৪র্থ বর্ষ, ১ম সংখ্যা
শ্রাবণ, ১৩৪১

পরিচয়

বুদ্ধদেবের 'নাস্তিকতা'

৩

বুদ্ধদেবের সমস্ত দেশনার মধ্যে, মুক্তাগুচ্ছের অন্তরালে স্বর্ণসূত্রের ন্যায়, যে তত্ত্বটি ওতপ্রোত আছে, সেটি এই :—

সব্বং অনিচ্চং, সব্বং দুক্খং, সব্বং অনাত্তং—সর্ব্বই অনিত্য, সর্ব্বই দুঃখ, সর্ব্বই অনাত্ম।

সর্ব্বম্ অনিত্যম্

প্রথম সূত্র,—সর্ব্বং অনিত্যং। এই যে বিশাল বিবিধ বিচিত্র বিশ্ব—this solid-seeming universe, it is in a constant state of flux—ইহা নিয়ত পরিণামী, সতত বিকারশীল। একদিন এ বিশ্বের প্রলয় বিলয় বিনাশ ঘটিবেই—

—ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে—গীতা, ৮।১৯

এ সম্পর্কে বিজ্ঞান ও দর্শন এক মত। বুদ্ধদেবও ঐ কথাই বলিয়াছেন—Up to the highest world of the gods, every existence becomes annihilated। শ্রীশঙ্করাচার্য্য স্মরণীয় শ্লোকে এই সত্যকে স্থায়ী রূপ দিয়াছেন—

অষ্ট কুলাচলাঃ সপ্ত সমুদ্রাঃ
ব্রহ্মপুরন্দর দিনকর রুদ্রাঃ।
ন ত্বং নাহং নায়ং লোকঃ
তদপি কিমর্থং ক্রিয়তে শোকঃ॥

অতএব বুদ্ধদেবের সিদ্ধান্ত এই—

A rising shews itself, passing away shews itself, during existence vicissitude shews itself. —অঙ্গুত্তর নিকায়, ii p 261.

থেরগাথায় এই কথাই বলা হইয়াছে—

Impermanent are all the compounds of existence !
Painful are all the compounds of existence !

—থেরগাথা, v 227

অন্যত্র—

"All things are subject to annihilation, to destruction * * * they are subject to cessation, to changeableness.

—সংযুক্তনিকায়, iv p 216

এক কথায়, যং কিঞ্চি সমুদয়ধম্মং (has origin), সব্বং তং নিরোধধম্মং তি—মজ্ঝিমনিকায়, ১৪৭ সূত্ত।

—যাহারই উদয় আছে, তাহারই ব্যয় আছে—সে কখন অব্যয় অক্ষয় হইতে পারে না—সে 'অনিত্য'। ইহাই প্রজ্ঞা-দৃষ্টি।

সব্বে ধম্মা অনত্তাতি যদা পঞ্ঞায় পস্সতি—ধম্মপদ

এই বিশ্বপ্রপঞ্চের যখন একদিন উৎপত্তি হইয়াছিল, তখন অন্যদিন ইহার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। আদিতে উদয়, অন্তে বিলয়—মধ্যে ক্ষয় ব্যয়, বিকৃতিপরিণতি। সেইজন্যই এই প্রপঞ্চের নাম 'জগৎ' (what passes away—গচ্ছতি গচ্ছতি ইতি জগৎ); সেইজন্যই ইহার নাম 'সংসার' (endless chain of changes—সংসরতি সংসরতি ইতি সংসারঃ। গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাই ইহাকে 'অশাশ্বত' বলিয়াছেন—দুঃখালয়ম্ অশাশ্বতম্ (গীতা, ৮।১৫)। অশাশ্বত = অনিচ্চ (অনিত্য)।

এই যে আমাদের দেহ—উহাও ঐ প্রপঞ্চের অন্তর্গত। উহার সার্থক নাম শরীর—যাহা শীর্ণ হয়, জীর্ণ হয়। বুদ্ধদেব বলিয়াছেন, দেহ যখন প্রপঞ্চের অন্তর্গত, তখন উহার ধ্রুবা স্থিতি নাই—উহাও অনিত্য—

আতুরং বহুসঙ্কপ্পং যস্স নত্থি ধুবং ঠিতি

—ধম্মপদ, জরাবগ্গো

উহা ফেনের ন্যায় ভঙ্গুর এবং মরীচিকার ন্যায় অলীক—

ফেণূপমং কায়মিমং বিদিত্বা মরীচিধম্মং অভিসম্বুধানো
—পুপ্‌ফ বগ্‌গো

হিন্দু দার্শনিকও 'শরীরং ক্ষণবিধ্বংসি' বলিয়াছেন এবং নানা ভঙ্গিতে উহার ভঙ্গুরত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন ঃ—'শ্বোভাবা মর্ত্ত্যস্য'—Things of a day—কঠ-উপনিষদে নচিকেতার ঐ আক্ষেপ এবং পরমহংস-উপনিষদে—স্ববপুঃ কুণপম্ (শবদেহ) ইব দৃশ্যতে—এই উপদেশ স্মরণ করুন। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের পরীক্ষিত সিদ্ধান্ত এই যে, শরীরের catabolismএর ফলে প্রতিক্ষণ উহা হইতে বিশ্লিষ্ট অণু-পরমাণু বিচ্ছুরিত হইতেছে এবং নবতর উপাদান তাহার স্থলে সংশ্লিষ্ট হইতেছে। এইরূপে সাত বৎসরে আমাদের শরীর সম্পূর্ণ নবীকৃত হয়।

A man who deliberately chooses that he will have a pure body, either takes advantage of *the fact that his body completely changes in seven years* or prefers the shorter and more difficult path of changing it more rapidly * * The particles, of which those bodies are composed, are constantly coming and going.—Mrs Besant's Man and his Bodies, pp 18, 20.

অতএব 'সর্ব্বং অনিত্যং' বুদ্ধদেবের এই মহোক্তি সম্বন্ধে আপত্তি উঠিতে পারে না। কিন্তু প্রশ্ন উঠিবে—এই অধ্রুব, অনিত্যের পশ্চাতে বুদ্ধদেব কোন কিছু ধ্রুব, নিত্য মানিতেন কি না ?

—Whose secret presence, thro' creation's veins,
Running quick-sliver like, eludes your pains.

উপনিষদ্ যেমন 'নিত্যো নিত্যানাম্' 'মহান্ ধ্রুবঃ' অক্ষত অমৃত অজর অক্ষর অক্ষয় অব্যয় এক শাশ্বত, নিত্য, নির্বিকার সত্তার উপদেশ করিয়াছেন—যিনি 'বিনশ্যৎসু অবিনশ্যন্তং,—

সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্।
বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি॥—গীতা, ১৩।২৭

—বুদ্ধদেবের 'দর্শনে' সেরূপ সত্তার স্থান আছে কিনা ? যদি না থাকে, তবে তিনি নাস্তিক বটেন।

এ সম্পর্কে উপনিষদ্ কি বলিয়াছেন ? উপনিষদ্ বলেন—এই বিশ্ব বিবিধ বিচিত্র বটে, কিন্তু বিশ্বের অজস্র বৈচিত্র্যের মধ্যে এক অদ্বয় 'পুরুষ' (Cosmic Principle) বিরাজিত আছেন—

পুরুষ এবেদং সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যম্
—ঋগ্বেদ, ১০ম মণ্ডল, ৯০ সূক্ত

তিনিই 'ব্রহ্ম'—ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বমিদং বরিষ্ঠম্ (মুণ্ডক, ২।২।১১)। সেই ব্রহ্ম অ-মৃত—ব্রহ্মৈবেদম্ অমৃতম্; তিনি অ-ক্ষর—তদ্ অক্ষরং গার্গি ! ব্রাহ্মণা অভিবদন্তি (বৃহ, ৩।৮।৮); তিনি 'মহান্ ধ্রুব'—

একধৈবানুদ্রষ্টব্যম্ এতদ্ অপ্রমেয়ং ধ্রুবম্।
বিরজঃ পর আকাশাদ্ অজ আত্মা মহান্ ধ্রুবঃ॥
—বৃহ ৪।৪।২০

তিনি অনিত্যের মধ্যে চির নিত্য—

নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্
একো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্।—কঠ, ৫।১৩

সেই অজর অক্ষর অমর নিত্য সত্তা—

স এষ ইহ প্রবিষ্টঃ। আনখাগ্রেভ্যো যথা ক্ষুরঃ ক্ষুরধানে অবহিতঃ স্যাদ্, বিশ্বম্ভরো বা বিশ্বম্ভর-কুলায়ে। তং ন পশ্যন্তি—বৃহ, ১।৪।৭

'যেমন ক্ষুর ক্ষুরধানে, যেমন অগ্নি অরণির মধ্যে, তেমনি তিনি এই বিশ্বের মধ্যে আনখাগ্র (upto the finger-tips) প্রবিষ্ট আছেন'—যদিও 'অণিমা' (স য এষ অণিমা) বলিয়া, প্রচ্ছন্ন বলিয়া, নিগূঢ় বলিয়া—ঘৃতমিব পয়সি নিগূঢ়ং—'Its secret presence eludes your pains'—তিনি আমাদের দৃষ্টির অগোচর। বুদ্ধদেবের বাণীর মধ্যে এরূপ কোন ইঙ্গিত আছে কি ? যদি না থাকে, তবে ত' 'সব্বং অনিচ্চং' এই উপদেশ দ্বারা তিনি নাস্তিক মতেরই পোষকতা করিয়াছেন ! তবে কি তাঁহার মতে—

—অসত্যম্ অপ্রতিষ্ঠঞ্চ জগদ্ আহু অনীশ্বরম্ ?

এ আপত্তির উত্তর আমরা ইতিপূর্ব্বেই পাইয়াছি—আমরা দেখিয়াছি শুধু ইঙ্গিত মাত্র নহে, বুদ্ধদেব স্পষ্টবাক্যে প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, এক

অজাত অভূত অকৃত অসংখত (unborn, uncreate, unbecome, unevolved) অর্থাৎ শাশ্বত নিত্য সত্তা বিদ্যমান আছে—যে সত্তার উপরই এই জাত ভূত কৃত সংখত বিচিত্র বিশ্বের অস্তিত্ব নির্ভর করিতেছে। ঐ সত্তা কিঞ্চন নয়, অকিঞ্চন নয়, সৎ নয়, অসৎ নয়, উহার গতি নাই, আগতি নাই, স্থিতি নাই, চ্যুতি নাই, উৎপত্তি নাই, বিলয় নাই। ঐ সত্তা অপ্রবৃত্ত, অনাধার, অনারম্ভ—অজ্ঞেয়, অমেয়, অবাচ্য, অনির্দেশ্য—মহা-সমুদ্রের ন্যায় গম্ভীর, দুষ্পরিগ্রহ, অপ্রমেয়, অগাধ। এই যে 'সর্ব্ব', এই যে 'প্রপঞ্চ'—এই যে ভূত-ভৌতিক জগৎ (Material Universe)—ইহা অনিত্য বটে; কিন্তু যাহা 'অপ্রপঞ্চ', প্রপঞ্চাতীত ?—তাহা ত 'অনিচ্চ' নহে—তাহা নিত্য! এবং যিনি 'তথাগত', যিনি 'নিষ্প্রপঞ্চ' (নিপ্পপঞ্চা তথাগতা—ধম্মপদ), যিনি প্রপঞ্চ-সমতিক্রান্ত (পপঞ্চ-সমতিক্কন্তে তিন্ন-সোকপরিদ্দবে—ধর্ম্মপদ)—অর্থাৎ যিনি সেই অজাত অভূত অকৃত অসংখত সত্তায় সুস্থিত, যিনি 'অস্তংগত,'—তিনিও সেই সত্তার ন্যায় লোকোত্তর (transcendental), —অপ্রমেয় (অত্থং গতস্স পমানং নত্থি),—অস্তি-নাস্তির অতীত—'অকৃত'-জ্ঞ 'অচ্যুতস্থান'প্রাপ্ত—

> তে যন্তি অচ্চুতং ঠানং যত্থ গন্ত্বা ন সোচয়ে—ধম্মপদ, কোধবগ্‌গো
> সঙ্‌খারানং খয়ং ঞত্বা অকতঞ্ঞূসি ব্রাহ্মণ—ঐ, ব্রাহ্মণবগ্‌গো

সর্ব্ব = Everything; ঐ সর্ব্ব অনিত্য। যাহা 'সর্ব্ব' নহে, তাহা No-thing, তাহা 'শূন্য'। আমরা দেখিয়াছি, ঐ 'অজাতং অভূতং অকতং অসংখতং' সত্তাকে বুদ্ধদেব 'শূন্য' বলিয়াছেন এবং পাছে 'শূন্য' বলিলে নাস্তিত্ব (Nihilum) বুঝায়, সেইজন্য ঐ শূন্যের নামান্তর দিয়াছেন 'অক্ষয়'—যে চ সুভূতে! শূন্যা, অক্ষয়া অপি তে। অতএব তাঁহার শূন্য অনিত্য নহে, নিত্য—অক্ষয়। অক্ষয় সেই—যাহার ক্ষয় ব্যয় নাই, অপচয়-উপচয় নাই—যাহা অজর, অমর, অক্ষর। যিনি 'শূন্যতা'-সিদ্ধ, নির্ব্বাণপ্রাপ্ত—তিনিও অক্ষয় শান্তি, অক্ষয় স্বস্তি, অক্ষয় সুখে প্রতিষ্ঠিত—*eternal* peace, *eternal* rest, *eternal* bliss' তাঁহার অধিগত এবং তিনি অগাধ অ-মৃতে পরিনিষ্পন্ন—'submerged in the Imperishable' *

---

* এ প্রসঙ্গে খৃষ্টীয় mystic Silesiusএর নিম্নোক্তি তুলনীয়—I am a blissful thing, a non-thing though I be.

তে পতিপত্তা অমতং (অ-মৃতং) বিগয্য লদ্ধা মুধা নিব্বাণং ভুঞ্জমানা

—সুত্তনিপাত

এমন কি 'পটিসংবিদামগ্গে' নির্ব্বাণের যে সকল বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে—নিত্য, ধ্রুব, অচল, অজাত, অজর, অমৃত, অশোক, অনিমিত্ত—তাহাদিগের অন্যতম। অতএব বুদ্ধদেব 'সব্বং অনিচ্চং' বলিয়াছেন বলিয়া, তাঁহার নামে নাস্তিক্য-অপবাদ কোনমতে উঠিতে পারে না।

সর্ব্বং দুঃখম্

বুদ্ধদেবের দ্বিতীয় সূত্র ঃ—সব্বং দুক্খং—সমস্তই দুঃখময়। বুদ্ধদেব 'মহা সতিপতানসুত্তে' বলিয়াছেন ঃ—

জাতি পি দুক্খা, জরা পি দুক্খা, ব্যাধি পি দুক্খা, মরণং পি দুক্খং, সোক-পরিদেব-দুক্খদোমনস্স-উপায়াসা পি দুক্খা, যং পি ইচ্ছং ন লভতি তং পি দুক্খং, সংক্খিত্তেন পঞ্চুপাদানক্খন্ধা দুক্খা—২২।১৮

"Birth is suffering, old age is suffering, disease is suffering, death is suffering, sorrow, distress, worry, hankering are suffering ; to be united to the disliked is suffering ; to be seperated from the liked is suffering ; not to get what one desires is suffering. In a word the five skandhas are suffering."

অর্থাৎ জন্ম দুঃখ, জরা দুঃখ, রোগ দুঃখ, মরণ দুঃখ, প্রিয়বিয়োগ দুঃখ, অপ্রিয়সংযোগ দুঃখ—কামনার বিঘাত দুঃখ। জগতে সমস্তই দুঃখ, সব্বং দুক্খং।

পুনশ্চ ঐ দুঃখ অল্প নয়, প্রচুর, অপর্য্যাপ্ত—

—প্রহস্সথা দুক্খ মিদং অনপ্পকং—ধম্মপদ, দণ্ডবগ্গো।

এই কথার অনুবাদ করিয়া আর্ণল্ড্ 'Light of Asia'তে বলিয়াছেন—

Ask of the sick, the mourners, ask of him
Who tottereth on his staff, low and forlorn—
'Liketh thee life' ; these say, the babe is wise
That weepeth being born.

সংযুক্তনিকায়ে দেখি, বুদ্ধদেব শিষ্যদিগকে প্রশ্ন করিতেছেন ঃ

What do you think, O Monks ! which may be more, the flood of tears you have shed on this long way, running again and again to new birth and new death, united to the disliked,

seperated from the liked, complaining and weeping—or the water of the four great oceans ?

তাঁহার নিজমুখের উত্তর এই ঃ

While you were united to the disliked, separated from the liked, running from birth to death, from death to birth, you have shed on this long way, truly, more tears than water is contained within the four great oceans.—সংযুক্তনিকায় II, p 178

ধম্মপদের জরাবর্গে এই কথাই শ্লোকার্দ্ধে উক্ত হইয়াছে—

কোনু হাসো কিমানন্দো নিচ্চং পজ্জলিতে সতি

—সংসার-অরণ্যে দাবাগ্নি লাগিয়াছে, এখানে হাস্য কৌতুকের, আহ্লাদ-আমোদের অবসর কোথায় ?

'The whole world is devoured by flames, the whole world is enshrouded in smoke, the whole world is on fire, the whole world is trembling,'—সংযুক্ত নিকায় I, p. 133.

We agree with the Greek chorus in Oedipus, that the happiest fate for man is not to be born at all, while the second best is to die—no sooner he sees the light. * * With everyone, without exception, life is as full of pains and sorrows as a bramble-bush of thorns,—an undesirable thing, *at best.*

পৃথিবীতে সুখ নাই—তাহা নহে।

'What an immense quantity of pleasure, of lust, of the purer joys of family life, in nature and in art, life offers ! No, not everything in life is suffering ; it is not even true, that suffering predominates therein ; but in spite of suffering, existent without doubt, the world is beautiful and worthy of being enjoyed,*

মানুষ জীবনে দুঃখের সহিত সুখও ভোগ করে বটে কিন্তু তথাপি বিবেকীর দৃষ্টিতে জগৎ দুঃখময়—দুঃখমেব সর্ব্বং বিবেকিনঃ (যোগসূত্র ২।১৫)। যদি জগতের দুঃখ সুখ লইয়া একটু ধীরভাবে বিচার করি, তবে দেখিতে পাইব প্রত্যেক সুখ দুঃখোদর্ক অর্থাৎ সকল সুখের মধ্যেই দুঃখের বীজ প্রচ্ছন্ন আছে। গীতারও কথা ঐ—

যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে ।

---

* এই ভাবে ভাবিত হইয়া Sir John Lubbock 'Pleasures of Life' লিখিয়াছিলেন।

বিষ্ণুপুরাণেরও ঐ কথা—

যৎ যৎ প্রীতিকরং পুংসাং বস্তু মৈত্রেয় ! জায়তে ।
তদেব দুঃখবৃক্ষস্য বীজত্বম্ উপগচ্ছতি ॥—৬।৫।৫৫

বুদ্ধদেব বলিতেন—

প্রিয়ানং অদস্সনং দুক্খং অপ্পিয়ানঞ্চ দস্সনং—ধম্মপদ

'প্রিয়ের সহিত বিয়োগ এবং অপ্রিয়ের সহিত সংযোগ—ইহাই দুঃখ'। অর্থাৎ যাহা ইচ্ছা করি, তাহা পাইনা—যাহা ইচ্ছা করি না তাহাই পাই। এই যে ইচ্ছার (স্ব-চ্ছন্দের) বিঘাত ও ব্যাঘাত—ইহাই দুঃখ। দার্শনিক সোপেনহাওয়ারের ভাষায় suffering is impeded volition। জীবনে পদে পদে ইচ্ছার বিঘাত ও ব্যাঘাত হয় নাকি ? তা' ছাড়া আমরা দেখিয়াছি, সব্বং অনিচ্চং—তাহা যদি হয়, তবে ত' সব্বং দুক্খং—কারণ, বুদ্ধদেব বলেন, যং অনিচ্চং তং দুক্খং—যৎ অনিত্যং তৎ দুঃখম্ (সুত্তনিপাত iv, pp 1 & 216)—যাহাই অনিত্য, তাহাই দুঃখ।

I have said that whatever is felt, belongs to suffering, having regard to the fact that things are subject to annihilation, to destruction, that pleasure in them ceases, that they are subject to cessation, to changeablness. —সুত্তনিপাত iv 216

সেই গীতার কথা—সুখ দুঃখ আগমাপায়ী আদ্যন্তবন্ত, অনিত্য।

আগমাপায়িনোঽনিত্যাঃ—গীতা, ২।১৪

যেতু সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে।
আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ! ন তেষু রমতে বুধঃ ॥—গীতা, ৫।২২

যিনি বুধ (পণ্ডিত), যিনি বিচারশীল বিবেকী, তিনি এই দুঃখোদর্ক, দুখের দ্বারা সংভিন্ন, অস্থায়ী অনিত্য সুখে সন্তুষ্ট হইবেন কিরূপে ?

আরও দেখুন, 'অনল্পক' দুঃখের তুলনায় সুখ কতটুকু ? অত্যল্প নয় কি ? সেই যে সাংখ্যকার বলিয়াছেন—

কুত্রাপি কোঽপি সুখী।—৬।৭

তদপি দুঃখশবলমিতি দুঃখপক্ষে নিঃক্ষিপন্তে বিবেচকাঃ—৬।৮

'সেই অত্যল্প কাদাচিৎক সুখ আবার দুঃখশবল—অতএব বিবেকীরা তাহাকে দুঃখপক্ষেই নিক্ষেপ করেন।'

সেইজন্য প্রাচীনেরা বলিতেন, পৃথিবীর সুখ যেন কাকের মাংস (বিস্বাদ), তায় শুনোচ্ছিষ্ট (কুকুর কর্ত্তৃক এঁটো-করা), তাহাতে আবার স্বল্প এবং সুদুর্লভ।

কাকমাংসং শুনোচ্ছিষ্টং স্বল্পং তদপি দুর্লভম্।

বুদ্ধদেবও বলিতেন—অপ্প(অল্প)-স্সাদা দুক্‌খা কামা (ধম্মপদ)।

বিচারদৃষ্টিতে দেখিলে জাগতিক সুখের এ বর্ণনা অতিরঞ্জিত নহে। শুধু আধিভৌতিক জগৎ কেন, আধ্যাত্মিক জগতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেও এই কথারই সমর্থন হয়। আমাদের চিত্ত—যাহার সহিত সংযুক্ত হওয়াতে জীবের জীবত্ব—সমস্ত ভাবনা বাসনা চেষ্টনা যে চিত্তের বৃত্তি, যে চিত্ত-ভূমির প্ররোহ—সেই চিত্ত অশেষ 'ক্লেশে'র আকর—পতঞ্জলির ভাষায়—ক্লেশমূলঃ কর্ম্মাশয়ঃ দৃষ্টাদৃষ্টজন্মবেদনীয়ঃ (যোগসূত্র, ২।১২)। তন্‌হার ঝঞ্ঝাবাতে, কামনার তুফানে ঐ চিত্ত সদাই আন্দোলিত—জীবের স্বস্তি শান্তি সন্তোষ কোথায়? সেইজন্য বুদ্ধদেব 'দন্তং চিত্তং সুখাবহং, সন্তং (শান্তং) চিত্তং সুখাবহং' বলিয়াছেন। কিন্তু দান্ত চিত্ত, শান্ত চিত্ত বহু সাধনা, বহু সুকৃত-সাধ্য। বুদ্ধদেবের পরিভাষায়, কামনা-বাসনার নাম 'সংযোজন' (fetters), গ্রন্থি (bonds)।

সব্বসংযোজনং ছেত্বা যো বে ন পরিতস্সতি।
গন্থা তেসং ন বিজ্জন্তি যেসং নত্থি পিয়াপিয়ে।
—ধম্মপদ

কিন্তু যতদিন না গ্রন্থি মোচন হয়, সংযোজন-সংবরণ হয়? ততদিন নত্থি খন্দসমা দুক্‌খা (সুখবগ্‌গো)। সেই জন্য বুদ্ধদেব এক কথায় বলিয়াছেন—

দুক্‌খা জাতি পুনপ্পুনং—ধর্ম্মপদ। অর্থাৎ Life and suffering in the last analysis are identical concepts.

এই কথা বলার অপরাধে, অনেকে, বিশেষতঃ পশ্চিমিয়ারা, বুদ্ধদেবকে ঘোর Pessimist (দুঃখবাদী) বলিয়াছেন। বুদ্ধদেব যদি দুঃখবাদী, তবে উপনিষদ্‌ও দুঃখবাদী, গীতাও দুঃখবাদী, আমাদের ষড়্‌দর্শন সকলেই দুঃখবাদী। উপনিষদ্ কি বলিয়াছেন?—অতঃ অন্যৎ আর্ত্তম্—

সেই সৎ-চিৎ-সুখস্বরূপ ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত আর সমস্তই দুঃখময়। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ সেইজন্য জগৎকে দুঃখালয় বলিয়াছেন,—দুঃখালয়ম্ অশাশ্বতম্। তাই ভগবানের উপদেশ—

অনিত্যম্ অসুখং লোকম্ ইমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্—গীতা ৯।৩৩।

ন্যায় বৈশেষিক, সাংখ্যপাতঞ্জল, পূর্ব্ব মীমাংসা উত্তর মীমাংসা (বেদান্ত)—আর্ষ ষড়্দর্শনের প্রত্যেকেরই আরম্ভ—দুঃখবাদে। সংসার দুঃখময়—ঐ দুঃখের কিরূপে নিবৃত্তি হইতে পারে—এই উপায়-উদ্ভাবন জন্যই ঐ ঐ দর্শনের প্রবৃত্তি।*

শুধু এ দেশে কেন? জর্ম্মান ধ্যানরসিক (mystic) Jocob Boehme কি বলিয়াছেন?

If all the mountains were books, and all the lakes ink, and all the trees pens, still they would not suffice to depict all the misery.

দার্শনিক-প্রবর সোপেন্‌হাওয়ারের (Schopenhauer)'ও ঐ কথা।

This holds good of the modern philosophy of Schopenhauer, who, like no other European, has shewn the essence of all life to consist in suffering, but who has not been able to find the way and the bridge leading out of suffering. (George Grimm's Doctrine of the Buddha, p 18)

বুদ্ধদেব ও আর্য্যঋষিরা যদি সোপেন্‌হাওয়ারের মত কেবল দুঃখের কথাই বলিতেন, দুঃখহানির কোন 'পাত্তা'ই না দিতেন—তবে তাঁহাদিগকে pessimists (দুঃখবাদী) বলা অসঙ্গত হইত না। কিন্তু নিরাশার অন্ধকারে তাঁহাদের আশাপ্রদ বার্ত্তা এই—মাভৈঃ—'মোচন আছে এ বিপদে'—'পন্থা বিদ্যতে অয়নায়'—অর্থাৎ যেমন মুস্কিল আছে, তেমনি তাহার আসান আছে,—যেমন রোগ আছে, তেমনি ভবপীড়া আরোগ্যের জন্য ঔষধ আছে। এ সম্পর্কে বুদ্ধদেবের আশ্বাসবাণী শুনুন—

---

* এ সম্পর্কে মৎপ্রণীত 'গীতায় ঈশ্বরবাদ' গ্রন্থে এবং 'দুঃখবাদ—প্রাচ্য ও প্রতীচ্য' প্রবন্ধে সবিস্তার আলোচনা আছে—এখানে ইঙ্গিত মাত্র করিলাম। অধ্যাপক মোক্ষমূলরও এই মর্ম্মে বলিয়াছেন—

The principal systems of philosophy in India * * * start from the conviction that the world is full of suffering and that this suffering should be accounted for and removed.—The Six Systems of Indian Philosophy, p 140.

If ye lay bound upon the wheel of change
And no way were of breaking from the chain,
The heart of boundless Being is a curse,
The Soul of Things fell pain.

—Light of Asia.

হ'ত যদি পাশবদ্ধ জীব, এ সংসার-নেমির উপর—
নিরুপায়, শকতিবিহীন করিবারে ছিন্ন ভব-পাশ,
দুঃখ দুঃখ চিরদুঃখময় বিশ্বপ্রাণ হ'ত নিরন্তর,
অন্তহীন অন্তর-দেবতা হ'ত তবে অভিশাপ-রাশ!

কিন্তু মাভৈঃ মাভৈঃ—ye are not bound—তুমি শুদ্ধ বুদ্ধ নিরঞ্জন—তুমি নিত্যমুক্ত—তুমি কখনই বদ্ধ নহ। এবং the heart of Being is celestial rest—জগতের মধ্যে যিনি অনুস্যূত আছেন, জগতের কেন্দ্রে যিনি অধিষ্ঠিত আছেন—তিনি নিত্যানন্দ—উপনিষদের ভাষায়, তিনি শুধু বিজ্ঞানং নহেন তিনি বিজ্ঞানম্ আনন্দম্, এবং উত্তরাধিকার-সূত্রে তুমি সেই ভূমানন্দের 'দায়ভাক্'। এডুইন আর্নল্ডের কথায়—

Ye are not bound; The Soul of Things is sweet;
The Heart of Being is celestial rest;
Stronger than woe is will; that which was good
Doth pass to Better—Best.

—The Light of Asia, Book viii.

জীব কদা পাশবদ্ধ নহে, বিশ্বপ্রাণ সদা মধুময়!
আর্ত্তি হ'তে ঈপ্সা বলীয়ান্, বিশ্বকেন্দ্র স্বস্তির নিলয়!
শুভ যাহা ক্রমে শুভতর, শুভতম হ'বে নিঃসংশয়।

সেই জন্য বুদ্ধদেব বলিয়াছেন, জীব যখন পাশমুক্ত, বি-সংযুক্ত হইয়া নির্ব্বাণে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন সে অমানুষী রতি, বিপুল সুখ, প্রামোদ্য-বহুল অচ্যুত পরম আনন্দ—এক কথায় 'ভূমানন্দে'র ভাগী হয়।

অমানুষী রতী হোতি সম্মা ধম্মং বিপস্সতো। নিব্বাণং পরমং সুখং।
ততো পামোজ্জবহুলো দুক্খস্সন্তং করিস্সতি—ধম্মপদ

যে বুদ্ধদেবের এই প্রণালী এই পদ্ধতি, এই মত এই পথ—তাঁহাকে pessimist দুঃখবাদিদিগের মধ্যে গণনা করা খুব অসঙ্গত নহে কি?

সর্ব্বং অনাত্মম্

বুদ্ধদেবের তৃতীয় সূত্র—সর্ব্বং অনাত্মং। 'সব্বং অনিচ্চং সব্বং দুক্খং সব্বং অনাত্মং—যাহা কিছু সমস্তই অনিত্য, সমস্তই দুঃখ, সমস্তই অনাত্ম। সমস্তই অনাত্ম? তবে কি বুদ্ধদেব জড়বাদীর মত আত্মা মানিতেন না—Survival of Man মানিতেন না? তাঁহার কি এই মত ছিল যে, দেহের নাশের সহিতই সমস্তের বিনাশ হয়? তাহা যদি হয়, তবে ত' তিনি নিপট দেহাত্মবাদী—মহা নাস্তিক। কথাটা একটু ধীরভাবে আলোচনা করা যাক। যে বুদ্ধদেব পুণ্যপাপের ফল-স্বরূপ স্বর্গ নরক স্বীকার করিয়াছেন—

> সগ্‌গং সুকৃতিনো যন্তি, নিরয়ং পাপকম্মিনো—ধম্মপদ
> অভূতবাদী নিরয়ং উপেতি—ধম্মপদ
> (নিরয়=নরক, সগ্‌গ=স্বর্গ)
> ইধ সোচতি পেচ্চ সোচতি পাপকারী উভয়থ সোচতি।
> ইধ মোদতি পেচ্চ মোদতি কতপুঞ্‌ঞো উভয়থ মোদতি।—ধম্মপদ

অর্থাৎ পাপকারীর ইহলোক পরলোকে দুঃখ এবং পুণ্যকারীর ইহলোক পরলোকে সুখ।

—যে বুদ্ধদেব—প্রেততত্ত্ববাদীরা (spiritualists) যাহাকে spirit identity বলেন, সেই spirit-identity অর্থাৎ 'সোহং দেবদত্তঃ' এই প্রত্যভিজ্ঞা স্বীকার করিয়াছেন—তিনি দেহাত্মবাদী হইবেন কিরূপে?

মজ্ঝিমনিকায়ের ১৪৩ সূত্তে বুদ্ধদেবের একজন গৃহস্থ শিষ্য অনাথ পিণ্ডিকের প্রসঙ্গে এই বিবরণ দৃষ্ট হয়।

এক সময় ভগবান্ বুদ্ধদেব শ্রাবস্তীতে জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করিতেছিলেন—একং সময়ং ভগবতা সাবত্থিয়ং বিহরতি জেতবনে অনাথপিণ্ডিকস্‌স আরামে। ঐ সময় গৃহপতি অনাথপিণ্ডিক কঠিন রোগে পীড়িত হইয়া মৃত্যুশয্যায় শায়িত হইলে বুদ্ধদেবকে সংবাদ দেন এবং সারিপুত্রকে একবার দর্শন দিতে বলেন। তেন খো পন সময়েন অনাথপিণ্ডিকো গহপতি আবাধিকো হোতি দুক্খিতো বাল্‌হগিলানো (গ্লানঃ)। * * সাধু কির ভান্তে, আয়স্মা সারিপুত্তো যেন অনাথ পিণ্ডিকস্‌স গহপতিস্‌স নিবেশনং তেনুপসংক্রমতু। তদনুসারে সারিপুত্র আনন্দকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার গৃহে উপস্থিত হন এবং তাঁহার সঙ্কট অবস্থা দেখিয়া তাঁহাকে চরম ধর্ম্মোপদেশ দান করেন। ইহার অল্পক্ষণ পরে অনাথপিণ্ডিকের দেহান্ত ঘটে—অথ খো অনাথপিণ্ডিকো গহপতি অচিরপক্কন্তে আয়স্মন্তে চ সারিপুত্তে, আয়স্মন্তে চ আনন্দে কায়স্‌স ভেদা পরং মরণা তুসিতং কায়ং উপপজ্জি—এবং তিনি 'তুষিত কায়' প্রাপ্ত হন

(passed to the Tusita heavens)। সেই রাত্রেই অনাথপিণ্ডিক জ্যোতির্ম্ময় দেব-দেহে জেতবন উদ্ভাসিত করিয়া বুদ্ধদেবের সমীপস্থ হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করেন—অথ খো অনাথপিণ্ডিকো দেবপুত্তো অভিক্কন্তায় রত্তিয়া, অভিক্কন্তবণ্ণো কেবলকপ্পং জেতবনং ওভাসেত্বা যেন ভগবতা তেনুপসংকমি—এবং তাঁহার নিকট একটি গাথা আবৃত্তি করিয়া প্রস্থান করেন—ভগবন্তং অভিবাদেত্বা পদক্খিনং কত্বা তত্থেব অন্তধায়ি। প্রভাতে বুদ্ধদেব এই ঘটনা শিষ্যবর্গকে বলিলে—একম্ অন্তং ঠিতো দেবপুত্তো মং গাথাহি অজ্ঝাভাসি—ইহা শুনিয়া আনন্দ বলিলেন সম্ভবতঃ ঐ দেবপুত্র অনাথপিণ্ডিকই হইবেন—সোহি নূন সো, ভান্তে, অনাথপিণ্ডিকো দেবপুত্তো ভবিস্সতি —বুদ্ধদেব তাঁহার বাক্যের অনুমোদন করিয়া বলিলেন 'সাধু সাধু, আনন্দ— তোমার অনুমান ঠিকই—সেই দেব-পুত্র অনাথপিণ্ডিকই বটে—অন্য কেহ নয়'— সাধু সাধু আনন্দ! অনাথপিণ্ডিকো সো আনন্দ! দেবপুত্তো নাঞ্ঞোতি।

অতএব এ কথা নিশ্চিত যে, বুদ্ধদেব জানিতেন এবং বলিতেন যে—

The annihilation of man by death—this doctrine goes against the inner nature of man. (Grimm, p. 5)

কেবল তাহাই নহে, বুদ্ধদেব জন্মান্তর মানিতেন—'ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ' এই চার্ব্বাকমতের প্রতিবাদে তিনি বলিতেন —পুনপ্পুন গব্ভম্ উপেতি মন্দো (ধর্ম্মপদ)।

মনুজস্স পমত্তচারিণো তনহা বড্ঢতি মালুকাবিয়।
সো প্লবতি হুরাহুরং ফলমিচ্ছং ব বনস্সিং বানরো—তনহাবগ্গো

"প্রমত্তচিত্ত মনুষ্যের তৃষ্ণা 'মালবার' লতার ন্যায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ফলাকাঙ্ক্ষী বানর যেমন বনে অহরহ বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে গমন করে, সে ব্যক্তিও পুনঃপুনঃ জন্মান্তর গ্রহণ করে।

সর্ব্বত্থ বিমুত্তমানসো ন পুন জাতি জরং উপেহেসি—ধম্মপদ

'যতদিন না মানুষ সর্ব্বরূপে বিমুক্তচিত্ত হইবে, ততদিন সে জন্ম ও জরার অধীন থাকিবে।'

বুদ্ধদেবের মতে সংসার যেমন অনাদি, পুরুষের পুনর্জ্জন্মও সেইরূপ অসংখ্য—

Without beginning or end, ye Bhikkhus, is this *sansara*. There cannot be discerned a first beginning of beings, who sunk in ignorance and bound by thirst, ceaselessly transmigrating again and again run to a new birth.—সুত্তনিপাত II, p 187

বুদ্ধদেব বলিতেন, অবিদ্যাজনিত 'তনহা' (তৃষ্ণা) হইতেই জীবের জন্ম-জন্মান্তর এবং তনহাক্ষয়েই পুনর্জ্জন্মের নিবৃত্তি—

Through not understanding, through not penetrating the four noble truths (চতুরার্য্য সত্য), O Bhikkhus, we have wandered round this long long journey—you and I.—দীঘনিকায়, ২।৯০।

Hence it is this Tanha which must be completely eradicated, root and branch, during our present lifetime—if at death we want to get out of the cycle of rebirth (stretching from the beginingless infinity of the past).—The Doctrine of the Buddha. p 312

অর্থাৎ সেই প্রাচীন কথা—বাসনা হইতেই প্রবৃত্তি ও জন্মজন্মান্তর এবং জ্ঞানদ্বারা বাসনার ক্ষয়েই জন্মনিবৃত্তি ও জন্মান্তরের নিরোধ—জ্ঞানাৎ মুক্তিঃ, ন পুনরাবর্ত্তন্তে। যতদিন তাহা না হয়, ততদিনই সংসার—'the chain of single personalities strung one on to the other'।

যাবৎ জননং তাবন্ মরণং
তাবৎ জননীজঠরে শয়নম্—শঙ্কর

এ সম্পর্কে বুদ্ধদেবের দেশনাকে সংক্ষিপ্ত করিয়া অধ্যাপক গ্রিম্ এইরূপ লিখিয়াছেন—

His doctrine embraces three statements :

1. There is existence after death ;
2. This existence is effected by rebirth—strictly speaking by palingenesis ;
3. It takes place within the five realms mentioned above.

—The Doctrine of the Buddha, p 100.

এই পঞ্চবিধ পুনর্জন্ম কি কি ? দৈব, মানুষ, নারক, পৈশাচ ও তির্য্যক্, অর্থাৎ দেবলোকে, মনুষ্যলোকে, নরকলোকে, প্রেতলোকে ও পশুলোকে। যাহার যেমন ভাবনা—যাহার যেমন কামনা-বাসনা, তাহার তেমনি 'যথাকর্ম্ম যথাশ্রুতং' জন্মান্তর।

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয়! সদা তদ্‌ভাব-ভাবিতঃ॥—গীতা, ৮।৬

এ প্রসঙ্গে অভিজ্ঞ পাঠকের উপনিষদের উপদেশ স্মরণে আসিবে।

যোনিম্ অন্যে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ।
স্থাণুম্ অন্যেঽনুসংযন্তি যথাকর্ম্ম যথাশ্রুতম্॥—কঠ, ২।২।৭

'যেমন কর্ম্ম যেমন বিদ্যা—তাহার অনুসারে জীব দেহান্তর গ্রহণের জন্য, হয় মাতৃজঠরে প্রবেশ করে অথবা 'স্থাণু' (তির্য্যক্ বা স্থাবর) দেহ প্রাপ্ত হয়।'

এই নিম্নযোনিপ্রাপ্তি সম্পর্কে ছান্দোগ্য-উপনিষদের উক্তি এই—

য ইহ কপূয়চরণাঃ, কপূয়াং যোনিম্ আপদ্যেরন্ শ্বযোনিং বা সূকরযোনিং বা (৫।১০।৭)

—'যাহাদের জঘন্য আচরণ, তাহারা হীন যোনি প্রাপ্ত হয়—কুকুরযোনি বা শূকরযোনি।'

এ সম্বন্ধে বৃহদারণ্যক-উপনিষদে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের উক্তি এই—

তদ্ যথা তৃণজলায়ুকা তৃণস্যান্তং গত্বা অন্যম্ আক্রমম্ আক্রম্য আত্মানম্ উপসংহরতি, এবমেবায়ম্ আত্মা ইদম্ শরীরং নিহত্য অবিদ্যাং গময়িত্বা অন্যম্ আক্রমম্ আক্রম্য আত্মানম্ উপসংহরতি।

তদ্ যথা পেশস্কারী পেশসো মাত্রাম্ উপাদায় অন্যৎ নবতরং কল্যাণতরং রূপং তনুতে, এবমেব অয়ম্ আত্মা ইদং শরীরং নিহত্য অবিদ্যাং গময়িত্বা অন্যৎ নবতরং কল্যাণতরং রূপং কুরুতে—পিত্র্যং বা গান্ধর্ব্বং বা দৈবং বা প্রাজাপত্যং বা ব্রাহ্মং বা অন্যেষাং বা ভূতানাম্ (বৃহ ৪।৪।৩৪) অর্থাৎ যেমন জোঁক একটি তৃণের আশ্রয় ছাড়িয়া অন্য তৃণের আশ্রয় গ্রহণ করতঃ আপনাকে সংহৃত করে, সেইমত ঐ আত্মা এই দেহকে ত্যাগ করিয়া অচেতন করাইয়া, অন্য দেহ গ্রহণ করতঃ আপনাকে সংহৃত করেন। যেমন স্বর্ণকার সুবর্ণখণ্ড লইয়া তদ্দ্বারা নবতর কল্যাণতর রূপ রচনা করে, সেইমত ঐ আত্মা এই শরীর ত্যাগ করিয়া নবতর কল্যাণতর শরীর রচনা করেন—পিতৃলোকের উপযোগী, গন্ধর্ব্ব-লোকের উপযোগী, দেবলোকের উপযোগী, প্রজাপতিলোকের উপযোগী, ব্রহ্মলোকের উপযোগী কিম্বা অন্য লোকের উপযোগী শরীর।

আমরা ইহাও জানিয়াছি যে, বুদ্ধদেবের শিক্ষা এই যে, সমুচিত সাধন দ্বারা 'দিব্য' চক্ষুঃ (যাহাকে তিনি superhuman celestial seeing বলিয়াছেন) উন্মীলিত করা যায় এবং তাহার ফলে 'জাতিস্মর' হইয়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের ঘটনাবলী প্রত্যক্ষ করা যায়—'Thereby we may gain an immediate perception of our own existences before our birth and the vanishing and reappearing of other creatures.' (এ প্রসঙ্গে মজ্ঝিমনিকায় ৩৯ ও ৫১ সূত্র দ্রষ্টব্য)। অতএব জন্মান্তরবাদ বুদ্ধদেবের অনুমানসিদ্ধ Hypothesis মাত্র নহে, তাঁহার প্রত্যক্ষ-অনুভূত, সাক্ষাৎকৃত, অপরোক্ষ ব্যাপার। *

---

* With heart thus stedfast, thus clarified, and purified, stablished and immutable— it was thus that I applied by my heart to the knowledge which recalled my earlier existences in the past—a single birth, then two, then three * * * then a hundred thousand births * * * For, Waccha, as long as I please I can call to mind all my past existences from a single one onwards in all their details and features. As long as I please, I can see with the eye celestial, which is pure and far surpasses the eye of man—creatures to pass hence and reappear elsewhere.

—মজ্‌ঝিমনিকায়, 39th discourse.

সত্য বটে, বুদ্ধদেব—পাশ্চাত্যেরা যাহাকে Personality বলেন (এ দেশে যাহার প্রাচীন সংজ্ঞা ভূতাত্মা)—সেই ভূতাত্মাকে আশাশ্বত বলিয়াছেন। বুদ্ধদেবের দর্শনে এই Personalityর নাম পঞ্চস্কন্ধ (পালিতে 'খন্দ')।

'Personality, when analysed, is dissolved into the five skandhas. (Grimm).

বুদ্ধদেব বলেন, এই পঞ্চস্কন্ধের উদয়-ব্যয় আছে—উৎপত্তি-প্রলয় আছে—খন্দানং উদয়ব্যয়ং (ধম্মপদ)—অতএব ইহাদের সমষ্টি ভূতাত্মা (Personality) = অনাত্মং ।

ঐ পঞ্চস্কন্ধ কি কি ? রূপস্কন্ধ, বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ, সংস্কারস্কন্ধ ও বিজ্ঞানস্কন্ধ। রূপস্কন্ধ মাতাপিতৃজ পাঞ্চভৌতিক স্থূলশরীর—the material body composed of four chief elements (মহাভূত), the earthly, watery, fiery and airv (and of Akasa)—এক কথায় আমাদের sensorium—'মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি'-সংযুক্ত ষড়ায়তন দেহ—the six-senses machine, endowed with the five senses and the brain.

এই স্থূল দেহ (রূপ-কায়) ছাড়া বুদ্ধদেব সূক্ষ্মদেহ স্বীকার করিতেন—স্যার অলিভার লজ্ যাহাকে ether-body বলিয়াছেন—সাংখ্যদর্শনে যাহার নাম লিঙ্গশরীর। বুদ্ধদেবের পরিভাষায় ঐ সূক্ষ্মদেহের নাম নামকায়।

He distinguishes between নামকায় and রূপকায়, these terms designating the mental and the material body—(Grimm)। সংযুক্ত নিকায়ে তাঁহার মুখের কথা এই :—And what, monks, is নামরূপ ? Sensation, perception, thinking, contact, attention—these (অর্থাৎ the *faculties* of sensation, of perception, of thought, of contact etc), friends, are called নাম।* The four chief-elements (মহাভূত) and the corporeal form that comes to be by reason of the four chief

---

* If the three skhandhas—বেদনা, সংজ্ঞা and সংস্কার—are comprised in other passages under the designation of নাম, the meaning is simply this :...বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ and সংস্কারস্কন্ধ are the groups of those mental processes comprised under the term নামস্কন্ধ, because they are based on নাম as the respective faculty or quality of the material body as of a living entity.—Grimm, pp 77-8,

elements—this, friends, is called রূপ। —সংযুক্ত নিকায়, II. ৩। মিলিন্দপ্রশ্নে দেখিতে পাই, রাজা মিলিন্দ আর্য্যনাগসেনকে প্রশ্ন করিতেছেন—Master Nagasena! you are talking about নামরূপ, what means Nama and what means Rupa? নাগসেনের উত্তর এই :—What there is of coarse matter about a creature that is রূপ—and what there is subtle, ethereal, mental about it is নাম * * Both are inextricably connected,—O King, there would be no *rupa* if there were no *nama.* For নাম and রূপ are thus mutually dependent that they may only originate together. Thus it happens from time immemorial.

নামকায় দ্বারা বুদ্ধদেব যে mind-body (লিঙ্গশরীর) বুঝিতেন, দীঘনিকায়ে তাঁহার নিজবাক্যের প্রতি লক্ষ্য করিলে তদ্‌বিষয়ে সন্দেহমাত্র থাকে না। চিত্তশুদ্ধির ফলে সমাধি ঘনীভূত হইলে ধ্যানী ঐ নামকায়কে রূপকায় হইতে নিষ্কাষিত করিতে পারেন—মুঞ্জা হইতে যেমন ঈষিকা নিষ্কাষিত করা যায়।

With his mind thus concentrated, made completely pure, utterly clean * * he directs it to the calling up of the mental body. He calls up from this body (স্থূলশরীর) another body, having form made up of thought-stuff, having all limbs and parts—just as if a man were to pull out a reed from its sheath.

এই নামকায় বা Mind-bodyর অপর নাম চিত্ত।

ফন্দনং চপলং চিত্তং দূরক্‌খং দুন্নিবারয়ং—ধম্মপদ, চিত্তবগ্‌গো

'চিত্ত স্পন্দনশীল, চঞ্চল, দুরক্ষ্য ও দুর্নিবার'। মেধাবী ইহাকে যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিবেন—চিত্তং রক্‌খেথ মেধাবী।

প্রাগুক্ত faculties-যুক্ত (the faculties of sensation, of perception, of thought, of contact &c)—চিত্তকে পাশ্চাত্য দর্শনে soul বলে। ঐ soul নাকি শাশ্বত ও চিরন্তন (constant and immutable)। বুদ্ধদেব ঐরূপ soul মানিতেন না—তাহার মতে 'it is an utterly and entirely foolish idea'.—মজ্ঝিমনিকায়, I p.138।

The Buddha calls the dogma of the ego being constant and immutable in the form of an individual soul, "an utterly and entirely foolish idea".

—Grimm, Doctrine of the Buddha. p. 147.

সংযুক্ত-নিকায়ে দেখিতে পাই বচ্ছগোত্ত-নামক এক পরিব্রাজক (wandering ascetic) একবার বুদ্ধদেবকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন—গোতম ! Is the I existent অহম্ অস্মি ? তথাগত নিরুত্তর রহিলেন। বচ্ছগোত্ত আবার প্রশ্ন করিলেন—Is the I not existent—নাহম্ অস্মি ? তথাপি তথাগত নিরুত্তর রহিলেন। বচ্ছগোত্ত বিরক্ত হইয়া উঠিয়া গেলেন। তারপর বুদ্ধদেবের প্রিয়শিষ্য আনন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন—O Lord ! why did not the Exalted One explain himself on this question—তথাগত বচ্ছগোত্তের প্রশ্নের উত্তর দিলেন না কেন ? বুদ্ধদেব বলিলেন—আনন্দ ! অহমস্মি এ প্রশ্নের উত্তরে যদি আমি বলিতাম 'হাঁ'—তাহা হইলে শাশ্বতবাদের সমর্থন করা হইত (I had thereby sided with ascetics and Brahmins, who teach eternalism)। পক্ষান্তরে নাহমস্মি এ প্রশ্নের উত্তরে যদি বলিতাম 'হাঁ'—তাহা হইলে উচ্ছেদ-বাদের সমর্থন করা হইত (I had thereby sided with those ascetics and Brahmins who teach annihilation)—সংযুক্ত নিকায়, iv p. 400 *

এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক ব্রাড্‌লির একটি প্রগাঢ়োক্তি আমাদের স্মর্ত্তব্য—The body and soul (বুদ্ধদেব যাহাকে রূপকায় ও নামকায় বলিয়াছেন) are phenomenal arrangement but neither is real in the end, each is merely phenomenal.—Appearance and Reality, p. 307। কই ? এরূপ বলার জন্য ব্রাড্‌লিকে কেহ ত' নাস্তিক বলে না—তবে বুদ্ধদেবের দুর্নাম রটে কেন ?

রূপস্কন্ধের পর বেদনা-স্কন্ধ। বেদনা-স্কন্ধ কি ?

যখন বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ ঘটে, অর্থাৎ যখন বাহ্যস্পর্শ (external contact)-দ্বারা ঐ রূপ-স্কন্ধ স্পন্দিত হয়, তখন—"those modes, features, characters, expressions (এক কথায় বৃত্তয়ঃ পঞ্চতয্যঃ) arise in which the mental body (নামকায়) manifests itself—তখন sensation (বেদনা), perception (সংজ্ঞা), mentation বা ideation (সংস্কার) (Grimm p. 66), এবং সর্ব্বশেষে বিজ্ঞানের উদয় হয়। অতএব বুদ্ধদেব যাহাকে বেদনা-স্কন্ধ বলিয়াছেন, ঐ বেদনাস্কন্ধ = the feelings or sensations, whether pleasant, unpleasant or neutral (see 'What is Buddhism ?'

* মিলিন্দপ্রশ্নে ইহার প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই—where Nagasena explains to Milinda that what the king thinks to be his self is nothing but the unsubstantial ghost of Not-self, of Anatta. (Grimm. p. 160)

section 4)—অর্থাৎ সুখ-বেদনা, দুক্‌খ-বেদনা, অদুক্‌খ-অসুখ বেদনা (মজ্‌ঝিমনিকায়, 140th discourse), which arise in the mental body as the result of such contact.

ইহার পরই সংজ্ঞা-স্কন্ধ, which 'comprises all perception or re-cognition, whether sensuous or mental. It is re-action to sense-stimuli (What is Buddhism ?)। উপনিষদে এই 'সংজ্ঞা'র নাম 'সংজ্ঞান'। ঐ সংজ্ঞার অর্থ 'নাম' নহে —সংজ্ঞান (Perception)—'সংজ্ঞানম্, আজ্ঞানম্, বিজ্ঞানম্, প্রজ্ঞানম্'।

কিন্তু সংস্কারভিন্ন (বুদ্ধদেব ইহাকে সঙ্খার বলিয়াছেন) সংজ্ঞান সিদ্ধ হইতে পারে না—সেই জন্য স্কন্ধসমষ্টি Personalityর মধ্যে সংস্কারের গণনা। এই সংস্কার জন্ম-জন্মান্তরে অনুভূত বেদনা ও সংজ্ঞার 'বাসনা' (vestiges বা impressions).

—It includes all tendencies mental and physical, the elements or factors in consciousness. (What is Buddhism ?)

অধ্যাপক গ্রিম্ সংস্কারের অনুবাদ করিয়াছেন Mentation। ঐ প্রতিশব্দটি আমার মনঃপূত নয়। কারণ, আমাদের নামকায় (Mental Body) বা চিত্ত, সাদা শ্লেট—Tabula Rasa—নহে— উহা জন্মাবধি বিবিধ সংস্কার দ্বারা শবলিত—তদ্ অসংখ্যেয়বাসনাভিঃ চিত্রং (যোগসূত্র, ৪।২৩) ; এবং অশেষ সংস্কারের আধার—তথা অশেষ-সংস্কারা-ধারত্বাৎ (সাংখ্যসূত্র, ২।৪২)। বেদনা ও সংজ্ঞা (Sensation and Perception) যে অনিত্য ও অনাত্ম—এ বিষয়ে মতভেদ নাই। কিন্তু ঐ সংস্কারও অনিত্য—অতএব অনাত্ম।

সঙ্খারানং খয়ং ঞত্বা অকতঞ্ঞূসি ব্রাহ্মণ – ধম্মপদ
সব্বে সঙ্খারা অনিচ্চাতি যদা পঞ্ঞায় পস্সতি – ঐ, মগ্গ বগ্গো

কিন্তু অনুভূতি-উদয়ের পক্ষে বেদনা, সংজ্ঞা ও সংস্কার-স্কন্ধও পর্য্যাপ্ত নহে—there must be reaction of the chit—চিদ্‌বসানো ভোগঃ (সাংখ্যসূত্র, ১।১০৪)—এই জন্যই ত' চিত্তের নাম 'চিৎ-ত'। বুদ্ধের

পরিভাষায় এই ব্যাপারের নাম 'বি-জ্ঞান'। বিজ্ঞান কি ? — 'মাত্রাস্পর্শে'র ফলে চিত্তের যে প্রতিস্পন্দ বা reaction, উহাই 'বিজ্ঞান'।

অর্থাৎ In consequence of contact between our six-senses machine and the world of forms, odours, flavours, sounds, touches and ideas, there flames forth this বিজ্ঞান or consciousness. (Grimm)

'Apart from conditioning cause, there is no coming to pass of consciousness (বিজ্ঞান) (Majjhima Nikaya, I p. 256)—in short consciousness is something causally conditioned.

(Grimm, p. 55)

এই যে flamed-forth consciousness—ইহা বিজ্ঞান-বৃত্তি,—বুদ্ধদেব যাহাকে 'বিজ্ঞান-ধাতু' বলিয়াছেন, সে বিজ্ঞান-ধাতু নহে। অতএব উহা (বিজ্ঞানও) অনিত্য (temporary)। যেমন রূপস্কন্ধ, বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ ও সঙ্খারস্কন্ধ অনিত্য, এই উদয়-ব্যয়শীল বিজ্ঞানস্কন্ধও অনিত্য—অতএব অনাত্ম। এবং পঞ্চস্কন্ধসমষ্টি Personality বা ভূতাত্মাও অনিত্য—অতএব অনাত্ম।

কিন্তু মনে রাখিতে হইবে—According to the Buddha, our essence is not exhausted by our personality (Grimm, p. 48)। সত্য বটে আমরা সাধারণতঃ ঐ Personality বা ভূতাত্মার সঙ্গে তাদাত্ম্য (identity) স্থাপন করিয়া, 'gigantic and incessant self-mystification' দ্বারা (অনাদিমায়য়া সুপ্তঃ), ঐ অনাত্মাকেই আমাদের আত্মা মনে করি ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঐ apparent Ego—উহা আমাদের *false* self, our egoistic self, the fleeting personality, the actor's mask through which the true man speaks. (What is Buddhism ?) অতএব এই পঞ্চস্কন্ধ (ভূতাত্মা) আমাদের প্রকৃত আত্মা নহে—ইহা আমাদের false self, অনাত্মা। অধ্যাপক গ্রিম যথার্থই বলিয়াছেন—

'Our true essence lies beyond (and behind) our personality and its components—even beyond the world. (p. 227)

সত্য বটে, the average man identifies his essence with the five components of his personality (পঞ্চস্কন্ধ) * * কিন্তু in truth, man does not consist in his personality. But this he does not recognise, being under the delusion that he consists of his personality. (Grimm, pp. 147-8)। সেইজন্য বুদ্ধদেব পঞ্চস্কন্ধকে 'উপাদান'-স্কন্ধ বলিয়াছেন—the groups of grasping। বুদ্ধদেবের নিজের বাণী শুনুন—Take, friend Visakha, the uninstructed man of the world—this man looks upon রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সঙ্খার and বিজ্ঞান as himself or looks upon himself as possessing these or else he regards himself as being in body, sensation, perception, mentation or consciousness (Majjhima Nikaya, III p. 17)। কিন্তু ভিক্ষুগণ! রূপ ত' তোমার নহে, বেদনাও তোমার নহে, সংজ্ঞাও তোমার নহে, সংস্কারও তোমার নহে, বিজ্ঞানও তোমার নহে। অতএব Give them up—one and all (মজ্ঝিমনিকায়, I p. 141)—কারণ, জানিয়া রাখ—নেতং মম, নেসোহহং অস্মি, ন মে সো অত্তা (আত্মা) (This does not belong to me, this I am not, this is not my self)—মজ্ঝিমনিকায়, I p. 232।

ইহার প্রতিধ্বনি করিয়া অধ্যাপক গ্রিম বলিতেছেন :—Personality in its elements, is something *alien* to our true essence. From this *alien* thing, we only need to free ourselves. * * He (our real self) is something essentially different from the five groups, constituting his personality, and in his real essence is not touched by the slow perishing of the five groups. The five groups follow their our laws. The five groups (পঞ্চস্কন্ধ) (Personality) being alien to me, I can lose it, discard it, without myself being hurt in my real constitution. All these *alien* things in which I see myself involved, for me are nothing but one endless chain of misery.

'But the learned and true disciple, conversant with the noble Doctrine—he recognises the fact that the corporal form (রূপস্কন্ধ), sensation (বেদনাস্কন্ধ), perception (সংজ্ঞাস্কন্ধ), the activities of the mind (সঙ্খারস্কন্ধ), consciousness (বিজ্ঞানস্কন্ধ) are not the Ego.' (সংযুক্তনিকায়, III p. 109-10).

It is a gigantic delusion to think that my real essence has something in common with the components of my personality (অর্থাৎ পঞ্চস্কন্ধ)।

Everything is *Anatta*—not the I, and does not belong to my innermost essence * * All determinants within us have

nothing to do with our essence, which is not subject to the laws of arising and passing away.

(The Doctrine of the Buddha, pages 131, 227, 299, 196, 162, 306, 312, 334)।

এই যে নেতি নেতি প্রয়োগ (Process of Negation or pointing out to us wherein we do not consist), দর্শনের ভাষায় ইহাকে অপবাদ বলে। ইহার পর 'nothing more seems to remain over wherein man may erroneously find his essence'। তখন সমস্ত 'অধ্যারোপ' নিরাস দ্বারা সর্ব্ব সঙ্কল্প ত্যাগের ফলে, he only cherishes the purely negative thought, because of rejecting everything: 'ন এতং মম, ন এসোহং অস্মি, ন মে সো অত্তাতি' and so ought soon to come upon the positive kernel of his own essence (Grimm)। বস্তুতঃ অপবাদন্যায়ের উদ্দেশ্যই ঐ—

It can only have for its object the pulling away more and more of the thick alien covering that is spread over our real essence until that essence itself lies openly before us. (p. 151)

ঐ real essenceই আমাদের প্রকৃত আত্মা (true self)। উহা লোকোত্তর তত্ত্ব (ultra-mundane essence)।

You are nothing belonging to the world. You are in truth beyond the world, beyond the universe. (Grimm, p. 159)

আবার বলি ঐ পঞ্চস্কন্ধের উদয়ব্যয় আছে—কিন্তু প্রকৃত আত্মার? Our essence is not subject to the laws of arising and passing away অর্থাৎ—ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ (কঠ, ২।১৮)।

অর্থাৎ মাসাব্দযুগকল্পেষু গতাগম্যেষ্বনেকধা।
নোদেতি নাস্তমায়াতি সম্বিদেষা স্বয়ংপ্রভা ॥—পঞ্চদশী

'অতীত বা আগামী কোনকালে সেই স্বপ্রকাশ সম্বিতের উদয়াস্ত হয় নাই, হইবে না।'

ঐ স্ব-প্রকাশ সম্বিৎই বুদ্ধদেবের বিজ্ঞানধাতু—মৈত্রেয়ী উপনিষৎ যাহাকে 'প্রত্যক্‌ধাতু' বলিয়াছেন—

আনন্দাদ্ধি র্ষ পরঃ সোঽহমস্মি •
প্রত্যক্‌ধাতু র্ন'ত্র সংশীতিরস্মি—১।১১

ঐ 'বিজ্ঞানধাতু' বিজ্ঞানস্কন্ধ নহে। বিজ্ঞানধাতু সম্বন্ধে বুদ্ধদেবের উক্তি এই—বিঞ্‌ঞানং অনিদস্সনং অনন্তং সব্বতোপহং (দীর্ঘনিকায়, ১১) অর্থাৎ বিজ্ঞানধাতু is invisible, boundless, all-penetrating, অর্থাৎ অবিনাশি তু তদ্‌ বিদ্ধি যেন সর্ব্ব মিদং ততম্‌ (গীতা, ২।১৭)। 'It is not an entity but the Universal Principle manifesting as the One life'—যাহাকে মহাযান বৌদ্ধেরা আলয়-বিজ্ঞান বলেন। (What is Buddhism ?) যাহা লোকোত্তর, অলৌকিক, transcendental—লৌকিক ভাষায় তাহার পরিচয় দেওয়া সম্ভব নহে। সেইজন্য বুদ্ধদেবের Doctrineএর বিবরণ করিয়া অধ্যাপক গ্রিম বলিয়াছেন—

We stand as something *inscrutable* beyond everything * * * The Atma, our kernel, cannot be grasped at all, by means of cognition * * * The true one is therefore not to be discovered as an object of cognition * * * It is transcendent.
—The Doctrine of the Buddha, p p. 447-8 and 515.

এখন বুদ্ধদেবের পূর্ব্বোল্লিখিত সেই সমীকরণটি (equation) স্মরণ করুন—সৎকায় + বিজ্ঞান = পুরুষ। সৎকায় = নামরূপ—রূপ = স্থূলদেহ (Physical Body) এবং নাম = সূক্ষ্মদেহ (Mental Body)। অতএব রূপকায় + নামকায় + বিজ্ঞান = পুরুষ। এ বিজ্ঞান—সেই অনিদ্দসনং অনন্তং সব্বতোপহং আলয়-বিজ্ঞানের, সেই invisible, boundless, all-penetrating Universal Principleএর 'আধ্যাত্মিক' বিজ্ঞান-ধাতু (individualised fragment)—সেই সমষ্টি-বিজ্ঞানের ব্যক্তিবিশেষ-কর্ত্তৃক স্বী-কৃত ব্যষ্টি-বিজ্ঞান। খৃষ্টীয় সাধু সেণ্ট পলও বলিয়াছেন জীব = Body + Soul + Spirit। তাঁহার উদ্দিষ্ট Spiritই বুদ্ধদেবের আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান ধাতু—'What is Buddhism'-এর গ্রন্থকার যাহাকে বলিয়াছেন 'the pure white radiance (pure – যেহেতু, অসঙ্গোয়ং পুরুষঃ – বৃহদারণ্যক) of the universally diffused eternal world-soul,

which is broken by the prism of the human body into the differentiated entities we call men'.

এ বিষয় লক্ষ্য করিয়া Charlotte Woods লিখিয়াছেন—

Individual consciousness (বুদ্ধদেবের আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানধাতু) is the adaptation to specific purposes, by the body as an organ of action, of the flow of the universal consciousness.—The Self and Its Problems, p. 63

বলা বাহুল্য, এই আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান-ধাতু পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানের immortal (?) soul নহে, which separates man from man ; 'it is not an entity but the Universal Principle, manifesting as the one Life ; 'it lives and moves in those who know the Self as one'—কারণ, ঐ বিজ্ঞান সমস্ত ভূতে বসতি করিলেও —দুগ্ধে ঘৃতের ন্যায় প্রচ্ছন্ন—ঘৃতমিব পয়সি নিগূঢ়ং ভূতে ভূতে বসতি বিজ্ঞানম্ (উপনিষদ্) ।

ইহার পরও কি বুদ্ধদেব পঞ্চস্কন্ধ-সমষ্টি ভূতাত্মা (Personalityকে) অনাত্ম বলিয়াছেন বলিয়া তাঁহার নাস্তিক-অপবাদ প্রচলিত থাকিবে ?

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত
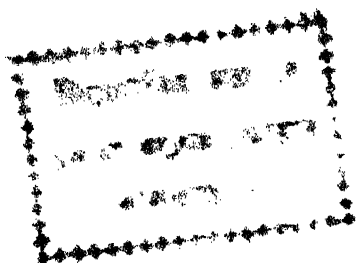
পুরানো কথা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

জেনিভা আজ আন্তর্জাতিক কেন্দ্র। কিন্তু চিরদিনই নির্ভীক, স্বাধীন, অভিনব চিন্তার সঙ্গে এই জায়গাটার কেমন একটা যোগ ছিল। সেকালে পোপের শক্তিকে যারা সব চেয়ে জোরে নাড়া দিয়েছিলেন, সেই কাল্‌ভিনিষ্ট্‌ সম্প্রদায়ের আড্ডা ছিল জেনিভা। তার পরের যুগে যে দু জন মহাপুরুষ অবাধ-রাজশক্তির সর্ব্বনাশের সূত্রপাত করেন, তাঁদের সঙ্গেও এই জেনিভার ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। রেল ষ্টেশন থেকে বেরিয়ে শহরের দিকে আসতে প্রথমেই নজর পড়ে হ্রদের মাঝে রুসোর দ্বীপ। শহরের অন্য দিক দিয়ে বেরিয়ে কোশ দশেক গেলেই, ফরাসী সীমান্তের পরপারে ফেয়ার্ণে গ্রাম। সেখানে আজও ভলতেয়ারের শাতো (আবাস) দাঁড়িয়ে রয়েছে। বাগানে ভলতেয়ারের মূর্ত্তি। মুখে তাঁর বিদ্রূপের হাসি। দেখলে মনে হয় যেন বলছেন—রাজা! কে রাজা! Un soldat heureux, নসীবদার সিপাহী বই ত নয়! আমি কয়েক হপ্তা সাধ মিটিয়ে এই Lac Leman-এর হাওয়া খেয়েছিলাম। আশ্চর্য্য হাওয়া! এতে প্রাণের আগুন নেভে না, বরং দ্বিগুণ জোরে জ্বলে ওঠে।

আমি যে হোটেলে বাস করছিলাম, সেখানে একদিন লম্বা চোগা-পরা দুজন উত্তর আফ্রিকার শেখ এলেন। এঁরা জাতিতে, যাকে বলে, মূর। বয়সে প্রৌঢ়। মূর্ত্তি শান্ত গম্ভীর। তাদের সঙ্গে আমি যেচে আলাপ করলাম। তাঁরা বললেন যে ইসলাম জগৎ সম্বন্ধে এক সভায় উপস্থিত হওয়ার উদ্দেশে এখানে এসেছেন। পরদিন বেড়াতে গিয়ে লেকের কিনারে দেখলাম অনেকগুলি তূর্কী যুবক বেড়াচ্ছেন। তাঁদের সব গায়ে সাহেবী পোষাক ও মাথায় Fez-টুপী। আমার শেখদের কাছে খবর পেলাম তাঁরা তূর্কী ও মিশরী তরুণ দল, তাঁরাও ইসলামী সভার জন্য এসেছেন। দিন দুই বাদে আমাদের হোটেলেই এঁদের সভা হল। সকাল বেলায় আমি লাইব্রেরী ঘরে বসে বিলেতী ছবির কাগজগুলো দেখছি, এমন সময়

দুজন সুদর্শন তুর্কী যুবক এসে চোস্ত ফরাসীতে বললেন, "ম্যসিয়, আপনার অনুমতি পেলে আমরা এই ঘরে বসে আমাদের একটু জরুরী কাজ করে নিই।" বুঝলাম যে আমাকে সরে পড়তে বলছেন। বেরিয়ে গেলাম। ঘণ্টা দুই চারিদিক বন্ধ করে ওঁদের মন্ত্রণা সভা চলল। বেরিয়ে যাবার সময় সেই তুর্কী যুবক দুটি বাগানে আমার সঙ্গে দুদণ্ড কথা কয়ে গেলেন। এঁদের একজন কায়রোর রাষ্ট্রীয় নেতা মুস্তাফা কামাল, অন্যজন ইস্তাম্বুলের আনোয়ার বে। মুস্তাফা বেশীদিন বাঁচেন নেই। তবে যতদিন ছিলেন তার মধ্যেই লোকের শ্রদ্ধাভক্তি যথেষ্ট পেয়েছিলেন। তাঁর আল্-লেওয়া কাগজের খুব নামডাক ছিল। অন্য ভদ্রলোকটির কথা আর কি বলব! স্বাধীন তুর্কীর দুর্দ্ধর্ষ জেনারল Enver Pasha'র নাম কে না শুনেছে! আমি কিন্তু তখন এঁদের পরিচয় জানতাম না। তাই ভারতের রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে সবেগে নিজের মত জাহির করেছিলাম। আনোয়ার যাবার সময় বলে গেলেন, "আপনারা কিন্তু ভারতীয় মুসলমানদের হাত না করতে পারলে আপনাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। আমাদের ব্যবস্থা আমরা ত একরকম করে এনেছি। দু'এক বছরে সবাই জানতে পারবেন।"

সুইৎসারলণ্ডে থাকার সময় আমি অনেকগুলো ছোট ছোট পাহাড় চড়েছিলাম। চারপাঁচ হাজার ফুট উঁচু চূড়া ওদেশে অনেক আছে। আমার সাধ ছিল সেগুলো চড়ে চড়ে কতকটা অভ্যাস হলে পরের বছর বরফের পাহাড়ে (Mont Blanc) উঠব; কিন্তু মঁ ব্লাঁ চড়া ব্যয়-সাপেক্ষ। দেশে টাকার জন্য দরখাস্ত করলাম। মঞ্জুর হলনা। কাজেই আবার—উত্থায় প্রবিলীয়ন্তে দরিদ্রস্য মনোরথাঃ। যাক, সে পরের কথা। ইতিমধ্যে দুধের সাধ ঘোলে মেটাতে লাগলাম। সালেভ্ (Saleve) চড়বার সময় এক মজার ঘটনা ঘটেছিল। সে গল্পটা করি। হয়ত তাতে আমার মুর্খতাই প্রমাণ হবে। কিন্তু মূর্খতা ছাড়াও আর পাঁচ রকম ভাব যে বিদেশে বাঙ্গালী ছেলেদের মনে খেলে বেড়ায় তারও কিছু আভাস পাওয়া যাবে বই কি! সালেভ-এর পথে এক জার্ম্মানের সঙ্গে আলাপ হল। তার টুপীতে পালক লাগান। হাতে লম্বা লাঠি। নানারকম লম্বা চওড়া কথা কয়ে শেষ আমাকে টিপ্পনী কাটলে, "তুমি ত বাঙ্গালী, সমতল দেশের

মানুষ। তুমি কি একদমে সাড়ে চার হাজার ফুট চড়তে পারবে?" "তুমি ত বাঙ্গালী" কথাটা গিয়ে একেবারে মর্ম্মস্থলে বিঁধল। আমি একটুও দ্বিধা না করে উত্তর দিলাম, "হয়ত সুইস্ কি হাইলাণ্ডারের কাছে হার মানতে পারি, কিন্তু মশায়, তোমার অনেক আগে চূড়ায় পৌঁছাব।" সে হেসে বললে, "দেখা যাবে।"

চড়াই আরম্ভ হতেই আমি খুব বেগ দিলাম। লোকটাকে অনেক দূরে ফেলে হন হন করে এগিয়ে যেতে লাগলাম। যাঁরা পাহাড় চড়েছেন তাঁরাই জানেন যে এর বাড়া আর মূর্খতা নেই। নিজের দমটাকে যথাসম্ভব বাঁচিয়ে চড়াই ভাঙ্গতে হয়। কিন্তু আমার কি তখন অত বুদ্ধি ছিল! "বাঙ্গালী ব'লে ব্যাটা টিট্‌কারী দিয়েছে; ওকে খতম করবই!" এই এক-চিন্তা আমার মনে। যখন অর্দ্ধেকপথ উঠেছি হঠাৎ মনে হল যেন চারিদিক অন্ধকার; আর বুকটা যেন ফেটে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। উপস্থিত বুদ্ধিমত তৎক্ষণাৎ সেই পথের ওপর চিৎ হয়ে হাত পা ছড়িয়ে দিয়ে চোখ বুজে শুয়ে পড়লাম। মিনিট পাঁচেক ওই অবস্থায় থেকে যন্ত্রণাটা চলে গেল। ইতিমধ্যে এক ফরাসী-দম্পতি সেই পথে আসছিলেন। তাঁরা আমাকে দেখে দাঁড়িয়ে পড়লেন। মহিলাটি ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "কি হয়েছে, অত দৌড়ে চড়াই উঠছিলেন কেন?" আমি উঠলাম। তাঁদের সঙ্গে ধীরে ধীরে হাঁটতে হাঁটতে জার্ম্মান বাবুটির গল্প করলাম। ফরাসী ভদ্রলোক নাক সিঁটকে বললেন, "ওদের স্বভাবই ওইরকম। বড়াই বড্ড ভালবাসে!" তিন হাজার ফুটের ওপর এক ছোট্ট কাফিখানা ছিল। ফরাসীরা সেইখানে সরবৎ খেতে বসলেন। আমি সর্দ্দি-গর্ম্মির ভয়ে কিছু খেলাম না, এক বেঞ্চে বসে তাঁদের সঙ্গে গল্প করতে লাগলাম। একটু পড়ে জার্ম্মানটি এসে উপস্থিত হলেন। আমাকে উপহাস করলেন, "কিহে, তোমার হয়ে গেছে ত!" আমি বললাম, "আপনি এগোন মশায়।" সে লাঠি ঠুকতে ঠুকতে চলে গেল। তখন আমি কাফিখানার বুড়ীকে জিজ্ঞাসা করলাম, "একটা চাকর আমার সঙ্গে দিতে পার, যে আমাকে বনের মধ্য দিয়ে পা-রাস্তা দেখিয়ে দিতে পারবে?"

তিনি এক ছোকরাকে সঙ্গে দিলেন। সে সোজা খাড়াপথে আমাকে

অল্পক্ষণের মধ্যেই চূড়ায় পৌঁছে দিলে। প্রায় আধ ঘণ্টা পরে Mein Herr (জার্ম্মান বাবু) আবির্ভূত হলেন। তখন আমি এক বেঞ্চে কাত হয়ে পড়ে পাইপ খাচ্ছি। আমাকে দেখে ভদ্রলোকের মুখ শুকিয়ে গেল। জিজ্ঞাসা করলেন, "কি হে, কতক্ষণ"? আমি উত্তর দিলাম, "অনেকক্ষণ এসেছি। আমরা বাঙ্গালীরা সুবিধা পেলেই পাকদাণ্ডি বেয়ে পাহাড় চড়ি।"

ফস্ করে মুখ দিয়ে এই সত্য কথাটা বেরিয়ে গেল। বাঙ্গালী জাতটার দোষই বলুন, গুণই বলুন, ত এই, যে ক্রমাগত শর্ট্‌কাট্ খুঁজছে!

একবার আমার এক বন্ধু স—ও আমি এক ছোট খেয়া জাহাজে নর্থ-সী পার হচ্ছি। সমুদ্র সেদিন প্রথম থেকেই একটু অশান্ত ছিল। জল যেন ফুলছিল। শেষের দিকটায় জোরে তুফান উঠল। জাহাজ ভীষণ রকম দুলতে আরম্ভ হল। মাল্লারা পেসেঞ্জারদের ধরে সব জাহাজের খোলে বন্ধ করে দিলে। আমরা কাপ্তানের হাতে-পায়ে ধরে উপরেই রইলাম। দাঁড়ান যাচ্ছিল না, কোনও রকমে রেলিং ধরে ঝুলছিলাম। মাঝে মাঝে জাহাজের গায়ে বড় বড় ঢেউ ভেঙ্গে জল উপর দিয়ে চলে যাচ্ছিল। আমাদের কাপড় ভিজে সপ্‌সপ্ করতে লাগল, কিন্তু কি আনন্দ! একবার একজন মাল্লা এসে জিজ্ঞাসা করে গেল, "আপনারা নীচে যাবেন না?" আমরা বুক ফুলিয়ে বললাম, "না"। "আচ্ছা, সাবধানে থাকবেন।" বলে সে হাসতে হাসতে চলে গেল। বন্ধুবরের উৎসাহ আমার চেয়েও বেশী। তিনি বলতে লাগলেন, "এই রকম করে আমরা দাঁড়িয়ে থাকব শেষ পর্য্যন্ত। কাল দেশবিদেশে সবাই জানবে যে ঘোর বিপদের মাঝে দুজন বাঙ্গালীর ছেলে কেমন শান্ত ধীরভাবে তলিয়ে গেছে, প্রাণ বাঁচাবার জন্য নির্লজ্জ হুড়োহুড়ি কামড়াকামড়ি করে নেই।" জাহাজ ডুবল না। হয়ত ডোববার সত্যি ভয় কখনও ছিল না। যখন আমরা শেল্‌ড্ নদীর শান্ত জলে পৌঁছে গেলাম, বোধ হল যেন বন্ধুবর একটু নিরাশই হলেন।

রিগি (Righi)-র চূড়ায় উঠবার সময় আমার সঙ্গে জুটেছিল বিখ্যাত সিবিলীয়ান রিসলী সাহেবের এক পুত্র। দিব্যি ছেলে। পাব্লিক স্কুলের ছাত্র। হাসিহাসি মুখ। খোলা মন, চমৎকার মেজাজ। আমার কুপরা-

মর্শে আড়পথে পাহাড় চড়তে গিয়ে মিছেমিছি তুঘণ্টা বেশী ঘুরতে হল। বেচারা ছেলেমানুষ, একেবারে কাবু হয়ে পড়ল, কিন্তু এক মুহূর্ত্তের জন্যও মেজাজ খারাপ করে নেই। সন্ধ্যাবেলা ষ্টীমারে লুসার্ণ ফেরবার সময় আবার ঝড় উঠল। নিতান্ত মন্দ ঝড় নয়। একটুক্ষণ সবাই ভয় পেয়ে গেছল। কিন্তু এ ছোকরার দৃকপাতও নেই। যাই হোক, সন্ধ্যাবেলা তাকে তার মার কাছে ফিরিয়ে দিয়ে তবে আমি নিশ্চিন্ত হলাম।

রিসলীদের Sylvia বলে একটি ছোট ছ'বছরের মেয়েও এই হোটেলে ছিল। সুন্দর ফুটফুটে মেয়ে। নীল চোখ, সোনার বরণ চুল। সর্ব্বদা যেন প্রজাপতিটির মতন উড়ে বেড়াত। আমার সঙ্গে তার বড় ভাব হয়েছিল। ক্রমাগত পালিয়ে পালিয়ে আমার কাছে এসে হিন্দীতে গল্প করে যেত। হিন্দী কইলে তার মা কিন্তু রাগ করতেন। বলতেন, "এত বড় মেয়ে হয়েছিস এখনও নেটিব ভাষায় কথা কওয়া কেন?" ভদ্রমহিলা আমাকে একদিন বললেন, "কি জানেন, ভদ্রলোকের হিন্দী ত ও কইতে জানে না! চাকরদের ভাষা শিখেছে, ওটা যত শীঘ্র ভুলে যায় সেই ভাল।" আমি হেসে বললাম, "আমার কাছে ত আর চাকরদের ভাষা শিখবে না! আপনি এ ক'টা দিন আর ওকে কিছু বলবেন না।" এই হিন্দী বলা নিয়ে একদিন ভারি রগড় হল। আমি হোটেলের বারান্দায় বসে আছি, Sylvia আমার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে অনর্গল বকে যাচ্ছে। কাছে কয়েকটি আকাট অজ-ব্রিটিশার মেয়ে পুরুষ বসেছিলেন। তাঁরা আমাদের তুজনের দিকে হাঁ করে তাকিয়েছিলেন। আমি অতটা নজর করি নেই। Sylvia আমাকে কানে কানে বললে, "ওরা কি দেখছে?" হঠাৎ তাদের একজন জিজ্ঞাসা করলেন, "মাপ করবেন মহাশয়। আপনি কোন দেশের লোক?" আমি উত্তর দিলাম, "আমি ভারতবর্ষের লোক।" ভদ্রলোক একটু ইতস্ততঃ করে Sylvia-কে জিজ্ঞাসা করলেন, "আর তুমি, ডারলিং?" ডারলিং অম্লানবদনে উত্তর দিলেন, "আমিও ইণ্ডিয়ান। শুনছেন না, আমরা হিন্দুস্থানীতে গল্প করছি?" ভদ্রলোক আমতা আমতা করে আমাকে আবার বললেন, "কিন্তু—,আপনারা তুজন ত মোটেই এক রকম দেখতে নন? মাপ করবেন একথা বলছি বলে।" আমি হেসে উঠলাম, "অতবড় দেশের সব

লোক কি একরকম দেখতে হয়, মশায় !" লোকটা আরও ভ্যাবাচাকা লেগে গেল দেখে আমার দয়া হল। আমি বললাম, "আপনার ভয় নেই। মেয়েটি আপনারই মতন ইংরেজ। আমার দেশে জন্মেছে। ওর বাপ মা ভারতবর্ষেই যাবজ্জীবন কাটিয়েছেন।" Sylvia নাছোড়বান্দা ; খুব জোরে ঘাড় নেড়ে বললে, "কিন্তু আমি ইণ্ডিয়ান।"বৃটিশ দলটি কি বুঝল কে জানে ! বোধ হয় মনে করলে আমরা দুজনেই ফিরিঙ্গী। রিসলী সাহেবকে গল্পটা বলাতে তিনি হেসে উঠলেন, "আর দিন কয়েক পরে কোন ইংরেজ নিজেকে ইণ্ডিয়ানও বলবে না, এংলোইণ্ডিয়ানও বলবে না।" হয়েছেও ত তাই !

১৮৯৮ সালে শীতকালে বাড়ী থেকে কড়া হুকুম এল যে আমাকে আই, সি, এস পরীক্ষায় বসতেই হবে, চাকরী নেওয়া-না-নেওয়া তাঁরা পরে বিবেচনা করবেন। কাজেই কেতাব-পত্র নিয়ে এক অজ-পাড়াগাঁয়ে বসে মাস তিনেক খুব লেখা পড়া করে এলাম। কতকটা সেই লেখাপড়ার ফলে, আর অনেকটা নসীবের জোরে, পাস হয়ে গেলাম। এখানেই বলে রাখি, যে শেষ পর্য্যন্ত চাকরীও নিতে হল। বাঁধন ছেঁড়বার মতন শক্তি আমি কোন দিন সঞ্চয় করতে পারি নেই।

একবার এক বাঁধা বেলুনে চড়েছিলাম। সেদিন বেশ জোরে হাওয়া দিচ্ছিল। চারিদিকে লোকের রুমাল নাড়া আর হুররে হুররে রবের মাঝে যখন আমার বেলুন হেলে দুলে আকাশ পথে উঠল তখন কি ফূর্ত্তি, কি আনন্দ ! মনে হতে লাগল যেন আমি একজন রীতিমত বিমানচারী হয়েছি, কিন্তু হাজার বারো শ' ফুট ঊর্দ্ধে উঠে বাঁধনের রশি গেল ফুরিয়ে, রথও গেল থেমে। আধ ঘণ্টা খানেক উপরে খুব দোল খেলাম বটে, দূরবীণ ধরে চারিদিকের দৃশ্যও দেখলাম, কিন্তু শেষ ভাল মানুষটির মতন আবার ভূপৃষ্ঠে নেমে আসতে হল। মুহূর্ত্তেক আশা হয়েছিল যে, দমকা হাওয়ার জোরে দড়ী ছিঁড়বে, ছট্‌কে বেরিয়ে যাব একদিকে। কিন্তু শক্ত বাঁধন, ছিঁড়ল না।

শেষ বছরটা বেশীর ভাগ উলউইচে কাটালাম। সেখানে পল্টনী আবহাওয়ায় বেশ লেগেছিল। কেডেটদের সঙ্গে ঘোড়ায় চড়তাম। নানা-রকমের বাচ্চা অফিসারের সঙ্গে আলাপও হয়েছিল। তাদের সঙ্গে আমার খুব বনত। চিরকালই এটা দেখে এসেছি যে আমাদের সিবিলীয়ানের

চেয়ে এই জঙ্গী-অফিসাররা লোক ভাল। ওদের মুখে এক, মনে এক নেই। একটা সরল ছেলেমানুষী ভাব ওরা অনেক দিন বজায় রাখতে পারে।

ঘোড়ায় ত ছেলেবেলা থেকেই চড়তাম কিন্তু উলউচের. চড়া দেখলাম একটু আলাদা রকমের। শুধু ঘোড়া ছোটালেই হবে না, বসার কায়দা, রাশ ধরার কায়দা, সব নির্ভুল হওয়া চাই। কাজেই যত্ন করে ফিরে-ফিরতি সব শিখতে হল। রেকাব ছেড়ে দিয়ে, রাশ ছেড়ে দিয়ে দৌড়ান, লাফান, এও কেডেটদের সঙ্গে করতে হত। সবই সযতনে করতাম। প্রাণে সদাই ভয় যে কেউ ভাববে—বাঙ্গালী, তাই ভয় পেয়েছে। বাঙ্গালীর ভয় পাওয়া কথাটা কিন্তু নিতান্ত বাজে। মায়ের আঁচলে বাঁধা না থাকলে বাঙ্গালীও যা, অন্যেও তা। বাঙ্গালী যারা নয় তাদিকেও যথেষ্ট ভয় পেতে দেখেছি উলউইচে। এক মিলিশিয়ার সাহেব একদিন বিনা কারণ ঘোড়া থেকে ধপ্ করে পড়ে গেল, ঘোড়াটা কিছুই করে নেই। একটু তাজা ছিল, এই মাত্র। সার্জ্জেণ্টরা যখন তাকে তুলতে গেল সে যখন সেরেফ ভয়ে বেহোস। ওখানে ত ভয়কে প্রশ্রয় দেওয়ার প্রথা ছিল না! লোকটাকে ঝট্ করে ষ্ট্রেচারে তুলে হাঁসপাতালে নিয়ে গেল। ডাক্তার তাকে খুব বকে ধমকে দশ মিনিট পরে ফিরে পাঠিয়ে দিলে। আবার ঘোড়ায় চড়তে হল।

উলউইচের একটা মজার গল্প বলি। আমার Landlady—বাড়ীওয়ালী একদিন তড়বর করে আমার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলে, "স্যার, আপনি কি বাঙ্গলা দেশ থেকে এসেছেন?" আমি উত্তর দিলাম, "হ্যাঁ, I have that houour, কিন্তু তুমি কি করে জানলে?" নীচেতলার কাপ্তান অমুক বলছিলেন। আপনাকে আজ আমি বেঙ্গল কারী-ষ্টু রেঁধে খাওয়াব।" আমি প্রমাদ গণলাম। কি খাইয়ে বুড়ীটা আমাকে বধ করবে দেখছি! তখনকার দিনে কারী জিনিসটাকে লোকে সন্দেহের চোখে দেখত। মাংস বেশ একটু বাসি না হলে তাকে কারী করা হত না। সন্ধ্যাবেলায় খেতে বসে কিন্তু দেখি, যে ভাতের সঙ্গে এক ডোঙ্গা ভরে মাছের ঝোল দিয়েছে। ঠিক আমাদের বাড়ীর ঝোলের মতন দেখতে। মালেট্ মাছ, আলু কপি কড়াইশুঁটী দিয়ে বুড়ী অতি উপাদেয় পদার্থ রেঁধেছে

একবার মনে হল হাতে করে শপাশপ্ খাওয়া যাক। কিন্তু সাহসে কুলাল না। যাই হোক, কাঁটা চামচ দিয়েও ডোঙ্গাটা সাবাড় করতে বেশী সময় লাগল না। বাসন তুলতে এসে বুড়ী এক গাল হেসে বললে, "আমি ত জানতাম না আপনি বাঙ্গালী! আমি যে অনেক বছর বারাকপুরে ছিলাম, স্যার! আমার স্বামী সেখানে পল্টনের সার্জ্জেণ্ট ছিলেন।" এর পরে কয়েক সপ্তাহ ধরে নানা রকমের বেঙ্গল কারী-ষ্টু খাওয়া হল। লণ্ডনের বন্ধু-মণ্ডলীও এসে পরখ করে গেলেন। বুড়ী অনেক বখ্শিশ্ পেলে। আমাদের সময় লণ্ডনে এখনকার মত দেশী খাবারের হোটেল ছিল না। একবার মাস তিনেকের জন্য মিস্ সোরাবজীর ভগ্নী বণ্ড ষ্ট্রীটে ধূম করে এক রেস্তরাঁ খুলেছিলেন। কিন্তু চালাতে পারলেন না। আমাদের নির্ভর ছিল মিসেস্ টার্ণার বলে এক বাড়ীওয়ালীর উপর। সে ফরমায়েশ পেলে পোলাও কোর্ম্মা কাবাব পরেটা রেঁধে দিয়ে যেত। কিন্তু dear old মাছের ঝোল আর কোথাও পাই নেই।

কলকাতায় ছাত্র-অবস্থায় আমরা যেমন দুটো মুরগীর কাটলেটের লোভে অসাধ্যসাধন করতাম, বিলেতেও তেমনি দেশী খাবারের, সামান্য কারী-ভাতটির পর্য্যন্ত, গন্ধ পেলে দিগ্বিদিক জ্ঞান হারাতাম। একটা গল্প বলি, একবার আমার দিদি দেশ থেকে এক বড় বাক্স ভরে নানা রকমের বড়ি পাঠিয়েছিলেন। চিঠিতে লিখেছিলেন, "দুটি দুটি করে খাস, ও বড়ি তোর ছমাস চলবে।" যেদিন বড়ি এসে পৌঁছল, তার পরদিন কোথা থেকে একেবারে জনা আষ্টেক অনশনক্লিষ্ট বন্ধু বাড়ী চড়াও হয়ে এসে বললেন, "এই! তোর কাছে আজ চা খেতে এসেছি।" রুটী দিলাম, মাখন দিলাম, সার্ডিন মাছ দিলাম, কেক কিনে এনে দিলাম। সব খেলে। তারপর একজন দাঁড়িয়ে উঠে বললে, "এইবার তোর বড়ি বের কর দিকিনি!" কোথা থেকে জানলে এরা, কে জানে! কি করি, এক লিপ্টন চায়ের কৌটা ভরা ভাজা-বড়ি এনে দিলাম। ঘরে আগুন জ্বলছিল। নিজেরাই তাইতে বড়িগুলোকে মাখনে ভেজে নিলে। তারপর পোস্ত-বড়ি, টোপা-বড়ি, মায় কুমড়ো-বড়ি পর্য্যন্ত যা কিছু ছিল, একে একে সব আগুনে পুড়িয়ে পুড়িয়ে নুন দিয়ে মেরে দিলে। আমাকে দুচারটে দেয় নেই তা বলছি না, কিন্তু

আমার ছ মাসের খোরাক এক বেলায় লোপাট করলে! দিদিকে সেই মেলেই লিখে দিলাম, এ "তুর্ভিক্ষের দেশে আর বড়ি পাঠিও না।"

বিলেতে সব চেয়ে তুষ্প্রাপ্য পদার্থ ছিল লুচি। আমার এক বাড়ী-ওয়ালীকে আমি শিখিয়ে নিয়েছিলাম। কাজটা সহজে সাধিত হয় নেই। প্রথম দিন টেবিলে যে চীজ উপস্থিত হল তাকে Dog Biscuit (কুকুরের বিস্কুট) ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। তবে বুড়ী ভাল রাঁধুনী ছিল। যখন একবার বুঝতে পারলে লুচি দ্রব্যটা কি, তখন বেশী দেরী হল না। যেদিন প্রথম রসাল শুভ্র নিটোল লুচি টেবিলে এসে পৌঁছল সেদিন কি ফূর্ত্তি! যতবা ফূর্ত্তি আমার, তত ফূর্ত্তি রাঁধুনীর। নূতন নামকরণ হল Fried wafers। পরম শ্রদ্ধাস্পদ সুরেন্দ্রনাথ যখন ওয়েল্‌বী কমিশনে সাক্ষী হয়ে বিলেতে এসেছিলেন, তখন একদিন আমার বাসায় এই লুচি খেয়ে গেছলেন। লুচি দেখে বৃদ্ধের কি আনন্দ! হেসে বললেন, "তোমরা যথার্থ ন্যাশ্‌নালিষ্ট হে! বিলেতে ভারতীয় সভ্যতা প্রচার করছ।"

সুরেনবাবুর সঙ্গে বিলেতে এসেছিলেন ওয়াচ্চা সাহেব ও গোপালরাও গোখলে। আমরা নব ভারতীয় দল এঁদিকে ষ্টেশানে স্বাগত করেছিলাম, ও একদিন বড় হোটেলে খানায় নিমন্ত্রণ করেছিলাম। ওয়াচ্চা ও সুরেনবাবু ছিলেন বিচক্ষণ নেতা। তাঁরা আমাদের মতন অর্ব্বাচীন বালকের দলকেও অবজ্ঞা হেনস্তা করেন নেই। কিন্তু গোখলে নিজে তখন ছেলেমানুষ, প্রথম সাক্ষাতেই তিনি আমাদিকে বিদ্রূপবাণে এরকম জর্জ্জরিত করেছিলেন যে আমরা আর বড় একটা তাঁর কাছে ঘেঁসি নেই। আমার সব চেয়ে খারাপ লেগেছিল তাঁর বাঙ্গালীর উপর, কি বলব, হিংসা না বিদ্বেষ? আমি ভুলি নেই। বহুকাল পরে যখন সুযোগ পেয়েছিলাম, নব ভারতের ঋণ পরিশোধ করেছিলাম। এত বড় লোকের এই ছোট মন! রাগ হয় বই কি!

একটা কথা বলব? সুরেনবাবু আমাদের স্পষ্টই আদেশ দিয়ে এসেছিলেন যেন আমরা দেশে ফিরে একটা Extremist (গরম) দল গড়ে তুলি। আমার বেশ মনে আছে, তিনি বললেন, "ওতে দেশের অনেক মঙ্গল হবে। কিন্তু মনে রেখো, আমি প্রকাশ্যে তোমাদের গালাগাল দেব।"

অবশ্য সত্যের খাতিরে এটাও এখানে উল্লেখ করতে হয় যে আমরা দেশে ফিরে কোনও দলই গড়ি নেই। আমি ত একেবারে আমলাতন্ত্রভুক্ত হয়ে পড়লাম। তবে আমাদের জন্য কি আর কোন কাজ আটকে ছিল!

আগেই বলেছি যে আমি ব্যারিষ্টার হওয়ার অভিপ্রায়ে Gray's Innএ খানা খাচ্ছিলাম। আমাদের Inn ছিল কৃষ্ণকায় ছাত্রের প্রধান আড্ডা। লোকে ঠাট্টা করে "এশিয়া মাইনর" বলত। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ আবার নিতান্ত নিরীহ প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। ইংরেজদের একটা স্বভাবের দোষ হচ্ছে যে নিরীহ লোক দেখলে তারা খোঁচা না দিয়ে থাকতে পারে না। এই খোঁচা দেওয়া নিয়ে কিন্তু নানা গণ্ডগোল বাধত। কেন না আমরা সবাই ত আর নিরীহ গোবেচারা ছিলাম না! ক্রমে এমন হল, রোজই একটা-না-একটা কিছু নিয়ে খিটিমিটি লাগত। কেবলই ভয় হত, কোন্ দিন একটা বড় কিছু বাধবে। পাঁচ রকম ভেবে আমি শেষে ডিনার খাওয়া ছেড়ে দিলাম। তখন পাশ হয়ে গেছি, ব্যারিষ্টার হওয়ার সে রকম তাড়া ত আর ছিল না!

১৮৯৯ সালে যখন দক্ষিণ আফ্রিকায় লড়াই বাধল, তখন ইংরেজ জাতটার দেশপ্রেম এমনি গেঁজে উঠল যে আমরা পাঁচজন বাইরের লোক ব্যতিব্যস্ত হয়ে গেলাম। যেখানে সেখানে, যখন তখন, বিনা কারণে, গর্দ্দভ-বিনিন্দিত রাগে রাষ্ট্রীয়-সঙ্গীত চীৎকার শুনতে শুনতে কান ঝালা-পালা হয়ে উঠল। সভা-সমিতির ত কথাই নেই, একদিন থিয়েটারে একজন লোক গ্যালারী থেকে গেয়ে উঠল,

> Till we have wiped the Stain,
> Off Britain's name,
> Of black Majuba Hill.

খানার কাপড় পরা Stalls-এর সাহেবরাও দাঁড়িয়ে উঠে গাইতে লেগে গেলেন! চিরদিন শুনে আসছিলাম যে ল্যাটিন জাতির লোকেরা বায়ুগ্রস্ত, তারাই এই রকম আত্মহারা হয়। ভব্য, শিষ্ট ইংরেজের এ কি হল!

শেষ, এই রকম বাঁদরামি সুরু করলে আমাদের Inn-এর ডিনারেও। খানার টেবিলে দাঁড়িয়ে রাষ্ট্রীয়-সঙ্গীত জুড়ে দিত। আমাদের ভারী বিরক্ত

বোধ হত। একদিন এই রকম মশগুল হয়ে গান চলেছে, সবাই দাঁড়িয়ে উঠে চেঁচাচ্ছে, আমার এক বন্ধু স—ও আমি দাঁড়ালাম না। .বড় বিরক্ত বোধ হল। বসেই রইলাম। অমনি চারিদিক থেকে রব. উঠল "দাঁড়িয়ে ওঠ, দাঁড়িয়ে ওঠ।" এ পর্য্যন্ত আমাদের গরম হয়ে ওঠবার কোন কারণই ছিল না। আমি বন্ধুবরকে বললাম, "চল ভাই, বাড়ী যাওয়া যাক। এদের মাথা খারাপ হয়ে গেছে।" দুজনে ধীরে ধীরে বেরিয়ে যাচ্ছি এমন সময় কতকগুলো লোক দুয়ো (hiss) দিয়ে উঠল। আমরাও দাঁড়িয়ে উল্টে হিস্ করলাম। আমাদের নসীব খারাপ। কেন না ঠিক সেই সময়ে গান চলেছিল: God bless the Prince of Wales। সবাই ভয়ানক চটে গেল। মনে করলে আমরা মাননীয় রাজপুত্রের অপমান করছি। সেদিন মার খেতে খেতে বেঁচে গেছলাম। তবে মারটা, বোধ হয়, একতরফা হত না। যাই হোক, এসব গল্প আজকের দিনে না করাই ভাল। বরং একটা মজার গল্প বলি। তার থেকে পাঠক বুঝবেন যে কি রকম সামান্য কথা নিয়ে ঝগড়া বাধত। একদিন আমার বন্ধু সেন ও আমি এক টেবিলে খাচ্ছি। পাশের টেবিলে খাচ্ছে তিন জন সাহেব ও একজন ভারতবর্ষীয় মুসলমান, নাম আবদুল লতিফ কমরুদ্দিন। তিন জনে মিলে তাকে ক্ষেপাতে আরম্ভ করলে ভারতবর্ষের কথা বলে। শুনলাম একজন বলছে, "তোমাদের ইণ্ডিয়ান নামগুলো কি রকম অদ্ভুত লম্বা!" আমরা চুপ করে গেলেই পারতাম। তা নয়, দুজনে মারমুখো হয়ে উঠে গেলাম সেই টেবিলের কাছে। লোকটাকে সেন বললে, "তোমার নামটি কি বল দেখি, Throgmorton না, Higginbotham? আমাদের দুজনের নাম Sen ও Dutt." সাহেবটা ফোঁস করে উঠল। এরকম ছোট-খাট ব্যাপার ত নিত্য হত।

বিলাতের পর্ব্ব এইখানে শেষ করব। ১৮৯৯ সালের শেষের দিকে চাকরীর করার-নামা সই করে, সরকারের ছাড়-পত্র নিয়ে ফরাসী জাহাজে দেশমুখো রওয়ানা হলাম। স্বতন্ত্র জীবনের শেষ কটা দিন সমুদ্রবক্ষে বেশ কাটল। প্রকাণ্ড জাহাজ, লোকে ভরা। খেলা-ধূলোয়, নাচে-গানে, সবাই মশগুল। যেন কারও সংসারের ভাবনা চিন্তা নেই। অনেকগুলি পলটনের অফিসার এই জাহাজে দক্ষিণ আফ্রিকায় যাচ্ছে। তারাই সব চেয়ে বেশী

হৈ-চৈ করছে। প্রাণ দিতে চলেছে ভদ্রলোকেরা, ওদের হৈ-চৈ করার অধিকার আছে বই কি! প্রতি বন্দরেই আমরা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে খারাপ খবর পাচ্ছিলাম। কিন্তু এই সৈনিক পুরুষদের পরোয়া নেই। আমি একজনের কাছে দরদ দেখাতে গেছলাম। সে গম্ভীর ভাবে বললে, "Makes no odds, really!" এর মানে, বোধ হয়—কি এসে যায় হার জিতে! সত্যিই ত, কি এসে যায়, যদি মরদের মতন জান দিতে পার! কত তফাৎ এদের সঙ্গে সেই লণ্ডনের বানরগুলোর, যারা স্থানে অস্থানে "Britannia rules the waves," গেয়ে লোককে অতিষ্ঠ করে তুলেছিল!

পোর্ট সৈয়দ বন্দরে জাহাজে কি রকম গানের জলসা দিয়েছিলাম, তার গল্পটা বলে আজকের মত বন্ধ করি। প্রায় চার বছর পরে ইউরোপের ধূলো পা থেকে ঝেড়ে ফেলেছি, মনের আনন্দে এক তুর্কী টুপী (Fez) মাথায় দিয়ে নামলাম বন্দরে। সঙ্গে বোম্বাইয়ের রতন টাটা। তাঁরও তুর্কী তাজ মাথায়। খুব খানিকক্ষণ শহরের পথে পথে ঘুরে বেড়িয়ে শ্রান্ত হয়ে এক কাফীখানায় দুজনে বসলাম তুর্কী কাফী খাব ব'লে। একটি ভিখারী মেয়ে এসে মেণ্ডোলীন বাজিয়ে গান গাইতে লেগে গেল। বেশ গলা মেয়েটার, আর আমাদের জানা ফরাসী ও ইটালীয়ান চুটকী গান অনেক গাইলে। আমরা মাঝে মাঝে সিকিটা দুয়ানীটা ফেলে দিয়ে গায়িকার উৎসাহবর্দ্ধন করছিলাম। ক্রমশঃ বেশ ভীড় জমে গেল। তখন আমি বললাম, "চল, একে জাহাজে নিয়ে যাওয়া যাক, টাটা। খুব মজা হবে।" রতনজী রসিক লোক ছিলেন, তৎক্ষণাৎ রাজী হলেন। বন্দরে পৌঁছলে, তিনি গিয়ে কাপ্তেনের অনুমতি নিয়ে এলেন। জাহাজে বড় ডেকের উপর গান জুড়ে দেওয়া গেল। ইংরেজ অফিসারের দল সেই দিকে ভেঙ্গে পড়লেন। প্রায় ঘণ্টাখানেক জলসা হল। শেষ হয়ে গেলে মেয়েটা টাটার ও আমার সামনে এসে "Pasha!" বলে মুসলমানী প্রথায় কুর্ণীশ করলে। আমরা কিছু কিছু বখশিশ্ দিলাম। ব্রিটিশ সেনানীরা নেটীবের কাছে হার মানবেন! তাঁরাও বেশ কিঞ্চিৎ পেলা দিলেন।

গায়িকা যখন নেমে গেল, তার চোখে জল। এর ভেতর একটু romance ছিল। তবে নিতান্ত মামুলী রকমের। মেয়েটি মল্টা দ্বীপ-

বাসিনী। বয়স কুড়ির বেশী হবে না। বছর দেড়েক আগে একজন ইটালিয়ান ওকে ভুলিয়ে এখানে নিয়ে আসে। কয়েকমাস একত্র ঘর করার পর, একদিন হঠাৎ লোকটা কোথায় উধাও হয়ে যায়। সেই থেকে মেয়েটি রাস্তায় রাস্তায় গান গেয়ে ভিক্ষা মেগে খাচ্ছে। অত্যন্ত কষ্টে দিনপাত করছে। কিছু টাকা সংগ্রহ হলেই সে ধারধোর শোধ করে দিয়ে দেশে ফিরে যেতে পারে। এই কাহিনী সে বন্দরে আসতে আসতে আমাদিকে বললে। আমি বিশ্বাস করলাম। টাটা করলেন না। ইংরেজ অফিসারেরা, জাহাজের কাপ্তান, এরা ত কিছু জানতই না। জানতে চায়ও নেই। তাতে কিছু এসে গেল না। মেয়েটার সবসুদ্ধ ছয় সাত পাউণ্ড রোজগার হল সেদিন। সে তার দেশে ফিরে গেল কি না, কে জানে।

আমি কিন্তু যথাসময় আমার দেশে ফিরলাম, যদিচ বুকে চাপরাস !

শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত
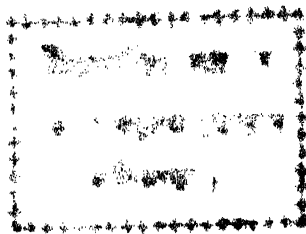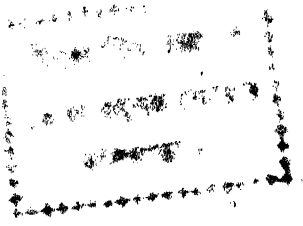
আদি-আর্য্য পিতৃ-ভূমি

অতীতের সন্ধানে মানুষের জিজ্ঞাসা অফুরন্ত। পুঁথি, প্রবচন, শিলা-লিপি, প্রস্তরলিপি থেকে সে উপাদান সংগ্রহ ক'রেছে, মাটি খুঁড়ে পূর্ব্ব-পুরুষের অস্ত্রশস্ত্র তৈজসপত্র উদ্ধার ক'রে ইতিহাস রচনা করেছে। কিন্তু প্রত্নতত্ত্ব অতীতের অন্ধকার ভেদ ক'রে বেশী দূর যেতে পারে না; তখন নতুন আলোকের সন্ধান করতে হয় ভাষাতত্ত্ববিদের কাছ থেকে। তুলনা-মূলক ভাষা-বিজ্ঞানের সাহায্যে আমরা জানতে পারি যে প্রায় সমগ্র ইউরোপের ও এশিয়ার অনেকটা অংশের অধিবাসীরা যে-সব ভাষায় কথাবার্ত্তা ব'লে থাকে, সেগুলি অধুনা-লুপ্ত এক মূল-ভাষা থেকে উৎপন্ন। আদি ভাষায় যে-সব মানুষ কথা বলত, ইংরেজ বৈজ্ঞানিক টমাস্ ইয়ং (Thomas Young) ১৮১৩ সালে তাদের নাম দিয়েছিলেন ইন্দো-ইউরোপীয়ন (Indo-European)। জার্ম্মান ভাষাবিৎ ক্লাপ্রোট্ (Klaproth) ১৮২৯ সালে তাদের সম্বন্ধে 'ইন্দো-গের্ম্মান' (Indo-German) শব্দ প্রয়োগ করেন। এ ছাড়া আরও কতকগুলি নাম এই আদি আর্য্য-ভাষার সম্বন্ধে প্রচলিত আছে যথা ইন্দো-কেল্‌তিক্ (Indo-Celtic), যাফেতীক্ (Japhetic), আর্য্য ইত্যাদি। কিন্তু এ-সব নামের মধ্যে কোনওটিতেই বিজ্ঞানোচিত স্পষ্টতা ও যাথার্থ্য নেই দেখে গাইলস্ (Giles) মূল-ভাষার সম্ভাব্য এক নতুন শব্দ আবিষ্কার করলেন * বিরোস্ (Wiros)। বিভিন্ন ভাষায় এই শব্দের যে-সব বংশধর আছে, সেগুলি মনুষ্য-বাচক, যথা—সংস্কৃত বীর: (বীরস্) Virah; লাতীন Vir; প্রাচীন ইংরেজি বের্ Wer; প্রাচীন আইরিশ fir; * বিরোস্ অর্থে গাইল্‌স্ বল্‌তে চান—একদল লোক যাদের ভাষা ইউরোপ ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশে শাখা-প্রশাখায় ছড়িয়ে পড়েছে।

---

* আদি-আর্য্য ভাষার মূল-শব্দ লুপ্ত হয়েছে, তার স্বরূপ জানবার উপায় নেই। তবে বিভিন্ন ভাষায় তার বংশধরদের লক্ষণ মিলিয়ে মূল-শব্দের একটা আনুমানিক রূপ কল্পনা করা হয়। নিশ্চয়তার অভাবেই লেখকদের মধ্যে একটা পদ্ধতি হয়েছে এইসব শব্দের পূর্ব্বে একটি তারকা-চিহ্ন দিয়ে পাঠকের মনে "সাধু সাবধান"-ভাব জাগিয়ে দেওয়া।

এই একই অর্থে মাক্স ম্যুলর (Max Muller) ব্যবহার করেছেন "আর্য্য" শব্দ। তাঁর মতে এই পদটির মধ্যে কোনও জাতি-বাচক দ্যোতনা নেই ; আর্য্য বলতে যে জনগণের কথা মনে আসে তাদের মধ্যে একমাত্র বন্ধন ছিল ভাষা। কিন্তু বিভিন্ন দেশের সাহিত্য ও কিংবদন্তী প্রণিধান ক'রে দেখা যায় যে 'জাতি' অর্থে আর্য্য-শব্দের প্রয়োগ বিরল নয়। কয়েকটি দৃষ্টান্ত * দিলেই ব্যাপারটি পরিষ্কার হবে। বেদে "আর্য্য জাতি" "আর্য্য কুল" ইত্যাদির উল্লেখ বহু স্থানে আছে। ইরানে "ঐরিয়ান-বায়েজো" (Airyana Vaejo=আর্য্যাণাং বীজঃ) কথাটি এখনও জাতি-বাচক অর্থেই প্রচলিত। পারস্যাধিপতি দারয়বহুর (গ্রীক্ দারেইওস্ ; ইংরেজি Darius) শিলা-লিপিতে যে "ariya cithra" শব্দ পাওয়া যায়, তার অর্থ আর্য্যবংশ। আইরিশ ভাষার aire মানে master এবং আইরিশ উপকথার Eremon নামের সঙ্গে বৈদিক আর্য্যমনের যথেষ্ট সাদৃশ্য দেখা যায়। আর্মেনিয়ান 'Ari' শব্দের অর্থ বীর বা মহৎ। এই সব দৃষ্টান্ত থেকে মনে হয় যে "আর্য্য" শব্দের কেবল ভাষা-বাচক দ্যোতনা বাদ দিয়েও অন্য অর্থ ছিল, একথা বিভিন্ন দেশে প্রকারান্তরে মেনে নেওয়া হয়েছে। লৌকিক পরিভাষায় আর্য্য-শব্দের অর্থ সঙ্কুচিত হ'য়ে পড়েছে ; * বিরোস্, ইন্দো-ইউরোপীয়ান্ বা ইন্দো-গের্মান পদের নামান্তর হিসাবে ব্যবহৃত না হ'য়ে, বরং তাদের শাখা-বিশেষের নাম হিসাবেই প্রযুক্ত হ'য়ে থাকে—আর্য্য বলতেই সাধারণে মনে করে ভারতবাসী বা ইরান্‌বাসী। কিন্তু এ প্রবন্ধে আমরা আর্য্য শব্দের ব্যাপক অর্থই গ্রহণ করব। আর্য্য-ভাষা বল্‌তে বুঝব—অধিকাংশ ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার মূল-মাতৃ-ভাষা। আর্য্য-জাতি বল্‌তে বুঝব—সেই আদি-আর্য্য-ভাষী ; কারণ প্রথম অবস্থায় যে গোষ্ঠীর ভাষা ছিল এক, তাদের জাতিও যে এক, এ অনুমান বোধহয় অসঙ্গত হবে না।

এখন প্রশ্ন এই—আর্য্যদের আদি বাসভূমি কোথায়? সে প্রশ্নের সমাধান করবার পূর্ব্বে দেখা যাক ভাষা-বিজ্ঞানের সাহায্যে আর্য্যদের সম্বন্ধে কতটুকু তথ্য সংগ্রহ করা যেতে পারে। আর্য্যদের আদি ভাষা লুপ্ত হয়ে গেছে, কিন্তু তার অনেক মূলধাতু অল্প-বিস্তর রূপান্তরিত হ'য়ে ইউরোপ

* L. de la Vallee Poussin—Indo-Europiens et Indo-Iraniens.

ও এশিয়ার নানা ভাষায় এখনও প্রচলিত র'য়েছে। সংস্কৃত মাতৃ, Latin mater, Celtic mathir, Teutonic muotar, Lithuanian mati, Armenian mair—একই অর্থে এতগুলি ভাষায় যে-বিভিন্ন শব্দ র'য়েছে, তাদের মধ্যে একটা ধ্বনিগত সাদৃশ্য আছে, তাই পণ্ডিতরা মনে করেন যে প্রত্যেকটি পদ আদি আর্য্য-ভাষার কোনও ধাতু-বিশেষ থেকে উৎপন্ন। সে ভাষা কেউ জানে না, কিন্তু ইউরোপ ও এশিয়ার অনেকগুলি ভাষা তুলনা ক'রে কতকটা অনুমান করা যায় কোন্ কোন্ শব্দ আদি আর্য্য ভাষায় প্রচলিত ছিল। এই রকম মূল শব্দ এত বেশী পাওয়া যায় যে তা' থেকে মনে হয় যে আর্য্যরা দেশ দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়ার পূর্ব্বে অনেকদিন ধ'রে একটা ছোট গণ্ডীর মধ্যে বসবাস করেছিল।

আর্য্য-নিবাসের ভৌগোলিক সীমা-নির্দ্দেশ করার পূর্ব্বে দেখা যাক ভাষার দিক দিয়ে সে-দেশ সম্বন্ধে কতটুকু বিবরণ পাওয়া যায়। প্রথমতঃ আমরা দেখি যে খুব সম্ভবতঃ আর্য্যদের সমুদ্রের সঙ্গে পরিচয় ছিল না, কারণ তাদের ভাষায় সমুদ্রের প্রতিশব্দ কিছু পাওয়া যায় না। লাতীন্ mare শব্দের অর্থ সমুদ্র, কিন্তু ঐ পদটির প্রতিশব্দ অন্যান্য ভাষায় যা' পাওয়া যায়, তার অর্থ জলাজমি বা বিল। *

আর্য্যরা যে দেশে বাস করত, সেখানে বছরের মধ্যে প্রধানতঃ তিনটি ঋতু ছিল †—শীত, বসন্ত ও গ্রীষ্ম। বিভিন্ন ভাষায় এই তিন ঋতুর নামগুলি তুলনা ক'রে বেশ সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। যথা :—সংস্কৃত (হিম, hima, হেমন্ত hemanta) গ্রীক Kheimon ; লাতীন Hiems ; শ্লাব Zima ; ইন্দো-ইউরোপীয় * Gheyem ; তা ছাড়া himazima শব্দের অর্থ তুষার—এই থেকে প্রতিপন্ন হয় যে শীতকালে আর্য্য দেশে বরফ পড়ত। সংস্কৃত বসন্ত Vasanta ; শ্লাব্ Vasna ; ইরাণী Vanhar ; লাতীন Ver ; গ্রীক্ ear ; ইন্দো-ইউরোপীয়ান্ Wesr ; সংস্কৃত হরস্ (গ্রীষ্ম) haras ; আর্মেনীয় yer ; লাতীন Aestas ; গ্রীক্ Theros।

তারপর গাছ-পালার মধ্যে কতকগুলি নামে বিভিন্ন ভাষায় বেশ মিল পাওয়া যায়। যেমন সংস্কৃত Bhurja ভূর্জ্জ ; Lithuanian berzas ;

* Cambridge History of India, vol. I, ch. 3,
† Carnoy—Les Indo-Europeens

Slavonic breza or bereza ; Celtic biork ; সংস্কৃত যব ; yava ; Lithuanian Javai ; Greek Zeiai। এ ছাড়া উইলো (willow) বীচ্ (beech) এল্ম্ (Elm) লেবু (lime) ইত্যাদি আর্য্য-দেশের আরও কয়েকটি গাছ-পালার খবর পাওয়া যায়।

এইবার তুলনা-মূলক ভাষা-বিচারে দেখা যাক কোন্ কোন্ পশু আর্য্যদের পরিচিত ছিল। নামগুলি শুধু এখানে উল্লেখ করলেই প্রতিপাদ্য বিষয় সহজ হবে। ভেড়ার সংস্কৃত নাম অভি ; Lithuanian Avis ; Greek Ois, Latin Ouis ; Slavonic Avinu ; গোরুর সংস্কৃত নাম গৌঃ ; Greek Bous ; Latin Bos ; ঘোড়ার সংস্কৃত নাম অশ্ব ; Latin Equos ; Greek hippos ; কুকুরের সংস্কৃত নাম শ্বন ; Latin Canis ; Greek kyon ; শূয়ার মানে সংস্কৃত শূকরঃ ; Latin Sus ; Greek hus। বাঘ সিংহের অস্তিত্ব সম্বন্ধে ভাষাগত প্রমাণ পাওয়া যায় না, তবে নেকড়ে বাঘ ও ভালুক খুব সম্ভবতঃ আর্য্য দেশে ছিল। নেকড়ে বাঘের সংস্কৃত নাম বৃক ; Greek Lykos ; Latin Lupus ; Slavonic Vluku ; ভালুকের সংস্কৃত নাম ঋক্ষ ; Greek Arktos ; Celtic Artos ; Latin Ursus ; Armenian Arj।

পশুর সঙ্গে সঙ্গে পাখীর কথা মনে পড়ে। আর্য্যরা দুরকম পাখীর সঙ্গে পরিচিত ছিল—রাজহাঁস ও পাতিহাঁস। সংস্কৃত হংস ; Latin Anser ; German Gans ; Slavonic Gosi ; সংস্কৃত আতি ; Latin Anas ; Slavonic Oty ; Lithuanian antis—এই সব শব্দের সাদৃশ্য সুস্পষ্ট। এ ছাড়া ঈগল পাখীরও উল্লেখ পাওয়া যায়।

এই ভাবে ভাষার বিচারে প্রতিপন্ন হয়েছে যে আর্য্য-দেশে বেশী শীতও ছিল না, বেশী গরমও ছিল না, কারণ তা' না হ'লে এত রকম গাছ-পালা জন্তু-জানোয়ার থাকা সম্ভব হত না। বিশেষতঃ বীচ্ বৃক্ষের উল্লেখ থাকাতে আমাদের কাজ সহজ হয়েছে। গাইল্‌স্ সাহেব দেখিয়েছেন যে এই গাছ পৃথিবীর এক নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ—অর্থাৎ প্রুশিয়ার অন্তর্গত কোনিগ্‌স্‌বার্গ (Konigsberg) থেকে আরম্ভ ক'রে যদি ক্রাইমিয়ার (Crimea) ভিতর দিয়ে এশিয়া মাইনর (Asia Minor)

পর্য্যন্ত একটি কাল্পনিক রেখা টানা যায়, সেই রেখার পশ্চিমাংশই হ'ল বীচের জন্মস্থান। পূর্ব্বেই বলেছি আর্য্য-দেশে গোরুও ছিল ঘোড়াও ছিল আবার ভেড়াও ছিল। এখন স্বাভাবিক অবস্থায় ঘোড়া হচ্ছে সমতলবাসী। কিন্তু গোরু ও ভেড়ার কথা স্বতন্ত্র,—তারা পার্ব্বত্যদেশের পশু। কাজেই বুঝতে হবে আর্য্য-বসতির মধ্যে পর্ব্বতও ছিল, সমতলভূমিও ছিল। তা' ছাড়া যবের উল্লেখ থেকে মনে হয়, শস্যোৎপাদনের জন্য নীচু জমি ও তদুপযুক্ত জলবায়ু নিশ্চয় ছিল।

যাহোক, আর্য্যদেশ সম্বন্ধে একটি মোটামুটি বিবরণ পাওয়া গেল। কিন্তু দেশটি কোথায় অবস্থিত ? এ বিষয়ে নানা মুনির নানা মত। ইউরোপের উত্তর-পশ্চিম প্রান্ত থেকে আরম্ভ ক'রে, মধ্য-এশিয়া পর্য্যন্ত এবং সুমেরু থেকে পারস্য পর্য্যন্ত যে সব দেশ আছে—নরওয়ে, মেরুপ্রদেশ, রুষ দেশ, হাঙ্গেরি, মধ্য-এশিয়া, ব্যাক্‌ট্রিয়া—ইত্যাদি ইত্যাদি নানা জায়গায় আর্য্যদের আদি অধিষ্ঠান প্রতিপন্ন করার চেষ্টা হয়েছে।

এককালে যখন সংস্কৃত আদি মাতৃভাষা ব'লে গণ্য ছিল তখন পণ্ডিতরা বলতেন ভারতবর্ষই আর্য্যদের আদি ভূমি। কিন্তু এখন সে মতের পরিবর্ত্তন হয়েছে।

এক দল লেখকের মতে আর্য্যদের আদি বসতি ছিল জার্ম্মানীতে। তাঁরা বলেন আর্য্যগণ নর্ডিক জাতি এবং বর্ত্তমান জার্ম্মানরা তাদেরই বংশধর, তা' ছাড়া একমাত্র টিউটনিক ভাষাতেই নাকি আর্য্য-ভাষার উচ্চারণ প্রণালী এখনও পর্য্যন্ত অনেকটা খাঁটি আছে। * কিন্তু কোনও কোনও পণ্ডিত বলেন যে এ মতের অনেক গলদ র'য়েছে, টিউটনিক ভাষার শব্দ-ভাণ্ডারে এমন অনেক কথাই পাওয়া যায় না যা আর্য্য-ভাষায় পাওয়া যেত। নগর অর্থে সংস্কৃত পুর, Greek Polis, Lithuanian Pilis ইত্যাদি শব্দের অনুরূপ কোনও শব্দ টিউটনিক ভাষায় নেই। † এ থেকেই বোঝা যায় জার্ম্মানদের সভ্যতার দৌড় কতদূর ছিল। তা ছাড়া সীজরের বর্ণনা প'ড়ে মোটেই মনে হয়না যে সে যুগের অর্দ্ধ-সভ্য জার্ম্মানরা তার বহু পূর্ব্বে থেকে আর্য্য-সুলভ সভ্যতা ও কৃষ্টির অধিকারী হয়েছিল। এই রকম যুক্তি দিয়ে কার্ণয় (Carnoy) প্রভৃতি পণ্ডিতেরা জর্ম্মন-বসতির মত প্রায় উড়িয়ে দিয়েছেন।

* Childe--The Aryan Race

† Carnoy—Les India Europeens

কিন্তু কার্ল পেঙ্কা (Carl Penca) প্রমুখ কয়েকজন পণ্ডিতের মতে জার্ম্মানীই আদি আর্য্য পিতৃভূমি। হিরণ্য-কেশ, উন্নস, নীলাক্ষ, গৌরবর্ণ টিউটনিক জাতির শারীরিক গঠন যেমন আর্য্য-সুলভ, পৃথিবীতে অন্য কোনও জাতিরই তেমনটি নয়।

কিন্তু উপরোক্ত মতের বিরুদ্ধে গাইল্‌সের ঘোরতর আপত্তি। তিনি সিদ্ধান্ত করেছেন যে আর্য্যদের আদি বসতি ছিল মধ্য-ইউরোপের অস্‌ট্রিয়া (Austria) ও হঙ্গেরি (Hungary) দেশে—তার পূর্ব্ব সীমানা কার্পেথিয়ান্, দক্ষিণে বল্‌কান্ ও পশ্চিমে অস্‌ট্রিয়ান্ আল্‌প্‌স্ এবং উত্তরেও পর্ব্বতমালা। আর্য্য-দেশের আব্‌হাওয়া, জন্তু-জানোয়ার, গাছ-পালা, ইত্যাদি বিষয়ে যা' কিছু তথ্য সংগ্রহ হয়েছে সেগুলি সবই গাইল্‌সের নির্দ্দিষ্ট ভৌগোলিক পরিধির সঙ্গে বেশ খাপ খায়। একদিকে যেমন হঙ্গেরির উর্ব্বরা সমতলভূমি আর্য্যদের শস্য উৎপাদন করত, তেমনি ব্যাল্‌কনি ওয়াল্ড ও বোহিমিয়ার পার্ব্বত্য-প্রদেশে বিস্তীর্ণ চারণ-ভূমি গোরু ও ভেড়ার পক্ষে বিশেষ উপযোগী ছিল, এবং ভাষায় যে-সব গাছ-পালার নাম পাওয়া যায়, চারিদিকের পাহাড় ও জঙ্গলে সেগুলি স্বাভাবিক অবস্থায় পাওয়া যেত। পূর্ব্বেই বলেছি ভাষার পরিণতি দেখে মনে হয়, বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ার পূর্ব্বে আর্য্যরা একটি বিশেষ ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে অনেকদিন বসবাস করেছিল। সে দিক দিয়েও গাইল্‌সের নির্দ্দেশ যথাযথ মনে হয়। কারণ অস্‌ট্রিয়া ও হঙ্গেরির চতুর্দ্দিকে যে দুর্ল্লঙ্ঘ্য পর্ব্বতমালা আছে, তার ফলে বাস্তবিকই আর্য্য-সভ্যতা এক স্বাভাবিক বেষ্টনীর মধ্যে বিচ্ছিন্ন, একক ভাবে পরিণতি লাভ করেছিল, অনেকদিন পর্য্যন্ত বাইরের জগতের সঙ্গে তার যোগ ছিল না।

নিভৃত গণ্ডীর মধ্যে যখন প্রথম পুষ্টি লাভ করতে থাকে তখন আর্য্য সভ্যতার পরিসর ছিল সঙ্কীর্ণ, প্রয়োজন ছিল স্বল্প। কিন্তু ক্রমশঃ অবস্থান্তর ঘটল। এক দিকে বংশ-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশে অন্নাভাব প্রবল হ'য়ে উঠল, আর একদিকে বাইরের শত্রুর আক্রমণ আর্য্যদের ঘরছাড়া ক'রে তুলল। আত্ম-রক্ষার চেষ্টায় আর্য্যরা তখন বেরিয়ে পড়ল নতুন দেশের সন্ধানে। সে অভিযান বিশ্ব-সভ্যতার নাটকে এক নতুন অঙ্কের প্রথম দৃশ্য।

শ্রীঅনিলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

ঐতিহ্য ও টি-এস্ এলিয়ট্

কবিকে নিয়ে জনসাধারণে যতই হাসাহাসি করুক, তবু তার সম্বন্ধে কিংবদন্তীর অন্ত নেই। এই রূপকথাগুলোর মধ্যে যেটা সবচেয়ে দুর্ম্মর এবং রহস্যময়, সে হচ্ছে প্রেরণা-নামক এক অলৌকিক শক্তি। যাঁরা কবিতা লেখেন না, শুধু পড়েন, যাঁরা লেখা পড়া কিছুরই ধার ধারেন না, তাঁরা যদি ভাবেন যে কাব্যরচনার জন্যে বুদ্ধি বিদ্যা, শিক্ষা দীক্ষা, সাধনা সংযম, এ-সমস্তই অনাবশ্যক, প্রয়োজন শুধু অখণ্ড অবসর আর অপার দৈবানুগ্রহ, তবে আশ্চর্য্য হবার কিছুই থাকে না; কারণ কার্য্যকারণ বিধির প্রাত্যহিক ব্যতিক্রমই নৈমিত্তিক জীবনের প্রধান লক্ষণ। কিন্তু যখন কাব্যরচয়িতা বা কাব্যবিবেচকদের মধ্যেও অনেকে এই উপকথাকে প্রশ্রয় দিয়ে থাকেন, তখন কাব্যজিজ্ঞাসুর পক্ষে বিস্ময়বোধই একমাত্র মনোভাব। কারণ চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই জানেন যে শিল্পী ও কারুকর্ম্মী—আর্টিস্ট্ ও আর্টিজ্যান্—এদের উদ্যোগে কোনো মূলগত প্রভেদ নেই, পার্থক্য শুধু এদের মানসিক সংগঠনে। অর্থাৎ কারুকর্ম্ম হচ্ছে একটা চিরাচরিত প্রথার নিশ্চিন্ত অনুকরণ, তার মধ্যে সন্দেহের অবকাশ নেই, তার গোড়ায় নেই এষণার একাগ্রতা; কিন্তু শিল্পসৃষ্টি উদ্বুদ্ধ চৈতন্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত, তার প্রত্যেক অঙ্গ সজীব এবং অপরিহার্য্য, প্রত্যেক অলঙ্কার বহু পরীক্ষার ফল। এর মানে এ নয় যে রূপকার আদর্শমুক্ত, বরং উল্টোটাই তার পক্ষে বেশি সত্য। কিন্তু ঐতিহ্য ব্যতিরেকে—ট্র্যাডিশন্ ব্যতীত—শিল্পসৃষ্টি যদিও একেবারেই অসম্ভব, তবু তার অনুবৃত্তি প্রাণহীন নয়, সঙ্কল্পের সংস্পর্শে সঞ্জীবিত; তার অনুকরণের উদ্দেশ্য উদ্‌ভাবন। হয়তো এইজন্যেই কখনো কোনো যথার্থ আর্টিস্ট্‌কে স্বয়ম্ভু ব'লে বোধ হয় না। কিন্তু তার আত্মপরিচয় গোত্রপরিচয়ের মধ্যে নিহিত থাকলেও, তার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য পারিবারিক ইতিহাসে রূপান্তর ঘটায়, যে-ঐতিহ্যপরম্পরা তাকে অনুপ্রাণিত করে, তার স্বরূপ বুঝতে গেলে আগন্তুককে আর বাদ দেওয়া চলে না। এই দিক থেকে দেখলে কোনো একটা নির্দ্দিষ্ট কাব্যধারাকে নদীর সঙ্গে

তুলনা করা যায় না, তাকে একখানা অসমাপ্ত অট্টালিকার মতো মনে হয়। এই অট্টালিকার সূত্রপাত মানুষের প্রয়োজনসিদ্ধির খাতিরে, এর বৃদ্ধি মানুষের মর্জ্জিতে, এর ধ্বংসও মানুষের অযত্নে। শুধু তাই নয়, এই অট্টালিকার ভবিষ্যৎ বিস্তার যদিও ভিত্তিস্থাপনার দিনেই অনেকখানি ধার্য্য হয়ে যায়, তবু প্রত্যেক যোগ-বিয়োগে তার অঙ্গসঙ্গতি বদলাতে থাকে; এবং তার মৌল প্রকৃতি যেমন সংযোগমাত্রকে নিয়ন্ত্রিত করে, তেমনি সংযোগমাত্রেই তাতে পরিবর্ত্তন ঘটে।

উপমাটা উপযোগী হলো কিনা বলতে পারি না, কিন্তু এটা নিশ্চয় জানি যে সাত্ত্বিক কবিরা অতিচেতন মানুষ। অদৃষ্টের অনুগ্রহ থেকে তারা কোনোদিনই বঞ্চিত নয় বটে, কিন্তু তাদের কীর্ত্তিতে প্রকৃতির চেয়ে পুরুষকারের প্রসাদই বেশি। এই সত্যকেই ঘুরিয়ে বলা যায় যে রূপসৃষ্টির অনেকখানিই সমালোচনার অন্তর্গত। কেবল প্রসঙ্গ ও পদ্ধতি নির্ব্বাচনে দক্ষতা দেখালেই বড় কবি হওয়া যায় না, তার জন্যে নিজের এবং পূর্ব্ববর্ত্তীদের কাব্যরচনার যথাযথ মূল্যনির্দ্ধারণও অত্যাবশ্যক। অর্থাৎ কাব্যের স্বভাব-সম্বন্ধে, সাহিত্যের ইতিহাস ও পরিণতি-সম্পর্কে কবিমাত্রের ধারণাই সুস্পষ্ট হওয়া বিধেয়। এই মতের যাথার্থ্য প্রমাণ করার জন্যে বেন্ জন্সন্, ড্রাইডেন, কোল্‌রিজ্ ইত্যাদির মতো বিশ্ববিশ্রুত কবি-সমালোচকদের সাক্ষী মানার প্রয়োজন নেই, ইংরেজি সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাসই আমার সমর্থন করবে। শিশুশিক্ষার কথা স্মরণ করলেই মনে পড়বে যে অন্ততপক্ষে ইংলণ্ডে এবং ফ্রান্সে সাহিত্যের নব যুগ কখনো বিনা-আয়োজনে প্রবর্ত্তিত হয়নি। অন্য দেশের সাহিত্যের সঙ্গে আমার পরিচয় পরোক্ষভাবে, তাই সে-সম্বন্ধে জোর গলায় কিছু বলা অশোভন। তবে এরিস্টফেনিস্-এর প্রহসন প'ড়ে বোধ হয় না যে গ্রীক্ সাহিত্যের আদর্শ-সম্বন্ধে একা এরিস্টট্‌ল্‌ই উৎসুক ছিলেন; এবং গোয়টে, শিলার্, লার্মণ্টফ্, টল্‌স্টয়্, ইব্‌সেন্, ষ্ট্রিণ্ড্‌বের্গ্, কার্দুচি, এমন-কি টুর্গেনিভ্ ও য়েট্‌স্-এর মতো বিশুদ্ধ শিল্পীরাও সাহিত্যিক বাদানুবাদের জন্যে প্রসিদ্ধ। অবশ্য শেক্‌স্‌পীয়র্-এর মতো দু-একজন মহাকবিকে মেলে যাঁদের শিল্পাদর্শ-সম্বন্ধে কোনো বৃত্তান্তই আমাদের জানা নেই, যাঁরা প্রকাশ্যে কোনো থিয়োরির প্ররোচনা

মানেননি, তেমনি অখ্যাত, অনাড়ম্বর ও স্বতঃসিদ্ধ ভাবে অমর কাব্য রচে গেছেন, যেমন ক'রে হয় সাধারণ প্রাণীর জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ। কিন্তু এই নিশ্চেষ্টা ও নির্ভাবনা নিশ্চয়ই আমাদের স্বকপোলকল্পিত। কারণ যে-কবির জিজ্ঞাসা সিনেকা, মেকিয়াভেলি, মঁতেঁই-এর মতো বিপরীতধর্ম্মী দার্শনিকদের দুরূহ মতবাদকে অত সহজে পরিপাক ক'রে ফেলেছিলো, যার কৌতূহল প্রত্নতত্ত্ব, বিজ্ঞান, ব্যবহারশাস্ত্র, জ্যোতিষ, পুরাণ, রূপকথা, যাদুবিদ্যা প্রভৃতি, মানুষী সভ্যতার কোনো উপকরণকেই বাদ দেয়নি, মানব-সম্পর্কের গবেষণায় যে-ব্যক্তি সম্ভবত উৎকটতাকে সুদ্ধ নিঃসঙ্কোচে মেনে নিয়েছে, কেবল নিজের জীবিকার মূলানুসন্ধানে সে নিরুৎসুক, এমন বিশ্বাস কোনোমতেই পোষণীয় নয়। তাছাড়া শেক্‌স্‌পীরীয় কলাকৌশলের অস্থৈর্য্য সুপরিচিত, এবং এই পরীক্ষা-প্রবণতা একমাত্র জিজ্ঞাসু মনেরই লক্ষণ।

কিন্তু তাহলেও এ-কথা অনায়াসে স্বীকার করা যায় যে সমালোচনার প্রয়োজন সকল কালে সমান নয়। শেক্‌স্‌পীয়র্‌-এর সময়ে যতখানি কাব্য-বিবেচনা কবিদের পক্ষে আবশ্যিক ছিলো, আমাদের যুগে তার পরিমাণ বহুগুণ বেড়েছে। কলাশুদ্ধির পুরোধারা আর্টের স্বাতন্ত্র্য নিয়ে যতই বাড়াবাড়ি করুন না কেন, তবু একেবারে জীবন্মুক্ত হওয়া শিল্পীর সাধ্যাতীত; এবং জীবন যেহেতু শৃঙ্খলা ও বিশৃঙ্খলার বিকল্পে তরঙ্গায়িত, তাই শিল্পপ্রসূ সামঞ্জস্যসাধনের প্রয়োজন কোনো সময়ে থাকে উহ্য, কখনো বা ব্যক্ত। সাহিত্যের মূল সমস্যা আর দর্শনের সনাতন প্রশ্ন, এ-দুটিকে আপতদৃষ্টিতে ভিন্ন ব'লে মনে হলেও, এদের পার্থক্য কেবল ভাষার, ভাবের নয়। শুধু কবি কেন, আমার বিশ্বাস ভাবুকমাত্রকেই যে রহস্য উদ্‌ঘাটনের চেষ্টায় প্রাণপাত করতে হয়, সে হচ্ছে ব্যক্তি ও সমাজের, ব্যষ্টি ও সমষ্টির, বিশেষ ও সাধারণের সম্পর্ক। যে-কালে সমাজবন্ধন নিবিড় থাকে, যখন লোকোত্তর আদর্শের প্রতি মানুষের ভক্তি অচলা,—যেমন ছিলো মধ্যযুগের য়ুরোপে—তখন কাব্যবিবেচনাকে গৌণ ক'রে, মুখ্যত অনুকরণের সাহায্যেই কাব্যরচনা সম্ভব। কিন্তু যখন উপনিপাত বিশ্বব্যাপারের ছত্রপতি, যখন অতিজীবিত আদর্শকে আশ্রয় ক'রে থাকা মারাত্মক,—যেমন আমাদের যুগে—তখন

স্রষ্টা আর সমালোচক প্রায় সমার্থবাচক। এলিজাবেথীয় ইংলণ্ড এই দুই সীমান্ত প্রদেশের মধ্যবর্ত্তী। সেখানে কবিত্ব গণ্য মান্য উপজীব্যগুলোর অন্যতম ব'লে বিবেচিত হতো না বটে, কিন্তু সুকুমারবৃত্তির অন্তর্ভুক্ত ছিলো। সেদিনকার সমাজে কবির উপকারিতা যদিও শূন্যে এসে ঠেকেছে, তবু নবরত্ন-সভার শিরোমণি হিসেবে সে তখনো সমাদৃত। সেকালের ভাবুক ন্যায়নিষ্ঠ বিধাতার সম্বন্ধে বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়লেও, মনুষ্যজীবন যে দৈবেরই খেয়ালে উপদ্রুত, সে-বিষয়ে সন্দিহান হয়নি। এ-অবস্থায় অতীত ও বর্ত্তমানের মধ্যে সাংঘাতিক সংঘাত স্বাভাবসিদ্ধ নয়। তখন পঙ্গু সমাজের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলা জাগ্রত ব্যক্তির পক্ষে যদিও কষ্টকর তবু এই অসঙ্গতির জন্যে সমাজকে কেউ দোষ দিচ্ছে না, বলছে ব্যক্তিই উৎকেন্দ্রিক। আমার বিশ্বাস শেক্স্পীয়র্-এর মনোভাবও গোড়ার দিকে এই মতেই সায় দিতো। অবশ্য তিনি নাটকের ধ্রুপদী আদর্শে কোনোদিনই আস্থাবান ছিলেন না, কিন্তু এখানে শেক্স্পীয়র আবিষ্কারক নন, অনুসারক মাত্র। তিনি লিখিতে সুরু করার এতদিন আগে এই বর্ণসঙ্করতা ইংরেজি নাটকে প্রবেশ করেছিলো যে তাঁর নিজের এবং সমসাময়িকদের কাছে এইটাই ছিলো নাট্যসাহিত্যের অনন্যরূপ। সেইজন্যেই বেন্ জন্সন্ যখন প্রাচীন পদ্ধতির পঙ্কোদ্ধার করলেন, তখন অতখানি বাক্বিতণ্ডার সৃষ্টি হলো। সে যাই হোক, নাটকের তৎকালীন আদর্শকে শেক্স্পীয়র আমরণ মেনে চলতে পারলেন না। হ্যাম্লেট্ রচনার সময়ে তাঁর মনে নানা বিরোধের উদয় হলো, এবং তারি ফলে অন্তকালে হ্যাম্লেট্ ওথেলোর চরমোক্তির প্রতিধ্বনি করলে না। কারণ সে ছিলো আধুনিক কালের অগ্রদূত, ব্যক্তিবাদের প্রথম ভয়াবহ বিকাশ; তার মুখ দিয়ে শেক্স্পীয়র এমনি স্বতন্ত্র, এতই স্বকীয় কথা বলতে চেয়েছিলেন যে সে-চরিত্রের রহস্য চিরদিনই সাধারণ জ্ঞানের বহির্ভূত থাকবে। এবং একবার এই অনন্যগোচর পথে চলার পরে প্রাচীন বিধানে ফেরা তাঁর পক্ষে আর সম্ভব হয়নি। সেইজন্যই তাঁর শেষ জীবনের তথাকথিত কমিডিগুলো অত দুর্বোধ্য, অমন বিশৃঙ্খল; কোনো গতানুগতিক কাঠামোকে অবলম্বন ক'রে মূর্ত্তিগঠনের চেষ্টা সেগুলোয় নেই, আছে কেবল স্বকীয়তা প্রকাশের অসম্বদ্ধ আনন্দ। হয়তো শুধু এই কারণেই

অত তিক্ততা, অত হিংস্রতা, অত বৈষম্য থাকা সত্ত্বেও সে-রচনা-কটিকে সমালোচকেরা কমেডির পর্য্যায়ভুক্ত করেছেন।

ষোড়শ শতকেই যখন স্বাতন্ত্র্যের প্রয়োজনীয়তা অত প্রবল হয়ে উঠেছিলো, তখন বিংশ শতাব্দীতে পরিবর্ত্তনকে অবশ্যম্ভাবী লাগাই স্বাভাবিক। রিনেসেন্স্-এ যে-আদর্শবিপর্য্যয় সুরু হয়েছিলো, সেটা সমগ্র সমাজের ক্রমোন্নতির ফল; এবং এই বিবর্ত্তনের চূড়ান্তে পৌঁছাতে যেহেতু প্রায় চার শ বছর লেগেছে, তাই বিপ্লবের আকস্মিক ও আপতিক রূপটা এতদিন পর্য্যন্ত কারো চোখে পড়েনি, লোকে ভেবেছে ব্যাপারটা পরিবর্ত্তন নয়, পরিবর্দ্ধন মাত্র। উন্নতির এই নাতিচেতন দিকটা সুবিদিত এবং এরি জন্যে ঊনিশ শতকের ভাববিলাসী কবিরা বলতেন যে মহৎ কাব্য দুঃখোদ্ভূত, সন্তুষ্টি কবিপ্রতিভার চিরশত্রু। জগতের কাব্য-সাহিত্যের আলোচনা করলে, এ-মতকে যদিও অগ্রাহ্য ব'লেই বোধ হয়, তবু এ-কথা সত্য যে দুঃখ মানবচৈতন্যকে উদ্বুদ্ধ করার একমাত্র উপায় না-হলেও, প্রকৃষ্ট উপায়। আমাদের যুগে নিদ্রালু মন্থরতার স্থান নেই, এবং অধুনাতনী ধ্বংসলীলার ব্যাখ্যায় অভিব্যক্তিবাদের শরণ নেওয়া অসম্ভব। আমরা যে আজ ঐতিহ্যমুক্ত হয়েছি, ব্যক্তিকে সমষ্টির ভগ্নাংশ ব'লে ভাবতে আমরা যে আজ অনিচ্ছুক, তার কারণ এ নয় যে পুরাতন আদর্শ আমাদের প্রগতির প্রতিবন্ধক, তার কারণ শুধু এই যে আমাদের ইতিহাসে প্রগতি এবং প্রলয়ের মধ্যে বিশেষ কোনো প্রভেদ নেই। তাই যে আদর্শের ফলে এই সর্ব্বনাশ ঘটেছে, শুধু তাকে নয়, প্রাচীন-অর্ব্বাচীন, সকল আদর্শকেই আমরা তফাতে রাখি। তাই আজকে আর আমরা কেবল বৃহত্তম সংখ্যার মহত্তম মঙ্গলে বিশ্বাস হারিয়েই ক্ষান্ত হতে পারি না, সংখ্যা-শব্দটাকেও ভয়ের চক্ষে দেখি। তাই আমরা আর স্বাধীনতা খুঁজিনা, চাই মাত্র নির্ব্বিরোধ। কিন্তু এই মনোভাব নিয়ে জীবনযাত্রা যদিই বা সম্ভবপর হয়, তবু সৌন্দর্য্যসৃষ্টির— অন্ততপক্ষে কবিতায় সৌন্দর্য্যসৃষ্টির—পদ্ধতি সম্পূর্ণ পৃথক।

সাম্প্রতিক শিল্পসেবীরা যে-সত্যটা প্রায়ই ভুলে যান, অথচ যেটা কলাবিদ্যার গোড়ার কথা, সে হচ্ছে এই যে সুন্দরের উপলব্ধিতে অধিকারভেদ নেই, সে-স্বপ্ন অতি সাধারণ মানুষের দৈনিক অভিজ্ঞতার অন্তর্গত।

কাজেই রূপকারকে যদি মামুলী মানুষের থেকে আলাদা ক'রে দেখাই বাঞ্ছনীয় হয়, তবে অভিজ্ঞতার উপরে জোর না দিয়ে, জোর দিতে হবে অভিব্যক্তির উপরে। কারণ ভিতরে ভিতরে সকল মানুষ—এমন-কি সকল প্রাণীই—সমধর্ম্মী; তাদের অমিল কেবল রূপে, স্বরূপে নয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে প্রেমের অভিজ্ঞতা সমান এবং সার্ব্বজনীন; কিন্তু যেখানে রামের প্রেম শ্যামের প্রেমের থেকে তফাৎ, সে হচ্ছে এই যে রাম প্রেয়সীর জন্যে স্বর্ণলঙ্কাকে উড়িয়ে পুড়িয়ে দেয়, আর শ্যাম তার আবেগ ব্যক্ত করে বেণুবাদনে। এই-জন্যে অনেক কলাভিজ্ঞের মতে আধেয় শিল্পের সারবস্তু ব'লে বিবেচিত হতে পারে না, সে-সম্মান আধারেরই প্রাপ্য। কিন্তু কাব্যের আধার-সম্বন্ধেও একটা প্রশ্ন ওঠে। যে-মাল-মসলায় সে-আধার তৈরি, সে হচ্ছে ভাষা, এবং ভাষা মানবসভ্যতার প্রথম ও প্রধান উপকরণ। তাই কবির পক্ষে অবচ্ছিন্নতা তো দূরের কথা, এমন-কি নির্দ্বন্দ্ব হওয়াও প্রায় অসাধ্য। পূর্ব্বে যে-দার্শনিক সমস্যার কথা বলা হয়েছে—অর্থাৎ ব্যষ্টি-সমষ্টির বিরোধ—এখানেও কবি তারি সমাধান করতে বাধ্য; ব্যক্তিমানব কি ক'রে বিশ্ব-মানবের প্রতিভূ হয়ে উঠবে, তার সন্ধানেই কবিপ্রতিভার একমাত্র সার্থকতা। এই সঙ্গতিসাধন যে-ঐন্দ্রজালিক উপায়ে সিদ্ধ হয়, তার বিবরণ আমাদের অজ্ঞাত। কিন্তু এ-কথা কাব্যামোদীমাত্রেই জানেন যে কবিতা যখন সত্যই মহৎ আখ্যার উপযোগী হয়, তখন তার ভাষা আর ভাব, এই উভয়ের মধ্যেই একটা নৈর্ব্যক্তিক গুণের আভাস মেলে;—এণ্টনির মতো সসাগরাধরণীপতির প্রণয়ব্যাপারে ফুটে ওঠে মাছিমারা কেরাণীর জীবন-চরিত। মহাকবিরা নিজেদের ভাষা নিজেরা বানিয়ে যান বটে, কিন্তু সে-ভাষা যখন চূড়ান্তে পৌঁছায়, তখন তার মধ্যে শোনা যায় নিত্যনৈমিত্তিক উক্তিপ্রত্যুক্তির প্রতিধ্বনি, প্রাকৃত ভাষার সবল, সরল ও সজীব পদক্ষেপ; তখন আর শেক্স্‌পীয়র্-এর ভাষা ব'লে কিছু থাকে না, দেখা যায় যে শেক্স্-পীয়র জনসাধারণের সাবলীল ভাষা ধার করেছেন। কিন্তু এতখানি আত্ম-ত্যাগ সত্ত্বেও শেক্স্‌পীয়র্-এর স্বকীয় পরিচয় ম্লান হয় না, বরং উজ্জ্বলতর হয়ে ওঠে; দুটো চারটে অসংলগ্ন ছত্র পড়লেই বলা যায়, সে-রচনা শেক্স্-পীয়র্-এর কিনা। এই অঘটনসংঘটনে দৈবপ্রসাদ নেই, এমন কথা

বলার মতো তথ্য আমরা আজও সংগ্রহ করতে পারিনি, কিন্তু এটা নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে মহাশিল্পীদের মধ্যে অলৌকিক শক্তি যে পরিমাণেই থাকুক না কেন, লৌকিক বুদ্ধিতেও তাঁরা নিতান্ত নগণ্য নন। অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ শিল্পীরা সচেতন শিল্পী, এবং শিল্পসৃষ্টির জ্ঞাত উপায় হচ্ছে স্বকয় উদ্দেশ্যকে চোখের সামনে রেখে, অতীত ও বর্ত্তমানের সমুদ্র মন্থন ক'রে, উপযোগী উপাদানে সুসঙ্গত অবৈকল্য নির্ম্মাণ।

যে-কাব্যাদর্শের কথা বল্‌লুম, তার জন্মদিন শুধু পুরাবিদেরাই জানেন। কেবল আমাদের যুগ নয়, সকল দেশ এবং সকল কাল এই নিয়মেই কাব্য রচনা ক'রে এসেছে ব'লে আমার বিশ্বাস। কিন্তু নানা কারণে, প্রধানত রুসো-প্রবর্ত্তিত ভাবপ্রবণ ব্যক্তিবাদের কল্যাণে, গত দু শ বছরের কবিরা, কাব্য লেখার সময়ে না-হলেও, কাব্যচর্চ্চার বেলায়, কবিপ্রতিভার সংযোগের দিকটায় জোর না-দিয়ে, তার বিয়োগের দিকটাই বড় ক'রে দেখেছেন। এর ফলে আধুনিক যুগের শ্রেষ্ঠ কবিতার বিশেষ কোনো ক্ষতি হয়তো হয়নি, কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে যে কাব্যানুশীলনের ইচ্ছা কমে এসেছে, তাতে সন্দেহ নেই। এ-অবস্থার প্রতিকার আছে কিনা তা তর্কাধীন; কিন্তু গত ত্রিশ বছর ধ'রে চিন্তাশীল কবিরা এই বিসংবাদ-সম্বন্ধে আর উদাসীন নেই। এটা নিশ্চয়ই আশাপ্রদ। উনিশ শতকের শেষে অথবা বর্ত্তমান শতকের আরম্ভে যাঁদের কাব্যজীবনের সূত্রপাত হয়েছে, তাঁরা প্রায় সকলেই একবাক্যে মেনে নিয়েছেন যে কবিতাকে বাঁচতে হলে, তার প্রসার বাড়াতে হবে, তার লুপ্ত গৌরবের পুনরুদ্ধার করতে চাইলে, কেবল খেয়ালী কবিদের অনুকরণে ব্যক্তিগত উৎকর্ষ খুঁজলেই চলবে না, জাতিগত চৈতন্যের শরণাপন্ন হতে হবে। এই মহাচৈতন্য কোনো একজন মহাকবির অধিকারে নেই; তাই কবিযশঃপ্রার্থীর পক্ষে কবিবিশেষের নামকে জপমন্ত্র করা বিপজ্জনক। কবিমাত্রেই তার আরাধ্য এবং আলোচ্য; তার কাজ হচ্ছে ব্যক্তিবিশেষের অপূর্ব্বতা ও ব্যতিক্রমের বিশ্লেষণ ক'রে, স্বদেশের সাহিত্যিক মূলসূত্রের আবিষ্করণ। কিন্তু এই মূলসূত্র যেহেতু প্রত্যেক নূতন কবির বয়নেই অল্প-বিস্তর বদলে যাচ্ছে, তাই এই বিষয়ে কোনো দুজন অনুসন্ধিৎসুর গবেষণা কখনো একই মীমাংসায় শেষ হবে না; এবং মীমাংসা যখন

আলাদা হতে বাধ্য, তখন সেই মীমাংসার উপরে যে-নবানুষ্ঠান স্থাপিত, তাও চিরদিন স্বতন্ত্র।

যুক্তির দিক দিয়ে বিচার করলে উপরের প্যারাগ্রাফটা হয়তো হাস্যকর ঠেকবে। কিন্তু এ-কথা ভুললে চলবে না যে কবি আর দার্শনিক যখন এক ব্যক্তি নয়, তখন কোনো নির্দ্দিষ্ট প্রশ্নের উত্তরে উভয়ের মুখে একই ভাষা শুনতে চাওয়া অনুচিত। আসলে, জগতের বড় বড় সমস্যা-গুলোর গুরুত্ব যদিও সকলের কাছেই সমান, তবু তাদের আয়তন-সম্বন্ধে ভিন্ন স্তরের লোকের ধারণা ভিন্ন হওয়াই বিধেয়। কাজেই এমন মনে করা শক্ত নয় যে নৈয়ায়িকের চক্ষে যে-রহস্য দুষ্প্রবিশ্য, সে-ব্যূহ ভেদের উপায় সাহিত্যিক জানেন জন্মগত অধিকারে। অবশ্য বেরিয়ে আসার কথা আলাদা; এবং বেরুতে না পারলে অন্য লোককে তার ভিতরে নিয়ে যাওয়াও অসম্ভব। অতএব বিশেষ-সাধারণের বিরোধ কবি যত সহজেই নিষ্পত্তি করুন না কেন, তার প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা তাঁর কাছ থেকে প্রত্যাশা করা যায় না, সেজন্যে হতে হয় দার্শনিকের দ্বারস্থ। কারণ কবিদের মধ্যে অনেকেই প্রকৃতপক্ষে দুর্বিনীত নন, তাই সচরাচর তাঁরা কোনো ব্যাপক সিদ্ধান্ত না-ক'রে শুধু তাঁদের নিজস্ব উপলব্ধির কথাই ব্যক্ত করেন। কিন্তু এ-নিয়মেরও ব্যত্যয় আছে; এবং আমাদের কালে যে-ইংরেজ কবির প্রভাব অতিবিস্তৃত, তিনি—অর্থাৎ টি-এস্ এলিয়ট্—কোনোদিন দুরূহতার ভয়ে দার্শনিক মনোভাবকে এড়িয়ে চলেননি।

এ-কথা মনে করলে খুবই অন্যায় হবে যে কবির দার্শনিক মনোভাব আর কবিতায় তত্ত্ববিচার এক জিনিস। অবশ্য দর্শন-শব্দকে খুব বিস্তারিত অর্থে ধরলে, শুধু কাব্যে কেন, মানুষের সকল প্রক্রিয়াতেই তার প্রসার দেখা যাবে। কিন্তু অর্থঘন ক্ষুদ্রপরিসর শব্দগুলিকে এইভাবে স্ফীত ও শূন্যগর্ভ করা আমার অনভিপ্রেত। তাই দর্শন বলতে আমি মানবচৈতন্যের সেই দিব্যদৃষ্টিকে বুঝি না যার আশীর্ব্বাদে বিশ্লিষ্ট বস্তুবিশ্ব সম্বন্ধশৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে আমাদের আয়ত্তে আসে, বুঝি মানবমস্তিষ্কের সেই চিন্তাশক্তিকে যার চেষ্টা বিসংবাদের নীরাকরণ করে, যার অধ্যবসায় বচনবিরোধের মধ্যে ন্যায়সঙ্গতি আনে। এই অর্থে দর্শন আর যুক্তি অভেদাত্মা হয়ে দাঁড়ায়,

আর ফলে দর্শনের সঙ্গে কাব্যের সম্পর্ক হয় শিথিল। কারণ অনুবন্ধন সৃষ্টি করা হচ্ছে যুক্তির কর্ত্তব্য, কাব্যের প্রাণ অভিজ্ঞতা উৎপাদন। এই দুটো ধর্ম্ম স্বতঃবিরোধী ঃ—অভিজ্ঞতার স্বরূপে যুক্তির সংস্পর্শ নেই, সে পরম্পরার আকর্ষণে আত্মসমর্পণ করতে চায় না, স্বয়ম্ভুর অখণ্ডতাই তার বিশেষ গুণ। অবশ্য তাকে বুঝতে গেলে যুক্তির দ্বারস্থ হওয়া ছাড়া গতি নেই। কিন্তু তবুও সে-যুক্তির শাসন মানে না, যুক্তিই তার কাছে মাথা নোওয়ায়। তখন যুক্তির তপস্যায় প্রীত হয়ে, সে হয়তো একবার বিদ্যুদ্‌বিলাসে চতুর্দ্দিক ঝলসে, আবার প্রায়ান্ধকারে অদৃশ্য হয়ে যায়; কিন্তু অধিকাংশ সময়েই এই ক্ষণিকের আনন্দও যুক্তির ভাগ্যে জোটে না, তাকে সন্তুষ্ট থাকতে হয় প্রতিমাপূজায়, সত্তাশূন্য বস্তুরেখার ধ্যানে। মরমী সাধকেরা এ সত্যকে বহু পূর্ব্বেই আবিষ্কার করেছেন; তাই সকল দেশে এবং সকল কালে তাঁরা প্রজ্ঞাকামীদের উপদেশ দিয়েছেন যুক্তির দম্ভকে খর্ব্ব করতে, বলেছেন যে পরমার্থ-সম্বন্ধে শেষ কথা বোঝা নয়, উপলব্ধি। পুরোহিত এবং ঐন্দ্রজালিক, দ্রষ্টা এবং মহানুভব, এরাই কবির পূর্ব্বপুরুষ; তাই কবির ব্যুৎপত্তি বুদ্ধিতে নয়, উপলব্ধিতে, তাই কবিতা যুক্তিতে একেবারে বঞ্চিত না-হলেও, অভিজ্ঞতাতেই তার জন্মগত অধিকার।

কিন্তু এ-অভিজ্ঞতা মুখ্যত লেখকের নয়, পাঠকের। অর্থাৎ কাব্য যদি বিবরণে নিযুক্ত হয়, তবে তার সার্থকতা থাকে না; তার ব্রত হচ্ছে উদ্বোধন, পাঠকের চৈতন্যকে উদ্বোধন। এইখানেই ইতিহাসের সঙ্গে কাব্যের প্রভেদ,—ইতিহাস বহির্জগতের বর্ণনাতেই সদাসর্ব্বদা ব্যস্ত, তা-ছাড়া তার অস্তিত্ব নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন; কিন্তু কাব্য স্বাবলম্বী, তাতে কাব্যেতর বিষয়ের প্রবেশ ব্যাহত, তার প্রভাবে মানুষ কেন অভিভূত হয়ে পড়ে, তা আমরা হয়তো জানি না, কিন্তু সে-প্রভাব যে বস্তুবিশ্বের প্রভাবের মতো প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ নয়, সে-সম্বন্ধে আমরা নিঃসন্দেহ। বর্ণ, গন্ধ, স্পর্শ ইত্যাদি যেমন স্বভাবগুণে মানুষের নাড়িতে সংবেদনার স্রোত বইয়ে তাকে অভিজ্ঞতার স্বরাজ্যে যাত্রা করিয়ে দেয়, কাব্যও তেমনি স্বাধিকারবশে পাঠকের মনকে উদ্বেজিত করে তোলে। অনেকের মতে এই অসাধ্যসাধন

সম্ভব হয় মাত্র ধ্বনির সাহায্যে; কিন্তু আমি কাব্যের ফলাফলকে শুধু শ্রুতিঘটিত ব'লে ভাবতে পারি না, অন্তত আমার নিজের ক্ষেত্রে কবিতার মায়া কেবল আমার কানকেই মুগ্ধ ক'রে দেয় না, তাতে ক'রে আমার চোখেও লাগে অতীন্দ্রিয় দৃষ্টির অঞ্জন। আমার কাছে কাব্যের প্রতীক ও পৌত্তলিকতা নিষ্প্রয়োজন অলঙ্কার মাত্র নয়, বরং অবর্জ্জনীয় সম্পদ। ওইগুলো থাকে ব'লেই কাব্যে ভাব রূপ পায়, অর্থ পরবশতা কাটিয়ে ওঠে, মানসী মানবীর মতো রক্তে, মাংসে, রসে, রেখায় পুষ্পিত, পল্লবিত হতে পারে। কোনো অজ্ঞাত বা অল্পজ্ঞাত কারণে মহৎ কাব্যে বাক্য প্রায়ই বস্তুতে পরিণত হয়; এবং তার উপাদানে এই অদ্ভুত পরিবর্ত্তন ঘটে ব'লেই তার ফল সার্ব্বত্রিক হলেও সকল ক্ষেত্রে সমান নয়।

বস্তুজগৎ যদি নির্ব্বিকার হয়, তবে তার নিত্যতা নিশ্চয়ই মনুষ্য-নিরপেক্ষ। লৌকিক পরিচয়ে বস্তু বিকারবহুল; এবং দুপুর রোদে যাকে কলাগাছ ব'লে বোধ হয়, চাঁদের আলোয় তাকেই দেখায় ভূতের মতো। তাছাড়া একই বস্তুর প্রতিক্রিয়া বিভিন্ন মানুষের মনে বিভিন্ন। আমার কাছে দেওদার বলাকার কাংস্যক্রেঙ্কারে মুখরিত, অস্তগামী সূর্য্যকিরণে মুকুটিত তার উড্ডীন কেশদাম, তার নিষ্কম্প্র চরণ বিধৌত ঝিলমের বন্দারু স্রোতে। কিন্তু আমার প্রতিবেশী বাক্সওয়ালার মনে ওই একই গাছ শুধু লাভসঙ্কোচের আশঙ্কা জাগায়। কাব্যের বাহন-সম্বন্ধে যখন এতখানি অনিশ্চিততা সম্ভব, তখন কবিতার—বিশেষত ছোট কবিতার—মধ্যস্থতায় কোনো নির্দ্দিষ্ট অর্থ জ্ঞাপন করতে চাওয়া ব্যর্থ। তার থেকে নিজেকে ভুলে, পাঠকের চৈতন্যকে জাগানোর চেষ্টাই ভালো; কারণ সে-চৈতন্য কি ক'রে জাগে, তা আমরা জানি, কিন্তু জানি না কি উপায়ে তার চৈতন্যে আর আমার চৈতন্যে করকম্পন চলতে পারে। মনের সঙ্গে মনের সংসর্গ একেবারে দুর্ঘট না-হলেও, সেটা একান্ত দৈবাধীন; কিন্তু দেহের সঙ্গে দেহের সংঘাত শুধু সুসাধ্য নয়, অনিবার্য্যও। সুতরাং মহাকবি মাত্রেই মনো-বিনিময়ের পণ্ডশ্রমে কালপাত করতে অনিচ্ছুক, তাঁদের নিরাকার ভাবনা-বেদনার বহিরাশ্রয় আবিষ্করণেই তাঁরা বদ্ধপরিকর, ব্যক্তিগত অনুভূতিকে একটা গ্রহণীয় বস্তুরেখার মধ্যে অবরুদ্ধ করতে পারলেই তাঁরা

সন্তুষ্ট। কারণ তাতে ক'রে যদিও একের অভিপ্রায় অন্যের মনে সংক্রামিত হয় না, তবু পাঠকের জড়িমা লেখকের আজ্ঞাতেই ভাঙে; তার অভিজ্ঞতার সীমা সে যদিও নিজের শক্তির অনুপাতেই ধার্য্য ক'রে নেয়, তবু অনভিজ্ঞ থাকার অধিকার তার আর থাকে না; তাকে চলতে হয়, অনুভব করতে হয়, লেখকেরই ইঙ্গিতে। খৃষ্টীয় দাক্ষিণ্যবাদে যে-ভগবানের পরিকল্পনা করা হয়েছে, তা কতকটা এই রকমের; এবং সেইজন্যেই হয়তো কোনো কোনো ভাবালু দার্শনিক কাব্যরচনাকে সৃষ্টিব্যাপারের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ ব'লে ভুল করেছেন।

বলাই বাহুল্য যে ও-ধরণের ভাববিলাসে আমার সহানুভূতি নেই। খৃষ্টীয় বা অন্য কোনো ধর্ম্মোক্ত ভগবান-সম্বন্ধে আমি যদিও নিরুৎসুক, তবু বিশ্ববিধাতার সঙ্গে সামান্য কবির তুলনা করতে আমার অবিশ্বাসী মনও কুণ্ঠিত। তৎসত্ত্বেও আমি দাক্ষিণ্যবাদের উল্লেখ করেছি আমার বক্তব্যকে স্পষ্ট করার উদ্দেশ্যে। কবির আজ্ঞাবহ হয়েও পাঠক যে-পরিমাণের স্বাধীনতা ভোগ করে, তার সাদৃশ্য মেলে ভগবান-পরিচালিত মানুষের পাপপ্রবৃত্তিতে। কবিও ভগবানের মতো পাঠককে একটা চক্রচরণের নির্দ্দেশ দিয়েই ক্ষান্ত হয়, এবং দৈবানুপ্রাণিত মানুষের মতো পাঠকের যাত্রাও যেখান থেকে সুরু হয়, ফিরে আসে আবার সেইখানেই। এইটুকু শাসন মানা ছাড়া অন্য সকল বিষয়েই পাঠক স্বেচ্ছাচারী। সে ঠিক কোন্ পথ দিয়ে চলবে, কোন্‌খানে জিরুবে, কতবার পড়বে, কখন উঠবে, এ-সমস্তই নির্ভর করে তার নিজের অভিরুচির উপরে। কবি চায় শুধু তার চলা, একটা যাত্রাস্থল থেকে বেরিয়ে আবার সেই যাত্রাস্থলেই ফিরে আসা; এবং চলতে চলতে সে যদি পথভ্রষ্ট হয়, তাতেও কবির আপত্তি নেই, যদি সে গোলোকধাঁধাঁয় প'ড়ে ঘুরপাক খেতে থাকে, তবু কবি তাকে উদ্ধার করবে না, যদি সে এমন পথ দিয়ে গন্তব্যে এসে পৌঁছায়, যেটা কবি নিজেও কল্পনা করতে পারেনি, তাহলেও সে কবির প্রসাদে বঞ্চিত হবে না, বরং পাবে অধিকতর সম্মান। শুধু এই দিক থেকে দেখলেই খৃষ্টানদের করুণাময় ভগবানের সঙ্গে কবির মিল ধরা পড়বে; অন্যত্র এরা একেবারে আলাদা, এত আলাদা যে প্রথমটি লোকোত্তর

হয়েও মানুষের ছাঁচে ঢালা ব্যক্তিস্বরূপের পরম প্রতিমান, দ্বিতীয়টি মর্ত্ত্যচর হয়েও পূরোপূরি নৈর্ব্যক্তিক। এই নির্লিপ্তির উপরে জোর দিলে, কবিকে আর ভগবানের সঙ্গে তুলনা করা চলবে না, তার ধ্যান করতে হবে বিজ্ঞানের নিয়মাবলীরূপে। তার নিয়ম পাঠকদের সম্বন্ধে গড়পড়তা হিসেবে অকাট্য হলেও, তাতে ক'রে পাঠকবিশেষের পুরুষকার একেবারে নিষিদ্ধ নয়, শুধু সঙ্কুচিত। এর অধীনে এলেও, ব্যষ্টিহিসেবে কোনো পাঠককেই আপনার ভাগ্যনির্ব্বাচনের দাবি ছাড়তে হবে না, কেবল তার নির্ব্বাচনক্ষেত্র হবে পরিমিত। অনিশ্চয়বিধির কল্যাণে বিদ্যুৎকণামাত্রেই যেমন গোটা কয়েক সম্ভবপর অবস্থার যে-কোনো একটাকে আশ্রয় ক'রে স্থিতিশীল হতে পারে, তেমনি শেক্স্পীয়র্-এর প্রত্যেক পাঠকই মানসিক প্রতিক্রিয়ার নানান স্তর থেকে একটা যে-কোনো স্তরকে বেছে নিতে সক্ষম। কিন্তু তাড়িত হয়েও অপরিবর্ত্তিত থাকা অথবা একটা নির্দ্দিষ্টসংখ্যক অবস্থার বাইরে যাওয়া বিদ্যুৎকণার পক্ষে যেমন দুষ্কর, শেক্স্পীয়র প'ড়ে সিনেকার ধৈর্য্যবাদের ন্যায়সঙ্গতিকে বোধগম্য করাও তেমনি দুঃসাধ্য।

এই কথাটাকে ঘুরিয়ে বলা যায় যে বিষয়নির্ব্বাচনে কবির স্বাধীনতা যদিও অনন্ত, তবু বিষয়ের বৈচিত্র্যে কবিতার মৌলিকতা বা সাফল্য নির্ভর করে না। কারণ কাব্যের মুখ্য সম্বল হচ্ছে আবেগ, এবং আমাদের আবেগ-সংখ্যা যেহেতু অত্যল্প, তাই প্রসঙ্গের দিক দিয়ে কবিতা যতই অপূর্ব্ব হোক, ফলাফলের বিচারে তার মধ্যে একটা ধারাবাহিকতা দেখা যাবেই যাবে। এই ধারাবাহিকতার অনুসরণ করলে তথাকথিত সনাতন সত্যসমূহের সন্ধান মিলবে কিনা জানি না; কিন্তু একেই যদি পূর্ব্বোক্ত ঐতিহ্যের বহিঃপ্রকাশ ব'লে মানা যায়, তবে নিশ্চয়ই কোনো সাংঘাতিক ভুল হবে না। এই প্রবহমান ঐতিহ্যের সঙ্গে স্বকীয় প্রণালীর সঙ্গমসাধনই অব্যক্তির মরুভূমিকে সুফলা করার একমাত্র উপায়। ব্যক্তিগত অনুভূতি যখন অতিব্যক্তি আবেগের অন্তঃপ্রবেশে রসায়িত হয়ে ওঠে, তখনই তাকে রত্নগর্ভা বলা চলে, শুধু তখনই রূপের জন্ম সম্ভব। অবশ্য কচিৎ কখনো এক-আধজন লোক খাস কুয়োর জলেও এই অনুর্ব্বর জমিতে চাষ আবাদ ক'রে গিয়েছেন বটে, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাঁদের পরিশ্রম পণ্ড হয়েছে, নিয়মিত শস্যাবর্ত্তন তাঁদের

ভাগ্যে জোটেনি, এবং একদিন না একদিন অনাবৃষ্টির প্রকোপে তাঁরা মরেছেন অনাহারে। সে যাই হোক, যে-ঐতিহ্য ব্যক্তিত্বের অনিবার্য্য ঊষরতা থেকে কবিকে মুক্তি দেয়, তাকে মানবসভ্যতার নামান্তর ব'লে ভাবলে দোষ নেই ; মানুষের ভাবনা-বেদনার যত বিভিন্ন আকার-প্রকার যুগযুগান্তরের অবিরত সাধনায় পূর্ণাবয়ব হয়ে উঠছে, উক্ত ঐতিহ্য তারি আশ্রয়। কিন্তু মানবসভ্যতা যেহেতু মানবীয় আবেগের প্রাক্তন পটভূমিতেই লীলায়িত হয়ে ওঠে, এবং সভ্যতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভাবনা-বেদনার পরিপুষ্টি অবশ্যম্ভাবী হলেও, অনুভবপ্রসূ আবেগসমূহ যেহেতু নির্ব্বিকার ও নিত্য, তাই অনেকের মতে কবিদের উত্তরাধিকার মানুষিক চিৎপ্রকর্ষের চেয়েও পুরাতন, এত পুরাতন যে তাকে প্রায় অনাদ্যন্ত বললেও চলে।

এই রকম কোনো একটা সুসঙ্গত অভিমতের প্রচ্ছন্ন পৃষ্ঠপোষণেই য়েট্‌স্ কবিকল্পিত মানস প্রতীকগুলোকে বস্তুর চেয়েও বেশি বাস্তব, এবং মানুষের থেকেও অধিক বয়স্থ ব'লে ঘোষণা করেছেন। শত ইচ্ছা থাকলেও য়েট্‌স্-এর মতো ইন্দ্রজালে বিশ্বাস করা আমার সাধ্যের অতীত ; এবং প্লেটো-প্রবর্ত্তিত অতিমর্ত্ত্য লোক আমার চক্ষে সুন্দর ঠেকলেও, তার স্বপ্নস্বচ্ছ অসারতা আমি কোনোমতেই ভুলতে পারি না। কিন্তু মনের এইরূপ মূলগত পার্থক্য নিয়েও, প্রতীকের আপেক্ষিক অবিনশ্বরতা স্বীকার করা আমার পক্ষে শক্ত নয়। আমি প্রগতি-সম্বন্ধে নিরুৎসাহ ; আমার বিশ্বাস, মানুষের মনের গতি তার দেহপরিচ্ছেদের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত, এবং এই দেহে যখন কালান্তর অভাবনীয় বদল ঘটায়নি, তখন মনের আদিম অবস্থাগুলোও মোটের উপরে অপরিবর্ত্তিত আছে। এই ধারণার সাক্ষীস্বরূপ য়ুংকে ডাকা যেতে পারে। আধুনিক চিত্তবিকারের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি বারে বারে দেখেছেন যে কোনো কোনো মানসিক পীড়ায় বিংশ শতাব্দীর স্ত্রী-পুরুষ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এমন সমস্ত ছবি আঁকে যে সেগুলোর জোড়া খুঁজতে গেলে বিশেষজ্ঞদের যেতে হয় দু হাজার বৎসর আগেকার চৈনিক যোগীদের অঙ্কিত কুণ্ডলিনীচিত্রে।

বলাই বাহুল্য যে মতিভ্রান্তদের সঙ্গে যোগীদের উল্লেখ ক'রে ; আমি যোগসম্বন্ধে কোনো হঠোক্তির প্রশ্রয় দিচ্ছি না। যোগের বিষয়ে আমি

কিছুই জানি না ; কিন্তু জনশ্রুতি যদি একেবারে অবিশ্বাস্য না-হয়, তবে মানতে হবে যে অন্তত অবধানের পরিসরসঙ্কোচে মনোরোগীও যোগীর সমকক্ষ। অন্যত্র উন্মত্ততা ও তপস্যার মধ্যে যতই ব্যবধান থাকুক, এই মনোযোগ-হ্রাসের দ্বারা, এই একাগ্রতার কল্যাণে উভয় ক্ষেত্রেই চিৎশক্তির ব্যাপ্তি ঘটে, এবং মানুষ বুদ্ধির দাসত্ব থেকে মুক্তি পায়। ফলে যোগী ব্রহ্মসাযুজ্যে অধিকারী হন কিনা বলতে পারি না ; কিন্তু এটা প্রায় নিশ্চয় ক'রেই জানি যে উন্মাদেরা অবচেতনের নৈরাজ্যে আত্মহারা হয়ে যায়। আমাদের ব্যাবহারিক জীবন প্রধানত বুদ্ধিচালিত ; সেইজন্যেই যারা কর্ম্মক্ষেত্রেও অবচেতনার প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারে না, তাদের আমরা পাগল ব'লে থাকি। কিন্তু বস্তুত অবচেতন বা অচেতনের উপদ্রব থেকে কোনো ব্যক্তিই অব্যাহতি পায় না। তবে অবচেতন যেহেতু আমাদের লজ্জাকর আকাঙ্ক্ষার অজ্ঞাতবাস, তাই জাগ্রতাবস্থায় আমাদের সামাজিক বুদ্ধি অবচেতনের সংক্রমণ বাঁচিয়ে চলতে সাধ্যমতো চেষ্টা করে। কিন্তু ঘুমের আবেশে কিম্বা ঐকান্তিক অভিনিবেশের তন্ময়তায় আমাদের ইচ্ছাশক্তি যখন অবশ হয়ে পড়ে, তখন নির্নিগড় কল্পনা অথবা নিরতিশয় প্রেরণা দুর্লভের বশীকরণে বেরোয়, তখন চিন্তা চিত্রল হয়ে ওঠে, ভাব করে মূর্ত্তিপরিগ্রহ। এই সময়ে যে-সকল আলেখ্য মনের অন্তর্ভৌম দেশ থেকে চৈতন্যের বহিস্তলে ফুটে ওঠে, সেগুলোতে ব্যক্তিগত অনুষঙ্গের সংস্পর্শ থাকলেও তার ধরণধারণ চিরন্তন ; এবং ফ্রয়েড্ লেওনার্দো দা ভিন্‌চির স্বপ্নবিশেষের বিকলন ক'রে দেখিয়েছেন উক্ত স্বপ্নে লেওনার্দো যে-বিগ্রহাদির ব্যবহার করেছিলেন, সেইগুলোই মিসরের ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রচলিত ছিলো তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বে। লেওনার্দোর স্বপ্নটি যে যৌনসম্পর্কিত, সে-বিষয়ে ফ্রয়েড্ সন্দেহের অবকাশ রাখেননি ; এবং মিসরী পূজাপার্ব্বণের মিথুনিক ভিত্তিও আজ আর তর্কসাপেক্ষ নেই। সুতরাং এমন সিদ্ধান্ত হয়তো অনুচিত হবে না যে কেবল আবেগ নয়, আবেগের প্রকাশভঙ্গীও দেশ-কাল-পাত্রের অতীত। হয়তো এইজন্যেই, হয়তো প্রতীকমাত্রেই সার্ব্বজনীন ব'লে, মনোবিনিময় অসাধ্য হলেও, কবির বেদনা পাঠকের অগোচর থাকে না।

আমার কথার সমর্থনে মালার্মে-প্রমুখ ফরাসী কবিদের নাম নেওয়া যেতে পারে। প্রচলিত প্রথায় চিন্তাসম্বদ্ধ কবিতা লেখা ছেড়ে, তাঁরা যখন চিত্রপ্রধান কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, তখন প্রতীকের অনাত্ম্য স্বরূপই তাঁদের উদ্যোগকে উপহাস্য হতে দেয়নি। পক্ষপাতশূন্য সমালোচক-মাত্রেই মেনেছিলেন যে তাঁদের হেঁয়ালির অর্থবোধ সাধারণত দুষ্কর হলেও, তার দ্বারা ভাবিত হওয়া শুধু সম্ভবপর নয়, স্বাভাবিকও। প্রতীকীরা অবশ্য যোগচর্চ্চার ধার ধারতেন না; এবং অবচেতনার গুণকীর্ত্তন তখনো পর্য্যন্ত আধুনিকতার অপরিহার্য্য লক্ষণ হয়ে দাঁড়ায়নি। কিন্তু হিপ্‌নোসিস্‌-ঘটিত সম্মোহের সঙ্গে তাঁদের অল্পবিস্তর পরিচয় ছিলো। তাঁরা জানতেন যে ছন্দের এবং অতিচ্ছন্দ ধ্বনিতরঙ্গের সহায়তায় পাঠকের মনে অনুরূপ স্বপ্নাবস্থা উৎপন্ন করা যায়; তখন তার সামনে যদি কোনো প্রতীক উপস্থিত থাকে, তবে সেই প্রতীককে সে যতখানি একাগ্রভাবে ধ্যান করতে পারে, তা জাগরণকালে তার সাধ্যের অতীত। এর কারণ হয়তো খুব দুর্ব্বোধ্য নয়। আমরা যখন জাগি, তখন বাইরের অবাধ আক্রমণে আমাদের সকল ইন্দ্রিয় অস্থির থাকে। ফলে একটার উত্তেজনা আর একটার সঙ্গে মিশে যায়, এবং আমাদের প্রতীতিগুলো হয় অস্পষ্ট ও অস্থায়ী। কিন্তু কোনো উপায়ে যদি কতকগুলো ইন্দ্রিয়কে অবদমিত ক'রে দেওয়া যায়, তবে বাহ্যজগতের প্রবর্ত্তনা অন্তর্লোকে প্রবেশের অধিকাংশ পথই বন্ধ দেখে, যে একটা-দুটো দ্বার খোলা পায়, তারই সামনে ভিড় ক'রে জমে; এবং দশের প্রণোদনা একের ভোগ্য হয়ে, তার গভীরতা বাড়ে। ঘুমের মধ্যে দৃষ্টি, শ্রুতি, ঘ্রাণ, স্বাদ ইত্যাদি প্রায় লোপ পায়, তাই সে-অবস্থায় স্পর্শের প্রভাব অত বেশি; তখন ওই এক উদ্বোধকই সকল রকম উত্তেজনার সৃষ্টি করে। অঙ্গহানি ঘটলে মানুষের কোনো একটা শক্তির যে পরিপুষ্টি হয়, তার ব্যাখ্যাও বোধহয় এইখানে। যোগের সঙ্গে কাব্যের সাদৃশ্য এই ইন্দ্রিয়নিরোধ ব্যাপারে, এবং উভয়ের সংযমপ্রণালীতেও বোধহয় বেশি পার্থক্য নেই। উভয় প্রকরণেই পুনরাবৃত্তি অতিব্যবহৃত,—প্রাণায়ামে বিধিবদ্ধ নিঃশ্বাস নেওয়ার চেষ্টায় চিত্ত যেমন আর বিক্ষিপ্ত হবার অবকাশ পায় না, কাব্যেও ধ্বনিতরঙ্গ অনুসরণের প্রয়াসে মন তেমনি ক'রেই আত্মস্থ

হয়ে ওঠে ; এবং উভয় ক্ষেত্রেই একনিষ্ঠার শাসনে ইন্দ্রিয়বোধের যে-সংক্ষেপ সাধিত হয়, তারই ফলে আমাদের বহির্মুখী চৈতন্য চলে অন্তর্মুখে। অবশ্য এই দুই পদ্ধতির উদ্দেশ্য আলাদা,—যোগের সমাধি শেষ পর্য্যন্ত চৈতন্যকে উন্নীত করে, এবং কাব্যের সম্মোহনে চেতনা হারিয়ে যায় অবচেতনের নিরুদ্দেশে। কিন্তু তাহলেও, পরমাবধি, তা সে উপরেই মিলুক অথবা নিচেই মিলুক, তার প্রকৃতি সর্ব্বত্রই এক। ঊর্দ্ধগমনেও যেমন মুক্তি পাওয়া যায়, অধোগমনেও তদ্রূপ ; এবং শুদ্ধ চৈতন্য আর অচৈতন্য দুই যখন লোকোত্তর, তখন তাদের পদমর্য্যাদা নিয়ে তর্ক করা নিতান্ত নিষ্ফল।

আমি জানি আমার বক্তব্য যে-স্তরে এসে পৌঁছেছে, সেখানে নির্ব্বিকল্পতার চেয়ে বিপদের সম্ভাবনাই বেশি। প্রমাণের দিক দিয়ে মনোবিজ্ঞান এখনো পদার্থবিদ্যার সমতুল্য হতে পারেনি ; এবং অবচেতনায় বিশ্বাস ততটা যুক্তিসাপেক্ষ নয়, যতটা আস্থাপ্রসূত। হয়তো সেইজন্যই এ-প্রবন্ধ যাঁকে উপলক্ষ ক'রে লেখা, তাঁর কাব্যাদর্শে মনোবিজ্ঞানের পরিভাষা স্থান পায় না। এলিয়ট্ ফ্রয়েড্পন্থী মনোবিদ্দের বিদ্রূপ করেছেন, এবং ঐতিহ্যের সঙ্গে অবচেতনের সমীকরণে তাঁর সমর্থন নেই। তাঁর বিবেচনায় এই ঐতিহ্য ইতিহাসবোধ ও ধর্ম্মানুরক্তির যোগফল। তিনি মনে করেন যে ইতিহাসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় না-থাকলে, অনুকরণ আর উদ্ভাবনের মধ্যে তফাৎ করা যায় না। আমাদের যুগে, মানবসভ্যতার পাঁচ সাত হাজার বৎসর যখন অতীত হয়েছে, তখন স্বকীয়তার সম্ভবপরতা সামান্য হওয়াই স্বাভাবিক। বিচার ক'রে দেখলে আজকের দিনে আর আমূল নূতনের সাক্ষাৎ মিলবে না, পাওয়া যাবে শুধু পুরাতনের ধ্বংসাবশিষ্ট উপকরণে নির্ম্মিত অধুনাতনী অট্টালিকা। কিন্তু এখানেও স্বাতন্ত্র্যের অবকাশ অত্যল্প ; কারণ অট্টালিকার প্রয়োজনীয়তা এত সার্ব্বজনীন ও সর্ব্বকালীন যে তার মুখ্য রীতিও অখণ্ডনীয় হয়ে পড়েছে। নবতর সমাবেশ ও বিন্যাস, এ-ছাড়া নূতনত্ববিলাসীর আর গতি নেই। উপমা বদলে বলতে গেলে, এ-কথার অর্থ এই দাঁড়ায় যে আবেগ, যা কাব্যের মূলধন, তা আমরা পাই উত্তরাধিকারসূত্রে ; সে-দান বিনাবাক্যে গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য ; তবে তাকে যদি সুদে খাটিয়ে, আমাদের আয় আমরা বাড়াতে পারি, তাহলেই আমাদের স্ববুদ্ধি প্রশংসিত হবে। এই সুদ হচ্ছে আমাদের ভাবনা-বেদনা

এবং একেই বোধহয় প্রাচীন ভারতে হৃদয় বলতো। এর তটভূমিও যদিচ অবধারিত, তবু যুগ-যুগব্যাপী ভাবস্রোতের প্রবাহে এর প্রস্থ না-বাড়লেও, গভীরতা ক্রমশই অতলস্পর্শিতার দিকে চলেছে। এই হৃদয়ই স্বকীয়তার আশয়, কারণ এর পিছনে মানুষের বংশানুক্রমিক সংস্কারমাত্রই উহ্য নেই, তার সমাজ ও রাষ্ট্র, শিক্ষা ও দীক্ষা, স্বাস্থ্য ও স্বাচ্ছন্দ্য, সাধনা ও সংযম, সে-সমস্তই এতে প্রতিফলিত হচ্ছে। অতএব কবি তাঁর হৃদয়কে যতখানি বড় ক'রে তুলতে পারেন, তাঁর জাগতিক পরিমণ্ডলের যতখানি তাঁর কাব্যে পরিকীর্ণ হয়, সেই পরিমাণেই তিনি আমাদের নমস্য, সেই পরিমাণেই তিনি মৌলিক।

দুঃখের বিষয় ব্যাপারটাকে এভাবে দেখলেও বিশেষ-সাধারণের বিরোধ ঘোচে না ; কারণ অনুভব করা এবং বেদনাব্যঞ্জনা, এ-দুই ক্রিয়া সমান নয়, এদের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান। এ-কথা এলিয়ট্‌ও জানেন, এবং সমস্যাসমাধানের উপায় নির্দ্দেশে তিনি দ্বিধা করেননি। এ-প্রসঙ্গে তাঁর উক্তি যদিও আমার বক্তব্যের মতো জটিল ও অস্পস্ট নয়, তবু আমাদের মধ্যে খুব বেশি মতদ্বৈত নেই ব'লেই আমার বিশ্বাস। আমার মতো তিনিও মনে করেন যে একের সঙ্গে বহুর সালোক্য তখনই ঘটে, যখন আত্মনেপদী বাক্য পরস্মৈপদে রূপান্তরিত হয়, কর্ত্তা কর্ম্মে লোপ পায়, ভাব বিষয়াশ্রিত হয়ে ওঠে। কিন্তু আমি যেখানে পরমার্থময় বিবেচনায় প্রতীকের ব্যবহার আবশ্যিক মনে করি, তিনি সেখানে ঐতিহাসিকতার খাতিরে উদ্ধার করেন প্রাচীন কবিদের উক্তি। বস্তুত এখানেও কোনো মতবিরোধ নেই, আছে কেবল প্রতীক-শব্দের ব্যাপ্তি নিয়ে তর্ক। আমি তাকেই প্রতীক বলি, যার মধ্যে বহু মিশ্র ভাব একটি মূর্ত্তিতে সংহতি পায়, যার অনুগ্রহে বুদ্ধির মধ্যস্থতা না-মেনেও একের সংস্পর্শ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার পথে অন্যের মধ্যে প্রবেশ করে, যা আবেগের চালনে বা ধ্যানে ব্যক্তিনিরপেক্ষভাবে মানুষের মনে স্বসমুত্থ হয়ে ওঠে। প্রতীকের অভিধা যদি এই রকম ক'রে ছড়িয়ে দেওয়া যায়, তবে এলিয়টী বাক্যচৌর্য্যও এর অন্তর্গত হতে বাধ্য। কারণ প্রতীকের সাহায্যে ব্যক্তিগত বেদনা যেমন নৈর্ব্যক্তিক রূপরেখায় আবদ্ধ হয়ে, দুইটি স্বতন্ত্র সত্তার মধ্যে অনুকম্পনের সেতুবন্ধ গড়ে, তেমনি এলিয়ট্-এর মনোভাব দান্তের ভাষাকে অঙ্গীকার

ক'রে আপনার সসীমতাই কাটিয়ে ওঠে। উদ্ধারসঙ্কুল রচনারীতি আপাত-দৃষ্টিতে প্রাঞ্জলতার পরিপন্থী হলেও, সহজতাই তার উদ্দেশ্য; এবং সেইজন্যেই এলিয়ট্ প্রত্যাশা করেন যে বুদ্ধি দিয়ে বোঝার বহু পূর্ব্বেই তাঁর কবিতা পাঠকের চিত্তে অর্থের বীজ ছড়াবে। বলাই বাহুল্য এ-দাবি অন্যায় নয়, এতে কোল্‌রিজ্-এরও সমর্থন আছে। কিন্তু মনস্তাত্ত্বিকেরা বলে থাকেন যে অভ্যাঘাত যদি সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত হয়, তবে তার দ্বারা মনের উদ্বোধন প্রায় অসম্ভব। সুতরাং এমন সিদ্ধান্ত ছাড়া আমি উপায় দেখি না যে কবির বক্তব্যের সঙ্গে পাঠকের একটা স্বাভাবিক পরিচয় আছে; এবং এই প্রাক্তন পরিচয় অবচেতন ভিন্ন অন্য কোন্ স্তরে ঘটতে পারে, তা আমার জ্ঞানের অতীত।

অবশ্য এলিয়ট্ এ-কথায় সায় দেবেন না; তিনি বলবেন যে মানুষের সাম্য আদম-কৃত আদিম পাতকের উত্তরাধিকারে। এইজন্যেই তাঁর চক্ষে এগা-মেম্‌নন্ ও স্থইনি সমগোত্রীয়, নোসিকা ও ডরিস্ সমধর্ম্মী; এইজন্যেই 'ওয়েষ্ট্ ল্যাণ্ড্'-এ টাইপিষ্ট্ আর মসিজীবীর ব্যাভিচার এলিজাবেথ্ ও লেষ্টার্-এর প্রেমকাহিনীর সঙ্গে একনিঃশ্বাসে উচ্চারিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, পাপের প্রকৃতিতে সকল মানুষ যেমন সমান, পরিত্রাণের উপায়েও তারা অভিন্ন। এই উপায় অনুতাপ আর অগ্নিদীক্ষা, এবং এরি প্রচারকল্পে ভগবান যিশুর দেহে আবির্ভূত হয়ে আত্মোৎসর্গ করেছিলেন। অতএব মানুষ যদি খৃষ্ট-প্রদর্শিত পথ থেকে বিচ্যুত না-হয়, তবে আদর্শের ঐক্যে তার ব্যক্তিত্বের বাধা দূর হবে। কিন্তু এই রকম আদর্শনিষ্ঠা সকল কালেই বিরল, এবং আমাদের নাস্তিক যুগে তার চর্চ্চা একেবারেই অসাধ্য। এই কারণেই মনের সংবাদে বর্ত্তমান সাহিত্যের অপটুতা এত শোচনীয়। এই যুক্তির সারবত্তা স্বীকার করা যে অখৃষ্টানদের পক্ষে শক্ত, তাতে সন্দেহ নেই। সেইজন্যেই প্রসঙ্গত বলা দরকার যে লাইব্‌নিট্‌স্-এর মতো বিজ্ঞানবিদ দার্শনিকও মানবীয় আদান-প্রদানের ব্যাখ্যায় অনুরূপ মতবাদের শরণ নিয়েছিলেন। তাঁর পরিকল্পিত স্বতন্ত্র জীবকণাগুলি স্বভাবত পরস্পরবিরোধী হলেও, তারা সকলেই ব্রহ্ম-প্রসূত এবং ব্রহ্মাভিমুখী। তাই বিয়োগধর্ম্মে এই জীবাণুরা যদিচ অত্যাধুনিক পরমাণুপুঞ্জেরই প্রতিযোগী, তবু আরম্ভ ও সমাপ্তির সাযুজ্যবশত তাদের মধ্যে

একটা পরোক্ষ সম্বন্ধ শুধু সম্ভবপর নয়, অবশ্যম্ভাবীও। এই অনুমানের পিছনে হয়তো ন্যায়ের চেয়ে নিষ্ঠাই বেশি আছে; কিন্তু তাহলেও এতে কেবল খ্রীষ্টানী কুসংস্কারের ঘনান্ধকার দেখলে অন্যায় হবে। সকল সভ্য দেশের ধর্ম্মানুভূতির মূলেই এই একই অন্ধ বিশ্বাসের প্রকারান্তর মেলে, এবং ধর্ম্ম বলতে এলিয়ট্ যদিও মুখ্যত ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের মতামতকেই বোঝেন, তবু উপনিষদ, বৌদ্ধধর্ম্ম, কন্‌ফিউসিয়স্-এর উপদেশাবলী, মিসরী পূজাপদ্ধতি, এমনকি প্রাগৈতিহাসিক আচার-ব্যবহার থেকে তিনি একই মহাবাণী সংগ্রহ করেছেন।

আসল কথা হচ্ছে বিনা-আদর্শে শুধু কাব্যরচনা কেন, কোনো কার্য্যই সাধ্য নয়। এই আদর্শের শাখা-প্রশাখা নিয়ে যদিও অনেক তর্ক আছে, তবু এর স্বরূপ-সম্বন্ধে আস্তিক-নাস্তিক সকলেই প্রায় একমত। তবে আস্তিকেরা ব'লে থাকেন যে এই আদর্শের সূত্রগুলি বিভিন্ন ধর্ম্মের আপ্তবাক্যে স্বয়ম্ভূত হয়ে উঠেছে, এবং নাস্তিকেরা ওই সকল আপ্তবাক্যের মহার্ঘতা মেনে নিয়েও দাবি করেন যে উক্ত উপদেশাবলী আধিজৈবিক নয়, ওর তলায় তলায় লক্ষ লক্ষ বৎসরের জৈবিক ইতিহাস অব্যক্ত আছে। এই দুই দলের কোনো একটাতে কবি যোগ দিতে পারেন, কিন্তু একটা যেমন তেমন মূল্যজ্ঞান অর্জ্জন করা ছাড়া তাঁর গত্যন্তর নেই। কারণ যে-পথেই এই প্রতিমানে পৌঁছানো যাক, সাহিত্যে তার ফল অবিকার,—তারি সাহায্যে স্থূল অভিজ্ঞতা সূক্ষ্ম অনুভূতিতে পরিণত হয়, তারি শাসনে আবেগ বেগ হারিয়ে আধারের বশ্যতা মানে। অভিজ্ঞতা কেবল অভিজ্ঞতা হিসেবেই স্মরণীয় বা বরণীয় নয়, তার মধ্যে লোকে কেবল সেইটুকুই মনে রাখে এবং বুঝতে চায়, যেটুকু সর্ব্বসাধারণের উদ্দেশ্যসিদ্ধির সহায়ক। বলাই বাহুল্য, এই অনুশাসনের দ্বারা কবির নূতন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় নিষিদ্ধ হচ্ছে না, বরং এটা তাঁর অবশ্যকর্ত্তব্য হয়ে দাঁড়াচ্ছে। সাধারণ মানুষের জীবনবেদ সঙ্কীর্ণ, তার অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র নাতিবিস্তৃত, এমন অনেক জিনিস তার জানা উচিত, যার সাক্ষাৎ সে কোনোদিনই পায় না। এইগুলোই সে সাহিত্যের কাছে প্রত্যাশা করে। সুতরাং কবি যে কেবল বাস্তব অভিজ্ঞতা তার কাছে জ্ঞাপন করবেন, তা নয়, উপরন্তু তাঁকে অনেক সময়ে এমন অভিজ্ঞতার কল্পনা করতে হবে, যার

প্রতিভাসে পাঠকের চিত্তে প্রসাদ জাগে, সে জীবনের আর্য্যসত্যগুলোকে স্পষ্টতর ক'রে চিনতে পারে। অর্থাৎ উপরোক্ত মূল্যজ্ঞানের প্ররোচনায় কবিকে মাঝে মাঝে অভিনয় করতে হয়, তখন তিনি যে-ভূমিকায় অবতীর্ণ হন, তার সঙ্গে তাঁর বা দর্শকের চাক্ষুষ পরিচয় থাকে না। কিন্তু এমনি তাঁর মহানুভবতা, এতটা নৈর্ব্যক্তিক তাঁর চৈতন্য, এরূপ বিরাট তাঁর জাগতিক নিরীক্ষা যে এই অঘটনসংঘটন-কালেও তিনি সম্ভাব্যতার সীমা অতিক্রম করেন না।

এলিয়ট্ বোধহয় ওই ধরণের কবি নন, অন্ততপক্ষে তাঁর কাব্য এখনো তর্কাতীত উৎকর্ষে উঠতে পারেনি। কিন্তু তাঁর মূল্যজ্ঞান-সম্বন্ধে আমার শ্রদ্ধা আছে; যে-দার্শনিকতা কাব্যের উপকরণ না-হলেও, কবিপ্রতিভার শ্রেষ্ঠ সম্পদ, তাতে তিনি বিশেষভাবে বিত্তবান, এবং তাঁর বিদ্যা প্রগাঢ় ও বুদ্ধি অকুতোভয়। তাঁর কাব্যাদর্শে ছিদ্র অনেক, কিন্তু সে-আদর্শের প্রধান গুণ হলো এই যে তাকে বা তার থেকে উৎপন্ন কবিতাকে বুঝতে গেলে কাব্যের প্রকৃতি ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সমস্ত সমস্যার পুনরুত্থাপন অনিবার্য্য হয়ে পড়ে। এই অন্বেষণের পরে তাঁর সঙ্গে আমরা একমত হতে পারি কিনা, সেটা গণ্য নয়; এইটাই প্রণিধানযোগ্য যে তিনিই আমাদের মূর্চ্ছাগ্রস্ত বিচারবৃত্তিকে জাগিয়ে দেন। কাব্য জীবনের সমালোচনা—আর্নল্ড্-এর এই বিখ্যাত মন্তব্যের প্রতিবাদে এলিয়ট্ যদিও অনেক হঠোক্তি উচ্চারণ করেছেন, এবং রিচার্ড্স্-এর বিজ্ঞানসম্মত কাব্যার্চ্চনায় যদিও তিনি আস্থাহীন, তবু তাঁর গদ্যে পদ্যে যতখানি জিজ্ঞাসার সন্ধান পেয়েছি, তা আধুনিক কালে একান্ত দুর্লভ। হয়তো এইজন্যেই বর্ত্তমান ইংরেজি সাহিত্যে তাঁর প্রভাব এত পরিব্যাপ্ত, হয়তো এইজন্যেই তিনি ভবিষ্যতের স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত
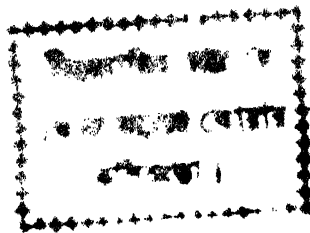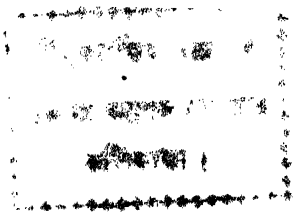
বৌদ্ধধর্ম্মের দান

(৪) মহাযান—নাগার্জ্জুনের মাধ্যমিক দর্শন

এ কথা পূর্ব্বেই বলেছি যে বৌদ্ধধর্ম্মের মূলসূত্রগুলির তত্ত্বনির্দ্দেশ করতে গিয়েই কালক্রমে নানা সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়, এই সব সম্প্রদায়কে সাধারণতঃ দুটি গণ্ডীভুক্ত করা হয়, একটি হীনযান, অন্যটি মহাযান। এই আখ্যার উদ্ভব মহাযানের আচার্য্যদের হাতে। তাঁদের আদর্শ হ'ল শুধু অর্হত্ব অর্থাৎ বৌদ্ধধর্ম্মের বিনয় ব্যবহার মেনে ও জপতপ করে পূজনীয় হওয়া নয়, একেবারে বুদ্ধত্বলাভ করা। অনেকে এ দুরাশা হৃদয়ে পোষণ করতে সাহসী হ'ন নি, কিন্তু মহাযান-পন্থী আচার্য্যেরা এ আশাকে মোটেই দুরাশা মনে করেন নি। বুদ্ধত্ব-লাভই তাঁদের শুধু একমাত্র কাম্য নয়, সে বুদ্ধত্বলাভে দশের সহায় হওয়াই হচ্ছে সব চেয়ে বড় আদর্শ, আর সে সহায় হ'তে গিয়ে যদি নিজেদের বুদ্ধত্বলাভে বিঘ্ন ঘটে তাতে কিছু যায় আসে না। এই জন্য এই আচার্য্যদের নিকট মৈত্রীই হ'ল সব চেয়ে বড় চর্য্যা, আর তাই মৈত্রেয় এসে অধিকার করলেন গৌতমবুদ্ধের স্থান। তাঁদের আদর্শের গণ্ডী অনেক বেশী প্রশস্ত বলেই নিজেদের মতবাদের তাঁরা আখ্যা দিলেন মহাযান, আর যাঁদের আদর্শ অর্হত্ব পর্য্যন্ত পৌঁছে থেমে গেল তাঁদের মতবাদের আখ্যা দিলেন হীনযান।

হীনযান ও মহাযান এই দুয়ের ভিতর কোনটি বেশী প্রচীন একথা বলা কঠিন, যে সব সম্প্রদায়কে হীনযান বলি তাদের শাস্ত্র মান্‌লে বলতে হয় যে হীনযানই প্রাচীন—আর মহাযান শাস্ত্র মান্‌লে স্বীকার করতে হয় যে বুদ্ধের বাণীর প্রথম থেকেই দুটো ধারা ছিল—ব্যবহারিক ও পারমার্থিক। যারা শ্রাবক, অর্থাৎ সাধনার চরম সোপানে উঠে পারমার্থিক সত্য উপলব্ধি করতে হ'লে যাদের বহু ব্রত আচরণ আবশ্যক তাদের আদর্শ হ'ল ব্যবহারিক জগতের, আর তা' অর্হত্বের চেয়ে বড় নয়, আর যারা সাধনায় অগ্রসর ও পারমার্থিক সত্যের উপলব্ধি যাদের দুরাশা নয়, তাদের পথ হ'ল পরমার্থের

পথ, আর সে পথের শেষ নিশানা হচ্ছে বুদ্ধত্ব। এ কথা বিশ্বাস করলে স্বীকার করতেই হবে যে প্রথম থেকেই দুটো গণ্ডীর সৃষ্টি হয়েছিল, একটি শ্রাবকদের, অন্যটি ছিল সাধনপথে যারা ছিল বেশী অগ্রসর তাদের। আর সব ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যেই যে প্রথম থেকে এ গণ্ডীর সৃষ্টি হয়ে থাকে তা'তে সন্দেহ নেই।

সুতরাং হীনযান মহাযানের কোনটি প্রাচীন তা বিচার করা সম্ভব নয়। হীনযানের দার্শনিক মতবাদ আমরা পূর্ব্বেই আলোচনা করেছি আর সে আলোচনায়, এটা স্পষ্টভাবেই ধরা পড়েছে যে সে মতবাদ পরিপুষ্টিলাভ করেছিল খৃষ্টীয় প্রথম দ্বিতীয় শতকের দিকে। মহাযানের যে দু'টি প্রধান মতবাদ—মাধ্যমিক ও যোগাচার তা'ও প্রায় ঐ সময়েই পরিপুষ্টিলাভ করে।

মাধ্যমিকের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছেন নাগার্জ্জুন। যতদূর প্রমাণ পাওয়া যায় তা'তে মনে হয় যে তিনি ছিলেন খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের লোক। তাঁর বাস ছিল বিদর্ভ দেশে আর অন্ধ্রদেশের রাজা সাতবাহনের সঙ্গে তাঁর বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। নাগার্জ্জুনের রচিত একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ এখনও চীনা ও তিব্বতী অনুবাদে সংরক্ষিত—গ্রন্থের নাম হচ্ছে 'সুহৃল্লেখ'; এই গ্রন্থ থেকে বোঝা যায় যে নাগার্জ্জুন তাঁর সুহৃৎ রাজা সাতবাহনকে পরামর্শ দেবার জন্যই এ গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। রাজা সাতবাহনকে খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের লোক ধরা হয়। নাগার্জ্জুন যে সব গ্রন্থে তাঁর দার্শনিক মত প্রচার করেন সেগুলি হচ্ছে—মাধ্যমিকশাস্ত্র, বিগ্রহব্যবর্ত্তনী ও মহাযানবিংশক। এ তিন গ্রন্থের কোনটিরই মূল পাওয়া যায় নি, পাওয়া গেছে তা'দের চীনা ও তিব্বতী অনুবাদ। ইউরোপীয় ও জাপানী পণ্ডিতদের চেষ্টায় সে সব অনুবাদ হ'তে নাগার্জ্জুনের মতবাদ উদ্ধার করা হয়েছে। নাগার্জ্জুনের পরে যে সব আচার্য্য মাধ্যমিকশাস্ত্র আলোচনা করেন তাঁদের মধ্যে আর্য্যদেব, চন্দ্রকীর্ত্তি, ও শান্তিদেব প্রসিদ্ধ। আর্য্যদেব ছিলেন তৃতীয় শতকের আর শান্তিদেব সপ্তম শতকের লোক। চন্দ্রকীর্ত্তি শান্তিদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী। আর্য্যদেবের প্রধান গ্রন্থ হচ্ছে শতশাস্ত্র ও চতুঃশতক।

চীনা অনুবাদ থেকে শতশাস্ত্রের ও নেপালের এক খণ্ডিত পুঁথি ও তিব্বতী অনুবাদের সাহায্যে চতুঃশতকেরও প্রায় সম্পূর্ণ উদ্ধার করা হয়েছে। শান্তিদেবের দু'খানি গ্রন্থ, বোধিচর্য্যাবতার ও শিক্ষাসমুদয় দুখানিরই মূল পাওয়া যায়। চন্দ্রকীর্ত্তি যে সব গ্রন্থ রচনা করেন তার মধ্যে মাধ্যমিকাবতার ও প্রসন্নপদা প্রধান। 'প্রসন্নপদা' হচ্ছে নাগার্জ্জুনের মাধ্যমিকশাস্ত্রের টীকা, এই টীকা ও তৎসঙ্গে মাধ্যমিক শাস্ত্রের উদ্ধৃত অংশের মূল পাওয়া গিয়েছে। এই সব শাস্ত্রের আলোচনা করলেই মাধ্যমিক মতবাদের সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়।

ইতিপূর্ব্বে আমি বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিক দর্শনের যে আলোচনা করেছি তাতে দেখিয়েছি যে বৈভাষিকেরা ধর্ম্মের (phenomenon) অস্তিত্বে ও বস্তুত্বে বিশ্বাস করেন আর সৌত্রান্তিকেরা তা'কে মনে করতেন শূন্যস্বভাব বা অলীক। তাঁদের মতে আমাদের বিজ্ঞান-প্রবাহেই ধর্ম্মের অস্তিত্ব—আর সে ধর্ম্মের জ্ঞান প্রত্যক্ষ নয় অনুমেয়। বৈভাষিকের মতে নির্ব্বাণ বাস্তব, অনাশ্রব আনন্দময় অবস্থা ও ভাবস্বভাব, আর সৌত্রান্তিক মতে নির্ব্বাণ অবস্তুক, ও অভাব-স্বভাব, অর্থাৎ unreal ও negative। এ দুটির একটিকে বলা চলে 'শাশ্বতবাদ', অন্যটিকে 'উচ্ছেদবাদ'।

মাধ্যমিক এ দুটি মতবাদের কোনটিই গ্রহণ করল না, সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করে দেখাল যে একটি মধ্যপথ অবলম্বন করা সম্ভব। সেই কারণেই তার আখ্যা হ'ল মাধ্যমিক। ব্যবহারিক হিসাবে আমরা বৌদ্ধসূত্রগ্রন্থে 'মধ্যমা প্রতিপদের' উল্লেখ পাই, এই 'মধ্যমা প্রতিপদের' বিশেষ অর্থ হচ্ছে যে ভোগসুখ, বা কঠোর দৈহিক ক্লেশের কোনটার ভিতর দিয়েই অর্হত্ব লাভ হয় না। 'মধ্যমা প্রতিপদ' বা মধ্যপথ অবলম্বন করাই হচ্ছে বুদ্ধের অনুমোদিত পথ। সেইজন্য বুদ্ধ বোধিবৃক্ষের তলায় বসে যখন কঠোর অনশনে তপশ্চর্য্যা করছিলেন তখন তিনি বোধিলাভ করেন নি, বোধিলাভ করলেন তখন যখন তিনি কঠোর অনশন পরিত্যাগ করে গোপকন্যার দেওয়া পায়স ভক্ষণ করলেন। এ 'মধ্যমা প্রতিপদ' নাগার্জ্জুনের 'মাধ্যমিক' না হ'লেও এ দুটিকে সম্পূর্ণ পৃথকভাবে দেখা চলে না।

নাগার্জ্জুনের মতে পরমার্থসত্যের আলোচনা করতে গেলে অস্তি-

নাস্তি, নিত্য-অনিত্য, আত্মা-অনাত্মা, প্রভৃতি অন্তিম বাক্যের কোনটিই সত্য নয়। পরমার্থ সত্যকে এ দু'টির কোনটি দিয়েই ব্যাখ্যা করা চলে না—কারণ 'অস্তি' বললে বস্তুকে শাশ্বত স্বীকার করা হয় আর 'নাস্তি' বললে তাকে সম্পূর্ণভাবে উড়িয়ে দেওয়া হয় কিন্তু বুদ্ধবচনের যা তত্ত্ব তা' মানলে এর কোনটিই স্বীকার করা চলে না (অস্তীতি শাশ্বতগ্রাহো নাস্তীত্যুচ্ছেদ-দর্শনম্।...শাশ্বতোচ্ছেদনির্ম্মুক্তং তত্ত্বং সৌগতসম্মতম্)।

নাগার্জ্জুন তাঁর এই দার্শনিক মত স্থাপনা করতে গিয়ে যে ন্যায়ের তর্ক অবলম্বন করলেন তা অতি সূক্ষ্ম—এত সূক্ষ্ম যে তা ইউরোপীয় পণ্ডিত-দেরও চমক লাগিয়েছে। নাগার্জ্জুনের দার্শনিক মতের মূলসূত্র হচ্ছে শূন্যতা। এই শূন্যতাকে কোন প্রতিশব্দ দিয়ে বুঝানো কঠিন। তাই ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা এ শব্দের অনুবাদ করেছেন, Vacuity, Non-Substance, Universal Relativity.

বৈভাষিক সৌত্রান্তিকদের মতে ধর্ম্মের (phenomenon) উৎপত্তির কারণ হচ্ছে প্রত্যয়—অর্থাৎ পূর্ব্ববর্ত্তী ধর্ম্মকে কারণ স্বরূপে অবলম্বন করেই পরবর্ত্তী ধর্ম্মের উৎপত্তি হয়, আর সেই উৎপত্তির সঙ্গেই পূর্ব্ববর্ত্তী ধর্ম্মের বিনাশ হয়। কিন্তু এর উত্তরে নাগার্জ্জুনের প্রথম কথা হল যে ধর্ম্ম অথবা ভাবের উৎপত্তি নাই, বিনাশও নাই—তার কারণ যে সব ধর্ম্ম বা ভাবকে কোন পরবর্ত্তী ধর্ম্মের হেতু-প্রত্যয় হিসাবে গ্রহণ করা হয় তার ভিতর সে ধর্ম্মের স্বভাবের কোন খোঁজ পাওয়া যায় না। সেই জন্য পরভাব বা অন্য ধর্ম্ম হ'তে কোন ধর্ম্মের উৎপত্তি সম্ভব নয়। আর বস্তুতঃ কোন ধর্ম্মের স্বভাব নাই বলেই অন্য ধর্ম্মেরও স্বভাব থাকা সম্ভব নয়। ধর্ম্মের এই উৎপত্তি নাই বলেই তার নাশও নাই। কিন্তু তাহ'লে কি ধর্ম্মকে শাশ্বত (eternal) বলা চলে? নাগার্জ্জুন তার উত্তরে বলেন যে ধর্ম্ম যে অনিত্য, তার যে স্থিতি নাই এ কথা ত বৌদ্ধদর্শনের মূল কথা, আর ধর্ম্মের সে অনিত্যতা সম্বন্ধে কোন সম্প্রদায়েরই সন্দেহ নাই। বীজ ও অঙ্কুরের উদাহরণ নিলে দেখা যায় যে বীজ ও অঙ্কুরের কোন সত্যকার উৎপত্তি নাই। তারা হচ্ছে পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থার পরিণতিমাত্র। তাদের কোন সত্যকার বিনাশও নাই কারণ তাদের তথাকথিত বিনাশের সঙ্গেই অন্য বীজাঙ্কুরের

উদ্ভব হয়। আর সে বীজাঙ্কুরের কোন স্থিতিশীলতাও নাই কারণ তার অনন্ত পরিণতি চলছে, সে পরিণতিও প্রকৃত পরিণতি নয় কারণ তা একই গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ, তার একত্ব নাই কারণ নিরন্তর বহু নূতন বীজাঙ্কুরের সৃষ্টি হচ্ছে আর বহুত্বও নাই কারণ মূলতঃ তারা একই জাতির ভিতর আবদ্ধ।

ধর্ম্মসমূহের উৎপাদ, স্থিতি ও ভঙ্গ বা বিনাশে বিশ্বাস করলে কালকেও (time) তিনটি ভাগে বিভক্ত করতে হয় আর এ-তিনটি ভাগ হচ্ছে গত আগত ও গম্যমান (past, future and present)। এই গতি বাদ দিলে কালের ধারণাকেও বাদ দিতে হয়। কিন্তু নাগার্জ্জুনের মতে এ গতিও নাই। যে কাল গত হয়েছে (past) তার কোন গতি নাই, আগত কাল অর্থাৎ যে কাল আসবে (future) তার গতি সম্বন্ধেও কোন কথা উঠতে পারে না। সুতরাং কথা উঠ্‌তে পারে গম্যমান বা present সম্বন্ধে। কিন্তু গত ও আগতের কথা বাদ দিলে গম্যমান কালের গতির কথাও ওঠে না, সুতরাং সে কাল হচ্ছে গতিহীন। সেই কারণেই কালের কোন আরম্ভও নাই শেষও নাই, সে কালকে স্থির বা গতিহীন বলাও চলে না, কারণ গতির ধারণা না থাকলে গতিহীনের ধারণা করা অসম্ভব।

ন্যায়ের এই কূটতর্কে নাগার্জ্জুন, ষড়ায়তন, পঞ্চস্কন্ধ ও ধাতু প্রভৃতিরও অস্তিত্ব ও বস্তুত্বও অপ্রমাণ করেছেন। হীনযানের মতে ষট্‌ধাতুই হচ্ছে মানুষের ব্যক্তিত্বের মূল। এই ষট্‌ধাতু হচ্ছে চতুর্মহাভূত, আকাশ ও বিজ্ঞান। এই ষট্‌ধাতুর মধ্যে আকাশ ও নির্ব্বাণ অসংস্কৃত অর্থাৎ অহৈতুকী ও আস্রবমুক্ত। অন্য ধাতুগুলি হচ্ছে সংস্কৃত এবং আস্রবমুক্ত নয়। নাগার্জ্জুনের মতে ধাতুগুলির সম্বন্ধে অস্তি-নাস্তি বা সংস্কৃত-অসংস্কৃত কিছুই বলা চলে না। বস্তুতঃ এগুলি আকাশের ন্যায় শূন্যগর্ভ—পরমার্থতঃ তারা শূন্যতা ব্যতীত আর কিছুই নয়।

বৈভাষিক-সৌত্রান্তিক মতে ধর্ম্মকে তিনটি ক্ষণ বা মুহূর্ত্তঅনুসারে ভাগ করা যায়—এ তিনটি ক্ষণ হচ্ছে যথাক্রমে উৎপাদ, স্থিতি ও ভঙ্গের। এই উৎপাদ, স্থিতি ও ভঙ্গ বা বিনাশই হচ্ছে ধর্ম্মের লক্ষণ। কিন্তু নাগার্জ্জুনের মতে এ লক্ষণগুলিও অলীক। কারণ এ তিন লক্ষণের

পরিকল্পনা হয় অখণ্ড ভাবে না হয় পৃথক পৃথক ভাবে সম্ভব। কিন্তু অখণ্ডভাবে সে লক্ষণগুলির পরিকল্পনা হয় না কারণ সেগুলি একই স্থানে বা একই কালে ঘটে না। পৃথক ভাবেও তাদের উপলব্ধি সম্ভব নয় কারণ পরস্পরকে অবলম্বন করেই হচ্ছে তাদের ঘটনা। উদাহরণ স্বরূপে বিচার করা যাক আলোকের উৎপাদ-স্থিতি-ভঙ্গ আছে কিনা। আলোকের উৎপাদ আছে একথা প্রমাণযোগ্য নয়। কারণ অন্য বস্তুকে আলোকিত করবার পূর্ব্বে আলোকের উৎপত্তি হয় একথা বলা যায় না। এমন কোন মুহূর্ত্তের পরিকল্পনা সম্ভব নয় যখন আলোক শুধু নিজেকেই আলোকিত করে। সুতরাং আলোকের উৎপত্তি আলোকিত বস্তুর উৎপত্তির পূর্ব্বে হয়েছে একথা বলা যায় না। আলোকের উৎপত্তি অন্ধকারকে দূরীভূত করে একথা বললে প্রশ্ন ওঠে যে সেই উৎপত্তির কোন্ মুহূর্ত্তে সে অন্ধকারকে দূর করে। অলোকের উৎপত্তি ও অন্ধকারের বিনাশ এ দু'টি ব্যাপার একই সময়ে ঘটে—একটির জন্য অন্যটি ঘটে একথা বলা চলে না তার কারণ এ দু'টির কোন সন্ধিক্ষণ পরিকল্পনা করা যায় না। সুতরাং আলোকের উৎপত্তি বলে কিছু নাই—তার সম্বন্ধে শুধু এইটুকু বলা চলে যে কোন বিশিষ্ট মুহূর্ত্তে আলোক 'অস্তি'। প্রশ্ন উঠ্‌তে পারে যে আলোকের এই 'অস্তি'-অবস্থার পূর্ব্বে একটা ক্রমশঃ দৃশ্যমান অবস্থা ছিল কি? নাগার্জ্জুন বলেন যে তাও অসম্ভব কারণ দৃশ্যমান হবার সঙ্গেই তার সম্পূর্ণ উদয় হয়ে যায়। কাল সম্বন্ধে বিচারে নাগার্জ্জুন প্রমাণ করেছেন যে গত ও আগত বলে কিছু নাই, আর সেই হিসাবেই অনেকেরও ভূত ভবিষ্যৎ বলে কোন অবস্থা পরিকল্পনা করা যায় না। সুতরাং শুধু তার 'অস্তি' বা বর্ত্তমান অবস্থা আছে—যাকে বলা যায় স্থিতি। আর এই স্থিতিকে বৌদ্ধধর্ম্ম সর্ব্বপ্রথমে অস্বীকার করেছে—বলেছে সমস্তই অনিত্য ও পরিণতিশীল। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে নাগার্জ্জুনের মতে উৎপাদ ও স্থিতি বলে কিছু নাই। তাহ'লে ভঙ্গ বা বিনাশ আছে কি? নাগার্জ্জুন বলেন যে সে বিনাশের পরিকল্পনাও অলীক। কারণ যার বিনাশ হয়ে গেছে তার বিনাশ সম্বন্ধে কোন কথা ওঠে না—যার এখনও বিনাশ হয় নি তার বিনাশ সম্বন্ধেও কোন কথা উঠ্‌তে পারে না—আর "বিনাশ হচ্ছে" এরূপ কোন অবস্থারও কল্পনা সম্ভব নয়। ক্রমশঃ

দৃশ্যমান বলে যেমন কোন অবস্থা নাই ক্রমশঃ বিনশ্যমান বলেও তেমনি কোন অবস্থা নাই। পরমার্থতঃ কোন বস্তুরই বিনাশ সম্ভব নয় কারণ তাহ'লে তা'র পরিণতির এমন একটা অসম্ভব অবস্থা পরিকল্পনা করতে হয় যখন স্থিতি ও বিনাশ যুগপৎ ঘটে। সুতরাং নাগার্জ্জুনের মতে ধর্ম্মের উৎপাদ স্থিতি ও ভঙ্গ কিছুই নাই। হেতু-প্রত্যয় দিয়ে যে জগৎকে বুঝবার চেষ্টা করা হয় সে শুধু গন্ধর্ব্বনগর বা স্বপ্নের জগৎ।

আমরা পূর্ব্বেই দেখেছি যে হীনযান মতে পুদ্‌গল বা আত্মা নাই বটে কিন্তু ধর্ম্ম আছে অর্থাৎ কারক নাই কিন্তু কর্ম্ম আছে। বেদান্ত মতে আত্মা বা কারক আছে কিন্তু কর্ম্মজগৎ নাই। নাগার্জ্জুনের মতে কারক কর্ম্ম কিছুই নাই। এই মত স্থাপন করবার জন্য তিনি যে যুক্তি দিলেন তা' অত্যন্ত অদ্ভুত মনে হ'লেও তা'র উত্তর নাই। হীনযানের বিরুদ্ধে তিনি বললেন যে যদি পুদ্‌গল বা কারকই না থাকে তাহ'লে একটা সত্যকার কর্ম্মজগতের উদ্ভব হচ্ছে এ কথা বলার কোন অর্থ নাই, অর্থাৎ গ্রাহকের অস্তিত্ব স্বীকার না করলে গ্রাহ্যবস্তুর অস্তিত্বও স্বীকার করা সম্ভব নয়। বৈদান্তিক মতের বিরুদ্ধে তিনি বললেন যে যদি কারকের সত্যকার অস্তিত্ব ধরা যায় তাহ'লে সে কারক অলীক কর্ম্ম-জগতের সৃষ্টি করছে তা বলা চলে না। গ্রাহকের অস্তিত্বে বিশ্বাস করলে গ্রাহ্যের অস্তিত্বে বিশ্বাস না করা চলে না। সংক্ষেপে বলতে গেলে, যদি কর্ম্ম থাকে আর কারক না থাকে তাহ'লে সে কর্ম্মের উৎপত্তি বোধগম্য হয় না আর যদি কারক থাকে আর কর্ম্ম না থাকে তাহ'লে উৎপত্তিও থাকে না। সুতরাং এ দুটি মতের প্রত্যেকটিই যুক্তিহীন। বস্তুতঃ কারক কর্ম্ম কোনটিরই অস্তিত্ব স্বীকার করা চলে না। এখন প্রশ্ন হ'তে পারে যে কারক-কর্ম্ম যদি কিছুই না থাকে তাহ'লে তাদের আভাস আসে কোথা থেকে। এর উত্তরে নাগার্জ্জুন বৌদ্ধধর্ম্মের মূলসূত্র প্রতীত্যসমুৎপাদের শরণাপন্ন হয়েছেন। প্রতীত্যসমুৎ-পাদের হিসাবে এ আভাসের উৎপত্তি হয় প্রত্যয় (Conditions) হ'তে। সুতরাং কারক ও কর্ম্মের কোন সত্যকার উৎপত্তি নাই, আছে শুধু আভাস আর সে আভাসের অস্তিত্বও relative এবং পরমার্থতঃ এ সবের প্রকৃত স্বভাব বলে কিছু নাই—আছে শুধু শূন্যতা।

কারক ও কর্ম্ম যদি না থাকে তাহ'লে সংসার আছে কিনা এ প্রশ্নও ওঠে। হীনযানের মতে সংসার আছে—কিন্তু তার প্রারম্ভ বা আদি নাই। হীনযানের সেই কথা ন্যায়ের বিচারে ফেলে নাগার্জ্জুন বললেন যে যদি সংসারের আদি না থাকে তাহ'লে সে সংসারের অন্তও নাই—আর আদি অন্ত না থাকলে তা'র মধ্যের পরিকল্পনাও সম্ভব নয়। সেই হিসাবে জন্ম জরা ও মৃত্যু কিছুই নাই। সুতরাং যে দুঃখ সেই সংসারের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন-ভাবে সংবদ্ধ সে দুঃখেরও কোন অস্তিত্ব স্বীকার করা চলে না। সেই হিসাবেই কর্ম্মফল, পাপ-পুণ্য, শুচি-অশুচি, রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ, গ্রাহ্য-গ্রাহক প্রভৃতি কিছুরই অস্তিত্ব নাই—এ সমস্তই শূন্যগর্ভ।

এ কথা যদি সত্য হয় তাহ'লে বৌদ্ধধর্ম্মের মূলসূত্রের কোন অর্থ থাকে না, বুদ্ধবচনও অলীক হয়ে দাঁড়ায়। বুদ্ধ চারটি আর্য্যসত্য সম্বন্ধে উপদেশ দিয়েছেন আর সেই সম্পর্কে বলেছেন যে সংসার দুঃখময়। সংসারের মূলে রয়েছে কর্ম্ম ও কর্ম্মফল আর সে সংসার হ'তে মুক্তিলাভ করতে গেলে সদ্ধর্ম্ম অবলম্বন করা আবশ্যক। অথচ নাগার্জ্জুনের মতে দুঃখ, সংসার, কর্ম্ম, কর্ম্মফল এ সব কিছুই নাই। তা হ'লে বুদ্ধবচন কি মিথ্যা? এর উত্তরে নাগার্জ্জুন বলেন যে বুদ্ধবচন মিথ্যা নয়। প্রথম হ'তেই তার দুটি বিভিন্ন ধারা আছে, একটি হচ্ছে ব্যবহারিক অন্যটি পারমার্থিক। প্রথমটির আবশ্যক হচ্ছে লোক-ব্যবহারের জন্য আর তার উদ্দেশ্য হচ্ছে সাধনমার্গে যারা অনুন্নত অর্থাৎ শ্রাবক তাদের চালিত করা। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে যারা উন্নত সাধক, যারা গভীর রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে চায় তাদের জন্য। সুতরাং ব্যবহারিক হিসাবে দেখলে, দুঃখ, সংসার, কর্ম্ম, কর্ম্মফল, প্রভৃতি সবই আছে, কিন্তু পরমার্থতঃ এ সমস্তই শূন্য। স্বভাব-শূন্যতাই হ'ল একমাত্র সত্য আর তা' না বুঝলে জগতের প্রকৃত রহস্যভেদ করা যায় না, নির্ব্বাণ লাভ করাও সম্ভব হয় না।

কিন্তু সে নির্ব্বাণ কি? যদি সমস্তই শূন্য হয়, যদি ধর্ম্ম-সমূহের উৎপাদ স্থিতি ও ভঙ্গ না থাকে, যদি দুঃখ ও সংসার অলীক হয় তাহ'লে কিসের নিরোধ ও প্রহাণ হ'বে? অথচ দুঃখ ও ক্লেশের নিরোধ ও প্রহাণেই নির্ব্বাণ। এর উত্তরে নাগার্জ্জুন বলেন যে নির্ব্বাণে নিরোধ

প্রহাণ কিছুই নাই, আর নির্ব্বাণের উৎপাদ নাই বিনাশও নাই। নির্ব্বাণ ভাবস্বভাব নয়, কারণ ভাবের পরিণতি আছে। অথচ নির্ব্বাণ অভাবস্বভাবও নয় কারণ অভাবের কোন অস্তিত্বই নাই। যখন ধর্ম্মের উৎপাদ ভঙ্গ কিছুই হয় না—ধর্ম্মসন্তানের সেই অপ্রবৃত্তিই হচ্ছে নির্ব্বাণ। সেই উপশান্ত অবস্থা ভাবস্বভাবও নয়, অভাবস্বভাবও নয়, অথচ তাকে নিরোধ বলা চলে না কারণ তার পর ধর্ম্মের আর কোন ক্রিয়া থাকে না—সে অবস্থা হচ্ছে supraphenomenal; সুতরাং পরমার্থতঃ সংসার ও নির্ব্বাণে কোন প্রভেদ নাই। সংসারের অসংস্কৃত অবস্থা বা স্বভাবশূন্যতাই হচ্ছে নির্ব্বাণ। নির্ব্বাণ = অসংস্কৃত সংসার = স্বভাবশূন্যতা।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী

বিদেশে অর্থনীতি ও সংখ্যাশাস্ত্রের গবেষণা-পদ্ধতি *

আমাদের দেশে সংখ্যাশাস্ত্রের (Statistics) চর্চ্চা বেশী দিন হ'চ্ছে না বটে কিন্তু অর্থনীতির (Economics) চর্চ্চা অনেকদিন সুরু হ'য়েছে। অথচ এতদিনেও অর্থনীতির গবেষণা ভাল রকমে হয় নি। ভারতবর্ষে মোট ১৮টি বিশ্ববিদ্যালয় আছে। সবগুলিতেই অর্থনীতি পড়ানর ব্যবস্থা আছে। কতকগুলিতে বাণিজ্যনীতি (Commerce) অধ্যাপনার বন্দোবস্তও র'য়েছে। অথচ গবেষণা কত অল্প! আবার যে সব গবেষণা এতাবৎকাল প্রকাশিত হ'য়েছে সেগুলির বেশীর ভাগই ইতিহাস বা বর্ণনা মাত্র। বিষয়ও খুবই সঙ্কীর্ণ। হয় ব্যাঙ্কিং কারেন্সি (Banking and Currency), না হয় বাণিজ্য সম্বন্ধে। অর্থনীতির তত্ত্ব (theory) সম্পর্কীয় কাজ নাই ব'ললেই চলে। অপর দিকে যাতে রাশির বা মাপজোকের ব্যাপার আছে, অর্থাৎ Quantitative Economics-এর কাজ খুবই কম। বিদেশে বিশ্ববিদ্যালয়, বাণিজ্য, শিল্প, গভর্মেণ্ট আফিস, গবেষণা সমিতি এ সবের মধ্যে একটা সুসঙ্গত শৃঙ্খলা আছে। এই সুসঙ্গত পদ্ধতিটিই (organisation) আমার সব চেয়ে চমৎকার লেগেছে। আজ সেই কথাটাই আপনাদের ব'লতে চাই।

সুসঙ্গত পদ্ধতির কথা এত জোর দিয়ে এভাবে বলা আপনাদের কাছে একটু খাপছাড়া লাগ্‌ছে হয়ত। আমার কিন্তু মনে হয় ঐ organisation জিনিষটি আমাদের জাতি এতদিনেও ঠিকভাবে আয়ত্ত ক'রতে পারে নি ব'লেই আমাদের নানা প্রচেষ্টা জয়যুক্ত হ'তে পারে না। অন্য সব ব্যাপারের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। শুধু গবেষণার কথাটাই একটু ব'লতে চাই। এখন আমাদের দেশের গবেষণা কি রকমের জানেন? যেন একই লোক

---

* ভারতীয় সংখ্যাসমিতির (Indian Statistical Institute) Statistical Colloquiumএ ৭ই জুলাই, ১৯৩৪ সালে প্রদত্ত বক্তৃতার অনুলিপি।

প্রস্পেক্টিং (prospecting) ক'রে খনিজ পদার্থের খোঁজ ক'র্‌বে, সেই লোকই সেটি থেকে ধাতু বার ক'র্‌বে, আবার সেই লোকই ধাতু দিয়ে অলঙ্কার গড়াবে, এবং সব শেষে সেই লোকই সে অলঙ্কার বেচ্‌বে। এতগুলি কাজ একই লোককে ক'র্‌তে হ'লে কোনও কাজই ঠিক মত হয় না। আমাদের দেশের গবেষণা যে ভালো মতে হচ্ছে না তার এইটেই প্রধান কারণ ব'লে আমার মনে হয়। বিদেশে এ বিষয়ে কি বন্দোবস্ত আছে সেটি আমাদের প্রণিধান করা উচিত।

ইয়ুরোপে গবেষণার মোটামুটি দুটি প্রথা। অবশ্য এর চেয়ে বেশী প্রথার কথাও বলা যেতে পারে,—কিন্তু সেগুলি এ দুটিরই প্রকার-ভেদ মাত্র। প্রথমটি হ'চ্ছে এক প্রতিষ্ঠানের সাহায্যেইটি সব গবেষণার কাজ চালান,—অর্থাৎ কৈন্দ্রিক প্রথা (centralisation); দ্বিতীয়টি হ'চ্ছে অনেক-গুলি প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে কিন্তু পরস্পরে সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে গবেষণার কাজ চালান, অর্থাৎ কেন্দ্রাতিগ প্রথা। প্রথমটির উদাহরণ স্বরূপে প্যারিসের বাণিজ্য সমিতির (Chamber of Commerce) কথা ব'ল্‌তে পারি। দ্বিতীয়টির দৃষ্টান্ত ইংল্যাণ্ডে অনেক আছে।

প্যারিসের বাণিজ্য সমিতি অন্য দেশের বাণিজ্য সমিতির মত নয়। এটি গভর্মেণ্টের ব্যাপার। ফ্রান্সের শিল্প, বাণিজ্য সব কিছু এতেই সংশ্লিষ্ট। সাধারণতঃ বাণিজ্য সমিতির যা' যা' কাজ, যথা বাণিজ্যের প্রসার এবং ব্যবসায়ীদের সাহায্য, এ ছাড়া অন্য অনেকগুলি কাজের ভার এই সমিতির উপরে আছে। তা'র মধ্যে এখানে শুধু লেখাপড়া এবং গবেষণার কথাই বলি। এঁদের লাইব্রেরীটি চমৎকার। যে গ্রন্থসূচীগুলি এই সমিতি আমাদের ভারতীয় সংখ্যা সমিতির (Indian Statistical Institute) গ্রন্থাগারের জন্যে উপহার দিয়েছেন তা'র থেকে সহজেই বোঝা যায় এঁদের লাইব্রেরী কত ভালো এবং এঁদের কাজ কত ব্যাপক। নানা দেশ থেকে নানা ভাষাতে যে সব বই, সাময়িক পত্রিকা, এবং সরকারী রিপোর্ট মাসে মাসে বাণিজ্য সমিতিতে সংগৃহীত হ'চ্ছে তাদের একটা বিষয়ানুক্রমিক সূচী প্রতি মাসেই ছাপা হয়। বিভিন্ন পত্রিকাতে প্রকাশিত প্রয়োজনীয় সব প্রবন্ধের সূচীই এতে আছে, এর নাম সেজন্যে "Bibliographic।" এটি

আমাদের "সংখ্যার" পরিবর্ত্তে এঁরা বরাবর পাঠাবেন ব'লেছেন।* এই রকম বিষয় সূচী দেখে নিতে পার্‌লে কোনও বিষয়ে তথ্য সংগ্রহে দেরী হয় না। এখন এত বেশী সাময়িক পত্রিকা বেরুচ্ছে যে কারুর পক্ষেই এটি সম্ভব নয় যে তিনি একলা সবগুলি ঠিকমত প'ড়ে নিজের কাজের উপযোগী সূচী ও সংক্ষিপ্তসার বরাবর ক'রে যাবেন। সে হয়ত ত্রিশ বৎসর আগে সম্ভব ছিল। এখনও যদি আমরা সেই নিয়মেই চলার চেষ্টা করি তবে অন্য দেশ থেকে আমাদের দেশের গবেষণা বরাবরই পিছিয়ে থাক্‌বে।

প্যারিসের বাণিজ্য সমিতি একটা কলেজও চালাচ্ছেন। তার নাম "Ecole d'Application du Centre du Preparation aux Affaires" (বিষয় কর্ম্ম সম্বন্ধে হাতে কলমে শিক্ষার প্রতিষ্ঠান)। হার্ভার্ড বিশ্ব বিদ্যালয়ের Graduate School of Business Administration (বিষয় কর্ম্ম পরিচালনার জন্যে গ্রাজুয়েট কলেজ)-এর ধরণের এই কলেজটা। আমি যদিও আমেরিকাতে যেতে পারিনি, তবু যে সব আমেরিকান অধ্যাপক ছুটীতে বেড়াবার জন্যে বা তথ্য সংগ্রহের জন্যে বিলেতে এসেছিলেন তাঁদের কাছ থেকে তাঁদের দেশের বিষয় কর্ম্ম সম্বন্ধে অধ্যাপনার ও গবেষণার নানা তথ্য সংগ্রহ ক'রেছি। সেগুলি সবই আমাদের লাইব্রেরীতে আপনারা পাবেন। হার্ভার্ডে এবং প্যারিসে এই দুই জায়গাতেই Case method of instruction চলে।† অর্থাৎ শিল্প বাণিজ্যের দৈনন্দিন ব্যাপার থেকে কতকগুলি সত্যিকার সমস্যা ছেলেদের কাছে হাজির করা হয়। এবং কি ভাবে সেই সমস্যার সমাধান হ'তে পারে সে বিষয়ে ছেলেদের সঙ্গে আলোচনা করা হয়। দুইয়েতে এইটুকুই মাত্র মিল কিন্তু,—আর সবই অমিল। হার্ভার্ডে প্রতি ক্লাশে প্রায় ৪০০ ছেলে; তার মধ্যে কয়েকজন মাত্র আলোচনাতে

* এই রকম আরও চারখানি বিষয়সূচী আমাদের লাইব্রেরীতে নানা দেশ থেকে আস্‌ছে। তা'র মধ্যে জাতি-সংঘের (League of Nations) লাইব্রেরী থেকে প্রকাশিত "Monthly List of Selected Articles" "নির্ব্বাচিত প্রবন্ধের মাসিক তালিকা" অর্থনীতির গবেষণার পক্ষে সব চেয়ে উপযোগী।

† কয়েক বছর হ'ল লণ্ডন স্কুল অব ইক্‌নমিক্‌সে (London School of Economics) নতুন একটা Department of Business Administration (বিষয় কর্ম্ম পরিচালনা শিক্ষার বিভাগ) খোলা হয়েছে। সেখানেও এই প্রথা অবলম্বিত হ'য়েছে।

যোগ দিয়ে থাকে।* প্যারিসে কোনও ক্লাশে ৫০টির বেশী ছেলে নাই; আলোচনা' অনেকেই করে। দ্বিতীয় তফাৎ হ'চ্ছে হার্ভার্ডে মূলনীতি (principle)-গুলি পর্য্যন্ত Case-গুলির সাহায্যে আরোহ (inductive) প্রথাতে শেখানর চেষ্টা করা হয়। প্যারিসের ছেলেরা মূলনীতিগুলি জেনে যায়; তাই এখানে অবরোহ (deductive) প্রথা। আমাদের মেডিক্যাল কলেজে আমরা রোগী পরীক্ষা এবং হাতে কলমে রোগের ব্যবস্থা তখনই আরম্ভ করি যখন ছেলেরা রোগের বিষয়ে, ঔষধ পথ্যের বিষয়ে, শরীর-তত্ব বিষয়ে খানিকটা জ্ঞান পেয়েছে। প্যারিসে এই পদ্ধতিতেই শিক্ষা দেওয়া হয়। এই কারণেই প্যারিসে শিল্প বাণিজ্যের সমস্যার পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুসন্ধান হয় এবং সংখ্যাশাস্ত্র হাতে কলমে কাজে লাগান হয়। বার্লিনের বাণিজ্য সমিতির লাইব্রেরী এবং তাঁদের টাকাতে পরিচালিত উচ্চ বাণিজ্য-নীতির কলেজ (Handels Hochschule) দুইই বেশ সুন্দর। কিন্তু প্যারিসে আর একটি জিনিষ দেখলাম যেটি অন্যত্র পাই নি। সেটি হচ্ছে বাণিজ্য সমিতির Bureau বা গবেষণাগার। এই Bureauই "case"-গুলি সংগ্রহ করেন এবং কাজে লাগান। হার্ভার্ডে এবং অন্যত্র কলেজের অধ্যাপকেরাই "Case"-এর যোগাড় করেন। তাঁদের পরিচিত যে কয়টি ব্যবসায়ী আছেন তাঁদের কাছ থেকেই যা' পাওয়া যায় তাই নিতে হয়। এতে ক'রে নানা বিষয়ের নতুন নতুন "Case" মেলে না, অধ্যাপনা এবং গবেষণা দুয়েরই অসুবিধা হয়। চতুর্থ তফাৎ এই যে Bureau শুধু কেবল তাঁদের কলেজটিতে "Case" দেন না; ব্যবসায়ীদেরও পরামর্শ দেন। সুতরাং ব্যবসায়ীরা অনেক সময়ে নিজে থেকেই তাদের সমস্যাগুলি নিয়ে আসেন। প্যারিসে এই ভাবে গভর্মেণ্ট, অধ্যাপনা, গবেষণা, শিল্প, বাণিজ্য সব ওতঃ-প্রোতঃ ভাবে সম্বন্ধ হ'য়েছে ব'লে অর্থনীতির এবং সংখ্যাশাস্ত্রের গবেষণা চলার নানা সুবিধা হ'য়েছে।

* ইংল্যাণ্ডের অন্য সব বিশ্ববিদ্যালয়ের আগে বার্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ে বাণিজ্যনীতি শেখানর বন্দোবস্ত করা হ'য়েছিল। Ashley সাহেব আমেরিকা থেকে সব দেখে শুনে এসে এটির প্রবর্ত্তন ক'রেছিলেন; এই সঙ্গে সঙ্গে একটি "Conference"-এর (এটি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের Seminarএর মতন)।

ইংল্যাণ্ডে এই রকম কৈন্দ্রিক পদ্ধতির একান্ত অভাব। ব্যবসা বাণিজ্যের কথা কেউই অপরকে বল্‌তে চান না। জার্ম্মানীতে আইন ক'রে গভর্মেণ্ট নানা তথ্য আদায় করেন দেখে এসেছি। জার্ম্মানীতে ধনবিষয়ক রিপোর্টগুলি (Financial Statistics) যেরূপ বহুল তথ্যপূর্ণ এমন আর কোথায়ও দেখিনি। শুন্‌লাম যে ক্ষতিপূরণের দাবী মেটানর জন্যে (reparation payments) এত বিস্তৃত বিবরণ দরকার হ'য়েছে। আমার কিন্তু মনে হ'ল যে অন্য ব্যাপারে জার্ম্মানরা যেমন পাকাপোক্ত ভাবে কাজ করেন এক্ষেত্রেও তাইই ক'রেছেন। সে যাই হোক ইংল্যাণ্ডে আইন ক'রে গভর্মেণ্টের সাহায্যে তথ্য সংগ্রহের রেওয়াজ নাই ব'ল্‌লেই চলে।

Census of Production Act (উৎপাদন সুমারি সম্বন্ধে আইন) পাশ করার সময়ে শ্রমিকদের মজুরি সম্পর্কীয় যাবতীয় প্রশ্ন পার্লামেণ্ট নাকচ ক'রে দিয়েছিলেন। এই কারণে ভিতরকার খবর পাবার নানা ফন্দি ইংল্যাণ্ডে উদ্ভাবিত হ'য়েছে। একটা হচ্ছে Management Research Groupএর (বিষয়কর্ম্ম পরিচালনার গবেষণা সভা) প্রথা। কয়েকটি বিভিন্ন বিষয়ের ব্যবসায়ী,—যাঁদের ভিতরে পরস্পরে প্রতিযোগিতা নেই—যেমন Cadbury, Imperial Chemical, Shell Mex—তাঁদের ব্যবসায়ের সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা পরস্পরে আদান প্রদান করেন এবং তার ফলে প্রত্যেকেই উন্নততর পদ্ধতি অবলম্বন ক'র্‌তে পারেন। উদাহরণ স্বরূপে বলা যেতে পারে প্রত্যেকেই আয় ব্যয়ের পূর্ব্বাভাস (budget) প্রস্তুত করেন এবং তদনুসারে যাতে খরচ পত্র চলে সেই ব্যবস্থা করেন। কিন্তু সবাই একভাবে পূর্ব্বাভাস প্রস্তুত কিংবা তদনুযায়ী ব্যয় সঙ্কুলান করেন না। সুতরাং প্রত্যেকেরই অপরের কাছে শিক্ষণীয় কিছু আছে। Management Research সম্বন্ধে এ ভাবে দুটি Group হ'য়েছে। প্রথমটি বড় বড় ব্যবসায়ীদের ; দ্বিতীয়টি মাঝারি ব্যবসায়ীদের। এ সম্বন্ধে যে সব কাগজ পত্র উপহার পেয়েছি সবই আমাদের সমিতির লাইব্রেরীতে সাজান আছে।

যে সকল ব্যবসায়ীদের মধ্যে পরস্পরে প্রতিযোগিতা আছে তাঁদের জন্যে অন্য একটি উপায় অবলম্বন করা হ'য়েছে। ইংল্যাণ্ডে অনেকগুলি বিবিধ ভাণ্ডার (Departmeut Stores) আছে ; এর প্রত্যেক দোকানেই

নানারকম জিনিষ একই সঙ্গে বিক্রী হয়,— যেমন ক'ল্‌কেতার বেঙ্গল ষ্টোর্স (Bengal Stores)। এঁদের সকলের মূলধন, বা মজুত মাল, বা বিক্রী বা কর্ম্মচারীর বেতন এক নয়। মূলধন, মজুত মাল, বিক্রী, কর্ম্মচারীর বেতন কি অনুপাতে হ'লে কারবার সবচেয়ে ভালো চলে এ বিষয়ে গবেষণার জন্যে সকল দোকানের ভিতরকার খবর জানা দরকার। মজা এই যে প্রত্যেকেই অপরের কথা জান্‌তে চান, কেউই নিজের কথা অপরকে ব'ল্‌তে চান না। এই সম্পর্কে লণ্ডন স্কুল অব ইকনমিক্স (London School of Economics)-এর একজন অধ্যাপক (Prof. Plant) সব দেখে শুনে অনেকগুলি বিবিধ ভাণ্ডারের কর্ত্তৃপক্ষদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় ক'রে নয় পৃষ্ঠা ব্যাপী একটা প্রশ্নপত্র* খাড়া করেছেন। বিবিধ ভাণ্ডারগুলির একটি সভা আছে নাম Incorporated Association of Retail Distributors, সংক্ষেপে I. A. R. D.। ঐ সভা প্রতি প্রশ্নপত্রে একএকটি সংখ্যা (code number) বসিয়ে ওগুলি দোকানে দোকানে পাঠিয়ে দিয়ে থাকেন। ধরুন উলওয়ার্থের (Woolworth)-এর একটি দোকানে যেটি পাঠান হ'ল তাতে ৭ এই নম্বর দেওয়া হ'ল। শুধু I. A. R. D.-র সম্পাদক মাত্র জান্‌তে পার্‌লেন ৭ নম্বরের প্রশ্নপত্র কার কাছে গেল, আর কেউই নয়। উলওয়ার্থের দোকানে সব প্রশ্নের যথাযথ উত্তরগুলি বসিয়ে সেই প্রশ্নপত্রখানা I. A. R. D.-তে ফেরৎ না পাঠিয়ে (Bank of Englandএর Economics and Statistics Divisionএ) ব্যাঙ্ক অব ইংল্যাণ্ডের অর্থনীতি ও সংখ্যাশাস্ত্র বিভাগে † পাঠিয়ে দিলেন। তাঁরা তাঁদের দরকারী তথ্যগুলি নকল ক'রে নিলেন এবং I. A. R. D.-র দেওয়া ৭ নম্বরটা ছিড়ে অন্য একটি নম্বর, ধরুণ ১৩, বসিয়ে দিলেন। ওখানে কারুর পক্ষে জানা সম্ভব নয় যে ঐ প্রশ্ন পত্রটি কোথা থেকে এসেছে। সব শেষে প্রশ্নপত্রটি লণ্ডন স্কুল অব ইকনমিক্সে ফিরে এল। সেখানে অধ্যাপক সমস্ত সংবাদ পেলেন বটে, কিন্তু কার কাছ থেকে

---

* এর নকল ভারতীয় সংখ্যা সমিতির গ্রন্থাগারে আছে।

† Sir Basil Blackett এবং Institute of Bankers, Londonএর আনুকুল্যে আমার এখানে কাজ করার সৌভাগ্য হয়েছিল।

কোন্‌টি এসেছে তা' তিনি বা অন্য কেউই জান্‌তে পার্‌লেন না। যদি ঐ প্রশ্ন পত্রটিতে কিছু তথ্য সন্দেহজনক থাকে, তবে তিনি প্রথমে ১৩ নম্বরের প্রশ্ন পত্রের উল্লেখ ক'রে ব্যাঙ্ক অব ইংল্যাণ্ডে চিঠি লিখ্‌বেন। ওখান থেকে আবার ৭ নম্বরের কথা জিজ্ঞেসা ক'রে I. A. R. D.-র কাছে চিঠি যাবে। সবশেষে উলওয়ার্থের দোকানে অধ্যাপকের প্রশ্নটা পৌছবে। পদ্ধতিটা অবশ্য খুবই ঘোরালো, এবং যাঁরা ঐ প্রশ্নপত্রগুলি এবং তদানুষঙ্গিক কাগজ পত্র নাড়াচাড়া ক'র্‌ছেন তাঁদের সকলের উদ্দেশ্যও এক নয়। অধ্যাপক হয়ত "representative firm"-এর খোঁজ ক'র্‌ছেন। ব্যাঙ্ক অব ইংল্যাণ্ড হয়ত দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যবসায়ের গতি নির্দ্ধারণ ক'রে তদনুসারে টাকার ব্যবস্থা করার চেষ্টায় আছেন। I. A. R. D. হয়ত বিবিধ ভাণ্ডারের কেনা বেচা কি ভাবে সব চেয়ে কম খরচে হ'তে পারে সেই কথাই ভাব্‌ছেন। অথচ সকলে একযোগে কি চমৎকার ভাবেই কাজ চালাচ্ছেন। এই কাজটা নিজের চোখে দেখে কৈন্দ্রিক পদ্ধতিই (centralisation) ভালো এবং কেন্দ্রাতিগ প্রথা (decentralisation) খারাপ একথা আমি কিছুতেই ব'ল্‌তে পারিনে।

এই কাজটার সঙ্গে গভর্মেণ্টের কোনও আফিস সংশ্লিষ্ট নেই বটে কিন্তু ইংল্যাণ্ডে অন্য অনেক কাজের সঙ্গে সরকারী আফিসগুলি বেশ জড়ান দেখেছি। বোর্ড অফ ট্রেড (Board of Trade, সরকারী বাণিজ্যবিভাগ) এবং মিনিষ্ট্রী অব লেবার (Ministry of Labour, সরকারী শ্রমিক বিভাগ) এ দুটির সঙ্গে রয়াল ষ্ট্যাটিষ্টিকাল সোসাইটীর (Royal Statistical Society) নিকট সম্বন্ধের কথা আপনাদের অবিদিত নেই। Flux সাহেব, Marcrosty সাহেব এঁরা সকলেই বোর্ড অব ট্রেডেতে কাজ ক'রেছেন এবং এখন R. S. S. এবং Statistical Societyর Journal (পত্রিকা) চালাচ্ছেন। যারা অবসর নেননি,—যেমন Leak সাহেব কিংবা Ramsbottom সাহেব (এঁরা Board of Trade ও Ministry of Labourএর Statistical Department দুটির বর্ত্তমান অধ্যক্ষ)—এঁরা সকলে R. S. S. এবং পত্রিকার কাজে যথেষ্ট সাহায্য করেন। প্রতি গভর্মেণ্ট কমিটিতেই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, ব্যবসায়ী, গভর্মেণ্টের কর্ম্মচারী

সবাই একসঙ্গে কাজ করে থাকেন। প্রতি গভর্মেণ্ট আফিসেই গবেষণার সুবন্দোবস্ত আছে। মিনিষ্ট্রী অব লেবার-এর ষ্ট্যাটিষ্টিক্স্ বিভাগের একটি শাখা আছে। • তাতে পৃথিবীর সব দেশের মজুরদের অবস্থা সম্বন্ধে যা কিছু খবর সব কার্ডে নির্ঘণ্ট (card catalogue) করা আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদেরই শুধু সেটি কাজে লাগে এমন নয়। ব্যবসায়ীদেরও সে সব তথ্য অনেক উপকারে আসে। যখন আমি ওখানে কাজ ক'রছিলাম তখন Nigeriaতে একটি পুলের টেণ্ডার (tender) দেবার জন্যে একটি এঞ্জিনীয়ারিং ব্যবসায়ী জিজ্ঞাসা ক'রে [illegible] যে Nigeriaতে সাধারণ শ্রমিকদের মজুরি কত। তা নইলে সাঁকো রং করা এবং ঐ রকমের কাজে কত খরচ প'ড়বে তা' না জানাতে তাঁরা টেণ্ডার দিতে পারছিলেন না। কার্ডের নির্ঘণ্ট দেখে তখনই খবরটা পাঠান হ'ল। ওটি যে কি চমৎকার তা' মিনিষ্ট্রী অব লেবার গেজেট (Ministry of Labour Gazette)-এ প্রকাশিত নানাদেশের শ্রমিকদের অবস্থা সম্বন্ধে প্রবন্ধগুলি পড়লেই বোঝা যায়। ঐ শাখাতে সবশুদ্ধ ১৪ জন মহিলা পুরুষে কাজ করেন। জেনিভাতে আন্তর্জাতিক শ্রমিক সভার (International Labour Office) সমগ্র ষ্ট্যাটিষ্টিক্স্ বিভাগে (Statistics Departmentএ) মাত্র ছয়জন কাজ করেন। সে যাই হো'ক ইংল্যাণ্ডে, জার্ম্মানীতে, ফ্রান্সে এবং ইটালীতে অনেক সরকারী আফিসেই দেখেছি লেখাপড়া এবং গবেষণার নানা সুবিধা আছে এবং সে সব সুবিধা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং ব্যবসায়ীদের সকলের পক্ষেই অনায়াসলভ্য।

ইংল্যাণ্ডে এবং স্কটল্যাণ্ডে প্রায় সব বিশ্ববিদ্যালয়েই কৃষি বা শিল্প বা আর কিছুর জন্যে গবেষণা চলেছে। এবং সেই সব গবেষণার সঙ্গে জাতীয় জীবনের যোগ আছে। চাষী গবেষণার ফলে উন্নততর পথ অনুসরণ ক'রতে পারবে এতেই গবেষণার সার্থকতা। কেম্ব্রিজে কৃষি অর্থনীতি বিভাগে চাষ আবাদ, গোপালন, মুরগী ও শূকর উৎপাদন সম্বন্ধে নানা খুঁটিনাটি পরামর্শ কৃষিজীবীদের দেওয়া হচ্ছে। এই সম্পর্কের যাবতীয় কাগজ পত্র আমাদের সমিতির গ্রন্থাগারে আছে। ম্যাঞ্চেষ্টারের অর্থনীতির অধ্যাপক ড্যানিয়েল্স্ সাহেব কথা প্রসঙ্গে বল্লেন, "যদি অর্থনীতি ভূতবিদ্যার মত

বিজ্ঞানশাস্ত্র হয়, তবে অর্থনীতির সঙ্গে সঙ্গে শিল্পবাণিজ্যের প্রগতি পরিমাপের বন্দোবস্ত থাকা চাই কারণ যা' মাপা যায় না সেটি বিজ্ঞানের বহির্ভূত।" বার্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণিজ্যনীতির অধ্যাপক স্মিথ সাহেব ত স্পষ্টই স্বীকার করলেন যে তাঁর বিভাগের জন্য ব্যবসায়ীদের যে পরামর্শ-সমিতি আছে সেটি কোনও পরামর্শের জন্য সত্যিসত্যি নয়। তার আসল উদ্দেশ্য যাতে ছাত্রেরা ও শিক্ষকেরা তথ্য সংগ্রহের সুবিধা পায়। কেম্ব্রিজের কেন্‌স্ সাহেব হাসতে হাসতে বললেন যে ২৫ বছর আগে যখন তিনি ইণ্ডিয়া আফিসে (India Office) কাজ করতেন তখন ভারতবর্ষের ষ্ট্যাটিষ্টিকাল রিপোর্টগুলি (statistical reports) যে অবস্থায় ছিল এখনও প্রায় সেই অবস্থাতেই আছে। ইতিমধ্যে সংখ্যাশাস্ত্রের প্রভূত উন্নতি হ'য়েছে। ঠিক মত নির্ব্বাচনের (sampling) দরুন সামান্য অনুসন্ধান করে কত বেশী খবর পাওয়া যেতে পারে সে সম্বন্ধে একটি মজার গল্প এই প্রসঙ্গে তিনি করলেন। ম্যাকমিলান কমিটিতে (Macmillan Committee) কাজ করার সময়ে ব্যাঙ্কেরা কি কি ব্যবসায়ের জন্যে কি কি অনুপাতে কি ভাবে টাকা ধার দেন সে খবর দরকার হয়েছিল। সবাই বল্‌লেন এটি অনেক সময় ও ব্যয়সাপেক্ষ। তিনি বল্‌লেন যে প্রতি শততম হিসাব দেখে কি খবর পাওয়া যায় সেটা সংগ্রহ করলেই যথেষ্ট হবে। তিনি সেইভাবেই খবর যোগাড় করলেন। অন্য সভ্যেরা কষ্ট করে সব হিসাব দেখে তবে বিবরণী দিলেন। দুই প্রথাতে একই ফল হল।

একমাত্র আমেরিকাতেই ব্যবসায় সম্বন্ধে নানা গবেষণা হয় আমার এই ধারণা ছিল। কিন্তু দেখ্‌লাম যে বিলেতে সবাই সংখ্যাশাস্ত্রের সাহায্য নিচ্ছেন। সোসাইটী অব মোটর ম্যানুফ্যাকচারার্স (Society of Motor Manufacturers) কোন্ দেশে কোন্ বৎসর কত মোটর গাড়ী বিক্রী হ'তে পারে তা'র পূর্ব্বাভাস প্রস্তুত ক'র্‌ছেন। সেণ্ট্রাল ইলেক্‌ট্রিসিটি বোর্ড (Central Electricity Board) আগামী দশবৎসরে কত বিদ্যুৎশক্তি কোন্ কোন্ জায়গায় খরচ হ'বে তার অনুমান ক'রে এখনই তা'র মূল্য নির্দ্ধারণ ক'রে দিচ্ছেন। গণনাতে ভুল হ'লে লাভের বদলে লোক্‌সান হওয়া খুবই সম্ভব। অবশ্য জীবনবীমার গণনার মত এ সব অনুমান নির্ভুল

হয় নি, তবু চেষ্টার ত্রুটি নেই। চেম্বার অব শিপিং (Chamber of Shipping)-এর সংখ্যা ও অর্থনীতি বিভাগে (Dr. Isserlis) ডাঃ ইসার-লিসের মত গণিতজ্ঞ কাজ ক'র্ছেন। টাইম চার্টার রেট (Time Charter rate অর্থাৎ আগামী ছয় মাসের জন্য যে জাহাজ ভাড়া ঠিক হ'ল) এবং লাইনার রেট (Liner rate অর্থাৎ জাহাজের রোজ রোজকার ভাড়া) এ দুটির মধ্যে কি মিল, কি অমিল এ সম্বন্ধে চমৎকার চমৎকার তথ্যের বিশ্লেষণ ক'রেছেন। প্রথমটি দেখে বোঝা যায় যে আগামী ছয় মাসে ব্যবসায়ীরা ব্যবসায়ের পরিমাণ কি রকম অনুমান করেছেন। সেই অনুমান ঠিক কিনা দ্বিতীয়টি দেখে কতকটা বোঝা যায়। এই রকম নানা ব্যাপারে অর্থনীতির ও সংখ্যাশাস্ত্রের প্রয়োগ সম্বন্ধে সমস্ত কাগজ পত্র সংগৃহীত হ'য়েছে। সেগুলি সব আমাদের ভারতীয় সংখ্যাসমিতির লাইব্রেরীতে আছে।

শুধু প্রয়োগ (application) কেন তত্ত্বের (theory) সম্বন্ধে গবেষণাও নানা জায়গায় চ'লেছে। যেখানে যেখানে প্রয়োগের চর্চ্চা হ'চ্ছে সেখানে সেখানে তত্ত্বেরও আলোচনা হ'চ্ছে। ডাঃ ইসারলিসের সংখ্যাতত্ত্ব সম্বন্ধে কাজ আপনাদের অবিদিত নেই। কোনও কোনও জায়গায় তত্ত্ব সম্পর্কীয় গবেষণাই বেশী বেশী চ'লেছে যেমন লণ্ডনের ইউনিভার্সিটী কলেজের (University College, London) ষ্ট্যাটিষ্টিক্‌স্ বিভাগে (Statistics Departmentএ) এবং এডিনবরার ম্যাথেমেটিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউটে (Mathematical Institute, Edinburgh), ডাঃ পিয়ারসন, ডাঃ এটকেন, অধ্যাপক হুইটেকার (Dr. E.S. Pearson, Dr. A.C. Aitken এবং Prof. Whittaker) এঁদের গবেষণা। রোমে জিনি সাহেবের (Prof. Gini) ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউটে তত্ত্ব এবং প্রয়োগ দুয়েরই চর্চ্চা সমান ভাবে চ'লেছে। জিনি সাহেব এর আগে ইটালীর সরকারী ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল বিভাগের (Official Department of Statistics) অধ্যক্ষ ছিলেন। মেট্রন (Metron)-এর মত তত্ত্বপূর্ণ কাগজ এবং লা ভিটা ইকনমিকা ইটালিয়ানা (La Vita Economica Italiana)-র মত তথ্যপূর্ণ পত্রিকা দুইই প্রকাশিত হ'চ্ছে। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ সংগৃহীত হ'য়েছে।

এতক্ষণ শুধু বিদেশের কথাই ব'লেছি। এখন আমাদের দেশে অর্থনীতি ও সংখ্যাশাস্ত্রের কি ভাবে গবেষণা চালাতে পারা যায় সেই সম্বন্ধে দুই চারটি কথা ব'ল্‌তে চাই। আমাদের ভারতীয় সংখ্যা সমিতিতে পৃথিবীর সব দেশ থেকে প্রায় ৫০০ সাময়িক পত্রিকা ও সরকারী রিপোর্ট আস্‌ছে। পত্রিকাগুলিতে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলির এবং নতুন বইয়ের বিষয়ানুক্রমিক সূচী অনেকগুলি সংগৃহীত হ'য়েছে এ কথা আগেই ব'লেছি। আমাদের সংখ্যা সমিতির সঙ্গে এবং আমাদের "সংখ্যা" পত্রিকাটির সঙ্গে বিদেশীয় গবেষণা সমিতিগুলি এবং অর্থনীতি ও সংখ্যাশাস্ত্র সম্বন্ধীয় পত্রিকাগুলির পরিচয় হ'য়েছে। সমালোচনার জন্য এবং আমাদের লাইব্রেরীর জন্য অর্থনীতি ও সংখ্যাশাস্ত্র সম্বন্ধে নতুন বই এবং প্রবন্ধগুলির প্রতিলিপি যাতে আসে সেই ব্যবস্থার চেষ্টা হ'য়েছে। গণনার জন্যে কয়েকটি ভালো ভালো যন্ত্রও (calculating machines) র'য়েছে। সংখ্যাশাস্ত্র সম্বন্ধে বই এবং গণনার জন্যে অন্য কাগজ পত্র (যেমন tables) এই সমিতিতে যেমন আছে ভারতবর্ষে এ রকম বোধহয় আর কোথাও নাই। বিদেশেও একসঙ্গে এত রকমের এত প্রচুর সংগ্রহ বিরল, এগুলি কি ভাবে কাজে লাগান যেতে পারে সেটি সকলেরই প্রণিধানযোগ্য।

আমরা যদি সকলে মিলে এই সব জিনিষগুলির ভালো ক'রে কার্ডে নির্ঘণ্ট প্রস্তুত করি তবে একজনের পড়াশুনোর ফল অন্য সকলেই পাবেন। পড়াশুনা ব্যাপারে সমবায়নীতি যে কত সুফলপ্রসূ তা' বলা বাহুল্যমাত্র। প্রত্যেকে এক একটি বিষয় নিয়ে পড়াশুনো ক'র্‌লে এবং সেগুলি আমাদের (Colloquium) কলোকিয়ামে আলোচিত হ'লে প্রত্যেকের গবেষণাতেই অন্যের সাহায্য পাওয়া যাবে এবং আমরা সকলেই উপকৃত হ'ব।

এক্ষেত্রে একথা উঠ্‌তে পারে যে পড়াশুনো ত হ'ল, কিন্তু অর্থনীতির ঠিক মত গবেষণার জন্যে শিল্প বাণিজ্য সম্বন্ধে ভিতরকার তথ্য পাব কেমন ক'রে? আমাদের দেশে প্যারিসের বাণিজ্য-সমিতির মত অথবা বিলেতের নানা প্রতিষ্ঠানের মত কি আছে? দক্ষিণ আফ্রিকার গবেষণা-পদ্ধতি বিষয়ে একটি খবর পেয়েছি। সেটি এই। প্রতি ব্যবসায়ের ভিতরকার খুঁটিনাটি খবর সেই ব্যবসায়ের হিসাব পরীক্ষকের কাছে অজ্ঞাত নেই। ধরুণ,

একজন হিসাব পরীক্ষক পাঁচটি কাপড়ের কলের হিসাব দেখেন। তিনি যদি প্রশ্নপত্র (schedule) অনুযায়ী উত্তরগুলি পাঁচটি কলের জন্য লিখে সেই পাঁচটির প্রশ্নপত্রে লিখিত সংখ্যার যোগফলগুলি গবেষণার জন্য দেন তবে কোন্ কলের আভ্যন্তরীণ অবস্থা কি তা জান্‌বার কোনও উপায় নেই। অন্য একজন হিসাব পরীক্ষক হয়ত অন্য সাতটি কাপড়ের কলের হিসাব দেখেন। তাঁর কাছ থেকে সেই সাতটি কলের সংবাদ একত্র পাওয়া গেল। ঐ ভাবে সব হিসাব পরীক্ষকদের কাছ থেকে সংবাদ সংগ্রহ ক'রে বস্ত্রশিল্প সম্বন্ধে গবেষণা করা সম্ভব হয়। আমাদের দেশের ব্যবসায়ীদের এবং হিসাব পরীক্ষকদের এই প্রথাটার কথা বিবেচনা ক'রে দেখা অযোগ্য হবেনা। এতে ক'রে ব্যবসায়ীরা তাঁদের নানা গলদ ধর্‌তে পার্‌বেন। কেউ হয়ত দেখ্‌বেন যে তিনি আর সকলের চেয়ে কাঁচামালে বেশী অনুপাতে খরচ ক'র্‌তেন। কারুর বা শ্রমিকের মজুরির হার বেশী প'ড়েছে। কারুর বা পরিচালনার ব্যয় সঙ্কোচ দরকার দেখা যাবে। প্রতি বিষয়ের মাপকাটী (standard) ঠিক হ'লে, সকলেই নিজেদের ব্যবসায় সম্বন্ধে ঠিকভাবে বিচার ক'রতে পার্‌বেন। এই রকম ভাবে বিশ্লেষণ না হ'লে এই দারুণ প্রতিযোগিতার দিনে দাঁড়ান কঠিন হ'বে। আমাদের দেশে ব্যবসায়ীদের সংখ্যাশাস্ত্র সম্বন্ধে এখন যে রকম মতামত ইংল্যাণ্ডে পাঁচ সাত বছর আগে কতকটা সেইরকমই ছিল, এখন কিন্তু অর্থনীতি এবং সংখ্যাশাস্ত্রের মূল্য হাড়ে হাড়ে বুঝ্‌তে পেরেছেন। নিজের নিজের ব্যবসায় সম্বন্ধে খানিকটা জ্ঞান সকলেরই আছে, কিন্তু যত বেশী সংবাদ দরকার, বিশেষতঃ সেই ব্যবসায়ে বিদেশী প্রতিযোগিতার প্রসার কত দূর সে সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান বিরল। আবার সাধারণ অর্থনৈতিক কারণে, যেমন বিলাতের স্বর্ণমান পরিহার, আমেরিকার রুজভেল্টের ব্যবস্থা,—প্রত্যেকের ব্যবসায়ে কি পরিবর্ত্তন হতে পারে এ বিষয়ে অর্থনৈতিকেরা হয়ত ব্যবসায়ীদের চেয়ে বেশী জানেন। London and Cambridge Economic Service-এর প্রচার ব্যবসায়ীদের মধ্যে যথেষ্ট ঠিক এই কারণেই। দেখে শেখা যে ঠেকে শেখার চেয়ে ভালো একথা বলাই বাহুল্য।

অবশ্য যতদিন এভাবে তথ্য সংগৃহীত না হয় ততদিন সব গবেষণা

বদ্ধ থাক্‌বে এমন নয়। শিল্প, বাণিজ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য সম্বন্ধে যে সব তথ্য প্রকাশিত হ'য়েছে তারও বিশ্লেষণ দরকার। কৃষিপ্রধান দেশে প্রতি মাসে উৎপাদন এক ভাবে হ'তে পারে না, যেমন শিল্পপ্রধান দেশে হয়। কেনা-বেচা ইত্যাদিও আমাদের দেশে কোনও মাসে কম কোনও মাসে বেশী হয়। আবার এ বৎসরের আষাঢ় যে আগের বৎসরের আষাঢ়ের সঙ্গে ঠিক সমান হ'বে তারও মানে নেই, কারণ সময়মত বৃষ্টি না হওয়ার দরুন কোনও বার আগে বা কোনও বার পরে বুনানি আরম্ভ হয়; বুনানি একই সময়ে হ'লেও উৎপাদন আগে পরে হ'তে পারে। সুতরাং আষাঢ়ের সঙ্গে আষাঢ়ের তুলনা ক'র্‌লেও হাঙ্গামা মেটে না। জাতীয় জীবনের প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে যেমন লোকসংখ্যা বৃদ্ধির হিসাবে উৎপাদন, শিক্ষা সবই ক্রমশঃ বাড়ে। কিন্তু তাতেই দেশ এ সব বিষয়ে উন্নত হ'চ্ছে বলা যায় না, যদি না তাদের প্রসার দেশের সাধারণ প্রগতির চেয়ে দ্রুততর হয়। এ সব বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন কারণ আপনারা অনেকেই বৌলি এবং রবার্টসন (Bowley ও Robertson) সাহেবের রিপোর্ট দেখেছেন। পরিশেষে শুধু এই কথাটা ব'ল্‌তে চাই। ভারতীয় সংখ্যা সমিতিতে নানা দেশ থেকে যে নানা জিনিষ সংগৃহীত হ'চ্ছে সেগুলি কাজে লাগানর ভার গবেষকদের হাতেই অনেকটা, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই কাজ সহজসাধ্য হবে যদি বিশ্ববিদ্যালয়, গভর্মেণ্ট্ আফিস ও ব্যবসায়ীদের সমবেত সহযোগিতা পাওয়া যায়।

শ্রীহরিশ্চন্দ্র সিংহ
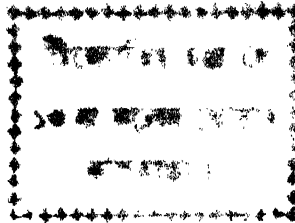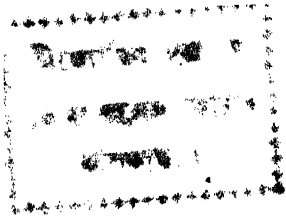
বিভাবরী

রাত তখন সাড়ে দশটা হইবে। সভাসমিতি সারিয়া সুবিমল বাড়ী ফিরিতেছিল। দরজায় ঢুকিতে যাইবে এমন সময় পিছন হইতে কে যেন ডাকিল—বাবু!—কে রে?—সুবিমল ঘুরিয়া দাঁড়াইল।—বাবু, মা আপনাকে ডাকছেন, বিশেষ দরকার।

তাহার বন্ধু অমরেশের চাকরের মুখে এই ডাক শুনিয়া সুবিমল একটুও আশ্চর্য্য হইল না। এমন ত অনেকবারই ঘটিয়াছে। অমরেশ ডাক্তার। হয়ত তাহার রোগীর বাড়ী হইতে ভালো ইলিশ মাছ দিয়া গিয়াছে, অতএব ডাকো সুবিমলকে। হয়ত আর একজনের অভাবে তাহাদের ব্রিজের পার্টি জমিতেছে না, সুবিমলকে বলিয়া পাঠাও—বিশেষ দরকার, মাঠাকরুণ ডাকিতেছেন। বিভার নাম করিয়া ডাকিলে যে সুবিমল ঠেলিতে পারিবে না তাহা অমরেশের চাইতে কে বেশী জানে। সুবিমল তাই বলিল—আচ্ছা বলগে যা যাচ্ছি!

সসম্ভ্রম প্রতিবাদের সুরে চাকরটা বলিল—দেরী হয়ে যাবে। মা বড় ভয় পেয়েছেন। বাবুর হঠাৎ অসুখ করেছে। অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেছেন।

সুবিমল যেন বিশ্বাস করিতেই পারে না। এই ত সবে কাল তাহাদের বাড়ী সমস্ত সন্ধ্যা কাটাইয়া আসিয়াছে, অমরেশের অসুখের চিহ্ন মাত্রও দেখে নাই। চাকরটাকে আর প্রশ্ন করা মিথ্যা। সে যতটুকু জানে ততটুকুই বলিয়াছে। বাবুর জন্য বরফ কিনিতে সে বাহিরে গিয়াছিল, বাড়ী আসিতেই বিভা তাহাকে সুবিমলের নিকট পাঠাইয়া দিয়াছে। এখান হইতে সে বিভার বাপের বাড়ী খবর দিতে যাইবে। সুবিমল বুঝিল, ব্যাপার সহজ নহে। বাড়ীতে না ঢুকিয়াই সে অমরেশের গৃহাভিমুখে চলিল। তাহার সঙ্গে সঙ্গেই নরেশ ডাক্তারের গাড়ী আসিয়া পৌঁছিল। তাহাকে দেখিয়া নরেশ বলিতে আরম্ভ করিল—এই যে সুবিমল বাবু, আপনার বন্ধুটির আবার কি অসুখ হলো। আর অসুখেরই বা অপরাধ কি। আমরা সবাই বসে থাকবো, আর ও একলা পয়সা কোরবে, এ কখনো ধর্ম্মে সয়।

সুবিমল উত্তর দিবার পূর্ব্বেই নরেশ বাড়ীতে ঢুকিয়া হাঁকিতে লাগিল —কই, বৌঠাকরুণ কই। বলি, অসুখটা কি সত্যি, না আইসক্রীম খাওয়াবার জন্যে টেলিফোনে ডেকে পাঠালেন? ওদিকে ত আমাকে একা আসতে দিতেই চায় না, তাকে না নিয়ে এলে।

দুজনে সিঁড়ি বাহিয়া উঠিতেছিল—নরেশ আগে, সুবিমল পিছনে। বিভা আসিয়া সিঁড়ির উপর-মুখে দাঁড়াইল। সুবিমল বেশ বুঝিতে পারিল তাহার মুখের চেহারা দেখিয়াই নরেশের বাক্যপ্রবাহ থামিয়া গেল—যেন কণ্ঠরোধে। আর সুবিমলের হঠাৎ মনে হইল—এই নিকষ-কালো মেয়েটির যে নাম দিয়াছিল বিভাবরী, সার্থক তাহার ভবিষ্যৎ-দৃষ্টি। এ যেন গরম দেশের রহস্য-গভীর স্বচ্ছরাত্রির জীবন্ত প্রতিরূপ।—আসুন আপনারা, ওদিকে নয়, এদিকে, ওই যে উনি,—বিভা কথা কহিল। বিভার কণ্ঠস্বর সুবিমলের নিকট চিরনূতন বিস্ময়। যতবার শোনে ততবারই মনে হয়, তারার আলো যেন শ্রুতিগম্য হইয়া উঠিয়াছে। সুবিমল দেখিল—বাথ-রুমের দরজার নিকট অমরেশের দেহ পড়িয়া আছে, অসাড় অচৈতন্য। কাছেই পাখা ও বরফ জলের পাত্র, বিভা এতক্ষণ অমরেশকে ঠাণ্ডা করিয়া জ্ঞান ফিরাইবার চেষ্টা করিতেছিল। নরেশকে আর কিছু বলিতে হইল না। সে সযত্নে পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা আরম্ভ করিয়া দিল। বিভা দুজনকে শোনাইবার মতো করিয়া বলিতে লাগিল—এই একটু আগে রোগী দেখে ফিরে ডাক্তারখানা বন্ধ করতে ও গাড়ীখানা তুলে ফেলতে বলে দিলেন। তারপর বাথরুমে ঢুকতে গিয়ে যেন হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলেন। আমি কাছেই ছিলাম। ছুটে এসে দেখি অজ্ঞান।

সুবিমল জিজ্ঞাসা করিল—ছেলে মেয়েরা?—তারা ঘুমুচ্ছে; তাদের আর জাগাই নি।—বেশ করেছ।

একটু পরে নরেশ চিন্তিতভাবে বলিল—ভয় পাবার কিছু নেই। ব্যস্ত হবেন না। ব্লড-প্রেসার কিছু বেড়েছে, মনে হচ্ছে। আপনি এখন এখানেই আছেন ত, সুবিমল বাবু, আমি আসছি এখনই। এই বলিয়া নরেশ তাহার গাড়ীতে বাহির হইয়া গেল। সিঁড়ি দিয়া নামিতে নামিতে বিভাকে উদ্দেশ করিয়া বলিল,—দেখুন, ওকে বোধ হয় আপাততঃ আপনা-

দের শোবার ঘরে নিয়ে যাওয়া যাবে না। এই পাশের ঘরটাতেই একটা বিছানার ব্যবস্থা করে ফেলুন।—বিভা ও তাহার ঝি কাজে লাগিল, সুবিমল অমরেশের নাড়ী ধরিয়া বসিয়া রহিল।

সময় যেন আর কাটে না। সুবিমলের মনে হয়, এক একটি মুহূর্ত্ত যেন যুগের চেয়ে দীর্ঘতর। বিভা কি ভাবিতেছে, বুঝিবার জো নাই। এটুকু সে বুঝিয়াছে, হয়ত ডাক্তারের স্ত্রী বলিয়া, অমরেশের সারিয়া উঠিতে সময় লাগিবে। তাই সে জিনিষ পত্র সরাইয়া, খাট ঘোরাইয়া, টেবিল নড়াইয়া, বালিশ বিছানা চাদর রবার-ক্লথ গোছ করিয়া এমন ব্যবস্থা করিতে লাগিল যাহাতে ভবিষ্যতে রোগীর কোনো অসুবিধা না হয়। অথচ চলা-ফেরায় কথাবার্ত্তায় কোথাও অধৈর্য্যের আভাস নাই। যে সুকঠিন শাসনের ফলে বংশীবাদক ভাবোন্মত্ত হইয়াও অঙ্গুলিচালনে নিমেষ মাত্র অসাবধান হয় না, তাহারি সুনিপুণ প্রকাশ যেন বিভার স্থিতি ও গতিতে। অন্তরের তীব্র উন্মাদনা বর্ত্তমান কর্ত্তব্যের অলঙ্ঘ্য আজ্ঞায় পরিশাসিত হইয়া প্রবল ইচ্ছা-শক্তির পরিচয় দিতেছিল।

নরেশ ফিরিয়া আসিল—সঙ্গে কয়েক জন ছোটো বড়ো ডাক্তার লইয়া। রোগীর অবস্থা দেখিয়া সকলেরই মুখ কালো হইয়া গেল। চিকিৎসা-ব্যবস্থার কোনো ত্রুটিই তাহারা হইতে দিল না। বিভার পিতা হরনাথও আসিয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি অত্যন্ত অবুঝের মতো চেঁচামেচি করিয়া বিরক্ত করিতেছিলেন বলিয়া ডাক্তারদের ইচ্ছানুসারে সুবিমল তাঁহাকে সরাইয়া লইতে বাধ্য হইল। শেষ পর্য্যন্ত সাংসারিক অসুবিধার দোহাই দিয়া তিনি নিজ বাটীতে ফিরিয়া গেলেন। সুবিমল তাহার বাড়ীতে খবর দিয়া সে-রাত্রি অমরেশের কাছেই থাকিয়া গেল।

অমরেশের রোগশয্যায় সাতদিন ধরিয়া যমে-মানুষে টানাটানি চলিল। এক একটি রাত্রি কাটে, আর পুনর্জীবনের ভরসা বাড়ে; কিন্তু যতক্ষণ না সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিয়া অমরেশ কথা কহিতে পারিতেছে ততক্ষণ বিশ্বাস নাই প্রাণে বাঁচিলেও সে তাহার স্মৃতি ও বাক্‌শক্তি ফিরিয়া পাইবে কি না। বিভা সমস্তক্ষণ রোগীর এত কাছে কাছে থাকিত যে এই ভীষণ আশঙ্কাজনক সম্ভাব্যতা তাহার নিকট গোপন করা চলিল না। প্রথম শুনিয়া সে সুবিমলের

মুখের দিকে চাহিয়া ব্যাকুল স্বরে প্রশ্ন করিয়াছিল—কি হবে তাহলে? কিন্তু তাহার এ চাঞ্চল্য নিতান্তই ক্ষণিক। তাহার পর সে সেবার মধ্যে এমন ডুবিয়া গেল যেন মৃতদেহে প্রাণ সঞ্চারই তাহার জীবনব্রত।

তাহার প্রথম স্বস্তির নিশ্বাস পড়িল যেদিন অকস্মাৎ ক্ষীণ অথচ স্পষ্ট স্বরে অমরেশ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—আমি এ ঘরে কেন? বাহিরে তখন সবে ফরসা হইয়া গিয়াছে, ঘরের ভিতরকার ঢাকাদেওয়া মৃদু আলো উদীয়মান সূর্য্যালোকে ম্লানতর হইয়া আসিতেছে। সুবিমল পাশের ঘরে বিশ্রাম করিতে গিয়া নিদ্রিত, রাত্রি সাড়ে তিনটা পর্য্যন্ত সে রোগীর কাছে পাহারা দিয়াছিল। অন্য দিন এই সময়টা বিভা সাধ্যপক্ষে সুবিমলকে জাগায় না। আজ আর থাকিতে পারিল না। দৌড়িয়া গিয়া তাহাকে জাগাইয়া দিয়া কহিল—শীগ্‌গির ও ঘরে চলুন, উনি কথা কইছেন। সুবিমল ঘুমের ঘোরে সবটা বুঝিতে না পারিয়া চরম বিপদ আশঙ্কা করিয়া ছুটিয়া আসিয়া অমরেশের নাড়ী খুঁজিতে লাগিল। অমরেশ যখন বলিল—কে, সুবি? আমি এখানে কেন? তাহার মনে হইল সে যেন কোন্ প্রেতপুরী হইতে বেতার বার্ত্তা শুনিতেছে। পরে সমস্তটা বুঝিতে পারিয়া উল্লাসে প্রায় চীৎকার করিয়া উঠিল,—বিভা, শোন শোন, অমর কথা কইছে। বিভা কাছেই ছিল, বলিল—আমি ত সেইজন্যেই আপনাকে অসময়ে ডাকতে গিয়েছিলুম। এ যাত্রা বোধহয় ভগবান মুখরক্ষা করলেন। অনবরত চাপের পর একটু আল্গা পাইলেই স্প্রিং যেমন তার পূর্ব্বতন অবস্থানে ফিরিয়া আসে, ঠিক তেমন করিয়াই সুবিমল বলিয়া ফেলিল—ভালোই করেছেন, নইলে তাঁরই মুখরক্ষা হোত না।

বিভাকে অমরেশের কাছে রাখিয়া সুবিমল গেল, টেলিফোনে নরেশকে সুখবর দিতে। নরেশও আসিতে দেরী করিল না, উৎসাহ দিবার জন্য, আনন্দ জানাইবার জন্য। কিন্তু তাহার পরীক্ষার ফলে উদ্‌ঘাটিত হইয়া পড়িল একটি অতি নিদারুণ সত্য। অমরেশের সমস্ত দক্ষিণ অঙ্গ অসাড় হইয়া গিয়াছে, পক্ষাঘাত বলিলেই হয়। সারিয়া উঠিলেও পুরাতন সামর্থ্য ফিরিয়া পাওয়া আশাতীত। শুনিয়া সুবিমল মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। বিভা বলিল—উনি বেঁচে থাকুন, তারপর আমার ভাগ্যে যা আছে তাই হোক।

সেবা আরো কঠিন হইয়া উঠিল। সংজ্ঞাশূন্য রোগীকে পরিচালনা করা খানিকটা সহজ, তার মতামত নাই, বেদনাবোধও কম। কিন্তু রোগশয্যায় শুইয়াও অমরেশ ভুলিতে পারে না যে সে ডাক্তার। ক্রমে অমরেশের জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার নিজের অবস্থা নিজের নিকট প্রকাশ পাইল। সে কি অসহায় বিভীষিকা-ভীত দৃষ্টি তাহার চোখে, মরণের পায়ে সে কি অবিরাম কাতর প্রার্থনা। বিভা সব শোনে, সহ্য করে, সেবা করে। অমরেশের স্বভাবেরও ঘটিল ভীষণ পরিবর্ত্তন—সব কিছুতেই উগ্র বিরক্তি। তাহার ছেলেমেয়ে মুন্না ঝুন্নি ছিল তাহার প্রাণ; এখন তাহাদের দেখিলেই তাড়াইয়া দেয়। সুবিমলের সহিত কথা বলা বন্ধ করিয়াছে, বিভাকে সমস্তক্ষণই খিঁচায়। হরনাথ ইত্যাদি তাহার ঘরে ঢুকিতেই সাহস পায় না, বুঝিবা তাহাদের দেখিলেই মাথার শিরা ছিঁড়িয়া গিয়া প্রাণবিয়োগ ঘটিবে। তাহার চোখের ঘুম যেন উঠিয়া গিয়াছে, দিবারাত্র ছটফট করে। ঔষধ-পথ্যে অসম্ভব খেয়ালীপনা, কখন খায় কখন দূরে ছুড়িয়া দেয়। কখন বা বিভাকে লক্ষ্য করিয়া বলে—তুমি এত বোকা, কেন? কেন মিছে আমায় বাঁচাতে চেষ্টা করছ? আমি যে কত বড় বোঝা তা কি বুঝতে পারছ না? তুমি যদি সতী হও আমি যেন শীঘ্র মরি। বিভা কাঁদিতে কাঁদিতে উঠিয়া আসিয়া সুবিমলকে বলিল—বলুন, কেমন কোরে আমি ওঁকে বোঝাবো যে ওঁর ভার আমি বইতে পারবো, পারবো আমি ওঁকে কাঁধে নিয়ে সংসার ঠেলে চালাতে। তাছাড়া আপনি ত আছেন। যদি ওঁর তেমন কিছু ঘটেই, আপনি ত ওঁকে ফেলে চলে যেতে পারবেন না। কি উত্তর দিবে ভাবিয়া না পাইয়া সুবিমল চুপ করিয়া থাকে। কি করিয়া সে বিভাকে বুঝাইতে পারে অমরেশের বর্ত্তমান মানসিক অবস্থায় তাহাকে কোনো কিছু বোঝানো অসম্ভব। সে চেষ্টায় হিতে বিপরীত হইবার সম্ভাবনা।

ক্রমে প্রমাণ হইতে লাগিল বিশ্বনিয়ন্তা বধির নহেন; অমরেশের প্রার্থনা তাঁহার কর্ণে পৌঁছিয়াছে;—অমরেশ মৃত্যুর মুখে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া চলিল। কিন্তু মানুষের প্রার্থনা গ্রাহ্য করিলেই কি মানুষের প্রতি চরম দাক্ষিণ্য প্রকাশ করা হয়? অমরেশ মৃত্যু চাহিয়াছিল বটে, কিন্তু যে-মৃত্যু বিধাতা তাহাকে দিলেন, তাহা কি সে চাহিয়াছিল? কেহ

কি সে-মৃত্যু চাহিতে পারে, বিশেষতঃ নিজে ডাক্তার হইয়া ইউরিমিয়ার প্রচণ্ড দাহনে কি তাহার মৃত্যুকামনা ভস্মীভূত হইয়া যায় নাই? মরণের কোমলতর কোনো পন্থা কি সর্ব্বশক্তিমানের ক্ষমতাতীত ছিল? তবু জয় হইল মানব-আত্মার। নির্ব্বাণের অব্যবহিত পূর্ব্বে যন্ত্রণার সমস্ত প্রদাহকে উপেক্ষা করিয়া ফুটিয়া উঠিল অমরেশের মুখে দিব্য শান্ত হাসি, মুক্তি-মুহূর্ত্তের সুনিবিড় সমাগমে। তাহার শেষ কণ্ঠস্বরে ধ্বনিয়া উঠিল জীবনের আসক্তি নয়, মরণের ভীতি নয়, ভগবানের স্তুতি নয়, মানুষের প্রতি মানুষের একান্ত নির্ভরের বাণী—সুবি, আমি চল্লুম, এরা রইল।

(২)

বিভার যখন বিবাহ হয় অমরেশ তখন মেডিক্যাল কলেজের খ্যাতিমান ছাত্র। বাংলাদেশের অনেক রূপবতী ও ধনবতী কন্যার পিতা তাহাকে জামাতৃরূপে বরণ করিতে তখন অতিমাত্রায় আগ্রহশীল। ভুবনমোহিনীর একমাত্র লোভ ছিল কৌলিন্যের প্রতি; কাজেই অন্য সমস্ত প্রলোভন তাঁহার নিকট ব্যর্থ হইয়া গেল। হরনাথের অকলঙ্ক কৌলিন্যমর্য্যাদা তাঁহাকে এমনই মুগ্ধ করিয়া ফেলিল যে তিনি আত্মীয়স্বজনের সমস্ত আপত্তি উপেক্ষা করিয়া ঐখানেই সম্বন্ধ পাকা করিয়া দিলেন। কিন্তু বিবাহরাত্রে কয়েকজন আত্মীয় কুটুম্ব-বাড়ী হইতে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন—অমরের মা, তোমার ছেলে কি অরক্ষণীয় হয়েছিল? বাংলা-দেশে কি আর মেয়ে মিল্‌লো না? মাগো কি কালো কি কালো মেয়ে; তোমার ওই একটা ছেলে, তার কিনা এই কালো বৌ? এখন যদি অমরের বৌ পছন্দ না হয়, তখন? তখন কি কুল নিয়ে ধুয়ে খাবে? ভুবনমোহিনী মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। বিভা যে কালো তাহা তাঁহার অজানা নয়। কিন্তু কালো বলিয়াই যে অমর তাঁহার নির্ব্বাচিত পাত্রীকে তুচ্ছ করিবে, ইহা তিনি আগে ভাবিতেই পারেন নাই। এখন যে ফিরিবার পথও বন্ধ হইয়া গিয়াছে। নিজের অপরিণামদর্শিতার তিরস্কারে বিব্রত হইয়া ভুবনমোহিনী ঠাকুরঘরে ঢুকিয়া এই প্রার্থনা করিতে লাগিলেন—ঠাকুর, আমার অমর যেন অসুখী না হয়।

অমরেশের বিবাহে স্নুবিমল উপস্থিত থাকিতে পারে নাই, কারণ সে তখন কারাগারে অতিথি। জেলে বসিয়াই সে খবর পাইয়াছিল। তাহার অনিবার্য্য অনুপস্থিতিতে বিবাহরূপ অপরাধের মার্জ্জনা চাহিয়া অমরেশ লিখিয়াছিল,—তোমার ভাবী বান্ধবী সম্বন্ধে যেন তোমার কল্পনার রাশ ঢিলে কোরে দিয়ো না। অসামঞ্জস্যের ভয়ে যে মেয়ের নাম বাপ-মায়ে বিভাবরী রাখতে বাধ্য হয়, তার বিষয়ে তোমার আর কি উৎসাহ হতে পারে ?

মেয়াদ শেষ হইবার পূর্ব্বে হঠাৎ ছাড়া পাইয়া স্নুবিমল বাড়ী না যাইয়া অমরেশের বাড়ীতেই আসিল। অমরেশ বাড়ী ছিল না, বিভা বাপের বাড়ীতে। ভুবনমোহিনী সস্নেহ সমাদরে তাহাকে আবাহন করিয়া লইলেন। সামান্য কিছু আলাপ-আলোচনার পর তিনি সেই প্রসঙ্গ তুলিলেন যাহা তাঁহার মনে ভারের মত চাপিয়াছিল। সমস্ত শুনিয়া স্নুবিমল হাসিয়া উঠিয়া বলিল,—পাগল হয়েছেন আপনি। একি আপনাদের যুগ ? আমি ত ভাবতেই পারি না অমর তার স্ত্রীর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করবে শুধু তার গায়ের রং ফরসা নয় বলে। তাহলে ত কোনো বাঙালী মেয়েকেই বিয়ে করা চলে না, বিলেত থেকে বউ আমদানী করতে হয়। আসল কথা, মনের রং। আমি ত আপনার বৌমাকে দেখিনি—কাজেই কি কোরে কি বলি।

ভুবনমোহিনী বলিতে লাগিলেন—সেদিকেও কি আমার স্বস্তি আছে। অমর ত তার শ্বশুরবাড়ীর ওপর অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে আছে, বিয়ের রাত্রে তারা এমনি অভদ্রতা করেছে। বেহাই লোকটি যে বিশেষ সুবিধের নয় তা এই মাসখানেকের ব্যবহারে বেরিয়ে পড়েছে। বড় কুলীন হলেই যে বেশী ভদ্র হয় না—এশিক্ষা আমি বুড়োবয়সে পেলুম। তোরা যখন ভুল করিস আমরা কত বকি। আর বেশী বয়সের দোহাই দিয়ে আমরা যখন অন্যের ঘাড়ে বোঝা চাপিয়ে বসি—অমর যদি আজ আমার ওপর রাগ করে, আমার বলার ত কিছু নেই।

ব্যাপারটার উজ্জ্বল দিক দেখিবার চেষ্টায় স্নুবিমল বলিল—কিন্তু আপনার বেহাইএর সঙ্গে আমাদের ত তত সম্বন্ধ নয় যত তাঁর মেয়ের সঙ্গে। মেয়েটি কেমন, তাকে কেমন দেখলেন এতদিন, তাই বলুন।

—বৌমা আমার খুব কাজের মেয়ে, কিন্তু কেমন যেন চাপা। তার মনের কথা মনের মধ্যেই থেকে যায়। মা-মরা মেয়ে কিনা। মামার বাড়ী মানুষ। তারা লোক ভালো। তাই মনে মনে কামনা করি, ও যেন বাপের বাড়ীর ধারা না পেয়ে মামার বাড়ীর ধারা পায়। তবু ত মন মানতে চায় না। তা বউমা ত কাল আসছে এবাড়ী। তুই কাল রাত্রে এখানে খেতে আসিস। আমি আর কাউকে বলবো না, যাতে তোদের আলাপ-পরিচয়ের অসুবিধে না হয়।

সুবিমল তখন চলিয়া আসিল। পরে অমরেশ তাহার সহিত দেখা করিতে আসিয়া দেখা না পাইয়া ফিরিয়া গেল। পরের দিন অমরেশের ফেরার অপেক্ষা না করিয়াই সকাল সকাল হাজির হইয়া সুবিমল অতি সহজে বিভাবরীর সহিত ভাব জমাইয়া তুলিল। ভুবনমোহিনীর অনুমোদন ও সহযোগিতা থাকায় নূতন বধূর সহিত আলাপ মোটেই কঠিন হইল না। অমরেশও আসিয়া সানন্দে যোগ দিল। বিভাকে উদ্দেশ করিয়া বলিল,—দেখলে ত ঠিক বলেছিলুম কি না। আমার কাছে যতই আড়ষ্ট হয়ে থাকো না কেন, ওর কাছে নরম হতেই হবে। বিভাও হাসিতে হাসিতে উত্তর দিল —হবে না কেন, উনি যে আমাদের কালো লোকের দলের লোক, তাদের জন্যে জেল পর্য্যন্ত খেটেছেন। সুবিমল কি একটা বলিতে যাইতেছিল; তাহার পূর্ব্বেই অমরেশ বলিল,—কিন্তু কালো বলে কি আদরের কিছু কমতি পড়েছে? এইবার বিভা লজ্জিত হইয়া পড়িল। সুবিমল বিভাকে কহিল,—সত্যি কথায় রাগ কোরবেন না যেন, জেলে বসে অমরের বৌ কালো হয়েছে জেনে ক্ষোভ হয়েছিল বৈকি। কিন্তু এখন আর আমার কোনো ক্ষোভ নেই। কী অপূর্ব্ব আপনার কণ্ঠস্বর। এ সম্পদ যার আছে তার কাছে রঙ তুচ্ছ। বিভাকে ব্যঙ্গ করিবার সুযোগ পাইয়া অমরেশ বলিল—এরই মধ্যে স্কুলের মেডেলের কথা বলা হয়ে গেছে? দেখানোও হয়ে গেছে বোধহয়। বিভা তাহার উল্লেখ পর্য্যন্ত করে নাই। তাই রাগিয়া গিয়া কহিল—হ্যাঁ, সেটা যে আমি সমস্তক্ষণ গলায় পরে বেড়াই। সুবিমল বলিল—তা কি কোরে হবে, সেটার জায়গা ত অমরের গলায়। বিভা বলিল—ওঁর ভারি দায় পড়েছে আমার মেডেল পরতে। আমাকে উনি ওঁর মেডেলের কথা বলেছিলেন

বলেই ত আমি আমার মেডেলের কথা বলেছিলাম। নইলে—। বাধা দিয়া সুবিমল কহিল,—বেশ ত অমরের দরকার না থাকে, আমায় দেবেন কোনো একটা ছুতো কোরে—ধরুন যেমন জেলে গিয়েছিলুম বলে। ভাগ্যে ত কোনোদিন মেডেল জোটেনি, আপনার অনুগ্রহে যদি সে অভাব পূরণ হয়। সে যাই হোক, গান আপনার ছাড়া চলবে না, অভ্যেস বজায় রাখতেই হবে। আর আমার কথা মেনে যদি চলেন তাহলে দেখে নেবেন, অমরেশ ডাক্তার যত বড় ডাক্তারই হোক না কেন, তার প্রধান পরিচয় হবে যে সে বিখ্যাত গায়িকা বিভাবরী দেবীর স্বামী। অমরেশ জুড়িয়া দিল, সুবিমলের স্বরভঙ্গীর নকল করিয়া—যে বিভাবরী দেবী সুবিমল উকীলের একমাত্র মক্কেল—বিনি-পয়সার গানের মক্কেল।

অমরেশের বাড়ীতে সুবিমলের সান্ধ্যভোজন এই নূতন নহে, বিনা ডাকেই অজস্রবার সে খাইয়াছে। তবু আজ তাহাকে খাওয়াইবার জন্য ভুবনমোহিনী বিশিষ্ট আয়োজনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। একে সে বিবাহে যোগদান করিতে পারে নাই, তদুপরি সদ্য জেল হইতে ছাড়া পাইয়াছে। সেখানে যে-রাজভোগ ছেলেদের কপালে জোটে, তাহা মনে পড়িলে কোন্ মায়ের চিত্ত স্থির থাকিতে পারে। বিভাবরীকে তিনি আজ ইচ্ছা করিয়াই কোনো কাজে হাত দিতে দেন নাই। অথচ নিজে শত কাজে ব্যস্ত থাকিলেও তাঁহার কান পড়িয়াছিল যে ঘরে সুবিমল অমরেশ ও বিভাবরীকে লইয়া আড্ডা জমাইয়া তুলিয়াছিল। এতদিন ধরিয়া তাঁহার মনের আকাশে যে দুর্ভাবনার মেঘ ঘনাইয়া উঠিয়াছিল, আজ ইহাদের রহস্যালাপ তাহাকে ঝড়ের মতো দিগন্তরালে বিলীন করিয়া দিল। ইহাতেও ভুবনমোহিনীর তৃপ্তি আসে নাই। তাঁহার কালো বৌকে তিনি এমন করিয়া গড়িয়া তুলিতে চাহেন যাহাতে তাহাকে তাঁহার শিক্ষিত পুত্র অযোগ্য না মনে করে; তাহার মনে যেন কোনো বঞ্চিতের ভাব না থাকে, বরং স্ত্রীর খ্যাতিতে যেন তাহার নিজের মনেই অহঙ্কারের উদ্রেক হয়। বিভাবরীর সঙ্গীত পারদর্শিতার কথায় তিনি যেন পথ খুঁজিয়া পাইলেন। তাহাকে গান শিখাইবার প্রস্তাব সুবিমলের নিকট তুলিতেই সে রাজী হইয়া গেল। তাহার আর পরীক্ষার বালাই নাই, আপাততঃ দেশের কাজও কিছু মন্দা পড়িয়াছে, তাই তাহার এখন সুপ্রচুর

অবসর। গানের বিষয় তাহার সখ আছে, শিক্ষা আছে, নাই শক্তি। সে শক্তি যে বিভাবরীর প্রচুর পরিমাণে আছে, তাহাতে তাহার একটুও সন্দেহ নাই। অমরেশ শুনিয়া বলিল—আমার খুব মত আছে, তবে আমি যতক্ষণ বাড়ী থাকবো, ততক্ষণ ও গানের আসর যেন না বসে। গান শুনতে আমার মন্দ লাগে না, কিন্তু গানের কসরতের চেয়ে বিরক্তিকর আর কিছু নেই।

বিভাবরীর সহিত সুবিমলের ঘনিষ্ঠতার এই হইল সূত্রপাত। সে যখন তখন আসে, যতক্ষণ খুশী থাকে, খাবার করাইয়া খায়, গল্প করে, গান শেখায়, কবিতা শোনায়, বাছিয়া বাছিয়া সিনেমার ছবি দেখিতে লইয়া যায়, দেশ বিদেশের জীবনযাত্রায় আগ্রহান্বিত করাইবার জন্য। তাহার উৎসাহে বিভাবরী দু একটা ছোটো-খাটো প্রকাশ্য সভায় গান গাওয়ায় খ্যাতির বিস্তার আরম্ভ হইল। নানাদিক হইতে নিমন্ত্রণ, উপরোধ, মিনতি আসে, ভুবন-মোহিনীর চিত্ত উৎফুল্ল হয়। তাঁহার মনস্কামনা সিদ্ধ হইল যেদিন একটা বৃহৎ সঙ্গীত-যজ্ঞে অংশ গ্রহণ করিয়া অসাধারণ সাফল্য অর্জ্জন করায় বাংলা দেশের সকল পত্রে বিভাবরীর চিত্র ও প্রশস্তি প্রচুর স্থান অধিকার করিয়া দেশময় ছড়াইয়া পড়িল।

অমরেশ সগৌরবে পাশ করিয়া তাহার স্বভাবসিদ্ধ একাগ্রতার সহিত উন্নতির চেষ্টায় লাগিয়াছে। সংসারের কোনো বিষয়ে সে কোনো কথা কহে না। ভুবনমোহিনীর আর ইচ্ছে করে না যে বিভাবরী বাহিরের কাজে এত সময় ও মন দেয়। অথচ তিনি বুঝিতেছিলেন বাহিরের ডাকে একবার কান দিলে পিছাইয়া আসা কি কঠিন। এমন সময় তাঁহার প্রথম পৌত্র মুন্না আসিয়া সমস্যার সমাধান করিয়া দিল। বছর দুয়েকের মধ্যেই আদরের নাৎনী ঝুন্নি আসিয়া উপস্থিত। সুবিমল অমরেশকে কহিল—করছিস কি, আর না। অমরেশ হাসিতে হাসিতে উত্তর দিল—তথাস্তু। ঝুন্নির বছর পূরিবার পূর্ব্বেই ভুবনমোহিনী প্রশান্ত চিত্তে ইহলোক ত্যাগ করিলেন। গৃহিণীপনার সমস্ত গুরুভার ঘাড়ে আসিয়া পড়ায় বিভাবরীকে সম্পূর্ণভাবে গৃহকর্ম্মে লাগিয়া যাইতে হইল।

(৩)

ভুবনমোহিনীর মৃত্যুতে সুবিমল এই সংসারের আরো নিকটে আসিয়া পড়িল। এমন-কি চাকর-বাকরেও বুঝিতে পারিল এই বাবুটি বাহিরের হইলেও ইহার অমতে এ সংসারে কোনো কিছু হইতে পারে না। মুন্না কথা কহিতে শিখিবার সঙ্গে সঙ্গে সুবিমল তাহাকে শিখাইল নিজেকে জ্যাঠাবাবু বলিয়া ডাকিতে ও সেই সুবাদে সে বিভাবরীকে নাম ধরিয়া ডাকিতে ও তুমি বলিতে আরম্ভ করিল। মুন্না-ঝুন্নিকে গড়িয়া তোলার ভার যেন আপনা হইতে সুবিমলের হাতে আসিয়া পড়িল। সে শিশুশিক্ষার আধুনিক পুস্তক বিভাকে পড়িয়া শোনায় ও তাহার নির্দ্দেশ-মতো বিভা ছেলেমেয়েকে চালিত করে। অমরেশকে তাহার ব্যবসায়ে এত ব্যস্ত থাকিতে হয় যে সে প্রায়ই এ সব আলোচনায় যোগ দিতে পারে না। রাত্রে বিভা যখন তাহাকে সারাদিনের কাহিনী শোনাইবার চেষ্টা করে তখন অমরেশ খানিকটা শুনিয়া খানিকটা না শুনিয়া উত্তর দেয়—তোমরা দুজনে যে ব্যবস্থা কোরেছ, আমি আর তার ওপর কি বলব। সুবি আমার চেয়ে এসব বিষয় ঢের বেশী জানে ও ভেবে দেখেছে। তবে তোমার যদি কখনো ওর ব্যবস্থায় খটকা লাগে, আমায় বোলো, তখন ভেবে দেখতে হবে ঠিক হচ্ছে কিনা। এটা কিন্তু ভুলে যেয়ো না মুন্না-ঝুন্নিকে মানুষ করার প্রধান দায়িত্ব তোমার ওপর। এখন থেকে তোমার জীবনের কেন্দ্র ওরা, আমি নয়। হাজার হলেও সুবি আইবুড়ো মানুষ; ছেলেমেয়ে সম্বন্ধে কতকটা উদ্ভট ধারণা থাকা তার পক্ষে অসম্ভব নয়।

—আচ্ছা বল না, উনি কেন বিয়ে করেন নি। আমার এত অবাক লাগে; দেশে ত ভাল মেয়ের অভাব নেই।

—তুমি কেন নিজে তাকে জিজ্ঞেস করো না?

—ভয় করে। এমনি বেশ সহজ মানুষ, হাসি-ঠাট্টায় ভরা; কিন্তু নিজের বিষয়ে কোনো কথা কখনো বলেন কি। কখনো কোনো ইঙ্গিত কোরলে হয় চট্ কোরে এড়িয়ে যান, নয় এমন গম্ভীর হয়ে পড়েন যে আর এগোতে ভয় করে।

—কৈ আমাকে ত তুমি এখন ভয় করো না।

—বেশ লোক ত, তোমাকে কেন ভয় করতে যাবো। তোমার সঙ্গে কার তুলনা ?

—সুবিকে তুমি তাহলে পর ভাবো ?

—তা কি সম্ভব ? ওঁর চেয়ে আপনার আমাদের আর কে আছে ? আমি সত্যি কথা বললে তুমি আমায় নীচ স্বার্থপর ভাববে, তবুও একথা ঠিক উনি বিয়ে না করায় আমি মনে মনে খুশী। তাহলে ত ওঁকে এত নিকটে পাওয়া যেতো না।

—আচ্ছা, তোমার সঙ্গে মিশতে দেখলে যদি সুবির স্ত্রীর রাগ হোত, তাহলে কি আমার রাগ হওয়াও উচিত নয় ?

—তোমার আজ হয়েছে কি, যা-তা বলতে আরম্ভ করেছ ! তোমার বন্ধুকে কি তুমি জানো না ? ওঁর সঙ্গে কি কোনো মানুষের তুলনা হয় ? উনি কি আমাদের জগতের মানুষ ? দয়া কোরে যেটুকু সঙ্গ দেন, আমাদের পক্ষে তাই যথেষ্ট। বলিতে বলিতে বিভার কণ্ঠস্বর এমনই উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল যে তাহা নিজে বুঝিতে পারিয়া লজ্জিত হইয়া পড়িল। সে উত্তেজনা অমরেশের দৃষ্টি এড়াইল না। তাই একটু চুপ করিয়া থাকার পর সে বলিল—দেখ বিভা আমি এত বোকা নই যে বিয়ে করেছি বলেই তোমার মনের সমস্তটার ওপর আমার দাবী ফলাবো। একটু হাসিয়া বলিল,—আমি ডাক্তার মানুষ শরীরটা বুঝি, মোটা জিনিষ নিয়েই আমার কারবার। তোমার প্রতি অবিচার করতে চাইনে, তোমার মনও আমি পেয়েছি বৈকি। আমি বুঝতে পারি তোমার জাগ্রত চৈতন্যের সবটা দিয়েই তুমি আমায় চাও। তাই ত তোমার স্বামীসেবা এমন নিখুঁত, তোমার আদর এত উচ্ছ্বসিত। কিন্তু মানুষের মনের, বিশেষতঃ মেয়েদের মনের কতটুকুই বা জাগ্রত। অন্তরের গভীর গহনে যেখানে আমাদের ব্যক্তিসত্তা তৈরী হয় সেখানে আমার চেয়ে সুবি-র প্রভাব তোমার ওপর ঢের বেশী। এতে রাগের দুঃখের বা লজ্জার কিছু নেই। সে ভাবুক লোক ; তার মন যদি তোমার মনকে বেশী টেনে থাকে তাতে জাগতিক নীতির কোনই ব্যভিচার ঘটেনি।

—তুমি যা বললে সব শুনলুম, জানি না সব বুঝলুম কি না। আমি

তোমায় সুধু এটুকু বলতে পারি, হ্যাঁ জোরগলায় বলতে পারি, যাকে আমি যত শ্রদ্ধাই করি না কেন, আমার স্বামী তুমিই, তুমি ছাড়া আর কেউ নয়।

সেদিনের মতো আলোচনা থামিল। দিন দুই পরে সুবিমল হঠাৎ সন্ধ্যায় আসিয়া বিভাকে ডাকিয়া কহিল—তোমার ঠাকুরকে বলে দাও আমার জন্যে কিছু খাবার করতে, আমি বড় ক্লান্ত। আর শোনো তুমি একটা গান গাইবে? অনেক দিন গাও না, একটা গান শুনতে ইচ্ছে করছে।

—আমি এখন গাইতে পারবো না।

—কেন, কি হয়েছে?

—কিছু হয় নি, এম্‌নিই।

—তুমি ত আগে কখনো আমার এমন অবাধ্য হও নি।

—আপনার কথা আমি আর শুনবো না আপনি যদি আমার কথা না শোনেন।

—সে কি, তোমার কোন্ কথাটা আমি রাখি নি।

—আমায় ত বলেন নি কেন আপনি বিয়ে করেন না।

—ওঃ, এই কথা। তুমি কি কখনো জানতে চেয়েছ। তা ছাড়া অমর কি তোমায় বলেনি?

—না, তিনি বলেছেন আপনাকে জিজ্ঞাসা কোরতে।

—বলে দিলেই পারত। শোনো তবে বলি। আমি এক সময় একটি মেয়েকে ভালবাসতুম। কী তার রূপ, যেন একগাছ-ভরা রডোডেন-ড্রেন চোখ ফেরানো যায় না। আমি ছিলাম সেই রূপের পূজারী—অবশ্য একটা বড়ো দলের মধ্যে একজন। এক এক সময় মনে হোত, যেন আমাকেও সে চায়। এমন সময় লাগলো দেশে গণ্ডগোল, এলো ডাক আমার অন্তরে। বল্‌লুম, যোগ দাও, ঝাঁপিয়ে পড়ো। বল্‌লে, ও-সব তার পোষাবে না। হোল ফারখাৎ। বেঁচে গেছে; এখন সে আছে মহাসুখে। মস্ত বড় লোক স্বামী, চা-বাগানের জমিদার। বছরে ন মাস ইউরোপেই থাকে, এর চেয়ে বড় সৌভাগ্য সে মেয়ের আমি কল্পনাই করতে পারি না।

—আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। মনে হচ্ছে আপনি আমায় ভোলাতে গল্প বানিয়ে বলছেন।

—অমরকে জিজ্ঞাসা কোরো। কিন্তু আমাকে তুমি আজকাল অবিশ্বাসী ভাবতেও আরম্ভ কোরেছ।

বিভা লজ্জিত হইয়া বলিল—আপনি কি যে বলেন তার ঠিক নেই। ফাঁক পেলেই এমন বকে দেন আপনি। আচ্ছা মানছি আপনার কথা। কিন্তু একজনের সঙ্গে বিয়ের কথা হয়ে ভেঙে গেছে বলেই—

—বিভা, তোমাকে সংশোধন করা বিশেষ দরকার। তুমি নারী হয়ে আর একজন অনুপস্থিত নারীর প্রতি অন্যায় কোরছ—তোমার মতো প্রগতিশীল মহিলার কি এটা উচিত! আমি ত একবারও বলিনি সে আমায় বিয়ের কথা দিয়েছিল। আমাকে তার মাঝে মাঝে ভালো লাগত—অন্য অনেক লোককেও লাগতো।

—আপনাকে জানার পরে?

—এতে এতো আশ্চর্য্য হবার কি আছে? তোমার কি ধারণা আমি এমনই একজন শ্রীকৃষ্ণ যার কাছে সব আধুনিক গোপবালা কুলমান ত্যাগ কোরে দৌড়ে আসবে? কই, তোমার ব্যবহারে এতদিনের মধ্যে আমি তার একটা প্রমাণও পাই নি।

—তার কারণ, আমার স্বামীর মতো মহাদেব স্বামী আর কারো নেই।

এমন ঘটা করিয়া কথাটা বলার ইচ্ছা বিভার ছিল না। সে বুঝিতে পারিল সেদিন রাত্রে অমরেশের সহিত আলোচনার ফলেই আজ এ কথা এমন উষ্মার সহিত প্রকাশ পাইল। সুবিমল কিন্তু ঠাট্টার ছলেই উত্তর দিল—তোমার এই প্রবল স্বামীভক্তির উচ্ছ্বাস দেখে প্রীত হলুম। এই জন্যেই তোমায় এত ভালোবাসি, কারণ তোমায় ভালবাসা সম্পূর্ণ নিরাপদ। বাঘছালে যার মন মজেছে শ্যামের বাঁশীও কি তাকে টানতে পারে?

—আপনার আজ হয়েছে কি, আমাকে রীতিমতো অপ্রস্তুত না কোরে বুঝি তৃপ্তি পাচ্ছেন না। আমি যে কথা জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিলুম তা ভালোভাবে শুনলেন না পর্য্যন্ত। আমি বলতে চাইছিলুম, একবার না হয় একটি মেয়ে আপনার মনের ইচ্ছাকে ব্যর্থ করেছে; সেই কারণে কি অন্য কোনো মেয়েকে বেছে নেওয়া অন্যায়?

—কে বলছে এমন কথা?

—তবে আপনি আজও একা কেন ?

—আজও কপালে কেউ জোটে নি বলে।

—ও আবার একটা কথা! বলুন না কি রকম মেয়ে আপনার পছন্দ।

—এতদিনে যখন বুঝতে পারোনি, তখন বর্ণনা কোরেই বলি শোন।

—শুনছি, একটু দাঁড়ান খাবারটা নিয়ে আসি। আপনি খেতে খেতে বলবেন।

—বেশ। তারপর আবার আরম্ভ করিল—সুন্দর মেয়ের সখ যে আমার মিটে গেছে তা আগেই বলেছি। কাজেই আমি এখন খুঁজছি কালো মেয়ে, দস্তুরমতো কালো মেয়ে চাই।

—জানেন, আর কেউ আমার সামনে এমন কথা বললে আমি অত্যন্ত অপমানিত বোধ করতুম।

—আমাকে যে বাদ দিলে, এ কৃপাটুকুর জন্যে ধন্যবাদ। কিন্তু তুমি কি ভাবছ যে মেয়েটি শুধু কালো হলেই আমার পছন্দ হবে? তার চুল হওয়া চাই যেন প্রথম-বৈশাখী ঝড়ের মেঘ; তার চোখ, যেন অন্ধকার আকাশে যুগ্মতারা। তার গলা, মানে তার কণ্ঠস্বর হবে, তা যে কি রকম হবে তার কোনো তুলনাই আমি খুঁজে পাইনে। আর, গান গাইতে বললে সে কখনো না বলবে না।

নিজের এই সকৌতুক সাড়ম্বর বর্ণনায় বিভা খানিকটা পুলকিত, খানিকটা লজ্জিত হইল। তারপরে বলিল—আর খোঁচা দিতে হবে না, কথা শুনছি। বলিয়া এস্রাজটা নামাইয়া লইয়া ঘর অন্ধকার করিয়া দিল। জানিত সুবিমল ইহা পছন্দ করে। সুবিমল শয্যার আরামে নিজেকে ছাড়িয়া দিবার জন্য চেয়ার হইতে বিছানায় উঠিয়া আসিল।

রাত্রে অমরেশ বিভার নিকট সমস্ত শুনিয়া ভাবিতে লাগিল—কি তালটাই পাকায় যদি সুবি সত্য সত্যই বিভাকে ভালোবাসিয়া ফেলে। কিন্তু সে অনাগত দুশ্চিন্তায় বর্ত্তমানে লাভ কি? তাই সে তখন শয্যা-পার্শ্বস্থ সঙ্গিনীকে সাগ্রহে জড়াইয়া ধরিল।

(৪)

অমরেশের মৃত্যুর পর দেখা গেল সে এমন কিছু রাখিয়া যায় নাই যাহাতে তাহার স্ত্রী পুত্র কন্যার স্বাধীনভাবে চলিতে পারে। তাহার বয়সী ডাক্তারদের তুলনায় আয় তাহার নিতান্ত মন্দ ছিল না; সমস্তই সে প্রয়োগ করিত ভবিষ্যতে প্রতিপ্রাপ্তির আশায়। মৃত্যুর সম্ভাবনা স্বপ্নেও মনে না আসায় সঞ্চয়ের দিকে মোটেই দৃষ্টি দেয় নাই। ভাবিত, বর্ত্তমানের দাবী আগে মিটাইয়া লই, ভবিষ্যতের সংস্থান পরে করা যাইবে। তাই তাহার সংসারের ডালপালার বিস্তার যত বাড়িতেছিল, শিকড়ের মুখ তত নিম্নগামী হয় নাই। তাহার মৃত্যুতে বিভাবরীর অবস্থার যে পরিবর্ত্তনের সূচনা হইল তাহা চিত্রজগতে অতি সাধারণ বলিয়াই সংসার-নাট্যে অতি বিরল নয়। অমরেশের নিকট-আত্মীয় কেহ ছিলেন না। থাকিলেও তাঁহাদের সহিত কোনো সাংসারিক ও আন্তরিক যোগ না থাকায় কেহই তাহার অনাথ পরিবারের ভার লইতে অগ্রসর হইলেন না। বিভার দিদিমা বাঁচিয়া থাকিলে, মাতৃহীন দৌহিত্রীকে পরিত্যাগ করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইত। কিন্তু তাঁহার অবর্ত্তমানে সে সংসার ছিন্নভিন্ন হইয়া নানা স্থানে ছড়াইয়া গিয়াছে। মামারা সকলেই ছা-পোষা মানুষ; কাহারো এত প্রচুর সংস্থান নাই যে সাগ্রহে এই গুরুভার তুলিয়া লইবেন। সুবিমল ভাবিতেছিল—তাহার দাদাদের সংসারে সে থাকে অনেকটা নিরালম্বভাবে; যেন পাকা ফল বা শুকনো পাতা, হাওয়ার একটু দোলাতেই আল্‌গা বাঁধন খসিয়া পড়িবে। আজ মা বাঁচিয়া থাকিলে কি কোনো ভাবনা ছিল।—অগত্যা অনন্যোপায় হইয়া হরনাথ অত্যন্ত অপ্রসন্নভাবে কন্যার সংসারের দায়িত্ব লইতে বাধ্য হইলেন। বিভাবরী প্রস্তাব করিয়াছিল, কোনো ভদ্র পরিবারে দুটা কি একটা ঘর ভাড়া লইয়া সে স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জ্জনের চেষ্টা দেখিবে। কিন্তু এ প্রস্তাব হরনাথের কুলমর্য্যাদার নিকট এমনই বৈপ্লবিক, তিনি এমনই শিহরণ ও গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন যে তাহার বর্ত্তমান দুরবস্থায় বিভা আর উচ্চবাচ্য করিতে সাহস পাইল না।

স্বামীর জন্য নিশ্চিন্ত হইয়া শোক করিবার অবসরটুকু হইতেও বিধাতা

বিভাবরীকে বঞ্চিত করিলেন। অনিবার্য্য দুর্দ্দিন নিষ্ঠুর পরিহাসে তাহাকে সম্ভাষণ করিতে ছুটিয়া আসিল। যে সংসার বিভাবরী তিলে তিলে গড়িয়া তুলিয়াছে; যাহার প্রত্যেকটি খুঁটিনাটির সহিত তাহার শতস্মৃতি বিজড়িত; যেখানে সে পাইয়াছে শাশুড়ীর স্নেহ, স্বামীর প্রেম, আদরের ছেলেমেয়ে, অগাধ শান্তি, অসীম তৃপ্তি, একান্ত নির্ভর; খ্যাতি ও প্রীতি, মানব-জীবনের এ দুটি পরম কাম্যের সাক্ষাৎ যে সংসারে মিলিয়াছিল অযাচিত-ভাবে,—আজ স্বহস্তে সেই সংসার চূরমার করিতে গিয়া মর্ম্মান্তিক বেদনায় তাহার অন্তর নিষ্পেষিত হইয়া গেল। তাহার দশবৎসরের সুখস্বর্গ ইন্দ্রধনুর মতো মিলাইয়া গেল, রহিল সুধু ভ্রুকুটিকুটিল পুঞ্জীভূত কালো মেঘ। মানুষের সহনশক্তির সীমা কোথায়, কেহ জানে না। তাই পারিল বিভাবরী তাহার ছেলেমেয়ের হাত ধরিয়া বাপের বাড়ী আসিয়া উঠিতে। বাপের বাড়ী—বিভা তিক্তভাবে না ভাবিয়া পারিল না—জন্ম হইতেই যে মেয়ে মা-হারা তাহার আবার বাপের বাড়ী কি? বিবাহ পর্য্যন্ত দিদিমা ও বাড়ী কখনো যাইতে দেন নাই; হরনাথ কদাচ কখন আসিয়া পূর্ব্ব সম্বন্ধ স্মরণ করাইয়া দিয়া গিয়াছে মাত্র। বিবাহের পর মাঝে মাঝে আসিয়াছে বটে; কিন্তু সে আসা ত সগৌরবে আসা, হিংসার পাত্রী হইয়া আসা। কে ভাবিতে পারিত মা-মরা কালো মেয়ের এমন ভালো বর জুটিতে পারে। তাহার বিমাতা একটি রাত্রিবাসের অনুরোধও কখন তাহাকে করে নাই। "তুমি বাছা বড় ঘরের বৌ, এ গরীব ঘরে কি তোমার পোষাবে? জামাই আবার আমাদের দেখতে পারেন না", এই সব বক্রোক্তির পর বিভার দিক হইতেও কোনো আগ্রহ ছিল না ইহাদের সহিত ভাব রাখিবার। তা ছাড়া তখন তাহার বিবাহিত জীবন মন্দাকিনীধারার মতো আপন বেগে প্রবহমান।

হরনাথেরা তিন ভাই, হরনাথ মেজো। একান্নবর্ত্তী পরিবার, অর্থাৎ এক হাঁড়িতে রান্না হয় ও এক ঝিয়ে কাজ করে। বাকী সমস্ত বিষয়ে তিন জায়ের ঘরকন্না যেন একই সৌর জগতের তিনটি বিভিন্ন গ্রহ। সংসারের প্রধান মালিক ছোট কর্ত্তা, কারণ তাঁহার বাঁধা আয় আছে। সদাগরী অফিসে কাজ, যেখানে মাহিনার চেয়ে উপ্‌রি বেশী। সংসারের সাধারণ খরচ তিনিই দেন বলিয়া ছোট গিন্নীর প্রভুত্ব সেই অনুপাতে প্রকট। কাজ

করিবেন কম, দোষ দেখাইবেন বেশী, এটাকে তিনি তাঁহার ন্যায্য পাওনা বলিয়া দাবী করেন মনে এবং মুখেও। বাড়ীতে তিন ভাগে বড়ো ছোটো ছেলে মেয়ে আপাততঃ গুটি তেরো। এক সঙ্গে খাইতে বসিয়া ছোট কর্ত্তার ছেলেমেয়েরা পাতে দুধ পায়, অন্যেরা চাহিয়া দেখে। বড় ও মেজো গিন্নী ইহাতে মনে মনে চটেন কিন্তু ফাটিতে পারেন না। তাঁহাদের স্বামীরা ব্যবসায়ে ফেল করিয়া এখন দালালিতে লাগিয়াছেন। কখন দু' পয়সা আসে, প্রায়ই ফসকাইয়া যায়। দু' পয়সার চেয়ে বেশী কিছু হাতে পড়িলে সেটা আর সংসার পর্য্যন্ত পৌঁছায় না, ঘোড়দৌড়ের মাঠে হয় তাহার সদ্‌গতি। ছোট গিন্নীর প্রশ্রয় পাইয়া ঝি বামনীও সুযোগমতো দু এক কথা শুনাইয়া দিতে ছাড়ে না—এ সবও তাঁহাদিগকে বেমালুম হজম করিতে হয়।

এহেন সংসারে, এহেন মেজবাবু মেজো গিন্নীর প্রায় সম্বলশূন্য কন্যা হইয়া বিভা প্রবেশ করিল অসহায় বিধবা অবস্থায়, তার দুটি শিশু পুত্র-কন্যার সহিত। এ সংসারে যে খুব শান্তি যে কোনো কালেই ছিল তাহা সত্য নহে; বিভাবরী আসিয়া সে অস্পষ্ট কালো ছায়াকে ঘন করিয়া তুলিল। তাহার নিবিড় কালো রং গৃহময় ছড়াইয়া পড়িল, যেন একটা চলমান দুর্ল্লক্ষণ। বাড়ীর সব ঘরগুলি জোড়া, এ ছোট তরীতে তাহার ঠাঁই কোথায়, তাই তাহার জন্য নির্দ্দিষ্ট হইল ভিতর দিকের ঢাকা বারান্দার একটি কোণ। সেখানে পাতা একখানি তক্তাপোষে শয্যা ও তাহার তলে বাক্স ইত্যাদি। একটা দরজা পর্য্যন্ত নাই যে এক মুহূর্ত্ত বন্ধ করিয়া দিয়া একা হইবে। এরূপ উন্মুক্ত অবস্থায় শুইতে বিভার আতঙ্ক হইত, কিন্তু নিরুপায়। দুরন্ত ছেলেপিলেরা তাহার তক্তাপোষে যখন তখন লাফালাফি খেলাধূলা লাগাইয়া দিত, প্রতিবাদের উপায় নাই। মুস্কিল বাধিত, সুবিমল দেখা করিতে আসিলে। বাড়ীর ভিতরে তাহাকে আনা যায় না, বৈঠকখানা ঘরেও বেশীক্ষণ থাকিবার যো নাই, বিশেষতঃ তাহার মতো বয়স্থা মেয়ের পক্ষে একজন অনাত্মীয় পুরুষের সম্মুখে। অথচ বিভা সুবিমলকে আসিতে বারণ করিতে পারে না। এই লোকটি তাহার সুখের জীবনের নিত্য সঙ্গী, তাহার স্বামীর বিশ্বস্ত বন্ধু, তাহার বিপদসঙ্কুল ভবিষ্যৎ জীবনের নির্ভরশীল সহায়। তাহার মুন্না-ঝুন্নির একমাত্র প্রকৃত হিতকামী। তাহার মতানুসারে চলা বিভার এমন অভ্যাস

হইয়া গিয়াছে যে এখন তাহাকে না জানাইয়া কোনো কিছু করিতে অন্তরে বাধে। এ বাড়ীতে আসা অবধি এখানকার আবহাওয়া তাহার অপছন্দ হইলেও গভীর শোকে মন আচ্ছন্ন থাকায় অনেক বিসদৃশ ব্যাপার তাহার চোখে পড়িত না। ক্রমে চোখ খোলার সঙ্গে সঙ্গে, দম আটকাইয়া আসিতে লাগিল। সব চেয়ে অশান্তির কারণ হইল তাহার আহারের ব্যবস্থা লইয়া। তাহার স্বামী ছিল ডাক্তার, তাহার শাশুড়ী ছিলেন অত্যন্ত স্নেহশীলা। তাই তাহার সংসারে শুচিবাই ছিল না, ছিল পরিচ্ছন্নতা। এ বাড়ীতে ঠিক তার বিপরীত। শাস্ত্রসম্মত গোবরন্যাতার তাড়নায় রান্নাঘরটিতে নিত্য বর্ষা। অন্যত্রও স্তূপীকৃত আবর্জ্জনা। বিধবা বলিয়া, তাহার সম্বন্ধে বাছ-বিচারের অন্ত নাই, তাহার ত্রুটি-বিচ্যুতিরও সংখ্যা নাই। তাহার জন্য পৃথক রন্ধনের ব্যবস্থায় নানা অসুবিধা দেখিয়া বিভা একদিন বাড়ীর তিন গিন্নীর সামনে বিনা ভূমিকায় বলিয়া বসিল—আচ্ছা, আমার জন্যে আলাদা রাঁধার ব্যবস্থা বন্ধ রেখে সাধারণ হাঁড়ি থেকে দুমুঠো ভাত তুলে দিলে কি খুব অন্যায় হয়? অনেক ঝঞ্ঝাট বাঁচে কিন্তু তা হলে। এ ভীষণ প্রস্তাবে কৌলীন্য-আভিজাত্য-গর্ব্বিতা তিন গৃহিণীর মস্তকে যেন মুগুরের ঘা পড়িল। বাকরোধ কাটাইয়া উঠিলেন প্রথম স্বয়ং ছোট গিন্নী।—তার চেয়ে বল না কেন বাছা আমাদের সঙ্গে একপাতে খেতে চাও। মাছ দেখে নোলা শক্‌শক্ করে, তা কি বুঝতে পারিনে। এ সব কি অলক্ষুণে কথা গো, গেরস্তর বাড়ীতে। সাধে কি আর কপাল পোড়ে এই বয়সে। অনেক পাপে, বুঝলে দিদি, অনেক পাপে।—দিদি মেজদি'র সাধ্য কি যে ছোটগিন্নীর প্রতিবাদ করেন। এ আঘাত কোথায় গিয়া বিঁধিল তাহা বিভাই জানে। ইহার জন্য সে তৈরী হইয়াই ছিল। তাই মোটামুটি সহজভাবেই বলিতে পারিল—তাহলে আর এক কাজ করা যায়। এখন থেকে আমিই রাঁধব, আঁশ নিরামিষ দুইই। ও রান্নাঘরে দু হেঁসেল চলে না। বামুন ঠাকরুণের আর কি দরকার?

এ প্রস্তাবে ছোটগিন্নী সম্মত না হইয়া আর কি করেন। তাঁহার কর্ত্তাকেই বামুন ঠাকরুণের মাহিনা যোগাইতে হয়। সেটা বাঁচিলে বছরে সবসুদ্ধ লাভ বড় কম নয়। অবশ্য ছোট কর্ত্তাকে তিনি রেহাই দিবেন না, নিজের জন্য টাকাটা আদায় করিয়া লইবেন। তাই এবার তিনি কিঞ্চিৎ

নরম সুরে বলিলেন—তা মন্দ বলনি বাছা। তোমার মতো সোমত্ত মেয়ের ত এ সব করাই উচিত। তা কাল থেকে বামনী মাগীকে আসতে বারণ করে দিলেই হবে। কি বল মেজদি?

মেজদি কি আর বলিবেন। বিভা নিজে থেকেই বলিল—হ্যাঁ, তাই দেবেন।

ঝোঁকের মাথায় রান্নার ভার গ্রহণ করিয়া বিভা বুঝিল তাহার ভুল হইয়াছে। সেইদিন হইতে প্রত্যহ দুটিবেলা কাজ, এক বেলারও অবসর নাই। অবশ্য ছোটগিন্নী তাহাকে সহজে বিশ্বাস করেন নাই। নিজে এবং ছেলেমেয়েদের মারফতে চৌকি দিয়া তাঁহার এখন বিশ্বাস হইয়াছে যে লুকাইয়া মাছ তরকারি খাইবার লোভে বিভা এ ভার লয় নাই। এমন কি সে যে চালডাল ঘি তেল চুরি করিবে না, তাহাও ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। বামনীর আমলে শত সতর্কতা সত্ত্বেও যে বেশী খরচ পড়িত, এখন তাহা স্পষ্ট প্রমাণ হইয়া গেল। অথচ রান্না আগের চেয়ে স্বাদ হয় বলিয়া বাড়ীর কর্ত্তা গিন্নী হইতে ছেলেমেয়েরা পর্য্যন্ত সকলেই খুশী। হরনাথও যেন বিভাকে আনিয়া সংসারের একটা মস্ত উপকার করিয়াছেন, এরূপ ভাব দেখাইতে চাহিলেন। কিন্তু বিভা দেখিল তাহার ছেলেমেয়ে দুটির মাথা খাওয়া হইতেছে। তাহারা পূর্ব্বে কখনও স্কুলে পড়ে নাই। বাড়ীতে সুবিমল ও বিভার শিক্ষায় তাহারা শিক্ষিত হইতেছিল। তাহাদের ধরণধারণ ছিল স্বতন্ত্র। এ বাড়ীতে লেখাপড়ার শিক্ষাদীক্ষার কোনো বিশেষ আয়োজন নাই। কর্ত্তারা সকলেই বোঝেন ব্যবসা ও ঘোড়দৌড়। ছোট ছেলেমেয়েরা স্কুলে যায় অনেকটা প্রথা হিসাবে—কিন্তু লেখাপড়ার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তাহাদের মত অত্যন্ত সুদৃঢ়। প্রথম প্রথম বিভা যখন মুন্না-ঝুন্নিকে পড়াইতে বসিত, তখন কর্ত্তাগিন্নীরা ত বটেই, এমন-কি বাচ্ছারাও শোনাইতে ছাড়িত না—লেখাপড়া শিখিয়া কি হইবে? দোকান-দারি, ব্যবসাদারি, ইত্যাদিতে তাহাদের বুদ্ধি পাকিয়া উঠিতেছিল। কি করিয়া জিনিষের দর কষিয়া ফিরিওয়ালাকে জব্দ করিতে হয়, এ বিদ্যায় তাহারা ওস্তাদ। যে দুটি ছেলে বড়ো, তাহারা সকালে খবরের কাগজ খুলিয়া খেলার খবর জানার আগেই কোন ঘোড়া কোন রেস জিতিল তাহার সন্ধান

লয়। বিভা আজকাল মুন্না-ঝুন্নিকে চোখে দেখিবারই অবসর পায় না, পড়ানোর কথা দূরে থাকুক। সুধু এটুকু লাভ হইয়াছে যে তাহারা এখন পেট পুরিয়া খাইতে পায়, যেটা বামনীর আমলে সব সময় ঘটিত না। নিজের হাতে রান্নার ভার নেওয়ার বিভার পক্ষে এও আর একটা কারণ। এখন সে ভাবিয়া দেখিয়াছে সুধু খাইয়া দাইয়া, দোকান বাজার করিয়া, খেলিয়া বেড়াইয়া দিন কাটাইলে চলিবে না। অমরেশের সন্তানকে সে এরূপে নষ্ট হইতে দিবে কেমন করিয়া! তাই একদিন অতিকষ্টে সময় করিয়া ও টিপ্পনী শুনিবার ঝুঁকি ঘাড়ে লইয়াও সুবিমলকে জানাইল, মুন্না ঝুন্নিকে অন্ততঃ পক্ষে স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিতে। সুবিমলকে মুন্না-ঝুন্নি আজও মান্য করে, ভালোবাসে; সে আসিলে তাহাদের জমা যত কথা অনর্গল বলিয়া যায়। তাহাদের কাছ হইতে সুবিমল বিভার খবর পায়; নইলে এখন সব দিন বিভার সহিত তাহার চাক্ষুষ দেখাও ঘটে না। তাই সুবিমল যখন তাহাদিগকে স্কুলে ভর্ত্তি করার কথা বলিল, তাহারা উল্লাসে চীৎকার করিয়া উঠিল। তাহাদের আনন্দ আর সেদিন ধরে না যেদিন সুবিমল সত্যসত্যই স্কুলে নাম লিখাইয়া দরকার মতো পুঁথি পত্রাদি কিনিয়া দিয়া গেল। মাহিনার ভার সুবিমল নিজেই লইয়াছিল, বিভাকে গঞ্জনার হাত হইতে বাঁচাইবার জন্য বলিয়া গেল, উহারা ফ্রি-তে পড়িবে। অবশ্য বিভা জানিত সত্য ব্যাপারটি কি। যাই হোক যে আশায় বিভা মুন্না-ঝুন্নিকে স্কুলে দিল, তাহা ক্রমেই বিলীন হইতে লাগিল। স্কুলে দিলেই যদি বাংলাদেশের ছেলেমেয়েরা সুশিক্ষা পাইত, মানুষ হইয়া উঠিবার সুযোগ পাইত, তাহা হইলে বাংলাদেশের লেখাপড়া জানা যুবকগণের এ দারুণ অবনতির চিহ্ন দেখা যাইত না। বাংলাদেশের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির মতো কুশিক্ষার এ-হেন সুচারু কারখানা জগতের কোথাও মেলে কি না সন্দেহ। এই শোচনীয় অবস্থার জন্য কোনো এক পক্ষকে দায়ী করা বৃথা, তবু সত্যকে মানিয়া লওয়াই সঙ্গত। মুন্না-ঝুন্নির জীবন ছিল সযত্নে বেড়া-দেওয়া, সস্নেহ সতর্কতায় সুরক্ষিত। এখন বাড়ীতে ও স্কুলে কুসংসর্গের প্রভাবে ও সুপরিচালিত শাসনের অভাবে তাহাদের স্বভাব ক্রমেই অত্যন্ত মলিন হইয়া উঠিতে লাগিল। বিভাকে

অমান্য করিতে আর তাহাদের বাধে না, কেন না তাহারা দেখে বাড়ীতে কেহই বিভাকে কোনোরূপ সম্মান করে না। ফাঁকি দেওয়া, মিথ্যা বলা, ইত্যাদিতে অতি সহজেই অভ্যস্ত হইতে লাগিল—কারণ দেখে, এ বাড়ীর ইহাই প্রথা! মারধোর মাঝে মাঝে খায়,—আগে কখনও খায় নাই—কিন্তু তাহাতেও আর লজ্জা নাই। ওটাও ত নিত্য কর্ম্মের অংশ বিশেষ! সুবিমলকে যথাসাধ্য এড়াইয়া চলে। অথচ কাগজ পেন্‌সিল বা ডালমুট কি লজেনচুসের দরকার হইলে আদর কাড়াইবার কৌশলটি দিব্য আয়ত্ত করিয়া লইয়াছে। সুবিমল যে গোপনে তাহাদের স্কুলের মাহিনা দিয়া থাকে, তাহা আর গোপন রহিল না; কারণ সত্যের আছে রূঢ় নির্লজ্জতা, সে কাহারো কল্যাণের মুখ চাহিয়া থাকে না। ইহা লইয়া দস্তুর মতো ঘোঁট বাঁধিল। প্রকাশ্যত অন্যায় বলিতে না পারায় বক্র ইঙ্গিতের ব্যবহার চলিল বহুল পরিমাণেই। হরনাথ শুনিয়া হঠাৎ একদিন রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়াইয়া বিভাকে ডাক দিলেন—সাধারণতঃ তিনি বিভার অস্তিত্বকে লক্ষ্যই করেন না। বলিলেন, ছোকরা মাইনে দিতে চায় দিক; তাতেও আপত্তি কোরতে পারি, কিন্তু কোরতে চাইনে। অভদ্র হওয়া আমাদের বংশে নেই। কিন্তু এসব লুকোছাপি কেন? তাকে বলে দিয়ো, ওসব এ সংসারে চলবে না। বলিয়া সদর্প পদক্ষেপে হরনাথ বাহির হইয়া গেলেন, যেন জীবনে কখন তিনি কোনো মিথ্যাচরণ করেন নাই। মুখ ফুটিয়া উত্তর দিতে না পারায় বিভার চোখ ফাটিয়া জল আসিল। এই মিথ্যাটুকুর পিছনে যে ভদ্রমন আছে, বন্ধুপত্নীর সম্মান বাঁচাইবার যে নিঃস্বার্থ প্রয়াস আছে, হরনাথ বাপ হইয়াও কি তাহা বুঝিতে পারিলেন না? হরনাথ নিজেই কি এ মিথ্যা ছলের জন্য দায়ী নন? তাঁহার নিজেরই কি উচিত ছিল না তাহার ছেলেমেয়ের শিক্ষার ব্যবস্থা করা? উপরন্তু, বিধবা কন্যার শেষ সম্বলটুকু গ্রাস করিতে তাঁহার বংশগর্ব্বিত বিবেকে বাধে নাই। অমরেশের মৃত্যুতে কয়েক শত টাকা বিভার হাতে আসিয়া পড়ে। হরনাথ ব্যবসায়ী লোক, তাহাতে ঘোড়দৌড়ে অভ্যস্ত। কোনোখানে নগদ টাকা জমিয়া আছে দেখিলেই তাঁহার হাত নিসপিস করে। মাথায় হাজারো মতলব গজাইয়া উঠে কি

উপায়ে ঐ টাকা খাটাইয়া তিনি উহার সংখ্যাকে ফুলাইয়া তুলিতে পারেন। অনেকবার অনেকের অনেক টাকা খোয়াইয়াও তাঁহার আত্মবিশ্বাস বিন্দুমাত্র কমে নাই। কারণ, টাকাটা গেল বটে, অভিজ্ঞতা ত বাড়িল। বিভাকে বাড়িতে আনিয়া অবধি তাঁহার মন ঘুর ঘুর করে, ভ্রমরের মতো ঐ টাকা কয়টির আশেপাশে। শেষে খানিকটা কৌশল করিয়া, খানিকটা এক প্রকার জোর করিয়াই, সুদের লোভ দেখাইয়া টাকাটা ধার বলিয়া হাতাইয়া লইলেন। কথা ছিল সুদ দিবেন প্রতি মাসে বিভার হাত খরচ হিসাবে। সুবিমল শুনিয়া মুখভার করিয়াছিল। ইহার অর্থ বিভা ভালো করিয়াই জানে, বৃথাই দশ বৎসর উহার সহিত অন্তরঙ্গভাবে মিশে নাই। বুঝিল, তাহার এই মূঢ়তায় সুবিমল নিদারুণ চটিয়াছে। ভরসা ছিল হরনাথ মাসে মাসে নিয়মিত সুদ দিলে তাহার প্রসন্নতা ফিরিয়া পাইবার। কিন্তু দু এক মাস পরেই হরনাথ তাঁহার প্রতিজ্ঞা এমন ভুলিয়া গেলেন যে কাহার সাধ্য তাঁহাকে সে কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। বিভার আজ এ অবস্থা নয় যে বাপের সহিত মুখোমুখি বচসা করে। মনে মনে বুঝিল, তাহার সুদের আশা শীতকালের উত্তাপের মতো আকাশে মিলাইয়া গিয়াছে। সুধু তাহাই নয়, যে অগ্নিকুণ্ড হইতে সে এই উত্তাপের আশা করিয়াছিল তাহা পুড়িয়া নিঃশেষে ছাই হইয়া গিয়াছে, হয়ত ব্যবসায়ের কোনো অতি-অভিনব ফন্দীতে, নয়ত কোনো নূতন ঘোড়ার অভাবিত জয়ের প্রত্যাশায়। ক্রমে সুবিমলও ইহা বুঝিতে পারিল, কিন্তু বিভাকে কিছু বলিল না। কি হইবে বেচারীকে বৃথা কষ্ট দিয়া।

হরনাথের আস্ফালনের দু'একদিন পরে বিকাল বেলা সুবিমল বিভাদের বাড়ীর কাছ দিয়া যাইতেছিল। হঠাৎ মোড় ঘুরিয়া সেই বাড়ীর দিকে চলিল, যদি বিভার দেখা পায় এই আশায়। অন্ততঃ পক্ষে ছেলেমেয়ে দুটোকে ত দেখিতে পাইবে। পাইল দেখিতে। বাড়ীর সামনের একটা ছোট মাঠে তাহারা খেলা করিতেছিল। হঠাৎ সুবিমল ছুটিয়া গিয়া মুন্নার হাত টিপিয়া ধরিল। মুন্না আগে তাহাকে দেখিতে পায় নাই; এখন দেখিয়া ভয়ে, অপরাধে তাহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। সুবিমল তাহার মুখে শুনিয়াছিল এমন ভাষার প্রয়োগ যাহাতে সে শিশুমনোবিজ্ঞানের সকল

শিক্ষা ভুলিয়া গেল, হারাইল তাহার আত্ম-সংযম। তখন তাহার মনে সুধু একটি প্রশ্ন—এই সেই মুন্না? রাগের মাথায় সে মুন্নাকে প্রকাণ্ড একটি চড় লাগাইতে হাত তুলিয়াছিল এমন সময় ঝুন্নি রাক্ষসীর মতো তাহার গায়ে আসিয়া পড়িল। সে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল—দেনা দাদা ওকে কামড়ে। মারবে? জ্যাঠাবাবু না হাতীবাবু? কেন আসো তুমি? জানো তোমার জন্যে মা কত বকুনি খেয়েছে? সুবিমলের উঁচু করা হাত থপ করিয়া নামিয়া আসিল। ছাড়া পাইয়া মুন্না ঝুন্নি দৌড়িয়া দূরে পলাইয়া গিয়া সেখান হইতে মুখ ভ্যাংচাইতে লাগিল। ছেলেমেয়ের দল হো হো করিয়া, খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। চোখে অন্ধকার দেখিতে দেখিতে সুবিমল সেখান হইতে নিজের ঘরে ফিরিল, কোথায় কোন্ কাজ ছিল সম্পূর্ণ ভুলিয়া গেল।

(৫)

এতদিন ধরিয়া নিজের অলক্ষ্যে সুবিমলের মনে যে আপত্তি পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিতেছিল তাহার সম্পূর্ণ স্বরূপ আজ যেন অকস্মাৎ তাহার মানস পটে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিল, মুন্না ঝুন্নির এই অতর্কিত রূঢ় ব্যবহারে। অমরেশের শেষ কথা কয়টি সে ভুলিতে পারে না, ভুলিতে পারে না যে অমরেশ নিজের স্ত্রী পুত্র কন্যার ভবিষ্যৎ প্রতিপালনের জন্য কোনো আত্মীয়ের মুখাপেক্ষী না হইয়া নির্ভর করিয়াছিল তাহারই বন্ধুত্বের উপর। এই দুই বৎসর ধরিয়া সেই একান্ত নির্ভরের কী প্রতিদান সে দিতে পারিয়াছে। বিভার অবস্থার কথা মনে হইলে তাহার শরীর শিহরিয়া উঠে। স্বামীগৃহে যে ছিল আদরিণী গৃহিণী, পিতৃগৃহে তাহার অবস্থা দাসী অপেক্ষাও হেয়। আর ছেলেমেয়ে দুটা—যাহারা মানুষ হইয়া গড়িয়া না উঠিলে অমরেশের আত্মা স্বর্গে থাকিয়াও তৃপ্তি পাইবে না বলিয়া সুবিমলের বিশ্বাস—তাহাদের সর্ব্বনাশের জন্যে কুশিক্ষার কি বিপুল আয়োজন চারিপাশে সাজানো। করুণ হাস্যের সহিত তাহার মনে পড়িল, ইহাদের লইয়া শিক্ষাতত্ত্বের নবোদ্ভাবিত প্রণালীর নানা পরীক্ষা-পর্য্যবেক্ষণের কথা। মনে পড়িল, অমরেশের অসুখে হরনাথের হাস্যকর ব্যবহারের কথা—স্নেহের অভাবে

কর্ত্তব্য—প্রতিপালনের স্পষ্ট বোধগম্য অভিনয়। অথচ সাংসারিক হিসাবে সেই হরনাথই বিভার নিকটতম আত্মীয়, নিরাপদতম অভিভাবক। আর সুবিমল তাহার কেহই নহে—বিভার সহিত একটু নিভৃতে দেখা করাও এখন তাহার পক্ষে দুর্ল্লভ। আত্মীয়তার এই নিষ্করুণ প্রাণহীন দাবীতে সুবিমলের সহিষ্ণুতার সীমা ছাড়াইয়া যায়। প্রতিকূল সংসারের বিরুদ্ধে ন্যায় আচরণের পঙ্গুতায় তাহার ইচ্ছাশক্তি বিদ্রোহের পথ বাছিয়া লয়। সে প্রতিজ্ঞা করে যেমন করিয়াই হউক বিভাকে হরনাথের সংসার হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহার ছেলেমেয়েকে অমরেশের ইচ্ছানুযায়ী মানুষ করিবার চেষ্টা করিতে হইবে।

মুন্না ঝুন্নির শিক্ষা সমস্যার কথা ভাবিতে ভাবিতে নিজের মনের একটা অজ্ঞাত দিক সুবিমলের চোখে পড়িয়াছে। বিভার সংসারকে তাহার প্রয়োজন, বন্ধুপ্রীতির তাড়নে নয়, আত্মোপলব্ধির প্রাণোদনে। প্রত্যেক মানুষের অন্তরে আছে একটি সৃষ্টিকর্ত্তা, একটি রূপকার, তাহার কাজ অন্তরকে বাহিরে প্রকাশ করা, অগোচরকে সুষীম করিয়া মূর্ত্তি দেওয়া। সংসারের দিনগত পাপক্ষয়ের তাড়নায় যাহাদের সমস্ত শক্তি ব্যয়িত হয়, তাহাদের অন্তরের এই রূপকার সময় ও উপাদানের অভাবে আজীবন সুপ্তই থাকিয়া যায়। যাঁরা বীর, যাঁদের তেজ অমিত, তাঁরা জীবন-সংগ্রামের প্রতিকূলতা সত্ত্বেও সৃষ্টির অবসর অর্জ্জন করেন বটে, কিন্তু অধিকাংশের পক্ষে আত্মার অস্তিত্ব হয় অবজ্ঞাত, তাহার সৃষ্টির দাবী উপেক্ষিত। সুবিমলের সৌভাগ্য যে তাহার মা মৃত্যুকালে তাহার হাতে যে টাকা দিয়া গিয়াছেন তাহাতে তাহার আমরণ বিনা উপার্জ্জনে চলিয়া যাইতে পারে যদি সে অপব্যয় না করে। সচ্ছল সংসারে বাড়িয়া ওঠায় সে ছেলেবেলা হইতেই চিন্তানুশীলনের অবকাশ পাইয়াছে। এমন একদিন ছিল যখন সে কাব্য ও সঙ্গীত চর্চ্চায় কাটাইয়াছে। তাহার উর্দ্ধগামী মন আদর্শ সৌন্দর্য্যের সাধনায় পাইয়াছে অখণ্ড সুখ, নির্ব্বিরোধ তৃপ্তি। তারপর আসিল দেশের ডাক। সুবিমল ত্যাগ-সাধনার পথ ধরিল। পরে দেখিল সে পথে আর যাহারই থাক, তাহার আত্মার তৃপ্তি নাই। যে বিরাট ব্যক্তিত্ব থাকিলে নিজের আত্মাকে সহস্রের মধ্যে বিকীর্ণ করিয়া তাহাদের আত্মাকে উদ্বুদ্ধ

করা যায়, সে জানে সে শক্তির অধিকারী সে নয়। কাব্যে সঙ্গীতে আর সে পূর্ব্বেকার তৃপ্তি মেলে না; লাগে কেমন যেন অশরীরী ব্যাপার। মাটির—স্পর্শযোগ্য নির্ভরযোগ্য মাটির, অভাব। জেলের মধ্যে বসিয়া জীবনের নানা জটিল, কঠিন ও আবৃত অংশের সহিত সংস্পর্শে আসায় শিল্প সম্বন্ধে তাহার ধারণা বদলাইয়া গেল। সে এখন চায় জীবন-ধারার আমূল রূপান্তর যে রূপান্তর হইবে উচ্চতম আদর্শের অনুগামী; যে আদর্শ প্রতিফলিত হইবে প্রত্যেক দিনের প্রতিটি ছোট কাজের মধ্যেও। তাহার প্রধান কাজ নিজের মধ্যে এই উচ্চতম আদর্শের অনুসন্ধান ও নিজের জীবনে তাহার প্রয়োগ। কিন্তু আদর্শের পরীক্ষা সম্পূর্ণ হয় না, বাস্তবের প্রতিঘাতের অভাবে। সুবিমল তাহার দাদার সংসারে কোনরূপ আদর্শ পন্থা খাটাইবার সুযোগ পায় না। সকলেই তাহার পাশ কাটাইয়া চলে, তাহাকে দূরে দূরে রাখে ক্ষেপাটে বলিয়া, বাতিকগ্রস্ত বলিয়া। অমরেশের সংসার ছিল তাহার পরীক্ষাগার, সেখানে তাহার সমস্ত কল্পনার সব ধারণার বিচার হইত, ও প্রয়োগ চলিত। সেই সংসারই মানুষের আপন যেখানে সে শ্রদ্ধা পায়, বিবেচনা পায়, যেখানে পরস্পরের বন্ধন বাড়িয়া উঠে স্বাধীন মনোবিকাশের ফলে। রক্তের সম্বন্ধই যে সংসারের ভিত্তি তাহা ত মানব সভ্যতার আদিম যুগের উপযুক্ত।

অমরেশের মৃত্যুর পর বৎসর দুই ধরিয়া সুবিমলের আত্মা ক্ষুধিত হইয়া আছে, এই অনুকূল আবহাওয়ার অনুপস্থিতিতে। এখন তাহার জানা দরকার, তৃপ্তির সেই পুরাতন পথ তাহার পক্ষে একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে কিনা। বিভাকে সে হরনাথের সংসার হইতে মুক্ত করিতে চায়—এ বিষয়ে বিভার কি মত? কিন্তু কেমন করিয়া সে বিভাকে সকল কথা বুঝাইয়া বলিবে—তাহার সহিত দেখা হওয়াই যে দুঃসাধ্য। চিঠিতে লেখায় অনেক বিপদের সম্ভাবনা; উপায়াভাবে শেষ পর্য্যন্ত তাহাই বাঞ্ছনীয় কিনা ভাবিতেছে এমন সময় হঠাৎ একটা সুযোগ মিলিয়া গেল।

পথে যাইতে যাইতে সুবিমলের যেন মনে হইল একটা গাড়ী হইতে বিভার খুড়তুতো ভাইয়েরা নামিতেছে, উলটো ফুটপাতে থিয়েটার-বাড়ীর সামনে। পিছনে আর একটা গাড়ী আসিয়া লাগিল ও তাহা হইতে লাফাইয়া পড়িল মুন্না। সুবিমল একটা থামের আড়ালে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল!

বোধ হইল দুটি গাড়ী বোঝাই করিয়া বাড়ী-সুদ্ধ সবাই আসিয়াছে, আসে নাই শুধু বিভা। হয়ত তাহার ভুল হইয়াছে। তবুও যদি সে বাড়ীতে থাকে, তাহা হইলে নিরিবিলি দেখা করার এমন সুযোগের লোভ সুবিমল ছাড়িতে পারিল না।

কড়া নাড়িতে দরজা খুলিয়া দিল বিভা। সচমকে কহিল—আপনি। আমি ভেবেছিলুম ঝিটা বুঝি আবার ফিরে এলো। ভিতরে আসুন, জানেন আমি আজ একদম একা আছি।

—জানি ; জানি বলেইত এখন এলুম।

—কেমন কোরে জানলেন ? আপনি ত অনেকদিন এ পথ মাড়ান না।

সুবিমল ঘটনাটি বলিতে বলিতে একটা ঘরে আসিয়া বসিল। আলো জ্বালিতেই তাহার চোখে পড়িল বিভার চেহারা কী কুশ্রীই না হইয়া গিয়াছে। কালো সে চিরদিনই, কিন্তু তাহার শ্রী ছিল সুঠাম। এখন অবশিষ্ট আছে কেবল চোখের সেই স্বপ্নময় দৃষ্টি আর ঠোঁটের মৃদু হাসি। আর আছে তার কণ্ঠস্বর—অমৃতের সেই চিরন্তন উৎস। সুবিমল আহত হইয়া কথা বলিতে পারিল না—কে যেন তাহার গলার কাছটা টিপিয়া ধরিল। বিভা তাহা বুঝিতে পারিয়া সস্নেহে কাছে আসিয়া বসিয়া বলিল—ভাগ্যিস আজ যাইনি ; ওঁরা কিন্তু আমায়ও নিতে চেয়েছিলেন।

সুবিমল নিজেকে সামলাইয়া লইয়াছিল। সংযত স্বরে বলিল—ভাগ্যটা তোমার চেয়ে আমারি বেশী !

গম্ভীরভাবে বিভা উত্তর দিল—আপনি কি আজ আমায় ব্যঙ্গ কোরতে এসেছেন।

—ব্যঙ্গ ত তোমায় আমি কম করিনি, বিভা, যে আজ তুমি আমার ওপর রাগ কোরছ। ভাবছি সেই স্বচ্ছন্দ ব্যঙ্গ করার সুদিন আবার কবে পাবো।

—যা হবার নয় তা নিয়ে কেন মাথা ঘামাচ্ছেন। আগে ভাবতুম ছেলেমেয়ে দুটো একটু বড় হলে হয়। এখন দেখছি তাদের মানুষ হবার আশাই নেই। যতদিন বাঁচব, এ বাড়ী থেকে বোধহয় আর মুক্তি নেই।

—আমি ত ঠিক এই বিষয়েই আজ কথা বলতে এসেছি। অমরেশের ছেলেমেয়ে এমন কোরে নষ্ট হয়ে যাবে, আমি বেঁচে থাকতে তা হতে পারে না। শুনেছ সেদিনকার কথা ?

—কিছু—কিছু।

—তাতেই হবে, কাণ্ডটা সব শোনার মতো মুখরোচক নয়, তোমার আমার কাছে। তুমি কি বলতে চাও ওরা এইভাবেই মানুষ হবে এখন। ওদের জন্য কত কি ব্যবস্থা ছিল সব কি ভুলে গেলে ?

—ভোলা কি সম্ভব ? কিন্তু আপনি কি করতে চান ?

—আর কিছু না পারি আপাতত ওদের কোনো বোর্ডিং-এ পাঠাতে চাই।

—স্কুলের মাইনে দেন, তাতেই এ বাড়ীতে শ্লেষের অন্ত নেই। বোর্ডিংএর খরচ দিলে কি রক্ষে আছে ? তাছাড়া বাবা কি মত দেবেন ? তাঁর আশ্রয়ে থেকে তাঁর অমতে কাজ করা ত সম্ভব নয়।

—ও কথা আমিও ভেবেছি। বোর্ডিংয়ে রাখায় আমারও পূরো মত নেই। আমি ওদের নিজের হাতে মানুষ কোরতে চাই—যেমন আগে করতাম।

—কেমন কোরে হবে—এ বাড়ীতে থেকে ?

—এ বাড়ীতে থাকাটা অপরিহার্য্য নয়। তুমি আলাদা বাড়ী ভাড়া কোরে থাকতে পারো।

বিভা খানিকক্ষণ উত্তর দিল না। পরে কহিল—আমি জানি, আপনি আমায় অপমান কোরতে চান না। এটাও ঠিক, আপনার কাছ থেকে সাহায্য নিতে—টাকাই হোক বা অন্য কিছুই হোক—আমার বাধে না। কিন্তু নেবারও ত সীমা আছে। আজ আপনার মা থাকতেন, আমি অসঙ্কোচে তাঁর পায়ে আশ্রয় নিতাম। আপনার স্ত্রী থাকলেও ছেলেমেয়ে দুটোর হাত ধোরে তাঁর কাছে আশ্রয় ভিক্ষা কোরতুম—হয়ত ফেরাতেন না। আজ আপনি যদি আমার সব খরচ চালান ; আমি আলাদা বাড়ীতে থাকবো, আর আপনি যখন তখন আসবেন যাবেন—বলুন ত সমাজের দিক থেকে এটা কি রকম দেখাবে ?

—কিন্তু সমাজের দিক থেকে কি রকম দেখাবে এই ভেবেই কি অমরেশের এত আদরের মুন্না-ঝুন্নিকে নষ্ট হয়ে যেতে দেবে ? তোমার মৃত স্বামীর ইচ্ছার এই কি প্রতিপালন ?

বিভা কি উত্তর দিবে ? তাহার দিক হইতে এ প্রশ্নের কি উত্তরই বা আছে ? সে কি বোঝে না, ছেলেমেয়ের অযত্ন হইতেছে ? ইহাও কি বুঝিতে বাকী আছে তাহার আত্মীয়েরা নামে মাত্র আত্মীয়, কাজে পর হইতেও নিষ্ঠুর। তাহার মৃত স্বামীর নিকটতম আত্মীয়, পূর্ণতম বন্ধু ছিল এই লোকটি। অথচ সমাজ চায় এই লোকটির সহিত তাহার কোনো সম্বন্ধই থাকিতে পাইবে না। এই লোকটি কি সুধু তাহার স্বামীরই বন্ধু ? তাহার নিজের জীবনেও কি ইহার প্রভাব ওতপ্রোতভাবে জড়াইয়া নাই ? তাহার সুখের সংসার কি সম্ভব ছিল, সুবিমল আসিয়া যোগ না দিলে ? কে তাহার স্বামীর মনকে এমন স্পষ্ট করিয়া চিনাইয়া দিয়াছিল ? কে তাহার ছেলে মেয়ের জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম করিত ? কে তাহাকে তাহার স্বামীর চোখে এমন অতুলনীয় করিয়া তুলিয়াছিল ? বহুকাল পরে পুরাতন স্মৃতির আলোড়নে বিভার বুক ফুলিয়া উঠিতেছিল। সেই উজ্জ্বল স্মৃতির বৈপরীত্যে তাহার বর্ত্তমান জীবনের কদর্য্যতা এমনই বীভৎস বোধ হইল যে বিভা বলিয়া ফেলিতে যাইতেছিল—আমার স্বামীর ইচ্ছা আমার চেয়ে আপনি বেশী বুঝতেন। বিচারের ভার আমার ওপর দেবেন না। আপনি যা বলবেন, আমি তাই মেনে চলব।

কিন্তু সে কিছু বলার আগেই সুবিমল বলিল—শোনো বিভা, তোমার ছেলে মেয়েকে নিজে হাতে মানুষ করার জন্যে আমি তোমাকে এ বাড়ী ছেড়ে যেতে বলছি। একথা মিথ্যে নয়। কিন্তু পূরো সত্যিও নয়। আমি তোমাকেও চাই—আমার কাছে রাখতে চাই। আমার জীবনের পরিপূর্ণতার জন্যে তোমাকেও আমার দরকার। প্রথম যখন তোমায় দেখি, দেখেছিলাম বন্ধু-পত্নীরূপে। তোমার কোনো স্বতন্ত্র সত্তা ছিল না, অমরেশের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবেই আমার কাছে তোমার দাম ছিল। তার-পর তোমার স্বভাবের মাধুর্য্য দিয়ে তুমি হয়ে উঠলে বিশেষ। তুমি সুধু অমরেশের স্ত্রী নও মুন্নাঝুন্নির মা নও, তুমি বিভাবরী, মানবাত্মার এক

অপরূপ জ্যোতির্ম্ময় প্রকাশ। কতদিন ভেবেছি, আমি তোমাকে ভালবাসি অমরেশের স্ত্রী বলে, না, অমরেশকে ভালবাসি তোমার স্বামী বলে। তুমি জানো, তোমরা দুজনে আমার মন সম্পূর্ণ ভরে রেখেছিলে। তোমাদের সংসারেই ছিল আমার পূর্ণ মুক্তি, সহজ বন্ধন। তোমাদের সান্নিধ্যেই আমি আমার অন্তরাত্মাকে পেতুম, সব চেয়ে প্রত্যক্ষভাবে। এ দু বছর সে অনুভূতি আমায় ত্যাগ কোরেছে। অমরেশ নেই, তুমি আছ। তোমার প্রতি আমার নির্ভর তাই হ'য়েছে দ্বিগুণ। তোমাকে অবলম্বন কোরে আমি আবার সেই শান্তিনীড় গড়ে তুলতে চাই। বিধবা বিবাহ এখন আর কিছু নতুন ঘটনা নেই।

স্থবিমল যখন থামিল, বিভা তখন টেবিলে হাত রাখিয়া মুখ গুঁজিয়া কাঁদিতে সুরু করিয়াছে। সুবিমল কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। পরে বলিল—আমি আজ চলি। আমার যা কিছু বলার ছিল তোমায় বলে নিশ্চিন্ত হলুম। এখন তোমার হাত। এরকম দেখা হবার সুযোগ আর বোধহয় সহজে ঘটবে না। যদি কিছু বলার থাকে, চিঠি লিখো।

বিভা উঠিয়া দাঁড়াইল। তারপর নিঃশব্দে দরজা পর্য্যন্ত সুবিমলকে আগাইয়া দিল। সুবিমল দরজা পার হইতে যাইবে, এমন সময় হঠাৎ বিভা তাহার হাত ধরিয়া টানিল। সুবিমল দেখিল, বিভা থর থর করিয়া কাঁপিতেছে, এখনই পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা, জোর করিয়া তাহার হাত ধরিতে বিভা আবার স্থির হইয়া দাঁড়াইল। তারপর তাহার সেই অপরূপ মিষ্ট কণ্ঠে কহিল—আমায় ক্ষমা করুন, যদি আপনাকে ব্যথা দিয়ে থাকি। সুবিমল মুখে কোনো উত্তর দিল না। সুধু অল্পক্ষণের জন্য বিভার মাথায় শান্তভাবে হাত রাখিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া আসিল।

তিন চারিদিন পরে মুন্নার স্কুল হইতে রিপোর্ট আসিল যে তাহার পাঁচ টাকা জরিমানা হইয়াছে, ছেলেদের সহিত ঝগড়া করিয়া স্কুলের একটা ম্যাপ ছিঁড়িয়া ফেলায়। মুন্না মহা বিপদে পড়িল। মায়ের যে টাকা নাই তাহা সে জানিত। ইহাও জানিত এ বাড়ীতে কাহারো কাছে টাকা মিলিবে না। যে দিতে পারিত তাহার সহিত এমন অভদ্রতা করিয়াছে যে সেখানে যাইতে সাহস নাই। ঝুন্নি আসিয়া বুদ্ধি দিল—মা যদি তোর হয়ে জ্যেঠা-

বাবুর কাছে লিখে দেয়, তাহলে দেখিস সব ঠিক হয়ে যায়। মুন্না আসিয়া মার কাছে কাঁদিয়া পড়িল। বিভা অনেকক্ষণ তাহার কোনো কথার উত্তর দিল না। সেদিন মুন্নার ইস্কুল যাওয়া বন্ধ থাকিল। দুপুর বেলায় মায়ের কাছে যখন সে অত্যন্ত অনুতপ্ত হইয়া প্রতিজ্ঞা করিল যে সে আর কখনও মন্দ হইবে না, আগের মতো ভালো হইবে তখন বিভা একটা চিঠি লিখিয়া দিয়া কহিল—যা' এখ্‌খুনি ডাকে দিয়ে আয়। চিঠিতে মুন্নার ঘটনা লেখার পর শেষ ভাগে লিখিল—আমার স্বামীর শিক্ষা ছিল আপনাকে অসম্মান না করা। আপনার প্রস্তাবে আমার অসম্মতি আমি প্রত্যাহার করছি। এতে যদি অপরাধ হয় ইহলোকে বা পরলোকে তিনিই যেন আমায় শাস্তি দেন।

(৬)

দেখিতে দেখিতে বিভার জীবনের আরো দশটি বৎসর কাটিয়া গেল। সুনিবিড় শান্তির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া তাহার জীবনের এই নূতন অধ্যায়ের প্রারম্ভের স্মৃতিতে এখন হাসি আসে বটে, কিন্তু তখন কি মানসিক যন্ত্রণাই না তাহাকে ভোগ করিতে হইয়াছে। তাহাকে আশ্রয় দিবার জন্য সুবিমল নিজের বাড়ী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আসিল। হরনাথ তাহার ভার বহিবার দায় হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া মনে মনে খুশী হইলেন, বিভার যে টাকাটা আত্মসাৎ করিয়াছিলেন তাহা শোধ দিবার ভার তাঁহার ঘাড় হইতে নামিয়া গেল, এমন ভাব দেখাইতে লাগিলেন যেন তিনি টাকাটা গ্রহণ না করিলে অত্যন্ত দুষ্কার্য্যে তাহা অপব্যয়িত হইত; আর বাহিরে আস্ফালন করিতে লাগিলেন আজকালকার ছেলেমেয়েদের অকৃতজ্ঞতা, স্বার্থপরতা, ও নৈতিক অবনতির বিরুদ্ধে। সব থেকে মজা পাইয়া গেল খবরের কাগজওয়ালারা। এহেন মুখরোচক সংবাদে দু'পয়সা কামাইবার লোভ শুদ্ধ ভদ্রতার খাতিরে সংবরণ করা তাহাদের পক্ষে অসাধ্য। সুচিকিৎসক বলিয়া অমরেশের খ্যাতি ছিল। সুবিমলের নামও জনসাধারণের পরিচিত; রাজনীতিতে ঢুকিলে ওটুকু পুরস্কার সহজেই পাওয়া যায়। আর বিভাবরীর নাম ত এককালে দেশময় ছড়াইয়া পড়িয়াছিল তাহার সঙ্গীতকুশলতার প্রভাবে। কাজেই দৈনিকে

সাপ্তাহিকে মাসিকে তাহাদিগকে দফায় দফায় জবাই করিবার আয়োজনে কোনো ত্রুটি হইল না। রঙ্গকবিতায় ও ব্যঙ্গচিত্রে বাংলাদেশের প্রতিভা স্ফুরিত হইতে লাগিল। মুন্না-ঝুন্নি এখন সুবিমলকে কি বলিয়া ডাকিবে, তাহাদের উপাধি বদলানো হইবে কি-না বৈপিত্রেয় ভাইভগিনীর সহিত তাহাদের সম্বন্ধ কিরূপ দাঁড়াইতে পারে ইত্যাদি প্রশ্ন লইয়া লেখকগণের সে কি উত্তেজিত আলোচনা ও গভীর গবেষণা। এ ইঙ্গিতও বাদ পড়িল না যে এ ব্যাপারের মূল পত্তন অমরেশের জীবদ্দশাতেই ও অনিবার্য্য কারণে বাধ্য হইয়াই সুবিমলকে সপুত্রকন্যা বিধবা স্ত্রী গ্রহণ করিতে হইতেছে। না পড়িয়া এড়াইবার জো নাই; কোনো না কোনো হিতকামী বন্ধুর অনুগ্রহে সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র নিয়মিত আসিয়া পৌঁছিত। শরীরের যেখানে ব্যথা সেখানে নাড়াচাড়া করাই মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। বিভা আঘাত পাইত, তবুও এগুলি পড়িয়া দেখিবার কৌতূহলকে উপেক্ষা করিতে পারিত না। সুবিমলের উদাহরণ তাহার নিকট ব্যর্থ হইয়া গেল।

কিন্তু সংসারের কোনো গলি পথই এত লম্বা নয় যে তাহাতে মোড় মেলে না। তাই এই বিদ্রূপ-আলোড়নে তাহাদের একটা লাভও হইল। কুৎসার বন্যা চিরস্থায়ী নয়। তাহাতে ভাঁটা পড়িয়া আসিলে সমাজ আবার ধীরে ধীরে তাহাদিগকে গ্রহণ করিতে লাগিল। যাহারা নিকটে আসিল তাহারা আসিল সমস্ত জানিয়া শুনিয়াই। ফলে সুবিমল ও বিভাবরী ও তাহাদের পুত্র কন্যাও অনেক অপ্রীতিকর ঘটনাসঙ্কট হইতে বাঁচিয়া গেল। মুন্না-ঝুন্নির স্বভাবের মাধুর্য্য যেন তাহাদের পারিবারিক পবিত্রতার প্রতীক হইয়া দিকে দিকে সৌরভ বিস্তার করিতে লাগিল। মুন্না পাইয়াছে তাহার বাপের কর্ম্মদক্ষতা; নিজের হাতে টেলিস্কোপ তৈরী করিয়া আকাশের গ্রহ-উপগ্রহকে কাছে টানিয়া আনে; রেডিয়ো সেট খাটাইয়া দেশবিদেশের বেতার-বার্ত্তা ধরে; ও আলোকচিত্রের প্রতিযোগিতার সন্ধান পাইলেই চেষ্টা করে ও মাঝে মাঝে পুরস্কারও পায়। ঝুন্নির ঝোঁক গানের দিকে, তাহার মায়ের মতো; বাঁশী, বেহালা, পিয়ানো, তবলা, কোনো যন্ত্রেই তাহার কারিগরি না ফলাইয়া ছাড়ে না। লেখাপড়ায় ইহাদের কৃতিত্ব সাধারণ ভাল ছেলের উপরে নয়, তবুও ইহাদিগকে অসাধারণ মনে হয়

সুবিমলের শিক্ষার গুণে। তরুণ-জীবনের সকল কাজেই ইহাদের উৎসাহ আছে, যোগ্যতা আছে, অথচ প্রাধান্যে পিপাসা নাই। আগ্রহের সহিত নির্লিপ্তির এই অপূর্ব্ব সংমিশ্রণে ইহারা যাহার সংস্পর্শে আসে তাহারই চিত্ত অনায়াস ইন্দ্রজালে জয় করিয়া বসে।

সেদিন তাহাদের বাড়ীতে ছোটোখাটো উৎসব হইয়া গেল। উপলক্ষ্য, মুন্না ও ঝুন্নি আই-এস-সি, ও ম্যাট্রিক সসম্মানে পাশ করিয়াছে। বন্ধু বন্ধুনীরা আসিয়াছিল বৈকালিক জলযোগে, কিন্তু আড্ডা এমনই জমিয়া উঠিল ও গানবাজনার পালা চলিল এমনই অবিচ্ছেদ্য গতিতে যে নৈশভোজের সংক্ষিপ্ত আয়োজন করা ছাড়া বিভার গত্যন্তর রহিল না। নাছোড়বান্দা ছেলেমেয়েরা সুবিমল ও বিভাবরীকেও তাহাদের দলে ভিড়াইয়া লইল। বিভা তখন আর গান গাহে না, তবুও ইহাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে গাহিতে হইল। আর সুবিমলের ইংরাজী কবিতার আবৃত্তি ইহারা শুনিল, একটির পর একটি করিয়া অনেকগুলি। শেষে মুন্না-ঝুন্নি তাহাদের দলবল লইয়া বাহির হইয়া গেল বাড়ী বাড়ী পৌঁছাইয়া দিতে।

গৃহকর্ম্মের তদারক সারিয়া বিভা উপরে আসিয়া দেখে সুবিমল একটা ইজিচেয়ারে চোখ বুঁজিয়া পড়িয়া আছে। হাতলের উপর বসিয়া তাহার একটা হাত নিজের কোলের মধ্যে টানিয়া আনিয়া বিভা জিজ্ঞাসা করিল—কি ভাবছ?

—আজকের আনন্দের কথা। কিন্তু সুখ পাচ্ছিনে। ভুলতে পারছিনে, অমর নেই। অথচ তার জীবনের কোনো উৎসবেই আমাকে সে বাদ দেয় নি।

—কেন, বিয়ের সময়।

—সেই একটিবার। আমি হঠাৎ গেলাম জেলে চলে; আর সে মাকে কথা দিয়েছিল যে তার বিয়ের ব্যাপারে সে কোনো মতামত দেবে না। একবার বলেছিল দিন পিছিয়ে দিতে, নানা কারণে মার তর সইল না। জানো, আমি বাইরে থাকলে এ বিয়ে হয়ত ঘটতই না। অমরেশের কালো বৌ আমার কল্পনাতীত ছিল!

—তোমার জেল তাহলে আমার সৌভাগ্য।

—আমারও। তোমায় কনের বেশে দেখলে আবার তোমায় বিয়ে করতে পারতুম কি না কে জানে।

—তাতে ত বিপদ আটকে থাকত না। তখন ছেলেমেয়ে দুটোর কি গতি হোত। বাপের বাড়ীর সে দু বছরের কথা ভাবলে এখনও গায়ে কাঁটা দেয়। মুন্না-ঝুন্নির গর্ব্বে আজ যে আমার বুক দশ হাত ফুলে ওঠে, সে কেবল তোমারই শিক্ষায়, তোমারই চেষ্টায়, তোমারই অনুগ্রহে।

—অনুগ্রহ বলছ কেন? ওদের কি আমি পর ভাবি? আমার নিজের ছেলেমেয়ে হোল না তাই বুঝতে পারি না অন্য বাপে আর কি বেশী করতে পারে।

—অন্যদের সঙ্গে তুলনা টেনে কেন নিজেকে খাটো করছ? বাপ হলেই যদি তোমার মতো কর্ত্তব্যজ্ঞান জন্মাতো, তাহলে ভদ্রঘরের এত ছেলে-মেয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াত না।

এমন সময় ঝুন্নি ছুটিয়া উপরে আসিয়া ইজিচেয়ারের অন্য হাতলটায় বসিয়া সুবিমলকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিল—জানো বাবু, দাদাটা আজকাল কি হ্যাংলাই হয়ে উঠেছে। টিলাকে নামানো হোলো সকলের শেষে—নামাতে ইচ্ছে যেন করেই না।

মুন্না ঘরে ঢুকিতে ঢুকিতে কহিল—বাবু, কী কুটিলা মেয়েই তৈরী করছ তুমি? গাড়ীতে নিজে টিলাকে ধরে টানাটানি, আর এখন দোষ চাপানো আমার ঘাড়ে?

বিভা জানিত এধরণের ঝগড়ার মীমাংসা সহজে হয় না; তাই উঠিয়া পড়িয়া মুন্নার দিকে চাহিয়া বলিল,—তুমি এখানটায় এসে বসে মোকদ্দমা চালাও। আমি চল্লুম শুতে।

—চেয়ারটাকে রেহাই দেওয়া যাক, এত ভার ওর বেশীক্ষণ সইবে না। মোকদ্দমা আজ স্থগিত রইল, কাল বিচার হবে।—এই বলিয়া সুবিমলও উঠিয়া পড়িল।

শেষরাত্রে সুবিমল জাগিয়া দেখে বিভা পাশে নাই। খানিকক্ষণ অপেক্ষা করিল। তখনও বিভা ফিরিল না দেখিয়া নিজেই বিছানা হইতে ...য়া পড়িল। ঘরের মধ্যে অমরেশের একখানি দীর্ঘ প্রতিমূর্ত্তি ছিল।

তাহার তলায় মেঝের উপর বিভা উপুড় হইয়া পড়িয়া আছে, স্থির নিঃস্পন্দ। সুবিমল কাছে আসিতেও বিভা নড়িল না। বোঝাই যায় না সে জাগিয়া আছে কি না। গায়ে হাত দিতেই বিভা চমকিয়া উঠিল ও সুবিমলকে দেখিয়া তাহার পায়ের কাছে আবার লুটাইয়া পড়িল। সুবিমল কোনো কথা না বলিয়া তুলিয়া ধরিয়া চোখ মুছাইতে মুছাইতে বিছানায় আনিয়া শোয়াইয়া দিল। অনেকক্ষণ পরে বিভা কথা কহিল। মুখের কাছে মুখ আনিয়া মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—তুমি আমায় এত দিলে, কিন্তু কি পেলে ?

—আমার ত কোনো অভাবই নেই।

—ছেলে মেয়ে ?

—মুন্না-ঝুন্নি।

—তোমার নিজের ছেলেমেয়ে পেতে কি ইচ্ছে করে না ?

—কখনো কখনো করে বৈ কি ! গোড়ায় গোড়ায় চাইনি, তাহলে মুন্না-ঝুন্নির অসুবিধে হোত। তার পর হোলো না যখন, তা নিয়ে আর দুঃখ কোরে লাভ কি ?

—এখন যদি হয় ?

—এখন আর না হওয়াই ভালো। বয়স হয়ে গেছে, মানুষ করার সময় পাবো না।

—তবু যদি সত্যি সত্যিই হয়।

—তাহলে যেন একটার বেশী না হয়। যদি নিতান্তই না বাঁচি, ওরা কি আর একটা ভাই বা বোনকে দেখবে শুনবে না। তোমার কথা আমি বাদই দিচ্ছি।

—কেন ?

—দুবার বিধবা হবার পর কি সংসারের ঝক্কি পোহাতে ইচ্ছে করবে ?

—সে দুর্ভাগ্য যেন আমার না হয়। তোমাকে রেখে যেন যেতে পারি।

(৭)

কয়েক মাসের মধ্যেই সুবিমল জানিতে পারিল বিভার সন্তান-সম্ভাবনা। অনাস্বাদিতপূর্ব্ব রসে তাহার অন্তর ভরিয়া উঠিল। সুদূর কল্পনার বাস্তব রূপায়ণের আশায় তাহার মনে পুলকের দোলা লাগে। এই যে আসিবার সাড়া দিয়াছে অনাগত অতিথি—না জানি সে কি হইবে, কেমন হইবে। যদি সে সুস্থ না হয়, যদি সে সুগঠিত না হয়; যদি তাহার বুদ্ধিতে বিকৃতি থাকে, চিত্তে গ্রন্থি থাকে। সুবিমল হাত দিয়া কপালের ঘাম মোছে। কখনো কখনো আবার বাসনার লাগাম দেয় আলগা করিয়া। তাহার সন্তান হইবে অতুলনীয় প্রতিভা, দুর্জ্জয় বীর। মানবজীবনের ধারাকে সে দিবে সম্পূর্ণ বদলাইয়া, তুলিয়া ধরিবে এক পশুত্বলেশহীন মানবাতীত স্তরে, পৃথিবীকে সে ঢালাই করিবে এমন এক সুরম্য ছাঁচে যাহাতে সংঘর্ষের ঘটিবে একান্ত নিবৃত্তি, দুঃখদারিদ্র্যের চরম অবসান, ব্যক্তিত্বের নির্ব্বাধ স্বাধর্ম্মিক বিকাশ। সুবিমল দেখিতে পাওয়ার আশা করে না, কিন্তু শুনিতে চাহে, মরণের পরপার হইতে, মহামানবের মিলিত কণ্ঠে ছন্দিত তাহার সন্তানের যশোগাথা।

বিভা কিন্তু দিনের পর দিন রুগ্ন ক্ষীণ হইয়া পড়িতেছে। কি একটা দুর্ভাবনার কালো ছায়া তাহার মুখের প্রসন্নতাকে রাখিয়াছে যেন সর্ব্বদা রাহুগ্রস্ত করিয়া। চোখের দৃষ্টি যেন শিকারী-তাড়িত শশকের মতো। সুবিমল ভাবে—হবেই ত, এতো দিন পরে আবার। বিভা তাহাকে মিনতি করিয়া বলে—তুমি আমার কাছে কাছে থেকো; ভয় করছে, আমি হয়ত খুব ভুগবো, কি জানি হয়ত বাঁচবো না। মুন্না-ঝুন্নির মুখেও কেমন যেন চিন্তার ছায়া পড়িয়াছে, কিন্তু তাহা এত অস্পষ্ট যে তাহা লইয়া আলোচনা চলে না। অস্পষ্ট হইলেও তাহা বিভাবরীর লক্ষ্যে আসিয়াছে; ভাবিয়াছে হয়ত তাহার নিজের মনের ছায়াই উহাদের মুখে প্রতিফলিত দেখিয়াছে।

হঠাৎ একদিন অকাল বেদনায় বিভা আক্রান্ত হইয়া পড়িল। যে নার্সটিকে ডাকা হইল সে অমরেশের কাজ করিত। বিভাকে তখন হইতে চেনে। এ বাড়ীতেও তাহার অবাধ যাতায়াত ছিল। আগে দু একবার বিভার শারীরিক অসুস্থতায় সে আপনা হইতেই সেবা করিয়া রাত জাগিয়া

গিয়াছে। মুন্না-ঝুন্নি ছোট ছিল বলিয়া তাহার সহায়তায় সুবিমল অত্যন্ত কৃতজ্ঞ বোধ করিত। ডাক্তার আসিয়া বিপদ রোধ করিতে পারিল না—গর্ভস্থ সন্তান অকালে নষ্ট হইয়া গেল। ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছিল—আমার মনে হচ্ছে এর আগেও এঁর এরকম হয়ে গেছে। শুনিয়া বিভার মুখ কালো হইয়া গেল, নার্স টি মুখ ফিরাইয়া লইল। সুবিমল নিঃসন্দিগ্ধভাবে উত্তর দিয়াছিল—তা কি কোরে হবে; সতেরো বছর পরে এই ত প্রথম সন্তান-সম্ভাবনা।

ডাক্তার বলিল—সে যাই হোক, তা নিয়ে এখন মাথা ঘামানো মিথ্যে। আপাততঃ রোগিণীর অবস্থা মোটেই আশাপ্রদ নয়। হার্ট অত্যন্ত দুর্ব্বল। একটু উত্তেজনাতেই ভীষণ ক্ষতি হতে পারে; অত্যন্ত সাবধান সেবার দরকার—চিকিৎসার বিশেষ কিছু নেই।

সুবিমল, মুন্না, ঝুন্নির প্রতিবাদ সত্ত্বেও নার্স টি রহিয়া গেল। মাস-কয়েকের মধ্যে বিভা শয্যাত্যাগ করিতে পারিল না।

একদিন রাত্রে নার্স আসিয়া সুবিমলকে বিভার ঘরে ডাকিয়া লইয়া গেল। তাহার মাথার কাছে বসিতেই বিভা তাহার হাতদুটি নিজের বুকের মধ্যে টানিয়া লইল। তারপর ধীরে ধীরে একটু একটু করিয়া ভাঙিয়া ভাঙিয়া বলিতে লাগিল—আর ভুগতে পারি নে, বাঁচতে আর ইচ্ছে নেই, সব সাধ পূরেছে; মনে হচ্ছে মরণ কাছে এসেই দাঁড়িয়ে আছে, তবুও যেন নিতে পারছে না। কিসে যেন আটকাচ্ছে। কিসে জানো? তোমার কাছে সত্য গোপন করেছি, তাই মরতে পারছি না। ডাক্তারের সন্দেহ ভুল নয়; এর আগে দুবার—ঐ নার্স জানে। তুমি বিশ্বাসে অন্ধ ছিলে, তাই দেখতে পাওনি। আমি তোমায় বিশ্বাস করতে পারিনি। ভয় ছিল, মুন্না-ঝুন্নি তোমার স্নেহে বঞ্চিত হবে। তাদের যে আর দাঁড়াবার ঠাঁই ছিল না। কিন্তু এবার সত্যিই চেয়েছিলাম, আমার পাপে সইল না। আমায় মাপ কোরো।

বিভার কান্না উদ্বেল হইয়া উঠিল। সুবিমল এমনই স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল যে বিভার কান্নাও তাহাকে চঞ্চল করিতে পারিল না। উঠিয়া আসিতেছিল, বিভা টানিয়া ধরিল—রাগ কোরো না, ক্ষমা করো। আমার

আর বেশীক্ষণ নেই। যাবার আগে আমি তোমায় সেই কথাই বলে যাচ্ছি যা উনি—এই বলিয়া সে অমরেশের ছবির দিকে নির্দ্দেশ করিল—তোমায় বলে গিয়েছিলেন, "আমি চল্লুম, এরা রইল।"

*　　*　　*　　*　　*

দাহন-সৎকার শেষ হইয়া গিয়াছে। বন্ধুবান্ধবেরা একে একে বিদায় লইলেন। সুবিমল তাহার ইজি-চেয়ারখানায় অসাড় হইয়া পড়িয়াছিল। আস্তে আস্তে ঘরে ঢুকিল মুন্না ও ঝুন্নি। অতি সন্তর্পণে দুজনে চেয়ারখানার দুধারে আসিয়া মুখ নীচু করিয়া দেখিল সুবিমল ঘুমাইতেছে কি না। সুবিমল চোখ চাহিল; দুজনে দু হাতলে বসিল। ঝুন্নি প্রথম স্তব্ধতা ভাঙিল—কহিল,—চল বাবা, আমরা কোথাও বেড়াতে যাই। মুন্না বলিল—হ্যাঁ, তাই চলো, বাবা।

সুবিমল দুজনকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিল।

শ্রীনীরেন্দ্রনাথ রায়

কবিতা-গুচ্ছ

অনুবাদ

(ইংরাজী হইতে)

লোকেরা চলেছে কাজে
তাহাদের ছায়া
এখনো রয়েছে তাজা ;
যায়নি শুকায়ে
নিষ্করুণ তপনের তাপে ;
যা কিছু সবই সম্ভব,
সাধনার বাধা বিঘ্ন এখনো অস্ফুট ;
যায়নিক কোনো কিছু
করণ-অতীত হয়ে ।

* * *

আকাশ ধূসর স্থির……
বাতাসের চলাচল স্তব্ধ ;
নাহিক একটি তারা । তরুগুলি
বৃথা শিহরিছে শীতে,
ডালপালা হিমে জমে গেল ।

সারারাত এ প্রাচীন দীর্ণভূমি
পড়ে' আছে শৃঙ্খলিত,
যেন হিম দিয়ে লোহার বাঁধনে বাঁধা
সংযত শাসিত
কঠিন তরল-জল ।

অশ্রুর অতীত দুঃখ আজ এইখানে।
অনুকম্পা আজ মৃত।
শুভ্রবেশ মৃত্যু
আজ চলে পথে পথে।
বিমর্ষ সন্ত্রাস
মেলিয়া দিয়াছে তার সর্ব্বব্যাপী ডানা।

*		*		*

লোকে বলে প্রেম অন্ধ, বোধহয় সত্য কথা, তাই
আমি যারে ভালোবাসি তার কোনো ত্রুটি নাহি পাই;
কিন্তু যবে মিলি মোরা মোর চোখে সমস্ত ভুবন
সৌন্দর্য্যে ঝলকি' উঠে, পতাকার বিস্তার যেমন।

*		*		*

হতেই পারেনা ম্লান চাঁদ ছিল
চিরদিন এত একা,
মনের মতন কোনো প্রণয়ীর
পেয়েছিল ধ্রুব দেখা,
বহুযুগ আগে তাহারি সঙ্গসুখে
প্রতি রজনীতে চলেছিল পাশে পাশে
নহিলে কেন সে মলিন এমন
প্রিয়বিয়োগের করুণ হতাশ্বাসে?
অথবা কেন সে দীপ্ত এমন
গরবী-প্রেমের সোহাগ-দৃপ্ত হাসে?

শ্রীনীরেন্দ্রনাথ রায়

"লীলাসঙ্গিনীর" একটি কবিতা

আজিকে ছুটীর দিন। তাই ক্ষণে ক্ষণে
কত ছলে কত নামে ডাকি অকারণে
বাহুতে সঁপিয়া বক্ষ স্কন্ধোপরি শির
নয়নে নয়নযুগ স্থাপিতেছ স্থির
স্থির বিদ্যুতের মত নির্ব্বাক কৌতুকে।
শুধু কি কৌতুকে। না, না, তীব্রতর সুখে।
একটি চুম্বন দিলে হাস্য অসম্বৃত
শিশুসম বকে যাও কলকল্লোলিত
"উজু গুজু গুজু—" অতি অর্থহীন ভাষ
যেন সে কায়ার বাণী কায়াতে বিকাশ।
যদি রঙ্গভরে মুখ লই ফিরাইয়া
অমনি চাপড় সুরু রাগিয়া রাঙিয়া।
কিছুতেই শান্তি নাই। কী করিতে হবে
বলো! কোথা নিয়ে যাবে চলো যাই তবে।
হয়ত ঘাসের পরে সুলভ শালিখ
হাঁটে আর মাথা নাড়ে। তাই অনিমিখ
হেরিতে হইবে। কিম্বা পীত প্রজাপতি
একটি দিবসে যার জন্ম মৃত্যু রতি
বৃন্তচ্যুত চম্পাসম কভু নিম্নে ধায়
সোনালি ঘুড়ির মত কভু ঊর্দ্ধে ভায়
প্রাণের লহর তুলি পক্ষের তরীতে
কভু শরলক্ষে চলে, হইবে হেরিতে।
আজিকে ছুটীর দিন তাই ছুটাছুটি
আঁখিপুটে ত্রিভুবন নিতে হবে লুটি।

মোর গেহে আছো তুমি সেই সুখে প্রিয়া
তব অবস্থিতিটুকু থাকি বিস্মরিয়া

আপন অস্তিত্বসম। নিত্যকার কাজে
যে অভিনিবেশ মম হেলা সম বাজে
তব চিত্তদেশে ওগো অভিমানময়ী
তুমি না থাকিলে গেহে সেও থাকে কই।
স্নাতপুষ্পরুচি গন্ধ তব অঙ্গজাত
আমারে জড়ায়ে রয় আমার অজ্ঞাত
তব নৈশ আলিঙ্গনসম। তাই মম
দীর্ঘ দিনব্যাপী শ্রম লাগে স্বপ্নসম।
তব কণ্ঠমাল্যখসা সুরপদ্মদল
মোর কর্ণশীর্ষে খচা। মোর মর্ম্মতল
তার অভিষেকসিক্ত। সেই স্বরস্বাদ
তিক্ত করিবারে নারে কর্ম্ম কলনাদ।
আমি যদি ভুলে থাকি তুমি মনে করে
মনে করাইয়া লও তুমুল আদরে।

এই তুমি আছো মোর কাছে। এ সরল
এ সহজ অনুভব করিছে সজল
আমার নয়নোপান্ত অহেতুক ত্রাসে
যেমন গগনোপান্ত নবমেঘাভাসে।
মিলন সে বড় ভীরু ঊষার শিশির
নিঃশ্বাস লাগিলে কাঁপে শির শির শির।
দীর্ঘ দিন অন্যমনা শতকর্ম্মে রত
তোমার সান্নিধ্যসুখে সস্মিত সতত
যখনি বিরাম মানি ভাবি ক্ষণ কাল—
জীবন অসনাতন জগৎ বিশাল
দিনে দিনে মিলনের ঘনাইছে শেষ
তব পথ চেয়ে আছে দূরতর দেশ

মোর প্রেমে কেন তবে এত অপচয়
এত অন্যমনস্কতা। কেন দিনময়
মিথ্যা কাজে মাতি। কেন তব সনে
নিরন্তর নাহি থাকি সংলগ্ন আসনে।
নিশীথেও সুপ্তিহীন। ভাবি ক্ষণ কাল
অমনি বাজিয়া উঠে কর্ম্ম-করতাল।
প্রশ্নের উত্তর নাই। আমি অসহায়।
প্রেম অসমাপ্ত থাকে দিন চলি যায়॥

লীলাময় রায়

বন

হয়ত বা তুমি ছাখনি' কখনো গভীর বন
যেখানে লুকিয়ে আছে কবেকার রাতের ছায়া
এলান' যেখানে আকাশের হিম-নয়ন নীল—
তেমন বন।
যে স্বপনগুলি চোখ হ'তে রাতে হারিয়ে যায়
তা'রা কথা কয় বনের নরম লতার ফুলে ঃ
তা'রা যেন, লঘু পালকের মত, বনের মেঘ—
স্বপ্নগুলি।
হয়ত যখন তারা-ঝরে'-পড়া অনেক রাত
অলস বাতাস ঘুমায় হ্রদের জলের মত ঃ
জাগর চোখের পাতায় তখন ছোঁয়ায় ঘুম
বনের হিম।
যদি কোন দিন আকাশের তলে তোমার চুল
ভিজে ওঠে কালো নতুন মেঘের শীতল জলে
দেখো, ছুঁয়ে যাবে কতদূর হ'তে তোমার বুক
গভীর বন।

শ্রীসঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

মূক

এবার বোবা পেয়েছে তার ভাষা,
যাবার বেলা জানায়ে যাবে চিরনীরব মূকের ভালবাসা।
এবার আর নাহিক তার ভয়,
উছল বাণীবন্যাজলে ডুবিল লাজ ডুবিল পরাজয়।
জানে সে মনে বিরাগ অনুরাগ
যা হয় হোক্, জাগায়ে তুলি, অস্তাচলে মাখায়ে দিয়ে ফাগ্
বিদায় লয়ে অতলে ডুবে যাবে,
তোমার প্রীতি অথবা হেলা কভু তাহার নাগাল নাহি পাবে।
মন্দভাল যা খুসী বোলো তারে
ক্ষণ চপল হবে অচল চির-বধির অতল পারাবারে।
সাগরকূলে বসিবে একা যবে,
দেখিবে যবে ফেনমুখর দোদুল ঢেউ উছলে কলরবে,
—তাহারি তলে মৌন গহনতা,
স্মরিবে জানি শেষ তুফানী বোবার বাণী, বেদনা-অবনতা।

শ্রীসুরেশ্বর শর্ম্মা

সন্ধান

আপনারে অহর্নিশি খুঁজি।
কিন্তু যার স্পর্শ পাই, যাহার বিশ্রম্ভালাপ বুঝি,
আমার অন্বিষ্ট সে তো নয়।
সে কেবল বাচাল হৃদয়
বহুরূপী বহুভাষী বহুব্যবসায়ী,
যার সনে আত্মীয়তা নাই
স্বচ্ছন্দ দেহের কিম্বা স্বতন্ত্র বুদ্ধির ;
যে-অধীর
পৃথ্বীর পৃথুল কোলে শান্ত হয়ে থাকিতে পারে না ;

যার স্বপ্নসেনা
অলীক স্বর্গের দ্বারে হানা দিতে ছুটে বারে বারে
জ্যোতিষ্মান ব্রহ্মাণ্ডের শূন্যময় পরিখার পারে
যেথা তার প্রতিনিধি ক্রূর ভগবান
পাশরি সম্রাটনিষ্ঠা অগোচর সামন্ত সমান,
অনাদি নীরবে বসে আপনার মনে
চক্রান্তের ঊর্ণাজাল বোনে ॥

আমি যারে চাই
তার মাঝে ভেদ নাই, দ্বন্দ্ব নাই, দেশ কাল নাই ;
তাহার শরীর বুদ্ধি, মনীষা মনন
শিল্প-উপাদানসম অখণ্ডতা করে বিরচন ;
অবিকল সিদ্ধ স্বয়ম্বশ
ডরে না সে অপমানে, অন্বেষণ করে না সে যশ ;
সে কেবল নির্লিপ্ত অয়নে
পূর্ণ করে ভগ্ন বৃত্ত ; নিরাসক্ত বিভা বিকীরণে
জানায় দিকের বার্ত্তা অমাগ্রস্ত নিঃসঙ্গ তরীরে ;
রূপসীরে
নিষ্কাম উদ্দীপ্তি তার করে পূজারতি ;
কুরূপার কুৎসিত বসতি
মায়াপুরী হয়ে ওঠে কভু তার নৈর্ব্যক্তিক রাগে ;
ডরে না সে ব্যাধি মৃত্যু জরা ;
চিতার স্ফুলিঙ্গযোগে জীবনের দীপপরম্পরা
জ্বালায় সে নির্ব্বিষাদ নির্ব্বাণের আগে ॥
অক্ষয় মনুষ্যবট নির্ব্বিকার যে-প্রাণ পরাগে
নিত্য বিকশিত হয় আশুক্লান্ত নির্ব্বিশেষ ফলে,
সে-অনাম চিরসত্তা খুঁজি আমি আপন অতলে ॥

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত

শাশ্বত-নবীন

(১)

হে নবীন,
ছিল একদিন
তোমার আমার সনে
　　প্রণয়ের গ্রন্থি বাঁধা।
　　নিত্য নিত্য অগণিত বাধা
হাস্যলীলা-সকৌতুকে লঙ্ঘিয়া আমরা দুইজনে
　　প্রবীণের রক্তচক্ষু-জ্বালা,
অকাল বয়সীদের বাক্য সে বিদ্রূপ-বিষ-ঢালা
　　নিন্দার তিলক পরি ভালে
আনন্দে নির্ভর-সুখে অযথা অকালে
　　বিচরিয়া ফিরিয়াছি ;　নিত্য কুতূহলী
সন্ত্রাসিত সমাজের সুশাসনে দিয়া জলাঞ্জলি।
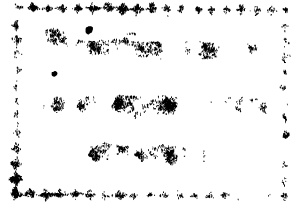
(২)

　　এখন নবীন যারা,
　　সহজে আপনি আত্মহারা,
আপন আনন্দ বেগে চিরন্তনী (!) নীতি ভাঙে গড়ে ;
　　আমরা আতঙ্কে মরি ।　প্রবৃত্তির ঝড়ে
　　সমাজ বা যায় ভেঙে চূরে।
আকাশ বিদীর্ণ করি ক্রোধে-উচ্ছ্বসিত দীপ্তসুরে।

(৩)

সমাজ ভাঙে না তবু তেমনি সে থাকে
সুধু সে খসায়ে ফেলে কালজীর্ণ আবরণটাকে।
　　বারে বারে আসে যায় যারা
পুরাতনে দূর করি' নূতন বসন দেয় কালে কালে তারা।

মৃত্যু-সর্ব্বনাশ বলি কাকে ?
প্রাণ যদি থাকে ;
এই ত প্রাণের খেলা—এই পরিণতির সরণি
সমাজ তাহারি চল-রথচক্র। নিখিল ধরণী
পূজায় সাজায় অর্ঘ্যথালা
নিত্য পরিবর্ত্তনের মাঝে থাকে প্রাণের আনন্দ দীপজ্বালা।

(৪)

সহজ আনন্দ যাহা জাগায় মানব চিত্ত মাঝে,
সর্ব্বকালে সব কাজে,
চিত্ত-শতদল নিত্য সহজে ফুটায়ে তোলে
আলোর মতন—মুগ্ধ মানসের সরসীর কোলে ;
যা' কিছু অন্তর মাঝে
গোপনে বিরাজে,
তারে যে সার্থক করে সুন্দরের পূজা-অর্ঘ্য করি'
বিকশিত আনন্দের পুষ্পে দেয় শূন্য সাজি ভরি'।
সেই সব প্রিয়তমপ্রিয়
অন্তরে গভীরতম আত্মার আত্মীয়।
তারে যে বরণ করে যুগে যুগে সেই ত নবীন ;
তারি পূজা চলে চিরদিন।
অবমান অস্বীকার তারে করে যারা
তারাই সৃজন করে সমাজের অন্ধকার কারা।
সে-কারা ভাঙিছ তুমি, হে নবীন, সত্যের পূজারি !
তোমার অমোঘ শক্তি দিয়াছ সঞ্চারি'
ক্ষীণবীর্য্য সমাজের ধমনীর রক্তের প্রবাহে ;
গড়িছ নূতন রূপে। দুর্নিবার দাহে
পুড়িয়া হইছে ছাই মোহদিগ্ধ অসত্য বন্ধন।
ধ্বনিছে জগৎ জুড়ি' অব্যাহত নবীনের অনাহত বিজয় বন্দন ॥

শ্রীজীবনময় রায়

বিভ্রম

ভালো যদি লাগে সখি বিমুগ্ধের প্রণয়-বচন
মোর প্রেম-দৃষ্টিপাতে যদি তব চিত্ত-শতদল
উন্মেষি উঠিল কভু অনুরাগে আপনা বিহ্বল
বারেক চকিত স্পর্শ যদি চাহে তৃষিত যৌবন,—
তবে এই জ্যোৎস্নারাতে কানে কানে করিব গুঞ্জন
ভালোবাসি ! ভালোবাসি ! তনুদেহ করিব উজ্জ্বল
বাসনা-সোনায় ঘোর ; কামনার উগ্র হলাহলে
নিঃশেষে শুষিয়া লব বারম্বার বুলায়ে চুম্বন ।

জানি প্রেম বাসি হয় ব্যবহারে একটি রাত্রির
'ভালোবাসি' কহিলেই উড়ে যায় প্রণয়-কর্পূর ।
তবুও ফাল্গুনী তিথি আজি যদি সেজেছে সুন্দর
নয়নে বাঁকানো তব শাণিত-সে তীক্ষ্ণ ফুল-শর,—
ভ্রান্তি-মদে এসো ভুঞ্জি যৌবনের ব্যথা সুমধুর ।
দুর্লভ মুহূর্ত্ত এযে, অসম্বৃত উদ্বেল অধীর !

সুফী মোতাহার হোসেন

পূর্ণিমা ও অমাবস্যা

(প্রস্বনী ছন্দ)

কোন্ সিন্ধু মন্থন্ মাধুর্য্যের ও মহিমা !
সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর্ ও-চন্দ্রের্ নাহি সীমা !
ঝল্‌মল্ কিরণ্ তার্
চঞ্চল্ কী ঝঙ্কার্
জ্যোৎস্নার্ বীণায় ছায়
অনন্তের্ ও নীলিমা !

বিহ্বল্ সমুদ্রের্ অকূল্ বুক্ আলো করি'
টল্‌মল্ সে-রঙ্গের্ অতুল্ সুখ্ পড়ে ঝরি' !
নিস্তল্ তমিস্রায়
মোর্ মন্ মগন্ হায় !
মোর্ চাঁদ্ আঁধার আজ
পাথর্-দুখ্ বুকে ধরি'।

হায় বন্ধু দুর্লভ্ ! আমায় আজ্ ক্ষমা করো,
অন্ধের্ এ-অন্তর্-অমার্ লাজ্ জর জর !
দূর্ দূর্ সুদূর্ রই !
ঐ রূপ্ বিভোল্ হই,
স্বপ্নের্ মিলন্-ময়
সোণার্ সাজ্ তুমি পরো।

শ্রীনিশিকান্ত রায় চৌধুরী

হিমাদ্রী-পূর্ণিমা

(প্রস্বনী ছন্দ)

১

চন্দ্র-অতন্দ্র-অনন্ত নভে
আজি পূর্ণিমা রাত্রি কি মন্ত্র জপে,
তার লক্ষতারা
হল আত্মহারা,
হল বিশ্ব সুদৃশ্য সে শুক্লাতপে।

২

শঙ্করী গৌরী তপস্যাব্রতী
এল জ্যোৎস্না-সুধাস্নাত শুক্লাসতী !
তার চন্দ্রাননে
ঝল— মল্ কিরণে
রূপ— —সিন্ধু তরঙ্গ-বিভঙ্গ-গতি !

৩

তুঙ্গ হিমাবৃত শৃঙ্গ পরে—
যোগ— —মগ্ন-তুহিনতনু তন্দ্রা ভরে—
সে— —স্তব্ধ—ছিল,
মরি ! উদ্ভাসিল—
ধরি শুক্লা উমার চুমা সুখ্‌লহরে !

৪

পূর্ণিমা-পূর্ণ কি রঙ্গ উজল !—
হ'ল শুভ্রা তপস্বিনী-লব্ধ সকল—
শিব- —শুভ্র কোলে
দোলে গৌরী দোলে—
দোলে অভ্র-বিকীর্ণ সে-মূর্ত্তি যুগল !

শ্রীনিশিকান্ত রায় চৌধুরী

প্রস্বনীছন্দ মূলতঃ ইংরাজি ছন্দ হইতেই লওয়া—যদিও সংস্কৃত ছন্দেও প্রস্বন (stress) আছে, যথা তোটক প্র ণ মা মি শি ব ং শি ব। পারস্য ছন্দেও প্রস্বন পাওয়া যায়—অনেকে দেখাইয়াছেন। কিন্তু তবু এ-ছন্দের উদ্ভব ইংরাজি ছন্দ হইতেই। সর্ব্বপ্রথম মহাছন্দজ্ঞ বরেণ্য সত্যেন্দ্রনাথ Dactyl ও Iambic বাংলায় চালান—"সিন্ধুর টিপ্" ও "মহৎভয়ের" কবিতায়। তিনি যুগ্মধ্বনিকে (closed syllable) দুই মাত্রার মর্য্যাদা দিয়া—ইংরাজী long বা গুরু প্রস্বনের প্রতিরূপ ফুটাইয়া তোলেন সুন্দর ভাবে। অযুগ্ম ধ্বনি (open syllable) সুতরাং হইবে লঘু প্রস্বন short ; এ কবিতায় এই পদ্ধতিতেই ইংরাজী প্রস্বনের আমদানি করা হইয়াছে। এ দিকে দৃষ্টি রাখিয়া পড়িলে এ ছন্দের কদম সুললিত মনে হইবে।

পুস্তক-পরিচয়

The Supernormal—A critical introduction to Psychic Science by C. B. Bernard (London, Rider & Co, Paternoster House, E. C.)

Supernormal বলিলে কি বুঝিব? Supernormal=অতি প্রাকৃত—অপ্রাকৃত (abnormal) নয়। It does not imply any more than that the phenomena in question are highly unusual, and take place under conditions and through agencies of whose nature we are ignorant. (Bernard)। এ বিশ্ব যদৃচ্ছার খামখেয়াল নহে—ইহা নিয়মের রঙ্গভূমি। অতএব এখানে অপ্রাকৃত (supernatural) বলিয়া কোন কিছু নাই—'No fact can be outside nature'—থাকিতে পারে না। সেইজন্য গ্রন্থকার মুখবন্ধেই পাঠককে সতর্ক করিয়া বলিতেছেন—No scientist can admit the existence of *supernatural* phenomena or any *contrary* to the laws of nature। বেশ কথা! কিন্তু অতি-প্রাকৃত হইলেই অ-পাংক্তেয় হইবে, বৈজ্ঞানিক সমাজের অনালোচ্য হইবে—কোন কোন বিজ্ঞানবিদের এরকম ধারণা কেন? এ সম্পর্কে যিনি সত্যান্বেষী, তাঁহার কি attitude হওয়া উচিত? অবজ্ঞা নয়, অন্বেষণ—প্রত্যাখ্যান নয়, পরীক্ষণ। If our object is to *know* and *comprehend* intellectually whatever may be true, then we must follow the same methods that we follow in any exact science: we must examine critically and we must devise experiments to test our hypotheses. (Bernard)

ফনোগ্রাফের গান আমরা এখন ঘরে ঘরে শুনি—রেডিও ও সবাক চিত্র এখন আমাদের সুপরিচিত ব্যাপার। কিন্তু এডিসনের আবিষ্কৃত ফনোগ্রাফ যে দিন প্যারিসের বিজ্ঞানসভায় প্রথম প্রদর্শিত হইয়াছিল, সে দিন প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডাঃ বুইয়াড´ (Dr Bouillard) সর্ব্বজন সমক্ষে প্রদর্শককে হরবোলা প্রতারক (ventriloquising cheat) বলিয়া তিরস্কার করিতে কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। When Edison's invention was first demonstrated at the Academie des Sciences in Paris, the worthy Dr Bouillard rose angrily and denounced the demonstrator as a ventriloquising cheat। অতিপ্রাকৃত ব্যাপার সম্পর্কে এখনও অনেকের এইরূপই অবৈজ্ঞানিক attitude! আমার বিশ্বাস, যদি তাঁহারা ধীরভাবে বার্ণার্ডের এই 'The Supernormal' গ্রন্থ পাঠ করেন, তবে তাঁহাদের ঐ *a priori* অবিশ্বাস ও অবজ্ঞার ভাব প্রশমিত হইতে পারিবে। বর্ণাড বলেন, আমরা যাহাকে অতিপ্রাকৃত ব্যাপার (supernormal phenomena) বলি, তাহার সত্যতা সম্বন্ধে কয়েকজন বিশ্রুত বৈজ্ঞানিক বহু সমীক্ষা ও পরীক্ষার

ফলে নিঃসংশয় হইয়াছেন—There is a group of men, a group containing many of the greatest modern scientists, who have deliberately given their testimony to the reality of supernormal phenomena. De Morgan, Crookes, Zollner, Lombroso, Morselli, Richet, Flammarion, W. James, and Lodge are perhaps the chief scientists of international renown, who have devoted a considerable portion of their time to patient experimental investigation of psychic phenomena ; and they have all staked their reputation on the existence of facts unknown to the orthodox sciences. (p. 11)

বার্ণার্ড ঐ সকল প্রমাণ-সিদ্ধ ঘটনাকে সজ্জিত ও সমীকৃত করিয়া উহাদের মূলগত তথ্য নির্ণয়ের প্রয়াস করিয়াছেন এবং তাঁহার চেষ্টা অনেক ক্ষেত্রে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। সেইজন্য গ্রন্থপরিচয়-প্রসঙ্গে প্রকাশক লিখিয়াছেন—This book interprets the facts of Psychical Research in the light of Modern Science and Philosophy * * While critical, the treatment is neither sceptical nor materialist. The reality of psychic phenomena is conclusively demonstrated and incidentally an original *theory* * * is proffered.

পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের এই theoryকে আমি সর্ব্বদা ভয়ের চক্ষে দেখি। তাঁহারা প্রায়শঃ নিপুণ গবেষক, ধীর পর্যবেক্ষক—phenomena observe করিতে, facts সংহত ও সজ্জিত করিতে, অতি সুপটু ; কিন্তু যখন অন্বীক্ষা করিতে বসেন, যখন 'থিওরি' রচনা করেন—তখন বলিতে ইচ্ছা হয়—'খবরদার ! ! সাধু ! সাবধান'। বার্ণাডও is no exception—তিনিও 'থিওরি' নির্ম্মাণে প্রতীচ্য-সুলভ ঐ অক্ষমতা এড়াইতে পারেন নাই। কিরূপে পারিবেন ? এ যে তাঁহাদের জাতির মজ্জাগত !

এ গ্রন্থে যে সকল অতি-প্রাকৃত ব্যাপার (supernormal phenomena)আলোচিত হইয়াছে, তাহার তালিকা এই :—হিপ্‌নটিজম (Hypnotism), Multiple Personality (ব্যক্তিব্যূহ), Telekinesis (দূর-প্রবৃত্তি), Materialization (মূর্ত্তিগ্রহ), Ideoplasticity (চিন্তাকারিতা), Telepathy (ভাবসঞ্চারণ), Precognition (প্রাক্‌দৃষ্টি), Psychometry (সাইকোমেট্রি) ও Clairvoyance (দিব্য দৃষ্টি, দিব্য শ্রুতি)।

গ্রন্থকার Hypnotism, Telepathy, Psychometry, Clairvoyance, Precognition (Prevision), Apport (the sudden appearance of an object from no-where—কেহ কেহ ইহাকে Passage of matter through matter বলিয়াছেন), Materialisation ও Dematerialisation, এবং Telekinesis সম্পর্কিত অনেকগুলি প্রামাণিক ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। এ ক্ষেত্রে তাঁহার ত্রুটি এই যে, তাঁহার নিজের কোন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নাই—সকল স্থলেই তাঁহাকে পরের মুখে ঝাল খাইতে হইয়াছে। ক্রুক্‌স্‌, লম্‌ব্রোসো, জোল্‌নার, রিচে, অষ্টি, লজ প্রভৃতি যেরূপ স্বয়ং সমীক্ষা-পরীক্ষা করিয়া অতিপ্রাকৃত ব্যাপার

সম্পর্কে সাক্ষ্য দিতে পারিয়াছেন, ডাঃ বার্ণার্ডের সেরূপ সুযোগ সুবিধা ঘটে নাই। কিন্তু তথাপি তাঁহার সংগ্রহ বেশ মূল্যবান্। এই সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ-পরিচয়ে ঐ সকল ব্যাপারের সবিশেষ উল্লেখ সম্ভবপর নহে—সময়ান্তরে এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। কিন্তু এখানে একটি কথার অবতারণা করিতে চাই। গ্রন্থকার ঐ ঐ অতি-প্রাকৃত ব্যাপার লইয়া অনেক জল্পনা-কল্পনা করিয়াছেন, অনেক theorise করিয়াছেন—এমন কি যাহাকে Fourth Demension বলে, অর্থাৎ দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধ—এই তিন দিশার উপর অতিরিক্ত যে চতুর্থ দিশা—তৎসম্পর্কেও প্রচুর গবেষণা করিয়াছেন। কিন্তু এ দেশে আমরা যাহাকে যোগপ্রণালী বলি,—যে প্রণালীর যথাযথ প্রয়োগ দ্বারা মানবের মধ্যে অব্যক্ত প্রচ্ছন্ন শক্তি-সমূহের (অধ্যাপক অষ্টি যাহাকে the Super-normal Faculties in Man বলিয়াছেন) বিকাশসাধন করিয়া যোগবিভূতির অধিকারী হইতে পারা যায়—ঐ যোগসাধনের সহিত ডাঃ বার্ণাডের সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে পরিচয় না থাকায় এবং যোগপ্রণালী সম্বন্ধে প্রামাণিক গ্রন্থাদির আলোচনার সুযোগ না হওয়ায়, তিনি এই সকল জটিল সমস্যার অনেক স্থলেই সমাধান করিতে পারেন নাই।

ডাঃ বার্ণার্ড সূক্ষ্মশরীর মানেন না—স্যার অলিভর লজ যাহাকে Ether-body বলিয়াছেন, তাহার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তিনি বলেন—Inspite of De Rochas' experiments it remains highly improbable that there is an etheric body। অথচ তিনি Ectoplasm মানেন। Ectoplasm কি? একটা সূক্ষ্ম বাষ্প-জাতীয় পদার্থ—'which is able spontaneously to move, grow, assume various forms and retreat back into the medium's body, from which it disengaged itself during her trance'। এই Ectoplasm সম্পর্কে বার্ণার্ড বলেন—The ectoplasm is eminently amenable to de-materialisation as well as to materialisation। বার্ণার্ড 'Survival of Man'ও মানেন না। দেহান্তে প্রেতের (প্র—ইত=প্রেত, Departed Spirit) পরলোকে অস্তিত্ব থাকে—এ কথা তিনি স্বীকার করিতে প্রস্তুত নন। তিনি বলেন—Whenever we fix our finger on some alleged phenomenon, such as ghost, we find on following it—not that the alleged facts are unfounded (as our sceptical friends averred), but that such facts, although demonstrable up to the hilt, never prove survival. (p. 191).

সেইজন্য প্রেতের ছায়ামূর্ত্তি-পরিগ্রহ ব্যাপার লইয়া তাঁহাকে বেশ বিব্রত হইতে হইয়াছে। তিনি বৈজ্ঞানিক, সত্যের সন্ধানী। স্যার উইলিয়ম ক্রুক্স্, অধ্যাপক রিচে প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকের পরীক্ষালব্ধ সত্য তিনি উড়াইয়া দিবেন কিরূপে? ক্রুক্স্ মিস্ কুক্-নাম্নী যে অভিজাত মিডিয়ামকে লইয়া তিন বৎসর ধরিয়া নানা সমীক্ষা-পরীক্ষা করিয়াছিলেন, তাহার সমক্ষে কেটি কিং (Katie King) নাম-ধারিণী এক ছায়ামূর্ত্তি বহুবার প্রকট হইয়াছিল এবং ক্রুক্স্ স্বহস্তে তাহার ৪৪ খানি ফটোগ্রাফ্ লইয়াছিলেন। কেটি কিং সম্বন্ধে ক্রুক্স্‌এর সাক্ষ্য এই—

Katie King was a perfect model of a human being, who

possessed a heart (pulse normally 75) and breathed, moved, talked and apparently had her own recognisable character and personality.

At a seance at Hackney, Katie appeared for about two hours, walking about the room and conversing with those present. Crookes asked and obtained permission to clasp her in his arms and thus verify the fact that she was as material a being as Miss Cook herself.

মার্থা নাম্নী আর এক মিডিয়মকে লইয়া অধ্যাপক রিচে Villa Carmenএ যে পরীক্ষা করিয়াছিলেন, তাহার বিবরণও কম কৌতুকপ্রদ নহে।

Fairly good light. A white spot on the floor grows rapidly and two horns protude from the mass. The mass dis-aggregates into particles, taking on the semblence of a hand * * * This hand moves; it raises and lowers itself like a hand. Marthe's hands are held by me and are quite motionless. The hand rests on my knee and I feel the slight friction of a body of little resistence. The hand then rises of itself, swaying on a long stem that connects it with the floor; it falls back on the floor with a slight noise. * * The hand then rises, bends and moves towards me * * The hand rests on my knee again. I feel its weight very light; it makes little movements at my request that I can feel quite well * * It then falls to the ground with a slight noise, rises from it, and suddenly disappears at the moment that Marthe gets up.—Richet's Thirty Years of Psychic Research, p. 521.

Ectoplasm ও Ideo-plasticity-র সাহায্যে অধ্যাপক বার্ণার্ড এই ছায়ামূর্ত্তির ব্যাপার প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু সে চেষ্টা যে সার্থক হইয়াছে তাহা আমার মনে হয় না। কিন্তু এ জন্য অধ্যাপক বার্ণার্ডকে যদি জড়বাদী (Materialist) মনে করা হয়, তবে তাঁহার প্রতি অবিচার করা হইবে। তিনি একেবারেই জড়বাদী নহেন। যাহারা বলে চিন্তা মস্তিষ্কের ব্যাপার মাত্র—Thought is secreted by the brain—যকৃত হইতে যেরূপ পিত্ত নিঃসৃত হয়, মস্তিষ্ক হইতে সেইরূপ চিন্তার নিঃসরণ হয়—বার্ণার্ড তাহাদের প্রতিবাদ করিয়াছেন—

The body is the instrument of the soul, in particular the brain is the instrument which is used by the mind. It is not the machine which creates mental phenomena but the machine which is driven by psychological forces. (p. 104)

তিনি বলেন—Subconscious thought bears no kind of quantitative relationship with cerebral development; the examples

of the calculating boy and the musical prodigy make this clear.

মস্তিষ্ক যে চিন্তার জনক নয়, এ কথা প্রতিপন্ন করিতে বার্ণাড অন্যত্র বলিতেছেন:—Finally however, there are certain medical cases which show that conscious psychic life may proceed normally, even when portions of the brain which are usually considered essential have been removed, or are completely septic. Bergson's studies of aphasia led him to deny that memories were stored in the brain, as physical traces or "neurograms'; and if the materialistic view does not hold for memory, it certainly does not apply to other psychological processes. Moreover, some interesting cases are quoted by Flammarion (Before Death, p. 38) which undermine any physiological theory of thought. "My learned friend, E. Perrier presented to the Academy of Sciences in his lecture of December 22nd 1913, an observation of Dr Robinson's concerning a man who had lived for nearly a year with almost no suffering and with no apparent mental trouble, with a brain that was nearly reduced to a pulp and was no longer anything but a vast purulent abscess. On March 24th, 1917, at the Academy of Sciences, Dr Guepin showed, through an operation on a wounded soldier that the partial ablation of the brain does not prevent manifestations of intelligence. Other examples might be cited. At times there remain only very slight portions; the mind makes use of what it can"। এই যে Soul, Psyche, Mind—ইহার একটু ভগ্নাংশ মাত্র জাগ্রত অবস্থায় আমাদের মস্তিষ্ক মধ্য দিয়া প্রকাশিত হয়—ইহার বৃহত্তর ব্যাপকতর ভাগ অব্যক্ত থাকে। সেইজন্য মায়ার্স প্রভৃতি Subliminal Mind (অব্যক্ত সম্বিতের) কথা তুলিয়াছেন, —এবং ফ্রেয়েড প্রভৃতি psycho-analystগণ the unconsciousএর কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

অধ্যাপক বার্ণাডের মতে 'our individual minds are not ultimately separated entities but they are all united, or at least that they interpenetrate, in what is called the Unconscious.

এই 'Unconscious'ই হয়ত' বিশ্বাত্মা (the Universal Mind)। The Universal Mind exists, doubtless; it may even be the only thing that does exist, all else being but "appearance".

এই universal mindকে লক্ষ্য করিয়া অধ্যাপক জিন্‌স (Jeans) তাঁহার Mysterious Universe গ্রন্থে বলিয়াছেন—The universe may best be

pictured as consisting of pure thought। এ সম্পর্কে জিন্‌সের উক্তিগুলি বেশ প্রগাঢ় এবং মিঃ বার্ণাড সমাদরের সহিত তাহা উদ্ধৃত করিয়াছেন—

Mind no longer appears as an accidental intruder into the realm of matter; we are beginning to suspect that we ought rather to hail it as the creator and governor of the realm of matter—not of course our individual minds, but the mind in which the atoms out of which our individual minds have grown exist as thoughts। এ দেশে যাহাকে আমরা 'সমাধি' বলি, সেই তুরীয়াতীত অবস্থায়, সেই exalted state of supertranceএর সময় যোগী কখনও কখনও ঐ Universal Mind, ঐ বিশ্বাত্মার সংস্পর্শলাভ করেন—

সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥—গীতা

প্রাচ্যে এবং প্রতীচ্যে ঐরূপ যোগীরা 'ব্রহ্ম দর্শন' করিয়া স্ব স্ব অনুভূতি অমর ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। অধ্যাপক বার্ণার্ড ধ্যানরসিক ব্লেকের (Blake) ঐরূপ একটি উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন—I saw no god, nor heard any in a finite organical perception; but my senses discovered the Infinite in everything—অর্থাৎ, সেই প্রাচীন কথা ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বম্, বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি।

ইহার উপর মিঃ বার্ণার্ডের টিপ্পনী এই—Would it not be a pure ecstacy such as the mystics have alleged? * * Would it not necessarily involve the complete loss of personal individuality and the attainment of a sense of one's own identity with all the mind in the universe? Would it not also involve complete loss of the sense of time? * * * Yet it would not be a blank, but rather a state akin to godhead while it lasted. In fact does not it corespond closely with the Nirvana of Eastern Mysticism? (p. 250)

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

The Use of Poetry and the Use of criticism.— by T. S. Eliot (Faber).

After Strange Gods—by T. S. Eliot (Faber).

দুইখানি গ্রন্থকারে প্রকাশিত T. S. Eliot-এর বক্তৃতামালা। গ্রন্থাকার আধুনিক মার্কিন লেখক হ'লেও সুনিয়ন্ত্রিত, সুনির্ব্বাচিত, সুসভ্য সাহিত্যের পক্ষপাতী। সাহিত্যের উদ্দেশ্য ও আদর্শ বিষয়ে যত মতভেদ, সাহিত্যের সংজ্ঞা সম্বন্ধেও তত মতভেদ। প্রারম্ভেই

মনে ক'রে রাখতে হ'বে, লেখক সুশিক্ষিত চিন্তাশীল লেখক, অতএব রচনারও তদনুযায়ী সুসভ্য ও সতর্ক হ'বার সঙ্কট। হঠাৎ একটা কিছু বলে ফেলে নিজেকে বিপদ্‌গ্রস্ত করার ভয়ে যেন বারম্বার তিনি অনুস্বার বিসর্গগুলিকে মনে মনে উচ্চারণ ক'রে নিচ্ছেন। কিন্তু স্মরণ রাখতে হবে এগুলি বক্তৃতা, লেখনীর মূক রচনা নয়।

"The Use of Poetry" নামে গত বৎসর Harvardএ প্রদত্ত কতকগুলি বক্তৃতা প্রকাশিত হ'ল। বইখানাকে ঠিক সাহিত্য বলা চলে না, বরং কলেজ-পাঠ্য নামে যে এক বিশাল শ্রেণী আছে, সেই দলভুক্ত। কিন্তু কতগুলি নিগূঢ় সত্য খুঁজলে পাওয়া যায়। গোড়াতেই Eliot বল্‌ছেন কাব্যের প্রয়োজনীয়তা কিছুমাত্র নেই, আছে তার অপূর্ব্ব, অভাবনীয়, অনির্ব্বচনীয়তা। তবে সমালোচনার প্রয়োজন আছে বৈকি। বিশেষতঃ কবি যদি কাব্য সমালোচনা করেন। এলিয়ট আরও বল্‌ছেন একটা ভ্রান্ত ধারণা বহুকাল থেকে প্রাধান্য পেয়ে আস্‌ছে যে রচনার যুগ সমালোচনার যুগ নয়। কিন্তু এলিজাবেথের, ভিক্টোরিয়ার ও তৎপরবর্ত্তী যুগের ইংলণ্ডের সাহিত্যে Ben Jonson, Sidney, Wordsworth, Coleridge সৃষ্টিও করেছেন, সমালোচনাও করেছেন। ইংলণ্ডে সমালোচনার ইতিহাস স্থূলভাবে সুরু এলিজাবেথের সময় থেকে। Eliot সনাতনী মতাবলম্বী। Sidneyর Defense of Poesieর মতগুলি অকাতরে গ্রহণ করেছেন, unities of time, place and sentiment শুদ্ধ। শেষোক্ত বিষয়টি কতকটা যুক্তিসঙ্গত বটে। গম্ভীর রস ও হাস্যরসের সংমিশ্রণে সামঞ্জস্য রক্ষা করা কঠিন। নাটকে এই সংমিশ্রণের উদ্দেশ্য সাধারণ দর্শককে অভিনয়ের একটানা সুরের ক্লান্তি থেকে নিষ্কৃতি দেওয়া। Shakespeare এ কার্য্য অতি নিপুণ ভাবে করেছেন, যা'তে হাস্যরসও গম্ভীর রসের অঙ্গ হ'য়ে পড়েছে। যেমন Henry IVএ Falstaffএর দৃশ্যগুলি ইচ্ছাকৃত চপলতাপূর্ণ, যা'তে রাজপুত্রের অন্তরের শেষ নিদারুণ বিপ্লবটা সুস্পষ্ট হ'য়ে ওঠে। অথচ এক মুহূর্ত্তের জন্যও হাস্যরস গম্ভীর রসের মধ্যে অনধিকার প্রবেশ করেনি। বাকী unity দুইটিকে ধরাবাঁধা নিয়ম করা চলে না। নাটকের ঘটনা এক স্থানে সংঘটিত হ'বে অথবা এক দিনের অধিক কাল-ব্যাপী হবে না এমন বলা চলে না। Eliot বল্‌ছেন, ইংলিশ লেখকরা এ নিয়ম অগ্রাহ্য করেছেন, কিন্তু যেখানেই গ্রহণ করেছেন সেখানেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট সাহিত্য রচনা করেছেন। অথচ James Joyceএর নাম করা ছাড়া এর কোন স্পষ্ট উদাহরণ দেন নি।

তারপর আরও পাঁচ পরিচ্ছেদে ইতিহাস শেষ ক'রে বই সমাপ্ত করেছেন। প্রাঞ্জল ভাষায় যা বলেছেন তার মধ্যে নূতন শিক্ষার বিশেষ কিছু নেই। স্থানে স্থানে একটু অদ্ভুত মত প্রকাশ করেছেন, কিন্তু সে অভিনবত্বের নেশায় না, গোঁড়ামির দায়ে—কি বিচারের দোষে বলা মুস্কিল। যথা, কোনোস্থানে বল্‌ছেন Shakespeareএর যে কোন একখানা বই বাদ দিলে বাকীগুলিকে বোঝার অসুবিধা হোতো। কিন্তু Merry Wives of Windsor বাদ দিলে কোনো ক্ষতি ত' হোতোই না, বরং Falstaffএর কতকটা মান বজায় থাক্‌তো। আরেক স্থানে বল্‌ছেন Browningএর তুলনায় Matthew Arnold অনেক বেশী "intimate" কবি। এটুকু স্বীকার্য্য Arnold-এর রচনা অধিক প্রাঞ্জল। কিন্তু তাই ব'লে যা'কে ইস্পাতের সঙ্গে, মর্ম্মরের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, যে কঠিন, সুস্পষ্ট, সংহত, তা'কে অন্তরঙ্গ করা চলে না। Browning বরং স্থলে স্থলে intimate ছেড়ে garrulous, যেমন Bishop

Blougramএ। তবে তাঁর জটিল বাচালতা সুতীব্র সুমধুরও বটে। Eliotএর মতে Coleridgeএর Kubla Khanকে অত্যধিক প্রশংসা করা হয়। Kubla Khanএ সম্পূর্ণতা অথবা নূতনত্ব কোনটাই নেই। অমন কথা বহু পূর্ব্বে Tempest-এর গানে Shakespeare আরও মধুর করে বলে গেছেন।

কবিকে অসম্পূর্ণতার অপবাদ দিয়ে দোষী Eliot প্রথম করেন নি। বহুপূর্ব্বে Aristotle বলে গেছেন কাব্যের গোড়া শেষ ও এই দুই সীমাকে সংযোগ করে একটি মধ্যমের উপস্থিতি প্রয়োজন। কিন্তু কাব্য ত আর মাগুরমাছ নয়—যে ল্যাজা মুড়ো মাঝখান তিনটেই থাকা চাই। সেইজন্য বাকী সমগ্র বইখানা বাদ দিলেও Chaucer-এর Prologue-এর গৌরব হ্রাস হবে না। একটি লতিকার জন্য বৃহৎ গন্ধমাদন বহন করা মূঢ়তা।

পরিশেষে লেখক বল্‌ছেন কাব্য উপভোগ করতে সহায়তা করা সমালোচনার উদ্দেশ্য নয়। সমালোচক কবির চিন্তাধারার দিক্ নির্দ্দেশ ক'রে দেয় মাত্র।

অন্য গ্রন্থটি বস্তুতঃ সাহিত্য-বিষয়ক নয়। ভূমিকাতেই লেখক বলে দিয়েছেন আধুনিক সাহিত্য সমালোচনা তাঁর উদ্দেশ্য নয়। বর্ত্তমান যুগের লেখক ও পাঠক সম্প্রদায় কিরূপে চিরপ্রচলিত চিন্তাপ্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী তারই একটু পরিচয় দিচ্ছেন। প্রথা বল্‌তে ধর্ম্মসংক্রান্ত কিছু বোঝাচ্ছে না, জড় নিয়ম বোঝাচ্ছে না, মানুষের চিন্তার গতিপথ বোঝাচ্ছে।

মানুষ পারিপার্শ্বিককে এবং পারিপার্শ্বিক মানুষকে যেখানে নিজের মতন করে গড়ে নিতে পেরেছে সে সেখানেই সর্ব্বাপেক্ষা সুখী। এই গড়ে নেওয়া থেকেই বিভিন্ন প্রদেশের প্রথার সৃষ্টি, এবং এই গঠন-ক্রিয়া একটা সচেষ্ট ক্রিয়া বলে প্রথারও একটা সজীব সচল গতি। যাঁরা গোঁড়া তাঁরা এই গতি অনুসারে চিন্তা করেন; যাঁরা আধুনিক তাঁরা এ থেকে পৃথক্ হ'য়ে গেছেন।

একবার যা বলা হয়ে গেছে সেটাকেই আবার নূতন ভাষায় বলাকে অনেকে traditional লেখা মনে করেন। আরেক শ্রেণীর লেখক আছেন যাঁদের সব ঘটনা, চরিত্র ও মনস্তত্ত্বই উৎকট নূতনত্বের দাবী করে। কিন্তু পৃথিবীর জ্ঞান ভাণ্ডারে তৃণটি যোগ করা মহা গৌরবের কথা; বাস্তবিক নূতন কল্পনা করা অল্প ব্যক্তিরই সম্ভবে।

আজকালকার অবিশ্বাসীরা পুরাতন পথ থেকে বেরিয়ে পড়েছেন, নূতন বিশেষ কিছু আবিষ্কার করেন নি।

সমগ্র বইটি সুচিন্তার পরিচায়ক। কিন্তু গ্রন্থকার একটি কথা অবহেলা করে গেছেন। সাহিত্যে দুইটি শক্তি আছে, একটি সৃষ্টি ক'রে ক'রে চলে, এক এক সময়ে উচ্ছৃঙ্খল, খামখেয়ালী অভাবনীয় রূপে। অপরটি সংরক্ষণ ক'রে ক'রে চলে, চিন্তা ক'রে, বিশ্বাস ক'রে, দমন ক'রে। যেমন ঝরণার উদ্দাম জলরাশি প্রপাতের নিম্নে ধীর গম্ভীর গভীর ভাবে জমে। বর্ত্তমান সাহিত্য জগতে Hardy, Lawrenceও আছে, আবার John Galsworthyও আছে। Hardy, Lawrenceএর চরিত্রগুলির তীব্র অনুভূতি, বিষম উত্তেজনাকে Eliot অস্বাভাবিক বলেছেন। কিন্তু কেবলমাত্র Hardy Lawrenceকে দিয়ে সাহিত্য নয়। অসাধারণ ও সাধারণ এবং individual ও type উভয় নিয়ে জগৎ। Hardy, Lawrence থেকে যে অস্বাভাবিকতার উদাহরণ উদ্ধৃত করা হয়েছে তা'কে বেষ্টন করে রয়েছে বহু সাধারণ, এবং Hardy,

Lawrenceকেও বেষ্টন করে রয়েছে বহু সাধারণ লেখক। এবং সাধারণ অসাধারণের গণ্ডি তুলে দিয়েছেন Celtic Revival-এর কবিরা, Bridges, Yeats, Walter de la Mare। Eliot এদের কোথাও বলছেন "morbid", কোথাও বলছেন "spiritually sick" অর্থাৎ জ্ঞানতঃ নয়, এঁদের পক্ষে এই উৎকট মনস্তত্ত্বই স্বাভাবিক। কিন্তু এ দোষ বর্ত্তমান যুগের সম্পত্তি নয়, Shelley Cenci লিখে, Shakespeare Lear, Hamlet, Othello লিখে, আরও বহুপূর্ব্বে প্রাচীন কবি Oedipus লিখে অমর হয়ে গেছেন। এদের মধ্যে কতখানি স্বাভাবিক ও সাধারণ? এবং কতখানি অপূর্ব্ব ও অভাবনীয়?

বই দুটির পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করা সম্ভব নয়। কোনটিই প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য নয়। Gosse, Saintsbury, Stopford Brooke Eliotএর অনেক উপরে স্থান পেয়েছেন এবং তাঁরাও প্রথম শ্রেণীর নন। তবে সহজ ভাষায় স্পষ্ট অভিমতের যদি কোন মূল্য থাকে তা' হ'লে গ্রন্থ দু'খানিকে সুপাঠ্য বল্‌তে হবে।

শ্রীলীলা মজুমদার

চিন্তয়সি—শ্রীধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রণীত, শ্রীকুন্দভূষণ ভাদুড়ী কর্ত্তৃক ৯ রুস্তমজী ষ্ট্রীট বালিগঞ্জ হইতে প্রকাশিত।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বঙ্গীয় সুধীসমাজে সুপরিচিত। সম্প্রতি তিনি নানা মাসিকপত্রে প্রকাশিত তাঁহার কতকগুলি প্রবন্ধ একটি পুস্তকাকারে বাহির করিয়াছেন—পুস্তকটির নাম "চিন্তয়সি"। এই গ্রন্থে লেখক তাঁহার পঠিত ও চিন্তিত বহু বিষয় নানা প্রবন্ধে লিখিয়াছেন। প্রবন্ধগুলিকে তিনি তিনভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। প্রথম—বিজ্ঞান ও মানবধর্ম্ম, দ্বিতীয়—সাহিত্যিক, তৃতীয়—দেশ ও প্রগতি। লেখকের অধ্যয়নস্পৃহা যে কিরূপ বিপুল তাহা তাঁহার গ্রন্থের প্রতি পত্রের প্রতি ছত্রে ছত্রেই বুঝিতে পারা যায়! তিনি এত পাঠ করিয়াছেন ও এত ভাবিয়াছেন যে তাহার বিশদ পরিচয় দেওয়া এই ক্ষুদ্র পরিসরে সম্ভব নহে। পুস্তকটির প্রতি বিভাগ অথবা প্রতি প্রবন্ধের দোষগুণ বিচার করিতে গেলেও তাহার আয়তন বর্ত্তমান পুস্তক অপেক্ষাও বৃহত্তর হইয়া ওঠে। লেখকের প্রতি প্রবন্ধই বহুমুখী জটিল চিন্তাপুঞ্জে পরিবৃত—সে সকলের বিশ্লেষণের স্থান এখানে নাই। তবে তিনি তাঁহার নিজ চিন্তা ও লেখা সম্বন্ধে নিজেই মুখবন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। লেখক মুখবন্ধে লিখিতেছেন :—

"সূক্ষ্ম-সমালোচনার দৃষ্টিতে আমার মতামতের মধ্যে একাধিক বৈষম্য ধরা পড়বে নিশ্চয়। *কিন্তু সেজন্য আমার চিত্তবৃত্তির গতিকে দায়ী করাই ভাল।* মনের প্রকৃতি স্থিতিপ্রবণতার প্রতিকূল। কিন্তু মতামতের ঘূর্ণিবাত্যার মধ্যে কোথায় যেন একটা নিভৃত ও নিশ্চিত, প্রশান্ত ও অবিচল কেন্দ্র রয়েছে। তাকে আবিষ্কার করাই আমার প্রতি সুবিচার, আমার শ্রেষ্ঠ উপকার।"

যাহারা নিজ মতের মধ্যে এতটা কঠিনভাবে বদ্ধ যে কোনও নূতন সত্য দেখিয়াও দেখিতে পায় না—তাহারাই মতের কঠিন ও অচল অপরিবর্ত্তনীয়তার গর্ব্ব করে। বস্তুতঃ পরিবর্ত্তনের ক্ষমতা অগ্রগতিরই নির্দ্দেশক যদি সত্যদৃষ্টির সহিত পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। লেখক যে মাঝে মাঝে নিজ মতের পরিবর্ত্তন করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার লজ্জিত হইবার কিছু নাই। কিন্তু মনের সকল গতি ও পরিবর্ত্তনের মাঝে কোনও স্থির লক্ষ্য লেখকের অন্তশ্চক্ষুর সাম্‌নে আছে কি? যে প্রশান্ত ও অবিচল কেন্দ্রের জন্য লেখকের মন পিপাসিত তাহার সন্ধান তাঁহার লেখায় আমরা পাই কি?

অধ্যাপক ধূর্জ্জটিপ্রসাদ সুপণ্ডিত বটেন—বিশেষত পাশ্চাত্য রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, ইতিহাস ও সর্ব্ববিধ লৌকিক শাস্ত্রে তাঁহার যথেষ্ট অধিকার; পাশ্চাত্য জগতে আজ চিন্তাশীল লেখক যত আছেন, তাঁহাদের সর্ব্ববিধ রচনার সহিতই অধ্যাপক মহাশয়ের ঘনিষ্ট পরিচয় বিদ্যমান। গ্রন্থপাঠ যে অধ্যাপক মহাশয়ের কত বড় নেশা, তাঁহার বর্ত্তমান পুস্তক তাহার অবিসংবাদিত প্রমাণ। নূতন নূতন চিন্তারাশি পাশ্চাত্য মনো-জগতের কারখানা হইতে যখনই যাহা কিছু বাহির হইয়াছে ইনি তাহা পরখ না করিয়া ছাড়েন নাই এবং শুধু নিজে তাহা দেখিয়াই সন্তুষ্ট হন নাই—পাঠকসমাজেও তাহা আগ্রহের সহিত বিতরণ করিয়াছেন। অজস্র অসংখ্য চিন্তারাশি গ্রহণ ও দানের তীব্র আগ্রহ তাঁহার রচনার সর্ব্বত্র দেদীপ্যমান। আর তাই বোধ হয়, এত বিভিন্নমুখী ও বহুপ্রকারের চিন্তার জটিলতায় তাঁহার প্রবন্ধগুলি ও সম্ভবত তাঁহার মনও আচ্ছন্ন হইয়া আলোকের পথ হারাইয়াছে। পাঠকও এত চিন্তার জটিলতার মধ্যে সত্যের আলোক খুঁজিয়া পাইবেন কিনা সন্দেহ।

অধ্যাপক মহাশয়ের কাছে "মনই সব-চেয়ে বড় সত্য"। মনুষ্যজাতির মানসিক বিকাশেই মনুষ্যত্বের বিকাশ সম্ভব হইয়াছে। মন কিছু অবহেলার বস্তু নয়। মনের বিচার বিশ্লেষণ দ্বারাই আমরা জগতের শৃঙ্খলার প্রথম পরিচয় পাইয়া থাকি। কিন্তু মনের একটা সীমা আছে সেই সীমার বাহিরে তাহার পদার্পণের ক্ষমতা নাই। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনের ভিতরে জন্মগত একটা অসীমের ক্ষুধা আছে। সে সীমার মধ্যে যাহা দেখে তাহাতেই তৃপ্ত হইতে পারে না, সে আরো দেখিতে, আরো জানিতে চায়, অতৃপ্তি তাহার কেন্দ্রগত। "সে সত্যের অপেক্ষা গভীর ও ব্যাপক সত্যের সন্ধানে আমার চিত্ত বিক্ষুব্ধ" এই উক্তি দ্বারা লেখক এই অতৃপ্ত অশান্ত মনের ও বিশেষত পাশ্চাত্যপ্রভাবান্বিত মনের বেশ পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু গভীর ও ব্যাপক সত্যের সন্ধান পাইতে হইলে মন বিক্ষুব্ধভাবে অন্বেষণ করিয়া তাহা পাইবে না—তাহাকে চুপ্ করিতে হইবে। তাই আমাদের শাস্ত্রে বলিয়াছে সত্যলাভের পন্থা "ন মেধয়া ন বহুশ্রুতেন।" চিন্তা ও মত-বাদের আবিল আড়ম্বরের মধ্যে সত্য কোথায় লুকাইয়া যায় তাহার সন্ধানও পাওয়া যায় না—নানা থিওরি ও মতের গহন ও দুর্গম অরণ্যে অন্তর পথ খুঁজিয়া পায় না।

জ্ঞানের আলোক মানুষের নিজ অন্তরের কেন্দ্রেই রহিয়াছে—সেই আলোকেই বাহিরের সকল সত্য, সকল তত্ত্ব ও সব তথ্য সত্য করিয়া দেখা যায় ও জানা যায়। কিন্তু অন্তরের আলোক জ্বালিতে হইলে অগ্রে মনকে অন্তর্ম্মুখী ও ধ্যানে সমাহিত করিতে হইবে। নচেৎ অন্তরের "প্রশান্ত ও অবিচল কেন্দ্র"কে খুঁজিয়া পাওয়াও যেরূপ অসম্ভব হইবে, কেন্দ্রের সহিত বাহিরের সামঞ্জস্যও সেরূপ অসাধ্য হইয়া পড়িবে। লেখক চিন্তাশীল, তাঁহার মন চক্ষুষ্মান্,—দেখার আকাঙ্ক্ষা ও আগ্রহ তাঁর অপরিসীম—কিন্তু

তাঁহার এই মনশ্চক্ষু একবার ধ্যানে নিমীলিত না হইলে জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র বিকশিত হইবে না এবং তাহা বিকাশের পূর্ব্বে কোনও সত্যেরই গভীর তত্ত্ব তাঁহার নিজের কাছেও প্রকাশিত হইবে না ও পরের কাছেও তাহা উদ্‌ঘাটিত করা সম্ভব হইবে না। পাশ্চাত্য-মনের চিন্তাধারার গতি ও পরিণতি প্রকৃত প্রস্তাবে বুঝিতে হইলেও প্রাচ্য উপায়ে মনকে আগে আত্মসমাহিত ও আলোকিত করিতে হইবে।

নিজের মধ্যে নিভৃত ও নিশ্চিত, প্রশান্ত ও অবিচল কেন্দ্র মানুষ কখনও আবিষ্কার করিতে পারে না যদি তাহার বহির্মুখী চক্ষু নিমীলিত হইয়া অন্তরের কেন্দ্রের সন্ধানে স্থিরলক্ষ্য না হয়। যেদিন লেখক পাশ্চাত্যচিন্তাস্রোতের লক্ষ্যহারা গতিতে না ভাসিয়া অন্তরের লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি ফিরাইবেন, সেদিনই তিনি "বিক্ষোভের অবসানে অন্য স্তরে আরোহণ" করিতে পারিবেন, আর সেই স্তরে আরোহণ করিতে পারিলে পাশ্চাত্য বিশ্লেষণী চিন্তাধারারও প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভবপর হইবে।

অধ্যাপক মহাশয় লিখিয়াছেন যে তিনি ভাষার জটিলতা কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই। ইংরাজীতে একটি প্রবাদ আছে "Style is the man", মানুষের মানসিক প্রকৃতি তাহার রচনাভঙ্গীতে বেশ প্রকাশ পায়। শুধু প্রবন্ধের বিষয়ের দুর্ব্বোধ্যতার জন্য নয়—লেখক বিষয়গুলিকেই গহন চিন্তাজালে জটিল করিয়া ফেলিয়াছেন। চিন্তারাজ্যে গিয়া লেখক পথ হারাইয়া ফেলিয়াছেন। কিন্তু চিন্তারাজ্য ছাড়িয়া যখন তিনি বস্তুজগতে ফিরিয়া আসিয়াছেন তখন নিজেও যেরূপ স্বস্তি পাইয়াছেন পাঠকবর্গকেও সেরূপ সজীবতার মলয়স্পর্শে সঞ্জীবিত করিতে পারিয়াছেন।

লেখকের মন, চিন্তা ও ভাষার সম্পূর্ণ বিভিন্নরূপ দেখিতে পাই যখন তিনি তাঁহার চতুঃপার্শ্বের ঘটনার বর্ণনা করিয়াছেন। এখানে লেখকের অনুভূতি বাস্তব ও অতি সরস; ভাষাও অতি সুন্দর ও প্রাঞ্জল। বর্ণনার ক্ষমতা লেখকের অতি উঁচুদরের। সহজ সরস ও স্বচ্ছন্দ ভাষায় লেখক "দেশের কথায়" দেশকে কতটা সত্য করিয়া অনুভব করেন ও দেশকে কতটা চিনেন তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। সমগ্র গ্রন্থটির মধ্যে তাঁহার এই প্রবন্ধটি উজ্জ্বল রত্নখণ্ডের মত জ্বল্ জ্বল্ করিতেছে। ইহাতে চিন্তার সূক্ষ্মজালবয়ন নাই, বুদ্ধিবিলাস নাই—আছে সত্যকার দেশাত্মানুভূতি। সত্যানুভূতি এখানে আছে বলিয়াই ইহা আমাদের প্রাণে অনায়াসে ও তীব্রভাবে স্পর্শ করে। কষ্ট করিয়া ইহা পড়িতে বা বুঝিতে হয় না। লেখকেরও এইখানেই কৃতিত্ব। তাঁহার লেখা একদিকে দেশের প্রতি সমবেদনায় পূর্ণ ও অপরদিকে হাস্যরসে সুরস। দেশের জাগরণের গোড়া হইতে আজ পর্য্যন্ত সমুদয় বিষয়ের এমন সুন্দর বর্ণনা প্রশংসনীয় বলিলেও অল্প বলা হয়। তবে এত দীর্ঘ সময়ের দীর্ঘ ঘটনাগুলিকে সংক্ষেপে বর্ণন করিতে গিয়া একটু ব্যস্ততা আসা স্বাভাবিক। ঘটনাগুলি যেন ছায়াচিত্রের মত অতিদ্রুত গতিতে মনের উপর দিয়া চলিয়া যায়।

অধ্যাপক মহাশয় পরের চিন্তিত বিষয়ের আলোচনার পরিবর্ত্তে দুই চক্ষু মেলিয়া যাহা দেখেন তাহা যদি এরূপ সরস ও শক্তিশালী ভাষায় প্রকাশ করেন, তবে বঙ্গবাণীর পূজা তাঁহার সার্থক হইবে এবং অন্তরের সমৃদ্ধিতে বঙ্গভাষাকে তিনি সত্যই সমৃদ্ধ করিতে পারিবেন।

শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী

Science Today :—Planned and arranged by the late Sir J. A. Thomson : Edited by J. G. Crowther. 1934. (Eyre and Spottiswoode, London.)

The Universe of our Experience :—L. M. Parsons D.Sc. (Williams & Norgate Ltd.)

বিজ্ঞান সংক্রান্ত বইএর যত প্রচার হয় ততই ভাল। কেবল শিক্ষার বিস্তারের দিক থেকে বলছি না। সভ্যতার আজ সঙ্কটময় অবস্থা। জ্ঞানের সঙ্গে সভ্যতার সম্বন্ধ নিকট, তাই আজ জ্ঞানের ইতিহাসেও সঙ্কটময় মুহূর্ত্ত এসেছে। বিশেষজ্ঞ-সম্প্রদায় জ্ঞান-বৃদ্ধির অজুহাতে তাঁদের বিষয়গুলিকে লোকচক্ষুর অন্তরালে রেখে এসেছেন। লোকচক্ষুর অর্থ সাধারণের চোখ নয়, মার্জ্জিত-বুদ্ধি ভদ্রলোকের চোখ। আমেটার কথাটি গালাগালির সামিল হয়ে উঠেছে, ফলে বিশেষজ্ঞের চোখে ঠুলি উঠেছে এবং তাঁদের ওপর অগাধ বিশ্বাসে জনসাধারণ অন্ধ হয়ে উঠেছেন। এই প্রকার অন্ধত্ব ধর্ম্মান্ধতা অপেক্ষা কম ক্ষতিকর নয়। জনসাধারণকে অনেক কষ্টে জীবন ধারণ করতে হয়, সেইজন্য তাঁদের সাধারণ-বুদ্ধি খোলে, এবং সাধারণ বুদ্ধির সমালোচনায় বিশেষজ্ঞের দিব্যানুভূতি ও দৈব-দাবী একটু সংযত হয়। সাধারণ-বুদ্ধির সমালোচনা এবং জনসাধারণের সাহায্য ব্যতীত বিশেষ জ্ঞান গুহ্যধর্ম্মে পরিণত হয়। গুহ্যধর্ম্মাবলম্বীর দাম্ভিকতার তুলনা নেই। বিশেষজ্ঞরা জনসাধারণের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হবার দরুণ অ-সামাজিক হয়ে পড়েছেন। অ-সামাজিক হওয়াও যা, আর সমাজের বিরুদ্ধাচরণ করাও তাই। জ্ঞানের সঙ্গে জীবনের যোগ খণ্ডিত হবার দরুণই পণ্ডিতবর্গের হাত থেকে সভ্যতাকে সমৃদ্ধ করবার ভার চালাক লোকেদের হাতে সরে এসেছে। সভ্যতাকে আর তাঁরা উদ্ধার করতে পারছেন না। এবং উদ্ধার করতে পারছেন না বলেই যে ক্ষেত্রে তাঁদের অধিকার নেই তার ওপর অধিকার-বিস্তারে তৎপর হয়ে উঠেছেন। তাই আজ জার্ম্মাণদের মতন বিজ্ঞানপ্রিয় ও বিশেষজ্ঞবহুল জাতিও সুপ্রজনন বিদ্যার অনিশ্চিত সিদ্ধান্তের দোহাইএ ইহুদীদের ওপর অত্যাচার করছেন। তাই আজ বিশেষজ্ঞ সম্প্রদায় ধনিক-তন্ত্রের ক্রীতদাস। জীবনের সঙ্গে জ্ঞানের সম্বন্ধ ভেঙ্গে গেলে পণ্ডিতবর্গ সভ্যতার শত্রু হয়ে ওঠেন। বিশেষজ্ঞের মধ্যে আজ কেউ কেউ সভ্যতার দুরবস্থা স্মরণ করে জীবনের সঙ্গে জ্ঞানের সম্বন্ধকে পুনঃস্থাপিত করতে তৎপর হয়েছেন। যাঁরা বিজ্ঞানকে ভাল ভাবে জীবন ধারণের উপায়মাত্র বিবেচনা করেন তাঁরা এই বই দুখানিকে সমাদর না করে থাকতে পারবেন না। দিগ্‌গজ পণ্ডিতে বই দুটি লিখেছেন—কিন্তু সহজ ভাষায়, সুন্দরভঙ্গীতে। সর্ব্বনাশ উপস্থিত হলে পণ্ডিতে অর্দ্ধেক ত্যাগ করতে রাজি হন। যেটুকু পরিত্যক্ত হয়েছে—সেটুকু বিশেষজ্ঞের দাম্ভিকতা এবং অতিরিক্তদাবী।

বই দুখানির কেন্দ্র হল মানুষ ও তার কল্যাণ, মাত্র জ্ঞান ও জ্ঞানবৃদ্ধিই নয়, জ্ঞানবৃদ্ধির ফলে যে কল্যাণ সম্ভব হয়েছে সেই কল্যাণ। টম্‌সন্ সাহেব পৃথিবীর পনের জন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতকে নিজের নিজের বিষয়ে লিখতে অনুরোধ করেন, টম্‌সন্ সাহেবের মৃত্যুর পর ক্রাউথার সাহেব সেই প্রবন্ধগুলি একত্রিত করেছেন। বইখানির প্ল্যানে একটু বৈশিষ্ট্য আছে। অন্য বইএ গোড়ায় থাকে অঙ্ক, তর্কশাস্ত্র, দর্শন প্রভৃতি abstract systemsএর বর্ণনা ও বিচার, পরে আসে রসায়ন, পদার্থ-বিদ্যা, সুপ্রজনন

কিংবা জীববিজ্ঞান। কিন্তু টম্‌সন্‌ সাহেবের প্ল্যান উল্‌টো ধরণের। সমাজ যখন শান্তিতে অগ্রসর হচ্ছে তখন মানুষ নিজের কথা ভাবে না—না ভাবলেও তার চলে। কিন্তু সমাজ ও জীবন যখন বিপ্লবশীল হয়ে ওঠে, তখন মানুষ প্রথমেই নিজের জীবনের কথা ভাবে—ভাবাই তার উচিত। এই দ্রুত পরিবর্ত্তনশীল যুগের উপযুক্ত জ্ঞানের দিক থেকে বলা চলে যে মানুষ প্রথমে নিজেকে জানে, অতএব তার জ্ঞান অন্তর থেকে বাইরে প্রকাশ পায়। মানুষের অন্তরতম তথ্য হল তার বীজ, তার স্বাস্থ্য ও দেহ, তার রীতিনীতি, তার মন, সমাজ ও ধর্ম্ম। বাইরে এসে প্রতিবেশের সঙ্গে তার সাক্ষাত হয়। তার পারিপার্শ্বিকের প্রধান কথা হল পঞ্চভূতের সমন্বয়—অতএব ভূত ও পদার্থবিদ্যা আলোচিত হচ্ছে প্রথমে, পরে ভূতত্ত্ব ও জ্যোতিষ। তারও পরে আসে অন্তর ও বাহিরের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন। সেই সম্বন্ধ স্থাপনের রীতিনীতি হল অঙ্কশাস্ত্র, ন্যায়শাস্ত্র ও দর্শন। প্রত্যেক শাস্ত্রই প্রতিষ্ঠিত হয় কার্য্য-কারণ পর্য্যায়ের ওপর। বর্ত্তমানকালের বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায়ের গুরুস্থানীয় প্ল্যাঙ্ক কার্য্য-কারণ পর্য্যায়ের সূক্ষ্ম বিচার করে বইখানির গৌরব বৃদ্ধি করেছেন। পূর্ব্বোক্ত পদ্ধতির মধ্যে গলদ দেখান খুব শক্ত না হলেও আপাতত তার গুণের কথা স্মরণ করাই ভাল—কারণ মানুষের জন্যই বিজ্ঞান, বিশেষজ্ঞের জন্য মানুষ কিংবা প্রকৃতি তৈরী হয় নি।

প্রথমেই Hogben জীবতত্ত্বেরও একটি চমৎকার আলোচনা করেছেন। জীবতত্ত্বের নামে আজকাল অনেক দাবী করা হচ্ছে—সেই দাবী দাওয়ার জবাব হিসেবে প্রথম প্রবন্ধটি অত্যন্ত মূল্যবান। জাতিগত গুণ ও বৈশিষ্ট্যের ওপর নানা দেশে সমাজ প্রতিষ্ঠানের চেষ্টা চলছে—হগবেনের মতে জীব-বিজ্ঞান সে সম্বন্ধে এখনও নীরব থাকতে বাধ্য। কারণ মানুষের সামাজিক ব্যবহারে পারিপার্শ্বিকের প্রভাব কোন অংশেই বংশগত কিংবা বীজগত মানসিক ও দৈহিক বিন্যাস অপেক্ষা কম নয়। অতএব নব-মানব-সৃজনের অপেক্ষা প্রতিবেশের সংস্কার-সাধন আপাতত বেশী প্রয়োজনীয়। হগবেনের সিদ্ধান্ত Pieronএর একটি মূল্যবান বাক্য স্মরণ করিয়ে দেয়—The brain is the seat of all trends—হগবেনের মতেও মস্তিষ্কের স্নায়ুমণ্ডলীর অনুসন্ধান-শক্তি (co ordinating capacity) দ্বারা অনেক সামাজিক সমস্যার সমাধান হয়। সমালোচকের মতও তাই—ইতিপূর্ব্বে একাধিক স্থানে তিনি এই মতের ব্যাখ্যা ও সমর্থন করেছেন।

Sir Leslie Mackenzie ডাক্তারী বিজ্ঞানের ইতিহাস লিখে দেখাচ্ছেন, যেমন পাদ্রীর হাত থেকে পরিত্রাণ পেয়ে বিদ্যার উন্নতি সম্ভব হয়েছে, তেমনি ডাক্তারদের হাত থেকে ডাক্তারী বিদ্যা মুক্ত হয়ে রাসায়নিক, এবং পদার্থবিদের কাছে এলে লাভই হবে। অবশ্য পাদ্রী ও ডাক্তারদের বিশেষ অধিকার ও একাধিপত্যের বিপক্ষেই আপত্তি তোলা হয়েছে। Marret-এর প্রবন্ধের মূল কথা হ'ল এই—অন্যান্য জীবতাত্ত্বিক বিদ্যার পদ্ধতিই হল নৃতত্ত্বের পদ্ধতি, নৃতত্ত্বের পদ্ধতি অন্য কিছু নয়। নৃতত্ত্বের পদ্ধতি বৈজ্ঞানিক উপায়ে জীবনের মূল্য সমর্থন করছে—যে মূল্য ঐতিহ্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, কৃষ্টির দ্বারা নিরূপিত। Masson একজন বিখ্যাত রাসায়নিক—তিনি খোলাখুলিই বলেছেন যে রসায়ন বিদ্যার সাহায্যে রাসায়নিক প্রক্রিয়া ভিন্ন অন্য কিছুর ব্যাখ্যা অসম্ভব—তার দ্বারা Realityর প্রকৃতি বোঝা যায় না। Prof. Eveএর প্রবন্ধে Wave-Theroyর বর্ণনা আছে—তাঁর সিদ্ধান্ত হল এই যে পর্য্যবেক্ষণ-ক্রিয়ার মধ্যে কোথায় যেন subjective

element লুকিয়ে থাকেই থাকে। Aliotta একজন বড় ইটালীয়ান দার্শনিক—তিনি দেখাচ্ছেন যে ইতিহাস ও মানুষের ইচ্ছাশক্তি তর্কশাস্ত্রের সব রীতিকেই বিধ্বস্ত করে, অতএব অন্তর্গত সামঞ্জস্যই সত্যের একমাত্র পরিচয় নয়। দার্শনিক সত্যও বৈজ্ঞানিক সত্যের মত পরীক্ষার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হবে। ব্যক্তিগত জীবনে দার্শনিক পরীক্ষার উল্লেখ দেখলেই হিন্দু-দর্শনের সাধনার কথা মনে পড়ে। স্বাধীনতা ও নিয়তির মিলন ও পরিণতি কি ব্যক্তিগত জীবনের সাধন-লব্ধ পরিপূর্ণতায়? Parsons অন্ততঃ তাই বিশ্বাস করেন—তাঁর মতে 'Life itself is found to be inexplicable on any mechanistic basis; and personality, the outstanding feature in the universe of our experience, is still possessed of free-will, initiative, foresight, and those greater qualities which can link it permanently with Beauty, Goodness and Truth, the things which really matter, the realities which last for evermore"—এ ক্ষেত্রে personality অর্থে পুরুষ, অর্থাৎ পরিপূর্ণ ব্যক্তি।

Professor Max Planckএর মতবাদ পরিচয়ের পৃষ্ঠায় ইতিপূর্ব্বে বিস্তারিত-ভাবে আলোচিত হয়েছে। তাঁর বিশ্বাস যে আদর্শ জগতেই determinism খাটে, ব্যবহারিক জগৎই indeterminate। আদর্শ জগতের অস্তিত্ব আছে, তবে সেটি বুদ্ধিগম্য নয়।

Prof. Heath বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে দার্শনিক মতবাদের পরিবর্ত্তন আলোচনা করেছেন। তিনি বৈজ্ঞানিক মতামতের যোগ সাধনকে philosophy বলতে চান না, synoptic science নাম দিয়েছেন। কারণ তাঁর মতে বিজ্ঞানের উন্নতিতে বিজ্ঞানেরই ক্ষতিবৃদ্ধি হয়েছে, দর্শনের বড় বেশী কিছু পরিবর্ত্তন ঘটেনি। বিজ্ঞানের পক্ষে সংজ্ঞাগুলি নতুন হলেও দর্শনের পক্ষে পুরাতন। দর্শনের কেবল temper বদলেছে, content যা ছিল তাই আছে। অবশ্য দার্শনিকবৃন্দ synthetic system তৈরী করতে আর সাহসী হচ্ছেন না, তাঁদের বিশ্লেষণ সূক্ষ্মতর হয়েছে। আগে যেমন ভগবদ্‌ বিশ্বাসের দ্বারা সমাজ শৃঙ্খলিত হত, তেমনি বিজ্ঞানের দান অর্থাৎ সূক্ষ্মতর বিশ্লেষণের সাহায্যে দর্শন নব্য-সমাজকে সুবিন্যস্ত করবার আশা পোষণ করে।

আমি মাত্র গোটাকয়েক প্রবন্ধের সংক্ষিপ্তসার দিলাম। দুখানি বইএরই লিখনভঙ্গী দেখলে মনে হয় যেন দার্শনিকের চেয়ে বৈজ্ঞানিকেরই মেজাজ বদলেছে। তিনি হয়ে পড়েছেন বিনয়ী ও সাবধানী, পরের কোঠায় পা দিতে বড়ই ভীতু। প্রত্যেক পণ্ডিতই ইঙ্গিত করেছেন যে বিজ্ঞানের জগৎ ধর্ম্মের জগৎ থেকে ভিন্ন—অতএব বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির দ্বারা গুহ্যধর্ম্মের ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। এই মনোভাবে আমার কোন আপত্তি নেই। কেবল ভয় হয়, পাছে বই দু'খানি কোন আশ্রমবাসী M. Sc. D. Sc. ডিগ্রীধারীর হাতে প'ড়ে তাঁদের আত্মতৃপ্তির মাত্রা হঠাৎ বাড়িয়ে দেয়। ভারতবর্ষের কপাল বড়ই খারাপ, তাই ভয় হয়। নচেৎ যাঁরা দুঃসাহসী, যাঁরা প্রাণ খুলে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির শেষ বেশ দেখতে চান, তাঁদের পক্ষে এই বই দুটি উপকারী।

শ্রীধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

রবীন্দ্রজীবনী (১ম খণ্ড)—শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। শান্তিনিকেতন।

এই গ্রন্থে কবির জীবনের প্রথম পঞ্চাশ বৎসরের (১২৬৮—১৩১৮) ঘটনা-সমূহের বর্ণনা ও তাঁহার এই সময়কার সকল রচনার আলোচনা আছে। লেখক ইহাতে শুধু কবির জীবনের বিবরণ দিয়েই ক্ষান্ত হন নাই। এই পর্ব্বে কবি যাহা কিছু লিখিয়াছেন তাহাদের রচনার ও প্রকাশের যুগের সহিত সংক্ষেপে তুলনা-মূলক আলোচনা করিয়াছেন। এই সব আলোচনা সংক্ষিপ্ত হইলেও সর্ব্বত্রই লেখকের রবীন্দ্র-সাহিত্যের বিষয়ে গভীর জ্ঞান ও রসগ্রাহিতার পরিচয় দেয়।

ভূমিকার আগেই বিচক্ষণ লেখক "কবিরে পাবে না তাহার জীবন-চরিতে" এই বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন, এবং ভূমিকাতেও রবীন্দ্রনাথের মত এত বড় মনীষী ও স্রষ্টার জীবন-চরিত লেখার ব্যর্থতা সম্বন্ধে স্পষ্ট ইঙ্গিত করিয়াছেন। তবুও প্রয়াস করিতে হইবে। আমাদের মধ্যে এ পর্য্যন্ত কবিকে বুঝিবার ও বুঝাইবার চেষ্টা সম্যক হয় নাই। এ বিষয়ে আমরা এতই উদাসীন যে অন্য কোনও সংস্কৃতিসজাগ জাতির সহিত আমাদের তুলনা হয় না।

রবীন্দ্রজীবনী শুধু একটিমাত্র ব্যক্তি-বিশেষের জীবনী নহে। গত ৬০।৭০ বৎসর ব্যাপিয়া বাঙ্গালীর সাধনা, তাহার রাজনীতি, সাহিত্য ও সমাজ-সেবা এক কথায় বাঙ্গালী জগতের সর্ব্ব বিভাগে যাহা কিছু হইয়াছে রবীন্দ্রনাথ তাহার সহিত অতিশয় ঘনিষ্ঠ ভাবে সংশ্লিষ্ট। রবীন্দ্রনাথের জীবনী নব বাঙ্গালী জাতির জীবনেতিহাস। প্রভাতকুমার এই সমগ্র ইতিহাসের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া এই গ্রন্থ সম্পাদন করিয়াছেন। নানা বাদ প্রতিবাদ, কত ব্যক্তিগত ও মতবাদগত আক্রমণের ইতিহাস লেখককে পর্য্যালোচনা করিতে হইয়াছিল। কোথাও তাঁহার লেখনী সম্প্রদায় বা সমাজ বা মতের পক্ষপাতে দুষ্ট হয় নাই। ইহা কম কৃতিত্বের কথা নহে।

লেখক বহু বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের জীবনে একই সময়ে নানা বিষয়ের, ও অনেক সময় পরস্পর-বিরোধী মতের, প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রন্থকার দেখাইয়াছেন যে একই কালে জীবনের বিচিত্র রসের সম্ভোগ ও প্রকাশ হইতেছে রবীন্দ্র সাহিত্যের বিশেষত্ব। বাহিরের ঘটনা-সমূহের ঘাত-প্রতিঘাতে কবির জীবন কি ভাবে কখন সাড়া দিয়াছে তাহার চিত্তাকর্ষক ইতিহাস লেখক বিবৃত করিয়াছেন। তবুও আরও অনেক জানিতে ইচ্ছা হয়। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে সব কথা বলিবার ও জানিবার সময় এখনও হয় নাই। জীবনের পটভূমিকার সহিত পরিচিত না হইলে কোন কবিরই কাব্যের রসাস্বাদ সম্পূর্ণ হয় না। রবীন্দ্রনাথের জীবন ও তাহার অভিব্যক্তি যে সাহিত্য তাহা এক সঙ্গে পাশাপাশি করিয়া না দেখিলে রবীন্দ্র সাহিত্যের অনেক অংশের প্রকৃত মর্ম্ম ও রস উপলব্ধি হওয়া সম্ভব নয়। জীবনকে ও জগৎকে বিচিত্র ভাবে জানিবার ও জানাইবার সাধনাই তাঁহার জীবনের সাধনা। এই প্রচেষ্টার অন্তরে রহিয়াছে তাহার জীবন-দেবতার নিত্য সাহায্য। এইজন্য লেখক দেখাইতেছেন যে কবি কোন বিষয়েই বেশী দিন স্থির ও বন্ধনযুক্ত হইয়া থাকিতে পারেন নাই। এক অনন্ত শক্তি অগোচরে থাকিয়া তাঁহাকে বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে চালিত করিয়াছে।

এই জীবনীতে প্রকাশ পায় যে রবীন্দ্রনাথ 'কমলবিলাসী' কবি নন। তিনি একজন নিরলস কর্ম্মী, নানা শুভ প্রতিষ্ঠানের প্রাণ-স্বরূপ; আদর্শপন্থী সেবক ও সমাজ-সংস্কারক।

গ্রন্থখানিতে রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন বয়সের এবং নানা ভাবের অনেকগুলি ছবি আছে। তাহার মধ্যে একটি বিশেষ করিয়া দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সেটি পুস্তকের ১৬৮ পৃষ্ঠায় অবনীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ নামিত ছবি। ষ্টার রঙ্গমঞ্চে যাঁহারা চিরকুমার সভার অভিনয় দেখিয়াছেন তাঁহাদের স্মরণ হইবে, নট অহীন্দ্র চৌধুরী চন্দ্রবাবুর ভূমিকায় যেরূপ সাজ-সজ্জা করিয়াছিলেন তাহা এই ছবিতে রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতির অনুরূপ।

গ্রন্থখানির দ্বিতীয় খণ্ড (১৩১৯—১৩৪০) যন্ত্রস্থ। প্রথম খণ্ডে জীবনীকার যে পরিশ্রমশীলতার ও কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন, কবির জীবনের দ্বিতীয়ার্দ্ধের বিস্তৃততর পরিসরের মধ্যে তাহার অনুরূপ প্রকাশ কবির অসংখ্য পাঠকমণ্ডলীর সাহিত্যিক কৌতূহল-পিপাসা চরিতার্থ করিবে ; ও এই সম্পূর্ণ গ্রন্থ রবীন্দ্রনাথের কর্ম্ম ও ভাব-বহুল জটিল জীবনের সুবিচিত্রিত আলেখ্য হিসাবে বাঙালী পাঠককে সহায়তা করিবে এই বিশাল প্রতিভাকে জাতীয় সংস্কৃতির অঙ্গীভূত করিবার প্রয়াসের পথে।

শ্রীমণিভূষণ ভট্টাচার্য্য

On the Meaning of Life—Edited by Will Durant. (William and Norgate).

মাঝে মাঝে এক একটা বই হাতে আসিয়া পড়ে সাহিত্যহিসাবে যাহার দাম হয়ত বেশী নহে কিন্তু যাহা বিষয়বস্তুর গৌরবে সহজেই আমাদের কুতূহলী দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই বইখানি সেই শ্রেণীর। জীবনের কোন অর্থ আছে কিনা, থাকিলে তাহা কি, ইহাই ইহার আলোচ্য বিষয়। সম্পাদক এ বিষয়ে বহু লোকের মতামত সংগ্রহ করিয়াছেন। এমন লোক খুব অল্পই আছে যাহার মন কখনো না কখনো ঠিক এই প্রশ্নে চঞ্চল হইয়া উঠে নাই। সুতরাং এই বইখানি পড়িবার আগ্রহ হওয়া কতকটা স্বাভাবিক।

কিন্তু Symposium শ্রেণীর রচনার একটি দুঃখ যে ইহাতে কোন একটি লেখককে সমগ্রভাবে পাওয়া যায় না ; ফলে তাহার মধ্যে পৌর্ব্বাপর্য্য, ঐক্য ও মতের ক্রম-বিকাশের অভাব ঘটে। সুতরাং সাধারণতঃ এই শ্রেণীর গ্রন্থ অংশবিশেষে উপভোগ্য হইলেও সমগ্রহিসাবে ভাল লাগে না। কিন্তু যদি কখনও উপযুক্ত সম্পাদকের হাতে পড়ে তাহা হইলে গ্রন্থনৈপুণ্যের ফলে এই অনতিক্রম্য দোষ সত্ত্বেও তাঁহার সম্পাদিত গ্রন্থ পাঠ করিয়া আনন্দ লাভ করা যায় ও তাহার মধ্যে একটি অখণ্ড ও সমগ্র চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়।

Will Durant প্রথিতনামা লেখক ; ফিলজফির অতি নিগূঢ় তত্ত্বগুলি অতি সহজে স্বচ্ছভাবে বলিবার তাঁহার একটি অসাধারণ ক্ষমতা আছে। এই বইখানিতে তিনি তাঁহার সেই ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়াছেন। তাঁহার সম্পাদনের গুণ এই যে তিনি এই সব বিভিন্ন মতগুলি লইয়া তাল পাকাইয়া একটি অসাধ্য সামঞ্জস্য সাধনের চেষ্টা করেন নাই। কারণ তিনি ভাল করিয়াই জানেন যে একশত লোকের কথা দূরে থাক জীবনের অর্থ লইয়া দুইটি লোকই এক মত হইবে না। সুতরাং সমীচীন সম্পাদকের মত তিনি বিভিন্ন মনীষিগণের মতামতগুলি সাজাইয়া দিয়াছেন এবং তাহাদেরই মধ্যে

তাঁহার নিজের মত প্রকাশ করিয়াছেন। যদি কোন পাঠক জীবনের এই সমস্যার সমাধানে বিভিন্ন মনীষিগণের মধ্যে ঐক্যমত্য আশা করিয়া বইটি পড়িতে যান তাঁহাকে নিরাশ হইতে হইবে।

Will Durant বর্ত্তমান কালের একশত জন জীবনরসিক মনীষীর নিকট প্রশ্ন করিয়া চিঠি লিখিয়াছিলেন, জীবনের অর্থ কি ? তাঁহার মতে এতদিন শুধু জীবনকে যাঁহারা এক হিসাবে এড়াইয়া গিয়াছেন এমন শ্রেণীর দার্শনিক ও ধর্ম্মতাত্ত্বিকগণই এই প্রশ্ন লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। প্রতিদিনকার জীবনের সহিত তাঁহাদের যোগ নিবিড় ছিল না। ফলে তাঁহাদের আলোচনা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কিছু পরিমাণ অবাস্তব ও intellectual হইয়া উঠিয়েছিল। তাহাতে সাধারণ মানুষের মন ভরে না। অথচ পণ্ডিত মূর্খ সকলেই জীবনের একটি অর্থ খুঁজিয়া বাহির করিতে চায়। সুতরাং যাঁহারা জীবনের রস খুঁজিয়া পাইয়াছেন, যাঁহারা প্রাকৃত জনসাধারণেরই মত জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন, তাঁহারা যদি এই প্রশ্নের আলোচনা করেন তাহা হইলে হয়ত আলোর সন্ধান মিলিতে পারে। Will Durant এই জন্য গান্ধীজী, রাসেল, বার্নাডশ, আঁদ্রে মরোয়া হইতে আরম্ভ করিয়া ফিল্ম অভিনেতা Will Rogers, ফিল্ম ডিরেক্টার লেম্‌লে, এমন কি টেনিস জগতের হেলেন উইল্‌স্‌ মুডি পর্য্যন্ত জীবনের সকল পর্য্যায়ের ও স্তরের লোকের কাছে প্রশ্ন করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহাদের উত্তরগুলিও জীবনেরই মত চিত্রবিচিত্র হইয়াছে। সকলেই যে উত্তর দিয়াছেন তাহা নহে, কেহ কেহ প্রশ্ন এড়াইয়া গিয়াছেন। বার্নাড শ' তাঁহার স্বাভাবিক ব্যঙ্গের সুরে পাল্‌টা প্রশ্ন করিয়াছেন, এরূপ প্রশ্নেরই কোন অর্থ আছে কি ? রাসেল বলিয়াছেন তিনি নানা কাজে এমন ব্যস্ত যে তাঁহার মনে হইতেছে জীবনের কোন অর্থ নাই। কেহ কেহ সংক্ষেপেই সারিয়াছেন। তাঁহারা সকলেই যদি খোলাখুলিভাবে প্রশ্নটি আলোচনা করিতেন তাহা হইলে বইটি যে আরো উপভোগ্য হইত তাহাতে সন্দেহ নাই।

এইখানেই বলিয়া রাখা ভাল দার্শনিক পাঠকের হয়ত বইখানা ভাল লাগিবে না। ইহার মধ্যে কোন দার্শনিক কূটতর্ক নাই, কোন বিশেষ দার্শনিক মতের ক্রম-বিকাশ নাই। আমার মত পাঠক যাঁহারা দর্শন শাস্ত্রকে ভয় করিয়া দূরে রাখিয়া চলেন তাঁহারা হয়ত বইটি পড়িয়া কিছু পরিমাণ আনন্দ লাভ করিবেন। কারণ বইখানি মুখ্যতঃ এই শ্রেণীর লোকের জন্য লেখা। ইহার মধ্যে গভীরতা নাই কিন্তু মানুষ-সুলভ সহৃদয়তা আছে।

যে অধ্যায়ে গ্রন্থের আরম্ভ হইয়াছে Durant তাহার নাম দিয়াছেন An anthology of doubt। আমাদের মধ্যে একদল আশাবাদী আছেন যাঁহারা জীবনের কোন অর্থ আছে কিনা এই প্রশ্নের গভীর তাৎপর্য্য না বুঝিতে পারিয়া একটি superficial উত্তর দিয়া প্রশ্নটি এড়াইতে চাহেন। সেরূপ আশাবাদের, বিশ্বাসের মূল্য বেশী নহে। তাঁহাদেরই উদ্দেশ্যে Durant বলিয়াছেন—no one deserves to believe unless he has served an apprenticeship of doubt। অর্থাৎ যাহার মনে সন্দেহ জাগে নাই এমন লোকের বিশ্বাসের বিশেষ মূল্য নাই। তাই এই অধ্যায়ে তিনি জীবনের কোন অর্থ থাকার বিপক্ষে যাহা বলিবার আছে তাহা বলিয়াছেন, এ বিষয়ে প্রতিপক্ষের মতগুলি সংগ্রহ করিয়াছেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিভিন্ন মনীষীদের মতগুলি সংগৃহীত হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে গান্ধীজী ও জবাহিরলাল নেহরুর উত্তর দুইটি আমাদের পক্ষে চিত্তাকর্ষক হইবে মনে হইল। অবশ্য তাঁহাদের উভয়েরই জীবনে ও কর্ম্মে পরোক্ষভাবে এই প্রশ্নের যে উত্তর আমরা পাই এখানে সংগৃহীত উত্তর দুইটিও সেই রকম। আঁদ্রে মরোয়ার উত্তরটি একটি lyric। দুর্ভাগ্যক্রমে সম্পাদক তাহার সমস্তটি উদ্ধৃত করিয়া দেন নাই, কিন্তু যেটুকু দিয়াছেন তাহাই পাঠককে মুগ্ধ করে। আর একটি উত্তর খুব ভাল লাগিল। বইটি যখন ছাপা হইতেছিল তখন প্রকাশকগণ Sing Sing জেলে চিরনির্ব্বাসন দণ্ড প্রাপ্ত একজন বন্দীর নিকট প্রশ্নের একটি নকল পাঠাইয়া দেন। তাঁহার উত্তর সময় মত না আসায় গ্রন্থের পরিশেষে দেওয়া হইয়াছে। সে উত্তরের মধ্যে নির্ভীকভাবে প্রশ্নটি আলোচনা করিবার একটি চেষ্টা দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি।

গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ের নাম letters to a suicide। জীবনের কোন অর্থ খুঁজিয়া না পাইয়া অনেক হতভাগ্যই আত্মহত্যা করিয়া জীবন হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে চাহে। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ Durantকে মাঝে মাঝে চিঠিও লিখিয়াছে। তাহাদেরই একজনকে কল্পনা করিয়া আত্মহত্যার বিপক্ষে যুক্তি প্রয়োগ করিতে গিয়া ডুরাণ্ট জীবন সম্বন্ধে তাঁহার মতামত প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীঅনাথনাথ বসু

Bengal Vaishnavism—By Bipin Ch. Pal.

আলোচ্য গ্রন্থে অল্প কথায় গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্ম বিষয়ে সমস্ত জ্ঞাতব্য তত্ত্বই সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। পুস্তকখানি ক্ষুদ্র, তবু ইহা পাঠ করিলে ভক্তিমার্গ, বৈষ্ণব সাধনা, ও গৌড়ীয় পন্থার বিশেষত্ব সম্বন্ধে একটা সাধারণ জ্ঞান জন্মে।

পুস্তকে পাণ্ডিত্যের নিদর্শন যথেষ্ট আছে, তবে সেই পাণ্ডিত্যের উপর যেন একটা ক্ষুদ্র সাম্প্রদায়িকতার ছায়া পড়িয়াছে; রামমোহন ও রামকৃষ্ণের পরেও এই গৌড়দেশে ধর্ম্মসম্বন্ধে সঙ্কীর্ণতা দেখিলে মনে পরিতাপ না হইয়া যায় না। বিশেষতঃ যখন সেই সঙ্কীর্ণ পথে প্রবেশ করিতে আমন্ত্রণ করিতেছেন বিপিনচন্দ্রের মত একজন দেশবিশ্রুত ভাবুক। বাল্যকালে তাঁহার মুখে জ্বলন্ত ভাষায় একেশ্বরবাদের ব্যাখ্যা শুনিয়াছি। যৌবনে তাঁহার বজ্রকণ্ঠে আহ্বান শুনিয়াছি দেশসেবার ব্রতে। আজ তাঁহার হস্তে সাম্প্রদায়িক পতাকা দেখিয়া সুখী হইতে পারিলাম না।

এই গ্রন্থের আর একটি দোষ দেখিয়া আমরা কষ্ট পাইয়াছি। ইহাতে বৈষ্ণবজনোচিত দৈন্য ও বিনয়ের একান্ত অভাব। স্থানে স্থানে ভাষার ধ্বনি রণতূর্য্যের মত। মনে হয় যেন কোনও বিদ্যাভিমানী দাম্ভিক পণ্ডিত প্রতিপক্ষকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিতেছেন। এ সেই পুরাতন New Indiaর বিষাণ; কিন্তু কান্ত মধুর ভাবপ্রকাশের নিতান্ত অনুপযোগী।

বৈষ্ণব দৈন্য ও বিনয়ের একটা উদাহরণ দেই,

জগাই মাধাই হৈতে মুঞি সে পাপিষ্ঠ।
পুরীষের কীট হৈতে মুঞি সে লঘিষ্ঠ॥
মোর নাম শুনে যেই তার পুণ্যক্ষয়।
মোর নাম লয় যেই তার পাপ হয়॥

* * *

আমি লিখি এহো মিথ্যা করি অভিমান।
আমার শরীর কাষ্ঠপুতলী সমান॥

(চৈতন্য চরিতামৃত)

চৈতন্যচরিতামৃতের টীকাকার রাধাগোবিন্দবাবু তাঁহার পুস্তকের ভূমিকায় লিখিয়াছেন—"শ্রীমন্ মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব ধর্ম্মের উদারতা বিশেষ প্রশংসনীয়। বৈষ্ণবাচার্য্যগণ অন্যান্য সাধারণ পন্থার অকিঞ্চিৎকরতা বা নিষ্ফলতা কীর্ত্তন করেন নাই। তাঁহারা বলেন, সকল পন্থারই সফলতা আছে, তবে এই সফলতা একরকম নহে। * * তাঁহারা বলেন, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন উপাস্য স্বরূপও মিথ্যা নহে; তাঁহারা সকলেই সত্য; তবে তাঁহাদের সকলের মূল—শ্রীকৃষ্ণ। * * বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সমন্বয় স্থাপনই বৈষ্ণবাচার্য্যদের অপূর্ব্ব কৃতিত্ব।"

আলোচ্য পুস্তকে এই উদারতা ও ইতর পন্থার প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শন দেখিলে আমরা সুখী হইতাম।

"ভক্তিতে মিলয়ে কৃষ্ণ, তর্কে বহুদূর" বৈষ্ণবেরই বাক্য। বৈষ্ণব ধর্ম্মের দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক ভিত্তি সম্বন্ধে বাদানুবাদ নিতান্তই নিষ্প্রয়োজন। শুধু তাই কেন, ভক্তির psychological বিশ্লেষণ করা আমাদের মতে মহাপাপ। মহাপ্রভু কীর্ত্তনের বন্যায় গৌড়বঙ্গ ভাসাইয়াছিলেন, বাক্যের অগ্নিবাণ বর্ষণে গৌড়জনকে বিধ্বস্ত করেন নাই। তিনি যে প্রকাশানন্দকে তর্কে পরাস্ত করিয়াছিলেন, সে ত তাঁহার মধুর জীবনের এক অতি অকিঞ্চিৎকর ঘটনা।

মায়াবাদকে উপহাস করা যত সহজ, শঙ্করের মত খণ্ডন করা তদপেক্ষা কঠিন। আলোচ্য পুস্তকের প্রথম পরিচ্ছেদে বাক্যবিন্যাসের চাতুর্য্য যথেষ্ট থাকিলেও ন্যায়-শাস্ত্রানুমোদিত যুক্তি তর্কের বাহুল্য নাই। চিদাকার ও নিরাকার, এই দুইশব্দের ভেদ কি প্রধানতঃ philological, কথার কথা নহে। যাহারা ব্রহ্মকে সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ বলিয়া জানিয়াছিলেন, তাঁহারা কি অর্থে নিরাকার শব্দ ব্যবহার করিতেন?

একস্থানে বিপিনবাবু বলিতেছেন,

"He is not without sense organs though his sense organs are not like our sense organs physical but spiritual,

(ভগবানের যে শ্রবণ দর্শনাদি ইন্দ্রিয় নাই তাহা বলা যায় না, তবে তাঁহার ইন্দ্রিয়গুলি আমাদের ন্যায় স্থূল নহে, সূক্ষ্ম)।

ইহাও কি কথার ভেল্কী নহে? যাঁহারা নির্গুণ ও সগুণের ভেদ দেখাইয়া গিয়াছেন, তাঁহারা ত বারবার বলিয়াছেন—তিনি স্থূল, সূক্ষ্ম, তিনি ব্যক্ত অব্যক্ত, তিনি মূর্ত্ত অমূর্ত্ত।

লেখকের আক্রোশ যে শুধু শঙ্করের মায়াবাদের উপর, তাহা নহে। মধ্যযুগের-ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মকেও তিনি ক্ষমা করিতে পারেন নাই। এই মধ্যযুগের ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম যে কি পদার্থ তাহা কিন্তু এ পুস্তক হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় না। সাধারণ হিন্দু, আমরা বিশ্বাস করিয়া থাকি যে যুগে যুগে নানা সাধনার মধ্য দিয়া সনাতন ধর্ম্মের ক্রমবিকাশ হইয়াছে। অদ্বৈতবাদী, দ্বৈতবাদী, শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব সকলেরই উত্তরাধিকারী আমরা।

মহাপ্রভুর আবির্ভাবের বহু পূর্ব্ব হইতেই জয়দেব বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসাদি গোস্বামি বৃন্দ বৃন্দাবনলীলার মধুর রস গৌড়দেশে অকাতরে বিতরণ করিতেছিলেন। বৌদ্ধধর্ম্ম, তন্ত্রের সাধনা, ও সহজিয়া পন্থা প্রচারের ফলে বাঙ্গালীর মনে বর্ণাশ্রমের মূল ধীরে ধীরে শিথিল হইয়া আসিয়াছিল। চণ্ডীদাসের বিখ্যাত শ্লোক ত সহজিয়ার কথা!

"শুনহ মানুষ ভাই,
সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই।"

সাধনার একটা সরল পন্থা লাভের জন্য বাঙ্গালীর প্রাণ উৎসুক হইয়া উঠিয়াছিল। এমন সময় আসিলেন শ্রীগৌরাঙ্গ। ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত অধিকার-ভেদের উচ্ছেদ করিয়া জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে মানবমাত্রকে তিনি হরিনাম কীর্ত্তনের অধিকার প্রদান করিলেন।

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

এই "কলৌ" কথাটা প্রণিধান-যোগ্য। নহিলে "নাস্ত্যেব গতিরন্যথা" অর্থহীন হইয়া যায়, সনাতন ধর্ম্মের ক্রমবিকাশেরও কোনও অর্থ থাকে না। বিপিনবাবুর মত ভাবুক একথা স্বীকার না করিলে গভীর দুঃখের বিষয় হইত। কিন্তু প্রথম কয় পরিচ্ছেদে মনের আবেগে যাহাই বলিয়া থাকুন, তিনি শেষের দিকে স্পষ্টই স্বীকার করিয়াছেন যে, কলিযুগে জ্ঞানযোগ ও কর্ম্মযোগ দুঃসাধ্য বা অপ্রচলিত হইয়া পড়িয়াছিল বলিয়াই লোকের মন সহজে ভক্তিযোগের দিকে ধাবিত হইয়াছিল। আলোচ্য গ্রন্থের একস্থানে লেখা হইয়াছে "Vaishnavism * * stands differentiated from the popular medieval thoughts and philosophies of India that are obsessed by the Vedantic dogma of Maya and Illusion.

কিন্তু কাচের ঘরে বসিয়া কি অন্যকে ঢেলা মারা চলে? সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মমাত্রই ত dogmaর উপর প্রতিষ্ঠিত। শুধু মায়াবাদই কি যত দোষ করিল? এই মায়াবাদ হইতেই নাকি হিন্দুর সর্ব্বনাশ হইয়াছে! শাক্ত বা শৈবের পক্ষে একথার প্রত্যুত্তর দান কঠিন হইবে না। গ্রন্থকার ভুলিয়া গিয়াছেন যে বৈষ্ণবধর্ম্মেও মায়াকে অস্বীকার করা হয় নাই। বৈষ্ণবাচার্য্যগণের মতে অপ্রকট ব্রজলীলায় শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের ভার্য্যা, কিন্তু প্রকট লীলায় তিনি অন্যের ধর্ম্মপত্নী। প্রকটের এই পরকীয়া ভাবময়ী লীলা বৈষ্ণব সাধনের মূল। এই পরকীয়া ভাব কৃষ্ণরাধা ও গোপসুন্দরীদের মনে যোগমায়ার প্ররোচনায় উপস্থিত হইয়াছিল। বৈষ্ণব গুরুগণের ইহা স্বীকৃত। সুতরাং যদি কেহ বলে যে স্বয়ং কৃষ্ণ এই সঙ্কীর্ণ অর্থে মায়াবদ্ধ হইয়াছিলেন সে কথা কি দোষাবহ হইবে? এই যোগমায়ার প্রভাব কোন কোন বৈষ্ণবগুরু কিন্তু স্বীকার

করিতে প্রস্তুত ছিলেন না, কেন না শ্রীজীব গোস্বামী তাঁহার চম্পূ গ্রন্থে কৈফিয়ৎ দিয়া গিয়াছেন যে দন্তবক্র বধের পরে শ্রীকৃষ্ণ যখন ব্রজে আগমন করিয়াছিলেন তখন লৌকিক রীতি অনুসারে শ্রীরাধিকাদি গোপসুন্দরীদিগের সহিত তাঁহার যথাশাস্ত্র বিবাহ হইয়াছিল। কিন্তু এ বিবাহ ঘটনা ত সকল গোস্বামীরা স্বীকার করেন নাই। সুতরাং ধরিয়া লইতে পারা যায়, যে বৈষ্ণব মতানুসারে শ্রীকৃষ্ণ ও রাধিকা যোগমায়ার প্রভাবে বৃন্দাবনে পরকীয়া প্রেমলীলায় রত হইয়াছিলেন।

বিপিন বাবু এক স্থানে বলিয়াছেন যে, কৃষ্ণ ও রাধা পুরুষ ও প্রকৃতি, তাঁহারা অভিন্ন। লীলার জন্য তাঁহারা বিভিন্ন mask (মুখোস) পরিয়া বৃন্দাবনে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এই maskকে কি মায়া বলিলে দোষ হয়?" Purusha and Prakriti are not two entities but really One Being * * * their difference or duality is the result of a mask that each puts on for purposes of Leela."

ভগবানের চতুর্ভুজ মূর্ত্তি বা নারায়ণ শিলা বিগ্রহের সম্বন্ধে লেখক যে ভাবে কথা কহিয়াছেন (৪১ পৃঃ ও ১২৪ পৃঃ) তাহা আমাদের চক্ষে সম্মানসূচক বলিয়া মনে হয় না। রাধাবল্লভের বংশীধারী দ্বিভুজ মূর্ত্তি লেখকের ইষ্টদেবতা বলিয়াই কি তিনি শ্রীকৃষ্ণের অন্য মূর্ত্তির সহিত তাহার তারতম্য করিবার অধিকার লাভ করিয়াছেন?

এইস্থানে আর এক বিষয় বিবেচ্য। কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং—প্রাচীন বাক্য। বিপিন বাবু আমাদিগকে বুঝাইয়া দিতেছেন যে গৌড়ীয় বৈষ্ণবের চক্ষে কৃষ্ণ অবতার নহেন, অবতারী, পূর্ণব্রহ্ম। কথাটা উপলব্ধি করা কঠিন। শ্রীকৃষ্ণ মানবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিলেন, নররূপ ধরিয়া মানব সমাজে নানা কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেন, ও অবশেষে মানবের অস্ত্রাঘাতে প্রাণত্যাগ করিলেন, তবু তিনি বিষ্ণুর অবতার নহেন? মথুরার অধিপতি, রুক্মিণী সত্যভামার স্বামী, পাণ্ডবসখা, পার্থসারথী, নারায়ণী সেনার অধিনায়ক, মহাবীর, মহাজ্ঞানী, মহাযোগী কৃষ্ণ ছিলেন অবতার, কিন্তু সেই কৃষ্ণই বাল্যে যে বৃন্দাবনলীলা করিয়াছিলেন তাহা পূর্ণব্রহ্মরূপে! সাধারণ হিন্দুর পক্ষে একথা মানিয়া লওয়া সহজ নহে। গোলোকে দিব্য-দ্বারকায় যে অনন্ত রাসলীলা চলিতেছে তাহার নায়ককে কি দেবকীনন্দন বলা যায়? তাঁহাকে নররূপীই বা কিরূপে বলিব! তিনি ত নিখিলরসামৃত মূর্ত্তি!

বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণকে শিশু না বলিয়া কিশোর বা যুবা যাহাই বলা হউক না কেন একথা সর্ব্ববাদিসম্মত যে দ্বাদশ বর্ষ বয়সের পূর্ব্বেই তিনি মথুরায় চলিয়া গিয়াছিলেন, আর ব্রজে ফেরেন নাই। সুতরাং রাসলীলাকে পর্য্যন্ত বাল গোপালের লীলা বলিলে কেহ কি ন্যায়তঃ আপত্তি করিতে পারেন?

এমন বৈষ্ণবও আছেন যাঁহারা মথুরার কৃষ্ণ এবং ব্রজের কৃষ্ণ এ দুইএর অত্যন্ত পার্থক্য প্রদর্শন জন্য একটি আখ্যায়িকার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, বসুদেব যখন যমুনা পার হন, তখন তাঁহার হস্ত হইতে স্খলিত হইয়া কৃষ্ণ যমুনার জলে পড়িয়া যান। বসুদেব ব্যস্ত সমস্ত হইয়া যত্নসহকারে কৃষ্ণকে জল হইতে পুনরুদ্ধার করেন। এরূপ আখ্যায়িকা নিবদ্ধ করিবার উদ্দেশ্য এই যে, যিনি পূর্ণতম ভগবান তিনি দেবকীগর্ভে জন্মগ্রহণ করেন নাই। দেবকীসুত যমুনা-জলে নিপতিত হন এবং সেইখানেই থাকেন। বসুদেব যাঁহাকে জল হইতে তুলিয়া লন তিনি স্বয়ং পূর্ণতম

ভগবান। ব্রজে বিচিত্র লীলা করিবার জন্য নন্দগৃহে আগমন করিলেন। আবার, অক্রূর যখন কৃষ্ণকে মথুরায় লইয়া আইসেন, তখন যমুনার জলে স্নান করিবার কালে জলমধ্যে কৃষ্ণকে অবলোকন করেন। সেই সময়ে জলস্থ দেবকীনন্দন কৃষ্ণ রথে উত্থিত হন, ও রথস্থ পূর্ণতম ভগবান পুনরায় যমুনাগত হন। যিনি পূর্ণতম, তিনি নিমেষের জন্যও ব্রজভূমি পরিত্যাগ করেন নাই। বিপিন বাবু অবশ্য এরূপ অদ্ভুত আখ্যায়িকার উল্লেখ কিছু করেন নাই। তবে পাঠক বুঝিতেই পারিবেন যে, ক্ষত্রিয় কৃষ্ণ ও গোপকৃষ্ণ, এই দুইএর তারতম্য করিতে গিয়া মানুষ কতদূর হাস্যাস্পদ হইতে পারে। এমন কৃষ্ণভক্তও ত অনেকে আছেন, যাঁহারা জয়দেব-বর্ণিত আদিরস-ঘটিত কৃষ্ণলীলাকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে পারেন না। এবিষয়ে অনুসন্ধিৎসু পাঠককে পণ্ডিত গৌর গোবিন্দ উপাধ্যায় মহাশয়ের "শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার জীবন ও ধর্ম্ম" পুস্তকখানি পাঠ করিতে অনুরোধ করি। তিনি পরম কৃষ্ণভক্ত ছিলেন, কিন্তু দশমবর্ষীয় বালকের শৃঙ্গার লীলায় আস্থাবান্ ছিলেন না।

পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে শ্রীগৌরাঙ্গ শাস্ত্রোক্ত অধিকার-ভেদের লোপ সাধন করিয়া মানব মাত্রকে নাম কীর্ত্তনের অধিকারী করিয়াছিলেন। পাল মহাশয় এই কথা খুব বড় গলায় বলিয়াছেন বটে! কিন্তু তাঁহাকেও স্বীকার করিতে হইয়াছে যে পূর্ব্বেও যেমন হিন্দুর ও বৌদ্ধের দীক্ষাগুরু ছিল, গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে গোস্বামীরাও সেইরূপ দীক্ষাগুরু হইয়া রহিলেন। গুরু সম্বন্ধে নরোত্তম ঠাকুর বলিয়া গিয়াছেন,

গুরুকে মানুষ জ্ঞান করে যেই জন।
দারুণ নরকে তার হয় নিপাতন ॥

কীর্ত্তন দুই প্রকারের, নাম কীর্ত্তন ও রসকীর্ত্তন। নাম কীর্ত্তনে সকলেরই অধিকার আছে। কিন্তু বিপিন বাবু বিশদভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন, কেন রসকীর্ত্তনে অধিকার সর্ব্বসাধারণের নাই। মনকে বিশুদ্ধ ও নির্ম্মল করিয়া না লইলে, রসকীর্ত্তনের দ্বারা শুধু যে কোনও লাভ হয় না তাহা নহে, বরং যথেষ্ট ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা। চিত্তশুদ্ধির দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া মধুর প্রেমরস কীর্ত্তনে উন্মত্ত হওয়ার কি ফল অতীত কালে ফলিয়াছে, তাহা আলোচ্য পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছে। "The realisation of the high Vaishnavic truths is exceedingly rare even among professed Vaishnavas, who either lose themselves in gross sensual enjoyments or seek their ideal in the abstraction and fancies of medieval theology and religion"। লেখক শ্রীগৌরাঙ্গভক্ত হইলেও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের নির্ম্মম critic (সমালোচক)। "The sensuous and erotic interpretation of it (Vaishnavism) is entirely due to the ignorance not only of outsiders but even of the Vaishnava crowd themselves."

পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে ভারতে সর্ব্বত্র যে বৈষ্ণব সাধকমণ্ডলীর আবির্ভাব হইয়াছিল, তাঁহারা সকলেই বর্ণাশ্রমের বিরোধী ছিলেন, সকলেই কথিত ভাষায় ধর্ম্ম-গ্রন্থ ও ভজনাদি লিখিয়াছিলেন, সকলেই পূজাপদ্ধতিকে যথাসম্ভব সরল ভক্তিমূলক ও সর্ব্বজনের অধিগম্য করিয়া দিয়াছিলেন। বঙ্গদেশের আবহাওয়া অনুকূল ছিল।

ভূমি পূর্ব্ব হইতেই কর্ষিত ও প্রস্তুত ছিল। সেইজন্য এদেশে চৈতন্যদেবের নবীন ধর্ম্মের প্রচার অতি সহজেই সাধিত হইয়াছিল। কিন্তু লাভ কি হইল? কি কারণে জানি না, পাঠান রাজপুরুষেরা গৌড়ীয় বৈষ্ণব গুরুদিগকে বিশেষ কোনও বাধা দিলেন না। তাঁহাদিগকে কোনরূপ অত্যাচার নিগ্রহও সহিতে হইল না। পঞ্জাবে নিগ্রহের ফলে নানকের ধর্ম্ম হইতে খালসার উত্থান হইল। রামদাস তুকারামের ভক্তমণ্ডলীও মহারাষ্ট্রে জাতীয় সাম্রাজ্য স্থাপন করিলেন, আর বাঙ্গালী আমরা, বৈষ্ণব হইয়াও পরপদলেহী রহিলাম।

বিপিন বাবু দেখাইয়াছেন কেমন করিয়া ধীরে ধীরে প্রাচীন বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম এই নবীন বিদ্রোহী সম্প্রদায়কে গ্রাস করিল। বৌদ্ধ ধর্ম্মকেও ত একদিন এইরূপেই গ্রাস করিয়াছিল। এই জন্যই ত হিন্দুর ধর্ম্মকে সনাতন ধর্ম্ম বলে। কে বলিতে পারে, হয়ত এই ভক্তিধর্ম্মও আর্য্যেরা রাবণ হিরণ্যকশিপুর নিকট শিক্ষা করিয়াছিলেন।

উনবিংশ শতকে ইংরাজের সংস্পর্শে আসিয়া বাঙ্গালী আবার মাথা তুলিল। যুগাবতার রামমোহন বাঙ্গালীর নিত্য জীবনের সহিত ধর্ম্মের যোগস্থাপনের প্রয়াসী হইলেন। বৈষ্ণব ধর্ম্মের জীবন্ত প্রেরণা তখন দেশ হইতে তিরোহিত হইয়াছে। তাই তাঁহাকে প্রেরণা সংগ্রহ করিতে হইল ইসলাম হইতে ও প্রাচীন উপনিষদ হইতে। ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপিত হইল। সেকালে লোকে ব্রাহ্মদিগকে ব্রহ্মজ্ঞানী বলিত। সত্যই রাজা রামমোহনের ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের একেশ্বরবাদ জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়াই ব্রাহ্মধর্ম্ম কোনদিন সমাজের নিম্নস্তরে প্রবেশ লাভ করে নাই। সেকালের প্রায় সকল ব্রাহ্মই ত উচ্চকুলজাত ছিলেন। প্রায় অর্দ্ধ-শতাব্দীকাল বর্ণাশ্রমের শৃঙ্খল যেমনকার তেমনই রহিল। সে বন্ধন ছিন্ন করিবার আবশ্যকতা পর্য্যন্ত কাহারও মনে আসিল না। পঞ্চদশ শতাব্দীর বৈষ্ণব ধর্ম্মের সহিত উনবিংশ শতাব্দীর ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রধান প্রভেদই এই। মহাপ্রভু স্বয়ং ব্রাহ্মণকুলে উদ্ভূত ও পণ্ডিতাগ্রগণ্য হইলেও তাঁহার মন্ত্র ছিল—চণ্ডালও হরিভক্তিপরায়ণ হইলে দ্বিজশ্রেষ্ঠ।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের সময় হইতে কিন্তু ব্রাহ্মসমাজে আর একটা পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইতে লাগিল। যেমন একদিকে জাতিভেদের বন্ধন ছিঁড়িল, তেমনই অন্যদিকে নানা রকমে মূর্ত্তিপূজার সহিত রফা আরম্ভ হইল। কি কি হইল, তাহার উল্লেখ করিয়া আমরা কাহারও মনে ব্যথা দিতে চাহি না। কিন্তু নির্ম্মল বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদ প্রচারের ক্রমশঃ সর্ব্বনাশ সাধিত হইল। শ্রদ্ধাস্পদ বিপিনবাবু গৌরাঙ্গের বৈষ্ণব ধর্ম্মের কথা যাহা বলিয়াছেন রামমোহনের ব্রাহ্মধর্ম্মেরও সেই দশা ঘটিল। অবতার প্রতীকাদি নানা অলঙ্কার ও রূপক ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ লাভ করিল। আলোচ্য পুস্তকে ব্রাহ্মধর্ম্মের ক্রমবিকাশ বর্ণিত হইয়াছে বলিয়াই আমরা এইসব কথার সংক্ষেপে উল্লেখ করিতে বাধ্য হইলাম। নহিলে এ ব্যাপারে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। সনাতন ধর্ম্মের ধারাই এইরূপ। এক হজরৎমহম্মদ ব্যতিরেকে অন্য কেহই একেশ্বরবাদকে নিষ্কলঙ্ক রাখিতে পারেন নাই।

বিংশ শতাব্দীতে সমাজে বৈষ্ণব ধর্ম্মের পুনরুজ্জীবন দেখিয়া বিপিনবাবু দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বড় আশান্বিত হইয়াছেন। কিন্তু এ বিষয়ে আমাদের যে আশঙ্কা আছে, তাহা এইখানে বলিব। শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমধর্ম্মের বিশেষত্ব এই ছিল যে উহা সমাজের নিম্নতম স্তরকেও আন্দোলিত করিয়াছিল। তাহাদের জীবনে একটা সজীব

মূর্ত্তিমন্ত ধর্ম্ম আনিয়া দিয়াছিল। কিন্তু এই বর্ত্তমান যুগে যেমন ব্রাহ্মধর্ম্ম, তেমনই বেদান্ত প্রচার, তেমনই বৈষ্ণব ধর্ম্ম, সবই বৈঠকখানা (Drawingroom)—বিহারী Parasite-দের জন্য। এ ছাড়া আর কিছু যে হইবে তাহাও আমরা আশা করি না। মুণ্ডিত মস্তক কণ্ঠিধারী জাত-বৈষ্ণবদের প্রতি বিপিনবাবুর গভীর অবজ্ঞা হইতেও এই কথাই প্রতীত হয়।

দ্বিতীয় কথা এই যে সনাতন ধর্ম্ম যুগে যুগে যে যে মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে, তাহা সেই সেই যুগের আবেষ্টনের উপযোগী। আজিকার বঙ্গে যে বৈষ্ণব সাধনার ধারা প্রবাহিত হইয়াছে তাহা মাধুর্য্যরসাশ্রিত। দাস্য, সখ্য বা বাৎসল্যের সহিত তাহার প্রায় কোনও সম্পর্ক নাই। সুদর্শনধারী মুরারির ত নামও কেহ করে না। ইহা হইতে বুঝিতে হইবে যে, পরকীয়া প্রেম বর্ত্তমান যুগের গৌড়বাসীর মনপ্রাণ জুড়িয়া বসিয়া রহিয়াছে। তাই সেই পরকীয়া প্রেমরসের মধ্য দিয়া ভগবৎসাধনার পন্থা কালোপযোগী বলিয়া এত ব্যাপকভাবে প্রচলিত হইতেছে। আমি যে আমাদের মানসিক অবস্থা সম্বন্ধে অতিরঞ্জিত কথা বলিতেছি না, তাহা বর্ত্তমান যুগের কাব্য কাদম্বরী পাঠেই হৃদয়ঙ্গম হইবে।

আমার তৃতীয় কথা এই যে, বর্ণাশ্রমে বিশ্বাস ও চৈতন্যদেব-নির্দ্দিষ্ট প্রেম-সাধনার পন্থা পরস্পর-বিরোধী। মনে এই দুই পদার্থের একত্র অবস্থান অভাবনীয়, ও আত্মপ্রবঞ্চনার পরিচায়ক। আত্মপ্রবঞ্চনা হইতে কি কোনও দিন কিছু মঙ্গল সাধিত হইয়াছে?

বিপিনবাবুর পুস্তক তথা বৈষ্ণব মতামত আমি অতীব সঙ্কোচের সহিত আলোচনা করিয়াছি। কোনরূপ অবিনয় প্রকাশ করা আমার একান্ত অনভিপ্রেত। ভক্ত মাত্রই আমার গভীর শ্রদ্ধার পাত্র, এই কথা মনে করিয়া পাঠক যেন আমার লেখা ক্ষমার চক্ষে দেখেন।

ভক্তি ও চিত্তশুদ্ধি সম্বন্ধে একজন বর্ত্তমান যুগের সাধক যাহা বলিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করিয়া আমার সমালোচনা শেষ করি।

"*Unpurified* emotionalism * * leads to want of balance, agitated and disharmonious expression or even contrary reactions and at its extreme nervous disorder."

শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত

অভিমান :—শ্রীমতী আশালতা দেবী, প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স।

অমিতার প্রেম :—শ্রীমতী আশালতা দেবী, প্রকাশক ডি এম লাইব্রেরী।

এই নবীন লেখিকা তাঁর মনস্বিতার জন্য স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে সার্টি-ফিকেট পেয়েছেন, সেটি অমিতার প্রেমের জ্যাকেটে ছাপিয়ে তার প্রতি সাহিত্যসেবীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে প্রকাশকরা ভালই করেছেন। কেননা দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের

দেশে লেখিকার সংখ্যা অন্যদেশের তুলনায় অতি নগণ্য, আমরা সেজন্য অনেক সময়েই তাঁদের প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ দিতে ভুলে যাই। শ্রীমতী আশালতা তাঁর পূর্ব্বপ্রকাশিত রচনায় ও নিবন্ধে যে মনস্বিতার পরিচয় দিয়েছেন তা সাধারণ শ্রেণীর নয়; বয়সে তিনি নবীন কিন্তু তাঁর অধীত বিদ্যা যেমন প্রচুর তাঁর বিচার ও সমালোচনার দৃষ্টিও তেমনি প্রখর। এটা কি আশা করা যায় না যে আমাদের সাহিত্যামোদীদের কাছে তাঁর লেখা উপেক্ষিত হবে না?

আনন্দের কথা লেখিকা গল্প ও উপন্যাস রচনাক্ষেত্রে প্রবেশ করেছেন। তাঁর স্বকীয় মনস্বিতা যে তাঁর গল্প উপন্যাসে নূতন আলোকপাত করবে এ কথা আশাকরা অন্যায় হবে না। সম্প্রতি রবীন্দ্রনাথও এ আশা প্রকাশ করেছেন যে স্ত্রীজীবনের যে সব সূক্ষ্ম ও গুপ্ত রহস্য সাধারণতঃ পুরুষের কাছে অজ্ঞাত অনাবৃত রয়েছে সে সব রহস্য এই লেখিকার কলমে দীপ্যমান হয়ে ওঠা উচিত। এ সব আশা তাঁর প্রথম বইকটিতে কতদূর কৃতার্থতা লাভ করেছে তা বিচার করবার সময় এখনও উপস্থিত নাও হতে পারে; কিন্তু সন্দেহ নেই যে এই বই দুটিতে লেখিকার স্বকীয় ক্ষমতার আভাস পাওয়া যায়।

বইদুটির মধ্যে প্রধান লক্ষ্য করবার বিষয় ভাষা ও রচনাপদ্ধতিতে একটা পরিবর্ত্তনক্রম রয়েছে, কিন্তু অন্যত্র নেই;—গল্পগুলি ও উপন্যাসের প্লট ভিন্ন হলেও মূলবৃত্তান্ত একই,—সে হল আজকালকার শিক্ষিতা তরুণীর ঈষদুন্মুখ ভালবাসায় হিল্লোলিত মান অভিমান। এ বৃত্তান্তটি,—বিশেষ করে লেখিকা যে পদ্ধতিতে এগুলিকে রূপ দিয়েছেন তা আজকালকার সাহিত্যের দরবারে বহুবার রোমন্থিত হয়েছে। এটা লেখিকার বৈশিষ্ট্য বিকাশের একটা অন্তরায়। প্রথম গল্প অভিমানের মূলঘটনাটি চোখের বালির আন্তাংশ থেকে পৃথক নয়:—কিরণ ধনীপুত্র সম্বন্ধ করে বিবাহ করতে নারাজ, কিন্তু মার বিশেষ অনুরোধে বন্ধুবর সতীশ তাকে জোর করে মার সইয়ের মেয়ে মায়াকে দেখবার জন্য শ্যামবাজারে নিয়ে গেল; মায়া সুন্দরী, কিন্তু কিরণ পরিহাসের সঙ্গে বিবাহ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল, মুগ্ধ সতীশ তখন স্বয়ং বালিকাকে উদ্ধার করতে রাজি হল, কিন্তু ইতিমধ্যে দেওঘরে কিরণের মায়ার সঙ্গে আলাপ পরিচয়ের সুযোগ হল; ফলে কিরণ সতীশকে জানিয়ে দিল সেই মায়াকে বিবাহ করবে। সেই দলিত খরমুজার বৈকালিক আছে, সেই কেওড়াজলে সুগন্ধিত পান সাজা আছে। সকলেই একবাক্যে বলবে যে এ একেবারে মহেন্দ্র—আশা—বিহারীর বিবাহপর্ব্ব; পৃথক এই আশা ছিল নিরীহ গোবেচারা, মায়া আধুনিক। তার হৃদয় আছে তাই সতীশের প্রতি তার বিতৃষ্ণা হল কেননা তাকে সতীশের কৃপাপ্রার্থীরূপে দাঁড়াতে হয়েছিল; আর কিরণের প্রতি তার হল বৈরাগ্য। মায়ার মনের এই হল দ্বন্দ্ব; বেচারা সেকালকার আশা তার ক্ষুদ্র হৃদয় ক্ষুদ্র বিচার নিয়ে লজ্জায় আপনাকে বিদগ্ধ ও বিলুপ্ত করে দিতে চেয়েছিল।

এই গল্পটির যদি সমালোচনা করতে হয় ত আমি বলব যে চোখের বালির নব সংস্করণ হোক ক্ষতি নেই;—পুরাতন প্লটের নূতন সংস্করণই ত সাহিত্যের খোরাক; কিন্তু এক্ষেত্রে আমার নিষ্প্রভ লেগেছে অভিমান গল্পটি কেননা মায়াকে লেখিকা "তীক্ষ্ণ অনুভূতিশীল" "সক্রিয় জীবন্ত চিত্তভূমি"ময় বলেছেন কিন্তু মায়া গল্পের এ নাট্যে কোন পার্টই অভিনয় করল না,—কিরণ যখন বিবাহ করতে চাইল না তখন বিবাহ হল না আবার যখন চাইলে তখন হল। মায়ার মনের দ্বন্দ্ব কোন কাজে লাগল না। এ দ্বন্দ্ব মায়ার মনে আছে কি নেই তাতে গল্পের লাভ ক্ষতিতে কোন অঙ্কপাত করল না।

এতাদৃশ ব্যাপার লেখিকার গল্পগুলিতে ও উপন্যাসে এতই সুপ্রকট যে আমার মনে হয়েছে যে এর ভেতর লেখিকার প্রখর মনন ক্রিয়া ও গল্প সৃজন ক্রিয়া পরস্পরকে অবলম্বন না করে আপন আপন বিভিন্ন স্রোতে প্রবাহিত হয়েছে, একদিকে চলেছে তাঁর সৃজিত কাহিনী ও আর একদিকে চলেছে তাঁর মনন ক্রিয়া যা যখন তখন জবরদস্তি করে বলতে চেয়েছে এখানটা এই রকম হোক,—এ চরিত্রে এইটুকু বৈপরীত্য আসুক। আমার মতে গল্প উপন্যাস স্বয়ং রচয়িতারও এ রকম খাম-খেয়ালীর হুকুম মেনে নিতে বাধ্য নয়। গল্প উপন্যাসের চরিত্রাবলী আপনাতে আপনি সিদ্ধ এক একটি জগৎ সৃজিত করে, তখন যে মনন ক্রিয়া এ জগতের বহিরস্থ তার কোন অধিকার থাকে না সে জগতের অধিবাসীদের ও তাদের কার্য্যকলাপকে নিয়ন্ত্রিত করবার। প্রত্যেক সুকুমার শিল্পের প্রধান সার্থকতা তার প্রত্যাশা সৃষ্টিতে ও তা পূরণে; যে প্রত্যাশা সৃজন করা হয়নি তা পূরণ করতে গেলে যেমন রসভঙ্গ হয় যে প্রত্যাশা সৃষ্টি করা হয়েছে তাকে ব্যর্থ করলেও তেমনি রসভঙ্গ হয়। প্রত্যাশাপূরণ অবশ্য সূক্ষ্ম কারিগরীর ব্যাপার, ইঙ্গিতে এমন কি কথঞ্চিৎ অসম্পূর্ণ রেখেই তার শ্রেষ্ঠ পূরণ হয় কিন্তু তা বলে নিষ্ফল প্রত্যাশা সৃষ্টির জায়গা artএ নেই। সাহিত্যের খেলা বাজি রেখে খেলা; এ খেলায় বাজির ফেরৎ বা বদল চলে না।

বলাবাহুল্য আজকের দিনে সাহিত্যের প্রত্যেক ক্ষেত্রেই মনন ক্রিয়ার বিকাশ সুপ্রতিষ্ঠিত কিন্তু একটা বিপদের কথা আছে। অসতর্ক মননক্রিয়া এক এক সময়ে অযথা সমস্যাবিলাসে ব্যাপৃত হয়ে পড়ে। এ রকম ব্যাপার আমাকে মনে করিয়ে দেয় Cambridge Triposএর অঙ্ক সৃষ্টির কথা। এই জগদ্বিখ্যাত অঙ্কগুলি ধারাল মস্তিষ্কের উর্ব্বরতা সম্ভূত ও গণিতের exercise রূপে নিত্যই নূতন নূতন তৈরী হচ্ছে। জাগতিক ব্যাপার গণিতের এ সব exerciseএ ধরা পড়ে বলে এরা একদিক থেকে সার্থক হয় কিন্তু জীবনের গুপ্ত রহস্য যা সাহিত্যের বিষয়ীভূত তা কি মননক্রিয়ার আজগুবি exerciseএ ধরা পড়বে? আমি আসল মাধ্যাকর্ষণের পরিবর্ত্তে একটা জটিল মাধ্যাকর্ষণ ধার্য্য করে কল্পিত জগতের একটা গাণিতিক সমাধান রচনা করতে পারি কিন্তু আমার গল্পের চরিত্রে কি অসংলগ্ন প্রবৃত্তির সমাবেশ করে গল্পের সমাধান করতে পারি? প্রবল মননশক্তি কি গল্প সাহিত্যে Tripos problem সৃজন করতে ব্যাপৃত হবে? প্রকৃত মনস্বিতার পথ অন্য, সে মনস্বিতা পাত্রপাত্রীর মনোবিশ্লেষণ ও মানসিক বিবর্ত্তনের স্বরূপ প্রকাশে নিযুক্ত। বোধ হয় রবীন্দ্রনাথের গোরা, শেষের গল্প ক'টি ও চতুরঙ্গ এ পথে অগ্রণী। আধুনিক তরুণ লেখকদের মধ্যে ধূর্জ্জটিপ্রসাদ, বুদ্ধদেব, দিলীপকুমার এ পদ্ধতিতে সিদ্ধহস্ত; শ্রীমতী আশালতাও তাঁর গল্পগুলিতে ও অমিতার প্রেমে এই পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। তিনি যে অনেকটা সফল হয়েছেন তাতে সন্দেহ নেই কিন্তু তাঁর একটু দুর্ব্বলতাও রয়েছে যেখানে তিনি এতদতিরিক্ত জটিল অনাবশ্যকীয় মানসিক সমস্যা নিয়ে খেলা করেছেন যা তাঁর নিজেরই সৃজিত গল্প জগতের বাইরের জিনিষ, যা মিথ্যাচার।

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল গল্পের পুষ্পলতার ভণ্ডামী এই রকম একটা মিথ্যাচার, কেননা পুষ্পলতাকে লেখিকা ভণ্ডের ভূমিকা দান করেননি। অন্তর্দ্ধান, স্পেশালি-জেসন ও পরাজয় গল্প পাঠ করেও মনে কেবল ক্ষোভ হয় এসব মিথ্যা মিথ্যা।

সে যাই হোক এ কথা না বলে পারিনে যে লেখিকার গল্পগুলি পড়ে অনেকবার

চমৎকৃত হয়েছি। স্বাধীনতা ও সম্মান গল্পটি আমার বিশেষ করে মনে পড়ছে। যদি না এতে মিঃ বসুর মুখ দিয়ে চারুশশীর বিষয়ে অযথা রূঢ় মন্তব্য বলান হত ত একে নিখুঁৎ বলতে দ্বিধা করতাম না। এটুকু ছেড়ে দিলে গল্পটি ভাষায়, অনিবার্য্যতায়, অনতিরিক্ততায় ও সমাপ্তিতে জল জল করছে। শেষের স্বপ্নটি সার্থক, উপভোগ্য। নিরুপম গল্পটিও পাঠকের প্রশংসা লাভ করবে আশা করি।

আরও কয়েকটি কথা আমি বলতে ইচ্ছা করি যদি তার জন্য আমার সাফাই তলব না হয়। লেখিকা গল্পের ছক পাতাতে, চরিত্র সংযোজনায়, ভাষায় ও অন্যান্য বিষয়ে যথেষ্ট দক্ষতা দেখালেও কথোপকথন গঠনে অকৃতকার্য্য হয়েছেন। তাঁর পাত্র পাত্রী ও চরিত্রগুলির কথোপকথন খামকা রুচিবিগর্হিত রূঢ়তায় অসামঞ্জস্যে ও কৃত্রিমতায় পরিপূর্ণ। আর একটা মহৎ দোষ চরিত্রগুলির আচরণ স্থানে অস্থানে সঙের মত; এতে নিজেরই সৃষ্ট চরিত্রে নিজেই ব্যঙ্গ লেপন করা হয়। তা ছাড়া চরিত্রগুলি প্রায়ই classified—অন্ততঃ নায়ক নায়িকা ও এদের অভিভাবকেরা। অভিভাবকের দল ignorant old fools, নায়করা সকল বিষয়েই পর্য্যাপ্ত—লেখাপড়ায়, টাকাকড়িতে, সঙ্গীতে, মোটর চালানতে, অথচ মনে ও ব্যবহারে শিশু ও নারীসুলভ অযোগ্যতায় ও ন্যাকামতে অবাক করে দেয়। সন্দেহ হয় লেখিকা বাংলার যুবকবৃন্দকে চেনেন না, তাদের ঠিক পরিচয় পান নি। নায়িকা চরিত্র অঙ্কনে তিনি কৃতকার্য্য বলতেই হবে কিন্তু type এক—শরৎচন্দ্রের তুল্য কতকটা অর্থাৎ সকল নায়িকাই নায়ককে বশ করে সেই একই উপায়ে—সেবা ও অভাবনীয় তেজস্বিতা দিয়ে।

লেখিকার অমিতার প্রেম গল্পগুলির চেয়ে ঢের পরিণত মনে হয়। এর নায়িকার নিগূঢ় বেদনা ও অভিমানের পালার চিত্রাঙ্কন খুব সতেজ হয়েছে। তবু তার গোড়ার দিকের আত্মশ্লাঘা ও পরে আপন প্রেমপাত্রের প্রতি রুষ্ট ব্যবহার কেমন খাপছাড়া রকমের মনে হয়। দুঃখের বিষয় এখানেও লেখিকার কথোপকথন বিশ্রী ও অস্বাভাবিক হয়েছে স্থানে স্থানে। কথোপকথন গল্প উপন্যাসের একান্ত অবলম্বন, এ সম্বন্ধে লেখিকার অনভিজ্ঞতা বা অন্তর্দৃষ্টির অভাব অমার্জ্জনীয় হবে। রাস্তার নাম সম্বন্ধে ও কয়েকটি তুচ্ছ বাক্য বিন্যাসে এমন কয়েকটি ভুল রয়ে গেছে যা থাকা উচিত ছিল না।

লেখিকার ভাষা ও style রমণীয় ও সজীব। কিন্তু দুয়েই অপরের প্রভাব অত্যন্ত প্রকট,—প্রথমে রবীন্দ্রনাথের, পরে বুদ্ধদেবের, এমন কি আরও দু'একজনের প্রভাব রয়েছে। এ সত্ত্বেও ভাষা খুব সজীব—আগেই বলেছি। এমন কি এই প্রভাবান্বিত ভাষা ও style পড়েও অকৃত্রিম আনন্দবোধ হয়। কিন্তু নিজের বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলতে হলে লেখিকাকে সকল প্রভাব ছিন্ন করে চলে আসতে হবে, আপন স্বকীয় ভাষা ও style দাঁড় করাতে হবে।

যদিও এই সব ত্রুটি বিচ্যুতি নিয়েই আমি একটু বেশী করে আলোচনা করেছি, কিন্তু তা বলে এগুলিকেই প্রধান করে লেখিকার এই প্রথম প্রয়াসের ফলকে বিচার করতে গেলে তাঁর প্রতি অবিচার করা হবে। দেখতে হবে তাঁর দক্ষতা ও promise যা আছে তা সাধারণের অনধিগম্য কিনা।

শ্রীগিরিজাপতি ভট্টাচার্য্য

English Journey by J. B. Priestly. (Gollancz).

আলোচ্য বইখানি বর্ত্তমান ইংরাজ সমাজের একখানি আবেগময় পর্য্যবেক্ষণ-চিত্র। অল্‌ডাস হাক্সলীর উদাহরণ হতে বলা যায় যে উপন্যাস-রচয়িতাদের স্বভাবগত দোষ হচ্ছে যে তাঁরা তাঁদের সমকালীন সামাজিক বা রাজনৈতিক বর্ণনায় প্রবৃত্ত হ'লে অতিমাত্রায় মুখর হয়ে পড়েন। লিপিসংযমে অনভ্যস্ততাহেতু যথেচ্ছবিহারমান চিন্তাধারা মূল আখ্যানবস্তুটিকে ঘনপল্লবিত বৃক্ষশাখার মত অদৃশ্য করে তোলে। অবশ্য হাক্সলীর চিন্তারত্নাবলীর কোষাগার এমনই চমকপ্রদ ও বিচিত্র ঐশ্বর্য্যসম্ভারে পরিপূর্ণ যে প্রকাশকমণ্ডলীতে তাঁর শিল্পসৃষ্টির চাহিদা পাঠকের মনোরঞ্জন-সাপেক্ষ বলে বিবেচিত হয় না। এমন কি আজও তাঁর স্বাক্ষরিত গ্রন্থ চতুর্গুণ মূল্যে বিক্রয় হচ্ছে। কিন্তু প্রিষ্টলীর কথা স্বতন্ত্র। তাঁর সৃজন-প্রতিভা হাক্সলী বা শ'এর আভিজাত্যভুক্ত না হলেও ইংলণ্ডের যথার্থ স্বরূপ বর্ণনায় তিনি স্বভাবতঃই অপারগ, কারণ ঐতিহাসিক চিত্র অঙ্কনে যে নিরালম্ব আবেগশূন্য রেখাপাতের প্রয়োজন হয় উপন্যাস লেখক বা নাট্যকারের দ্বারা তা সম্ভব হয় না। সূক্ষ্ম ছিদ্রান্বেষণের মত সংসার-ক্ষেত্র হতে জটিল সমস্যার অনুসন্ধিৎসা যাদের পেশা বিশেষণ-দৌর্ব্বল্য তাঁদের অশোধনীয় সংস্কার হয়ে পড়ে।

সুখের বিষয় প্রিষ্টলী তাঁর বইখানি জাতীয় গৌরবের রঙে অতিরঞ্জিত না করে স্বদেশের অগৌরবের কথা দিয়ে ভরিয়েছেন। ইংলণ্ডের অগৌরবে উল্লসিত হবার কোন কারণ নেই। সুখের বিষয় বলেছি, তার কারণ আছে, আত্মম্ভরিতার আতিশয্যে যে সাহিত্য ইতিপূর্ব্বেই স্ফীত সে ক্ষেত্রে প্রিষ্টলীর ন্যায় বিশ্বপ্রিয় শিল্পীর প্রবেশ নিতান্ত ক্ষোভণীয় হত।

শেক্সপিয়ার যে দেশের কবি; ভূমণ্ডলের অধিকাংশ যে জাতির করায়ত্ত; শিক্ষার মুক্তি ও চিত্তের স্বাধীনতা যে সভ্যতার অঙ্গ; গৌরবের সেই উচ্চশীর্ষ হতে আত্মশ্লাঘার পরিচয় যদি পাই তাতে অধীর হওয়া উচিত নয়। কিন্তু যে রচনা বিশ্ব-মানবের সহিত সম্বন্ধশূন্য ও একদেশদর্শিতায় পূর্ণ তা সাহিত্য নয়—সাহিত্য না হলে জগতের হাটে তার প্রবেশ হঠকারিতা।

যে মহামানবীয় সত্তাটুকু প্রগতিশীল জাতিমাত্রেরই অন্তস্তলে প্রচ্ছন্ন থাকে, আপন দেশবাসীর মধ্যে সেই সংজ্ঞা নির্ণয় ক'রবার মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে প্রিষ্টলী ভ্রমণে বাহির হন। ইংলণ্ডের মত বহুলাঙ্গ ও বিচিত্র দেশে বিভিন্ন প্রদেশ ও সামাজিক স্তরের মধ্য হতে মানুষের কোন নিবিড় সত্তা পরম ভাবে উপলব্ধি করবার বাসনা বাতুলতা—বিশেষ করে মাত্র কয়েকমাসের অভিজ্ঞতায়—এবং বলা বাহুল্য লেখক সে প্রচেষ্টায় কৃতকার্য্য হন নি। কিন্তু তাঁর শুভ ইচ্ছা যে একেবারে নিষ্ফল হয়নি তার প্রমাণ আলোচ্য বইখানির প্রতি পৃষ্ঠায় পাওয়া যায়।

যন্ত্রযুগের প্রবর্ত্তনার পর হতে ইংরাজ জাতি উন্নত ও সমৃদ্ধ হয়ে এসেছে ক্ষিপ্র ও ব্যাপক ভাবে, কিন্তু সে প্রগতির অন্তরালে প্রতিক্রিয়া-প্রবণ মানুষ কিরূপ বিচিত্রভাবে পরিবর্ত্তিত হয়েছে তার হিসাব নিকাশ এতাবৎ কাল হয়নি। বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে উৎপাদিত ধনের অবণ্টন নিয়ে সংঘর্ষ সভ্যতার প্রথম যুগ হতেই বিদ্যমান। ব্যবধানের পরিধি ক্রমেই বিস্তৃত হয়েছে, বিরোধ ক্রমেই প্রকট হয়েছে, অবশেষে পরস্পরের মধ্যে

আত্মীয়তার যোগসূত্র কবে ছিন্ন হয়েছে কেউ লক্ষ্য করে নি। এখন দেশব্যাপী অর্থনৈতিক দুরবস্থাতে আনুষঙ্গিক উপসর্গগুলি যতই স্পষ্ট হচ্ছে ইংরাজ সুধিসমাজ স্বজাতীয় অন্তর্গূঢ় একতা সম্বন্ধে ক্রমে সন্দিহান হয়ে উঠছে—দেশহিতৈষী মনীষিগণ শ্রেণী হতে দৃষ্টি উত্তোলন করে সাধারণ মানুষের উপর নিক্ষেপ করছেন। প্রিষ্টলীর রচনার প্রধান সম্পদ হচ্ছে ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত সাধারণ দেশবাসীর জীবনচিত্র। পূর্ব্বেই বলেছি সে চিত্র সর্ব্বাঙ্গীণ হয়নি। লেখক শ্রমিক শ্রেণীর প্রতি অযথা ঝুঁকেছেন। তবে তাঁর বক্তব্যের মধ্যে কতকগুলি বৈশিষ্ট্যময় ইঙ্গিত আছে যা প্রণিধানযোগ্য। ইংরাজ শ্রমিকের অর্থ অনটনের কাহিনী দুঃস্থ ভারতবাসীর চিত্তে করুণার উদ্রেক করবে না—আমি উল্লেখ করছি কারণ তাদের জঠরাগ্নির প্রকোপ সমস্যা নয়—সমস্যা, তাহাদের আধ্যাত্মিক নিঃস্বতা ও আত্মসংবিতের অভাব।

কলকারখানার ইংরাজ-ধনকুবের অধিকারিগণ, বিশেষ করে বৃষ্টলের উইলস্ পরিবার ও বোর্ণভিলের ক্যাডবেরী কোম্পানী, তাঁদের আশ্রিত শ্রমিকগণের স্বচ্ছন্দতার জন্য যে সকল উদার বন্দোবস্ত করেছেন তা দেখলে ঈর্ষার উদ্রেক হয়—কিন্তু পর মুহূর্ত্তে মনে প্রশ্ন জাগে—পরাশ্রয় অঙ্গীকার ক'রে এক প্রকার হীন পরিতৃপ্তিতে আচ্ছন্ন থাকা অমঙ্গলের লক্ষণ নয় কি? প্রিষ্টলী বলেছেন এই উদারতার অত্যন্ত দূষণীয় প্রভাব লক্ষিত হয় শ্রমিকের অবসর-সময়ে। তিনি ছোট ছোট উদাহরণ দিয়ে দেখিয়েছেন স্বতঃপ্রণোদিত আনন্দ পরপ্রণোদিত প্রণালীতে নিরুদ্ধ হলে তার পরিণাম হয় শোচনীয়।

প্রিষ্টলীর লিপিদক্ষতা অসাধারণ। মানবচরিত্রের পেশাদারি বিবৃতিকার বলেই বোধ করি পাঠকচিত্তের সঙ্গেও তিনি নিবিড়ভাবে পরিচিত—তাই স্মৃতিগুলি চিত্রার্পিত করেছেন মধুর করে; ভাবগর্ভ কথার প্রয়োগ করেছেন ইতঃস্তত বিক্ষিপ্তভাবে; চিন্তাশীলতার প্রাখর্য্য বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে রামধনুর মত সুদৃশ্য হয়েছে। তবু বইখানি আদ্যন্ত পাঠ করবার পর মন প্রীত হতে চায় না—লেখকের তীব্র অরুচি ও যুক্তির অসামঞ্জস্য বোধ হয় রসোৎকর্ষের অন্তরায় হয়েছে। কয়েকটি উদাহরণ তুলে দিলাম। (১) রেল কলোনী ও কারখানা-প্রধান সহরের বৈচিত্র্যবিহীন শিল্প-স্থাপনা তাঁর সৌন্দর্য্য-জ্ঞানকে পীড়া দিয়েছে, অথচ রাজপথের উভয় পার্শ্বের দীপালোক-শোভিত বিচিত্র বিপণিশ্রেণী তাঁর চক্ষুঃশূল হয়েছে। অধীর হয়ে বলেছেন যে সেগুলি ধূলিসাৎ করে সেইস্থানে এক একটি অতিকায় গুদামঘর খাড়া করে দিতে পারলে তবে তিনি শান্তি পান। (২) ট্রামগাড়ীকে ঘৃণাচ্ছলে বলেছেন লঘুগামী কীটবিশেষ, অথচ অন্য কোন প্রসঙ্গক্রমে তিনি খেদোক্তি করেছেন যে বর্ত্তমান কালের দ্রুতগামী যানবাহন মানুষের বিহারের সময়কে এত সংক্ষিপ্ত করে তুলেছে যে পথিপার্শ্বস্থ দৃশ্যাবলী হতে কোন অভিজ্ঞতা বা আনন্দ সংগ্রহ করে ওঠবার অবসর পাওয়া যায় না। (৩) স্বদেশী বণিকের বিপণিতে বিদেশী পণ্যদ্রব্য দেখে তাঁর দেশপ্রীতি উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে বিপুলভাবে। অথচ অন্যত্র বারবার আক্ষেপ করেছেন যে বিদেশীদের ক্রমিক নিষ্ক্রমণে উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত ও নাটকের সাধনাস্পৃহা দেশ হতে উঠে যাচ্ছে।

ল্যাঙ্কাশায়ারের তুলার কলের দুরবস্থায় পীড়িত হয়ে উচ্ছৃঙ্খল ভাষায় বিলাপ করেছেন—A rum little chap called Gandhi, who provided the most

promising raw material for music hall jokes, was going about there, spouting and spinning a fatuous little wheel···firms went out of business, mills were idle, then empty and folk by the street and by the town were thrown out of work.

লিভারপুলের আইরিশ কুলীদের অপরিচ্ছন্নতায় অধীর হয়ে রূঢ় ভাষায় ইঙ্গিত করেছেন যে তাহাদের বহিষ্কৃত করে দেওয়াই মঙ্গল, অথচ শেষ পৃষ্ঠায় নাটকীয় ঢঙে দেশবাসীকে উত্তেজিত করেছেন—Let us be too proud, to refuse shelter to exited forigners, too proud to do dirty little tricks because other people can stoop to them, too proud to lose an inch of our freedom, too proud even if it beggars us to tolerate social injustice here, too proud to suffer anywhere in the country an ugly mean way of living.

তিনি ভুলে গিয়েছিলেন যে কয়েক পৃষ্ঠা পূর্ব্বেই দুঃখ করেছেন—I wonder if there is a country in Europe in which musicians, painters, authors, philosophers, scientists count for less than they do in in this country। যুক্তির অসামঞ্জস্যের উদাহরণ আরও দিতে পারতাম কিন্তু সমালোচনা দীর্ঘ হয়ে পড়বার ভয়ে নিবৃত্ত হলাম ।

প্রিষ্টলী তাঁর ভ্রমণ পঞ্জিকা হতে Oxford, Cambridge. York, Canterbury ইত্যাদি মনোরম স্থানগুলি ইচ্ছা করেই বাদ দিয়েছেন। টেনিসানের ইংলণ্ড—ডাফোডিল, বনপ্রান্তরের কান্ত শ্যামলিমা, নদ, নদী, Elm বৃক্ষ—নূতন কোন চারণ কবির অভাব বোধ করে না। কন্‌ষ্টেবলের রেখা ও বর্ণের পরিভাষা মাতৃভূমিকে সুরলোকের অঙ্কনে ভূষিত করেছে—কথাসাহিত্য মহত্তর অর্ঘ্য আর কি দেবে? প্রিষ্টলী সে চেষ্টা না করে ভালই করেছেন, তবু কয়েকটি ছন্নছাড়া মুহূর্ত্তের সুপ্রকাশ আমাকে তাঁর অনুরক্ত করে তুলেছে। অতিভাষের বেড়াজাল হতে গুণ স্বতঃস্ফূর্ত্ত হয়েছে যখন কোন বিরল মুহূর্ত্তে তিনি প্রাণের দ্বার উদ্‌ঘাটন করে প্রকৃতিকে নিবিড় ভাবে দেখেছেন। বনলক্ষ্মীর অনন্তরূপের সমীপস্পর্শে বিভোর হয়ে যখন উচ্ছ্বাস করেছেন—It lay there, half in gloom,half smiling,this forest I had never entered, like a piece of time that no clock of ours could tick away—তারপর শরতের স্বর্ণালোক রূপের নিবিড়তম অনুভূতিটি জাগিয়ে তুলেছে: we looked into the distant vale and saw, far away in the autumnal haze, the spire of Salisbury Cathedral like a pointed finger, faintly luminous······It was one of those autumn mornings when every bush glitters with dewy gossamer. One moved mysteriously through a world of wet gold. Nothing had boundaries or real continuity. Roads climbed and vanished into dripping space.

কিন্তু শেষ অবধি পাঠকের অবস্থা হয় ডক্টর জিকল্ এবং হাইডের নায়িকার মত; জিকল্ আশার বহতা বাড়িয়ে দিয়ে উধাও হয়ে যায়, হাইড নৈরাশ্যের বেদনা করে জড়।

দিনপঞ্জিকার মত অন্তরঙ্গ সাহিত্যের ভিতর দিয়ে সকল শ্রেণীর পাঠকের মনোরঞ্জন করা কঠিন কারণ হৃদয়াবেগের ভাসমান প্রতিবিম্ব কোন প্রথাসিদ্ধ প্রণালীতে প্রতিফলিত হয় না এবং পাঠকের রুচিও স্বতন্ত্র—কখনো বা সামান্য শারীরিক অসুস্থতা মানসিক বিকার উপস্থিত করে এবং তার প্রতিক্রিয়া দর্শায় উভয় ক্ষেত্রে। কিন্তু কোন মানসিক পীড়ায় আক্রান্ত হয়ে প্রিষ্টলী তার ভক্ত-ক্রিশ্চান দেশবাসীকে প্রাচ্যের অসভ্য ক্রাইষ্টকে বাতিল করে পাশ্চাত্যের কোন সভ্য দেবতার অনুসন্ধানে আমন্ত্রণ করেছেন, তা পরিষ্কার স্বচ্ছভাবে বোধগম্য হয়। তাঁর দেশবাসীর অনেকেই যে সেই রোগে আক্রান্ত আমরা ভারতবাসী তা মরমে মরমে অনুভব করি।

শ্রীশ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ

My Life as German and Jew.—By Jacob Wassermann. (George Allen & Unwin Ltd).

আমাদের দেশে আজকাল প্রদেশে প্রদেশে সদ্ভাব নাই; আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা ভারতবাসীর মিলন স্বপ্নে দেখেছিলেন, আমরা সে স্বপ্ন ভুলে গিয়ে প্রাদেশিক ঐক্যকেই বড় করে দেখতে আরম্ভ করেছি। জাতীয় মহাসভা প্রতিষ্ঠার এই প্রায় ৫০ বৎসর,—হিংসাদ্বেষের পরিমাণ কমে গিয়ে মহামিলনের সূত্রপাত হওয়া দূরে থাক, সনাতনী হরিজন সমস্যা, সাম্প্রদায়িক সমস্যা, প্রাদেশিক ভাগবাঁটোয়ারার সমস্যা—নিত্য নূতন নূতন সমস্যার সৃষ্টি হতে চলেছে। দেশ আর ধর্ম্ম, সুদূর অতীতের পূর্ব্বগামী স্বজাতিদের দেশ আর বর্ত্তমানে নিতান্তই নিজেদের দেশ, এই উভয়ে দ্বন্দ্ব লেগেছে, সমাধান করে কে? তবু এই হয়তো কলির সন্ধ্যা,—এখনও আমাদের দেশে সমস্যার উৎকটতম রূপ প্রকাশ পায়নি, সুদূর ভবিষ্যতে পাবে কি না জানি না। জার্ম্মানীতে কিন্তু এই সমস্যা ঠেকিয়ে রাখা যায়নি, নাৎসীদলের অভ্যুদয়ে য়ীহুদীরা আজ বিতাড়িত, বিধ্বস্ত, বহুপ্রকারে অত্যাচারিত। ১৮৭৩ খ্রীঃ ভাসারমানের জন্ম, তখন য়ীহুদীবিদ্বেষ এত স্থূলভাবে দেখা দেয়নি,—কিন্তু শৈশবে যৌবনে এবং বার্দ্ধক্যেও বহুবার তাঁকে বহুভাবে য়ীহুদী বলে জন্মগত পাপের জন্য জার্ম্মান বিরাগের ভাজন হতে হয়েছে। জীবনে যে প্রচণ্ড অকল্যাণ হতে দুঃখ পেয়েছেন, পঞ্চাশ বৎসর বয়সের পরপারে এসে বৃদ্ধ সেই অকল্যাণকে বিশ্লেষণ করে দেখতে চেয়েছেন, কিছুতেই এর কোনও হেতু খুঁজে পাননি; বিশেষ করে তিনি নিজকে শুধু য়ীহুদী বা শুধু জার্ম্মান বলে কোনও দিন পরিচয় দিতে পারেন নি, নিজের কাছে তিনি চিরদিন জার্ম্মান, এবং য়ীহুদী, দুই-ই। জার্ম্মানীবাসী য়ীহুদীকে জার্ম্মানীর জন্য রক্তপাত করতে হবে, শরীরপাত করতে হবে, কিন্তু সৈন্যবিভাগে সে শুধু হরিজন সম্প্রদায়ের লোক, নিতান্তই 'অস্পৃশ্য' হয়ে থাকবে। তার বুদ্ধি ও কর্ম্মপটুতা যথেষ্ট, এমন কি ছুটীর দিনেও সে প্রভুর কাজ করতে স্বেচ্ছায় আফিসে আসে, মনিবের কাজ যে তার নিজের কাজের মত; তার ফল হল এই যে মনিব তাকে য়ীহুদী বলে জানবামাত্র বিদায় করে দিলেন। অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব যার সঙ্গে হয়েছে সেও তাকে য়ীহুদী জানবামাত্র দূরে সরিয়ে দেয়। এর মধ্যে আবার যে বেশী উদার সে বলে,

'তুমি হচ্ছ ব্যতিক্রমমাত্র। য়ীহুদীদের ঘৃণা করি, কিন্তু তোমাকে ভালবাসি'। আত্মসম্মান-বিশিষ্ট স্বজাতিপ্রেমী ভদ্রলোকের নিকট এও অসহ্য। অনেকের ধারণা য়ীহুদীরা হচ্ছে ইউরোপের মহাজন, সুদখোর, টাকার গরম তাদের বেশী, বর্ত্তমান নাৎসী বিপ্লব তারই স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া। এই ব্যাখ্যাও 'বিচারসহ' নয়, কারণ য়ীহুদীদের মধ্যে ধনীর সংখ্যা কত অল্প, তারাই হয়তো জগতের ভাগ্যনিয়ন্তা, কিন্তু বাকী বিস্তর লোক—লক্ষ লক্ষ লোক—দীন দরিদ্র। কোনও প্রকারে মলিন মুখে সংসারধর্ম্ম করে এই দুঃখময় জীবনের কয়টা দিন কাটিয়ে দেয়। এদের দেখেও হিংসা !!! সব চেয়ে বড় কথা এই যে, এই য়ীহুদীবিদ্বেষ (ভাসারমান্ বলছেন) নিতান্তই কারণবর্জ্জিত, অথবা এর কারণ খুঁজে পেতে ধরা যায় না,—সুতরাং রহস্যজালে আবৃত; ভাসারমান্ সারা জীবন চেষ্টা করেও রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে পারেন নি।

এই জাতিবিদ্বেষের সমাধান কিসে হয়? বইখানি পড়্‌তে পড়্‌তে মনে হয়—ভারতের প্রাচীন সভ্যতা, যা কাউকে মেরে বা কাউকে ছোট করে বড় হতে চায় নি, যা সকলকে গ্রহণ করে, সকলকে বুকে স্থান দিয়ে বড় হয়েছে সেই সভ্যতাকে প্রচার করা ও সেই সভ্যতার মূলনীতি অনুসরণ করে চলাই যুগোপযোগী সমাধানের প্রশস্ত উপায়। A World in Distress নামক পুস্তিকায় রঙ্গনাথ মুদালিয়ার মহাশয় থিওজফিষ্টের দিক থেকে বলেছেন যে জগতের দুঃখকষ্ট দূর করবার একমাত্র উপায়—"সংসারে ভ্রাতৃভাব জাগিয়ে তোলা, মনে রাখা ও সেই মত জীবনে চলা।" অবশ্য এ হচ্ছে আদর্শবাদীর উত্তর এবং আদর্শবাদীর উত্তর সম্বন্ধে একথা বলা চলে যে এই মন্ত্র জীবনে সাধন করা যে কত কঠিন তা শুধু আদর্শবাদীই জানেন, কারণ তিনি যদি সত্যিই আদর্শবাদী হন তবে বাধার কাছে হার মানবেন না এগিয়েই চলবেন।

ভাসারমান সমাধান করতে পারেন নি, কিন্তু এই জাতিবিদ্বেষ তাঁর আত্মাকে ক্ষতবিক্ষত করে তুলেছিল। প্রেম দিয়ে তিনি অপ্রেমকে, ঘৃণাকে জয় করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু যুগ যুগ সঞ্চিত ক্রোধকে প্রশমিত করতে পারেন নি। তাই নিতান্ত হতাশার ভাবেই তিনি বলেছেন,— এবং এই বলার ধরণটাই হচ্ছে পুস্তকখানির মধ্যে সবচেয়ে সরল অংশ,—

With the realization of the hopelessness of effort the bitterness in one's breast becomes a mortal agony.

Vain to adjure the nation of poets and thinkers in the name of its poets and thinkers. Every prejudice that one believes to be disposed of breeds a thousand others, as carrion breeds maggots.

Vain to present the right cheek when the left has been smitten. This does not move them to thought; it neither touches nor disarms them : they strike the right cheek also.

Vain to interject words of reason into their crazy shrieking. They say : He dares to open his mouth? Gag him.

Vain to set an example in your life or behaviour. They

say : We know nothing, we have seen nothing, we have heard nothing.

Vain to seek obscurity. They say : The coward ! He is creeping into hiding, driven by his evil conscience !

Vain to go among them and offer them one's hand. They say : Why does he take such liberties with his Jewish obtrusiveness ?

Vain to keep faith with them, as a comrade-in-arms or a fellow-citizen. They say : He is Proteus, he can assume any shape or form.

Vain to help them to strip off the chain of slavery, They say : No doubt he found it profitable.

Vain to counteract the poison. They brew fresh venom.

Vain to live for them and die for them. They say : He is a Jew.

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন

Flush. A Biography—By Virginia Woolf. (The Hogarth Press.)

কথিত আছে যে দিগ্বিজয়ী কার্থেজীয় বাহিনী ভূমধ্যসাগর পার হইয়া ইতিহাস-বিশ্রুত স্পেন দেশে অবতীর্ণ হইবামাত্র অগণিত সৈনিক তারস্বরে সহসা 'স্প্যান' 'স্প্যান' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিল। এইরূপ আচরণ অদ্ভুত হইলেও অহেতুক নয়, কেননা দেখা গেল পরাক্রমশালী বীরবৃন্দের স্পেনরাজ্যে পদার্পণমাত্র দলে দলে শশক ক্ষুপগুল্ম হইতে নির্গত হইয়া উর্দ্ধশ্বাসে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতেছে। অসংখ্য শশকের সশঙ্ক সঞ্চারে স্পেনদেশ ছিল সজীব এবং শশক-শব্দের কার্থেজীয় প্রতিশব্দ 'স্প্যান'। তাই কার্থেজীয় সৈন্যরা এই নূতন দেশটির নামকরণ করিল 'হিস্‌প্যানিয়া' বা 'শশক-ভূমি'। পলায়নপর শশককুলের পশ্চাদগামী বহু দ্রুতগতি সারমেয়ও সৈন্যদলের দৃষ্টিগোচর হইতে বিলম্ব হয় নাই, এবং তৎক্ষণাৎ নামকরণ-তৎপর কার্থেজীয় সৈন্যরা 'স্প্যানিয়েল' নামে তাহাদের অভিহিত করিয়াছিল। বিশ্ববিশ্রুত 'স্প্যানিয়েল' নামক সারমেয় বংশের এই হইল আদি ইতিহাস।

দুঃখের বিষয়, ঐতিহাসিক-সম্প্রদায় বড়ই কলহোন্মুখ এবং পরস্পরের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ। তাই, প্রভূত আয়াস ও গভীর গবেষণালব্ধ স্প্যানিয়েল-বংশের এই রোমাঞ্চকর জন্মবৃত্তান্ত অনেকে ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলিতে চান—কিন্তু কি বলিতে চান তাহার উল্লেখ করিয়া লাভ নাই, কেননা

তাঁহারা সকলে এক কথা বলেন না। কিন্তু ঐতিহাসিকরা যাহাই বলুন বা না বলুন, শ্রীমতী ভার্জ্জিনিয়া উল্‌ফ প্রসিদ্ধ স্প্যানিয়েল বংশের একটি বিশিষ্ট প্রতিনিধিসম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা আমরা কিছুতেই অবহেলা করিতে পারি না। কেননা, এই বিশিষ্ট প্রতিনিধি যে নিজে একজন কৃতী সারমেয় ছিল শুধু তাহা নয়, দুটি প্রখ্যাত মানব-সন্তানের সহিত তাহার জীবন অত্যন্ত ঘনিষ্ঠসূত্রে জড়িত হইয়াছিল। এই মানবসন্তানদ্বয় আর কেহ নয়—'ফ্লাশ'-এর কর্ত্রী বিখ্যাত ইংরাজ-মহিলা-কবি এলিজ্যাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিং ও তাঁহার সমধিক খ্যাত স্বামী কবি রবার্ট ব্রাউনিং। শৈশবাবস্থা হইতেই ফ্লাশ-এর সহিত এলিজাবেথ ব্যারেট-এর (তখনও তিনি ব্রাউনিং-জায়া হন নাই) যোগসূত্র স্থাপিত হয় এবং এই সূত্র নানা সুখ দুঃখের মধ্য দিয়া ফ্লাশ-এর মৃত্যুদিন পর্য্যন্ত অবিচ্ছিন্ন ছিল।

ফ্লাশ জন্মগ্রহণ করিয়াছিল আর একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারের গৃহে। তাঁহাদের নাম মিটফোর্ড। ঐ নামের এক বিখ্যাত অভিজাত-বংশ হইতে উদ্ভূত বলিয়া ইঁহারা গর্ব্ব করিতেন। সে যাহাই হউক, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে রিডিং নামক স্থানে ডাক্তার মিটফোর্ড নামে যে-ব্যক্তি বাস করিতেন তাঁহার আচরণে বা অকৃতিতে আভিজাত্যের কোন লক্ষণই ছিল না। স্প্যানিয়েল কুকুরদের জাতি-নিরূপণ ও বংশ-রক্ষার জন্য 'স্প্যানিয়েল ক্লাব' বলিয়া যে প্রভাবশালী প্রতিষ্ঠান আছে, মানবদের মধ্যে যদি সেই জাতীয় প্রতিষ্ঠান থাকিত তাহা হইলে ডাক্তার মিটফোর্ড-এর আভিজাত্যের গর্ব্ব অচিরে চূর্ণ হইত, তাঁহার লাঞ্ছনার আর সীমা থাকিত না। সৌভাগ্যক্রমে ডাক্তার মিটফোর্ড মানবসন্তান হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাই বিনা বাধায় তিনি এক অভিজাত বংশের নারীর পাণিগ্রহণ করেন, বহু অভিজাত গ্রে-হাউণ্ড ও স্প্যানিয়েল কুকুর পালন করেন এবং অশীতিবৎসর বয়সে একটি কন্যা ও লুপ্তপ্রায় সম্পত্তি রাখিয়া পরলোকে গমন করেন। এই কন্যা, মিস মিটফোর্ড, ফ্লাশের প্রথম কর্ত্রী।

সুতরাং ফ্লাশ যে পরিবারের গৃহে জন্মগ্রহণ করে তাহা অভিজাত হইলেও দরিদ্র। তাই যে বিলাসের আবেষ্টনের মধ্যে ধনী গৃহের সারমেয়-শিশুরা প্রতিপালিত হয় ফ্লাশের শৈশবে তাহা কিছুই জোটে নাই। তবু ফ্লাশ-এর জীবনে কোনো অভাব ছিল না। মাঠে মাঠে বনে বনে আনন্দে তাহার দিন কাটিত। পায়ের তলায় কখনো কঠিন কখনো কোমল মাটির স্পর্শে তাহার শক্তি সঞ্জীবিত হইত, দীর্ঘ তৃণরাজীর মধ্য দিয়া চলিতে চলিতে বর্ণচ্ছটায় উদ্ভাসিত অসংখ্য শিশিরকণার অজস্র বিকীরণে তাহার ক্লান্ত দেহ স্নিগ্ধ হইত, পত্রপুষ্পশস্যের বিচিত্র সৌরভে তাহার প্রাণ অধীর পুলকে ব্যাগ্র হইত। মাঝে মাঝে অকস্মাৎ শৃগালের বা শশকের দূরবাহিত ঘ্রাণ নাকে আসিত, অতীতের শতাব্দীসঞ্চিত স্মৃতির ভাণ্ডার একমুহূর্ত্তে উন্মুক্ত হইত, ফ্লাশ-এর কানে তখন "স্প্যান স্প্যান" ধ্বনি তীব্র কশাঘাত করিতেছে—পাগল হইয়া সে ছোটে। তাহার পর একদিন অতীতের সকল স্মৃতি, বর্ত্তমানের সমস্ত আবেগ কোথায় ভাসিয়া গেল, এক প্রচণ্ড শক্তির তাড়নায় ফ্লাশ-এর চোখে মাঠ বন গাছ ফুল মনে হইল সব একাকার, প্রেমের দীপ্তিতে তাহার দুই চক্ষু স্ফুরিত হইল, ফ্লাশ-এর কানে শুধু বাজিল কন্দর্পের তীব্র আহ্বান। সময়ে অসময়ে মানবসন্তানের কানেও এই আহ্বান ধ্বনিত হয়, শিক্ষা ও দীক্ষার নির্দ্দেশ অনুযায়ী মানবসন্তান তাহাতে সাড়া দেয়, যাহারা এই আহ্বান শুনিয়া শিক্ষাদীক্ষা জলাঞ্জলি দেয় তাহারা অমানুষ বলিয়া গণ্য হয়।

সরলমতি কুকুর সহজ সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া চলে, শিক্ষাদীক্ষার ধার ধারে না। তাই শাবকাবস্থা ঘুচিবার পূর্ব্বেই ফ্লাশ পিতৃত্বের গৌরবে ভূষিত হইল।

এ হইল ১৮৪২ সালের কথা। তখন হালচাল ছিল সাবেকী, সমাজের শাসন ছিল কঠিন, এখনকার মত প্রেমের মর্য্যাদা তখন লোকে বুঝিতনা। ফ্লাশ যদি মানবসমাজে জন্মগ্রহণ করিত এবং পুরুষ হইত তাহা হইলে তাহার এই অকালপিতৃত্বের সমর্থনের জন্য তাহার চরিতকারকে বহু কূটযুক্তির অবতারণা করিতে হইত, নারী হইলে, সর্ব্বনাশ!—ঐরূপ ব্যাপারের পর বোধ হয় কেহ তাহার জীবনী লিখিতে সাহসই করিত না। সৌভাগ্যক্রমে ফ্লাশ ছিল কুকুর। যে-আদর্শ দিয়া মানুষের চরিত্র-বিচার করা হয় কুকুরের চরিত্রের বিচার তাহা দিয়া করা হয় না। তাই তৎকালীন জ্ঞানী গুণী সম্ভ্রান্ত সচ্চরিত্র এবং অত্যন্ত সুনীতিপরায়ণ নরনারী কেহই ফ্লাশের সঙ্গ পরিত্যাগ করেন নাই। এমন কি অনেকে নগদ মূল্য দিয়া তাহাকে কিনিতে চাহিয়াছিলেন। ফ্লাশের কর্ত্রী দারিদ্র্যের প্রায় চরম দশায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, অর্থের প্রয়োজন তাহার বিশেষ ছিল, কিন্তু আভিজাত্যের অভিমান তিনি বিস্মৃত হন নাই, অর্থের লোভে প্রিয় কুকুরকে পরহস্তে সমর্পণ করিতে তাঁহার মন সরিল না। তবু ফ্লাশকে একদিন তিনি নিজের হাতে অপরের নিকট সমর্পণ করিলেন—কিন্তু অর্থের লোভে নয়, নিছক স্নেহের ও বন্ধুত্বের আকর্ষণে। মিস্ মিটফোর্ড-এর কাছে ফ্লাশ ছিল অমূল্য, কেননা পয়সা দিয়া যাহা পাওয়া যায় ফ্লাশ তাহার অতীত এক সম্পদের প্রতীক। দুইটি হৃদয়ের মধ্যে প্রেমের আকর্ষণও তো এই জাতীয় সম্পদ। এই আকর্ষণেই তিনি ফ্লাশকে বহু অর্থের লোভ উপেক্ষা করিয়া ধরিয়া রাখিয়াছিলেন। এই আকর্ষণেই একদিন তাঁহার পরম বন্ধু কবি এলিজাবেথ ব্যারেট্-এর হস্তে ফ্লাশকে চরম উপহারস্বরূপ সমর্পণ করিলেন। ১৮৪২ সালে, জন্মের কয়মাস পরে, যখন ফ্লাশ-এর জীবনে এইভাবে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা হয়, মিস্ ব্যারেট তখন লণ্ডনের অভিজাত পল্লী উইমপোল ষ্ট্রীটে পিতৃগৃহের এক নিভৃত শয়নকক্ষে রোগশয্যায় দিন যাপন করিতেছেন। অতঃপর ফ্লাশ-এর স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল এই কক্ষের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে।

এই অভিনব আবেষ্টনে ফ্লাশ যদি প্রথম কিছুদিন ম্রিয়মাণ হইয়া থাকে তবে তাহাকে নিশ্চয় দোষ দেওয়া চলে না। পল্লীগ্রামের প্রান্তরে ও বনে যে-জীবন তাহার এতদিন অভ্যস্ত হইয়াছিল হঠাৎ একদিনে তাহা কোথায় মিলাইয়া গেল, তাহার ঘরের ও বাইরের পরিচিত সাথী কি নির্ম্মম ভাবে তাহাকে ফেলিয়া অন্তর্হিত হইলেন, এক নিশ্চল, নিরানন্দ, বৈচিত্র্যহীন গৃহাভ্যন্তরে তাহার হইল কারাগার। কিন্তু ফ্লাশ-এর গোপন অন্তঃকরণে আনন্দের যে অফুরন্ত ভাণ্ডার ছিল নিয়তির কঠিন আঘাতেও তাহা রিক্ত হয় নাই। ক্রমে ফ্লাশ তাহার নূতন গৃহে অভ্যস্ত হইল, ইহার সাজসজ্জা আসবাব-পত্র ক্রমে তাহার অত্যন্ত অন্তরঙ্গ হইয়া উঠিল, এই নির্জ্জন কক্ষটি ক্রমে বিচিত্র শোভায় মণ্ডিত এক নূতন জগৎ বলিয়া তাহার নিকট প্রতিভাত হইল। তাহার জীবনে আরো গভীর পরিবর্ত্তন দেখা গেল। সে বুঝিতে পারিল রোগশয্যালীনা এক নারী হইলেন এই জগতের কেন্দ্র। অসীম নির্ভরের সহিত সে এই কেন্দ্রকে তাহার জীবনের একমাত্র আশ্রয় বলিয়া গ্রহণ করিল। কি অবিচলিত নিষ্ঠার সহিত ফ্লাশ তাহার এই সঙ্কল্প আমরণ পালন করিয়াছিল তাহার পরবর্ত্তী জীবনে তাহার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়।

যাহারা জ্ঞানী ও অভিজ্ঞ তাঁহারা হয়তো মাথা নাড়িতেছেন। কুকুরের আবার সঙ্কল্প কি? কেন বাপু, কুকুরের কি সঙ্কল্প করিবার অধিকার নাই? তাঁহারা বলিবেন, অধিকার থাকিতে পারে, কিন্তু ক্ষমতা নাই। হয়তো নাই। কিন্তু একথা জোর করিয়া বলিতে গেলে মনস্তত্ত্ব, প্রাণিতত্ত্ব ও বিশেষভাবে কুকুরতত্ত্বসম্বন্ধে যে গভীর জ্ঞানের প্রয়োজন, তাহা কয়জনের আছে জানিনা।

কিন্তু একথা অত্যন্ত স্পষ্ট যে ফ্লাশ-এর জীবনীর লেখিকা এই জাতীয় বিরল পাণ্ডিত্যের দাবী কখনই করিবেন না। তাই ফ্লাশ-এর জীবনের যাহা বাহিরের ঘটনা তাহা ইতিহাসের সাহায্যে তিনি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, কিন্তু ফ্লাশ-এর মনের কথা যাহা তিনি লিখিয়াছেন তাহার একমাত্র নজির তাঁহার নিজের মন। অর্থাৎ ফ্লাশ-এর মন যদি হইত ঠিক মানুষের মনের মতন এবং তৎসত্ত্বেও যদি ফ্লাশ মানুষেরা সাধারণত যাহা ভাবে তাহা না ভাবিয়া শুধু ভাবিত কি করিয়া আদর্শ কুকুরোচিত জীবন যাপন করা যায়—তাহা হইলে ফ্লাশ কি ভাবিত মিস উল্‌ফ সেই কথাই লিখিয়াছেন। এই ভাবে অবিসম্বাদিত ঐতিহাসিক তথ্য ও নিছক কল্পনার মিশ্রিত উপাদানে রচিত ফ্লাশ-এর জীবনী মানুষের চোখের সামনে অত্যন্ত স্পষ্ট, অত্যন্ত সুন্দর, অত্যন্ত সত্য হইয়া উঠিয়াছে, রূপকথা বা কবিতা বা ছবির মতন। মিস উল্‌ফ একটি কুকুরের জীবনের আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করেন নাই, তিনি করিয়াছেন শিল্পসৃষ্টি। তিনি যে সার্থক হইয়াছেন তাহার প্রমাণ তাহার রচনার অখণ্ডতা। ফ্লাশ-এর জীবনকাহিনী পড়িতে পড়িতে পাঠকের মন ক্রমাগত অবিসম্বাদিত তথ্য ও নিছক কল্পনার মধ্যে আনাগোনা করে, কিন্তু কোথায়ও বাধা পায়না, কোথায়ও বিন্দুমাত্র রসভোগের ব্যাঘাত ঘটে না, কোথায়ও মনে হয় না সত্যের মর্য্যাদা অণুমাত্র ক্ষুণ্ণ হইয়াছে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে সেই আয়নার ব্যাপারটি। একদা শ্রীমতী ব্যারেট-এর নজরে পড়িল শ্রীমান ফ্লাশ অত্যন্ত নিবিষ্টভাবে দর্পণে নিজের প্রতিবিম্ব নিরীক্ষণ করিতেছে। দেখিয়া তিনি চমৎকৃত হইলেন, শ্রীমানের প্রতি শ্রদ্ধায় তাঁহার মন পূর্ণ হইল। ফ্লাশ নিশ্চয়ই পরম দার্শনিকের মতন ভাবিতেছিল এই যে স্থাবর ও জঙ্গম বস্তুনিচয়, যাহারা নিয়ত দৃশ্যমান এবং দর্পণে যাহারা প্রতিফলিত হয়, তাহাদের সহিত জগতের অন্তর্নিহিত লোকচক্ষুর অগোচর পরম সত্তার কি সম্বন্ধ? মূঢ় নারী! লণ্ডনে অতি অল্পদিন বাসের ফলে ফ্লাশ-এর মনের চিন্তাধারা কোন খাতে প্রবাহিত হইতেছিল তাহা অনুমান করিবার মত বুদ্ধি বা সহানুভূতি তাঁহার ছিল না। তাই এই পরম কুকুর-রত্নটির পবিত্র চরিত্র তিনি বিনা দোষে দার্শনিকতার অপবাদে কলঙ্কিত করিয়াছেন। এই ত্রুটি সংশোধন করিয়াছেন ফ্লাশের জীবনী-লেখিকা। আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া ফ্লাশ কি ভাবিতেছিল—এবং আরো অনেক কথা—তিনি ফাঁস করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে ফ্লাশের গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে বই কমে নাই। ব্যাপারটি সংক্ষেপে এই। মিস্ মিটফোর্ড-এর নিকট গ্রামে বাস করিবার সময় ফ্লাশ-এর কখনো ধারণাই হয় নাই যে কুকুরদের মধ্যে জাতিভেদ আছে এবং কুকুরোচিত উৎকর্ষ বা অপকর্ষ অনুযায়ী এই ভেদ নিরূপিত হয়। গ্রাম্য জীবনে এ সব বালাই ছিল না। সকল প্রকারের কুকুরের সহিত সে অবাধে মিশিত। সহরে আসিয়া ফ্লাশ তাহার কর্ত্রীর শয্যাপার্শ্ব হইতে ছাড়া পাইলেই পথে পথে স্বজাতিচর্চ্চার সুযোগ সন্ধান করিত। প্রথম প্রথম সে পূর্ব্ব জীবনের অভ্যাস অনুযায়ী সঙ্গীনির্ব্বাচনে বিশেষ

বাচবিচার করিত না। কিন্তু ফ্লাশ তো নির্ব্বোধ ছিল না। সে ক্রমে বুঝিতে পারিল রাজধানীর হালচাল অন্য রকম। ইতিমধ্যে ব্যারেট-পরিবারের সম্ভ্রান্ত প্রতিবেশীদের গৃহে পালিত তাহার যে একাধিক সম্ভ্রান্ত বন্ধু জুটিয়াছিল তাহারাও এই বিষয়ে তাহাকে সৎপরামর্শ দিল। ফ্লাশের দিব্যচক্ষু ফুটিল। সে বুঝিল কুকুরজাতির মধ্যে আভিজাত্যের কদর কিরূপ প্রবল; আরো বুঝিল, আভিজাত্যের উচ্চতম স্তরের নিশ্চিত নিদর্শনসমূহ কিরূপ পরিপূর্ণভাবে তাহার শরীরে বিদ্যমান। দর্পণে প্রতিফলিত নিজের মূর্ত্তিতে ফ্লাশ এই সকল লক্ষণ প্রত্যক্ষ করিয়া আত্মপ্রসাদ অনুভব করিতেছিল। সে অভিজাত কুকুর, দর্শনচর্চ্চা কি তাহার সাজে?

তথ্যনিষ্ঠ পাঠক বোধ হয় অধীর হইয়া উঠিয়াছেন। প্রমাণাভাবে মিস ব্যারেট-এর অভিযোগ হইতে ফ্লাশকে তিনি নিশ্চয় মুক্তি দিবেন, কিন্তু, মিস উল্‌ফ্-এর স্তুতিই বা কোন্ প্রমাণের বলে তিনি গ্রহণ করিবেন? প্রমাণ অবশ্য আদৌ নাই। কিন্তু মিস্ উল্‌ফ যাহা লিখিয়াছেন তাহা সেই জাতীয় সত্য যাহা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না, অন্তত রসিকজনের নিকট। সুতরাং তথ্যনিষ্ঠ পাঠক তথ্যের অনুসরণ করুন, ফ্লাশের জীবনী তাঁহার জন্য লিখিত হয় নাই। বরঞ্চ সময় পাইলে স্প্যানিয়েল ক্লাব-এর বার্ষিক কার্য্য-বিবরণী তিনি পাঠ করিয়া দেখিতে পারেন, ইহা নানা তথ্যসমন্বিত প্রামাণ্য রচনা, পড়িয়া তিনি উপকার পাইবেন।

মানবসমাজে একদিন যে তাহার বিশেষ প্রতিপত্তি হইবে এবং সাহিত্যিক-মহলে তাহাকে লইয়া তর্ক উঠিবে এই কথা ফ্লাশ বুঝিতে পারিয়াছিল কিনা এবং বুঝিয়া থাকিলে এই সম্বন্ধে সে কি ভাবিত তৎসম্বন্ধে তাহার জীবনী-লেখিকা নীরব। কিন্তু যাহাই হউক, ব্যারেট-গৃহে তাহার দিন সুখেই কাটিতেছিল। স্বচ্ছন্দবিহারে অনেক বাধা ছিল বটে, কিন্তু সৌখীন আহারে সে অভাব পূরণ হইত। যে-সকল বিলাসের উপকরণ একদিন তাহার স্বপ্নেরও অতীত ছিল এখন তাহারা তাহার নিত্য উপভোগের সামগ্রী। সর্ব্বোপরি, আভিজাত্যের কি আশ্চর্য্য আবহাওয়া! পারিপার্শ্বিক মানবলোকে ও কুকুরলোকে দেহের ও মনের কি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম উৎকর্ষ! উইম্‌পোল ষ্ট্রীটের একপ্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত দ্বিপদ ও চতুষ্পদ সভ্যতার কি মর্ম্মস্পর্শী সৌরভ! এই সৌরভ শশকের নয়, শৃগালের নয়, শিশিরসিক্ত তৃণের নয়, পবনবাহিত ফুলরেণুর নয়। ইহা উইমপোল ষ্ট্রীটের দক্ষ সূপকারগণের সাক্ষাৎ তত্ত্বাবধানে ভর্জ্জিত কুক্কুটশাবকের সৌরভ। এই উপাদেয় সৌরভের সহিত শুধু যে তাহার নাসিকার পরিচয় হইয়াছিল তাহা নয়, ইহার আধারের সহিত তাহার রসনার নিত্য সংযোগ ঘটিত, ফলে তাহার রুচি অত্যন্ত সুকুমার ও মার্জ্জিত হইয়াছিল।

কিন্তু সভ্যতা তাহাকে একেবারে গ্রাস করিতে পারে নাই। মাঝে মাঝে কৃষ্ণকায় সৈনিককণ্ঠে উচ্চারিত "স্প্যান, স্প্যান" ধ্বনি তাহার কানে বাজিত, তখন তাহার আদিম কুকুর-প্রবৃত্তি জাগ্রত হইত, তাহার মন হইতে উইমপোল ষ্ট্রীটের ভব্য রীতিনীতি একেবারে লোপ পাইত। এইরূপ এক উন্মাদনাময় মুহূর্ত্তে সে ব্যারেট-গৃহে অভ্যাগত মিষ্টার কেনিয়ন নামধারী এক বিশিষ্ট ভদ্র ব্যক্তিকে দংশন করিল। বেচারা ফ্লাশকে দোষ দিলে চলিবে কেন? মিষ্টার কেনিয়ন কেন ঐভাবে হোঁচট খাইয়া পড়িলেন? তিনি কি জানিতেন না ফ্লাশ-এর আদিম পূর্ব্বপুরুষগণ স্পেনের দুর্গম গিরিবর্ত্মে কি দুর্দ্ধর্ষ আবেগে ধাবমান হইত? তাহাদের রক্ত যে ফ্লাশ-এর ধমনীতে

সঞ্চরমাণ। সুতরাং ফ্লাশ কি করিবে? শ্রীমতী ব্যারেট পর্য্যন্ত ফ্লাশ-এর এই দুর্নিবার প্রবৃত্তির কথা বুঝিতেন না। তাই এইরূপ অপব্যবহারের জন্য ফ্লাশকে তিনি কঠিন তিরস্কারে দণ্ডিত করিলেন। বিনা অপরাধে লাঞ্ছিত ফ্লাশ মর্ম্মান্তিক বেদনায় মুহ্যমান হইল। সভ্যতার শাসন কি নির্ম্মম!

ফ্লাশ-এর দুঃখের মাত্রা তখনো পূর্ণ হয় নাই। আদিম প্রবৃত্তির তাড়না তাহার দন্তে দন্তে আর একদিন উগ্র হইয়া উঠিল, হিংস্র অসংযমে সে দংশন করিল—যাহাকে তাহাকে নয়—একেবারে রবার্ট ব্রাউনিংকে। হাঁ, বিখ্যাত কবি রবার্ট ব্রাউনিংকে। দুঃসাহসী ফ্লাশ! সে কি জানিত না ব্যারেট-গৃহে এই পুরুষপ্রবরের নিত্য আনাগোনার কারণ আর কিছু নয়—তাহার কর্ত্রী এলিজাবেথের পাণি-প্রার্থনা? সে কি জানিত না যে প্রতিদিন দীর্ঘ সময় রবার্ট-এর পত্রের প্রত্যাশায় ও পাঠে এলিজাবেথ এত মগ্ন থাকেন যে তাঁহার প্রিয় ফ্লাশের কথা তিনি প্রায় বিস্মৃত হন? সে কি বুঝিতে পারে নাই যে এলিজাবেথ-এর রোগশীর্ণ জীবনের পাণ্ডুর দিগন্ত ফ্লাশ অপেক্ষাও প্রিয়তর একটি সঙ্গীর অভ্যুদয়ে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল? ফ্লাশের তদানীন্তন আচরণ লক্ষ্য করিলে যে-কেহ বুঝিতে পারিত তাহার কর্ত্রীর জীবনে যে এক গভীর পরিবর্ত্তন আসিয়াছে তাহা সে ভালো করিয়াই বুঝিতে পারিয়াছিল, যদিও এই পরিবর্ত্তনের গূঢ় তাৎপর্য্য তাহার সরল মনে তখনো সম্যকরূপে পরিস্ফুট হয় নাই। এই অবস্থায় তাহার কমনীয় মন যে চঞ্চল হইবে এবং এই চাঞ্চল্যের যিনি কারণ তাহাকে সে দংশন করিবে তাহা আর বিচিত্র কি? ইহার জন্য তাহার যে দারুণ লাঞ্ছনা ঘটিল তাহাতে তাহার দুঃখ হইল বটে কিন্তু শিক্ষাও হইল। সে বুঝিল এই সুখদুঃখময় সংসারে কেহ কাহারও একান্ত আপনার নয়। এই উপলব্ধি তাহার মনে অধ্যাত্মসাধনার নবধারা উন্মুক্ত করিল। অতঃপর ফ্লাশ মহৎ ঔদার্য্যের সহিত পরম শত্রু রবার্ট ব্রাউনিংকে পর্য্যন্ত সস্নেহ অনুকম্পার চক্ষে দেখিতে শিখিল।

ইহার অনতিকাল পরে ফ্লাশ-এর জীবনে এমন একটি অকল্পিত দুর্ঘটনা ঘটিল যাহা অধ্যাত্মসাধনার উন্নতমার্গে যাহারা বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে তাহাদেরও মানসিক সাম্য বিপর্য্যস্ত করে। শ্রীমতী ব্যারেট গাড়ি চড়িয়া বাজারে গিয়াছিলেন। সঙ্গে ছিল ফ্লাশ, কিন্তু তাহার কণ্ঠে শৃঙ্খল ছিল না। তাই মনের আনন্দে সে ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিয়া এই সুন্দর পৃথিবীর আলোক ও বাতাস প্রাণ ভরিয়া উপভোগ করিতে-ছিল। সহসা ঐ দৃশ্যের উপর কালো যবনিকাপাত হইল, ফ্লাশ-এর মনে হইল তাহার শ্বাস রুদ্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে। এইরূপ মনে হইবার সঙ্গত কারণ ছিল, কেননা এক অপরিচিত সবল হস্তের দৃঢ় আকর্ষণে ফ্লাশ মিস্ এলিজাবেথ ব্যারেট-এর শকট-সান্নিধ্যেই লণ্ডনের প্রশস্ত রাজপথ হইতে এক সঙ্কীর্ণ থলীর অভ্যন্তরে নিক্ষিপ্ত হইয়া-ছিল। এইরূপ ঘটনা তখন অর্থাৎ ১৮৪৬ সালে লণ্ডন সহরে বিরল ছিল না এবং যাহারা ইহা ঘটাইত তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল সাধু, অর্থাৎ জীবিকা-অর্জ্জন। কিন্তু উদ্দেশ্য সাধু হইলেও তাহাদের অবলম্বিত উপায় সম্বন্ধে যে জনসাধারণের নৈতিক অনুমোদন ছিল না তাহার প্রমাণ লোকে ঘৃণিত চোর নামে তাহাদের অভিহিত করিত। ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই। কিন্তু এই জাতীয় কার্য্যে যাহারা লিপ্ত থাকিত তাহারা যে উইম্পোল্ ষ্ট্রীটের সজ্জনসম্প্রদায়ের অতি নিকট প্রতিবেশী ছিল তাহা কল্পনা করা কঠিন না হইলেও অপ্রীতিকর। মিস্ উল্ফ্‌কে অবশ্য ইহা কল্পনা করিতে হয় নাই,

কেননা, ইহা সর্ব্বজনস্বীকৃত ঐতিহাসিক তথ্য। পরিচ্ছন্ন উইম্‌পোল ষ্ট্রীটের সুদৃশ্য অট্টালিকারাজীর মেহোগেনি কাঠের দরজায় বা কাচের বাতায়নে কিন্তু এই তথ্যের লেশমাত্র ইঙ্গিত ছিল না। কিন্তু ইহারই অদূরে অপরিচ্ছন্নতার ও অমানুষিকতার, দারিদ্র্যের ও পাপের, যে ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি প্রকট ছিল তাহা ভাবিলেও শিহরণ হয়।

এই সজ্জনবর্জ্জিত কদর্য্য পল্লীতে টেলার নামক এক প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি বহু অনুচরসহ প্রতিষ্ঠিত ছিল। কুকুর-বিলাসী উইম্‌পোল ষ্ট্রীটের সহিত এই সম্প্রদায়ের সম্পর্ক ছিল অতি অন্তরঙ্গ। সুবিধা পাইলেই প্রতিবেশীদের চতুষ্পদ সম্পত্তি ইহারা ক্ষিপ্র হস্ত ও বৃহৎ স্থলীর সাহায্যে নিজেদের পল্লীতে স্থানান্তরিত করিত, তাহার পর অপহৃত কুকুরের উত্তরাধিকারী লুপ্তবস্তু উদ্ধারের মানসে তাহাদের দ্বারস্থ হইলে সুযোগ বুঝিয়া যথাসাধ্য নিজেদের আয়বৃদ্ধি করিত। কোনো কুকুরের স্বত্বাধিকারী এই প্রশংসনীয় কার্য্যে ইহাদের সহায়তা করিতে অসম্মত হইলে যথাসময়ে শ্রীযুক্ত টেলার তাঁহাকে তাঁহার কুকুরের ছিন্নমস্তক ও খণ্ডিত থাবা উপহার পাঠাইত। বলা বাহুল্য, ফ্লাশ এই দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ টেলারেরই পরিবারভুক্ত হইয়াছিল।

মিস্‌ ব্যারেটএর মনের অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। টেলার রক্তাক্ত উপহার পাঠাইয়া তাঁহাকে অনুগৃহীত করিবে এই আশঙ্কায় আকুল হইয়া তিনি স্বয়ং যাইয়া তাহার সন্তুষ্টি সাধনের সঙ্কল্প করিলেন। ব্যারেট-পরিবার ত্রাসে চমকিয়া উঠিল। টেলার-এর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবে উইম্‌পোল ষ্ট্রীটের সম্ভ্রান্তবংশীয়া এক কন্যা? সেই ভয়াবহ দুর্ব্বৃত্তসঙ্কুল পল্লীতে? তাহা হইলে যে অপঘাতমৃত্যু নিশ্চিত। দুঃসাহসী মিস্‌ ব্যারেট সকল পরামর্শ অগ্রাহ্য করিয়া স্বয়ং দুর্ব্বৃত্ত-পল্লীতে গমন করিলেন, দুর্ব্বৃত্ত-প্রধান টেলার স্বয়ং ব্যারেট-গৃহে আসিল, ফ্লাশ-এর উদ্ধারসাধনের জন্য দুইপক্ষে আলাপ আলোচনা চলিল। এই সময়ে রবার্ট ব্রাউনিং, এলিজাবেথ ব্যারেট্‌-এর পাণিপ্রার্থী রবার্ট ব্রাউনিং, বিখ্যাত কবি রবার্ট ব্রাউনিং, রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইলেন। বাক্যালাপ এবং পত্রালাপ দ্বারা এলিজাবেথ-এর সহিত প্রেমচর্চ্চায় তিনি বিভোর ছিলেন। সহসা তাঁহার চমক ভাঙিল, তাঁহার হৃদয় বিগলিত হইল, তাঁহার প্রাণ হাহাকার করিয়া উঠিল। ফ্লাশ-এর জন্য? অবশ্য নয়। ব্রাউনিং প্রেমনিষ্ঠ ছিলেন বটে, কিন্তু তদপেক্ষা বেশি ছিলেন আদর্শনিষ্ঠ। ন্যায়ের যে উচ্চ আদর্শ তিনি জীবনের মন্ত্র বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন আজ তাহা ধূলিসাৎ হইবার উপক্রম হইয়াছে। কেননা তাঁহার সাধের এলিজাবেথ অভিজাত অর্থের দ্বারা অন্যায়ের প্রশ্রয় দিতে উদ্যত। এই অবস্থায় ব্রাউনিং কি প্রতিবাদ না করিয়া পারেন? পত্রের পর পত্রে এই প্রতিবাদ সুতীব্র ভাষা এবং অকাট্য যুক্তির সাহায্যে যথাস্থানে উপস্থাপিত হইল। না হয় ফ্লাশ টেলর-গৃহে প্রাণ বিসর্জ্জন করুক, কিন্তু ন্যায়ের মর্য্যাদা যেন ক্ষুণ্ণ না হয়।

একদা ফ্লাশ রবার্ট ব্রাউনিংকে দংশন করিয়াছিল তাহা আমরা জানি। এই ঘটনার অবচেতন স্মৃতিই কি আজ তাঁহার প্রবল ন্যায়নিষ্ঠার নিগূঢ় প্রেরণা হইয়াছিল? এ কথার উত্তর দিতে গেলে বরার্ট ব্রাউনিং-এর মনস্তত্ত্বের আলোচনা করিতে হয় এবং কল্পনার সাহায্য ছাড়া তাহা অসম্ভব। শ্রীমতী উল্‌ফ যে প্রয়োজনে ও অপ্রয়োজনে কল্পনার সাহায্য লইতে পারেন ফ্লাশ-এর জীবনীতে বারম্বার তাহার পরিচয় আমরা পাইয়াছি। কিন্তু ফ্লাশ কুকুর, বরার্ট ব্রাউনিং মানুষ। তাই বোধহয় রবার্ট ব্রাউনিং

সম্বন্ধে শ্রীমতী উল্‌ফ সর্ব্বজনস্বীকৃত অতিপ্রামাণ্য আপ্তবাক্য ছাড়া আর কিছুর উল্লেখ করেন নাই। সুতরাং আমরাই বা কোন সাহসে করি?

কিন্তু একথা নির্ভয়ে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে এই ঘটনার উপসংহার হইয়াছিল প্রীতিকর। দুঃসাহসী মিস্ ব্যারেট পিতা ও ভ্রাতাদের পরামর্শ অগ্রাহ্য করিয়া দুর্ব্বৃত্ত-পল্লীতে গিয়াছিলেন, দুঃসাহসের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া তিনি রবার্ট ব্রাউনিং-এর প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করিলেন। ন্যায়ের শক্তি পরাজিত হইল বটে কিন্তু ফ্লাশ-এর প্রাণরক্ষা এবং টেলর-সম্প্রদায়ের আয়বৃদ্ধি হইল। অতঃপর বরার্ট ব্রাউনিং ন্যায়ের সমর্থন ছাড়িয়া আবার প্রেমচর্চ্চায় মন দিলেন এবং সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া অনতিকাল পরে সস্ত্রীক ইটালি গমন করিলেন। এলিজাবেথ পিতৃগৃহ হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন এবং ফ্লাশকে সঙ্গে লইতে ভুলেন নাই ইতিহাসের কাঠগড়ায় লিপিবদ্ধ তথ্য এইরূপ সাক্ষ্য দেয়।

গণতন্ত্রের প্রচণ্ড প্লাবনে তখন ইটালি পরিপ্লাবিত। ফলে শুধু মনুষ্য নহে, সারমেয়দের মধ্যেও উদার সাম্যনীতি ঘোষিত হইয়াছিল। গণতন্ত্রের বাণী ফ্লাশ-এর উন্মুখ চিত্তকে গভীরভাবে স্পর্শ করিল। অধ্যাত্মসাধনার ফলে তাহার অন্তঃকরণ ক্রমশ আভিজাত্যের অহঙ্কার হইতে মুক্ত হইয়াছিল, বৈশিষ্ট্যের বাহ্য লক্ষণে সে আর বিভ্রান্ত হইত না। জাতিবর্ণনারীপুরুষনির্ব্বিশেষে সে সকল প্রকারের কুকুরের সহিত অবাধে বন্ধুত্ব স্থাপন করিল। তাহার বহুদিনগত শৈশবের নির্ব্বিচার উদারতা আবার ফিরিয়া আসিয়াছিল।

একদা ফ্লোরেন্স্-এর রাজপথ জনস্রোতে পূর্ণ হইল, বিচিত্র পতাকাধারী অগণিত নরনারী জাতীয়তার জয়োল্লাসে আকাশ ক্ষুব্ধ করিল। প্রজ্জ্বলিত বর্ত্তিকায় বাতায়ন আলোকিত করিয়া অলিন্দে দণ্ডায়মান ব্রাউনিং-দম্পতী এই জনবৃন্দকে সমাদর করিলেন। মানবজাতির এই অকারণ চাঞ্চল্যে ফ্লাশ বিস্মিত হইল। এই আকস্মিক উন্মাদনা হইতে আত্মরক্ষার জন্য অধীর হইয়া সে ছুটিল—দূরে—বহুদূরে—এক ইতরজাতীয়া কুক্কুরীর পশ্চাতে। ক্রমে জনতার কণ্ঠধ্বনি স্তব্ধ হইল, মশালের উজ্জ্বল আলো রাত্রির অন্ধকারে মিলাইয়া গেল। আর্‌নো নদীর তীরে স্নিগ্ধ কর্দ্দমশয্যায় সঙ্গিনীর সহিত নিবিড় প্রেমালিঙ্গনে আবদ্ধ ফ্লাশ সুখদুঃখ ভূতভবিষ্যৎ বিস্মৃত হইয়া তখন সম্মোহিত তূরীয় অবস্থা লাভ করিয়াছে।

এইভাবে ফ্লাশের জীবন গভীর হইতে গভীরতর অধ্যাত্ম-অভিজ্ঞতার সাহায্যে ক্রমশ অন্তর্ম্মুখিন হইয়া উঠিতেছিল। বাহ্য পৃথিবীর রূপরসগন্ধে আর সে সহজে বিচলিত হয় না। কিন্তু তবু মানবসন্তানের প্রতি তাহার মমতা ক্ষুণ্ণ হয় নাই। প্রকৃতির মায়া তাহাকে আকর্ষণ করিতে পারে না, কিন্তু মানুষকে দেখিবামাত্র তাহার অন্তঃকরণ অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়া উঠে। তাই, যখন এপেনাইন পর্ব্বতের বিসর্পিত পথে চলিতে চলিতে ব্যারেট ব্রাউনিং শকট-বাতায়নপথে মুগ্ধ নেত্রে চাহিয়া দেখিতেছিলেন প্রতিমুহূর্ত্তে অভিনব দৃশ্যপট উদ্‌ঘাটিত হইতেছে, তখন ফ্লাশ ছিল গভীর নিদ্রায় মগ্ন। বাতায়নপথে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে ফ্লাশ দেখিতে পাইত বহুনিম্নে উপত্যকা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ঘনসন্নিবিষ্ট বৃক্ষরাজী, বন্ধুর পর্ব্বতগাত্রে উৎকীর্ণ ভাস্কর্য্যের ন্যায় বহুধারায় উচ্ছ্বসিত অসংখ্য জলপ্রপাত, বহু ঊর্দ্ধে উদ্ধত গিরিশৃঙ্গে গগন বিদীর্ণ। কিন্তু ফ্লাশ এই সব কিছুই দেখে নাই। রূপবিলাসে প্রলোভনের বয়স সে অতিক্রম

করিয়াছিল। যখন ব্রাউনিং দম্পতীর শকট জনহীন পার্ব্বত্য পথ হইতে অবার গ্রামের পথে উপনীত হইল, তখন ফ্লাশ-এর নিদ্রা টুটিল। বাতায়নপথে চাহিয়া সে দেখিল চতুর্দ্দিকে নরনারী যাতায়াত করিতেছে। তাহার চোখের দৃষ্টি প্রসন্ন হইল, সে পরম তৃপ্তিলাভ করিল।

ইতিমধ্যে ব্রাউনিং-গৃহে একটি নবীন অতিথির অভ্যাগমন হইয়াছিল। প্রবীণ ফ্লাশ সকৌতুক স্নেহে এই সদ্যোজাত শিশুটিকে আত্মীয় বলিয়া মানিল। ব্রাউনিং দম্পতী কিছুদিনের জন্য ইংল্যাণ্ড গমন করিলেন। ফ্লাশ আর একবার লণ্ডন দেখিতে পাইল। কিন্তু সে সম্পূর্ণ মায়ামুক্ত হইয়াছিল, লণ্ডনে আর তাহার স্পৃহা ছিল না। ইটালিতে ফিরিয়া সে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।

ফ্লাশ-এর জীবন এতদিনে বার্দ্ধক্য উপস্থিত হইয়াছিল। সে আর চঞ্চল হইয়া ইতস্তত ছুটিয়া বেড়ায়না, প্রহরের পর প্রহর শান্ত নিদ্রায় তাহার সময় কাটে। যদি বা কখনো ফ্লোরেন্‌স্ সহরের অলিতে গলিতে সে স্বজাতীয়া বান্ধবীর সন্ধান করে, তাহা যৌবনের দুর্দ্দমনীয় কামনার আবেগে নয়, বার্দ্ধক্যের নিরাসক্ত নর্ম্মলীলায়। মনের পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে তাহার দেহের অনুভূতি দিনে দিনে শিথিল হইয়া আসিতেছিল। এই বিপুল পৃথিবীর বিচিত্র অভিজ্ঞতা অত্যন্ত লঘুভাবে তাহার ইন্দ্রিয়কে স্পর্শ করিত। তাহার মন্থরগতি জীবনে অন্তিম আবেশ ক্রমশ ঘনাইয়া আসিতেছিল।

এক এক সময় তাহার আবেশ কাটিয়া যাইত, বাহ্য পৃথিবীর আকস্মিক আঘাতে সে ক্ষণকালের জন্য বিচলিত হইত, তাহার পর আবার নিদ্রার ঘোরে আচ্ছন্ন হইত। একদিন ব্রাউনিং-গৃহের বৈঠকখানায় সে টেবল্‌-এর নীচে গভীর নিদ্রামগ্ন ছিল। সহসা তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। টেবল্‌-এর চতুষ্পার্শ্বে সমবেত নরনারীর তরঙ্গায়িত অধোবসনে তাহার শ্বাস রুদ্ধ হইবার উপক্রম হইল। তাহার কি মনে পড়িল বহুবর্ষ পূর্ব্বে এই ভাবেই একদিন লণ্ডনের রাজপথে মিস্ ব্যারেট্‌-এর শকটনিম্নে সে রুদ্ধশ্বাস হইয়াছিল। কিন্তু আজ চতুর্দ্দিকে এ কিসের উত্তেজনা? ফ্লাশ বুঝিতে পারিল না। সে চীৎকার করিল। কেহ সাড়া দিল না। সে দেখিল টেবিল্‌-এর পায়া একবার উঠিতেছে একবার নামিতেছে। ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কি আছে? পদার্থবিজ্ঞানবিৎ ফ্লাশ জানিত আকর্ষণ বিকর্ষণ ইত্যাদি বাহ্য শক্তির প্রয়োগে স্থূল বস্তুনিচয় এইভাবেই সঞ্চালিত ও নিপতিত হয়। তাহা হইলে উত্তেজনার কারণ কি?

কি করিয়া ফ্লাশ উত্তেজনার কারণ বুঝিবে? তাহার অন্তর্মুখিন মন যে বাহ্য জগতের কোন সংবাদ রাখিত না। যদি রাখিত তাহা হইলে ফ্লাশ বুঝিতে পারিত যে এই আপাতস্থূল টেবিল্‌টি আর স্থূল ছিল না, পারলৌকিক সত্তায় তাহার পায়া প্রাণবন্ত হইয়াছিল এবং সমবেত নরনারী এই সত্তার সন্ধানেই ঐরূপ উত্তেজিত হইয়াছিলেন। এই জাতীয় ঘটনা তখনকার দিনে বিরল ছিল না, ঘরে ঘরে এইভাবে বিদেহী আত্মার উদ্বোধন করা হইত। এই ব্যাপারের সূত্রপাত ঘটে কিছুদিন পূর্ব্বে। ইংল্যাণ্ডের সম্ভ্রান্ত-বংশীয়া এক নারী কি করিয়া যেন এক যাদুকরের নিকট হইতে একটি স্ফটিক-গোলক সংগ্রহ করেন। এই স্ফটিক-গোলকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলে নাকি নানা অদ্ভুত দৃশ্য উদ্‌ঘাটিত হইত এবং শ্রদ্ধান্বিত দ্রষ্টার মুগ্ধ দৃষ্টির সম্মুখে নাকি ভূত ভবিষ্যৎ ইহকাল পরকালের নানা রহস্য প্রকাশিত হইত। ইহা যে পরলোকবাসী মানবাত্মার আবির্ভাবের জন্য তাহাতে আর সন্দেহ কি? দেখিতে দেখিতে ঘরে ঘরে স্ফটিক-গোলক সংগৃহীত

হইল। অসংখ্য নরনারী পরলোকবাসিগণের সাক্ষাৎ লাভের জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা এই সকল গোলকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বসিয়া থাকিতেন। ক্রমে ইঁহাদের অত্যাচারে বিদেহী আত্মারা স্ফটিক-গোলক হইতে পলায়ন করিয়া ত্রিপাদ টেবল্‌-এর পায়াতে আশ্রয় গ্রহণ করিল। কিন্তু, হায়! সেখানেও তাহাদের নিস্তার ছিল না। দলে দলে নরনারী স্ফটিক-গোলকে দৃষ্টিনিক্ষেপ ছাড়িয়া টেবল্‌-এ হস্তক্ষেপ আরম্ভ করিলেন। পরলোকে চাঞ্চল্য উপস্থিত হইল।

পরলোকের চাঞ্চল্য ফ্লাশ কেন গ্রাহ্য করিবে? কিন্তু ইহলোকের এই অকারণ চাঞ্চল্যে সে বিশেষ বিস্মিত হইয়াছিল। তরঙ্গায়িত বসনব্যূহ ভেদ করিয়া সে সবেগে বাতায়ন অভিমুখে ছুটিল। না, রাজপথে তো জনতার চিহ্নমাত্র নাই। পতাকাবাহী নরনারী তো জয়ধ্বনিতে গগন বিদীর্ণ করিতেছে না। তবে কেন এই চাঞ্চল্য? কি অশোভন! সে অত্যন্ত বিরক্ত হইল। ফ্লাশ কি বুঝিতে পারিয়াছিল যে তাহার ইহকাল ও পরকাল ক্রমশ একাকার হইয়া আসিতেছে? তাই কি যাহারা অকালে পরকালের রহস্য সন্ধান করে তাহাদের অসহিষ্ণুতায় সে এত অসন্তুষ্ট হইয়াছিল? ইহলোকের চরম রহস্য তাহার জীবনে আসন্ন হইয়া আসিয়াছিল। মধ্যযুগের পুঞ্জীভূত স্মৃতির রহস্যজালে আচ্ছন্ন ফ্লোরেন্‌স্ সহরের প্রাচীন সৌধাবলী তাই বোধ হয় তাহাকে স্পর্শ করিত না। অত্যন্ত অবজ্ঞাভরে সে সৌধের পর সৌধশ্রেণী অতিক্রম করিয়া জনকোলাহলমুখর বাজারে এক তরমুজওয়ালীর বিপুল ঝুড়ির ছায়ায় দীর্ঘ সময় নিদ্রার আবেশে কাটাইত। জীবনে তাহার আর কোনো আকাঙ্ক্ষা ছিল না।

তাই সে যখন দেখিল মিসেস্ ব্রাউনিং কাগজ ও কলম লইয়া লেখায় এত নিবিষ্ট যে বারম্বার চেষ্টা সত্ত্বেও সে তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিল না, তখন সে বাজারের দিকে ছুটিল। কি আসে যায় কে তাহাকে ভালোবাসে বা না বাসে? ঐ তরমুজ-ওয়ালীর বিপুল পসরার স্নিগ্ধ ছায়ায় তাহার আশ্রয় কে হরণ করিতে পারে? এইখানে উপস্থিত হইতে তাহার বেশী সময় লাগিল না। সে দেখিল তরুণ কুকুর কুকুরী পরস্পরের অনুসরণ করিতেছে? তাহার মনে পড়িল সেও এককালে ইহা করিয়াছে, জীবনের কোনো রস হইতে সে বঞ্চিত হয় নাই। আজ এই তরুণতরুণীর দল ঠিক তাহারই মতন জীবন উপভোগ করিতেছে। করুক। তাহার আর কোন স্পৃহা নাই। সে শুধু চায় বিশ্রাম। দ্বিপ্রহরের আবেশ ক্রমে তাহাকে অভিভূত করিল। বহু কণ্ঠের অস্ফুট গুঞ্জনধ্বনি তাহার অত্যন্ত মধুর মনে হইতেছিল। সে গভীর নিদ্রায় মগ্ন হইল। সহসা সে চমকিয়া উঠিল। হয়তো সে স্বপ্নে শশকের গন্ধ পাইয়াছিল, হয়তো বহুশতাব্দীপূর্ব্বের "স্প্যান" "স্প্যান" ধ্বনি তাহার কানে আসিয়াছিল। সে আবার ঘুমাইয়া পড়িল। কিন্তু আবার চমকাইয়া সে জাগিয়া উঠিল। ভয়ে তাহার শরীর ঘামিয়া উঠিয়াছে। কিসের স্বপ্ন সে দেখিয়াছিল কে জানে?

অধীর হইয়া ফ্লাশ গৃহাভিমুখে ছুটিল। মিসেস্ ব্রাউনিং তখন পুস্তক পাঠে মগ্ন। হঠাৎ ফ্লাশ ঘরে ঢুকিতে তিনি চমকিয়া উঠিলেন। না, কোনো অপচ্ছায়া নয়—স্বয়ং ফ্লাশ। স্মিতহাস্যে ফ্লাশকে তিনি বুকে টানিয়া লইলেন, গভীর স্নেহে তাহাকে আদর করিলেন। এই দুইটি প্রাণীর জীবন যেন এক ছাঁচে ঢালা। ইহাদের সাহচর্য্য যেন বিধাতার অভিপ্রেত — একের সহিত অপর না মিলিলে বোধ হয় ইহাদের দুইজনেরই জীবন অসম্পূর্ণ থাকিত। মিসেস্ ব্রাউনিং পাঠে মন দিলেন। তাহার পর আবার

তিনি ফ্লাশ-এর দিকে তাকাইলেন। কিন্তু ফ্লাশ তাঁহার দিকে তাকাইল না। তাহার চোখে পৃথিবীর আলো চিরকালের জন্ত নিবিয়া গিয়াছিল। অধীর হইয়া তিনি ডাকিলেন "ফ্লাশ"! কোনো সাড়া নাই। এইতো ফ্লাশ বাঁচিয়াছিল, কিন্তু আর সে বাঁচিয়া নাই। আশ্চর্য্য! সেই ত্রিপাদ টেবলটি বৈঠকখানার মাঝখানে স্তব্ধ হইয়া রহিল।

শ্রীহিরণকুমার সান্যাল

সংক্ষিপ্ত পুস্তক-পরিচয়

The Idea in Fiction—Leggett. (Allen and Unwin Ltd.)

ছোট্ট বইখানিতে নভেলের টেক্‌নিক সম্বন্ধে অনেক সারবান কথা আছে। কি উপায়ে বড় নভেলিষ্ট পাঠকের কৌতূহল জাগ্রত রাখেন, নভেলের গল্পাংশ, মতামত, স্বাভাবিকতা, অর্থ ও তথ্যের এবং সামাজিক প্রয়োজনীয়তার স্থান কোথায় ও কতটুকু, কথোপকথনে সামাজিক রীতি-নীতির সংঘাত এবং সেই সংঘাতের সাহায্যে চরিত্র ফুটিয়ে তোলার উপায়—এই বিষয়গুলি অতি সুচারুরূপে পুস্তিকায় আলোচিত হয়েছে। লেখকের মতে নভেলিষ্টের ব্যক্তিত্ব লেখার মধ্যে ফুটে উঠতে বাধ্য। নিজের মেজাজ দিয়ে দেখার অর্থই হল নির্ব্বাচন। লেখককে সর্ব্বদাই নির্ব্বাচন করতে হয়। Not experience itself but the author's judgment of his experience is the essential material of fiction; not what he observes but his intuitions and speculations concerning it. অবশ্য speculationsকেও বশীভূত করা দরকার, কারণ ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ শেষ হবার পর, যেটুকু বাকী থাকে সেইটাই সাহিত্য। অর্থাৎ চিন্তার প্রবাহ থাকবে, তবে সেই চিন্তা অনুভূত কিনা দেখতে হবে। যে চিন্তা চরিত্রের দ্বারা অনুভূত নয়, সে চিন্তা ভার বাড়ায়, শোভা বাড়ায়না। বইখানি পড়লে বাঙালী নভেলিষ্ট ও পাঠকের যথেষ্ট উপকার হবে। লেগেট সাহেব নতুন নভেলিষ্টদের পছন্দ করেন না এবং টেক্‌নিকের ক্রমনির্ণয়টি একটু আড়ষ্ট—বইখানি সম্বন্ধে মাত্র এই দুটি আপত্তি উঠতে পারে।

Property or Peace—H. N. Brailsford. (Victor Gollancz).

প্রুধোঁ লিখেছিলেন Property is Theft, প্রায় একশ বৎসর পরে ব্রেলস্‌ফোর্ড লিখছেন Property is Anarchy। অথচ গত শতাব্দীতে বিজ্ঞানের আশীর্ব্বাদে উৎপাদনের পরিমাণ ও হার যথেষ্ট বেড়ে গিয়েছে, কিন্তু শ্রমিকের বিশেষ কিছু উপকার হয় নি। কেন হয় নি ব্রেলস্‌ফোর্ড লিখেছেন। অর্থসমাগমের সঙ্গে সঙ্গে সেই অনুপাতে সম্পত্তির বিভাগ ও বন্টন হয় নি, সম্পত্তির আশ্রিত শ্রেণীর অধিকার যেমনটি ছিল, তেমনি আছে, গণতন্ত্রের সুফলতা এখনও ফলছে না, সমাজের মধ্যে অন্যায়ের যে বীজ গুপ্ত ছিল আজ সেটি পল্লবিত হয়েছে। উপায় কি? ব্রেলস্‌ফোর্ডের মতে

constitutional means—বিশেষতঃ ইংলণ্ডে। ধনিকতন্ত্রের অমন নির্মম ও যথার্থ সমালোচনার পর ব্রেলস্‌ফোর্ডের সিদ্ধান্ত বড়ই নিরামিষ মনে হয়। কিন্তু বিপ্লব-পন্থা অবলম্বন করতে হলে য়ুরোপের সমগ্র ঐতিহ্যকে ত্যাগ করতে হয়। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীন-চিন্তা বাদ দিলে থাকে কি? যা থাকে তা দিয়ে সভ্যতা এগোয় না। ব্রেলস্‌ফোর্ডের এই অন্তঃসলিল লিবারেলিজম্‌ বড়ই উপভোগ্য। ভারতবর্ষের প্রতি সোশ্যালিষ্টদের কর্তব্য সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য পড়লে ১৯১২।১৩ সালের র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ডের ঔদার্য্যের স্মৃতি জেগে ওঠে। সে যাই হোক্‌, বইখানির ভাষা এতই চমৎকার, তার মধ্যে জানবার কথা এতই বেশী যে প্রত্যেক ভারতবাসীর বইটা কিনে পড়া উচিত। ব্রেলস্‌ফোর্ড Communal electorate এবং exclusion of the rural workersকে negation of democracy বলেছেন। লেখক নিতান্তই আদর্শবাদী, নচেৎ অমন দুঃসাহসের পরিচয় দেন! ভারতবাসী হলে ভাগ্যবিপর্য্যয় ঘটত।

Post-War France—Paul Vaucher. (Home University Library Series).

ফ্রান্স হল এই যুগের সয়তান। ফ্রান্সের জন্যই জার্ম্মানী উঠে পথ্য করতে পারছে না, ফ্রান্স ধার শোধ দেয় না, অথচ দেনা আদায় করে, তাল তাল সোনা জমায়, ইংলণ্ডকে স্বর্ণসিংহাসনচ্যুত করে, ফ্রান্সের যুদ্ধ-সজ্জা বেড়েই চলেছে, তার লোভের অন্ত নেই—১৯১৯ সাল থেকে এই কথাই শুনে আসছি। কেন না আমরা সকলে ফরাসী ভাষা জানি না। Paul Vaucher হচ্ছেন লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ফরাসী দেশের ইতিহাসের অধ্যাপক। তাঁর সুলিখিত ২৫০ পৃষ্ঠার বইখানি পড়ে ফরাসীদের পক্ষে কি বলা যায় শোনা গেল। অনেক ভুল দূর হলেও দু' একটা রয়েই গেল। শুনেছি ফ্রান্স দেশে দুটো বড় trust আছে—একটা লোহালক্কড়ের, অন্যটি অস্ত্রশস্ত্রের কারবার করে। গুজোব এই যে তারাই ফরাসী গবর্ণমেণ্ট ও লোকমত চালায়। গুজোব কতটা সত্য, কতটা মিথ্যা বইখানি পড়ে বোঝা গেল না। তা ছাড়া, বইখানির মধ্যে ফ্রান্সের পলিটিক্‌স্‌ ও ইকনমিকস্‌ সংক্রান্ত প্রায় সব কথাই আছে। ফরাসী চিন্তাধারার একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলে হয়ত এই সিরিজের নির্দ্দিষ্ট সীমা অতিক্রান্ত হত। কিন্তু সাধারণ পাঠকের খুবই লাভ হত জোর করে বলা যায়। এই প্রকার একদেশদর্শী লেখা বোধ হয় এই সিরিজে প্রথম।

Indian Constitution—A Survey; Lahiri & Banerji.
Atlas of Current Affairs—Horrabin. (Gollancz.)

Foundations, Constitution Structure, Administrative Problems, The India of the States, The Constitution in the Making বইখানিতে এই পাঁচটি অংশ আছে, প্রত্যেক অংশের বিভিন্ন অধ্যায়ে পূর্ব্বোক্ত বিষয় সংক্রান্ত নানা তথ্যের আলোচনা রয়েছে। লেখকদ্বয় প্রায় সব প্রয়োজনীয় নথিই ঘেঁটেছেন। ছাত্র ও জার্ণালিষ্টদের উপযোগী এমন সুলিখিত বই বাঙ্গালীদের দ্বারা লেখা হয় নি মনে হয়। এক এক সময় অবশ্য

objective treatment-এর আড়ালে লেখকদ্বয় আত্মগোপন করেছেন সন্দেহ হয়েছে, কিন্তু সেইটাই বোধহয় এক হিসেবে গুণ। Appendix-গুলি সকলেরই উপকারে আসবে। Minority Representation সম্বন্ধে একটি নোট থাকলে ভাল হত। বইখানি সম্বন্ধে একটি কথা পাঠকদের জানান উচিত। কোলকাতা সহরে জনকয়েক যুবক অধ্যাপক, প্রবীণ জার্ণালিষ্ট ও দেশপ্রেমিক সুধীরকুমার লাহিড়ীর নেতৃত্বে Politics Club নামে এক ক্লাব গঠন করেছেন। এই ক্লাবের সভ্যেরা ইতিপূর্ব্বে দুই অংশে White Paper-এর সমালোচনা করে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেছেন। Indian Constitution বইখানিও এই ক্লাবের একটি কৃতিত্ব। এই ক্লাবের উন্নতি নিতান্তই বাঞ্ছনীয়। ক্লাবের প্রকাশিত পুস্তকের বহুল প্রচারে অনুষ্ঠানটি আরো কার্য্যকরী হবে নিশ্চয়।

Horrabin-এর Atlas of Current Affairs প্রত্যেক ভদ্রলোকের টেবিলে থাকা উচিত। এর ছবি ও স্বল্প কথায় নানা দেশের প্রধান প্রধান জ্ঞাতব্য বিষয় সম্বন্ধে নোটগুলি বইখানিকে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় করে তুলেছে।

চলতিপথের বাঁশী—নবগোপাল দাস। (ডি, এম, লাইব্রেরী)

নভেলের আকারে একটি বড় গল্প। মীরা পিতৃবন্ধুর পুত্র অসিতকে ভালবাসে—অসিত দেশ-সেবক, সে মীরাকে ভালবাসে বোনের মত। ভগ্নীস্নেহ আর প্রেম, সঙ্গিনীভাব ও সহধর্ম্মিণী যে দুটো আলাদা শ্রেণীর, এই হল বইখানির প্রতিপাদ্য—তারই চারপাশে মামুলী গল্প। গল্পাংশে কোন বাহাদুরী না থাকলেও লিখনভঙ্গীতে একটি মাধুর্য্য ও সরলতার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। খড়ুই নদীর স্মৃতি সমস্ত বইখানির মধ্যে ওতঃপ্রোত হয়ে রয়েছে। খড়ুই নদীকে লেখকের মনের প্রতীক ভাবলে কাকেও অপমান করা হয় না। উচ্ছলতা সত্ত্বেও অপরিপূর্ণতা, উপলব্ধিহীন ভাষা ও রহস্যভরা প্রতিচ্ছবি খড়ুই নদীর এবং নবগোপাল বাবুর মনের দু'এরই বৈশিষ্ট্য। উচ্ছলতা কমলে পরিপূর্ণতা আসবে, উপলব্ধি হলে ভাষা সমৃদ্ধতর হবে, রহস্যাভাস নিশ্চিত হলে ছবি সুস্পষ্ট হবে আশা করা যায়। পরজ, পূরবী ও পূরিয়ার বিভাগটি যথার্থ হয় নি। তা ছাড়া চরিত্রগুলি বয়সের উপযোগী ব্যবহার করে না। এ দোষগুলি কিন্তু সহজেই কাটান যায়। লেখক এখনও নিজের ধর্ম্ম খুঁজে পান নি। মনের ও বাইরের প্রকৃতিতে যে রহস্যবিজড়িত সঙ্কেত থাকে তাকেই মূর্ত্ত করা, বোধহয় লেখকের স্বভাব-ধর্ম্ম। তবে একখানি বই থেকে ভবিষ্যৎবাণী করা অন্যায়। এই বইখানিতে কিন্তু আভাসই আছে, আকার নেই।

তুমি আর আমি—শ্রীসুধীর মিত্র। (পি, সি, সরকার এণ্ড কোং)

সনেট গুচ্ছ। বিষয় প্রেম, ভাব মামুলী, ভাষার চাতুর্য্য নেই। যেখানেই চমক ভাঙ্গে সেখানেই অন্য কবির, বিশেষতঃ রবীন্দ্রনাথের সুর ঝঙ্কৃত হচ্ছে। ছাপা ও বাঁধাই ভাল।

প্রকাশক—শ্রীসুরেশ চক্রবর্ত্তী, ৭, আর. জি. কর. রোড, কলিকাতা
রামকুমার মেশিন প্রেস, ১৩৩, মুক্তারাম বাবু ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীসুরেশ চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক মুদ্রিত

৪র্থ বর্ষ, ২য় সংখ্যা
কার্ত্তিক, ১৩৪১

পরিচয়
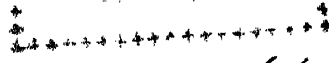
বুদ্ধিবিভ্রাট ও অপরোক্ষানুভূতি

প্রতীচীর ইতিহাসে মধ্যযুগ ছিল নিষ্ঠার যুগ। বুদ্ধি তখন হয় অনাদরে পরিত্যক্ত, নয় বাইবেলের নিষ্ঠা-প্রতিষ্ঠ দৈববাণীর কৃত্রিম সমর্থন ও ভাষ্য-রচনের দাসত্বে নিয়োজিত। অন্তরে বাহিরে তখন স্থবিরতা। এমন সময়ে ইউরোপের জীর্ণ দেহে আবার প্রাণসঞ্চার হ'ল, বহু শতাব্দীর নিদ্রিত মনের অবসাদ কেটে গেল, বুদ্ধি শৃঙ্খল ভেঙে উর্দ্ধগ হ'ল অনন্ত আকাশ পানে। মুক্তবুদ্ধির নির্ভীক অনুপ্রাণনায় ও সপ্তদশ শতকের অপূর্ব্ব-জ্যোতিষ্মান প্রতিভানক্ষত্রনিচয়ের শুভসঙ্গমে আধুনিক বিজ্ঞানের যাত্রারম্ভ। বুদ্ধি ও বিজ্ঞানের এই অভিযান অপ্রতিহত বেগে চল্‌ল শতাব্দীর পর শতাব্দী পার হয়ে, দুর্লঙ্ঘ্য গিরিপ্রান্তর অতিক্রম ক'রে, অপ্রত্যাশিত সাফল্যের উত্তুঙ্গ বৈজয়ন্তী বহন ক'রে। অবশেষে উনিশ শতকের শেষার্দ্ধে বৈজ্ঞানিকদের দুর্দ্ধর্ষ আস্ফালনে ধর্ম্মপ্রচারকের দল আতঙ্কিত হয়ে উঠল, দার্শনিকমণ্ডলীর তন্দ্রালস নয়নেরও চমক ভাঙল। এই আস্ফালনের আতিশয্য আজ আমাদের কাছে অসঙ্গত ঠেকলেও বিজ্ঞানের ইতিহাসে এটা কিছুমাত্র অস্বাভাবিক নয়। পদার্থ-বিজ্ঞান তখন গণিতের কাঠামো পেয়ে এক অদৃষ্ট-পূর্ব্ব শ্রী ধারণ করেছিল, বিশেষত ম্যাক্সওয়েল প্রণীত গোটা চারেক ইকুয়েশন আলোক ও বিদ্যুতের বিপুল ক্ষেত্রদ্বয়কে আপন বশে এনে চোখে ধাঁধা লাগিয়ে দিয়েছিল,—স্বাভাবিক তখন সেই অদূর ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখা যখন সমস্ত পদার্থবিজ্ঞান অল্পসংখ্যক কয়েকটি প্রত্যয় (concept) ও নীতির দ্বারা সংগ্রথিত ও সংগঠিত হয়ে জ্যামিতির মতন এক অখণ্ড ঐক্যরূপে

প্রতীয়মান হবে, এবং প্রমাণ ক'রে দেবে যে বিশুদ্ধতম তত্ত্বজ্ঞান ও ফলিত বিজ্ঞান নৈয়ায়িক পৌর্ব্বাপর্য্যের অতি নিবিড় সংযোগে আবদ্ধ। জীববিদ্যা যদিচ তখনও জড় থেকে জীবের উৎপত্তি প্রতিপাদনে সক্ষম হয় নি, তবু নগণ্য কীটাণু থেকে শ্রেষ্ঠ-গঠন মনুষ্যদেহ পর্য্যন্ত এক অবিচ্ছিন্ন সূত্রের সন্ধান সম্পূর্ণ না হলেও আংশিক প্রমাণ পেয়েছিল বই কি। আদমের স্বর্গচ্যুতির উপাখ্যানকে তখন আদিম ও অজ্ঞ পূর্ব্বপুরুষদের আত্মশ্লাঘা ব'লে উড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হল, এবং বানরের সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপন ক'রে মানুষ একাধারে বিবর্ত্তনের গৌরব ও আভিজাত্য হারাণোর লাঞ্ছনা অনুভব করল। মানস-বিজ্ঞানের বয়স তখন বেশী নয়, কিন্তু বাল্যসুলভ কুণ্ঠার কোনোই লক্ষণ দেখা গেল না মনোরাজ্যের অন্ধকার অলিগলিতে তার নিঃসঙ্কোচ পরিভ্রমণে। মানুষের মন হেন অনধিগম্য অপার রহস্যের কক্ষেও ওয়েবর, ফেক্‌নর প্রভৃতি তাঁদের মাপজোকের জারিজুরি নিয়ে হাজির। সন্দেহ রইল না যে এক দিন না এক দিন এই চিরচঞ্চল চিরপলাতক অসূর্য্যম্পশ্যটিকে পরীক্ষাবৃত্ত বিজ্ঞানের সুদৃঢ় বন্ধনে বেঁধে ভাবীকথনের বশে আনা যাবেই যাবে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির এই সার্ব্বত্রিক সম্প্রসারণ ও সুষ্ঠু সংগঠনের ফলে উনিশ শতকের বৈজ্ঞানিক মনীষীরা মনে করলেন, এবং যথার্থই মনে করলেন, যে বিজ্ঞান গগনস্পর্শী ও দিগন্তব্যাপী, যে বুদ্ধি মানুষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গৌরব, প্রকৃতির রহস্য উদ্‌ঘাটন ও প্রতিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য-সাধনের জন্যে বুদ্ধিই তার ব্রহ্মাস্ত্র।

বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান, বিশেষত পদার্থবিজ্ঞান, এ-অভ্রভেদী দাবীকে অনেকখানি খাটো করতে বাধ্য হয়েছে। এই শতকের প্রারম্ভেই শক্তিকণা-প্রত্যয়ের পরিগ্রহণ ও আপেক্ষিকতাবাদের প্রবর্ত্তনে ভূতবিদ্যার সারা রাজ্য জুড়ে এমন একটি যুগান্তরকারী অন্তর্বিপ্লব মাথা তুলে উঠেছে যে আজ ব্রহ্মাণ্ড-বিজয়ের মহাপ্রাণ অভীপ্সায় জলাঞ্জলি দেওয়া ছাড়া বিজ্ঞান-ধুরন্ধরদের গত্যন্তর নেই। বৈজ্ঞানিক নিয়মের যে-অমোঘ জাল ফেলে উনিশ শতক বিশ্বজগৎকে বাঁধতে চেয়েছিল, আজ দেখা গেল সে-জালের আধখানার কোনো অস্তিত্বই নেই আর বাকী আধখানার গ্রন্থি গেছে খুলে। ফীল্‌ড্‌ ফীজীক্স্‌-এর (field-physics) আইনগুলির নিত্যতা ও সার্ব্বত্রিকতা অবিসংবাদিত, কিন্তু

তার একমাত্র কারণ এই যে সেগুলি পুনরুক্তিময় (tautological)। এক ফুট যে বারো ইঞ্চির সমান এ-নিয়মটা সর্ব্বত্র ও সর্ব্বদা অব্যতিক্রান্ত, কিন্তু এতে আমাদের আভিধানিক মর্জ্জী ছাড়া বিশ্বের কোন গভীরতর রহস্যের উদ্‌ঘাটন হয় না এবং আপেক্ষিকতাবাদের মূল নিয়মগুলি অনেকটা এই গোছের। পূর্ব্বে আমরা বহির্জগতের নীতি ভেবে যার আবিষ্কারে গর্ব্ব বোধ করছিলাম আজ দেখি সে শুধু আমাদের শব্দ-প্রয়োগের রীতি! পক্ষান্তরে Quantum-physics-এর নিয়মগুলি প্রকৃতির নিজস্ব রূপ ধরতে পেরেছে বলে বোধ হয়, কিন্তু তারা সার্ব্বিক (universal) নয়, সামষ্টিক (statistical) মাত্র। ব্যক্তির ক্ষেত্রে তারা কেবল সম্ভাব্যতা নির্দ্দেশ করতে পারে, নিশ্চিতের সন্ধান দিতে অক্ষম। গড়্‌পড়্‌তা হিসাবেই তাদের কাটি্‌তি। পদার্থবিজ্ঞানের অভাবনীয় সাম্প্রতিক উন্নতি আরএক দিক থেকে আপন পদলাঘবের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অতি উৎকৃষ্ট ও অশেষ শক্তিশালী গাণিতিক টেক্‌নিক্ আজ তার আয়ত্তে, কিন্তু এই টেক্‌নিকের আওতায় তাকে সাঙ্কেতিকের এমন এক রঙীন চশ্‌মা পরতে হয়েছে যে বৈজ্ঞানিকরা মান্‌তে বাধ্য হলেন বিশ্বপ্রকৃতির অনেকখানি সে-চশ্‌মার কাচ ভেদ ক'রে এসে পৌঁছুতে পারে না, ধরা দেয় কেবল গোটাকতক pointer reading। এই pointer-readingগুলিকে সাজিয়ে গুজিয়ে এর চারিদিকে একটি সুসমঞ্জস তত্ত্বশৃঙ্খলা রচনা ক'রে বহির্জগতের যে-অসম্পূর্ণ ছবি তাঁরা আঁকতে পারেন তাই তাঁদের শক্তির পরাকাষ্ঠা। সাম্প্রতিক পদার্থ বিজ্ঞানের এই শালীনতার সুযোগ পেয়ে অধ্যাপক এডিংটন অপরোক্ষানুভূতির দাবী এনে খাড়া করেছেন। স্বপক্ষ-সমর্থন যখন সম্ভব হয় না তখন বিপক্ষ-বিনাশের দিকে সহজেই মন যায়, ন্যায়শাস্ত্র কিন্তু এ-সহজাত প্রবৃত্তির পৃষ্ঠপোষণে অপারগ। বুদ্ধি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মার্ফতে জগতের মাত্র একটা দিক অবধারণে সক্ষম, এ-হেন অকাট্য প্রমাণবলেই কি মানতে হবে যে অপরোক্ষানুভূতি দ্বারা আমরা সমগ্র বিশ্বের পরিপূর্ণ পরিচয় পাব? বৈজ্ঞানিক সৃষ্টিতত্ত্বের শেষকথা বলতে পারেন না বলেই কি যোগী তা পারবেন? হয়ত পারবেন, কিন্তু এটা নিশ্চিত যে বৈজ্ঞানিকের অযোগ্যতাতেই যোগীর যোগ্যতা প্রমাণ হয় না। অপরোক্ষানুভূতির তরফে ওকালতি করতে

গিয়ে পদার্থবিজ্ঞানের বর্ত্তমান সঙ্কটের কথা তোলা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক, বৈজ্ঞানিকদের সম্মত স্বীকারোক্তির দোহাই পাড়া সম্পূর্ণ নিরর্থক। উনিশ শতাব্দীর বিজ্ঞান চূড়ান্ত আত্মম্ভরিতায় এক বুদ্ধি ছাড়া মানুষের আর সমস্ত বৃত্তিকে অস্বীকার করেছিল বলেই যে বিশ শতাব্দীর উল্‌টো রথের দিনে আমরা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আস্থা হারিয়ে যৌগিক পদ্ধতিকে বিনা বাক্যে মেনে নেব, এই আদিখ্যেতারই বা কী মানে হয়?

এডিংটন, প্লাঙ্ক্‌ ও অন্যান্য বিজ্ঞান-পন্থী তত্ত্বজ্ঞানীরা বুদ্ধির পরিসরকে সংক্ষিপ্ত ক'রে তার দাবীকে সংযত ক'রেই ক্ষান্ত হয়েছেন; তাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করবার দুঃসাহস দার্শনিকদের মধ্যেই দেখা যায়। বের্গ্‌সঁ, ব্র্যাড্‌লি, শঙ্কর প্রভৃতির কাছে অনুভূতিই ব্রহ্মবিদ্যার নান্য পন্থা। বুদ্ধি জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য মোটামোটি তথ্য সংগ্রহ ক'রে কাজ চালিয়ে নিতে পারে বটে, কিন্তু সূক্ষ্ম তত্ত্বদর্শনের বেলা তার লম্ফঝম্ফ শুধু অক্ষমের আস্ফালন।

বের্গ্‌সঁ যদিও দার্শনিকরূপেই সর্ব্বসাধারণের কাছে প্রসিদ্ধ, প্রকৃতপক্ষে তাঁর দর্শনচর্চ্চা সাহিত্যসাধনার ছদ্মবেশমাত্র। তাঁর চিন্তাশক্তির সূক্ষ্মতা ও তথ্যসঞ্চয়ের সমৃদ্ধি অস্বীকার করবার জো নেই, তবুও মনে হয় যেন তাঁর বিদ্যাবত্তার প্রখর প্রদীপ্তিকেও ছাপিয়ে গেছে সমুজ্জ্বল কাব্যপ্রতিভা ও উদ্দীপনাপূর্ণ রচনাভঙ্গী। তাই বের্গ্‌সঁর লেখা বই হাতে নিলে বিচারবুদ্ধি আড়ষ্ট হয়ে যায়, পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করতে সঙ্কোচ বোধ হয়, মনে হয় যেন এখানে সে সমস্ত অবান্তর, এমন-কি অশ্লীল। তাই যখন পড়ি বিশ্বজগৎ এক অখণ্ড অনাদ্যন্ত প্রাণধারার নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ, তারি উদ্দাম উতরোল গতির প্রতিহত প্রত্যাবর্ত্তনে বস্তুপিণ্ডের সৃষ্টি, জড়প্রকৃতি প্রাণের ঊর্দ্ধগামী আতশ্‌বাজীর দাহশেষে ফিরে আশা ভস্মরাশি মাত্র, তখন এমনতর আষাঢ়ে কল্পনা-সমাবেশ সম্বন্ধে হেতু-জিজ্ঞাসা মনের কোণে জেগে ওঠে বটে, কিন্তু গ্রন্থকারের ঐন্দ্রজালিক করস্পর্শ আবার তাকে ঘুম পাড়িয়ে দিতে মুহূর্ত্তেক বিলম্ব করে না।

জীবজগতের প্রভূত তথ্য ঘেঁটে বের্গ্‌সঁ দেখিয়েছেন যে এক অখণ্ড প্রাণপ্রবাহ ত্রিধা বিভক্ত হয়ে জড় প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রামে আত্মরক্ষার জন্যে

তিনটি বিভিন্ন প্রকরণ উদ্ভাবন করেছে,—উদ্ভিদের অচেতন সংবেদনশীলতা, কীটপতঙ্গের উপজ্ঞা (instinct) ও স্তন্যপায়ী জন্তুর বুদ্ধি। বুদ্ধিও যখন প্রতিকূল পরিবেষ্টনের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে জীবের দেহরক্ষা ও বংশরক্ষার উপায় মাত্র, সেকালে তার ঘাড়ে প্রয়োজনাতিরিক্ত তত্ত্বজ্ঞানের অতিজান্তব বিলাসিতা চাপানো অসঙ্গত ও অন্যায়। এই অন্যায়ের জন্যেই দর্শনে বিজ্ঞানে এত যুগের পর যুগ এত সমস্যা এত বিভ্রাট পুঞ্জীকৃত হচ্ছে। বুদ্ধির প্রকৃত ধর্ম্ম জৈবিক ক্রিয়াসম্পাদন, প্রকৃতির রহস্য-উদ্‌ঘাটন তার অধিকার-বহির্ভূত। সেজন্যে একমাত্র সমুপযুক্ত বৃত্তি, বের্গ্‌সঁর মতে, ইন্‌টুইশন বা অপরোক্ষানুভূতি। অপরোক্ষানুভূতির সংজ্ঞা একস্থলে দেওয়া হয়েছে "নিঃস্বার্থ ও আত্মচেতন উপজ্ঞা"। এ-সংজ্ঞা অনুসারে ত কীটপতঙ্গের মধ্যেই অপরোক্ষানুভূতির অভিব্যক্তি অধিকতর সম্ভব ও স্বাভাবিক, কারণ তারাই হল উপজ্ঞা-বিশিষ্ট জীব। বের্গ্‌সঁ কিন্তু বুদ্ধি-বিশিষ্ট মানুষকেই এই বৃত্তির অধিকারী ঠাউরেছেন। ভাল কথা, তবে কিনা বিবর্ত্তন-তত্ত্ব অনুসারে কেবল বুদ্ধি নয়, মানুষের (তথা জীবমাত্রের) সবকটা বৃত্তিই প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের ফলে উদ্‌ভূত। বুদ্ধি যদি জীবিকানির্ব্বাহার্থে উৎপন্ন ব'লে তত্ত্বজ্ঞানে অক্ষম হয় তাহলে অপরোক্ষানুভূতিরও ত সেই দশা, তার বেলায় ব্রহ্মবিদ্যা সম্ভব হ'ল কেমন ক'রে? আরও বিচিত্র এই যে বের্গ্‌সঁ যে-বিবর্ত্তনবাদের শরণাপন্ন হয়ে বুদ্ধিকে গাল পাড়ছেন, বলছেন যে সে উদ্বর্ত্তনের যন্ত্রমাত্র, সে-বিবর্ত্তনবাদও ত সেই বুদ্ধিরই আবিষ্কার,—নিরাসক্ত, নিঃস্বার্থ অনুসন্ধিৎসা-প্রসূত তত্ত্ব, তড়িঘড়ি কাজ চালাবার প্রত্যয়মাত্র নয়। বুদ্ধি যদি তত্ত্বজ্ঞানের আসরে অপাংক্তেয়ই হয় তবে ত বিবর্ত্তনবাদকেও অস্পৃশ্য জ্ঞান করতে হয়, এবং পূর্ব্বোক্ত আপত্তিটা তাহলে দাঁড়ায় কিসের জোরে?

বের্গ্‌সঁর দ্বিতীয় আপত্তি তাঁর ক্ষণিকবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁর মতে জগৎপ্রপঞ্চের আপাত স্থিরতায় নিহিত রয়েছে নিরন্তর নিরবচ্ছেদ পরিবর্ত্তন-ধারা। বুদ্ধি কিন্তু জড়প্রকৃতির সঙ্গে ব্যবহারার্থে গঠিত ব'লে জড়তা-প্রাপ্ত, গতি-বিরহিত, প্রবহমাণ সত্তার পরিচয়-গ্রহণে অপারগ। বৌদ্ধিক জ্ঞানের ভিত্তিই হচ্ছে পুনরাবৃত্তি, অনিত্যের মধ্যে নিত্যের সন্ধান; অনন্ত নতুনের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের বিধিবদ্ধ পদ্ধতি কোনো কূলকিনারা পায় না।

না। বিজ্ঞান খোঁজে সুপরিচিতকে, পূর্ব্বঘটিতকে, বাদ দেয় যেটা তার বদ্ধ ধারণার বশ্যতা কবুল করতে চায় না। চলমানকে অচল ক'রে বোঝাই বিজ্ঞানের রীতি। কালের প্রত্যয় পদার্থবিজ্ঞানের প্রত্যয়সমূহের মধ্যে অতিশয় গুরুতর, কিন্তু বের্গ্‌সঁর বিবেচনায় বৈজ্ঞানিক কাল সত্যিকার গতিচঞ্চল কালের জ্যামিতিক ছায়ামাত্র। প্রকৃত কালের সর্ব্বপ্রধান বিশেষণ তার একতর্ফা গতি, ভূত থেকে ভবিষ্যতের দিকে। বৈজ্ঞানিকরা কালের এই বৈশিষ্টকে নির্ম্মমভাবে ছেঁটে দিয়েছেন। তাঁদের কালগত বিন্যাস (order) দেশগত বিন্যাসেরই অবিকল প্রতিচ্ছবি, কাজেই সম্পূর্ণভাবে স্থিতিমূলক ও পরাবর্ত্তনীয় (reversible)। ডাইনে বাঁয়ের তফাৎ যেমন বিষয়জাত নয়, দর্শকসাপেক্ষ, ভূতভবিষ্যতের প্রভেদও তেমনি দৃষ্টিকোণের উপর নির্ভরশীল। বিজ্ঞান-পরিকল্পিত কাল এক অনন্ত-প্রসারিত বর্ত্তমান, দর্শকের আপতিক উপস্থিতি যার মধ্যে একটি কৃত্রিম রেখা দ্বারা ভূত ভবিষ্যতের বিভাগ স্থাপনা করে। বহির্জ্জগতের ঘটনাপরম্পরায় এমন কোনো অব্যর্থ চিহ্ন বৈজ্ঞানিকের জানা নেই যাতে ক'রে ঘটিত থেকে ঘটিতব্যকে অভ্রান্তভাবে পৃথক করা যেতে পারে।

বিশ্বের সার্ব্বত্রিক অনিত্যতার জ্ঞান যে অপরোক্ষানুভূতিলব্ধ, এমন দাবী স্বয়ং বের্গ্‌সঁও করেন নি। অন্তর্দর্শনজাত আত্মজ্ঞানের মধ্যে আমরা স্থিতি বা পুনরাবৃত্তির চিহ্নমাত্র পাই না, এই কথাই তিনি বারম্বার ঘোষণা করেছেন। কিন্তু মানুষের মন সর্ব্বক্ষণ প্রবহমাণ বলেই যে টেবিল চেয়ার ইঁট-পাথরও প্রতিমুহূর্ত্তে নতুন থেকে নতুনতর হবে, এমন কী কথা আছে? প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়জ্ঞানেও এর সমর্থন পাওয়া যায় না। জান্‌লা দিয়ে দেখতে পাচ্ছি সাদা সাদা মেঘের টুক্‌রো ছুটে চলেছে, তাদের আকৃতিও অবিরাম বদলাচ্ছে, কিন্তু পটভূমিকায় যে-ঘননীল আকাশ সে ত নির্ব্বিকার, ঘণ্টার পর ঘণ্টা তার ত কোনো পরিবর্ত্তন নেই। বের্গ্‌সঁ বলবেন পরিবর্ত্তন সর্ব্বত্রই বিদ্যমান, তবে কোথাও তা আমাদের স্থূল দৃষ্টিতে ধরা দেয়, কোথাও ঘটে অলক্ষিতে। অলক্ষিতে যে ঘটে তার একমাত্র সাক্ষী সেই অবজ্ঞেয় অগ্রাহ্য বিজ্ঞান। ভূতবিদ্যার বিশ্বাস যে সামগ্রিকভাবে কোনো বস্তুর পরিবর্ত্তন লক্ষিত হোক আর নাই হোক,সে যে-কোটি কোটি ইলেক্‌ট্রনপ্রোটন সমাবেশে সংগঠিত

সেগুলি সর্ব্বদাই স্পন্দনরত। বৈজ্ঞানিক মতে কিন্তু পরিবর্ত্তনই সর্ব্বেসর্ব্বা নয়, ধ্রুবতার অস্তিত্বও আমরা স্বীকার করতে বাধ্য। ইলেক্ট্রনপ্রোটনের স্থান ও গতিমাত্রা সর্ব্বক্ষণ বদলায় কিন্তু তাদের বৈদ্যুতিক চার্জ্জ ও ম্যাস থাকে অক্ষুন্ন। বের্গ্‌সঁ অবশ্য কোথাও স্থিতির ক্ষীণতম ছায়াটুক মানতে রাজী নন। তবে ইলেক্‌ট্রনের ম্যাস সম্বন্ধে কোনা বিশিষ্ট যৌগিক উপলব্ধির অবর্ত্তমানে কেন যে তার নিত্য পরিবর্ত্তনশীলতাকে ধ্রুব বলে মেনে নিতে হবে তা বোঝা কঠিন। বিজ্ঞান গতিও মানে, স্থিতিও অস্বীকার করে না এবং দু'য়েরই অনুধাবন-যোগ্য পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছে। ক্যালকুলাস্‌ ত বিশেষ ভাবে পরিবর্ত্তনেরই ধর্ম্ম নিরূপণের উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত, তার অস্তিত্বের প্রতি দৃক্‌পাত না করে বের্গ্‌সঁ যে সমস্ত বিজ্ঞানকে জ্যামিতির ছায়ামাত্র ঠাউরেছেন, একে নিদারুণ অবিচার ছাড়া আর কি বলা যায়? পদার্থ-বিজ্ঞানের কালপ্রত্যয়ের অবাস্তবতা সম্বন্ধেও তাঁর বক্তব্য নির্ভুল নয়। সত্য বটে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে যখন ডিফ্‌রেন্‌শ্যাল্‌ ইকুয়েশন্‌ দিয়ে কোনো বস্তুর পরিবর্ত্তন বিবৃত করা হয় তখন তাতে তার ভূত অবস্থা থেকে ভাবী অবস্থা নির্দ্ধারণ করা যেমন সম্ভব, তার ভাবী অবস্থা থেকে ভূত অবস্থা নির্দ্ধারণ করাও তেমনি সহজসাধ্য, অর্থাৎ কাল সেখানে পূরোপূরি পরাবর্ত্তনীয়। কিন্তু পদার্থবিজ্ঞানের মধ্যে এমন একটি প্রত্যয় রয়েছে যার সাহায্যে ভূত ও ভবিষ্যৎ অমোঘভাবে চিহ্নিত করা যায়। সে-প্রত্যয়টি হল entropy। Entropyর বিশদ ব্যাখ্যা এখানে সম্ভব নয়, তবে মোটামুটি বলা যেতে পারে entropyর তারতম্য শৃঙ্খলার হ্রাসবৃদ্ধি ব্যক্ত করে। Thermodynamicsএর প্রখ্যাত নিয়ম অনুসারে যে-কেনো প্রাকৃতিক ঘটনার শেষ পরিণাম entropyর বৃদ্ধি। এই নিয়মের উপর নির্ভর ক'রে বলা যেতে পারে যে কোনো বস্তুর ভিন্নকালীন দু'টা অবস্থার মধ্যে যেটা মোটের উপর অধিকতর বিশৃঙ্খল সেটা পরবর্ত্তী, এবং অন্যটা পূর্ব্ববর্ত্তী। উক্ত বিশৃঙ্খলা ততটা বাহ্যিক বা আকৃতিগত নয় যতটা বস্তুর গঠনকারী অণুপরমাণুর স্থানিক ও গতিমাত্রিক বণ্টন দ্বারা নির্ণীত।

বের্গ্‌সঁর তৃতীয় অভিযোগের লক্ষ্য বৌদ্ধিক জ্ঞানের বাহ্যতা। বুদ্ধি যতই তন্নতন্নরূপে পর্য্যবেক্ষণ করুক জ্ঞেয় বিষয়কে, যতই বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ

থেকে তার বিভিন্নরূপ নির্ণয় করুক, তবু সে তার মর্ম্মস্থলে প্রবেশ করতে অক্ষম, তার অন্তরতম সত্তার সাক্ষাৎলাভে অপারগ। পক্ষান্তরে অপরোক্ষানুভূতি অনুপ্রবিষ্ট হয়ে যায় বিষয়ের মর্ম্মমাঝে, সমস্ত অন্তরাল অবলুপ্ত ক'রে দেয়, তখন আর ভেদ থাকে না বিষয়ের সঙ্গে বিষয়ীর। এই হচ্ছে জ্ঞানের চরম পরিণতি, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের ব্যবধান-বিরহিত সম্মিলন, দ্বৈত-বিলুপ্ত সাযুজ্য। এমনতর বাক্যচ্ছটার মধ্যে বের্গ্‌সঁর আসল বক্তব্যটা বোঝা কঠিন হয়ে উঠেছে। গরুর গাছের সঙ্গে ঐক্যানুভূতিতে বিলীন হয়ে যাওয়ার যে কী অর্থ তা অন্তত আমার স্বল্প-পরিসর ধারণার অতীত। শঙ্কর অবশ্য এমন কথা বললেও বলতে পারেন, কেন না তাঁর মতে সব কিছুর পরম সত্তা হচ্ছে আত্মা। বাহ্য বস্তুর সঙ্গে ঐক্যানুভূতির অর্থ হবে তার নামরূপ-মূলক মিথ্যাজ্ঞানের মায়াবরণ অপসারিত ক'রে তার মধ্যে আপন আত্মাকেই উপলব্ধি করা। বের্গ্‌সঁ কিন্তু বিষয়তান্ত্রিক (objectivist), তাঁর পক্ষে কেমন ক'রে ভাবা সম্ভব হ'ল যে অপরোক্ষানুভূতির দ্রাবণে "আমি" "না-আমি"তে বিলীন হয়ে যাবে ?

ব্র্যাড্‌লির মতে বৌদ্ধিক পদ্ধতির মূলেই এমন অনিবার্য্য গলদ রয়েছে যার অভিসম্পাতে সমস্ত বুদ্ধিলব্ধ জ্ঞান দিক্‌ভ্রান্ত ও লক্ষ্যভ্রষ্ট। বৌদ্ধিক জ্ঞান সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণ, দুই বিপরীত প্রক্রিয়ার সন্নিপাতে সংগঠিত ; এবং সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণ সম্বন্ধ-ব্যতীত সম্ভব নয়। আমাদের চিন্তামাত্রই অগ্রসর হয় সম্বন্ধের সূত্র ধ'রে। সে-সূত্র দিয়ে বুদ্ধি দুই বা ততোধিক বিষয়কে সংহত করে একটি সমগ্রতায়, অথবা একটি সমগ্রকে বিভিন্ন অঙ্গে পরিণত ক'রেও তাদের প্রাক্তন সংযোগ রক্ষা করে। ব্র্যাড্‌লি বুদ্ধির মূলে কুঠারাঘাত করেছেন সূক্ষ্ম নৈয়ায়িক তর্কের দ্বারা প্রমাণ ক'রে যে সম্বন্ধ-প্রত্যয় আগাগোড়া অবোধ্য ও স্বতোবিরুদ্ধ। "মুখের উপরে ঘোমটা রয়েছে"—এই তথ্যজ্ঞানের কথাই ধরা যাক। তথ্যটাকে বিশ্লেষণ করা গেল "মুখ" ও "ঘোমটা" এই অঙ্গদ্বয়ে, এবং তাদের সংযোগসূত্র হ'ল "উপরত্ব"-সম্বন্ধ, "রয়েছে" ক্রিয়াপদ যার অস্তিত্ব নির্দ্দিষ্ট করছে। সম্বন্ধ-বিশ্লেষণের ফলে আমরা পেলাম মোটের উপর তিনখানা অঙ্গ—মুখ, ঘোমটা আর উপরত্ব। এদের মধ্যে সংযোগ-সূত্র কী ? উপরত্ব দ্বারা মুখ ও

ঘোমটাকে পরস্পর-যুক্ত করতে হ'লে প্রথমে উপরত্বের সঙ্গে মুখের এবং ঘোমটার যোগসাধন আবশ্যক। উক্ত তথ্যের সঙ্গে এই তিনখানা অঙ্গের সমীকরণ করা যায় না, কারণ এরা হ'ল বিচ্ছিন্ন বিযুক্ত খণ্ড-সমষ্টি আর তথ্যটা একখানা অখণ্ড সমগ্রতা। অথচ সম্বন্ধ-নিষ্ঠ বুদ্ধি যখনই তাকে বুঝতে চায় তখনই এই বিচ্ছিন্ন অঙ্গ-সমূহে তাকে বিশ্লেষণ করতে সে বাধ্য। এমন বিভ্রাটে প'ড়ে বুদ্ধি বিশ্লিষ্ট অঙ্গগুলির বিচ্ছিন্নতা ঘোচাবার জন্যে তাদের সংযুক্ত করে দুটি নতুন সম্বন্ধ স্থাপন ক'রে। অর্থাৎ উপরত্বের এক দিকে মুখের সঙ্গে এবং অপর দিকে ঘোমটার সঙ্গে দুটা অতিরিক্ত সম্বন্ধ ক ও খ আরোপিত হয়। গলদ কিন্তু এখনো মিটতে চায় না যেহেতু পূর্ব্বে মুখ, ঘোমটা ও উপরত্ব নিয়ে ঐক্য-রচনার যে-সমস্যা সৃষ্টি হয়েছিল, এখন মুখ, উপরত্ব ও ক, এবং ঘোমটা, উপরত্ব ও খ নিয়ে অবিকল সেই সমস্যা আবির্ভূত হয়। এর নিষ্পত্তি করতে গিয়ে মুখ ও কয়ের মাঝখানে আরেকটা সম্বন্ধ ঘ বসিয়ে কোনো লাভ নেই, সমস্যাটা নাছোড়বন্দা হয়ে মাথা তুলেই থাকবে। সম্বন্ধের এই গরমিল নির্দ্দেশ ক'রে ব্র্যাড্‌লি দেখিয়েছেন যে বুদ্ধির জ্ঞানার্জ্জনকারী আর যতগুলি প্রত্যয় আছে (যথা দেশ, কাল, কার্য্যকারণ ইত্যাদি) তাদের প্রত্যেকটির মধ্যে সম্বন্ধ-প্রত্যয় নিহিত রয়েছে। কাজেকাজেই সম্বন্ধের আদিরোগ তাদের মধ্যেও সংক্রামিত। বুদ্ধির সবকটা মৌল প্রত্যয় যদি এমনতর বিপর্য্যস্ত ও অবোধ্য হয়ে দাঁড়ায় তাহলে সত্তাবোধের আশা তার পক্ষে নিতান্তই দুরাশা।

ব্র্যাড্‌লির এই প্রলয়ঙ্কর ন্যায়ের মূলে দেখা যায় শব্দ ও শব্দার্থের গোলযোগ। সমস্ত বাদবিতণ্ডার সৃষ্টি সম্বন্ধকেও সম্বন্ধীর মত স্বতন্ত্র ও স্বাবলম্বী পদারোপণে। মুখ, ঘোমটা ও উপরত্ব এই তিনটা স্বতন্ত্র শব্দ রয়েছে বলেই যে তিনখানা প্রত্যয়কেও বিচ্ছিন্ন হতে হবে, এমন কোনো কথা নেই। প্রকৃতপক্ষে উপরত্ব শব্দটাই বিচ্ছিন্ন, উপরত্ব প্রত্যয় আগা-গোড়াই সম্বন্ধীদ্বয়ের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে, সম্বন্ধের ধর্ম্মই তাই, শূন্যে দোদুল্যমান হয়ে সে থাকতে পারে না। কাজেই তাকে মুখ ও ঘোমটার সঙ্গে আবার নতুন ক'রে যোগ করবার জন্যে দুটা অতিরিক্ত সম্বন্ধ উদ্‌ভাবনের কোনো

প্রয়োজন নেই। চিন্তার সঙ্গে ভাষার আনুরূপ্য অবশ্য-স্বীকার্য্য, কিন্তু ভাষা চিন্তার বাহকমাত্র, তার হুবহু প্রতিচ্ছবি নয়। বাক্য যেখানে বিভিন্ন ও বিচ্ছিন্ন শব্দসমষ্টিতে বিভক্ত, সেখানে বাক্যার্থও পরস্পরযোগশূন্য খণ্ডসমূহের কৃত্রিম সন্নিপাতে গঠিত, এমন অনুমানের কোনো ভিত্তি নেই।

ইণ্টুইশন-পন্থীরা বুদ্ধিলব্ধ জ্ঞানকে একদেশদর্শী, আংশিক ও অসম্পূর্ণ আখ্যা দিয়ে অবজ্ঞা প্রকাশ ক'রে থাকেন। পক্ষান্তরে, তাঁদের বিশ্বাস, অপরোক্ষানুভূতি সম্যক ও সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ, অনুভূত বিষয়ের কোনো পক্ষই তার সর্ব্বগ্রাহী দৃষ্টি এড়ায় না, বৌদ্ধিক জ্ঞান তার অন্তর্ভুক্ত অঙ্গমাত্র। অপরোক্ষানুভূতির মহিমা কীর্ত্তনে যাঁরা পঞ্চমুখ, বাক্যের বহর ছেড়ে পরীক্ষার আসরে নামতে তাদের এত কুণ্ঠা কেন? যদি কতকগুলো অজ্ঞাত দ্রব্যের সংমিশ্রিত গুঁড়ো দেখামাত্র অনুভবজাত সম্যক্‌দর্শনের ফলে তাঁরা ব'লে দিতে পারেন এদের বুন্‌সেন-শিখায় বিকীর্ণ বর্ণচ্ছটার প্রত্যেকটি রেখার সঠিক তরঙ্গান্তর-পরিমাপ কী কী, তা হলে তাঁদের উত্তুঙ্গ দাবী সম্বন্ধে সন্দেহভঞ্জন অন্তত বৈজ্ঞানিক-মহলে অবশ্যম্ভাবী। অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণণ যোগজ প্রত্যক্ষের সঙ্গে কাব্যানুভূতির তুলনা করেছেন এবং কাব্যানুভূতির মধ্যেও সম্যক্‌জ্ঞানের উপস্থিতি কল্পনা করেছেন। কবি যখন কোনো বিষয়ের অভিঘাতে তন্ময় হয়ে যায় তখন সে শুধু তার বাহ্য রূপ নয়, তার অন্তরতম পরিপূর্ণ সত্তা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। এই পরিপূর্ণ সত্তার মধ্যে তার বিজ্ঞান-লভ্য সত্তাও নিশ্চয়ই অন্তর্ভুক্ত, নচেৎ তাকে পরিপূর্ণ বলার কোনো অর্থ হয় না। আমি কবি নই, কিন্তু শারদ সন্ধ্যার ক্ষান্তবর্ষণ আকাশে ইন্দ্রধনুর আবির্ভাবে যে কালে ভদ্রে কাব্যানুভূতির উদয় হয় নি, এমন কথা বললে সত্যের অপলাপ হবে। তবুও লজ্জার সঙ্গে স্বীকার করতে হচ্ছে যে অনুভূতির উদ্বেলতায় সেই ধনুগঠনকারী জলবিন্দুর ব্যাস-দৈর্ঘ্য সম্বন্ধে স্থূলতম ধারণাও আমার ভোঁতা মনে কোনো কালে জাগে নি। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের ন্যায় প্রকৃত কবির কাছেই উপরি-উক্ত সম্যক্‌জ্ঞান আমরা প্রত্যাশা করতে পারি। প্রত্যাশা করতে পারি তিনি যখন ভূমার সঙ্গে অভেদাত্মা হয়ে অনুভব করেছিলেন :

নারিকেলের ডালের আগে
দুপুরবেলা কাঁপন লাগে,
ইসারা তারি লাগিত মোর প্রাণে
বিচিত্রা, হে বিচিত্রা।

তখন সে কম্পন-মর্ম্মর-ধ্বনির তরঙ্গান্তর-পরিমাপও নির্ভুলভাবে তাঁর দিব্য-জ্ঞানপটে প্রতিভাত হয়েছিল।

অপরোক্ষানুভূতিলব্ধ সত্য যে একান্ত ব্যক্তিগত, তার অসীম ঐশ্বর্য্যের ভার বহন করা যে ক্ষীণবল মানুষী ভাষার সাধ্যাতীত,—এ-ধরণের কথা অতীন্দ্রিয়বাদীরা চিরকাল ব'লে এসেছেন। অথচ কী প্রাচ্যে কী পাশ্চাত্যে, মরমী সাহিত্যের পরিমাণ অন্য কোনো সাহিত্যের তুলনায় হেয় নয়। আসলে কথা বলতে তাঁরাও কিছু কসুর করেন না, তবে গরমিল যখন অনিবার্য্য, বাক্যের সঙ্গে বাক্যের অসঙ্গতি যখন সুপ্রত্যক্ষ, অর্থ যখন বিলুপ্তপ্রায়,—তখনই তাঁরা বচনাতীতের বর্ম্ম ধারণ করেন আত্মরক্ষার শেষ চেষ্টায়। শত্রুপক্ষ অন্তত এমন সন্দেহ না ক'রে পারে না। অনির্ব্বচনীয়তার মন্ত্রবলে ইতর জনের মুখ বন্ধ করা হয়ত সম্ভব, কিন্তু বচনাতীত সত্য আদৌ সত্যের দাবী করতে পারে কিনা সে-কথাও ভেবে দেখা দরকার। সত্যের সংজ্ঞা-বধারণ নিয়ে তত্ত্বদর্শনে বিস্তর ও জটিল তর্কবিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে, তার পরিভাষা-বর্জ্জিত আলোচনা যদি বা সম্ভব হয়, এখানে তার স্থানাভাব। মোটামুটি যদি বলা যায় যে যে-বাক্যার্থ পূর্ব্ব-সঞ্চিত জ্ঞান ও প্রত্যাশিত অভিজ্ঞতার সঙ্গে সামঞ্জস্য-রক্ষায় সমর্থ তাই সত্য হিসাবে গ্রহণীয়, তাহলে বেশীর ভাগ লোকের আপত্তি হবে না বোধহয়। এ-সংজ্ঞার উপর কিন্তু অপরোক্ষানুভূতির সত্যতা প্রতিষ্ঠিত করা অসম্ভব। যা অস্পষ্ট, ভাষায় অপ্রকাশ্য, সাধারণের অনধিগম্য, সার্ব্বজনীন জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সঙ্গে তার সামঞ্জস্যের কথাই উঠতে পারে না। সত্যের প্রতিমান যদি সঙ্গতিই হয় তাহলে যা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত তাকে সম্পূর্ণ অলীক বলা ছাড়া উপায় নেই। তার পরিগ্রহণ একমাত্র অন্ধ বিশ্বাসের জোরেই সম্ভব। এই আশঙ্কার তাড়নেই বোধ হয় সম্প্রতি দু'জন ভারতবর্ষীয় অতীন্দ্রিয়বাদী, অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণণ ও ডাঃ ইক্‌বাল, অনির্ব্বচনীয়তার অতিমর্ত্ত্য মহিমা

প্রত্যাখ্যান ক'রে অনুভূতির সঙ্গে বুদ্ধির সমন্বয়-সম্পাদনে প্রবৃত্ত হয়েছেন। বিশুদ্ধ বিজ্ঞানকে তাঁরা বড় একটা আমলে আনেন নি, তার দৃষ্টিকে সাঙ্কেতিকতাবৃত ও বহুধাবিভক্ত ব'লে অবজ্ঞা করেছেন। দর্শন ও দর্শন-ঘেঁসা বিজ্ঞানের সঙ্গেই তাঁদের যত বোঝাপড়ার আগ্রহ। রাধাকৃষ্ণণ ব্র্যাড্‌লি-মেশা শঙ্কর-মতবাদকে দর্শনের চূড়ান্ত জ্ঞান করেন, এবং ইক্‌বাল বরমাল্য দান করেছেন হেগেলীয়ভাবে ব্যাখ্যাত বের্গ্‌সঁ-মতবাদকে। পক্ষপাতের এ-দ্বৈধ সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। দর্শন ও বিজ্ঞানের স্বরূপ কালের সঙ্গে সত্যতার গতির সঙ্গে পরিবর্ত্তনশীল ত বটেই, বিপদ এই যে কোনো এক কালেও তার সিদ্ধান্ত নির্দ্বন্দ্ব নয়, তার শ্রেষ্ঠ ও স্বীকার্য্য স্বরূপ কী তা সর্ব্ববাদি-সম্মত নয়। জ্ঞানমার্গের সঙ্গে সমন্বয়সূত্র-যোগে যে আপন সত্যতা স্থাপনে ইচ্ছুক, বাদবিসংবাদের মধ্যে কালপ্রবাহের অনিত্যতার মধ্যে ঝাঁপ তাকে দিতেই হবে। অপরোক্ষানুভূতি কিন্তু দাবী করে ঐশিক অভ্রান্তি, সর্ব্ব-দেশকাল-নিরপেক্ষতা, স্বতঃসিদ্ধির নির্ব্যূঢ়তা। বুদ্ধিলব্ধ সত্য তৎকালীন ও মাত্রাবিশিষ্ট, তার সঙ্গে সামঞ্জস্য-সাধনের উপর অনুভূতিলব্ধ সনাতন চরম সত্যের ভিত্তি-স্থাপনা হচ্ছে সৈকতভূমির বালুকারাশির উপর দুর্গ-রচনা।

আবু সয়ীদ আইয়ুব
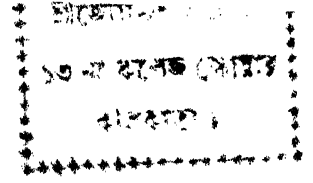
গোষ্ঠী-বিবাহ

গোষ্ঠী-গোত্র-পরিবার-সমন্বিত বিভিন্ন মানব-সমাজ কোথা হইতে কিরূপে উদ্ভূত হইল এই তথ্য জানিবার জন্য মানবের কৌতূহল নূতন নহে। মানব মনের এই স্বাভাবিক কৌতূহল নিবৃত্তি করিবার জন্য প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন যে ভগবান্ প্রথমে একটি দম্পতি সৃষ্টি করেন; তাহাদের সন্তান সন্ততি হইতেই মানব-সমাজের উৎপত্তি হইয়াছে। সেই দম্পতির নাম কোথাও কাশ্যপ-অদিতি, কোথাও আদম-ঈভ্। এক দম্পতির সন্তান হইতে কালক্রমে লক্ষ লক্ষ লোকের জন্ম হওয়া অসম্ভব নহে বলিয়াই শাস্ত্রে সমাজ-সৃষ্টির এইরূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এই ব্যাখ্যায় আরও বলা হয় যে সৃষ্টির প্রথম হইতেই নরনারী একনিষ্ঠ প্রেমে আবদ্ধ হইয়া স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সংসার পাতিয়াছে। স্বামী স্ত্রী পুত্র কন্যা লইয়া এক একটি পরিবার গঠিত হইয়াছে। পুত্রেরা বড় হইয়া বিবাহ করিয়া নিজ নিজ পরিবার স্থাপন করিয়াছে। এক দম্পতি হইতে উদ্ভূত পুরুষগণ, তাঁহাদের স্ত্রী ও অবিবাহিতা কন্যাদের লইয়া গোত্র গঠিত হইয়াছে। রক্তের সম্বন্ধে আবদ্ধ কয়েকটি গোত্র পরস্পর মিলিত হইয়া গোষ্ঠী স্থাপন করে এবং গোষ্ঠীগুলি সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া সমাজ রূপ ধারণ করে। এই ব্যাখ্যার মূল উপাদান হইতেছে নরনারীর একনিষ্ঠ প্রেম। একনিষ্ঠ প্রেম না থাকিলে "রক্তের পবিত্রতা" রক্ষা দুষ্কর হয়, সন্তানের পিতৃ-নির্ণয় দুরূহ হয়; এবং পুরুষ সন্তানাদির আহার জোগাইবার দায়িত্ব ঘাড়ে করিয়া সংসার করিতে চাহে না। যদি নর নারীর একনিষ্ঠ ভালবাসাই তাঁহাদের স্বাভাবিক প্রকৃতি হয় তাহা হইলে এই ব্যাখ্যা কতকটা মানিয়া লওয়া যাইতে পারে। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত এই ব্যাখ্যা প্রায় সকলেই নির্ব্বিচারে মানিয়া লইয়াছে। উনংবিশ শতাব্দীতে অধিরূঢ় প্রণালীতে সমাজতত্ত্বের বিচার আরম্ভ হইল। মর্গ্যান্ এবং বাচোফেন্ আদিমভাবাপন্ন বহু অসভ্যসমাজের সামাজিক আচার ব্যবহার আলোচনা করিয়া প্রমাণ করিলেন যে পরিবার সৃষ্টির বহু পূর্ব্বে গোষ্ঠীর অস্তিত্ব দেখা

যায়। নূতন নূতন তথ্য আবিষ্কার করিয়া ম্যাক্‌লেনান্‌, লুবেবাক্‌, র‍্যাটজেল, ফ্রেজার প্রভৃতি সমাজ-তত্ত্ববিদ্‌গণ উঁহাদের মত সমর্থন করিলেন এবং আরও দেখাইলেন যে আদিম মানব পরিবার-ভুক্ত ছিল না, একনিষ্ঠ প্রেমের ধার ধারিত না ও নারীকে গোষ্ঠীগত সম্পত্তি মনে করিয়া সকলেই উপগত হইত। তাঁহাদের গবেষণার ফলে পণ্ডিতগণ আদিমমানবের একনিষ্ট প্রেমকে নিছক কল্পনা বলিয়া উড়াইয়া দিতে লাগিলেন, অবাধ যৌন-মিলন হইতে সমাজের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া লোকে বিশ্বাস করিতে লাগিল। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দী শেষ হইতে না হইতেই এই মতের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইল। এ্যান্‌ড্রু ল্যাং, ওয়েষ্টারমার্ক, ফোরেল প্রভৃতি পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করিলেন যে আদিম যুগে নরনারী দাম্পত্য সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া বসবাস করিত। আমাদের দেশে ওয়েষ্টারমার্কের খুব খ্যাতি প্রতিপত্তি। বিবাহাদি সামাজিক প্রথার উৎপত্তি নির্ণয় বিষয়ে কোন কথা উঠিলেই তাঁহার "মানব বিবাহের ইতিহাস" তিন খণ্ড ও "নৈতিক আদর্শের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ" দুই খণ্ডের সাহায্য লইয়া পণ্ডিতগণ বাদপ্রতিবাদ চালাইয়া থাকেন। কিন্তু সম্প্রতি প্রতীচ্যের পণ্ডিতদের নিকট তাঁহার প্রতিপত্তি কিঞ্চিৎ হ্রাস পাইয়াছে। তিনি একনিষ্ঠ বিবাহই মানবের পক্ষে স্বাভাবিক—আদিম কাল হইতে আজ পর্য্যন্ত জগতের সর্ব্বত্র সকল জাতিই ঐরূপ বিবাহের আদর্শ অনুসরণ করিয়া আসিতেছে এই পাদ্‌রী-জন-সুলভ নীতিবাদ প্রমাণ করিবার জন্য সাধু এবং অসাধু নানাবিধ কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন। যাহা হউক, অবাধ-যৌনমিলনবাদী ও দাম্পত্যসম্বন্ধবাদীদের মধ্যে তুমুল বাদবিতণ্ডা উপস্থিত হইবার ফলে মানব-সমাজের উৎপত্তি বিষয়ে সত্য নির্ণয়ের সুবিধা হইয়াছে।

দাম্পত্য সম্বন্ধ হইতে সমাজ-জীবনের ক্রমবিকাশ দেখাইবার যাঁহারা পক্ষপাতী তাঁহারা বলেন যে মানবের নিকটতম জ্ঞাতি শিম্পাঞ্জি, গরিলা, ওরাংউটান্‌ প্রভৃতি জন্তুরা গোষ্ঠীগত জীবন যাপন করে না—পরিবারবদ্ধ হইয়া বসবাস করে। বুশম্যান্‌, ফুইগিয়ান্‌ প্রভৃতি যে সকল জাতি আজিও আদিম অবস্থায় রহিয়াছে, তাহারাও স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পরিবারে বাস করে—গোষ্ঠীভুক্ত হইয়া থাকে না। সুতরাং মানুষ প্রথম হইতেই পারিবারিক জীবন

যাপন করিতে আরম্ভ করে। গোষ্ঠীর মধ্যে থাকিয়া অবাধ যৌন-মিলনে রত হইবার দুষ্প্রবৃত্তি তাহার কোন দিনই দেখা যায় নাই। অপরাধ-প্রবণ-চিত্ত কতকগুলি লোকের মধ্যে সাধারণ নিয়মের ব্যতিরেক স্বরূপ এই ভাব দেখা যায়। মানুষ স্বভাবতঃ শান্তশিষ্ট ছেলে, পরস্ত্রীকে মাতৃবৎ দেখাই তাহার স্বভাব।

এই সমস্ত যুক্তির উত্তরে অবাধ-যৌন-মিলনবাদিগণ বলেন যে দাম্পত্য-সম্বন্ধ-বাদী ডারুইনও স্বীকার করিয়াছেন যে গরিলা বহু-বিবাহধর্ম্মী (The Descent of Man, vol. I. p 266 ; vol II, pp 361 ff)। ওয়েস্টারমার্ক সাহেব একখানি বাজারের মাসিক পত্রিকায় একজন জার্ম্মাণ লেখকের লেখা প্রবন্ধের উপর বিশ্বাস করিয়া গরিলাকে একনিষ্ঠ প্রেমিক বলিয়াছেন ও মানুষের স্বভাবও একনিষ্ঠ এই মতবাদ গড়িয়া তুলিয়াছেন। আধুনিক প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌গণ গরিলার আচার ব্যবহার ভাল করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে গরিলারা দশ পনরো জনে মিলিয়া দলে বাস করে ও দলস্থ পুরুষগণ স্ত্রীসমূহের সহিত যৌন ভাবে মিলিত হয়। শিম্পাঞ্জী-গণও দলবদ্ধ হইয়া বাস করে। এক এক পুরুষের সহিত তিনচারিটি স্ত্রী ও কতকগুলি শিশু থাকে। এক এক দলে প্রায় পঞ্চাশজন শিম্পাঞ্জীও দেখা যায়। ওরাংউটানগণ পঞ্চাশ-ষাট্‌জনে দল বাঁধিয়া বাস করে। কিন্তু যৌন-মিলনের সময় ছাড়া প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ও স্ত্রী বিভিন্ন দলে থাকে। তাহাদের যৌন ব্যবহারে একনিষ্ঠার কোন সাক্ষ্য পাওয়া যায় না।

বুশম্যান্ প্রভৃতি অসভ্য জাতিরাও নিরিবিলিতে পারিবারিক জীবন যাপন করে না। আহার্য্যের অপ্রাচুর্য্যবশতঃ তাহাদের গোষ্ঠী বা দল ছোট হয় বটে, কিন্তু স্বামী স্ত্রীর একনিষ্ঠ প্রেমের উপর ভিত্তি করিয়া তাহারা পরিবার গঠন করে না। বুশম্যানেরা একসঙ্গে সকল ভগিনীকে বিবাহ করে এবং একনিষ্ঠ বিবাহের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করে। ফুইগিয়ানদের মধ্যেও এক পুরুষের বহু স্ত্রী ও এক নারীর অনেক স্বামী দেখা যায়। সুতরাং পশু বা অসভ্য মানুষের আচার ব্যবহার দেখিয়া যাঁহারা মানুষকে স্বভাবতঃ একনিষ্ঠ স্থির করিয়াছিলেন তাঁহাদের গোড়াতেই গলদ হইয়াছিল।

আদিম মানব যে অবস্থা হইতে ক্রমবিকাশ লাভ করিয়া ক্রমশঃ সমাজ-বন্ধনে বদ্ধ হইয়াছে, সেই অবস্থার কথা কল্পনা করিলে প্রতীতি জন্মে যে গোষ্ঠীগত জীবন যাপন করা ছাড়া তাহার আর অন্য কোন উপায় ছিল না। আদিম অবস্থায় মানুষ পশুদেরই একজন। চারিদিকে ভীষণ অরণ্য, অরণ্যের মধ্যে ক্ষুদ্র বৃহৎ অতিকায় হিংস্র পশুগণ সর্ব্বদা অবাধে যাতায়াত করিতেছে; মানুষকে তাহাদের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিয়া আহার সংগ্রহ করিতে হয়। মানুষের পরিধানে তখন বস্ত্র নাই, হাতে অস্ত্র নাই; দন্ত নখরই তাহার একমাত্র সম্বল। অগ্নির ব্যবহারও তখন সে শিখে নাই। এরূপ অবস্থায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিবারে বিভক্ত হইলে, একজন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ এককভাবে নিজেরই আত্মরক্ষা করিতে পারে না, তা স্ত্রী ও শিশুদের রক্ষা করিবে কিরূপে? পূর্ণগর্ভা বা সদ্যোপ্রসূতা নারী শিশুরই ন্যায় অসহায়। যখন সে অসহায় নহে, তখনও কেবলমাত্র স্ত্রী পুরুষে মিলিয়া মাংসাশী পশুদের সহিত যুদ্ধ করিয়া আহারোপযোগী পশুহনন করিতে পারে না। পশুমাংসই মানবের তখন প্রধান খাদ্য, এবং সে খাদ্য সংগ্রহ করিবার জন্য দলের বা গোষ্ঠীর সমষ্টিগত চেষ্টার প্রয়োজন। সেই জন্য অন্যান্য স্তন্যপায়ী জন্তুদের ন্যায় মানুষও দলবদ্ধ হইয়া বসবাস ও বিচরণ করিত। মানুষের পক্ষে দলবদ্ধ হইয়া থাকার প্রয়োজন অন্যান্য জন্তু অপেক্ষা বেশী—কেননা মানবশিশুকে দীর্ঘকাল ধরিয়া লালনপালন করিতে হয়। একজন নর বা একটি দম্পতির দ্বারা সে সময়ে শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণ হওয়া অসম্ভব ছিল। সেইজন্য আদিম যুগে মানুষ গোষ্ঠীবদ্ধ হইয়াই বাস করিত সিদ্ধান্ত করিতে হয়।

সমাজতত্ত্বের একটি মূল সূত্র এই যে যে সকল জন্তু বা যে সকল জাতি যত অধিক পরিমাণে সঙ্ঘবদ্ধ ভাব দেখাইতে পারিয়াছে, জীবন-সংগ্রামে তাহারা তত অধিক সাফল্য লাভ করিয়াছে। যাহারা পরস্পরের সহিত মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিতে পারে নাই, তাহারা জীবন-সংগ্রামে হটিয়া গিয়াছে। মানুষের সভ্যতা ও সংস্কৃতির উৎকর্ষের প্রধান কারণ পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতা। মানুষ যদি সামাজিক জীব না হইত তাহা হইলে তাহার পক্ষে জীবজগতে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করা সম্ভব হইত না।

মানুষের স্বভাবগত সামাজিক বৃত্তিই তাহাকে আদিম যুগে গোষ্ঠীগত জীবন যাপনের প্রেরণা জোগাইয়াছে।

শিশুর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নারীকে গোষ্ঠীর মধ্যে বাস করিতে হইত। গোষ্ঠীতে বহু নরনারী এবং শিশু থাকিত। আত্মরক্ষা এবং আহার সংগ্রহের জন্য তাহারা দল বাঁধিয়া চলাফেরা করিত। সামাজিক বৃত্তিবশে তাহারা দীর্ঘকাল বা আজীবনকাল একসঙ্গে থাকিত। এইরূপ ভাবে বসবাস করিবার জন্য পরস্পরের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানের প্রয়োজন হইত। এই প্রয়োজন হইতে ভাষার স্থষ্টি হইল। অর্থনৈতিক কারণবশতঃ মানুষকে যেমন দীর্ঘকাল অন্যান্য ব্যক্তির সঙ্গে একত্রে বাস করিতে হয়, পশুপক্ষীদিগকে সেরূপ করিতে হয় না। সেইজন্য পশুপক্ষীর ভাষা কয়েকটি শব্দ-সমষ্টি মাত্র, আর মানুষের ভাষা বহুভাব-জ্ঞাপনে ও বহু প্রয়োজন-সাধনে সমর্থ, সুতরাং জটিল। নিরালা পরিবারে বাস করিলে এরূপ ভাষা স্থষ্টি সম্ভব হইত কিনা সন্দেহের বিষয়। আদিম মানুষের গোষ্ঠীগত জীবন যাপন করিবার অন্যতম প্রকৃষ্ট প্রমাণ তাহার ভাষা।

আদিম যুগে মানুষ যখন দলবদ্ধ হইয়া বাস করিত, তখন নরনারীর মধ্যে যৌন সম্বন্ধ কিরূপ ছিল জানিতে পারিলে, ঐ সকল দলের স্বরূপ সম্বন্ধে আমরা মোটামুটি একটা ধারণা করিতে পারিব। এযুগের কোন সমসাময়িক লিখিত বিবরণ পাওয়া অসম্ভব, কেননা তখন লেখা দূরে থাকুক সকল আবিষ্কারের মূল আগুনের ব্যবহার পর্য্যন্ত মানুষ শিখে নাই। আজকাল কতকগুলি এমন বর্ব্বর জাতির আচার ব্যবহার অবগত হওয়া গিয়াছে, যাহারা মানুষের আদিম অবস্থাকে বড়বেশী অতিক্রম করিতে পারে নাই। তাহাদের অবস্থা হইতে আমরা আদিম যুগের মানুষ সম্বন্ধে অনুমান করিতে পারি। কিন্তু ইহা অনুমান ছাড়া আর কিছুই নহে। কেননা যে জাতি যত বর্ব্বরই হউক না কেন, তাহারা আগুনের ব্যবহার শিখিয়াছে, ধাতু বা প্রস্তর নির্ম্মিত অস্ত্রের ব্যবহারেও অভ্যস্ত হইয়াছে। এই দুইটি আবিষ্কারের ফলে মানুষের সামাজিক জীবনে অনেক পরিবর্ত্তন আসিয়াছে। বিশেষতঃ অস্ত্র ব্যবহারের দরুন নারীর উপর পুরুষের অল্পাধিক প্রভুত্ব স্থাপিত হইয়াছে। তথাপি ইহাদের আচার ব্যবহার হইতে অনেক তথ্য

বাহির হইয়া পড়ে। ইহারা চিরাচরিত প্রথা মত জীবন যাপন করে। একবার যে রীতিনীতির প্রচলন হয়, অবস্থার পরিবর্ত্তন হেতু তাহার কিছু অদল বদল হইলেও, জাতির সংস্কার হইতে তাহা একেবারে ধুইয়া মুছিয়া যায় না। তাহার পর যে সকল জাতি জীবন-সংগ্রামে জয়ী হইয়া সভ্যতার আলোক পাইয়াছে তাহাদের জাতীয় জীবনের পুরা-কাহিনীতেও মানুষের আদিম অবস্থা সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা থাকিতে পারে।

প্রথমে এই শেষোক্ত প্রমাণের সন্ধানই করা যাউক। অনেক সুসভ্য জাতির প্রাচীন কাহিনীতেই দেখা যায় যে এমন এক সময় ছিল যখন বিবাহ বা একনিষ্ঠ যৌন-সম্বন্ধ স্থাপিত হয় নাই। সে সময়ে নরনারী যদৃচ্ছাক্রমে পরস্পরে উপগত হইত। যাহার শারীরিক শক্তি যত অধিক সে তত অধিক সংখ্যক নারীর সহিত যৌন-ব্যবহার করিত। আবার শক্তিশালিনী নারী গোষ্ঠীর শক্তিমান্ পুরুষদের সহিত মিলিত হইত। এরূপ অবস্থা ততদিনই চলা সম্ভব যতদিন পুরুষেরা স্বতন্ত্রভাবে নারী ও তাহার সন্তানদিগের আহার ও আশ্রয় দিতে সমর্থ না হয়। অস্ত্রবিদ্যায় উৎকর্ষলাভহেতু যখনই পুরুষ এরূপ সামর্থ্য লাভ করে, তখনই পারিবারিক জীবনের সূত্রপাত হয়। পারিবারিক জীবনের পক্ষে বিবাহ সম্বন্ধ প্রয়োজন। সুতরাং পুরাকাহিনী-গুলিতে কোন রাষ্ট্র বা সমাজনেতা বিবাহপ্রথা স্থাপন করিলেন বলিয়া কথিত হইয়াছে। যেমন মহাভারতে শ্বেতকেতু এই প্রথা স্থাপন করিলেন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, তেমনি গ্রীক্‌গণ বিশ্বাস করিতেন যে অবাধ যৌন-মিলন প্রথা রহিত করিয়া Kekrops নারীকে একজন পুরুষের সহিত তাহার জীবনকাল পর্য্যন্ত আবদ্ধ থাকিবার আদেশ দেন। মিশরবাসিগণ তাহাদের প্রথম রাজা মিনেস্ বিবাহপ্রথা প্রচলন করেন বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। প্রাচীন মিশরতত্ত্বে অদ্বিতীয় পণ্ডিত ম্যাস্‌পেরো তাঁহার The Dawn of Civilisation গ্রন্থে (৫২ পৃঃ) দেখাইয়াছেন যে প্রথমে মিশরের বিবাহ গোষ্ঠীগত ছিল, স্ত্রী মা ও মাতুলের বাড়ীতে থাকিত এবং নর ও নারী উভয়েই বহু বিবাহ করিত। চীনেরা বলেন যে ফু-হি প্রথমে বিবাহ অনুষ্ঠানের প্রচলন করেন, তৎপূর্ব্বে অবাধ যৌন-মিলন চলিত। পেরুবাসিগণ ম্যাঙ্কো-ক্যাপাক্‌কে বিবাহের উদ্ভাবনকর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করে।

যে সকল পণ্ডিত বিশ্বাস করেন যে মানুষ স্বভাবতঃ যৌন-ব্যবহারে একনিষ্ঠ এবং আদিম কালে একনিষ্ঠার উপর ভিত্তি করিয়া পরিবার গঠিত হইয়াছিল তাঁহারা উপরে বর্ণিত কাহিনীগুলিকে অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া উড়াইয়া দেন। তাঁহারা বলেন মানুষ সব কিছুরই আদি জানিতে চায়, সংস্কৃতিহীন মানুষ প্রত্যেক সামাজিক অনুষ্ঠানই ব্যক্তিবিশেষের সৃষ্টি বলিয়া মনে করে, তাই বিবাহের এক একজন সৃষ্টিকর্ত্তা খাড়া করিয়াছে। আমরাও যে ঐ কাহিনীগুলিকে ঐতিহাসিক সত্যরূপে গ্রহণ করিতেছি তাহা নহে, তবে এতগুলি প্রাচীন জাতির পুরাকাহিনীতে যখন এককালে অবাধ-যৌন-মিলন প্রথা ছিল বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, তখন তাহার মধ্যে কিছু সত্য থাকিতে পারে বলিয়া অনুমান করি। আজকাল যে সকল অসভ্যজাতি টিঁকিয়া আছে, তাহাদের আচার ব্যবহার পর্য্যালোচনা করিলে এই অনুমান দৃঢ়ীকৃত হয়।

ভারতবর্ষের আদিম জাতিদের মধ্যে গোষ্ঠীগত বিবাহ প্রচলিত ছিল। গোষ্ঠীগত বিবাহ বিশেষ অর্থনৈতিক অবস্থার ফল। যখন গোষ্ঠীর সকলে বা পরিবারের সকল ভ্রাতা একসঙ্গে সম্পত্তি ভোগ করে, যখন ব্যক্তিগত অর্থনৈতিক স্বার্থবোধ থাকে না এবং প্রত্যেকে পরস্পরের সাহায্যের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিতে বাধ্য হয়, সেই সময়ে গোষ্ঠীগত বিবাহ চলিতে পারে। কিন্তু ব্যক্তিগত সম্পত্তি অর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিগত বিবাহপ্রথা প্রচলিত হয়। এদেশের আদিম জাতিদের গোষ্ঠী সংগঠন ভাঙ্গিয়া যাইতেছে, সেইজন্য তাহাদের প্রাচীন আচার ব্যবহারও লুপ্ত হইতেছে। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে J. B. Lyall সাহেব তাঁহার Report of the Land Revenue Settlement of the Kangra District গ্রন্থে বলেন "The change from community of wives to separation is going on, and polyandry will disappear, though it probably exists to a greater extent than is admitted"। অর্থাৎ স্ত্রীরা গোষ্ঠীগত সম্পত্তি হইতে ব্যক্তিগত সম্পত্তি হইতেছে এবং এক স্ত্রীর বহুস্বামী গ্রহণ প্রথা তিরোহিত হইবে, যদিও এই প্রথার কথা যতটা স্বীকার করা হয় তাহা অপেক্ষা ইহা সম্ভবতঃ অনেক বেশী ব্যাপক। লায়াল সাহেবের অর্দ্ধ শতাব্দী

পূর্ব্বে ১৮২০ খৃষ্টাব্দে J. B. Fraser পশ্চিম হিমালয়ের উপত্যকাসমূহে ভ্রমণ করেন এবং তাঁহার Journal of a tour through part of the Snowy Ranges of the Himalaya Mountains গ্রন্থে বলেন যে স্ত্রীর উপর গোষ্ঠীগত অধিকার প্রত্যেক উপত্যকাতেই দেখা যায়। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দের Asiatic Annual Register পত্রিকায় T. Motte সাহেব "Narrative of a Journey to the Diamond Mines at Sumbhulpoor" প্রবন্ধে লেখেন যে বালাসোর জেলায় খন্দদের মধ্যে কোন বিবাহিতা স্ত্রীলোকই স্বামীহীনা হইয়া থাকে না—স্বামী বিদেশ গমন করিলে বা মৃত হইলে তাহার ভ্রাতারা তাহাতে সন্তান উৎপাদন করে। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে R. V. Russel তাঁহার Tribes and Castes of the Central Provinces of India গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে এখনও খন্দেরা যতদিন পর্য্যন্ত না ছোট ভাইদের বিবাহ হয় ততদিন তাহারা বড়ভাইয়ের স্ত্রীতে উপগত হয় (তৃতীয় খণ্ড, ৪৬৮ পৃষ্ঠা)। সাওতাঁলদের মধ্যে দেখা যায় যে কোন এক পরিবারের একটি ভগিনীকে বিবাহ করিলে সকল ছোট ভগিনীকে সেই বিবাহকারী ও তাহার ছোট ভাইয়েরা উপগমন করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হয় (Journal of the Asiatic Society of Bengal vol. LXXII, part III, pp 88, 90)। অঙ্গামী নাগারা দীর্ঘকালের জন্য বিদেশে যাইতে হইলে গোষ্ঠীর কোন বন্ধু বা আত্মীয়কে স্ত্রীর সহিত যৌন-ব্যবহার করিবার ক্ষমতা অর্পণ করিয়া যায়। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত Ethnographic Notes in Southern India গ্রন্থে E. Thurston সাহেব লিখিয়াছেন যে চোটীয়ান্ চাষীদের মধ্যে বিবাহের পর বধূ তাহার স্বামীর ভ্রাতাদের, নিকট আত্মীয়দের এবং কাকাদের সহিত সহবাস করে ; যদি কোন বধূ ইহাতে রাজী না হয়, তাহা হইলে পুরোহিত-গণ তাহাকে চিরাচরিত প্রথা রক্ষা করিতে বাধ্য করে (১০৮ পৃষ্ঠা)। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে (১৫৭৬ খৃঃ অঃ) পর্ত্তুগীজ বিশপ Osorius নায়ারদের সম্বন্ধে লেখেন যে প্রত্যেক নায়ার পুরুষ তাহার স্বজাতীয়া বহু নারীকে বিবাহ করে এবং প্রত্যেক নারী যতগুলি খুসী প্রণয়ী রাখিতে পারে। কিন্তু কি স্ত্রী কি পুরুষ কেহ যদি অন্য জাতির লোকের সহিত

যৌনব্যবহার করে তবে তাহাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। নায়ারদের মধ্যে এক স্ত্রীর বহু পুরুষ-সংসর্গ-প্রথা আজকাল প্রায় তিরোহিত হইয়াছে। তথাপি K. M. Panikkar Journal of the Royal Anthropological Institute (XLVII-পৃষ্ঠা ২৯৩)-এর একটি প্রবন্ধে স্বীকার করিয়াছেন যে স্বামীর ভাইয়েরা ভ্রাতৃবধূর সহিত সহবাস ছাড়া আর সব কিছু করিতে পারে এবং তাহারা বধূকে অর্দ্ধেক ভগিনী আর অর্দ্ধেক প্রণয়িনীরূপে দেখিয়া থাকে।

আমেরিকার অনেক জাতির আদিম অধিবাসীদের মধ্যে গোষ্ঠীবিবাহের নিদর্শন পাওয়া যায়। Bureau of Ethnologyর নবম বার্ষিক বিবরণে Dr. J. Murdoch লিখিয়াছেন যে Repulse Bayতে কোন কোন সময়ে সমস্ত গ্রামের মধ্যে স্ত্রী বিনিময় হইয়া থাকে; প্রত্যেক নারী পুরুষ হইতে পুরুষান্তরে হস্তান্তরিত হইয়া গ্রামস্থ সকলের দ্বারা উপভুক্ত হয় (৪১২ পৃষ্ঠা)। আমেরিকার উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে টলিন্‌কিট জাতি বাস করে। তাহাদের মধ্যে কোন নারী যদি স্বামীর গোত্র ভিন্ন অন্য কোন গোত্রের লোকের সহিত সহবাস করে তবে তাহাকে হত্যা করা হয়। কিন্তু সেই ব্যক্তি যদি স্বামীর সগোত্র হয় তাহা হইলে কোন প্রকার শাস্তি দেওয়া হয় না। তবে স্ত্রীর প্রণয়ীকে সংসার চালাইবার খরচের কিয়দংশ দিবার জন্য অনুরোধ করা হয়। একটি স্ত্রীলোকের কয়েকটি স্বামী থাকা সেখানে বিস্ময়কর নহে; এক স্বামীর অনুপস্থিতিতে অন্য স্বামী তাহার সহিত সহবাস করে। সহযোগী স্বামীরা প্রায়শঃ সম্বন্ধে প্রধান স্বামীর ভাই হয় (Tenth Census of the United States, vol viii, পৃষ্ঠা ১৫৮)। আদিম আমেরিকান্‌দের মধ্যে আদিমতম জাতি সেরি ইণ্ডিয়ান্‌দের মধ্যে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখ্যা এখন অনেক বেশী; কেননা অনবরত যুদ্ধের ফলে পুরুষের সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে। তাহাদের মধ্যে আত্মীয়গণ পরস্পারের স্ত্রীতে উপগত হইত। বাগ্‌দানের পর বরের আত্মীয়গণ বধূর সহিত যথেচ্ছ ব্যবহার এখনও করিয়া থাকে (Bureau of Ethnologyর সপ্তদশ বার্ষিক বিবরণ, ২৭৯, ২৮১ পৃষ্ঠা)।

আফ্রিকার আদিম অধিবাসীদের মধ্যেও গোষ্ঠী-বিবাহের অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। বান্টুজাতির হিরেরো শাখায় প্রত্যেক নরনারীর কতকগুলি সাঙ্গাৎ থাকে। যে কোন সময়ে যে কোন সাঙ্গাৎ তাহার সাঙ্গাতের স্ত্রীকে গ্রহণ করিতে পারে এবং যে কোন নারী তাহার সাঙ্গাতের স্বামীর সহিত সহবাস করিতে পারে। সাঙ্গাতেরা পরস্পরের ভাই নহে, যদিও নারীরা ভগিনীর সহিত সাঙ্গাৎ সম্বন্ধ রাখিতে পারে। সমস্ত গৃহ পালিত পশুর উপর সকল সাঙ্গাতের সমান অধিকার। পশুপালনই ইহাদের প্রধান উপজীবিকা। এক্ষেত্রে আমরা অর্থনৈতিক সঙ্ঘের মধ্যে অবাধ যৌন-মিলনের দৃষ্টান্ত দেখিতে পাইতেছি। ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও তদনুষঙ্গিক ব্যক্তিগত স্বার্থবোধ যেখানে বিকশিত হয় যেখানে এরূপ অবাধ যৌন-মিলন চলিতে পারে না। ম্যাডাগাস্কারের প্রত্যেক অংশের আদিম অধিবাসীদের মধ্যে ভগিনীপতি শ্যালিকাদিগকে এবং দেবরগণ ভ্রাতৃবধূকে সাময়িক স্ত্রীরূপে গ্রহণ করিতে পারে।

অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীরা এককালে গোষ্ঠী-বিবাহে রত ছিল কিনা ইহা লইয়া পণ্ডিতদের মধ্যে অনেক তর্কবিতর্ক চলিয়াছে। ওয়েষ্টারমার্ক সাহেব উহাদের গোষ্ঠী-বিবাহের প্রথা অস্বীকার করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া অবশেষে বলেন যে যদি ধরিয়াই লওয়া যায় যে অষ্ট্রেলিয়ায় এককালে গোষ্ঠী বিবাহ ছিল, তাহা হইলেই কি বুঝিতে হইবে যে মানবজাতির মধ্যে এক সময়ে সর্ব্বত্র উহার প্রচলন ছিল? অষ্ট্রেলিয়ায় যদি কাঙ্গারু পাওয়া যায় তাহা হইলে কি সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে ইংলণ্ডে কাঙ্গারু ছিল? ওয়েষ্টারমার্কের এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যাইতে পারে যে ইংলণ্ডে কাঙ্গারু থাক্ আর না থাক্ গোষ্ঠী-বিবাহ যে সেখানে এককালে প্রচলিত ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। জুলিয়াস্ সীজ্‌র ব্রিটনদের সম্বন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন যে "দশ বার জন পুরুষে মিলিয়া একসঙ্গে বাস করে ও তাহাদের স্ত্রী সকলেরই অধিকার-গত বলিয়া বিবেচিত হয়; ভ্রাতা ভ্রাতার এবং পিতা পুত্রের স্ত্রী ভোগ করিয়া থাকে।"

অষ্ট্রেলিয়ায় আজকাল ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিবারের

সৃষ্টি হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে যে অবাধ যৌন-মিলন প্রচলিত আছে একথাও বলা যায় না—কেননা কোন গোত্রে কে বিবাহ করিতে পারিবে, না পারিবে সে বিষয়ে বহুতর বিধি আছে। যদি কেহ এ বিধি উল্লঙ্ঘন করে তবে তাহাকে কঠোরতম দণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। যুদ্ধে বিজিতা নারী যদি গোত্র অনুসারে অগম্যা হয় তবে তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। কতকগুলি গোত্রের নারী কতকগুলি গোত্রের পুরুষের নিকট অগম্যা। নিজ নিজ গোত্রের পরস্পরের মধ্যে রক্তের সম্বন্ধ অনুসারে সম্বন্ধ নিরূপিত হয় না—বয়স অনুসারে হয়। প্রথম শ্রেণীতে পিতামহ পিতামহী মাতামহ মাতামহী বয়সের লোক; দ্বিতীয় শ্রেণীতে পিতা মাতার বয়সের লোক, তৃতীয় শ্রেণীতে পুত্রকন্যার বয়সের লোক। তৃতীয় শ্রেণীর সকলে দ্বিতীয় শ্রেণীর সকলকে পিতামাতা বলিয়া ডাকিবে ও প্রথম শ্রেণীর সকলকে ঠাকুর্দ্দা ঠাকুরমা বলিবে। দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রত্যেক ব্যক্তি তৃতীয় শ্রেণীর ব্যক্তিদিগকে পুত্রকন্যা সম্বোধন করিবে। কিন্তু যখন তৃতীয় শ্রেণীর কতকগুলি ব্যক্তি বয়ঃপ্রাপ্ত হয়, তখন তাহারা দ্বিতীয় দলে উন্নীত হয় এবং দ্বিতীয় দলের লোকেরা তাহাদিগকে ভ্রাতাভগিনী বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করে। অর্থাৎ কাল যাহারা ছিল পুত্রকন্যা, আজ তাহারা হইল ভ্রাতাভগিনী। এইরূপ সম্বন্ধ পর্য্যালোচনা করিলে প্রতীতি জন্মে যে কে কাহার পিতা ইহা লইয়া অষ্ট্রেলিয়াবাসিগণ মাথা ঘামায় নাই; গোষ্ঠীর মধ্যে কাহার স্থান কোথায় তাহাই শুধু নির্ণয় করিয়া দিয়াছে। ব্যক্তিগত সম্বন্ধ নিরূপণ অপেক্ষা গোষ্ঠীর মধ্যে কি করিয়া সঙ্ঘবদ্ধভাব ও সুশাসন আসে তাহাই তাহাদের চিন্তার বিষয় হইয়াছিল। গোষ্ঠীর মধ্যে বয়-সের পার্থক্য অনুসারে যৌন মিলনের বিধি নিরূপিত হইয়াছিল। এক বয়সের সকলেই ভাই এবং ঐরূপ ভাইদের মধ্যে স্ত্রী সাধারণী। যে গোত্রে কোন ব্যক্তি বিবাহ করিতে পারে, সেই গোত্রের প্রত্যেক নারীর উপরই তাহার অধিকার জন্মে। Rev. L. Fison, Dr. Howitt প্রভৃতি নৃতত্ত্ব-বিদ্‌গণ দীর্ঘকাল ধরিয়া অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের আচার ব্যবহার পর্য্যবেক্ষণ করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে অষ্ট্রেলিয়ায় এক

দলের পুরুষের সহিত এক দলের নারীর বিবাহ হইত—অর্থাৎ বিবাহ ব্যক্তির সহিত ব্যক্তির না হইয়া দলের সহিত দলের হইত।

গোষ্ঠীগত বিবাহ যে এককালে আদিম মানুষদের মধ্যে প্রচলিত ছিল, তাহার আরও কতকগুলি প্রমাণ অসভ্যদের আচার ব্যবহারে পাওয়া যায়। তাহাদের অতিথিসৎকারের নিয়ম দেখিলে এককালে তাহাদের মধ্যে যে গোষ্ঠীগত বিবাহের প্রচলন ছিল তাহা অনুমিত হয়। অসভ্য মানুষের কাছে গোষ্ঠীর সকলে মিত্র, বন্ধু, ভাই; গোষ্ঠীর বাহিরের লোক মাত্রেই শত্রু। শত্রুমিত্রের আর কোন পরিমাপক বিধি তাহাদের জানা নাই। যখন কোন অপরিচিত ব্যক্তি তাহাদের আতিথ্য গ্রহণ করে, ও তাহার ব্যবহারে সন্দেহ করিবার কিছু না পাওয়া যায়, তবে তাহাকে তাহারা গোষ্ঠীভ্রাতারূপে দেখিয়া থাকে। গোষ্ঠীর মধ্যে স্ত্রী সাধারণী; সুতরাং অতিথিকে রাত্রিকালে স্ত্রী বা কন্যার সহিত একসঙ্গে থাকিতে দেওয়া হয়। এরূপ অনেক কাহিনী শুনা গিয়াছে যে কোন পাদরী সাহেব কোন অসভ্যের গৃহে আশ্রয় লইয়া তাহার বাড়ীর স্ত্রীদের সহিত শয়ন করিতে আপত্তি করায় সাহেবের জীবন বিপন্ন হইয়াছে। একসঙ্গে শয়ন করার অর্থ গোষ্ঠীভুক্ত হওয়া; যদি একসঙ্গে শয়ন কেহ না করে তাহা হইলে অসভ্যেরা বুঝে যে সে ব্যক্তি গোষ্ঠীভুক্ত হইতে ইচ্ছুক নহে, অতএব সে শত্রু; তাহার জীবন নাশ করাই কর্ত্তব্য। অতিথিকে শয্যাসঙ্গিনী দিবার রীতি এস্কিমোদের মধ্যে, পেরুবাসীদের মধ্যে, সিংহলের আদিম অধিবাসীদের মধ্যে, পূর্ব্ব আফ্রিকায়, হিন্দুকুশের পার্ব্বত্য প্রদেশে, প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জে এবং অন্যান্য বহু আদিম জাতির মধ্যে প্রচলিত আছে।

বহু অসভ্যজাতির মধ্যে সময়ে সময়ে গোষ্ঠীর সমবেত উৎসব হইয়া থাকে এবং সেই উৎসবে অবাধ যৌন মিলন অনুষ্ঠিত হয়। পশুদের মধ্যে যেরূপ প্রজনন ঋতু আছে, অসভ্য মানুষদের মধ্যেও সেইরূপ ঋতু ছিল বলিয়া অনুমান হয়। সেই সময়েই এই প্রকার উৎসবের আয়োজন করা হইত। কোন যুগে গোষ্ঠীগত বিবাহ প্রচলিত ছিল বলিয়াই এরূপ উৎসব সম্ভব হইয়াছে।

গোষ্ঠীগত বিবাহ মানবের আদিম অবস্থায় প্রচলিত থাকার অনেক

প্রমাণ দেওয়া হইল। ব্যক্তিগত সম্পত্তির আবির্ভাবের পর গোষ্ঠীগত বিবাহ প্রথা পূর্ণরূপে বর্ত্তমান থাকা সুকঠিন। প্লেটো একশ্রেণীর দার্শনিক শাসকসম্প্রদায় সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহাদের কোন বিষয় সম্পত্তি থাকিবে না এবং তাঁহাদের নিজের সন্তান বলিয়া কোন শিশুকে জানিবার উপায় থাকিবে না—কেননা নিজের সন্তান এই বোধ থাকিলেই তাহার ভবিষ্যৎ সুখের জন্য দার্শনিক শাসক সম্পত্তি লাভের প্রয়াসী হইবেন বা এরূপ পক্ষপাত বিচার করিবেন যাহাতে সন্তানের সুখ সুবিধা হয়। সেইজন্য প্লেটো দার্শনিকদের মধ্যে স্ত্রীগণকে সাধারণী করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। অষ্ট্রেলিয়ার বয়সদ্বারা নির্ণীত শ্রেণীভেদের ন্যায় অল্পবয়স্কগণ সকলেই অধিক বয়স্কদিগকে মাতাপিতারূপে সম্বোধন করিবে এবং সমবয়স্কদিগকে ভ্রাতা ভগিনীর ন্যায় দেখিবে; কিন্তু বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া তাহারা পরস্পরের সহিত সহবাস করিবে। প্লেটো ভাবিয়াছিলেন শাসকসম্প্রদায়ের ব্যক্তিগত সম্পত্তি অর্জ্জনস্পৃহা সমূলে বিনষ্ট করিবার এই প্রকৃষ্ট উপায়। রাশিয়ায় আজ ব্যক্তিগত সম্পত্তি নষ্ট করিবার বিপুল প্রয়াস দেখা দিয়াছে। তথাপি সেখানে নারীকে সাধারণী করিবার কোন কল্পনা কোন রাষ্ট্রনেতার মনে উদিত হয় নাই—যদিও বলশেভিজিমের শত্রুপক্ষ রটনা করিয়াছিলেন যে সেখানে নারী সাধারণ সম্পত্তিরূপে পরিগণিত হইয়াছে। প্লেটোর সময়ে নারীর স্বতন্ত্র সত্তার, তাহার ব্যক্তিত্বের পরিস্ফুরণ হয় নাই। তাই তাঁহার পক্ষে নারীর ইচ্ছা অনিচ্ছার কথা না ভাবিয়া তাহাকে সাধারণের উপভোগ্যা করিবার কল্পনা করা সম্ভব হইয়াছিল। আজ বিংশ শতাব্দীতে নারীকে সম্পত্তিরূপে মনে করিবার কোন উপায় নাই। পুরুষের ব্যক্তিত্বের ন্যায় নারীর ব্যক্তিত্বের প্রতিও রাষ্ট্র শ্রদ্ধাশীল হইতে বাধ্য। নরনারী যদি ইচ্ছা করে তাহারা পরস্পরের প্রতি একনিষ্ঠ হইয়া জীবন যাপন করিবে। তাহাতে রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করিতে যাইবে কেন? সভ্যতার বিকাশের ফলে নরনারীর ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যবোধ জাগিয়া উঠে, নিজেদের ব্যক্তিগত জীবন তাহাদের ভাল লাগা মন্দ লাগার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। সুতরাং আদিম অবস্থার গোষ্ঠীগত বিবাহ-প্রথা এ যুগে চলিতে পারে না।

শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার

পুরানো কথা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

আমার জীবনের চতুর্থ-অঙ্ক আরম্ভ হল সম্পূর্ণ-নূতন আবেষ্টনের মাঝে। ঊনবিংশ শতাব্দী লুকিয়ে গেল মহাকালের জটায়। বিক্টোরীয় যুগ আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল অনন্ত আকাশে। কে জানে, কি আছে অজানা ভবিষ্যতে! বিশ শতকের ঝঞ্ঝাবায়ু তখনও ওঠে নেই বটে। কিন্তু ঈশান কোণে একখানা কালো মেঘ দেখা দিয়েছে। সবাই সভয়ে সেই দিকে তাকাচ্ছে। এ কি আমি আমার দেশের কথা বলছি? না, সারা জগতের? তা নিজেই ঠিক জানি না।

যাই হোক্, আমি বাঙ্গালা দেশে আত্মীয়-স্বজনের মাঝে দিন কয়েক কাটিয়ে এসে কোমর বেঁধে লেগে গেলাম আমার ঘানি টানতে। ঘানি-টানা প্রথমটা ভালই লাগল। চোখ বেঁধে দিলে সকল বলদেরই লাগে। তবে আমার দুর্দ্দৈব, যে আমার চোখের ঠুলিটা কেউ তেমন টেনে বেঁধে দেয় নেই। অল্পদিনেই কেমন আলগা হয়ে গেল। চারিদিক থেকে মুক্ত আলো চোখে এসে নানা অশান্তির সূত্রপাত করলে। যাক্, সে পরের কথা।

ইতিমধ্যে আমার নূতন জীবন সুরু হয়ে গেল আহমদাবাদে। প্রথম থেকেই লোকের কাছে যে অযাচিত স্নেহ আদর পেলাম, তা আজকের দিনে অভাবনীয়! হয়ত শ্রদ্ধাস্পদ সত্যেন্দ্রনাথ ও দেশে বাঙ্গালীর পথ সুগম করে দিয়ে গেছলেন। তবু এটা বলতেই হবে যে গুজরাতের অতিথিসৎকার অতি সুন্দর জিনিস। আমার মনে হত যেন আমাকে আপন করে নেবার জন্য একটা কাড়াকাড়ি পড়ে গেছে এঁদের সমাজে। আমার মতন একজন অতি সামান্য খোকা হাকিমকে আদর-যত্ন করার পেছনে যে কোনও মতলব থাকতে পারে, এ কথা আমি বিশ্বাস করি নেই। যদিচ আমার শুভানুধ্যায়ী দুই একজন সাহেব আমাকে এ বিষয়ে অনেক লেক্‌চার দিয়েছিলেন। You must be very careful — Can't you see, they are trying to get at you? বুঝতে পারছ না, এরা তোমাকে হাত করার চেষ্টা করছে?

যাঁরা আমাকে এই রকম উপদেশাদি দিতেন, তাঁরা ছিলেন, যাকে বলা যেতে পারে, মিছরীর ছুরী। তাঁদের একটির ত স্বজাতি-সমাজে নামই ছিল—Oily L.। তখন আমি বুঝতাম না যে Oily (মুখমিষ্টি) ইংলিশ-ম্যান জাতটা, কটা শূদ্র, কালো বামুন ও বেঁটে মুসলমানের সঙ্গে এক-পর্য্যায়ভুক্ত। ক্রমে জানলাম যে যথার্থ ইংরেজ মানে নির্ভীক ও স্পষ্ট-বাদী মানুষ। হয়ত একটু অপ্রিয়ভাষীও বটে!

এই রকম জাত-ইংরেজও আহমদাবাদে অনেকগুলি ছিলেন। তাঁরা কেউ যে আমার সঙ্গে কোন বিশেষ অসদ্ব্যবহার করেছিলেন, তা নয়। তবে মোটামুটি তাঁদের ভাবটা এই ছিল, যেন তাঁরা গুরুমহাশয় আর আমি নবাগত পোড়ো। কতকটা আমাকে কৃপার চক্ষে দেখতেন। আর সর্ব্বদা আমার চাল-চলনের উপর খুব কড়া নজর রাখতেন। দেখতেন, আমি ইংরেজ-সমাজে মেশবার উপযুক্ত পাত্র কি না! আমার মেজিষ্ট্রেট কর্ম্ম-পাগল মানুষ ছিলেন। সামাজিকতার ধার ধারতেন না। তিনি আমাকে বললেন—কাজ-কর্ম্ম শেখ, ক্লাবে ঢোকার তাড়া কি? সত্যি বলতে কি, আমার কোন তাড়াই ছিল না। কেননা, দেখতে দেখতে দেশী-সমাজে আমাদের অনেক বন্ধু জুটে গেল।

কমিশনার লীলী সাহেব আহমদাবাদেই থাকতেন। তিনি খুব জবরদস্ত হাকীম ছিলেন। একেবারে সেকেলে কোম্পানীর আমলের বড় সাহেব। একদিকে যেমন আদব-কায়দার এতটুকু ক্রুটী বরদাস্ত করতেন না। অন্যদিকে তেমনি গরীব-নওয়াজ, আশ্রিতবৎসল ছিলেন। তাঁর বাড়ী, শাহীবাগ, প্রাসাদ-তুল্য। সেখানে সকালে-বিকেলে হরদম ভিড় লেগে রয়েছে। ইংরেজী ও দেশী আমলাবর্গ, ইনামদার, তালুকদার, শেঠ মহাজন, সবাই ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে হুজুরকে সেলাম বাজাবার জন্য দৌড়াদৌড়ি করছে। চা-পার্টি, খানা, নাচ, ইভনিং পার্টি লেগেই রয়েছে। সাহেব প্রথম প্রথম আমাদের উপর সদয়ই ছিলেন। তবে বোধ হয় বিলেতী ভাবাপন্ন একেলে নেটীব তিনি আগে দেখেন নেই। বুঝতেন না যে অতটা পিঠ-চাপড়ান, তোয়াজ করা, হুকুম চালান, আমাদের ঠিক বরদাস্ত হবে না। ক্রমশঃ গোলযোগ বেড়েই চলল। শেষ,

এক কলমের খোঁচায় আমাকে একেবারে দূর দক্ষিণে বদলী করে দিলেন।

এ সব ব্যাপার দুই এক দিনে সংঘটিত হল, তা ত নয়। তবে সূচনা থেকেই আমি বেশ বুঝতে পারলাম যে উচ্চ মসনদে বসবার যোগ্যতা আমার নেই। চাকরীর মোহ যেটুকু-বা প্রাণে ঢুকেছিল, তা সহজেই উবে গেল।

সে বছর গুজরাতে ভীষণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হল। অনাবৃষ্টির দরুন চাষীরা হেমন্তের ফসল প্রায় কিছু পায় নেই। জেলা-হাকীমরা একথা বারবার হুজুরে জানালেন, কিন্তু সরকারের টনক নড়ল না। প্রথম কিস্তি খাজনা জোর-জবরদস্তী করেই উসুল হল। লোকের ঘটিবাটি তৈজস-পত্র গেল। জানুয়ারী মাস নাগাদ দলে দলে অনশন-ক্লিষ্ট লোক গ্রাম ছেড়ে, ঘর ছেড়ে, পথে বেরিয়ে পড়ল মজুরীর সন্ধানে। কিন্তু অত লোক মজুরী পাবে কোথায়? মাস দুই তিনে কঙ্কালে ছেয়ে গেল গুজরাতের পথ, ঘাট, মাঠ,। যত বা মরল মানুষ, তত মরল গরু। চাষী নিজে খেতে পায় না, গরুকে কি খেতে দেবে? ঘাস পাতা ত আর কোথাও ছিল না। সব জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে গেছল।

এই দুর্দ্দিনে কানপুর থেকে এলেন এক ব্যাপারী সাহেব। তিনি আট আনা বারো আনা করে গরু মহিষ কিনে, খুব ছাল চামড়া চালান করতে লাগলেন তাঁর কারখানায়। গুজরাতের সর্ব্বনাশ, কানপুরের হল পৌষ মাস। বড় বড় শেঠ মহাজনেরা কাতর হয়ে সরকারের কাছে দরখাস্ত করলেন যে এই নূতন কতলখানা বন্ধ করা হোক। সরকার তরফ হতেও অনেক চেষ্টা হল। কিন্তু ফল হল না। ব্যাপারী সাহেবটি জবরদস্ত লোক ছিলেন। তিনি কলেকটরকে বলে এলেন, "আমি ত আপনাদের কোন আইনই ভাঙ্গি নেই। পয়সা দিয়ে গরু কিনছি। সহরের বাইরে, ঘেরা জায়গায় কাটাই করছি। আর কি করতে বলেন?"

একদিন গুজব উঠল যে অমুক শেঠ এই সাহেবটার মুণ্ডের জন্য পাঁচ হাজার টাকা ইনাম কবুল করেছেন। সাহেব কুড়িজন যমদূতের মতন পাঠান চৌকীদার রাখলেন, তাঁর কতলখানায় পাহাড়া দেবার জন্য। ফলে ছোটোখাটো মারপিট হতে লাগল। সকলের ভয় হল, একটা বড়

দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাধবে। এমন সময় হঠাৎ একদিন সাহেব তার পেলেন তাঁর কোম্পানীর কাছ থেকে, "তুমি হুকুম পাওয়া মাত্র কানপুর চলে এস।" তিনি আহমদাবাদ ত্যাগ করলেন। তাঁর জায়গায় এলেন এক নিরীহ বাঙ্গালী বাবু। ধীরে ধীরে কসাইখানা বন্ধ হয়ে গেল। লোকের হাড় জুড়াল। সকলে আন্দাজ করলে যে বোম্বাই সরকার ভেতরে ভেতরে কল টিপে থাকবেন। তা হতেও পারে। কেন না, লাট নর্থকোটের মতন দয়ালু গভর্ণর বোম্বাইয়ে কখনও এসেছেন কি না সন্দেহ।

এই লাট সাহেব গুজরাতের গরু-বাছুর বাঁচাবার জন্য অনেক চেষ্টা করেছিলেন। তাঁরই আগ্রহে নানা জায়গায় সরকারী গো-শালা স্থাপিত হয়েছিল। আমার মহকুমায় এই রকম একটা বড় গো-শালা ছিল। একবার নর্থকোট সাহেব মহাধুম করে সেটা দেখতে এলেন — সঙ্গে কমিশনার থেকে আরম্ভ করে বড় বড় আমলা, সেক্রেটারী, এডিকং, চোপদার, বরকন্দাজ। এলেন আমার রাজ্যে, অথচ আমাকে কর্ত্তারা একটা খবর দিলেন না। আমি এক ক্ষুদ্র ইনামদার সাহেবের কাছে কথায় কথায় শুনলাম। তিনি ষ্টেশনে হাজির থাকার হুকুম পেয়েছিলেন কমিশনার সাহেবের কাছ থেকে। আমি কি করি? যাব কি যাব না? বিনা নিমন্ত্রণে সতী দক্ষযজ্ঞে গিয়ে ত প্রলয় কাণ্ড বাধিয়েছিলেন! যাহোক পাঁচরকম ভেবে যাওয়াই স্থির করলাম।

প্লাটফরমে গাড়ী দাঁড়ালে টুপী খুলে এগিয়ে গেলাম। লীলী সাহেব পরিচয় করে দিলেন কর্ত্তার সঙ্গে, কিন্তু প্রসন্ন মুখে নয়। লাট সাহেব বোধ হয় বুঝলেন যে একটা কিছু গণ্ডগোল হয়েছে। টুপী তুলে খুব অমায়িক হাসি হেসে বললেন, "বাঃ! বেশ হয়েছে, তুমি আসতে পেরেছ! আমাকে সব বুঝিয়ে-সুঝিয়ে দেবে। আমার গাড়ীতে এস।" কমিশনার-প্রমুখ সাহেবদের মুখের ভাব দেখে আমার বেশ একটু আনন্দ হল।

ঘণ্টা দুই পরে ষ্টেশনে ফিরলে একজন জরী-বেনারসী পরা বৃদ্ধ তালুকদার সাহেব আমাকে পিঠ চাপড়ে দিলেন, "Sir, you are very lucky, indeed—মশায়, আপনার জোর নসীব।" আমি উত্তর দিলাম, "Rather! নিশ্চয়ই!"

ট্রেন ছাড়বার আগে আমার কলেকটর আমাকে চুপি-চুপি একটু কড়কে দিলেন, "আমি মনে করেছিলাম তোমার ক্যাম্প বহু দূরে, তাই তোমাকে খবর দিই নেই। After all, H. E. is on an informal visit—তোমার আসার খুব দরকার ছিল না।" আমি কিছুই বললাম না।

লাট সাহেব কিন্তু যাবার সময় বেচারাদের আর একটু চটিয়ে দিয়ে গেলেন, "গুড্ বাই! থ্যাঙ্ক ইউ, ডাটু। অনেক দরকারী জিনিস শিখলাম আজ তোমার কাছে।"

আমি মজাটা খুব উপভোগ করলাম বটে! কিন্তু এতে আমার অদৃষ্ট-চক্র ফিরল না। লাটেরা সচরাচর ভদ্র লোকই হয়ে থাকেন। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট যে একটা প্রাণহীন যন্ত্র মাত্র!

গুজরাতে আকাল পড়াতে আমার এইটুকু সুবিধা হল যে আমার মামুলী-শিক্ষানবীশী খুব সংক্ষেপ হয়ে গেল। যত শীঘ্র সম্ভব কমিশনার আমাকে, আর আমার সাথী R—কে, জুড়ে দিলেন দুর্গতিসেবার কাজে। প্রথম ভার পেলাম আমরা দুজনে মিলে গোটা ছয়েক রিলিফ্ ক্যাম্পের। প্রতি ক্যাম্পে কত মজুর থাকত, তা এখন ভুলে গেছি, তবে হাজারের কম কোন ক্যাম্পে ছিল না। তারা কোথাও বা সড়ক তৈরী করছিল, কোথাও পুকুর খুঁড়ছিল, কোথাও বাঁধ বাঁধছিল। এ সব কাজের তদ্বির অবশ্য P.W.D. ইঞ্জিনীয়ার সাহেবরা করতেন। তবে আমরা ঝোলে, ডালে, অম্বলে, সবেতেই ছিলাম। ওভারসিয়াররা মজুরদিকে অতিরিক্ত খাটাচ্ছে কি না, তাও দেখতাম, ডাক্তারখানায় ঢুঁ মেরে মোড়লীও করতাম। আবার অন্নসত্রের তদারকও করতাম। এই অন্নসত্রে খেত, যারা অক্ষম। সমর্থ লোকেরা মাটি কোপাত আর একটা নির্দ্দিষ্ট দর অনুসারে মজুরী পেত। তাদিকে নিজে রেঁধে খেতে হত। রসদ যোগাত এক সরকার থেকে নিযুক্ত বেনে। ক্যাম্পে এই বেনের দোকানের সামনে একটা নিরিখ্ বা মূল্যের তালিকা টাঙ্গান থাকত। কিন্তু ক্রেতারা ত নিরক্ষর, নিরিখ্ পড়বে কে! মোট কথা এই মজুর বেচারাদিকে সবাই ঠকাত। P.W.D. বাবুদের থেকে আরম্ভ করে ডাক্তার, পুলিস, অন্নসত্রের আমলা (Civil

Officer), সকলকেই এ বেচারাদের দস্তুরী দিতে হত। R— ও আমি দুজনেই ছিলাম সংসার-সম্বন্ধে নিতান্ত অনভিজ্ঞ। কি উপায়ে এই দীন-দরিদ্রদের সত্যি সাহায্য করতে পারা যায়, তা ত জানতাম না! মাঝে-মাঝে রাগের মাথায় তাণ্ডব সুরু করে দিতাম। তাতে যে ফল একেবারে না হত, তা নয়। তবে আমাদিকে পরে নানা রকম বিপদে পড়তে হত। R—বেচারাকে ত একবার এক ওভারসিয়ার ফৌজদারী আদালতে খাড়া করে দিলে। ক্যাম্পের বেনেরা আমাদের চোখের আড়ালে নানা প্রকার রদ্দী মাল চালিয়ে দিত—চুন-মেশান চাল, কাঁকর-ভরা ডাল, ধূলোসুদ্ধ বাজরীর আটা ইত্যাদি। বেচারা কুলীরা ত একে অস্থিচর্ম্ম সার, তার উপর হাড়ভাঙ্গা খাটুনি, এ রসদ তাদের সহ্য হবে কেন! ক্যাম্পের পর ক্যাম্পে কলেরা আরম্ভ হয়ে গেল। আমাদের কাজ বাড়ল। সরকারের কল ত খুব শনৈঃ শনৈঃ নড়ে! মড়ক সুরু হয়ে গেছে, অথচ অনেক জায়গায় কলেরা মিক্সচার আসে নেই। দুই একজন ডাক্তার চড়টা চাপড়টা যে খান নেই, তা শপথ করে বলতে পারি না। তবে তাদের বাঁধা ওজর ছিল—ইণ্ডেণ্ট করেছি মশায়, এখনও ঔষধ এসে পৌঁছায় নেই। শেষ, হল কি, কমিশনার সাহেব আমাদিকে ডেকে ছোট-ছোট শিশি করে কি-এক সবুজ ঔষধ দিলেন। বললেন, "Never mind the doctors, তোমরা এই ঔষধ খাইয়ে চিকিৎসা করতে থাক।" সে ঔষধ খেয়ে অনেক-গুলি লোক বাঁচল। কিন্তু বিভ্রাট কি এইখানেই থামল? মড়ক এসে প্রথম উপস্থিত হতেই ক্যাম্পের মুর্দ্দাফরাসের দল পলায়ন দিতে লাগল, পুলিস পাঠিয়ে তাদের অধিকাংশকে গেরেপ্তার করে আনা হত বটে, কিন্তু বাসি মড়া ত আর পড়ে থাকতে পারে না! একদিন R— ও আমি এক ক্যাম্পে গিয়ে দেখি, যেখানে-সেখানে মানুষ মরে পড়ে রয়েছে, গোটা তিরিশেক হবে। মজুর সব ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে। আর ক্যাম্পের বাবু কজন হাঁসপাতালের ডাক্তারখানা-ঘরে ভয়ে জড়সড় হয়ে বসে রয়েছেন। শব-গুলো জ্বালিয়ে দেবার কথা বলাতে তাঁরা উত্তর দিলেন, "মড়া তোলে কে? ঢেড়রা সব পালিয়েছে।"

আমি হিন্দুর ছেলে, বলতে আমার একটু সঙ্কোচ হল। কিন্তু R—

সাহেবের বাচ্চা, সে চেঁচিয়ে উঠল, "তোমরা ওঠ। আমাদের দুজনকে সাহায্য কর। আমরা সব করছি।"

তাঁরা জাতের কথা তুলে একটু ইতস্ততঃ করছেন দেখবামাত্র R—এর চাবুক উঠল। যাক্, ঘণ্টা দুয়েকের ভেতর একটা ব্যবস্থা করে ফেলা হল। কারবলিক্ দিয়ে হাত-টাত ধুয়ে মাইল খানেক দূরে গিয়ে এক তেঁতুল গাছতলায় বসলাম। সেই একটা গাছে পাতা ছিল। আসে-পাসে সব গাছের পাতা কোন্‌কালে শুকিয়ে ঝরে পড়েছে। আমাদের ভয়ানক খিদে পেয়েছে। দুজনের উটের পিঠে বাঁধা টিফিন বাক্স ছিল। খুলে খেতে আরম্ভ করলাম। কিন্তু যা মুখে দিই, তাতেই দুর্গন্ধ। হঠাৎ দেখি কয়েক হাত দূরে মাটির ভেতর থেকে একটা মড়ার হাত বেরিয়ে রয়েছে। হাতে সবুজ রঙের চুড়ী। খাবার-দাবার ফেলে দিয়ে উটে চেপে বাড়ী-মুখো হলাম। কোশ সাতেক পথ গিয়ে তিনটার সময় বাড়ী পৌঁছলাম। স্নান-টান করে মুখে জল দিতে পেলাম। এ রকম ব্যাপার নিত্য হত, তা নয়। তবে মোটের উপর বলা যেতে পারে, যে কয়েক মাস পর্য্যন্ত খাওয়া-দাওয়া, আরাম-আয়েস, নিতান্তই দুর্লভ জিনিস হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

এই যে আমাদের ক্যাম্প, অন্নসত্র ইত্যাদি চলছিল, এগুলোকে লোকে কি ঘৃণার চোখে দেখত, তার আভাস একবার কি করে পেয়েছিলাম, বলি। একদিন আমি এক দূর কুলী-ক্যাম্পে টঙ্গায় চড়ে যাচ্ছি। হঠাৎ ঘোড়া দুটো চমকে পেছনের পায়ে দাঁড়িয়ে উঠল। কোন রকমে তাদের ঠাণ্ডা করে নেমে পড়লাম। দেখি, ছেঁড়া ময়লা কাপড়-পরা একজন আধবয়সী লোক মড়ার মতন পড়ে রয়েছে। তার পিঠে মাথায় হাত বুলোতে সে চোখ খুললে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "কি হয়েছে? তোমার অসুখ করেছে?" সে কথা কইতে পারলে না। একটু ঠোঁটের কোণে হেসে পেটে হাত দিলে। আমি বললাম, "আমি ওমুক তলাওয়ে (ক্যাম্পে) যাচ্ছি। আমার গাড়ীতে আয়। সেখানে অন্নসত্রে খেতে পাবি।" দুর্ভিক্ষের অন্নসত্রকে লোকে খিচড়ীখানা বলত। বোধ হয় ইংরেজী কিচেন শব্দের অপভ্রংশ। এ মানুষটি ভ্রূকুটি করে ভাঙ্গা গলায় বললে,

"কোথায় ? সরকারী খিচড়ী-খানায় ? না, তুমি যাও, যাও। আমি এইখানেই মরব।" লোকটার উপর সরকারী কিচেন-এ কি জুলুম হয়েছিল, কে জানে! আমি সন্তর্পণে বললাম, "আচ্ছা, যেতে হবে না। আমার সঙ্গে যে রুটী আছে, তাই একটুখানি খা।" সে চোখ দুটো বড় বড় করে হাঁপাতে হাঁপাতে উত্তর দিলে, "কি! মুসলমানের রুটী আমি খাব! যাও, যাও সাহেব, তুমি যাও। আমাকে চুপচাপ মর্‌তে দাও।" আমার মুখ দিয়ে কথা বেরোল না। ধন্য বর্ণাশ্রম সৃষ্টি করেছিলেন ঋষি মহারাজেরা! কি করব! আমার কাজের সময় বয়ে যাচ্ছে। লোকটার হাতে একটা টাকা গুঁজে দিয়ে টঙ্গার দিকে ফিরলাম। সে তার সমস্ত জোরটুকু খরচ করে টাকাটা আমার গায়ে ছুড়ে মারলে। আমি আমার কাজে চলে গেলাম। টাকাটা সেই ধূলোতে পড়ে রইল। ফেরবার পথে দেখি বেচারা মরে গেছে। তার প্রাণহীন দেহটা ভুঁইয়ে গড়াগড়ি দিচ্ছে। টাকাটা কিন্তু কে তুলে নিয়ে গেছে। দুই এক জন লোক ডেকে গর্ত্ত খুঁড়িয়ে, লোকটাকে কবর দিয়ে বাড়ী ফির্‌লাম।

কিছুদিন পরে R— ও আমি অন্য কার্য্যে মোতায়েন হলাম। ততদিনে কলেরার প্রকোপ কমে গেছে। লোক যা অনাহারে মরবার, তাও মরে গেছে। ক্যাম্পগুলোতে অনেকটা শৃঙ্খলা এসেছে। এবার আমাদিকে লাগান হল গ্রামের ভেতর। অধিকাংশ গ্রামে দুঃস্থ লোকদিকে রোজ কাঁচা সিধা বিতরণ হচ্ছিল। সিধা দিত গাঁয়ের পটেল তলাটী। তদ্বির করতেন তহশীলদার সাহেব। কিন্তু ইদানীং তহশীলদারদের কাজ এত বেড়ে গেছল যে তাঁদের পক্ষে এই সিধা-বিলান ব্যাপারের উপর কড়া নজর রাখা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাই আমাদিকে ঠেলে দেওয়া হল ঐ কাজে। সে রকম নজর না রাখতে পারলেও, মাঝে মাঝে দণ্ড চালনার দ্বারা গ্রাম-কর্ম্মচারীদের মনে ধর্ম্মভয়টা জাগিয়ে রাখতে পারব। সত্যি কাজ আমরা কতটা করতে পেরেছিলাম, জানি না। তবে হটুহটু করে ঘুরে বেড়ানর কসুর করি নেই। একটা ঘোড়া আর একটা উট এলে যেত রোজ। সাধারণতঃ একটা আন্দাজ গ্রাম-পরিভ্রমণ শেষ করতাম। তবে মাঝে মাঝে দুপুরের খাবারটা বেঁধে নিয়ে বেরিয়ে পড়তাম, ফিরতাম সন্ধ্যায়।

কখন কখন বা গাঁয়ে চণ্ডীমণ্ডপে (চাওরীতে) রাত কাটাতাম। চাষীদের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ পরিচয় হল।

ইতিমধ্যে আর এক ব্যাপার এসে পড়ল আমাদের হাতে। একদিন কমিশনার সাহেব আমাকে ডেকে দু হাজার টাকার এক তোড়া দিয়ে বললেন, "তুমি খুব ঘুরে বেড়াচ্ছ, শুনতে পাই। এই টাকাগুলো গরীব-দুঃখীকে দিও।" সেই থেকে যে কত হাজার টাকা বিলালাম, তার গুণতি নেই। টাকা খয়রাতের, সুতরাং চুল-চেরা হিসেব রাখতে হত না। সঙ্গে আমলা-মুহুরী কেউ থাকত না, সেপাই কনষ্টেবলও বড় একটা জুটত না। কত রাত কাটিয়েছি টাকার তোড়া মাথায় দিয়ে ঘুমিয়ে। একমাত্র প্রহরী আমার ছোট পিস্তলটি। কখন কখন বেশী টাকা সঙ্গে থাকলে পুলিস-সাহেব এক-আধ জন কনষ্টেবল দিতেন। একবার এক তলোয়ারধারী পাঠান কনষ্টেবল সঙ্গে নিয়ে গেছলাম। সে দুদিন ধরে এমনই তাণ্ডব নেচে বেড়ালে, যে আমি বিব্রত হয়ে উঠলাম। তার পর থেকে আর প্রহরী নিয়ে যেতাম না। টাকা কোনদিন চুরী যায় নেই। কিন্তু কিছুদিন বাদে একবার এক ভারী মজা হয়েছিল। কদিন আমার ডেরা ছিল রেল থেকে কয়েক মাইল দূরে এক ছোট্ট গ্রামের বাহিরে। রসদ আসত সদর থেকে রেলে। জিনিস ষ্টেশনে পৌঁছলে, মাষ্টার বাবু কুলীর মাথায় দিয়ে পাঠিয়ে দিতেন। একদিন পথে আমার রসদ (অর্থাৎ গোটা আষ্টেক পাঁউরুটী) লুট হয়ে গেল। সাহেবের পাঁউরুটী লুট! কি ভয়ানক ব্যাপার! পুলিস ত জগঝম্প লাগিয়ে দিলে। দিন তিনেক বাদে পাঁচজন অস্থিচর্ম্মসার কোলী চালান হয়ে এল ডাকাতীর চার্জ্জে, আমারই আদালতে! তারা অম্লানবদনে জবাব দিলে, "তিন দিন খেতে পাই নেই। পেট জ্বলে যাচ্ছিল। খাবার সামনে পেয়ে কি করে ছেড়ে দেব?" সত্যিই ত, ছেড়ে কি করে দেবে! কিন্তু আমিই বা ওদের ছেড়ে দিই কি করে? পুলিস যা প্রমাণ এনেছিল, সেটাকে একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অপরাধটা চুরীর কোটায় ফেললাম। তারপর সাজা লিখলাম—এক দিন জেল, আর আট আনা করে জরিমানা। লিখলাম ত এই রকম, কিন্তু লজ্জায় ওদিকে মুখে বললাম, "যা, ছেড়ে দিলাম। আর চুরী করিস্ না।" জরিমানাটা আমারই গাঁট থেকে গেল।

টাকা বিতরণের কাজে সব গাঁয়েই পাটীদার বা পটেল জাতটার কাছে যথার্থ সহায়তা পেতাম। তারা নিজেরা ত খয়রাতী পয়সা ছোঁবে না, কিন্তু দাঁড়িয়ে টাকা দেওয়াত গরীব দুঃখীকে। বলে দিত, কে যথার্থ দুঃস্থ, কে নয়। পাটীদারগুলো একটু হাঁদা, কিন্তু বড় সৎলোক। এদের মান-ইজ্জতের জ্ঞানও খুব প্রখর।

এক রকম কাজ কিন্তু ছিল, যাতে কারও সাহায্য পেতাম না। নিজেই বুদ্ধি খাটিয়ে যা পারি করতে হত। এমন সব ভদ্রবংশীয় রাজপুত ও মুসলমান পরিবার ছিল, যাদের পুরুষেরা হয় মরে গেছে, নয় রোজগারের চেষ্টায় বিদেশে বেরিয়ে গেছে। মেয়েরা পর্দ্দানশীন, কারও সামনে বেরোবে না, মুখে কিছু চাইবেও না। এই রকম অনেক স্ত্রীলোক ছেলেপিলে নিয়ে নিঃশব্দে না খেতে পেয়ে ধীরে ধীরে মরছিল। লোকমুখে এই কথা আমার কানে এসেছিল। সৌভাগ্যক্রমে আমি হিন্দী উর্দ্দু দুই ভাল বলতে পারতাম, গুজরাতীও ততদিনে বেশ শিখেছি। প্রথম, বাড়ী বাড়ী ঘুরে ঘুরে, অনেক চেষ্টা-চরিত্র করে কয়েকজন বৃদ্ধা মহিলার সঙ্গে আলাপ পরিচয় জমালাম। তার পর তাঁদিকে আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা-পড়া করে, দুঃস্থ মহিলাদের একটা ছোটো-খাটো তালিকা করে ফেললাম। প্রতি সপ্তাহে নিজে গিয়ে সেই লিষ্টমত টাকা মেয়েদের হাতে চুপি চুপি দিয়ে আসতাম।

উপরে গ্রামের তলাটীদের নাম করেছি। এই তলাটীরা ছিল সরকারী মাইনে করা গোমস্তা। জাতে অধিকাংশ বামুন কি বেনে, লেখাপড়াও শিখেছে, অথচ কষ্ট দিয়েছিল এরাই সব চেয়ে বেশী। সর্ব্বদা তাকে-তাকে ফিরত কিসে দুপয়সা হাতাতে পারে! আমরা বোকা আন-কোরা নূতন হাকীম, আমাদিকে ঠকান সহজ হবে! এই ভেবে এই জাতীয় কতকগুলো লোক মোটে আমাদের সঙ্গ ছাড়ত না। নানা রকম খিদমত করে আমাদিকে খুশী করার চেষ্টায় থাকত। R—বেচারা আমার চেয়ে সহজে এদের খর্পরে পড়ত, কেন না ভারতবর্ষের লোক সম্বন্ধে তার কোন ধারণাই ছিল না। মনে ভাবত, ফরসা কাপড় পরা ইংরেজী জানা লোক মাত্রই তার সমশ্রেণীর Gentleman। একবার একজন তলাটী আমাদের দুজনকে তার গ্রামে নিমন্ত্রণ করে চর্ব্ব্য-চোষ্য

খাইয়ে, পরে তারই জোরে চারপাশের গ্রামবাসীদের কাছ থেকে পাঁচশো টাকা আদায় করেছিল। সবাইকে বলেছিল—"এ ছোকরা সাহেব ছুটো ত আমার মুঠোর ভেতর। আমাকে খুশী কর, যা চাস্ পাইয়ে দেব।"

বেচারার ভোগে কিন্তু সে টাকা এল না। পটেলরা চুপি চুপি আমাকে বলে গেল, কি হয়েছে। শুনে আমি আহমদাবাদে গিয়ে R—কে বললাম। দুজনে আবার সেই গ্রামে গেলাম। তলাটীকে ফেরৎ দিতে হল সে পাঁচশো টাকা। কি উপায়ে ফেরৎ দেওয়ালাম, সেটা আপনাদের শুনে কাজ নেই।

যখন বর্ষা এল, তখন আমি মহকুমার ভার পেয়েছি। এইবার পটেলদিকে সাহায্য করার সময় এসেছে। তারা খয়রাৎ নেয় নেই। কোন রকমে ধার-ধোর করে এই কমাস পেট ভরিয়েছে। কিন্তু বেচারা-দের বলদ নেই, ঘরে বীজ নেই। অবিলম্বে এ দুটোরই ব্যবস্থা করে দিতে হবে। গভর্ণমেণ্ট, যত চাই, দাদন দিতে এখন প্রস্তুত। বোম্বাই সরকার অল্পে সারবার চেষ্টায় ছিলেন বটে। কিন্তু লাট কার্জ্জন নিজে এসে সারা গুজরাত ঘুরে দেখে গিয়ে দরাজ হাতে টাকার ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু সরকারের আবার গলদ ত নানা রকমের! বলদ আনাবার ভার পড়ল কৃষি-বিভাগের উপর। তাঁরা এক ঠিকেদারের মারফৎ মালোয়া থেকে বলদ কিনে পাঠালেন। আমার প্রথম পাল জানোয়ার যেদিন এসে পৌছল, সে দিন কি আনন্দ, কি উৎসাহ! চারিদিক হতে পটেলেরা এসেছে বড় বড় পাগড়ী বেঁধে। সকলের মুখে হাসি। মনের আবেগে আমি একটা ছোটোখাটো বক্তৃতাই করে ফেললাম। কিন্তু অল্প-ক্ষণেই হরিষে বিষাদ হল। চল্লিশ টাকার বলদ এই! কোনটা বুড়ো, কোনটা খোঁড়া, কোনটা কানা, শতকরা তিরিশটা নিখুঁত জানোয়ার আছে কি না সন্দেহ। যাই হোক কেউ নিলে না সে বলদ। আমি অত্যন্ত বোকা বনে গেলাম। কমিশনারকে তার করলাম, "বলদগুলো কোন কর্ম্মের নয়। আমি চাষাদিকে বলদ কিনে দিতে পারি কি?" লীলী সাহেব Red Tape-এর ধার ধারতেন না। তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ, নিশ্চয় পার। ঝাঁসীর বলদ ফেরৎ পাঠিয়ে দাও।" তার পর ধুম

পড়ে গেল বলদ কেনার। দালাল সঙ্গে নিয়ে এ হাটে ও হাটে ফিরে নিজেই কপাল ঠুকে কতকগুলো কিনে ফেললাম। পটেলরা সেগুলো খুশী হয়ে নিলে। এক ঠিকেদারও খাড়া করলাম। সে সাত দিনের মধ্যে সেই ঝাঁসী থেকে উনচল্লিশ টাকা করে চমৎকার বলদ এনে হাজির করলে। পটেলরা সেগুলো কাড়াকাড়ি করে নিয়ে যেতে লাগল। পরে শুনলাম যে এই উনচল্লিশ টাকার মধ্যে আবার জানোয়ার পিছু এক টাকা করে আমার এক কর্ম্মচারী সেলামী নিয়েছিলেন। তা হলে বুঝুন, কৃষি-বিভাগের ঠিকেদার কি কাণ্ড করেছিল!

অনেক সময় গভর্ণমেণ্টের এই ডিপার্টমেণ্ট-ভেদের দরুন নানা উৎপাত উপস্থিত হয়। আমরা সহরবাসী নিজেদিকে যত সভ্যই মনে করি না কেন, এটা ত অস্বীকার করা যায় না যে আমাদের দেশের লোক বলতে যারা, তাদের বুদ্ধিবৃত্তি primitive, শিশুর মতন। একটি হাকীমকে দুঃখের কথা জানাতে পারলেই তারা খুশী। তারা কি এত বোঝে, রাজস্ব-বিভাগ, কৃষি-বিভাগ, পূর্ত্ত-বিভাগ, স্বাস্থ্য-বিভাগ, শিক্ষা-বিভাগ! যখন ছাপান্ন সংবতে দুর্ভিক্ষের প্রথম সূত্রপাত হল, গভর্ণমেণ্ট ত লীলী সাহেবের কথায় কানই দিলেন না। তার পর যখন Relief ক্যাম্প আরম্ভ করলেন, তখনও এমন মজুরী ধরে দিলেন যে তাতে একটা লোকের পেট ভরতে পারে না। সব চেয়ে জুলুম হল যখন সেই আধপেটা মজুরীরও খানিকটা কেটে নেওয়া হতে লাগল জরিমানা বলে। আমি এমনও দেখেছি যে সপ্তাহের পর সপ্তাহ একটা ক্যাম্পের সমস্ত মজুরের জরিমানা হচ্ছে। ওভারসিয়াররা বলতেন, "মজুরগুলো ভয়ানক কুঁড়ে। নইলে কাজ এত কিছু বেশী ধরে দেওয়া হয় নেই। R—ও আমি বেশ নজর করে দেখতে লাগলাম, কিন্তু কুঁড়েমির লক্ষণ কিছুই ধরতে পারলাম না। শরীরের ঐ অবস্থায় ওর চেয়ে বেশী কাজ করা অসম্ভব। একদিন দেখি এক তলাওয়ে কুলীরা সবাই শক্ত কালো এঁটেল মাটি কোপাচ্ছে, আর P. W. D-র টিকিটে লেখা রয়েছে— সাধারণ বালি মাটি। আমি ওভারসিয়ারকে জিজ্ঞাসা করলাম, "এ রকম জুলুম করছেন কেন, মশায়।" তিনি হেসে উঠলেন, "স্যর, গুজরাতের সব

মাটিই যে ধরে নিতে হবে বালি-মাটি! এই আমাদের নিয়ম।” চমৎকার নিয়ম! এর উপর আর কথা কি! কমিশনারকে জানালাম। কার্জ্জন সাহেবের হুকুমে পরে এই গরীব বেচারাদের মজুরী কিছু বাড়ান হল। এই আমাদের মস্ত লাভ! লাট কার্জ্জন বাঙ্গালী Bourgeoisie-র পরম শত্রু হলেও হৃদয়বান পুরুষ ছিলেন। অনেক ক্ষেত্রেই তাঁর উদারতার পরিচয় দিয়ে গেছেন। এই সাহেবের গুজরাত-পরিদর্শনের দুটো একটা গল্প করব। শোনা গল্প, কেন না আমার মতন সামান্য লোক দূরে দূরেই ছিল।

আহমদাবাদ ষ্টেশনে লাট নামলে নগরশেঠ মণিভাই তাঁকে অভ্যর্থনা করলেন। লীলী সাহেব মণিভাইয়ের পরিচয় দিলেন। লাট সাহেব করমর্দ্দন করতে করতেই গোটা দশেক প্রশ্ন ফায়ার করলেন—মেশিন-গানের গুলির মত। জবাবের জন্য এক সেকেণ্ডও থামলেন না। “ওঃ! আপনি মণিভাই? প্রেমাভাই বুঝি আপনার বাপের নাম? আপনাদের বুঝি পদবী থাকে না? আপনি নগরশেঠ? তার মানে ত লর্ড মেয়র? আচ্ছা, কত পুরুষ আপনারা মেয়রী করছেন? ইত্যাদি ইত্যাদি।” মণিভাই আমাকে পরে বললেন যে, আর একটু হলেই তিনি মাথা ঘুরে পড়ে যেতেন, ভাগ্যিস্ লাট সাহেব আর একজনকে নিয়ে পড়লেন।

আহমদাবাদের কাছে এক গাঁয়ে গোবিন্দভাই বলে এক বৃদ্ধ বিচক্ষণ পটেল ছিলেন। তাঁর ডাক পড়েছিল বড়লাট সাহেবের হুজুরে। মণিভাইয়ের মত তাঁকেও খাড়া থাকতে হয়েছিল Lewis Gun-এর সুমুখে। তবে ভদ্রলোক জাতে পাটীদার, মাথা ঘুরে পড়বার পাত্র ত নয়! লাটকে পালটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে লেগে গেলেন, “বিলেতে গ্রাম আছে, হুজুর? না সবই শহর? গ্রামের পটেল আছে ত? পটেলরাও কি জাতে সাহেব? ইত্যাদি ইত্যাদি।” কমিশনার তাকে থামিয়ে দিলেন চুপি চুপি এই কথা বলে, “লাটকে সওয়াল জিজ্ঞেস করতে নেই, পটেল। রাগ করবেন যে!” গোবিন্দভাই আমার বন্ধু ছিলেন। আমাকে সব গল্পটা করে বললেন, “সাহেব, তোমাদের কলকাতার লাট খুব বুদ্ধিমান। তবে যতটা হুশিয়ার নিজেকে মনে করে, ততটা নয়!”

এই ত গেল লাট সাহেবের সাধারণ ভদ্রলোকদের সঙ্গে ব্যবহার। আমলাবর্গের সঙ্গে ব্যবহার একটু অন্য রকমের। ষ্টেশন থেকে লাট আমাদের কলেক্টরকে সঙ্গে নিয়ে গাড়ীতে উঠলেন। যেতে যেতে জিজ্ঞাসা করলেন, "মিষ্টার G—রাণী সিপ্রীর মসজিদ কোনখানটায়?" G—নম্রভাবে উত্তর দিলেন, "আজ্ঞে, আমি জিজ্ঞাসা করে বলছি।" কার্জ্জন চেঁচিয়ে উঠলেন, "জিজ্ঞাসা করে বলবেন! আপনি নিজে জানেন না।" G—বললেন, "আজ্ঞে না, দেখবার সময় পাই নেই। দুর্ভিক্ষের কাজে ব্যস্ত আছি।" লাট এবার চেঁচালেন না। খুব চিবিয়ে চিবিয়ে টিপ্পনী কাটলেন, "সময় পান নেই! না, দেখা দরকার মনে করেন নেই? এ বিষয়ে আমারও একটা মত আছে। সেটা জেনে রাখুন। একজন সিনিয়ার কলেক্টর নিজের জেলার পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধে কিছুই জানেন না, এতে সরকারের ইজ্জৎ বাড়ে না।" G—ততক্ষণে ভীষণ চটে গেছে। কোন রকমে রাগ হজম করে উত্তর দিলে, "I am sorry, Sir."

এই ঘটনার ফলে আর এক মজা হল। গুজরাত থেকে লাট সাহেবের সওয়ারী যাওয়ার কথা বিজাপুরে। পাঠক নিশ্চয় জানেন যে বিজাপুর আদিল শাহী রাজাদের প্রাচীন রাজধানী। সেকালের অধিকাংশ ইমারৎ আজও দাঁড়িয়ে আছে। তখন বিজাপুরের কলেক্টর ছিলেন এক বৃদ্ধ সিবিলীয়ান D—। D— চমৎকার লোক ছিলেন, কিন্তু একেবারে লালমুখো বিফখোর জন বুল। তার জীবনে কখনও নেটীবদের ইতিহাস নিয়ে মাথা ঘামায় নেই। সে কার্জ্জন-গিব সংবাদ শুনে চোখে শরষে ফুল দেখতে লাগল। করে কি? সেখানকার ইঞ্জিনীয়ার আহমদী সাহেবের হাতে পায়ে ধরে, তাঁকে দিয়ে এক ছোট্ট বই লিখিয়ে নিয়ে সেটা আগাগোড়া মুখস্থ করে ফেললে। বুড়ো বয়সে এমন মুখস্থ করলে যে দেড় বছর বাদে যখন আমার সঙ্গে আলাপ হল, তখনও একটা কথা ভোলে নেই।

G— ত ধমকানি খেলে পুরাতত্ত্ব নিয়ে! কিন্তু পাঁচ মহলের কলেক্টর S— সাহেব একেবারে হাতে-নাতে ধরা পড়ে গেল। বেচারা লাটকে

নিয়ে খুব বুক ফুলিয়ে গোধরার Relief ক্যাম্প দেখাচ্ছে। মস্ত ক্যাম্প, কুলীরা পর্য্যন্ত পরিষ্কার কাপড় পরে রয়েছে, চারিদিক ঝক ঝক করছে, কোথাও একটি কুটো পড়ে নেই। লাটকেও বেশ সন্তুষ্ট দেখাচ্ছে। ঘুরতে ঘুরতে সবাই পৌঁছলেন বেনের দোকানের কাছে। লাট এদিক ওদিক নজর করে জিজ্ঞাসা করলেন, "মিষ্টার S— এই দোকানের সামনে একটা দরের Tariff তালিকা টাঙ্গিয়ে রাখবার কথা না ?" S— বেশ বৈঠকী মানুষ ছিলেন। অমায়িক হাসি হেসে উত্তর দিলেন, "আজ্ঞে হাঁ। বোধ হয় থাকা উচিত।" লাট গর্জ্জন করে উঠলেন, "বোধ হয়! বোধ হয়! এখনই যান, খবর নিন কেন Tariff টাঙ্গান হয় নেই।" S— চোখ রাঙ্গা করে দোকানের ভেতর চলে গেল। দু' মিনিটে বেরিয়ে এল এক তক্তা হাতে করে। বললে, "এই ত রয়েছে নিরিখ্ Tariff!" কার্জ্জন চলে যেতে যেতে বললেন, "দোকানের ভেতরে থাকার কথা নয়। বাহিরে টাঙ্গিয়ে রাখা নিয়ম। আপনি আগে এখানে যখন এসেছিলেন তখন টাঙ্গান দেখেছিলেন কি ?" S— অনেকদিন সে ক্যাম্পে আসেন নেই, কি বলবেন ঠিক করতে পারছিলেন না। লাট সকলের সামনেই চেঁচিয়ে উঠলেন, "আপনি এ ক্যাম্পে আগে কখন আসেন নেই না কি ? দেখুন মিষ্টার S— কলেক্টরের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সম্বন্ধে আমারও একটা ধারণা আছে, জানবেন।" বলে S— এর দিকে পেছন ফিরে দাঁড়ালেন।

G—র গল্পটা G— নিজেই আমাকে বলেছিলেন। S—এর গল্পটা শুনেছিলাম আর একজন বড় সাহেবের কাছ থেকে। তিনি উপস্থিত ছিলেন সেখানে। গল্পগুলো থেকে এইটুকু বোঝা যায় যে লাট কার্জ্জন কারও খাতির রেখে কথা কইতেন না, সাহেবদেরও না।

এই দাম্ভিক কার্জ্জনকে একদিন কর্ণেল লরেন্স Versailles-এ কাঁদিয়েছিলেন, গল্পটা পাঠকের মনে আছে কি ? লর্ড সেসিল তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, "চোখ মুছে ফেল, শীগ্‌গীর। বিদেশীগুলো দেখলে মনে করবে কি ?"

কোথা থেকে কোথায় এসে পড়লাম! আজ এইখানেই বন্ধ করি।

শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত

বুদ্ধদেবের 'নাস্তিকতা'

৪

আমরা দেখিয়াছি, বুদ্ধদেবের মতে পুরুষ=সৎকায়+বিজ্ঞান ধাতু। রূপকায় (Physical Body) ও নামকায় (Mental Body অর্থাৎ চিত্ত বা Soul) মিলিয়া সৎকায়—এবং বিজ্ঞান ধাতু=সমষ্টি বা আলয়বিজ্ঞানের অর্থাৎ সেই অনিদ্দসনং অনন্তং সব্বতোপহং ('invisible, boundless, all-penetrating') Universal Principleএর, ব্যক্তি-বিশেষ কর্তৃক স্বী-কৃত অংশ বা কলা।*

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ—গীতা, ১৫।৭

আমরা আরও দেখিয়াছি, বুদ্ধদেবের মতে দেহের নাশের সহিত দেহীর (জীবের) বিনাশ হয় না ('There *is* existence after death'); কিন্তু মৃত্যুর পর তাহার দৈব কিম্বা মানুষ কিম্বা নারক কিম্বা পৈশাচ কিম্বা তির্য্যক্ যোনিতে জন্মান্তর হয়।

'This existence is effected by re-birth—strictly speaking by palingenesis, within one of the five realms mentioned above'.

অর্থাৎ দেবলোকে দৈব জন্মে—দেবশরীর গ্রহণ,
অথবা মনুষ্যলোকে মানুষ জন্মে—মানব শরীর গ্রহণ,
অথবা নরকলোকে নারক জন্মে—নারকীয় শরীর গ্রহণ,
অথবা প্রেতলোকে পৈশাচ জন্মে—প্রেতশরীর গ্রহণ,
অথবা পশুলোকে তির্য্যক্‌জন্মে—পাশব শরীর গ্রহণ ঘটে।

Five in number, Sariputta, are the fates which may befall after death; namely these: passage into the hell world, the animal kingdom, the realm of shades, the world of men or the abodes of the gods—M. N. I, p. 73.

পাঠকের স্মরণ হইবে, ঐ প্রসঙ্গে আমরা ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক-উপনিষদের বচন উদ্ধৃত করিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছিলাম যে, এই মতের সহিত উপনিষদের উপদেশ সমঞ্জস।

* 'Nama-rupa *together with* consciousness' constitute the individual (পুরুষ)

য ইহ কপূয়চরণাঃ কপূয়াং যোনিম্ আপদ্যেরন্ (ছান্দোগ্য) = 'যাহাদের জঘণ্য আচরণ, তাহারা হীনযোনি প্রাপ্ত হয়—যেমন কুক্কুরযোনি বা শূকরযোনি।

'যেমন জোঁক এক তৃণ ছাড়িয়া তৃণান্তর আশ্রয় করতঃ নিজকে সংহৃত করে, ঐরূপ জীব এক দেহ ছাড়িয়া দেহান্তর আশ্রয় করতঃ আপনাকে সংহৃত করে। যেমন স্বর্ণকার সুবর্ণখণ্ড লইয়া তদ্দ্বারা নবতর কল্যাণতর রূপ রচনা করে (নবতরং কল্যাণ-তরং রূপং তনুতে), ঐরূপ জীব মৃত শরীর পরিত্যাগ করিয়া পিতৃলোক বা গন্ধর্ব্বলোক বা দেবলোক বা প্রজাপতিলোক বা ব্রহ্মলোক বা অন্যলোকের উপযোগী শরীর রচনা করে (অন্যৎ নবতরং কল্যাণতরং রূপং তনুতে পিত্র্যং বা গান্ধর্ব্বং বা দৈবং বা প্রাজাপত্যং বা অন্যেষাং বা ভূতানাম্ (বৃহদারণ্যক)

বুদ্ধদেবের জাতি-স্মরতা

জন্মান্তর যুক্তিসিদ্ধ কিনা *—মানুষের পক্ষে দেবযোনিতে উত্তরণ বা পশুযোনিতে অবতরণ সম্ভবপর কি না, বুদ্ধদেবের নিকট এ সকল প্রশ্ন নিরর্থক ছিল। কারণ, নিরঞ্জনাতীরে বোধিদ্রুমতলে যে দিন তিনি সম্বোধিলাভ করেন, ঐ দিন পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্ম তাঁহার ধ্যানপূত দৃষ্টির সমক্ষে করকলিত কুবলয়বৎ প্রত্যক্ষ হইয়াছিল। তাঁহার নিজের মুখের কথা শুনুন।

And with thought thus fixed, cleansed, purged and stainless, I turned my mind towards the recollection and recognition of previous modes of existence. And I called to mind my various lots in former lives : first one life, then two lives, then three, then four, then five, ten, twenty up to fifty lives ; then a hundred lives ; then a thousand lives ; then a hundred thousand lives. * * There was I. That was my name. To that family I belonged. That was my position, that was my occupation, such the weal or woe that I experienced, thus was

* এ সম্বন্ধে যাঁহার জিজ্ঞাসা (জ্ঞাতুম্ ইচ্ছা) আছে, তিনি মৎপ্রণীত 'কর্ম্মবাদ ও জন্মান্তর' পাঠ করিতে পারেন। ঐ গ্রন্থে জন্মান্তরের সাধক অনেক দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক যুক্তি সংগৃহীত আছে।

দেবলোক যদি কাল্পনিক না হয়, তবে যে নিরয়লোক থাকিবেই এ কথা প্রতিপন্ন করিয়া অধ্যাপক গ্রিম্ বলিয়াছেন—Of course the extreme in the direction of untainted happiness, such as is said to be found within the heavens, we easily agree with ; but in any case, this much is clear, that if there are heavens, according to the law of polarisation, there must also be states of the opposite extreme, designated as hells, in whatever form we choose to picture these states. (p 112)

my life's ending. Thence departing, there I came to existence anew. There now was I. This was my rank now. This was my occupation. Such and such the fresh weal or woe I underwent. Thus was now my life's ending. Departing, once more, I came into existence again elsewhere. In such wise I remembered the characteristics and particulars of my varied lots in previous lives.—মজ্ঝিমনিকায়, I, p. 38.

এইরূপ 'জাতিস্মর' হইয়া বুদ্ধদেব সেই সময়ে এই গাথাটি আবৃত্তি করিয়াছিলেন ঃ

অনেক জাতি সংসারং সন্ধবিস্‌সং অনিব্বিসং।
গহকারং গবেসন্তো দুক্‌খা জাতি পুনপ্পুনং ॥ —ধম্মপদ, জরাবর্গ

'এই দেহরূপ গেহকারক 'ঘরামির' অন্বেষণ করিতে করিতে অনেক যোনিতে নিজের সংসৃতি (জন্মনঃ জন্মান্তরপ্রাপ্তিঃ) স্মরণ করিলাম এবং জানিলাম 'দুঃখা জাতিঃ পুনঃপুনঃ (the endless painful round of rebirth)।

সেই জাতিস্মর শ্রীকৃষ্ণের কথা—

বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন।
তান্ অহং বেদ সর্ব্বানি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ ॥ —গীতা, ৪।৫

তাই বুদ্ধদেব শিষ্যদিগকে বলিয়াছিলেন—

Without beginning or end, O monks, is this round of rebirth (সংসৃতি) * * Beings, sunk in ignorance and bound by thirst, are incessantly transmigrating and again and again run to a new birth.—সংযুক্তনিকায়, II, p. 187.

অতএব তাঁহার নিকট প্রশ্ন এই ছিল—ঐ অনাদি জন্মান্তর কিরূপে সিদ্ধ হয়—অর্থাৎ জন্মান্তরের প্রণালী ও প্রকার কিরূপ ?

নবজন্ম না পুনর্জন্ম ?

যাহারা শাশ্বত জীব (immortal Soul) স্বীকার করেন, তাঁহারা বলিবেন—একই Re-incarnating Ego, স্থির ব্যক্তি রূপে (immutable individual রূপে) জন্মে জন্মে ভিন্ন ভিন্ন শরীর গ্রহণ করে—যেমন একই নট রঙ্গমঞ্চে ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকা গ্রহণ করে—কখন বৎসরাজ হয়, কখন অজাতশত্রু হয়, কখন রাবণ হয়, কখন পরশুরাম হয়।*

---

* যথাহি নটস্তাং তাং ভূমিকাং বিধায় পরশুরামোবা অজাতশত্রুর্বা বৎসরাজোবা ভবতি এবং তত্তৎ স্থূলশরীর-গ্রহণাৎ দেবো বা মনুষ্যোবা পশুর্বা বনস্পতির্বা ভবতি সূক্ষ্মং শরীর মিত্যর্থঃ।—বাচস্পতি মিশ্রের ৪৭ সাংখ্যকারিকার ভাষ্য

ইহারই গ্রীক্ নাম Metempsychosis—অর্থাৎ the passing of the soul after death into some other body (from meta = change, and empsychosis = an animating soul)। কিন্তু বুদ্ধদেব যখন শাশ্বত 'সোল' (constant and immutable soul) মানিতেন না, যখন তাঁহার দৃষ্টিতে 'It is an utterly and entirely foolish idea'—যখন তাঁহার মতে আমাদের লোকোত্তর আত্মা, আমাদের আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান-ধাতু (our real essence)—সেই অনিদ্দসনং অনন্তং সব্বতোপহং, সেই invisible, boundless, all-pervading আলয়-বিজ্ঞানের ব্যক্তিবিশেষ কর্তৃক স্বীকৃত ভগ্নাংশ (the adaptation to specific purposes, by the body (নামরূপ) of the universal consciousness)—তখন Metempsychosis কখনও তাঁহার অনুমোদিত হইতে পারে না। সেই জন্য দেখা যায় জন্মান্তর তাঁহার মতে পুনর্জন্ম নহে—নবজন্ম—যাহাকে Palingenesis বলে।

(Palin = again, and genesis = birth). Palin-genesisএর আভিধানিক অর্থ a new birth, the development of an individual germ, in which it repeats that of its ancestors. এ সম্পর্কে অধ্যাপক গ্রিম লিখিয়াছেন—Palingenesis means decomposition and *renewal* of the entire individual; thus the dying creature perishes entirely, together with its consciousnesss (বিজ্ঞান-স্কন্ধ), but there remains a *germ*, from which a new individual arises, together with new consciousness, 'man thus, ripening like corn and ripening always again and again'. (p. 108)

সস্যমিব মর্ত্ত্যঃ পচ্যতে সস্যমিবা জায়তে পুনঃ—কঠ, ১।৭

'On death, a worn-out creature has perished but contained the indestructive germ from which this new existence (has) originated : they are one being.' (p. 109)

'অন্তে বৃক্ষের বীজেই স্থিতি এবং সেই বীজ হইতে নববৃক্ষের উৎপত্তি'—জন্মান্তর সম্পর্কে এই উপমানের প্রয়োগ আমাদের অপরিচিত নহে। বৃহদারণ্যকে যাজ্ঞবল্ক্যের মুখেও আমরা ঐ উপমানের কথা শুনিয়াছি।

যথা বৃক্ষো বনস্পতি স্তথৈব পুরুষোঽমৃষা —বৃহ, ৩।৯।২৮

'যে ভাবে বৃক্ষ অক্ষয়, সেই ভাবে পুরুষ অব্যয়।' কি ভাবে? বৃক্ষ অঙ্কুরিত হয়, পল্লবিত হয়, বিটপিত হয়, পুষ্পিত হয়, ফলিত হয়। তা'র পর? মাটিতে তিরোহিত হয়। কিন্তু বৃক্ষ একেবারে বিনষ্ট হয় না —বীজরূপে রহিয়া যায়। সেই বীজ হইতে বৃক্ষের নবজন্ম হয়—আবার অঙ্কুর, পল্লব, বিটপ, আবার ফুল ফল—বীজগর্ভ ফল হয়। বৃক্ষ বীজ—বীজ বৃক্ষ—অনাদি কাল হইতে নব নব বীজ, নব নব বৃক্ষ।

যদ্ বৃক্ষো বৃক্ণো রোহতি মূলাৎ নবতরঃ পুনঃ।
মর্ত্ত্যঃস্বিৎ মৃত্যুনা বৃক্ণঃ কস্মাৎ মূলাৎ প্ররোহতি॥
—বৃহ, ৩।৯।২৮।৪

বৃক্ষের, এই যে নবজন্ম—(প্রেত্যসম্ভবঃ) তাহার নিদান কি?

ধানারুহ ইব বৈ অঞ্জসা প্রেত্য সম্ভবঃ।

পুরুষের যে নব নব জন্ম, পুনঃপুনঃ তিরোভাবের পর পুনঃ আবির্ভাব, —উহাও ঠিক বৃক্ষেরই মত। পুরুষের নব নব জন্মের নিদান কি? তাহার অব্যয় 'বাসনা'-বীজ 'the indestructive germ from which the new individual arises each time.'*

গীতাতে ব্রহ্মকে বিশ্বের সনাতন বীজ বলা হইয়াছে।

বীজং মাং সর্ব্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্—গীতা, ৭।১০

---

* থিয়োসফিক্যাল গ্রন্থে আমরা যে Permanent Atomsএর কথা শুনিতে পাই, সেও এই ধরণের কথা। মৃত্যুর পর ভূলোকে আমাদের অন্নময় কোষ বিশ্লিষ্ট হইলে উহার বীজস্বরূপ একটি Physical Permanent Atom রহিয়া যায়; ঐরূপ ভুবর্লোকে আমাদের প্রাণময় কোষ বিশ্লিষ্ট হইলে তাহারও বীজস্বরূপ একটি Astral Permanent Atom এবং স্বর্লোকে আমাদের মনোময় কোষ বিশ্লিষ্ট হইলে তাহারও বীজস্বরূপ একটি Mental Permanent Atom রহিয়া যায়। ঐ তিনটি Permanent Atomএ আমাদের ভাবনা, কামনা ও চেষ্টনার (Thoughts Desires & Actionএর) সমস্ত সংস্কার বীজভাবে নিহিত থাকে। পরে নবজন্মের সময় হইলে ঐ তিনটি বীজ হইতে নবজাত বৃক্ষরূপে আমাদের নূতন অন্নময়, প্রাণময় ও মনোময় কোষের উৎপত্তি হয়। ইহার সহিত বেদান্ত সূত্রে আমরা যে অণুত্রয়ের প্রসঙ্গ শুনিতে পাই তাহা তুলনীয়।

তদন্তরপ্রতিপত্তৌ রংহতি সংপরিষক্তঃ—ব্রহ্মসূত্র, ৩।১

তদন্তরপ্রতিপত্তৌ দেহাৎ দেহান্তর-প্রতিপত্তৌ দেহবীজৈঃ ভূতসূক্ষ্মৈঃ সংপরিষক্তো রংহতি গচ্ছতি ইতি অবগন্তব্যম্ (শঙ্করভাষ্য)

অর্থাৎ জন্মান্তর গ্রহণের জন্য জীব দেহবীজ 'ভূতসূক্ষ্ম' দ্বারা পরিষক্ত হইয়া স্বর্গলোক হইতে ভুবর্লোকের মধ্য দিয়া ভূর্লোকে অবতরণ করে। ঐ 'ভূতসূক্ষ্ম' কি? পরবর্ত্তী সূত্রে সূত্রকার তাহার পরিচয় দিয়াছেন।

ত্র্যাত্মকত্বাৎ তু ভূয়স্ত্বাৎ—৩।১।২

ত্র্যাত্মকস্তু দেহঃ ত্রয়াণামপি তেজোপ্-অন্নানাং তস্মিন্ কার্য্যোপলব্ধেঃ (শঙ্কর ভাষ্য)। ভূতসূক্ষ্ম কি কি? তেজঃ, অপ্, ও অন্ন অর্থাৎ ক্ষিতিতত্ত্ব, অপ্‌তত্ত্ব ও অগ্নিতত্ত্ব নির্ম্মিত, তিনটি পরমাণু—থিয়সফিক্যাল গ্রন্থে যাহাদিকে 'Permanent Atoms' বলা হইয়াছে।

ব্যক্ত সৃষ্টি প্রলয়ে অব্যক্ত হইয়া প্রলীন অবস্থায় বীজভাবে বিদ্যমান থাকে। ঐ বীজ হইতে আবার নূতন সৃষ্টির উদয় হয়। এইরূপে সৃষ্টির পর প্রলয়, প্রলয়ের পর সৃষ্টি—অনাদি কাল হইতে পর্য্যায়ক্রমে প্রসৃত হইতেছে। পুরুষের জন্মান্তর—নব নব জন্ম, তিরোভাবের পর পুনঃ পুনঃ আবির্ভাব, ইহার ক্রম ও পর্য্যায়ও ঐরূপ।

Palingenesisএর প্রামাণিকতা

এই যে Palingenesis—বুদ্ধদেব যাহার অনুমোদন করিয়াছেন, অধ্যাপক গ্রিম বলেন যে হিউমের ন্যায় অত্যধিক সংশয়বাদী দার্শনিকও ইহার সম্বন্ধে পক্ষপাত প্রদর্শন করিয়াছেন এবং সোপেনহাওয়ারের মত প্রগাঢ় দর্শনবিৎও ইহার পক্ষপাতী।

Even Hume, through 'excessively empirical' as Schopenhauer calls him, says in his sceptical treatise on Inmortality that this system is the only one of its kind to which philosophy can pay heed. It is also, according to Schopenhauer, a postulate of Practical Reason. p. 108

স্যার অলিভার লজ তাঁহার Making of Man গ্রন্থে যে ভাবে জন্মান্তরবাদের আলোচনা করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয় এই Palingenesis তাঁহারও অনুমোদিত। স্যার অলিভার লজ বলেন, We are each of us larger than we know * * that each of us is only a partial incarnation of a larger self অর্থাৎ আমাদের ব্যক্ত সম্বিৎ এক বিরাটতর সম্বিতের খণ্ড প্রকাশমাত্র। কোন এক larger Consciousness (তাঁহার মতে) দুইহাজার বৎসর পূর্ব্বে কবি ভার্জিলরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। ভার্জিলের দেহান্ত হইলে ভার্জিল-ব্যক্তি কর্ত্তৃক স্বীকৃত সম্বিৎ (individualised consciousness) ঐ বিরাটতর সম্বিতে অস্তমিত হইল—ভার্জিলের অর্জ্জিত সমস্ত সংস্কারের সহিত। দুই হাজার বৎসর পরে ঐ সম্বিৎ আবার কবি টেনিসনের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিল। ভার্জিল ও টেনিসনে যে কবিত্বগত সৌসাদৃশ্য দৃষ্ট হয়, ইহাই তাহার প্রকৃত কারণ।*

---

*থিয়োসফিক্যাল গ্রন্থে Group Soul সম্পর্কে যে সকল উপদেশ আছে, তাহা অনেকটা এই ধরণের কথা।

As regards Reincarnation, it is probably a mistake to suppose that the same individual whom we know in bodily form is likely to appear again, at some future date. There may be exceptions, but as a rule that seems unlikely to happen. What may happen, however, is that some other portion of the larger self becomes incarnate ; and if so, it would be likely to feel a strong affinity, though often in a vague and puzzled way, with some other portion which had been embodied previously. And, again if this second incarnate portion happened to include some part of what had gone to make the previous individual, then there might not only be a sense of affinity, but some kind of reminiscence, some memory of places and surroundings which had previously been familiar.

How large a subliminal self may be, one does not know ; but one can imagine that in some cases it is very large, so that it contains the potentiality for the incarnation not only of a succession of ordinary individuals, but of really great men. It would be a mistake to suppose that Dante and Tennyson were reincarnations of Virgil, but one might, though presumptiously, imagine that all three were incarnations of one great subliminal self, which was able to manifest itself in different portions, having a certain family likeness, though without any necessary bodily consanguinity or inheritance in the ordinary sense.

—The Making of Man. pp. 170, 172

স্যার অলিভার লজ যে ভাবে জন্মান্তরের সমর্থন করিলেন বুদ্ধদেবের উপদিষ্ট Palingenesisএর সহিত ইহার খুব সামঞ্জস্য নাই কি ?

সংসার অনাদি কিন্তু সান্ত

আমরা দেখিয়াছি, বুদ্ধদেবের মতে সংসার (Round of rebirths) অনাদি। তিনি দীর্ঘনিকায়ে বলিয়াছেন—

Through not understanding, through not penetrating the four noble truths, O Bhikkhus, we have wondered round this long long journey—you and I—(from the beginingless infinity of the past).—দীর্ঘনিকায় ২—৯০

সংসার এইরূপে অনাদি বটে কিন্তু বুদ্ধদেব বলেন, উহা অনন্ত নহে।

"Whatever there may be, bretheren! of things created and not created, the hightest of them is the destruction of the circle of Sansara" (সংসার চক্র) —অঙ্গুত্তর নিকায়, II, p. 34.

সেই উদ্দেশ্যেই তিনি আর্য্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ উপদেশ করিয়াছেন—for getting out of the circle of rebirths, out of sansara, as the supreme goal of all sanctity। বুদ্ধদেব বলিয়াছেন—Everyone is in a position to determine whether he shall be reborn or not। যে কেহ সন্নদ্ধ হইয়া পরাক্রমের সহিত ঐ সাধন মার্গে বিচরণ করিবে, সেই জন্মান্তরের অতীত হইতে পারিবে (has the power of making a future birth impossible.)। কারণ, ঐরূপ উপায় দ্বারা—

There is the possibility of protecting ourselves in our inscrutable essence, against a repetition of these processes in future time, that is in a new existence.

যিনি ঐ পথের শেষ পর্য্যন্ত প্রয়াণ করিবেন, তিনিই বুদ্ধদেবের সহিত সুর মিলাইয়া বলিতে পারিবেন—

"Rebirth is exhausted, lived out the holy life, done what was to do ; no more is this world for me". or, as it is said in another passage : "unshakable is my deliverance, this is the last birth, there is no more becoming anew."

খীনা জাতি, বুসিতং ব্রহ্মচরিয়ং, কতং করণীয়ং, না পরং ইথত্তা যাতি

—মজ্ঝিম নিকায়

অর্থাৎ পুনর্জ্জন্ম নিঃশেষিত হইয়াছে, ধর্ম্মজীবন উদ্‌যাপিত হইয়াছে, করণীয় অবসিত হইয়াছে—আর কোন কিছু অবশিষ্ট নাই—যিশু খৃষ্টের ভাষায়—It is finished—Consummation est.

অনাগামিন্

যিনি এই অবস্থায় উপনীত হইয়াছেন, বৌদ্ধ পরিভাষায় তাঁহাকে 'অনাগামিন্' বলে। 'অনাগামী' অর্থে সংসারে যাহার পুনরাগমন হইবে না। অর্থাৎ যিনি জীবন্মুক্ত—যাঁহার এই শরীরই অন্তিম শরীর।

স বে অন্তিমসারীরোমহাপঞ্‌ঞো মহাপুরিসো তি বুচ্চতি —তন্‌হা বর্গ, ১৯

দন্তং অন্তিমসারীরং তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং—ব্রাহ্মণ বর্গ, ১৮

তিনি তখন বুদ্ধ-বাণীর প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতে পারিবেন—

গহকারক ! দিট্ঠোসি পুনগেহং ন কাহসি (জরাবর্গ)

'হে ঘরামি ! এইবার তোমার 'হদিস' পাইয়াছি—অহো ! তুমি দৃষ্টিগোচর হইয়াছ। আর নূতন ঘর গড়িতে পারিবে না'। সব্বা তে পাসুকা ভগ্গা গহকূটং বিসংখিতং—তোমার সব খুঁটি (পঞ্চস্কন্ধ) চূর্ণ হইয়াছে, তোমার গৃহচূড় আজ ধূলিসাৎ'—কেন ?

বিসঙ্খারগতং চিত্তং তন্হানং খয়ম্ অজ্ঝগা—আজ আমার চিত্ত সংস্কারহীন, আমার তৃষ্ণা নির্ব্বাপিত।

এই দশাকে বুদ্ধদেব 'নিব্বাণস্সেব অন্তিকে' 'এস পাত্তোসি নির্ব্বাণং'—নির্ব্বাণ-দশা বলিয়াছেন।

নির্ব্বাণী 'অর্হৎ'

যিনি 'নির্ব্বাণস্য অন্তিকে'—নির্ব্বাণের নিকটস্থ, বৌদ্ধ পরিভাষায়, তাঁহাকে 'অর্হৎ' বলে—নমো তস্সো ভগবতো অর্হতো সম্মাসম্বুদ্ধস্স। যিনি অর্হৎ, নিন্দাস্তুতি তাঁহার নিকট তুল্যমূল্য—

এবং নিন্দাপসংসাসু ন সমিঞ্জন্তি পণ্ডিতা—ধম্মপদ

জয়পরাজয়, লাভক্ষতি, তাঁহার নিকট অভিন্ন—

উপসন্তো সুখং সেতি হিত্বা জয়পরাজয়ং—সুখবগ্গো

যিনি অর্হৎ, তিনি হৃদিস্থিত কাম-লতাকে সমূলে উচ্ছিন্ন করিয়া 'কামতো বিপ্পযুত্ত' হইয়া, অকাম নিষ্কাম হইয়াছেন। সুতরাং সুখে অথবা দুঃখে তাঁহার সমান বোধ—

সুখেন ফুট্ঠা অথবা দুক্খেন
ন উচ্চাবচং পণ্ডিতা দস্সয়ন্তি।

তিনি বুদ্ধদেবের উক্তির প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতে পারেন—

যে মে দুক্খং উপাদন্তি, যে চ দেন্তি সুখং মম।
সব্বেসং সমকো হোমি দেন্যো কোপি ন বিজ্জতি ॥
সুখ দুক্খে তুলাভূতো যসেসু অযসেসু চ।
সব্বত্থ সমকো হোমি এসা মে উপেক্খা পরং ॥ —চর্য্যাপিটক, ৩

যাহারা আমাকে দুঃখ দেয় এবং যাহারা আমাকে সুখ দেয়—তাহারা সকলেই আমার পক্ষে সমান—তাহাদের সম্পর্কে আমার রাগ বা দ্বেষ নাই। সুখ দুঃখ আমার নিকট তুল্যমূল্য—যশঃ ও অযশঃ সর্ব্বত্রই আমি সমান—ইহাই আমার চরম উপেক্ষা (Perfection of my equanimity)

তিনি রাগদ্বেষ ও মোহের অতীত—অরাগো অদেসো অমোহো অনঙ্গনো অসংকিলিট্ঠ-চিত্তো (মজ্ঝিমনিকায়)—মান ও মন্থ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না।

যস্স রাগো চ দোসো চ মানো মক্খো চ পাতিতঃ।
সাসপোরিব আরাগ্গা তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং॥ —ধম্মপদ

অতএব যিনি অর্হৎ, তিনি পুণ্যপাপবিহীন—

পুঞ্ঞ পাপ পহীনস্স নত্থি জাগরতো ভয়ং —চিত্তবগ্গো।

—উপনিষদের ভাষায় 'বিসুকৃত, বিদুষ্কৃত'। তিনি অনঙ্গন (নিরঞ্জন), অনাসব (অ-ক্লেশ), অনাদান, অকিঞ্চন, অনপেক্ষ, নিরাশী, নিবৃর্ত, কৃতকৃত্য।

ইহাই জীবন্মুক্তির অবস্থা। বুদ্ধদেব স্বয়ং ঐ অবস্থা অনুভব করিয়া বলিতেন—

I have in this life entered Nirvana, while the life of Gautama has been extinguished.

অর্থাৎ যিনি নির্ব্বাণী, তিনি 'already in this *present* life has actually realised complete deliverance from every thing that is *Anatta*—has completed the gigantic task of getting rid of his bondage to this will (তন্হা)—he has burst all the fetters 'whether refined or gross'. × × ×

He takes his stand as a complete stranger (উদাসীনবৎ আসীনঃ) and thereby as a free man over against the world, including the elements of his own personality.

(Grimm's Doctrine of the Buddha. pp. 333 and 336.)

বুদ্ধদেব এই অবস্থার বর্ণনা করিয়া প্রাচীন পদ্মপত্রের উপমা দিয়াছেন—

সেয্যথাপি ব্রাহ্মণ! উপ্পলং বা পদুমং বা পুণ্ডরীকং বা উদকে জাতং উদকে সংবট্ঠং উদকং অচ্চুগ্গম্ম ঠাতি অনুপলিত্তং উদকেন—এবমেব খো অহং ব্রাহ্মণ! লোকে জাতো লোকে সংবট্ঠো লোকং অভিভুয্য বিহরামি অনুপলিত্তো লোকেন —অঙ্গুত্তর-নিকায় II

'Just as, O Brahmin, the blue, red or white lotus flower, originated in the water, grown up in the water, stands there towering above the water, untouched by the water: just so O Brahmin, I am born within the world but I have vanquished the world and unspotted by the world I remain.

অর্থাৎ তদ্‌যথা পুষ্করপলাশে আপো ন শ্লিষ্যন্তে এবম্ এবংবিদি পাপং কর্ম্ম ন শ্লিষ্যতে—ছান্দোগ্য, ৪।১৪।৩

'যেমন পদ্মপত্রকে জল স্পর্শ করেনা, তেমনি জীবন্মুক্তকে পাপ (বা পুণ্য) কর্ম্ম স্পর্শ করে না'—পদ্মপত্রমিবাম্ভসা (গীতা)।

যিনি নির্ব্বাণের তোরণে উপনীত, বুদ্ধদেব অন্যত্র তাঁহার অবস্থা (attitude) এই ভাবে বর্ণন করিয়াছেন—

সো সুখং চে বেদনং বেদেতি সা অনিচ্চা তি পজানাতি, অনজ্ঝোসিতা তি পজানাতি, অনভিনন্দিতা তি পজানাতি। দুক্খং চে বেদনং বেদেতি সা অনিচ্চা তি পজানাতি, অনজ্ঝোসিতা তি পজানাতি, অনভিনন্দিতা তি পজানাতি। অদুক্খং অসুখং চে বেদনং বেদেতি, সা অনিচ্চাতি পজানাতি, অনজ্ঝোসিতা তি পজানাতি, অনভিনন্দিতা তি পজানাতি।

সো সুখং চে বেদনং বেদেতি বিসংযুত্তো নং বেদেতি ; সো দুক্খং চে বেদনং বেদেতি বিসংযুত্তো নং বেদেতি ; সো অদুক্খং অসুখং চ বেদনং বেদেতি বিসংযুত্তো নং বেদেতি। —মজ্ঝিমনিকায়, ৩

তিনি যদি সুখকর বেদন (sensation) অনুভব করেন, তবে তাঁহার বোধ হয়—'ইহা অনিত্য, ইহা অস্বীকৃত (unappropriated), ইহা অনভিনন্দিত'। যদি দুঃখকর বেদন অনুভব করেন তবে তাঁহার বোধ হয়—ইহা অনিত্য, ইহা অস্বীকৃত, ইহা অনভিনন্দিত। যদি অদুঃখ-অসুখকর বেদন অনুভব করেন তবেও তাঁহার বোধ হয়—ইহা অনিত্য, ইহা অস্বীকৃত, ইহা অনভিনন্দিত। তাঁহার অনুভব সুখকর হ'ক, দুঃখকর হ'ক, অদুঃখ-অসুখকর হ'ক, তিনি "বিসংযুক্ত" (উদাসীন) ভাবে তাহা ভোগ করেন।

গীতার সেই প্রাচীন কথা—উদাসীনবদ্ আসীনং * * অসক্তং তেষু কর্ম্মসু। বুদ্ধদেবও ঐ মর্ম্মে আনন্দকে বলিয়াছেন—

পটিখুলং চ অপটিখুলং চ তদ্উভয়ং অভিনিবজ্জেত্বা উপেখকো বিহরেয্যং সতো সংপজানো তি উপেখকো তত্থ বিহরতি সতো সংপজানো এবং খো আনন্দ অরিয়ো হোতি ভাবিতেন্দ্রিয়ো —মজ্ঝিমনিকায়, ৩

অর্থাৎ প্রতিকূল ও অপ্রতিকূল (Repugnant and unrepugnant)—উভয়কেই বর্জ্জন করিয়া উপেক্ষক (উদাসীন ভাবে = with equal mind) বিচরণ করিতে হইবে—সৎ ও সম্প্রজান (thoughtful and clearly conscious) হইয়া। হে আনন্দ! যিনি অরিয়, (আর্য্য—saint) তাঁহার ইন্দ্রিয়গ্রাম এইরূপই বশীকৃত।

এই যে Equal Mind, গীতা ইহাকেই 'সমত্ব' বলিয়াছেন—সমত্বং যোগ উচ্যতে। এই অবস্থার নাম দ্বন্দ্বাতীত হওয়া—

যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টো দ্বন্দ্বাতীতো বিমৎসরঃ—গীতা, ৪।২২

সেই অবস্থায় নির্দ্বন্দ্ব পুরুষ—

প্রকাশং চ প্রবৃত্তিংচ মোহমেব চ পাণ্ডব।
ন দ্বেষ্টি সংপ্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি॥
উদাসীনবদ্ আসীনং গুণৈর্যোন বিচাল্যতে।
গুণা বর্ত্তন্ত ইত্যেব যোঽবতিষ্ঠতি নেঙ্গতে॥—গীতা, ১৪।২২

এই যে উদাসীনবৎ অবস্থান, 'পক্ষপাত-বিনির্মুক্তি'—ইহাই অভিতো ব্রহ্মনির্ব্বার্ণম্', নির্ব্বাণের সমীপস্থ দশা—নিব্বানস্সান্তিকে—

পক্ষপাতবিনির্মুক্তো ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা—ব্রহ্মবিন্দু, ৬

নির্ব্বাণ ও পরিনির্ব্বাণ

দেহ সত্ত্বে এই যে নির্ব্বাণ—সে অবস্থায় 'sensations are still felt × ×

We are not indeed yet free *from* them but stand towards them as *free* men (Grimm p, 325).

তখনও প্রারব্ধের সংস্কার (momentum)-বশে কিছুদিন তাঁহার শরীর-ব্যাপার সচল থাকে অর্থাৎ চক্রভ্রমিবৎ ধৃতশরীরঃ—

Until this six-senses machine has broken up at the death of the saint, in the same way that the potter's wheel still for a time keeps on turning, after the force that had set it in motion has ceased to operate.—The Doctrine of the Buddha, p 377.

সেই জন্য বৌদ্ধেরা এ অবস্থাকে 'সোপাধিশেষ' নির্ব্বাণ বলেন। দেহান্তে ঐ অর্হৎ যখন 'পরিনির্ব্বাণ' লাভ করেন—সে নির্ব্বাণ 'অনুপাধিশেষ' নির্ব্বাণ অর্থাৎ নির্ব্বাণ 'without any remnant of accessories'। সে অবস্থার বর্ণন করিয়া সুত্তনিপাত বলিয়াছেন—

The perfected Holy Ones, having rid themselves of all upadhis are submerged in the deathless (অমৃত)—সুত্তনিপাত

এই পরিনির্ব্বাণ লইয়া প্রাচ্য-বিদ্যাবিশারদদিগের মধ্যে বেশ বাদ বিবাদ আছে। এক দল (ইঁহারা প্রায়শঃ পল্লবগ্রাহী) দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন—The goal of the Buddha's doctrine was the absolute annihilation af Man অর্থাৎ মানবের নাস্তিত্ব-সিদ্ধিই (extinction) বুদ্ধদেশিত ধর্ম্মের চরম লক্ষ্য। কিন্তু একটু নিবিড় ভাবে দেখিলে প্রতিপন্ন হয় যে, এই আক্ষেপ, এই আশঙ্কা একেবারে ভিত্তিহীন। কিন্তু এ কথা বুঝাইতে হইলে অনেক কথা বলিতে হয়। আগামীবারে সে সকল কথা বলিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

প্রতারক
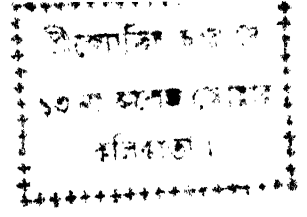
"এ রকম জীবনের কোনো অর্থ নেই। এর চেয়ে মৃত্যু ঢের ভালো।" এটা খেয়ালের উচ্ছ্বাস অথবা কৃত্রিম ভাববিলাস নয়। সম্পূর্ণ ঐকান্তিক প্রার্থনা।

সমস্ত দিনের মধ্যে অজিত চিন্তামুক্ত হ'ত একমাত্র রাত্রিতে, নিদ্রাচ্ছন্ন অবস্থায়। নতুবা তার বাকী সময় কাট্‌ত, সংসারের অর্থসংক্রান্ত প্রধানতম সমস্যাগুলো পূরণ হবে কি ক'রে, তাই ভেবে। অতিরিক্ত ভাবনায় যে কিছু ফল হ'ত এমন নয়; বরং নৈরাশ্যের মাত্রা বেড়েই যেত। তবু চিন্তা করা ছাড়া আর কী উপায় আছে? শূন্যতার মত ভয়াবহ অনুভূতির চেয়ে আত্মপীড়ন বুঝি বেশী কাম্য!

বালিশটাকে উল্টোপিঠ করে নিয়েও তার ঘুম এলনা। মনে হ'ল যদি কালকার সকাল না হয়, তা হ'লে কী আরাম! রাত্রির এই দীর্ঘায়মান অন্ধকারে সুষুপ্তি কি চিরস্থায়ী হয় না? এ সব অসম্ভব কল্পনাতেও মনে স্বস্তি আসে। আশ্চর্য্য নয়; সে ছিল হাস্যরসের গল্পলেখক।

বিবাহ হয়েছিল তার আটাশ বছর বয়সে। সাহিত্য ক্ষেত্রে তখন তার নবীন অভ্যুদয়, মনে ছিল দুর্জ্জয় আশা, যদিও তার সূক্ষ্ম রসবোধের আর্থিক মূল্য দিতে জনসাধারণে ভুল করেছিল। অবশ্য পত্রিকায় সমালোচক-বর্গ আর ঘরেতে স্ত্রী, দু পক্ষই অত্যন্ত আশাপ্রদ কথা বল্‌তেন এবং তাকে লেখায় উৎসাহিত করতেন। কিন্তু ফাঁকা আত্মতৃপ্তিতে কতদিন চলে? একদা সে আতঙ্কে আবিষ্কার করলো যে বিবাহটা হয়ে গিয়েছে অকাল-পরিণত আর সাহিত্য জীবনে আত্মবিশ্বাসও সেই পরিমাণে অপরিপুষ্ট। কিন্তু কোনও সঙ্কল্প গড়ে উঠ্‌বার পূর্ব্বেই গৃহে নব অতিথির আবির্ভাব এবং সেই সঙ্গে যাবতীয় জল্পনার সমাধি ঘট্‌ল।

তারপরের ইতিহাস অতি সহজ ও সনাতন। শিশু এল একাকী কিন্তু সঙ্গে নিয়ে এল অনেক চাহিদা। জামা, কাপড়, পথ্য ও ওষুধ, স্ত্রীর রক্তশূন্যতা এবং সেই সূত্রে নার্সের প্রয়োজন — সব ব্যাপারগুলি এমন

জটিল ভাবে উপস্থিত হ'ল যে দিনের পর দিন অপূর্ব্ব কৌশলে তার আয় অপেক্ষা ব্যয়ের হার বৃদ্ধি পেয়ে চল্‌ল। এর পর স্কুল, বই, মাষ্টারের মাহিনা প্রভৃতি আবশ্যক খরচ মেটানো যতই দুরূহ হয়ে ওঠে, সহধর্ম্মিণীর উৎসাহের উত্তাপ ততই এক এক ডিগ্রী নাম্‌তে থাকে।

একদিন বাধ্য হয়ে সে তার নিজের বাড়ীটা ছেড়ে দিয়ে উঠে এল মধ্যবিত্ত পল্লীতে এক বাসা-বাড়ীতে। মনঃক্ষোভে সে কারুর সঙ্গে মিশ্‌তে চাইত না, সশঙ্কে পরিবারের মধ্যে আত্মগোপন করে থাক্‌ত। কিন্তু সে নিষ্কৃতি পেল না। তাদের সংসারের আয়, ব্যয় এবং অন্যান্য গোপনতম পারিবারিক সংবাদগুলি অতি আশ্চর্য্য উপায়ে প্রসার লাভ করে প্রতিবেশিদের নিত্যচর্চ্চার সামগ্রী হ'ল। দুঃসময়ে যা হয়ে থাকে, ঠিক তাই, জনকয়েক সুধাসিক্ত শত্রুর সংখ্যা বর্দ্ধিত হ'ল।

মায়ার জীবনে প্রাথমিক ধারণাগুলো তখন পরিবর্ত্তিত হ'তে সুরু করেছে। বিবাহের অব্যবহিত পরের দিনগুলি তার কেটেছিল কী মোহময় আশায় ও উত্তেজনায়! অদূর ভবিষ্যতে স্বামীর সাহিত্যিক যশোলাভ, তারপর পার্টিতে নিমন্ত্রণ, বিদগ্ধ সমাজের সহিত সহজ ও ঘনিষ্ঠ পরিচয়, সঙ্গিনীদের ঈর্ষ্যামিশ্রিত সশ্রদ্ধ মনোভাব, এই সব চিন্তা এতদিন ধরে তার মনের নিভৃত কোণে পুষ্টিলাভ করছিল। কিন্তু অবশেষে সেও একদিন আবিষ্কার করলো যে তার কল্পনায় সহচররূপে যে সুরসিক, তীক্ষ্ণধী গ্রন্থকার ব্যক্তিটির মূর্ত্তি অঙ্কিত হয়েছে তার সঙ্গে বাস্তব স্বামীটির মধ্যে ব্যবধান অনেকখানি। আর অজিত! একদা উদ্বেল যৌবনে যে সে এই স্ত্রীকে নিয়ে ঘরের বেসাতি করতে চায়নি, বরং কবিতা রচনা করেছে, তাই স্মরণ করে সে লজ্জার বিপন্ন হাসি হাসে। তবু দিন আট্‌কায় না।

মায়ার চরিত্রগত এমন একটি বৈশিষ্ট্য ছিল যা অজিত কোনো দিনই অস্বীকার করতে পারেনি। নাতিহ্রস্ব, নাতিদীর্ঘ তার আকৃতি, সুগঠিত অবয়ব। চোখে ছিল একটি অতলস্পর্শ ভাবের ব্যঞ্জনা, অধরকোণে একটু সলজ্জ কম্পন, দেখলে মনে হয় কত সুকুমার এবং অসহায়। চিত্রবিদ্যায়, শিল্পকর্ম্মে ও সঙ্গীতে ছিল তার প্রগাঢ় অনুরাগ এবং বাস্তবতার সংস্পর্শে এসেও সে বজায় রেখেছিল সাত্ত্বিক মনোভাব। সব মিলিয়ে

মনে হ'ত যেন শাস্ত্রবর্ণিত সেকালের পদ্মিনী। কালগুণে যা একটু বিপর্য্যয় বা আধুনিক রূপান্তর ঘটেছে। কিন্তু সকালে গৃহস্থালীর কাজকর্ম্ম সেরে মায়া যখন সামনে এসে দাঁড়াত, অজিত তার নিঃস্পন্দ দেহের দিকে তাকিয়ে মানসিক অস্বস্তি বোধ করত। কারণ, দু একটা কথার পর যখন মায়া তীব্রস্বরে শ্লেষাত্মক বিদ্রূপ করে যেত, অজিত কল্পনা করতে পারত না যে বিধিরচিত এ রকম সুকুমার মুখশ্রী থেকে এত অজস্র কটূক্তি বর্ষণ সম্ভব হয় কি করে? সে ভাব্‌ত, "পাঁচজন অভ্যাগতের সম্মুখে এর মুখে যে লজ্জানম্র পেলবতা দেখি, ভিতরের মনোভাবের সঙ্গে যদি তার বিন্দুমাত্রও সামঞ্জস্য থাক্‌ত, তা হ'লে আপনাকে ধন্য বিবেচনা করতুম।" কিন্তু হায়! এ কথা পরিস্ফুট করবার উপায় নেই। থাক্‌লেও, কেউ তাকে বিশ্বাস করবে না, অসম্ভাব্য ঘটনা বলে উড়িয়ে দেবে! ভাব্‌বে সে একটা ইতর পশু, অমন সুন্দর ও মিষ্টস্বভাবের স্ত্রীর কদর করতে জানেনা। তবু ইচ্ছা হয়—আত্মীয়বর্গ, স্তুতিবাদক আর বান্ধবীকুল ছাড়া যদি অন্য কারুর সঙ্গে মায়ার একত্র বসবাস কয়েক দিনের জন্যও সম্ভব হ'ত, সে আজ নিজে দেবতা ব'লে গণ্য হতে পারত। না হ'লেও অন্ততঃ, ন্যায়-বিচারের প্রতিষ্ঠায় সে পুলকিত হ'ত সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

বয়স এখন তার চল্লিশ বছর। সুতরাং মৃত্যু কামনা যখন সে করেছিল, তখন অতি সুস্থদেহে ও স্থির মস্তিষ্কে। কিন্তু সংসার থেকে বিদায় নেবার বিপক্ষে একমাত্র প্রতিবন্ধক ছিল একটি অপরাজেয় দুশ্চিন্তা। তার অবর্ত্তমানে তার স্ত্রী পুত্রের কী উপায় হবে? অবশেষে অনেক দিনের একাগ্র আরাধনার ফলে মাথায় একটা মতলব এল। এতদিন এমন উপায় মনের কোণেও উদয় হয়নি—কথাটা যেমনি অবিশ্বাস্য, তেমনি আশ্চর্য্য। মায়ার এবং খোকার ভরণপোষণের ব্যবস্থা ত এক নিমিষেই স্থির করা যায়! যদি কোনো গতিকে প্রিমিয়ম দেবার টাকাগুলো জোগাড় হয়ে যায়, তা হলে জীবন বীমা করে আপনাকে অপসারিত করা এমন কিছু অসম্ভব কার্য্য হবে না। কিন্তু সব চেয়ে মজার কথা এই যে তার মনটা ছিল অতি সরল প্রকৃতির। সর্ব্বদা সৎপথে থেকে জীবন যাপন করা—এইটাই দিল তার আদর্শ। আর এই আদর্শবাদী মনোভাবের জন্য

তাকে অনেকের কাছে বিদ্রূপ সহ্য করতে হয়েছে। কাউকেও সে জ্ঞাতসারে প্রবঞ্চনা করেনি, অন্যায় করা ত দূরের কথা। নির্ভীকচিত্তে কারুর দিকে তাকাতে তার কোন দ্বিধা নেই। আর সেই মানুষ আজ এত বড় ইচ্ছাকৃত প্রবঞ্চনা করতে চলেছে, সজ্ঞানে ও অকুণ্ঠিত চিত্তে। অথচ নিজেকে কোনো মতেই দোষী মনে হচ্ছে না। কেমন সহজভাবে এই চিন্তাকে সে গ্রহণ করতে পারছে—এ সব তলিয়ে দেখলে মানব-মনের দুর্ব্বোধ্য চমৎকারিত্বে আস্থা আসে। অজিতের চরিত্রে আর একটা দিক্ এতদিন অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল, নিজেকেই সে এতদিন সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করেনি। সে ছিল মনে মনে ব্যক্তিত্বের উপাসক, সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যাভিলাষী। ভাবপ্রবণতার চেয়ে বুদ্ধিবাদকে সে এ যাবৎ শ্রদ্ধা করে এসেছে; সুতরাং আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই এতে। যাতে আপন ব্যক্তিত্বের বিকাশ হয়, তা করতেই হবে তাকে—যে কোনো উপায়ে। তাতে যদি আত্মীয়জনের স্বার্থ দলিত ও পিষ্ট হয়ে যায়, তাও ভালো। আত্মনিগ্রহ সে আর সহ্য করতে প্রস্তুত নয়।

হিতেন বোস্ ছিল তার পুরানো আলাপী। ব্যবসায় এটর্নীগিরি। আগে আগে প্রত্যহই হিতেন অজিতদের বাড়ীতে বেড়াতে যেত। ইদানীং অফিসের কাজে ফুরসৎ মেলে কম, তাই সন্ধ্যায় মিত্র-দম্পতির চায়ের আসর ঠিক জমে না। তবে আলাপ কমেনি। অজিত যে তাকে সবিশেষ শ্রদ্ধা করত তা নয়, কিন্তু ঠিক্ সেই কারণেই অজিতের মনে হ'ল যে বোধহয় হিতেনের সাহায্যে তার কার্য্যোদ্ধার হতে পারে। একদিন বেড়াতে বেড়াতে সে তার অফিসে ঢুকে পড়ল। কিছুক্ষণ আলাপের পর সাহসে ভর করে সে হিতেনের কাছে কথাটা পাড়লে।

বল্‌লে "দেখ হিতেন, আমি একটা জরুরী কাজে এসেছিলাম। তোমাকে একটা কথা জানাবো ভাব্‌ছি অনেক দিন থেকে, কিন্তু সেটা অতি গোপনীয়। আশা করি আমার বিশ্বাসের মর্য্যাদা তুমি রাখ্‌বে।"

হিতেন সযত্নরক্ষিত গোঁফের প্রান্তে আঙুল বুলিয়ে বল্‌লে, "ওটা বলা বাহুল্য।"

"ব্যাপার হচ্ছে এই যে আমার অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হয়ে পড়ছে ; এ সংবাদ তুমি পূর্ব্বেই আন্দাজ করে থাক্‌বে হয়ত। তোমাদের এই সংসারে বাস করা আমার পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠ্‌ছে। সত্যই আমি ক্লান্ত ; সময়ে সময়ে নিজেই আশ্চর্য্য হয়ে যাই এই ভেবে যে এখনও টিঁকে আছি ! তাই স্থির করলাম যে আমার শীঘ্রই সরে পড়া দরকার।"

এটর্ণী সাহেবের বয়স এখনও কাঁচা—সবে ছত্রিশ ; এবং ছত্রিশ ও চল্লিশে যে পার্থক্য অনেক, তা প্রৌঢ়েরা বিলক্ষণ জানেন। হিতেন চমকিত হয়ে প্রশ্ন করলে, "সরে পড়ার অর্থ ? কি বল্‌ছ তুমি—পাগল হলে নাকি ?"

"মানে কিছু শক্ত নয়। প্রৌঢ়ত্বের সীমায় এসে পৌঁছেছি অথচ জমার ঘরের অঙ্ক এখনও শূন্য থেকে গেল। আমার জীবন বীমা নেই, জানো বোধ হয়। স্ত্রী-পুত্রের ভবিষ্যতের জন্য পৃথক্ কিছু সঞ্চয়ও করতে পারিনি। সুতরাং অর্থবোধ কঠিন নয়। আমি ত সাদাচোখেই দেখ্‌ছি।"

"সে কথা অবশ্য তুমি হাজার বার বল্‌তে পার। কিন্তু সঙ্কল্পটা যে সাধু এ কথায় সায় দিতে পারছি না। ওটা পুরানো পন্থা, এ যুগে অচল।" হিতেন পকেট থেকে রুমাল বের করে ধীরে মুখসংস্কার করলে। হোয়াইট্ রোজের মৃদু সৌরভে ঘর ভরে উঠ্‌ল। অজিত আবার বল্‌লে—

"তোমায় তর্ক করে বোঝাব, এমন ক্ষমতা আমার নেই। যা ভেবে স্থির করেছি তা' কাজে পরিণত করবার ইচ্ছাতেই এসেছি—উদ্দেশ্য তোমার সাহায্য ভিক্ষা। সহানুভূতির প্রয়োজন নেই, জীবনে তা প্রচুর মিলেছে। একটা কিছু চাঞ্চল্য বা অভাবনীয় আন্দোলনের সৃষ্টি করবার মত মহৎ অভিপ্রায় বা উৎসাহ আমার নেই। তুমিও ত স্বীকার কর যে জীবন বীমার দরকার। কিন্তু করব কি দিয়ে ? এজেণ্টদের অনেকের সঙ্গেই আমার পরিচয় আছে কিন্তু নি-খরচায় কাউকে বীমা করানো যায়, তা ত শুনিনি।"

"কী ধরণের বীমা করতে ইচ্ছা কর ?"

"একটু ভালো রকমের—হাজার পঁচিশ ত্রিশ ; যাতে ক'রে, সুদে খাটালে বছরে হাজার তিনেক আয় থাকে আমার অবর্ত্তমানে, এই আর কি !

সেই অনুপাতে মোট টাকাটা সঠিক্ হিসাব করো আর প্রিমিয়মগুলোর কথা চিন্তা করে দেখো। আমার ইচ্ছা ছিলো যে—”

হিতেন সহজ গলায় জিজ্ঞাসা করিল, “কী ইচ্ছা ছিলো ?”

“আমি ভেবেছিলাম যে কিছু টাকা তুমি আমাকে অগ্রিম দেবে। আমার জন্যে তোমার আর্থিক ক্ষতি হয় এ আমি চাইনে। তবে আমার জীবন বীমার প্রস্তাবে তোমার স্পষ্ট উল্লেখ থাক্‌বে। তাতে যদি রাজী না হও উইলও করতে পারি—যা তোমার অভিরুচি।” অজিত অত্যন্ত শান্ত ভাবে বলে চল্‌ল, “এখন তুমি যা দিচ্ছ, আমার মৃত্যুর পর সুদসমেত সে ত ফিরে পাবেই ; বরং আরও কিছু বেশী।”

হিতেনের মুখ ততক্ষণে পাংশুবর্ণ ধারণ করেছে। দু হাতে কপাল টিপে সে অনেকক্ষণ চুপ করে রইল, তারপর বল্‌লে, “অবশ্য পুরানো বন্ধুত্বের খাতিরে অনেক কিছুই করতে হয়। কিন্তু তোমার প্রস্তাবটা এমনি অদ্ভুত যে কিরকম ঠেক্‌ছে যেন! তাছাড়া একটা কথা ভুলে যাচ্ছ যে আত্মহত্যা বড় সন্দেহজনক ঘটনা। কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষেরা কি অনুসন্ধান ?”—“সে সব আমি ভেবে দেখেছি, অন্ততঃ যতদূর সম্ভব। আমার একটি খুড়তুতো শ্যালী আছেন ; থাকেন এই কাছাকাছি কলকাতার উত্তরে এক বাগান বাড়ীতে। আমি সস্ত্রীক অনেকবার সেখানে নিমন্ত্রিত হয়ে গেছি। তাঁদের ঘাটে একখানা সখের পান্‌সী আছে। স্থানটা শুধুই রমণীয় নয়, অসম্ভব রকমের নির্জ্জনও। একদিন ছুটীর বারে সেখানে সপরিবারে যাবো মনস্থ করেছি। সন্ধ্যার পর একসময়ে এদের ডেকে বল্‌বে—সারাদিনটা আজ ঘরে বসেই কাট্‌ল। আর লিখতে ভাল লাগ্‌ছেনা। উঃ, কী ভীষণ মাথা ধরেছে, নৌকোটা নিয়ে নদীর ওপর একটু ঘুরে এলে মন্দ হয় না। কেমন ঠিক হচ্ছে ত ?” আজিত প্রশ্ন করলে। উত্তর না পেয়ে আবার নিজের মনেই বল্‌তে লাগ্‌ল, “মায়া আর যাই হোক্ আমাদের পিসী-ঠাকুমা-জাতীয় মেয়ে নয়। অতিস্নেহে অযথা বিপদের আশঙ্কায় তার হৃদয় কিছু উদ্বেল হয়ে উঠ্‌বে না। যতক্ষণ আমার কাছ থেকে দূরে থাকা যায় তাইতেই সে নিশ্চিন্ত। খুসী হয়ে নিশ্চয়ই সে মত দেবে, হয়ত একটু স্বাভাবিক মিষ্টি করে তাকাবেও। বেরুবার সময় না হয় আরও একটু সাবধান হতে পারি।

জিজ্ঞাসা করব'খন রাত্রে এখানে কটার মধ্যে খাওয়া দাওয়া শেষ হয়। তারপর ধরো মায়াকে একথাও বল্‌তে পারি যে সকালে উঠে একটা জরুরী চিঠি লিখ্‌তে হবে পাব্‌লিশারের কাছে—যেন ঘুম থেকে উঠেই আমাকে জাগিয়ে সে কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তারপর ছেলেটাকে আদর করে হাল্‌কা মনে বেরিয়ে পড়তে দেরী লাগ্‌বে না। এর পরের ইতিহাস অতি সুস্পষ্ট। সবাই জানে সাঁতারে আমি ওস্তাদ, হাঁটু ভোর জলে ঘটিবাটির মত ডুবে যাই। তোমার আর কিছু জিজ্ঞাস্য আছে, হিতেন?"

"কিন্তু তোমার মত পরিবর্ত্তন হতে কতক্ষণ? কথাটা বিশ্রী শোনাচ্ছে অজিত, কিন্তু ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখো যে তোমার উদ্দেশ্য যদি সফল না হয়, আমার টাকাগুলো জলে ফেলারই সামিল হবে নাকি? সাধারণ অবস্থায় তুমি এখনও বেওজর বিশ পঁচিশ বছর বাঁচ্‌তে পারো। ততদিন ধরে..." "ভেবেছিলাম যে চৈত্র মাসেই একেবারে শেষ কিস্তী দিয়ে যাবো। মধুমাসে মধুরেণ···আইডিয়াটা মন্দ নয়, কি বলো? তবে তুমি যদি আশ্বাস দাও যে আগামী মাসে ব্যাপারটা ঘট্‌লে কিছু সন্দেহজনক ঠেক্‌বেনা তা হলে সেই মতই ব্যবস্থা না হয় করা যাবে। একমাসের মধ্যে আমার সঙ্কল্প তিরোহিত হবে, এ সম্ভাবনাটা নিশ্চয়ই কম!" অজিত উৎসুক নয়নে চেয়ে রইল।

প্রত্যুত্তরে হিতেন কোনো কথা বল্‌লেনা। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে কেবল বল্‌লে, "আচ্ছা, ভেবে দেখি। তুমি এখন যাও; অন্য সময়ে সুবিধামত এসো"।

হিতেন বোসের অর্থাভাব ছিল না। ভারী হিসাবী লোক সে। সুদে খাটিয়ে তেজারতী ক'রে তার বাবা বিস্তর সম্পত্তি করে গেছেন। সে ঐশ্বর্য্যসঞ্চয় দুদিনে ফুরোবার নয়, তার ওপর ছেলেও সেই ধারা বজায় রেখেছে। বেশ করে তলিয়ে দেখে কিছুদিন বাদে সে অজিতের প্রস্তাবে রাজী হ'ল। একটা ভালো কোম্পানীতে অজিত বন্ধুসাহায্যে জীবন বীমা করলে খুব মোটা অঙ্কের। তারপর উইল করে কিছু অংশ হিতেনের নামে, বাকী সবটা মায়ার নামে লিখে দিলে। মায়া আর যাই হোক্ আদর্শ জননী বটে। পত্নীত্বে কৃতকার্য্য না হলেও তার মাতৃত্বে ত্রুটি ছিল না।

অজিতের জীবন এখন বেশ প্রশান্ত গতিতে চলেছে। হিতেন শেষ কালে সূক্ষ্ম বিচার ক'রে তাকে জানিয়েছে যে চৈত্র মাসই প্রশস্ত সময়। বন্ধুর সংস্পর্শে এসে হিতেনের মনের কপাটও একটু আলগা হয়ে গিয়েছে। মধ্যে মধ্যে অজিতের বাড়ীতে আসে বটে, কিন্তু বেশীক্ষণ থাকে না। মায়ার সঙ্গে ঈষৎ বাক্যালাপ ক'রে অজিতকে ইঙ্গিতে উৎসাহিত করে হাসিমুখে বিদায় নেয়। অজিত কিন্তু এবার একটু অস্বস্তি বোধ করতে লাগ্‌ল। এখনও পাঁচমাস কাল ধৈর্য্য ধ'রে মরণের প্রতীক্ষা করতে সে সম্মত নয়। কিন্তু উপায় নেই,—ভিখারীর হাতে পছন্দের ভার থাকেনা। সঙ্কল্পটা তার, কিন্তু ব্যবস্থা হিতেনের। তবু মনে ভাবে, আকাঙ্ক্ষিত বস্তু যখন হাতের মুঠোয় এসে গিয়েছে, তা নিয়ে অধৈর্য্য প্রকাশ নেহাৎ ছেলেমানুষী। ক্লান্ত মনে সে দিন গোণে—মেয়াদের আর কত দিন বাকী! জীবন ভোর ভাগ্যলক্ষ্মীর কৃপায় বঞ্চিত হয়ে কোনো অবস্থাতেই তার মন আর সাড়া দেয় না। তবে আশা এই, কয়েকমাস পরেই তার অভীপ্সা সার্থক হয়ে উঠ্‌বে।

সে বছর শীতকালেই কল্‌কাতায় টাইফয়েডের প্রাদুর্ভাব হ'ল। যার উপায় ও সংস্থান ছিলো সেই সহর ছেড়ে পালালো। অজিতের দুটোরই অভাব, তাই থাক্‌তে হ'ল। তখন পৌষ মাসের শেষ, হঠাৎ এক দিন মায়ার শরীরটা খারাপ হ'ল। প্রথমটা ডাক্তার ডাকা হয়নি, কিন্তু চারদিনের দিনও যখন জ্বর সমভাবে চল্‌ল, তখন ডাক্তার ডাকা হ'ল। তিনি এসে ওযুধের ব্যবস্থা করলেন, উপরন্তু বিশেষ কিছু ভয়ের কারণ নেই বলে আশ্বাস দিয়ে গেলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, দু চার দিনের মধ্যেই নিউমোনিয়া দাঁড়িয়ে গেল। এ সময়টা কী করে কেটেছিল অজিত তার হিসেব রাখেনি। শুধু ডাক্তার বাড়ী ছোটা, মতভেদ হওয়াতে অন্য চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া, ওষুধ আর নার্সের ব্যবস্থা করা এবং ছেলেটাকে সরিয়ে দেওয়া, এই কয়টা ঘটনার কথাই তার মনে আছে। অবশেষে ১৫ দিনের দিন ভোর বেলায় যখন মায়ার মৃত্যু হ'ল, তখন সে লক্ষ্য করলে যে চিকিৎসকেরা সমবেত হয়ে রোগটার বিভিন্ন রূপ ও চিত্ত বিভ্রমকারী লক্ষণগুলি যথারীতি বৈজ্ঞানিক ভাবে আলোচনা ক'রে তাকে বোঝাবার চেষ্টা করছেন।

অজিতের আঘাতটা লাগ্‌ল মৃদু-রকমের গুরুতর। সহধর্ম্মিণী হিসাবে সে মায়ার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলো। যে বিরহভাব তাকে পীড়িত করলে তা হৃদয়ের অভাব জনিত নয়। কারণ চেতনার সূক্ষ্মস্তরে এর পূর্ব্বে সে মায়ার কাছ থেকে এত আঘাত পেয়েছে যে মরণে নূতন কিছু নৈরাশ্য বোধ হ'ল না। তবে এতদিনের সঙ্গিনী ছিল সে; ছেলে তাকে 'মা' বলে সম্বোধন কর্‌ত; এমনি একটা বহুদিনব্যাপী আসঙ্গ-অভ্যাসের ফলে কেমন মমতা পড়ে গিয়েছিল। হতে পারে মায়ার প্রতি সে মায়াটা অতি স্থূল রকমের, কিন্তু আঘাতটা যে লেগেছিল, এটা সুনিশ্চিত! মায়া যে অতর্কিতে চলে গেল, এই বিয়োগ-ব্যথাই তাকে কাতর করে তুল্‌লে। বিগত দিনের কাহিনী যতই মনে পড়ে, তার অতীত স্মৃতি ততই উদ্বেল হয়ে ওঠে। সমস্ত সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ, বুদ্ধি, বিচার বাদ দিয়ে সে শুধু মানুষটির নিছক অনুপস্থিতির জন্য যন্ত্রণা বোধ করতে লাগ্‌ল।...একটা সংসার তবু ছিল এতদিন, যদিও কেবল নামে। সেইটাই যখন চুকে গেল, তখন ছেলেটার এবার একটা ব্যবস্থা না করলে নয়। অজিতের আপনার জনের বেশী বালাই ছিল না। আত্মীয়ের মধ্যে কেবল একটি ভগ্নী আর একটি দূর সম্পর্কীয় ভাই। পিসীর আদরে ছেলে মানুষ হয় না, তার বদ্ধ ধারণা। সেই ভয়ে এই জ্ঞাতি ভাইটির কাছে ছেলেকে রাখা স্থির করলে। হাজার হলেও সে শিক্ষিত; একটা রক্ত-সম্বন্ধও আছে। তার ওপর সে অপুত্রক। খোকার স্বভাব ভাল, কাজেই মায়া পড়তেও পারে। এ ছাড়া অর্থের ব্যবস্থা যখন করা রয়েছে, তখন কোন দিকে অসুবিধা হবে না। মনে মনে অজিত ঈশ্বরের নিকট কৃতজ্ঞতা জানালে। দুঃসময়ে একটা কূলও মিলেছে।

পৌষ গেল, মাঘ এল। মাঘ মাসও কেটে গেল, হ'ল ফাল্গুনে নব বসন্তের আবির্ভাব। একদিন প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়ে অজিত সচকিত হয়ে দেখ্‌লে কৃষ্ণচূড়ায় নূতন কিশলয়! মনে হ'ল—আর দেরী নেই। বড় জোর মাসখানেক। মায়ার মৃত্যুর পর থেকে সময় কী দ্রুতই চলেছে! বেচারী খোকা! তাকে ছেড়ে যাবার সময় অনিবার্য্য গতিতে এগিয়ে আস্‌ছে।

কিন্তু একটা বিস্ময়কর অনুভূতি অজিত আজকাল উপলব্ধি করছে। শেষের দিন যতই ঘনিয়ে আস্‌ছে, ততই মনে প্রশ্ন উঠ্‌ছে,

মৃত্যুই কি একমাত্র কাম্য লক্ষ্য? এই সমাসন্ন মুক্তির সম্মুখীন হয়ে উৎসাহ নির্ব্বাণ-উন্মুখ দেখে অজিত রীতিমত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। মনকে সে অনেক প্রকারে সতেজ করবার চেষ্টা করলে, কিন্তু কিছুতেই অস্বীকার করতে পারলে না তার এই অপ্রত্যাশিত মনোভাবকে। সম্প্রতি কিছুকাল ধরে, সে লক্ষ্য করছে যে জীবনের প্রতি কেমন একটা মায়া তার হৃদয়কে অধিকার করছে। বুদ্ধির আলোক-সম্পাতে সে বিচার করলে, দেখলে এ মায়া মিথ্যা মোহ নয়, অবচেতন ভীতি-সঞ্চারও নয়, সত্যকারের উপভোগের আনন্দ। এ গভীর রসাস্বাদ যেমনি অপরিজ্ঞাত, তেমনি উন্মাদক। সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে নিস্তব্ধ কক্ষের অশরীরী আকর্ষণ সে মনে প্রাণে অনুভব করে। ওদিকে প্রতীক্ষমান ধূমায়িত চায়ের পাত্র আর সদ্য প্রস্তুত আলুবোলা, এদিকে আরাম-কেদারায় শিথিল দেহ এলিয়ে দিয়ে অলস মুহূর্ত্তে কোনো পুস্তকের পৃষ্ঠা উল্‌টানো,—এরি মধ্যে যে এত শান্তি, এত উপাদেয় নিশ্চিন্ততা থাকতে পারে তা সে কল্পনায়ও আন্‌তে পারেনি। দিনের পর দিন, রাত্রির নির্ব্বাক্ নির্জ্জনতায় আপনার মনকে নব চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ, বিকশিত করা, প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করেই নবীন উদ্যোগ ও স্পৃহা নিয়ে কাজে প্রবৃত্ত হওয়া—এ সব যেন তার কাছে আশাতীত বর লাভ। এমন মুখোমুখি পরিচয়, এমন নিবিড় ভাবে জীবনকে গ্রহণ করতে সে কোনো দিন পায়নি। আর খোকা! মার কাছ ছাড়া হয়ে সে তাকেই পেয়ে বসেছে। তার সঙ্গে খেলায় কৌতুকে, বালকমনের নিত্য নূতন আবিষ্কারে, তার অফুরন্ত বৈচিত্র্যে অজিতের দিনগুলি কেটে যাচ্ছে লঘূর্ম্মি নদীর একটানা স্রোতের মতো। এদিকে মরণের ছায়া দীর্ঘ হতে ক্রমশঃ হ্রস্ব হয়ে আস্‌ছে, কিন্তু সে চিন্তা সে কৌশলে এড়িয়ে যায়। পূর্ব্বেকার মনোভাব ছিল মরণ অনাবিষ্কৃত জীবনের গৌরবময় সুপ্রভাত। এখন শুধু চোখে ভাসে তার কঙ্কালসার প্রেতাবয়ব। অজিত সেই কঙ্কালের শব্দ রুদ্ধ নিঃশ্বাসে শুনতে পায়। বিপত্নীক হবার পর জীবন একদিকে যেমন অর্থময় হয়ে ওঠে, ওদিকে কঙ্কালের বিদ্রূপ তেমনি স্পষ্ট ও সুতীক্ষ্ণ হতে থাকে।

সত্যকে স্বীকার করবার মত তা'র মনের ঋজুতা আছে। মায়া চলে যাবার পরই যে তার চিত্তপটের নিগূঢ় অন্ধকার অপসারিত হয়েছে সে কথা অবিসংবাদিত সত্য। যদি সুযোগ মিল্‌ত, হয়ত অজিত মায়ার জীবিতাবস্থাতেও সুখী হতে পারত। কিন্তু অদৃষ্ট ছিল অপ্রসন্ন। দৈনন্দিন জীবন যে তার কাছে বিষময় ও ভয়াবহ ছিল, তার কারণ প্রতিমুহূর্ত্তে, প্রতি-কাজে মায়ার নির্ভুল হস্তক্ষেপ। এখনও সে দেখতে পায় মায়ার সুকুমার তর্জ্জনীর পিছনে সেই কঠোর শাসন, তার মৃদু কণ্ঠস্বরে জড়িত সেই অননুকরণীয় তীব্রতা। প্রায়ই, মিষ্টতার প্রলেপে আত্মগোপন ক'রে থাক্‌ত শ্লেষের হলাহল, ফলে তুচ্ছতম মতদ্বৈধ পরিণত হ'ত নিদারুণ ঘৃণায়। যাক্‌ সে সব অপ্রিয় চিন্তা ও স্মৃতি। কিন্তু মায়ার সামান্য শারীরিক তিরোধান কতটা তারতম্য সূচনা করছে। পূর্ব্বের তুলনায় এখন সে পূর্ণতর, আরো পরিতৃপ্ত, তার জীবনের বাসনা আরো উগ্র হয়েছে।

কিন্তু সে নিজেকে আর চাপ্‌তে পারলে না। মানসিক সততার মূল্য সে দিয়ে থাকে, আশা করে অন্যেও তাই দেবে। একদিন সোজাসুজি সে হিতেনের কাছে গিয়ে বল্‌লে, "তুমি আমায় মুক্তি দাও। যদিও আমার নিবেদন অমার্জ্জনীয়, তবু উপায়ান্তর দেখছি না।" কথা শুনে হিতেন স্তম্ভিত, হতবাক্‌। সে শুধু বল্‌লে "এটা ঠিক্‌ কথামত কাজ হ'ল না, অজিত। আমি ব্যবসাদার মানুষ। কথা বেচি আর দলিল বুঝি, উভয়েরই মূল্য নিয়ে। আমাকে তুমি একটা বিশ্রী অবস্থায় এনে ফেলে দিলে। অবশ্য আমি তোমার মরণ কামনা করি না। কিন্তু যেটা একবার চুক্তিতে নিষ্পন্ন হয়ে গেছে, তার নিশ্চয়ই একটা অবধারিত মূল্য আছে। আমি এ যাবৎকাল যত প্রিমিয়মের টাকা দিয়ে এলাম, তার...

অজিত হতাশ স্বরে বল্‌লে—"কিন্তু হিতেন, তুমি বুঝ্‌ছ না ছেলেটা যে রয়েছে। তাকে নিয়ে কি করি বল ?"

"যতদূর স্মরণ হচ্ছে, তাকে জ্ঞাতিকাকার হাতে সমর্পণ করবার কথা উঠেছিল...না।"

"তা' ঠিক্‌। কিন্তু তার বন্ধন আমি কিছুতেই কাটিয়ে উঠ্‌তে পারছি

না। অপুত্রক হলেও আশা করি এটুকু বুঝবে নিজের হাতে এ মায়াসূত্র ছেদন করা কতটা দুরূহ।"

"কিন্তু সেটা আগে কঠিন বলে বিবেচনা করা উচিত ছিলো। আর আজ ঠিক্ সকালেই যে কঠিনতর বলে ঠেক্‌ছে তারও ত কোনো ন্যায়সঙ্গত কারণ দেখছি না। আমি কেবল বন্ধুত্বের খাতিরেই তোমার চাহিদা মিটিয়ে এসেছি ; নইলে এ সব কাজে কখনো আমি হস্তক্ষেপ করতুম্ না। এখন যা বল্‌ছ, তাতে তোমার কথার দাম নেই বলেই মনে হয়, অজিত। এ চুক্তি আইনতঃ অগ্রাহ্য আমি মেনে নিচ্ছি ; কিন্তু আমি কি শুদ্ধ তোমার প্রতিশ্রুতির উপর নির্ভর করিনি। তুমি সত্যিই আমায় ভীষণ মুস্কিলে ফেল্‌লে। এতগুলো টাকা জলে গেল দেখছি !"

"তোমায় আমি শপথ করে বল্‌ছি, হিতেন, একথা আমার মনেও উদয় হ'তনা যদি না মায়ার মৃত্যু হত। তারপর থেকেই আমার জীবনটা এমন অভাবনীয়রূপে বদ্‌লে গিয়েছে, অর্থাৎ···সে আমি তোমায় বোঝাতে পারবনা।

"না ! সেকথা মান্‌তে আমি প্রস্তুত নই, অজিত। অমন নিরাসক্ত, নির্দ্দোষ ভদ্রমহিলার উপর সমস্ত দোষ চাপিয়ে দিয়ে এরকম আত্মস্খালনকে আমি কাপুরুষতার লক্ষণ মনে করি। তার চেয়ে যেটা তোমার অন্তরের সত্য, সেইটাই বলনা কেন ?"

"বেশ ! তাই ভালো। ধর, আমার মতের পরিবর্ত্তন হয়েছে। তোমার যত টাকা খরচ হয়েছে তা হোক আমি যে কোনো উপায়ে পরিশোধ করে দেবো।"

"সে আশঙ্কা আমি পূর্ব্বেই করেছিলাম ! আর এ মনোভাব যে চিরস্থায়ী হবে তারও কোনো প্রমাণ নেই।" বিদ্রূপাত্মক হাসি হেসে হিতেন বল্‌লে, "তুমি ভুলে যাচ্ছ যে সুদে আসলে তুমি আমায় পুষিয়ে দেবে বলেছিলে ! তাহলে উইলে লিখিত টাকার সম্ভাবনাটাও মিথ্যে।"

অজিত দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেল্‌লে। "তুমি যে একটি শাইলক্, তা আমি জান্‌তাম না।"

"যাক্ আমার কিছু বলবার নেই। তবে তুমি যদি মানুষ হও, তাহলে এস্থলে তোমার যা কর্ত্তব্য, তা তুমি করবে। আত্মসম্মান বড় দামী জিনিষ,

অজিত," হিতেন অদৃশ্য হাসি হেসে বল্‌লে, "সেটা কোনো মতেই খুইয়োনা —জীবগত মায়াতেও না।"

বাড়ী ফেরবার পথে অজিত ভাব্‌তে লাগল—হয় তাকে প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করতে হবে, নতুবা অক্ষরে অক্ষরে তা পালন করতে হবে। তার ভিতরকার রসজ্ঞ মানুষটি এই চিন্তায় অত্যন্ত কৌতুক বোধ করলো। সে ভাবলে সাহিত্যের মানদণ্ডে এই বিশেষ অবস্থাটির মূল্য কত বেশী! কিন্তু হাস্যরসিক শিল্পী এটিকে জীবন-দেবতার রসিকতা ব'লে মেনে নিতে রাজী হ'লনা। বরং বিপরীত দিকে বাস্তবতার চরম পরীক্ষার জন্য সে মনকে প্রস্তুত করলে। চুলোয় যাক্ সাহিত্য! হিতেনকে সে এখন কি জবাব দেবে? দ্বিধায় সন্দেহে উদ্বেগে এক পক্ষ কাল কেটে গেল, অথচ কোনও স্থির সিদ্ধান্তে সে উপনীত হতে পারল না। পথে বেরুনো সে আজকাল একরকম ছেড়েই দিয়েছে। হিতেনের সঙ্গে প্রায়ই দেখা হয়ে যায়, এড়ানো সব সময়ে সম্ভব হয় না। সে অত্যন্ত নির্লিপ্ত স্বরে প্রশ্ন করে, "কেমন চল্‌ছে"? অপরকে নিজের কাছে হেয় প্রতিপন্ন করে দিতে হিতেনের দোসর মেলে না।

সমস্তক্ষণই অজিতের এক চিন্তা—সমস্যার সমাধান হয় কিসে? এক দিকে শাইলক্, অপরদিকে হ্যাম্‌লেট। সাহিত্যসৃষ্টির কী অপরিসীম সম্ভাবনা! নাটকীয় উপাদানের এত প্রাচুর্য্য তার জীবনেও লুকানো ছিল!

একদিন গভীর রাত্রিতে শয্যা ত্যাগ ক'রে সে ব'সে গেল এই ঘটনাটিকে অবলম্বন ক'রে একটা কিছু রচনা করতে। তার প্রবৃত্তির মূলে কি ছিল— কে জানে? হয়ত বা শিশুসুলভ চাপল্য। কিন্তু গল্প লেখার অবসর মধ্যে পরম তৃপ্তিভরে অজিত দেখ্‌লে যে একটা গম্ভীর ও ঈষৎ করুণরসাত্মক কাহিনীর সৃষ্টি হয়ে চলেছে।

রাত তখন তিনটে। গল্পটা এমন এক জায়গায় এসে আট্‌কে গিয়েছে যে তার মোড় ফেরানো দুষ্কর। শেষটা কী ভাবে দাঁড় করানো যায়, অজিত কিছুতেই স্থির করতে পারলে না। একটা চুরুট ধরিয়ে নিয়ে সে চেয়ার ছেড়ে উঠ্‌ল। অনেকক্ষণ ধ'রে সে সারা ঘরময় পদচারণা করে বেড়াল, কিন্তু গল্পের ভবিষ্যৎ তেমনি অন্ধকার—কোথাও একটু আলোকরশ্মির সন্ধান মেলে না। অন্যমনস্কভাবে অজিত লক্ষ্য করলে, ছাই জমে সিগারটার

আগুন নিবে গিয়েছে। হাতের কাছে দিয়াশলাইটাও আবার নেই। রাত ত প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু চাকরটার সুখনিদ্রা ভাঙ্গাতে তার মন সর্‌ল না জানালার সার্সীর কাছে মুখ এনে দেখ্‌লে ভোরের আলো হ'তে এখনও দেরী। থাক্‌গে, একটু পরেই না হয়...সহসা অজিতের মনে পড়ে গেল, ওপরে মায়ার শোবার ঘরে ড্রেসিং টেবিলটার দেরাজে দিয়াশলাইএর বাক্স থাক্‌ত। প্রসাধন-সামগ্রীর সঙ্গে এই রকম অনেক টুকিটাকি জিনিষ রেখে দেওয়া তার অভ্যাস ছিল।

এই যে, চাবি নিজের কাছে রিংএই আছে! বরাবর ওপরে উঠে গিয়ে অজিত সুইচ্‌ টিপে মায়ার ঘরে প্রবেশ করলে। চাবি লাগিয়ে একটা দেরাজ টেনে দেখে সেখানে কতকগুলো চুলের ফিতা ও কাঁটা, আর একটা অব্যবহৃত সিঁদূর কৌটা রয়েছে। মায়ার ঘরে দাঁড়িয়ে তার সেই সামান্য কাঠের কৌটাটা হাতে ক'রে অজিতের মন অপ্রত্যাশিতরূপে বিষাদে আচ্ছন্ন হয়ে গেল। বেচারী মায়া! অভাবের সঙ্গে প্রতিনিয়ত যুদ্ধ ক'রে তাকে সংসার চালাতে হয়েছে! স্বামীর আর্থিক অসচ্ছলতার ফলে তার মনটা ইদানিং অস্বাভাবিক রকমের তিক্ত হয়ে গিয়েছিল। তা'র ওপর অযথা অবিচার কতই না সে করেছে! অজিতের মনে পড়ল আপনার লজ্জাকর অসহিষ্ণুতার উদাহরণগুলো। কত তুচ্ছ কারণে সেও ক্রমশঃ উত্তপ্ত হয়ে কটূক্তি সুরু করেছে!

দিয়াশলাইএর বাক্সটা বোধ হয় নীচের বড় দেরাজে থাক্‌তে পারে। খুলে দেখে কয়েকটা পুরানো শাড়ী ও ব্লাউজ্‌। তার নীচে কতকগুলো নীল কাগজ। কি এক খেয়ালে সে কাপড়গুলো সরিয়ে ফেল্‌লে। আশ্চর্য্য! কাগজের ওপর হাতের লেখাটা যেন চেনা-চেনা। না, এ তার নিজের চিঠি ত নয়! অথচ সেগুলি যত্ন ক'রে পর পর সাজানো রয়েছে, এক টুকরা ফিতে দিয়ে বাঁধা। কার এসব চিঠি পত্র, অজিত বুঝতে পারলে না। তারপর একটার পর একটা চিঠি সে উল্‌টে যেতে লাগ্‌ল—কই কোনও দূষণীয় বা অবৈধ ব্যাপারের লেশমাত্রও নেই। তবে এগুলি যে ঈপ্সিত নারীর প্রতি প্রেম-নিবেদন তা সহজেই অনুমান করা যেতে পারে। লেখকের আত্মপ্রীতি কিন্তু অসাধারণ—সমস্ত চিঠিগুলোই আত্মকথায় পরিপূর্ণ।

কয়েকটাতে রয়েছ "সহানুভূতি"র পরিস্ফুট ইঙ্গিত ; কোনোটাতে প্রশ্ন আছে —"আমার স্নেহের স্পর্শে তোমার বৈচিত্র্যহীন জীবন মধুর হয়ে উঠুক্—এ কি দুরাশা ?" "এমনটি না হ'লে জীবনে আমার কী না হ'তে পারত !" এই রকমের আক্ষেপোক্তি অনেক স্থলেই আছে দেখা গেল। সব ক'খানি চিঠি-তেই কিন্তু সম্বোধনে উল্লেখ রয়েছে "প্রীতিভাজনাসু মিসেস্ মিত্র,"—নীচে সই আছে কোথাও বা 'স্নেহপ্রার্থী' কোথাও বা "প্রীতিধন্য হিতেন।" একটা সূক্ষ্ম হাসি অজিতের ওষ্ঠে বিলীন হয়ে গেল।

মায়ার ঘর থেকে অজিত যখন নীচে নেমে এলো, তখন ভোর হতে আর দেরী নেই। দিয়াশলাই জ্বেলে অতি যত্ন সহকারে সে ষ্টোভ্ ধরালে। তারপর অতি পরিপাটী করে এক পেয়ালা কোকো তৈরী করে পান করলে। চুরুট্টা ফেলে দিয়ে একটা সিগারেট্ ধরালে। অতঃপর সুস্থ হয়ে সে চিঠি লিখ্তে বস্‌ল—

প্রিয় হিতেন,

তোমাকে আমার শেষ কথা এখনো জানানো হয়নি, সেজন্য আমি অতীব কুণ্ঠিত। এই সঙ্গে তোমার কয়েকখানি চিঠি পাঠিয়ে দিচ্ছি। সেগুলো আমার কাছে নিতান্তই অনাবশ্যক। আত্মহত্যা সম্পর্কে আমার মাথায় এতদিন যে ভূত চেপেছিল, তা নেমে গিয়েছে জন্মের মত। আমার অবর্ত্তমানে উইলে যে ব্যবস্থা করা আছে, তা' রহিত করার ইচ্ছা আমার নেই। সুতরাং পূর্ব্ব কথামত তুমি আমার মৃত্যুর পর তোমার ন্যায্য অংশ নিশ্চয়ই পাবে। তবে মায়ার আকস্মিক মৃত্যুর জন্য তোমার যে দ্বিবিধ ক্ষতি হ'ল, সেই কারণে আমার আন্তরিক সান্ত্বনা জানাচ্ছি। মানুষ কতটুকু তা'র ভবিষ্যৎ ভাব্তে পারে ? আমরা শুধু উপলক্ষ বই আর কিছু না—নয় কি ?

আমি ভালই আছি। তুমি আমাকে বলেছিলে, বোধহয় তোমার স্মরণ আছে, যে আমি এখনও বিশ পঁচিশ বছর বাঁচ্‌তে পারি। ঈশ্বরের কাছে আমি সেই প্রার্থনাই করি। ছেলের প্রতি অনেক কর্ত্তব্য এখনও অসমাপ্ত রয়েছে। হ্যাঁ, প্রিমিয়মের টাকাগুলো যেন নিয়মিত ভাবে দিয়ে যাওয়া হয়। অবশ্য এটা স্মরণ না করিয়ে দিলেও চল্‌ত। তোমার চরিত্রে কোথাও আলগা বাঁধন নেই—এইটাই আমার বরাবর বিশ্বাস। এই চিঠিগুলোর মধ্যে

থেকে তোমার সম্মতি না নিয়েই দুখানি চিঠিমাত্র আমি রাখ্‌লাম—কারণ আর কিছুই নয়, একটা গল্প লেখা আমার প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, তাতে এগুলি বিশেষ কাজে লাগ্‌বে। ইতি

অজিত।

* * * *

অজিত এখন বেশ ভালই আছে। কলকাতার সহরতলী ছেড়ে সে এক নূতন বাড়ী করিয়েছে। তার বইয়ের কাট্‌তি অবশ্য বেশী বাড়েনি; তা হলেও সাহিত্যিক আসন তার সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছে। এখনও মধ্য বয়সে তার মুখে নব-যৌবনের বুদ্ধি-দীপ্ত খরধার ও সৌন্দর্য্য দেখে অনেক নারীচিত্ত বিক্ষোভিত হয়। সেইজন্যে সে আজকাল মুগার পাঞ্জাবীর নীচে তসরের সাদাধুতি পর্‌ছে।*

শ্রীবিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

* মেরিকের একটি গল্প অবলম্বনে
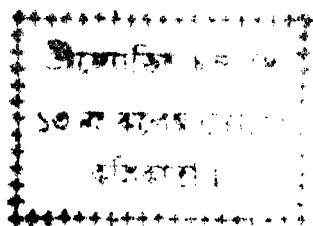
বুদ্ধচরিতম্ ও কালিদাসের কাব্য

কাব্যের গূঢ় নিবেদন—আভ্যন্তরিক সাক্ষ্য হইতে কি করিয়া কাব্যের প্রকৃত পরিচয় লাভ করা যায়—তাহাই এই প্রবন্ধে আলোচিত হইবে। "বুদ্ধচরিতম্" লইয়া আমি কথা আরম্ভ করিব ভাবিতেছি। ধরুন—আমরা যেন বুদ্ধচরিত কাব্যের রচয়িতার নাম ভুলিয়া গিয়াছি—কাব্যখানার নাম যে বুদ্ধচরিত তাহাও ভুলিয়া গিয়াছি—এবং কাব্যোক্ত নায়ক, নায়িকাদের (যথা—বুদ্ধ, মায়া প্রভৃতির) নামগুলির ঐতিহাসিক তাৎপর্য্যও বিস্মৃত হইয়াছি। এমত অবস্থায় কাব্যখানা পড়িয়া—কাব্যখানা যে বৌদ্ধ-দৃষ্টিতে জীবন-দর্শক কবির লেখা—তাহা বুঝিতে পারি কি না ? যদি পারি—তাহা হইলে জোরের সহিত বলিব যে কাব্যের মধ্যেই কাব্যের পরিচয় থাকে—কাব্যের স্বরূপের সন্ধানের জন্য আমাদিগকে অন্যত্র যাইতে হয় না। আমি প্রথমতঃ খুব ছোটখাট জিনিস লইয়াই আরম্ভ করিব।

বুদ্ধচরিতের প্রথম সর্গে বুদ্ধজননী মায়ার বর্ণনায় অশ্বঘোষ বলিতেছেন—"বভূব মায়াপগতেব মায়া"। "মায়াপগতা"—বিশেষণটি উল্লেখযোগ্য। এখন যদি আমরা রঘুবংশের প্রথম সর্গে সুদক্ষিণার বর্ণনার কথা মনে করি—তাহা হইলে কালিদাসের মুখে শুনিতে পাই—"পত্নী সুদক্ষিণেত্যাসীৎ অধ্বরস্যেব দক্ষিণা"—অধ্বর অর্থাৎ যজ্ঞদেবতার দক্ষিণার মত কল্যাণ-কারিণী সুদক্ষিণা…। মায়া হইলেন—মায়াপগতা আর সুদক্ষিণা হইলেন—অধ্বরস্যেব দক্ষিণা। হয়ত কবিদ্বয় কোনো কিছু না ভাবিয়া না চিন্তিয়াই লিখিয়াছেন—কিংবা মায়া এবং সুদক্ষিণা—এই দুইটি শব্দকে তাঁহারা ক্রীড়নকের মত ব্যবহার করিয়াছেন—তবুও বলিতে হয়—অশ্বঘোষ লিখিলেন—"মায়াপগতা" আর কালিদাস লিখিলেন—"অধ্বরস্যেব দক্ষিণা"। তাঁহাদের বর্ণনা যে স্ব, স্ব সংস্কৃতি অনুযায়ী হইয়াছে—শিক্ষা, দীক্ষা, আচারানুগত হইয়াছে—তাহা বলাই বাহুল্য। রঘুর জন্মে হইল দিলীপের পিতৃঋণ হইতে মুক্তি আর সিদ্ধার্থের জন্মে শুদ্ধোদনের রাজ্য হইতে উঠিয়া গেল ধর্ম্মকার্য্যের জন্য প্রাণিহিংসা… যাক্—এই প্রকারের

ছোটখাট জিনিস লক্ষ্য করিলেও আমরা বুঝিতে পারি—কবির কাব্য জীবন-যাপন প্রণালীর কাছে কতটা ঋণী! আকাশ যেমন নদীর বুকে নিজের ছায়া ফেলে, জীবনও কাব্যের বুকে তেমনি আপনার ছায়া ফেলে। পৃথিবীতে যেমন এমন কোন নদী নাই—যাহার মাথার উপর নাই আকাশ, সেইরূপ এমন কোন কাব্য এ পর্য্যন্ত লিখিত হয় নাই—যাহাতে জীবন গূঢ়ভাবে অনুপ্রবিষ্ট না হইয়াছে। সমালোচনার একমাত্র (কিংবা অন্যতম) কর্ত্তব্য হইল কাব্য-মুকুরে জীবনের প্রতিচ্ছবি আবিষ্কার করা। সুতরাং বুদ্ধচরিতে বৌদ্ধ-জীবন-ছায়া আরও একটু ব্যাপকভাবে আবিষ্কার করা যাউক্।

সর্ব্বার্থসিদ্ধিকে পুত্র পাইয়া জননী মায়ার যে অপার হর্ষ হইয়াছিল সেই আনন্দের বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া—পুত্র জন্মের সপ্তম দিবসে তিনি মৃত্যু-মুখে পতিত হইলেন। অশ্বঘোষ এই সংবাদটা আমাদিগকে দিয়াছেন আধুনিক কালের সংবাদপত্রের সংক্ষিপ্ত ভাষায়। অর্থাৎ মায়া দেবীর মৃত্যু যেন তাঁহার কাব্যজগতের কোন উল্লেখ-যোগ্য ঘটনাই নয়। দুইছত্রে কথাটা বলিয়া শেষ করিলেই যেন যথাকর্ত্তব্য পালন করা হইল। তারপর সিদ্ধার্থের মতন পুত্রকে পাইয়া সিদ্ধার্থ-জননীর মনে যে অপার আনন্দ হইয়াছিল, তাহার সম্বন্ধেও কিছু বলা তিনি যুক্তিযুক্ত মনে করেন নাই। একটি মাত্র শ্লোকে সিদ্ধার্থ-জননীর পুত্র-প্রাপ্তি-জনিত হর্ষ ও তজ্জনিত তাঁহার মৃত্যু বর্ণনা করিয়া কর্ত্তব্য শেষ করিয়াছেন। যাক্—এইরূপ অবস্থায় পড়িলে মহাকবি কি করিতেন—এই প্রশ্ন স্বতঃই আমা-দিগের মনে উদিত হয়। তবে মহাকবির কাব্য যাঁহারা কথঞ্চিৎ অভি-নিবেশ সহকারেও পড়িয়াছেন তাঁহাদের পক্ষে ঐ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া মোটেই কঠিন হইবে না। রতিবিলাপ এবং অজ-বিলাপে মানুষ-মানুষীর গভীর দুঃখানুভূতি যাঁহার লেখনীমুখে সর্গব্যাপী বিস্তার লাভ করিয়াছে নিঃসন্দেহে বলা যায় সেই কবির কাছে আমরা এমন একটা কিছু পাই-তাম—যাহাতে পুত্র-পরিত্যাগিনী মাতার অসহনীয় শোক নিকষে কনক-রেখার মত স্ফুট হইয়া উঠিত। আসন্ন-মৃত্যু জননীর অশান্ত অশ্রুশীলতা তাঁহার কাব্য-গগনকে চিরকালের জন্য মুখরিত করিয়া রাখিত। অশ্বঘোষের

কাছে ঐ প্রকারের কোনো হৃদ্যতা আমরা পাই নাই। মাতৃ-হৃদয়ের কোনো কথা, কোনোও ব্যথা—কোনোও কল্পনা অশ্বঘোষের লেখনীমুখে ফুটিয়া উঠে নাই। এখন প্রশ্ন এই যে—কেন এইরূপ হয়? কেন মহাকবির নিকট পাই রতিবিলাপের অজস্র করুণ-বেদিত্ব আর অশ্বঘোষের নিকট পাই একটি মাত্র শ্লোকের অযথা সংক্ষিপ্ত বর্ণনা—কেন? সমস্যা জটিল বলিয়াই একটু বিস্তারিত আলোচনা করিতেছি।

বাল্মীকিকে আমরা পুরাণ কবি—ভারতের (তথা জগতের) আদিকবি বলিয়া অভিহিত করি। কিন্তু বাল্মীকির পূর্ব্বে—এই ভারতেই ত কল্পনা-প্রবণ, দিব্য-প্রতিভা-শালী অনেক কুশলী জন্মিয়া গিয়াছেন—যাঁহাদের উদাত্ত-কণ্ঠের শঙ্খনিনাদ বৈদিক-গগনকে এখনও ঝঙ্কৃত করিয়া রাখিয়াছে। "অগ্নিসীলে পুরোহিতম্"-এর মধুচ্ছন্দা ঋষি হইতে "সমানী বঃ আকূতি"-র সংবনন ঋষি পর্য্যন্ত অনেক কল্পনা-কুশলীর পরিচয় আমরা বৈদিক সাহিত্যে পাই—যাঁহাদের ছন্দোবদ্ধ রচনা অনায়াসেই পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাব্য-সাহিত্যের সমকক্ষতা লাভ করিতে পারে। তবে ইঁহাদিগকে (মধুচ্ছন্দা, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্রকে) আমরা কবি বলিনা কেন?—কেন কবি-নামের যশোমাল্য পুরাণ-কবির বক্ষোদেশেই আলম্বিত করিয়া দিই? মনে রাখিবেন—বৈদিক ঋষিদের বাক্য ছন্দোবদ্ধ, দৃষ্টি কল্পনা-কুশল, রূপ ইঁহাদের বর্ণনার বিষয়—তবুও ইঁহাদিগকে আমরা "কবি" বলিনা কেন? কেন বাল্মীকিকেই আমরা সর্ব্বপ্রথমে কবি নামে আহ্বান করি? উত্তরে বলিব—ইঁহাদের অর্থাৎ বৈদিক ঋষিদের প্রতিভা ইন্দ্র, অগ্নি, মাতরিশ্বার স্তবস্তুতিতেই নিঃশেষিত হইয়াছে—মাটির মানুষের সুখদুঃখের কথা মুখ্য-ভাবে ইঁহারা কদাপিও বলেন নাই—বলিতে চাহেন নাই। বাল্মীকির প্রতিভা এই মাটির মানুষের সাম-গানে—মাটির মানুষের সঙ্গীতে নিঃশেষে ব্যয়িত হইয়াছে—এই জন্যই বাল্মীকি কবি—তিনি ঋষি ন'ন—মন্ত্রদ্রষ্টা ন'ন—তিনি কবি। সুতরাং আমরা বলিতে পারি—কবি হইতে হইলে কেবল কল্পনা-কুশল হইলে চলিবে না—ভাষাকে ছন্দে গাঁথিবার ক্ষমতা লাভ করিলেই চলিবে না—শোভন-রূপের সৃজন করিবার দক্ষতা থাকিলেই চলিবে না—কবি-নামে নামী হইতে হইলে থাকা চাই মানব-হৃদয়ের গভীর

অনুভূতির জ্ঞান—মানুষ-মানুষীর বিচিত্র সুখ-দুঃখের ইতিহাসের সূক্ষ্ম তাৎপর্য্য-বোধ এবং তাহার প্রকাশের ক্ষমতা। বাল্মীকির এই চিত্ত-সৌকুমার্য্যই ছিল—এইজন্যই তিনি "অহহ অবধীঃ" এই শাপবাক্য উচ্চারণ করিয়াছিলেন, এবং "রামায়ণ"-কাব্য রচনা করিতে পারিয়াছিলেন। সে যাহাই হোক্—বাল্মীকি প্রমাণ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন যে মনুষ্যহৃদয়ই কাব্যের একমাত্র এবং অদ্বিতীয় উপাদান। হৃদয়ের পথই কাব্যের চিরন্তন পথ—ইহা ছাড়া চলিবার রাস্তা আর নাই—নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।

বাল্মীকি-রচিত এই যে পথ—এই যে শোভন-বর্ত্ম—জগতের সকল কবিই দেখিতে পাই এই পথের পথিক হইয়াছেন। হৃদয়ের কথা—হৃদ্য-কথার নিবেদন ছাড়া কাব্য লিখিত কুত্রাপিও সম্ভবপর হইয়া উঠে নাই। এখন—অশ্বঘোষ কালিদাসের অগ্রজ না অনুজ—সে সব কথার বিচার পণ্ডিতেরা করিবেন। কিন্তু বাল্মীকির পরে যে অশ্বঘোষ জন্মিয়াছিলেন ইহাতে কাহারও কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। তবে অশ্বঘোষ কাব্য-নির্ম্মাণে বাল্মীকি-রীতির অনুসরণ করিলেন না কেন? তিনি কাব্য লিখিতে বসিলেন অথচ মানুষ-মানুষীর সুখদুঃখের কথা—হৃদয়ের তীক্ষ্ণ অনুভূতির কথা বলিতেই তাঁহার যত আপত্তি—ইহা কি প্রকারে সম্ভবপর হইল? উত্তরে বলিতে হয়—অশ্বঘোষের বৌদ্ধ-দৃষ্টি তাঁহার কবি-দৃষ্টিকে ব্যাহত করিয়াছিল বলিয়াই ঐরূপ অপূর্ব্ব ধরণের কাব্য অশ্বঘোষের নিকট হইতে আমরা পাইয়াছি। সত্যই অপূর্ব্ব ধরণের কাব্য—যে কাব্যে আর সব থাকিবে—কেবল রসাত্মক বাক্যই থাকিবে না—সেই সব হৃদ্য কথাই কেবল থাকিবে না যাহা তীক্ষ্ণ বাণের মত মানুষের অন্তরের অন্তঃস্তল সহসা বিদীর্ণ করে। যাক্—এখন বৌদ্ধ-দৃষ্টি ব্যাপারটা কি—একটু বুঝিয়া লই। তবে, প্রারম্ভেই বলি ভগবান বুদ্ধের জীবদ্দশাতেই যখন বৌদ্ধ মতবাদ লইয়া বহু তর্কবিতর্ক হইয়াছে—তাঁহার দেহত্যাগের অর্থাৎ পরিনির্ব্বাণ লাভের পরেই যখন বৌদ্ধজগতে ইহা লইয়া মতান্তরে মনান্তর ঘটিয়াছে এবং এখন পর্য্যন্তও যখন পণ্ডিতে পণ্ডিতে ইহা লইয়া বিলক্ষণ মতভেদ আছে—তখন আমি যে বৌদ্ধ-জীবন-দর্শন বুঝিয়াছি এবং আপনাদিগকে অনায়াসে বুঝাইতে পারিব এইরূপ বলিলে—আমার পক্ষে

ইহা অ-সম্যক ভাষণ হইবে। তবে, মোটামুটি তুইচার কথা বলিতেছি যতটা আমি উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি। বৌদ্ধবাদের বিরুদ্ধে কি আমাদের বলিবার আছে—তাহা বলিয়া লইলেই আমার বক্তব্য বিশদ হইবে। রবীন্দ্রনাথের "স্বর্গ হইতে বিদায়" শীর্ষক কবিতাটি স্মরণ করুন...পুণ্যবলে মানুষ স্বর্গে গিয়াছিল পুণ্যের তহবিল ফুরাইয়া আসিলে চ্যুত নক্ষত্রের মত সে পৃথিবীতে খসিয়া পড়িতেছে—আসিবার সময় অন্ততঃ স্বর্গীয়দিগের কাছে একটু "হাহতোঽস্মি" শুনিবে এই ছিল তাহার আশা—কিন্তু নন্দন-বনের পারিজাত বৃক্ষতলে বসিয়া যাহারা অমৃত-ভোগে দিন কাটায়—বিদায়ের দিনে তাহাদের মুখে কোন বিচ্ছেদের শোকচ্ছায়া ঘনাইয়া উঠিল না··· যাক্—এই যে স্বর্গীয়দের চোখে একটু জল দেখিবার আশা ইহারই অপর নাম—মানব-হৃদয়। দেবতাদিগের মত বৌদ্ধরাও এই মানব-হৃদয়ের অর্থ বোঝেনা। তাহা না হইলে কি বুদ্ধদেব মৃতপুত্রা জননীকে ওরকম ভাবে ছলনা করিতে পারিতেন—মৃতপুত্রাকে বলিতে পারিতেন যে তুমি অ-মৃত্যু-স্পৃষ্ট গৃহ হইতে সর্ষপ আনয়ন কর—কারণ এই মৃত্যু-সঙ্কুল গহন সংসার-অরণ্যে অ-মৃত সর্ষপ কোথায় পাওয়া যাইবে! বুদ্ধি পূর্ব্বক মৃতপুত্রাকে সান্ত্বনা দেওয়া যায় না—সান্ত্বনা দিতে হইলে হৃদয়-সম্মত সান্ত্বনা দিতে হইবে—সকল মানুষই মরে—তোমার ছেলেও মানুষ—সুতরাং মরিয়াছে—এই প্রকারের বিচার-সম্মত সান্ত্বনা দিলে চলিবে না··· এই যে মানবহৃদয় সম্বন্ধে অজ্ঞতা—ইহা বুদ্ধদেবেরও ছিল—বৌদ্ধদিগেরও আছে। এই অজ্ঞতার বশেই সংসার তাঁহাদের কাছে অসার—এইজন্যই তাঁহারা নৈরাশ্যবাদী, কারণ ফুলের ফুটিয়া উঠিবার সার্থকতার কথা মনে না রাখিয়া ঝরিয়া পড়িবার ব্যর্থতার কথাই বৌদ্ধেরা মনে রাখেন। আর নিছক বুদ্ধি-পূর্ব্বক দেখিবার জন্য রমণীর রূপও যেমন তাঁহাদের কাছে মারের ছলনা—মাতৃস্নেহ ও পুত্র-বাৎসল্যও তাঁহাদের কাছে সেইরূপ মারের ছলনা বলিয়া প্রতিভাত হয়। বৌদ্ধদিগের মৈত্রী এবং করুণার কথাই ধরুন্—মনে হয় যেন হাঁসপাতালের "নার্সের" সেবা—অর্থাৎ কর্ত্তব্যের সেবা—মায়ের কিংবা বোনের সেবা নহে—অর্থাৎ প্রীতির সেবা নহে··· যাক্—এই যে হৃদয়কে এড়াইয়া চলিবার একান্ত আগ্রহ এইজন্যই অশ্বঘোষের কাব্য অর্থাৎ হৃদয়ের কথা এইরূপ

কিম্ভূত কিমাকার হইয়াছে। এইজন্যই বলা যায়—বুদ্ধচরিত বৌদ্ধকাব্য, কেবলমাত্র বুদ্ধচরিত বলিয়া নহে।

এখন কালিদাসের কাব্যের কথা স্মরণ করুন। কালিদাসের কাব্য-জগতে মানব-হৃদয়ের অভিব্যক্তির সুপ্রচুর অবকাশ ঘটিয়াছে। এই-জন্যই পাই মদনভস্মের পর রতিবিলাপের অপরিসীম কারুণ্য এবং ইন্দুমতীর মৃত্যুর পরে অজবিলাপের "নব মেঘদূত—অপূর্ব্ব অদ্ভুত।" সুতরাং কালিদাসের কাব্য অ-বৌদ্ধ কাব্য—পৃথিবীর সকল দেশে, সকল যুগে যে ধরণের কাব্য রচিত হইয়াছে—কালিদাসের কাব্যগুলিও সেই ধরণের—অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিতের মত কিম্ভূত কিমাকার কিছু নয়।

কিন্তু কালিদাসের কাব্য যে হিন্দু কাব্য—হিন্দু সংস্কৃতির কাব্য—তাহা এখন আমাদিগকে প্রমাণ করিতে হইবে। তাহা হইলে কালি-দাসের যুগ-নির্ণয়ে আমরা নিঃসন্দেহ হইব। মদনভস্ম লইয়াই কথা আরম্ভ করি। বৌদ্ধদৃষ্টিতে মদনভস্ম অর্থাৎ মারজয় চূড়ান্ত ব্যাপার। মদনভস্মের পর যে আবার রতিবিলাপে চতুর্দ্দিক মুখরিত হইয়া উঠিবে—ইহা কোনো বৌদ্ধই ধারণা করিতে পারে না—কারণ মদনভস্মের পর রতিবিলাপের অবকাশ দিলে ত বৌদ্ধধর্ম্মের বনিয়াদই ধসিয়া যায়। কিন্তু কালিদাস এই অবকাশ দিয়াছেন। সুতরাং তিনি বৌদ্ধদৃষ্টিতে ব্যাপারটাকে দেখেন নাই। কিন্তু এখানে একটা প্রশ্ন স্বতঃই আমাদের মনে উদিত হয়—কালিদাস মদনভস্মের কথা পাইলেন কোথা? বেদে * উপনিষদে মদনভস্মের কোন উল্লেখ নাই—পরন্তু মহামান্য অথর্ব্ব বেদ "সনাতনতমঃ" বলিয়া কামদেবতার উল্লেখ করিয়াছেন। রামায়ণে † দু'তিনটি শ্লোকে ঐ কথাটি বলা হইয়াছে। কিন্তু রামায়ণের

---

* "শতরুদ্রীয়" পরবর্ত্তী কালের রচনা বলিয়া মনে হয়।

† কন্দর্পো মূর্ত্তিমানাসীৎ কাম ইত্যুচ্যতে বুধৈঃ। * * ধচয়ামাস দুর্মেধা হুঙ্কৃতশ্চ মহাত্মনা॥—বালকাণ্ড রামায়ণ—গোবিন্দরাজ তিলক প্রভৃতি মহোদয়েরা ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু মদন যে দুর্মেধা—তাহা সকলেই বলিতেছেন। কুমার-কাব্যের মদন কিন্তু দেবতার কার্য্যে আত্মবিসর্জ্জন দিতেছেন—তিনি ত দুর্ম্মেধা ন'নই—বরঞ্চ তাঁহাকে দ্বিতীয় দধীচি বলিলে অত্যুক্তি করা হয় না।

সুরের সহিত কালিদাসের সুর মিলে না। সুতরাং যদি ধরিয়া লই—কালিকাস বৌদ্ধ-চিন্তা-পদ্ধতি হইতে মদনভস্মের কল্পনা লইয়াছেন, তাহা হইলে কিছুমাত্র অন্যায় করা হয় না। "কুমার সম্ভবের" প্রথম তিনটি সর্গে শিব-মহেশ্বরকে বৌদ্ধ আদর্শে অঙ্কিত করা হইয়াছে। তিনি যোগী, স্ত্রী-পরিত্যাগী এবং মদন-দাহক—কিন্তু সহসা রতিবিলাপে যে হৃদ্যতার সুর মুখরিত হইয়া উঠিল—সেই সুরে এই রুদ্র বৈরাগীর বৈরাগ্য, স্রোতের মুখে তৃণের মত, ভাসিয়া গেল—গৌরীকে বামে লইয়া শিব গৃহী হইলেন। এই যে পরম পরিণতি ইহার জন্য কুমার-সম্ভব কেবল যে অবৌদ্ধ কাব্য তাহাই নয়—হিন্দু কাব্য—হিন্দুত্বের কাব্য।

বৌদ্ধধর্ম্মের পূর্ব্বে—আমরা যতদূর জানি—কোনো প্রচারশীল ধর্ম্ম জগতে উদ্ভূত হয় নাই। এই প্রচারশীল ধর্ম্মের সংস্পর্শে আসিয়া হিন্দু ধর্ম্মকে অর্থাৎ বৈদিক ধর্ম্মকে আত্মরক্ষার জন্য প্রতিপ্রচারকত্ব গ্রহণ করিতে হইয়াছিল নিশ্চয়ই — না হইলে হিন্দুধর্ম্ম টিঁকিত না। আস্তিক্যবাদী ষড়্‌দর্শন এই প্রতি-প্রচারকত্বের নিদর্শন স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। সুতরাং বৈদিক কর্ম্মকাণ্ড যে ধীরে ধীরে পৌরাণিক ধর্ম্মে পরিবর্ত্তিত হইল—ইন্দ্র, মাতরিশ্বার পরিবর্ত্তে যে শিব, বিষ্ণু পূজিত হইতে লাগিলেন, হিন্দুধর্ম্মের আত্মরক্ষার চেস্টাই ইহার গোড়ার কথা। হিন্দুধর্ম্ম যে কি প্রকার আদানশীল (assimilative) তাহা পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্মের কথা মনে করিলেই বোঝা যায়। বৈদিক দেবতারা বহির্ম্মুখী (concrete), বৌদ্ধ-দেব-কল্পনা দার্শনিক এবং অন্তর্মুখী (abstract)। কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তলার সহিত রবীন্দ্রনাথের "ডাকঘরের" যে প্রভেদ বৈদিক ধর্ম্মের সহিত বৌদ্ধ ধর্ম্মের সেই প্রভেদ—মানুষ এখানে বাহিরকে ছাড়িয়া ভিতরকে আশ্রয় করিয়াছে। সুতরাং বৌদ্ধ-বিপ্লবের পরে হিন্দুকে, আধ্যাত্মিক ভাবে বাঁচিবার জন্য, এমন দেবতার কল্পনা করিতে হইয়াছিল যিনি হইবেন যুগপৎ ভাবজগতের দেবতা এবং রূপজগতের দেবতা—বহির্ম্মুখী দেবতা এবং অন্তর্মুখী দেবতা। পৌরাণিক দেবতাগণের মধ্যে শিব মহেশ্বরই ভগবান

বুদ্ধের কাছ ঘেঁসিয়া দাঁড়াইতে পারেন। ইঁহারা উভয়েই যোগী, উভয়েই মারজয়ী, উভয়েই শিব অর্থাৎ মিত্র, ভব অর্থাৎ করুণ। তবে হিন্দুরা শিবকে—মদনদাহক শিবকে, গৃহী করিয়াছেন—বৌদ্ধেরা যাহা করিতে পারেন নাই কিংবা বিকৃতভাবে করিয়াছেন—মহাসুখবাদে ইত্যাদি। আরও একটা সুস্পষ্ট প্রভেদ লক্ষ্য করি—শিব অসুরের সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন—বুদ্ধ যাহা কখনও করেন নাই—দুঃখীজন লইয়া বৌদ্ধদিগের কৃতিত্ব—দুর্দ্দান্ত, দস্যু প্রভৃতির ব্যবস্থা তাঁহারা কিছুই করেন নাই···সে যাহাই হউক—হিন্দুর সকল কল্পনা যখন ইন্দ্র তথা বুদ্ধকে শিব মহেশ্বরে পরিবর্ত্তিত করিতেছিল—সেই যুগসন্ধিক্ষণে ভারতবর্ষের জাতীয় কবি, ভারতীয় সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ কবি—এই মহাদেশের মহাকবি জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন—যাঁহার প্রতিভার বিরাট অবদান কুমার কাব্যে, রঘুবংশে, অভিজ্ঞান শকুন্তলায়, রৌদ্র করোজ্জ্বল গিরিশৃঙ্গের মত, দেদীপ্যমান হইয়া রহিয়াছে। বিশেষতঃ কুমার-কাব্য তাঁহার কল্পান্তস্থায়ী কীর্ত্তিকৌমুদী—এমন একখানা জাতীয় কাব্য পৃথিবীতে আর হয় নাই···অনেকের ধারণা শঙ্করের "ভাষ্যে" বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষ হইতে লুপ্ত হইয়াছে—তাহা সত্য নয়—হইয়াছে কালিদাসের কাব্যে —কারণ কুমার-সম্ভবেই দেখি—হিন্দু সংস্কৃতি কি করিয়া বৌদ্ধ সংস্কৃতিকে ধীরে ধীরে গ্রাস করিতেছে। তবে, সন তারিখের হিসাবে কালিদাসের যুগ আমাদের ইতিহাসের কোন কোঠায় পড়িবে—তাহা আমি বলিতে পারি না—তবে নিশ্চয়ই হিন্দুর অভ্যুদয়ের যুগে—তাহা বলাই বাহুল্য। এখন প্রশ্ন—পুষ্যমিত্রের যুগে না—গুপ্ত সম্রাটদিগের যুগে—এই প্রশ্নের ভার ঐতিহাসিক-দের উপর দিয়া আমি বিরত হইতেছি। তবে একটা কথা বলার প্রয়োজন অনুভব করি—কেবল আভ্যন্তরিক সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিয়া যেমন প্রমাণ করা যায় যে "বুদ্ধচরিতম্" বৌদ্ধ কাব্য—তেমনি আভ্যন্তরিক সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিয়া প্রমাণ করা যায় কুমার-সম্ভব প্রভৃতি হিন্দু কাব্য, হিন্দুত্বের কাব্য, বৌদ্ধ-বিপ্লবের পরে হিন্দু-পুনরুত্থান-যুগের কাব্য।

শ্রীফণীভূষণ রায়
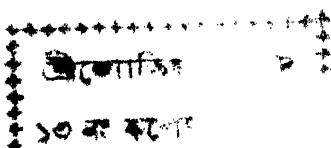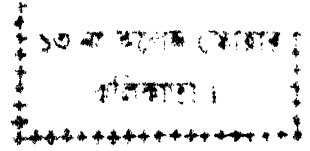
সহযাত্রী

সূর্য্য তখন অস্ত গিয়াছে কিন্তু গোধূলির আলো তখনও স্পষ্ট। ফ্রান্সের যে অংশের মধ্য দিয়া গাড়ী ছুটিতেছিল, এমন সুন্দর দেশ আমি খুব কম দেখিয়াছি। সমতল নয়, অথচ পাহাড়ে দৃষ্টি অবরুদ্ধ হইয়া যায় না! দুধারে একরকম লম্বা ঘাসে ভরা মাঠ, আর কেবল বন। শরৎশেষে ঝরিবার আগে পাতায় পাতায় এক অপূর্ব্ব রঙ্ ধরিয়াছে। বিন্দুমাত্র বাতাস নাই। সমস্ত প্রকৃতি যেন ছবির মত নিস্পন্দ ও স্বপ্নের মত অলীক—জোরে বাতাস দিলে যেন মুহূর্ত্তেই মিলাইয়া যাইবে।

দেখিয়া দেখিয়া চোখ ফিরাইতে পারিতেছিলাম না। ক্ষয়ের প্রারম্ভের রূপের মাঝে কি মোহ আছে জানি না। থাকিয়া থাকিয়া আমার মনে পড়িতেছিল আমাদের দেশের ফুলঝুরি নদীর কথা। জোয়ার আসিয়া নদী কূলে কূলে ভরিয়া উঠিলে কিছুক্ষণ আর স্রোত থাকিত না, ঢেউ উঠিত না। আপন পরিণতিতে সে প্রবাহিণী এক অপরূপ শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিত। তার পর ভাঁটার টান ধরিত।

অথচ মনের একাংশে ভালও লাগিতেছিল না। সমস্ত দিন গাড়ীতে একাকী। বুলয়েন্-এ উঠিয়াছিলাম সকাল প্রায় নয়টার সময়—আর তার পরদিন প্রাতে প্রায় দশটার সময় জিনিভা-তে নামিবার কথা। আমাদের কয়েকখানি গাড়ী প্যারিসে এই ট্রেনের সহিত জুড়িয়া দিয়াছে। যাত্রী বেশী ছিল না। সবগুলিই ঘুমাইবার গাড়ী। "রেস্তোরাঁ-কার" অবশ্য ছিল, এবং সেখানে মাধ্যাহ্নিক আহারের সময় সহযাত্রীদের দেখিয়াছি। মাত্র আট-দশ জন। তাহাদের মধ্যে কয়েক জনের কথা আমার আজো মনে আছে।

এক ছিলেন এক তরুণ দম্পতি। বোধহয় "হানি মুন"-এর যাত্রী। ক্ষণে ক্ষণে তরুণীটি বিহ্বল দৃষ্টিতে তাঁহার স্বামীর মুখের দিকে চাহিতেছিলেন এবং চোখে চোখে পড়িতেই ঈষৎ হাসিতেছিলেন। স্বামীটি টমাস্ কুক্-এর প্রণীত ভ্রমণ-পঞ্জী মন দিয়া পড়িতেছিলেন এবং বোধহয় দায়িত্ববোধের নূতন উপলব্ধিতে তাহারি এক কোণে তাঁহাদের

ব্যয়ের হিসাব লিখিতেছিলেন। তরুণী তনুদেহা, সুকেশী ও সুন্দরী। মুখের গড়নে ও কেশবিন্যাস-ভঙ্গীতে রম্‌নী-র আঁকা লেডি হ্যামিল্‌টন্‌-এর কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। কিছু দূরে একটি টেবিলে বসিয়াছিলেন একটি বৃদ্ধা, আর নার্সের পোষাকে তাঁহার সঙ্গিনী। বৃদ্ধা খাইতেছিলেন ও নার্সটি বৃদ্ধার পুরাতন ডায়েরী পড়াইয়া শুনাইতেছিল। বৃদ্ধার যে সব অংশ শুনিবার ইচ্ছা তাহা সব এক খাতায় ছিল না। নার্সটিকে বারে বারে উঠিয়া যাইতে হইতেছিল, অথচ তাহার মুখে হর্ষ-বিষাদ বা তৃপ্তি-বিরক্তি কিছুরই লক্ষণ দেখিতে পাই নাই। যেন কলের পুতুল কলে চলিতেছে।

ইঁহাদেরই পরের টেবিলে বসিয়াছিলেন আর একটি মহিলা। তাঁহাকে দেখিয়া বয়স নির্ণয় করা কিছু শক্ত। বোধহয় ত্রিশের উপর হইবে। দেখিলে মনে হয় বোদ্‌লেয়র্‌-এর মানস-লোকের কোনো মূর্ত্তি সজীব হইয়া দেখা দিয়াছে। যেমনি দীর্ঘ তেমনি প্রশস্ত, দৃঢ় দেহ আর আয়ত চোখ। ইয়ারিঙ্‌ দুটি অদ্ভুত রকমের, কাঁধে লুটাইয়া পড়িয়াছে। আদিম-জাতির মত কর্ণ-সজ্জার জন্যই হোক্‌ আর অন্য কোন কারণেই হোক্‌, মুখের মধ্যে যেন একটা নিষ্ঠুর শক্তির ব্যঞ্জনা ছিল। ইঁহার পাশে তরুণীটির কোমল লাবণ্য যেন স্বাদহীন ও অর্থশূন্য।

তাহার পর কয়েকটি টেবিল খালি ছিল। সর্ব্বশেষের টেবিলে একটি ভদ্রলোক বসিয়াছিলেন। আমাদের দেশ হইলে তাঁহাকে প্রৌঢ় বলিতাম। তাঁহার চেহারায় শুধু তাঁহার চোখ দুটি ছাড়া আর কোনো বৈলক্ষণ্য ছিল না। চোখ দুটি যেন পৃথিবীতে অফুরন্ত কৌতুক খুঁজিয়া পাইয়াছে এবং অপরকে তাহা জানাইবার জন্য ব্যগ্র। ভদ্রলোককে দেখিলেই মনে হয় তাঁহার ক্ষুধা ভাল হয়, আহার ভাল জোটে এবং নিদ্রার জন্য বেগ পাইতে হয় না।

সান্ধ্যভোজে আমার যাইতে কিছু দেরী হইয়াছিল। কিন্তু শেষোক্ত ভদ্রলোকটি আমারো পরে আসিলেন এবং আমাকে অভিবাদন করিয়া আমার টেবিলেই বসিলেন। তখন আর সকলে শেষ করিয়া উঠিয়া গিয়াছে।

ভদ্রলোককে শেষ অবধি আমি ভাল বুঝিতে পারি নাই। কিন্তু এ কথা ঠিক্‌ যে যে জিনিষ ব্যাখ্যা করিয়া বোঝানো যায় না, এবং যাহার কোনো বাংলা প্রতিশব্দ আছে কিনা সন্দেহ, ভদ্রলোকের তাহা ছিল—charm।

অতি অল্প সময়ের মধ্যে তিনি আমার সহিত অনেকখানি আলাপ করিয়া লইলেন। অথচ তাঁহার মধ্যে ইতর কৌতূহল বা অযথা ঘনিষ্ঠতা কিছুই ছিল না। আমার বয়স তাঁহার অপেক্ষা অনেক কম ছিল। অনেক কথা তিনি আমাকে উপদেশের সুরে বলিতেছিলেন এবং আমি কোনো প্রতিবাদ করিতে গেলেই তাঁহার চোখে একরূপ হাসি ফুটিয়া উঠিতেছিল—ভাবটা যেন "আমি বেশ জানি যে পৃথিবীর যত বুদ্ধি ও জ্ঞান আমার সহিত ফুরাইয়া যাইবে না। শুনিলেই না হয় আমার কথাগুলি, ইচ্ছা হয় কাল ভুলিয়া যাইও।"

তাঁহার কথা বলিবার ভঙ্গীটা ছিল কিছু বিশেষ রকমের। এক কথার শেষ হইতে না হইতে হিতোপদেশের 'কথমেতৎ'এর মত অন্য কথা পাড়িতে ছিলেন। তবে মূল কাহিনী তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিতে হইতেছিল না। তারপর অনেক সময়ে আমার দিক্ হইতে অনেক আপত্তি কল্পনা করিয়া লইয়া সেগুলি খণ্ডন করিতেছিলেন।

কিছুক্ষণ কথা হইতেই আমি অনুভব করিয়াছিলাম যে আমি ছিলাম উপলক্ষ্য মাত্র। সেই যাত্রায় সেই সব কথা তাঁহার কাহারো কাছে বলা আবশ্যক ছিল। আমি কতটুকু বিশ্বাস করি, বা তাঁহার মত কতটুকু গ্রহণ করি, সেটা তাঁহার নিকট বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয় ছিল না।

খাওয়া শেষ হইতে তিনি ওয়েটার-কে দুগ্লাস আব্স্যাঁৎ আনিতে বলিলেন। আমার জানাইতে হইল যে সুরাপান করা আমার অভ্যাস নাই। তিনি আমাকে ধূমপান করিতে অনুরোধ করিলেন। তাহাও করিনা শুনিয়া হাসিয়া কহিলেন "কোন রকম বদভ্যাস নাই। এটা ভাল কথা নহে। একটা কিছু আরম্ভ কর। নতুবা জীবনে বন্ধু পাইবে না।"

আমি উত্তর দিলাম "বন্ধুলাভের জন্য যেন এ সব করিতে হয়, ইহা ত আমার জানা ছিল না।"

সহযাত্রী আমার জন্য জিঞ্জার বিয়ার আনিতে বলিলেন ও আমাকে কহিলেন—"আমার সহিত সমান বেগে পান করিলে কাল ভোরের আগে তুমি জিঞ্জার বিয়ারের ভিন্টেজ ইয়ার (vintage years) সম্বন্ধে পণ্ডিত হইয়া যাইবে। আর বন্ধুত্বের কথা বলিতেছিলাম এইজন্য যে নিখুঁৎ মানুষকে সবাই

সন্দেহ করে। সন্দেহটা অহেতুক নয়। মানুষের পক্ষে নিখুঁৎ হওয়া এত অস্বাভাবিক যে বাহির নিখুঁৎ দেখিলে ভিতর সম্বন্ধে একটা সন্দেহ মানুষের স্বতঃই মনে আসে।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "আপনি কি 'সিনিক'?"

সহযাত্রী হাসিলেন, বলিলেন "না 'সিনিক' আমি নই। ঠাট্টা করিতে ছিলাম। কিন্তু সকলের চেয়ে আমি তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ করি নিজেকে। সময়ে সময়ে মনে হয় আমার মধ্যে দুজন লোক আছে। একজন দেখে ও আর একজন করে। প্রথম জন দ্বিতীয় জনকে অসীম কৃপার চক্ষে দেখে ও হাসে। এ হাসি মনের টিঞ্চার আয়োডিন, এ যে পাইয়াছে তাহার সিনিক হওয়া অসম্ভব।"

তারপর বোধহয় অন্য কথা পাড়িবার জন্য জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি স্প্যানিশ জানো?"

আমি কহিলাম "না।"

"তোমার শেখা উচিত, সহজ ভাষা। তারপর কাল্‌দেরন পড়িতে পারিবে। সে ছন্দ, সে ঝঙ্কার, সে গাম্ভীর্য্য পৃথিবীর আর কোনো কবিতে পাইবে না। স্পেনে গিয়াছ নিশ্চয়"।

স্বীকার করিতে হইল যে স্পেনেও আমি যাই নাই।

তিনি কহিলেন "আবার যখন ইউরোপে আসিবে স্পেনে যাইও। কিছুদিন সেভিল্‌-এ থাকিও। সৃষ্টির সেরা সুন্দরী নারী দেখিবে। আল্‌হাম্‌ব্রা, কর্দোভা এ সবই একদিন হয়ত আমরা ভুলিব, কিন্তু এই অলোকসামান্য রমণী-রূপ আমাদের চিরদিন মূরদের নিকট ঋণী রাখিবে।

—কিন্তু তাহাদের সহিত খেলিতে যাইওনা। তাহারা তোমাদের প্রাচ্য দেশের নারী নয় যে প্রদীপের সলিতার মত একটু একটু করিয়া নিজেকে ক্ষয় করিবে, তবু কখনও অগ্নিকাণ্ড করিবেনা। বিবাহ করিতে ইচ্ছা হইলে বিবাহ করিও।"

প্রাচ্যনারীর প্রতি এ ইঙ্গিত আমার ভাল লাগে নাই। কহিলাম "স্প্যানিশ নারী বিবাহ করিবার মত উচ্চাশা আমার কিছুমাত্র নাই, আর প্রাচ্যদেশের নারী সম্বন্ধে আপনার এ ধারণা কি করিয়া হইল?"

সহসা তিনি গম্ভীর হইলেন। এমন কি তাহার চঞ্চল চোখের হাসিও যেন থামিয়া গেল। অপেক্ষাকৃত নিম্নস্বরে কহিলেন—"অসন্তুষ্ট হইও না। আমার কথা বলিবার ভঙ্গীই ঐ। যখন যাহা বলি কিছু অতিরিক্ত জোরের সহিত বলি। সব দেশেই সব রকমের স্ত্রীলোক আছে। এই যে সেভিল-এর সুন্দরীদের কথা বলিতেছি ইহারাও লণ্ডনের কুয়াশাবৃত পথে তোমার চোখে সুন্দরী মনে হইবে না। তাহাদের দেখা চাই তাহাদের স্বাভাবিক আবেষ্টনের মধ্যে—সেই উজ্জ্বল রৌদ্র, সেই কঙ্কর-রাঙ্গা পথ ও সেই ফল-ভরা কমলা-গাছের সারি। তাহারি মাঝখানে তাহাদের না দেখিলে বুঝিবে না সেই কালো চুলের ও কালো চোখের ছায়ার কি মায়া।

স্পেনে গিয়া একদিন 'বুল্ ফাইট্' দেখিতে যাইও। সেদিন সাধারণতঃ একটি উৎসবের দিন থাকে। দলে দলে ছুটীর সাজে মেয়েরা আসিবে, দেখিবে তাহারা প্রত্যেকেই রাজরাণী হইবার যোগ্য!"

ইহার পর কিছুক্ষণ কোনো কথা হয় নাই। অনুভব করিলাম তর্ক উঠাইয়া আমি রসভঙ্গ করিয়া দিয়াছি। সহযাত্রীকে খুসী করিবার জন্য কহিলাম—

"আপনি ত চমৎকার ইংরেজী বলেন।"

ইংরেজী সত্যই তিনি ভাল বলিতেছিলেন তবে তাহাতে বিদেশী-সুলভ টান ছিল। তিনি উত্তর দিলেন "আমি বহুদিন ইংলণ্ডে আছি। বুঝিতেই পারিয়াছ আমার জন্ম স্পেনে। সেখানে আমার কৈশোর অবধি কাটে। তার পর কিছুদিন ফ্রান্সে ছিলাম। তার পর হইতে বরাবর ইংলণ্ডেই আছি।"

"আপনি স্পেনে ফিরিবেন না?"

"সম্ভাবনা কম, আমার কারবার ইংলণ্ডে।"

"চিরদিন এইরূপ বিদেশে থাকিতে ভাল লাগিবে?"

সহযাত্রীর গ্লাস কিছু আগেই শূন্য হইয়া গিয়াছিল। আর এক গ্লাস আনাইয়া লইয়া কহিলেন "সবি সহিয়া আসে। ইংলণ্ড আমার মন্দ লাগে না, আর জাতি হিসাবে ইংরেজদের আমি শ্রদ্ধা করি—সুতরাং কষ্ট বিশেষ কিছু নাই।

শ্রদ্ধা করি এইজন্য যে তাহাদের যাহা আছে আমাদের তাহা নাই। যদি কখনও জানিতে চাও যে একজনের মধ্যে কি নাই, তবে সে যাহাদের পছন্দ করে তাহাদের খোঁজ করিও। আর যদি জানিতে চাও সে সত্যই কি প্রকৃতির, খোঁজ করিও তাহাদের যাহাদের সে খুব বড়াই করিয়া ঘৃণা করে। কি জানো—ঘটনাক্রমে—কোনো জাতি সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হইতে পারে। কিন্তু শক্তিমান ও বুদ্ধিমান না হইলে সাম্রাজ্য কেহ রাখিতে পারে না।"

আমি কহিলাম "সাম্রাজ্য ত আপনাদেরও একদিন ছিল। আপনাদের জাতিও ত একদিন অর্দ্ধপৃথিবীর অধীশ্বর ছিল—"

"ছিল সত্য, কিন্তু সেদিন হয়ত আমাদের চরিত্রও অন্যরকমের ছিল। কখনও বিশ্বাস করিও না যে জাতীয় চরিত্রের পরিবর্ত্তন হয় না। যে দিন প্রতি স্পেনীয় পরিবারের অর্দ্ধেক পুরুষ থাকিত হাজার হাজার মাইল দূরে পৃথিবীর নানাস্থানে, যখন প্রবাসে তাহাদের চলিতে হইত বিজয়ীর গর্ব্ব ও মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া, তখনকার দিনে তাহাদের আশা ও আকাঙ্ক্ষা নিশ্চয়ই অন্যরকমের ছিল।

কেন যে জাতির উত্থান বা পতন হয়, আমি জানিনা—তবে ইংরেজদের আমি শুধু সাম্রাজ্যের অধীশ্বর বলিয়া শ্রদ্ধা করি না। কর্ম্মক্ষেত্রে ইহাদের শক্তি অদ্ভুত। সব চেয়ে মূর্খ ইংরেজকে কোন একটি শক্ত বিপদে ফেলিয়া দেখিও ইহাদের শক্তির মূল কোথায়। তাহাদের চিন্তাশক্তি প্রখর নয়, প্রকাশের ক্ষমতা সাবলীল নয়, কিন্তু বিপদে সংগ্রামে যদি সাথী খুঁজিতে হয়, তবে ইংরেজের চেয়ে ভাল সাথী কেহ নাই।

অপূর্ব্ব সাহস এ জাতির। তোমাকে বোধহয় এখনও বলি নাই গত মহাযুদ্ধে আমি ইংরেজের পক্ষে যোগ দিয়াছিলাম। খুব বেশী দিন আমাকে যুদ্ধ করিতে হয় নাই, না হইলে হয়ত আজ এখানে বসিয়া তোমার সহিত গল্প করিতাম না। অনেকগুলি ভাষা জানি বলিয়া শীঘ্রই আমার উপর অন্য রকমের কাজের ভার পড়ে। কিন্তু সোম্-এর যুদ্ধে আমি ছিলাম। তখনও বোকা ইংরেজ-কর্তৃপক্ষ সকলে বোঝেন নাই যে জার্ম্মানদের পরিখাগুলি কিরূপ সুরক্ষিত ছিল, এবং তাহা নষ্ট করিবার জন্য কি শ্রেণীর গোলাগুলির প্রয়োজন।

কিছুকাল ধরিয়া আমাদের পক্ষ হইতে যে ভীষণ বম্বার্ড্‌মেণ্ট্‌ চলিল, তাহার পর ভাবিতে পারি নাই যে শত্রুপক্ষের সম্মুখের দিকের পরিখায় কেহ জীবিত আছে। 'বারাজ্‌' উঠাইয়া দূরে সরাইবার সঙ্গে সঙ্গেই ইংরেজ সৈন্য আক্রমণ করিল। এক মুহূর্ত্তে আরম্ভ হইল শত্রুপক্ষের অসংখ্য মেশিনগানের অজস্র গুলিবৃষ্টি। তাহাদের গোলন্দাজেরা আগেই আক্রমণ করিয়াছিল। সে দৃশ্য জীবনে ভুলিব না। এক এক দল ইংরেজ পড়ে—যেন কোনো অদৃশ্য কৃষকদল নিপুণ হস্তে তৃণ কাটিতেছে—আবার আর এক দল আক্রমণ করে। চারিদিক হইতে আসে আহতের আর্ত্তনাদ, ইংরেজ-অফিসারদের উচ্চ-কণ্ঠে প্রদত্ত আদেশ ও উৎসাহবাণী, মেশিনগানের শব্দ ও কামানের গর্জ্জন। মনে হইতেছিল এ ত যুদ্ধ নয় যেন কোনো মহাদানবের পূজায় লক্ষবলি।

যুদ্ধে যোগ দিয়াছিলে কি ?"

বলিলাম "না"। এইখানে এই সম্পর্কে বলিয়া রাখি যে আমার অনেক কিছু বলিবার ইচ্ছা ছিল এবং বলিতে পারি নাই এ কারণে আমার চির-জীবনের একটি আক্ষেপ রহিয়া গিয়াছে। এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা কিরূপ এককালে হেলায় লঙ্কা জয় করিয়াছিলাম, আমাদের প্রাচীন যৌধেয় জাতির মধ্যে কিরূপ গণ-তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল, আমাদের দেশে মাৎস্যন্যায়ের সূচনা হইলে প্রজাশক্তি কিরূপে রাজা নির্ব্বাচন করিয়াছিল, আমাদের সভ্যতার আধ্যাত্মিক প্রকৃতি — এ সবের কিছু কিছু আমার বন্ধুটিকে জানাইয়া দিবার ইচ্ছা ছিল। জানাইতে পারি নাই তাহার প্রথম কারণ ভয়। যদি লোকটি আমার চেয়ে এ সব বিষয় ঢের বেশী জানে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি লোকটিকে আমি ঠিক্‌ বুঝিতে পারি নাই। দ্বিতীয় কারণ—একটা লজ্জার ভাব। এজন্য নিজের উপর অনেক দিন বিরক্তি আসিয়াছে এবং এ লজ্জার কোন যুক্তি-সঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাই নাই। তৃতীয় কারণ—এবং এইটিই শ্রেষ্ঠ কারণ—আমার এই দোতুল্যমান মন স্থির করিতে না করিতে বন্ধু আবার আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখ আমার আজিও যায় নাই। তর্কে বা কলহে যে উত্তর দিলে জয় অবশ্যম্ভাবী, সে উত্তর যখন বহুপরে হঠাৎ মনে আসে, অনেকটা সেই মনের অবস্থা লইয়া অনেকদিন আশা করিয়াছি যে একদিন না একদিন আমার সেই সহযাত্রীর সহিত আবার দেখা হইবে।

বন্ধু কহিলেন—"কেমন করিয়াই বা দিবে—যুদ্ধের সময় ত তুমি নিতান্ত বালক ছিলে। তবে তোমার কাছে এ বিষয়ে কোন অতিরঞ্জন করিতে চাই না। বর্ত্তমান যুদ্ধ-প্রণালী যে রকম, তাহাতে বীরত্বের প্রশ্ন খুব কম ওঠে। সময় মত যদি নিজের পরিখা ছাড়িয়া না ওঠ, তবে হয় মরিবে শত্রুর গোলায়, না হয় মরিবে নিজের অফিসারের রিভলভারে। তার পর ঠিক্‌মত যদি অগ্রসর না হও, মরিবে উভয়-পক্ষের গোলায়। যদি কোনো মতে কোথাও লুকাও বা পলাও, হয়ত তারপর দিনই আপন-পরিবারের মাথায় কাপুরুষতার কলঙ্কের বোঝা তুলিয়া দিয়া জীবন-লীলা শেষ করিবে নিকটতম কোন প্রাচীরের কাছে।

এ কথাও ঠিক্ যে অন্য জাতির সৈন্যেরাও কম সাহস দেখায় নাই। অস্ত্র নাই, গুলি নাই, খাদ্য নাই---এ অবস্থায় রাশিয়ার সৈন্যগণ যাহা করিয়াছে, যাহা সহিয়াছে, তাহা বলিবার নয়। কিন্তু তবু আমি বলিব, ইংরেজদের সাহস অপূর্ব্ব, মৃত্যুকে লইয়া তাহারা খেলা করিতে পারিত। মনে পড়ে সোম্-এর যুদ্ধের কিছু আগে একদিন আমি আমার কোম্পানী পরিদর্শনে বাহির হইয়াছিলাম। ট্রেঞ্চ্-এর এক অংশে গিয়া দেখি কয়েকজন সৈন্য মহানন্দে তাস খেলিতেছে। আমাকে দেখিয়া লুকাইবার চেষ্টা। কি খেলা জিজ্ঞাসা করিতে প্রথম কেহ কিছু উত্তর দেয় না। অনেক প্রশ্নের পর জানিতে পারিলাম ব্যাপারটা কি। মৃত্যুকে লইয়া তাহারা জুয়া খেলিতেছে। প্রত্যেক তাসের উপর একজনের নাম লেখা আছে। যাহার নাম একজনে টানিয়াছে সেই লোকটি যদি পরের চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে নিহত হয়, তবে যে টানিয়াছে তাহাকে আর যে ক'জন বাঁচিয়া রহিবে তাহারা দুই শিলিং করিয়া দিবে। দুইজনেরই মৃত্যু হইলে ব্যবস্থাটা কি হইবে তাহা আর জিজ্ঞাসা করিতে পারি নাই। হাসিতে হাসিতে চলিয়া আসি—কিন্তু হাসিয়াছিলাম কাঁদা অসম্ভব ছিল বলিয়া।

বালকের দল—ওরা কখনও পরিণতবয়স্ক হয় না। ওদের যাহা কিছু দোষ তাহারও মূল সেইখানে। ছেলেবেলায় যখন স্কুলে যায়, তখন বড়ছেলেদের অত্যাচারে শেখে নিজের উপর নির্ভর করিতে। ধারণা হয় যে হৃদয়াবেগ সহসা প্রকাশ করা পুরুষের পক্ষে হাস্যকর কাজ। আর শেখে ভদ্রলোকে কি করে আর কি করে না। সারা জীবন সে শিক্ষা

ভোলে না। যতদিন নিজেদের মধ্যে থাকে, ততদিন বিশেষ গোলমাল হয় না। কিন্তু পরকে ওরা সহজে বোঝে না। ওদের কাছে একজন লোক হয় ভাল না হয় মন্দ। একটা জাতি হয় শ্রদ্ধার যোগ্য, না হয় শ্রদ্ধার যোগ্য নয়—এমনি করিয়া ওরা জগৎ শাদায় কালোয় ভাগ করিয়া লয়। বিধাতার তুলিতে আর যত রঙ্ আছে সেগুলি ধরিতে ওদের দেরী হয়।"

জিজ্ঞাসা করিলাম—"উহাদের বণিক মনোবৃত্তির কথা শোনা যায় যে—"

বন্ধু কহিলেন—"কোন জাতি বণিক নয়? এককালে ত শুনিয়াছি তোমাদের মস্‌লিন না হইলে রোমের বিলাসিনীদের মন উঠিত না। বর্ত্তমান জগতের ব্যবস্থাই এই যে যেখানে প্রভুত্ব নাই, সেখানে বাণিজ্য নাই। একমাত্র ইংরেজ ত তোমাদের দেশে বাণিজ্য করিতে যায় নাই—তবে উহারাই রহিয়া গেল"। তারপর একটুখানি নীরব রহিয়া বলিলেন "ওসব অপবাদের কোনো মূল্য নাই। ইংরেজ প্রবল জাতি, প্রবলের যাহা প্রাপ্য তাহা ভোগ করিতেছে। মানুষের চরিত্র না পরিবর্ত্তিত হওয়া অবধি এইরূপই চলিবে। কিন্তু ওরা জীবনের কারুকার্য্য বোঝে না। এই দেখনা ওদের প্রিয় খাদ্য বীফ্, আর সেরা পানীয় বিয়ার। গরীব ফরাসীও কোনো না কোনো ওয়াইন্ খায়, তাতে মত্ততা আনে না, পিপাসা নিবারণ করে না, কিন্তু আসে স্বপ্ন।"

এটা আমার নিতান্ত গায়ের জোরের কথা মনে হইয়াছিল। কহিলাম —"যে জাতির মধ্যে এত কবি, এত শিল্পী, তাহার সম্বন্ধে আপনার বর্ণনা ঠিক্ বলিয়া মনে হয় না।"

বন্ধু হাসিলেন—যেন এই কথাটিরই অপেক্ষা তিনি করিতেছিলেন—বলিলেন "একটা জাতির সম্বন্ধে কোনো কথা কি সর্ব্বাংশে খাটে কখনও? খুঁজিতে হয় তার প্রাণ। তবে তুমি ঠিক্ প্রশ্নই তুলিয়াছ। ইংরেজের মধ্যে একটি ভাবপ্রবণতা ও আদর্শবাদের ধারা আছে, যাহা তাহারা সচরাচর অতি অন্তরালে রাখে কিন্তু দু' একটি জিনিষে তাহা বেশ ধরা পড়ে। প্রতি জাতির মধ্যেই কিছু পরিমাণে গোপন প্রণয় আছে। হয়ত অনেক

উপন্যাস পড়িবার সময় তোমার মনে হইয়াছে যে বস্তুটি ফরাসী জাতির বিশেষত্ব। কোনো ফরাসী গ্রামে গিয়া কিছুদিন বাস করিলে বুঝিবে এ কথা কত অসত্য। এমন পরিশ্রমী, সমাজভীরু ও রক্ষণশীল জাতি খুব কম আছে। তাইই বোধহয় ফরাসী-বিপ্লব এমন সাংঘাতিক আকার ধারণ করিয়াছিল!

কিন্তু কিছু পরিমাণে আছে ত। তবে সেরূপ অবস্থায় পড়িয়া ফরাসী নারী বা কোনো ল্যাটিন নারী নিজের পরিবার ভাঙ্গে না। তাহার কারণ শুধু ক্যাথলিক ধর্ম্ম নয়। জীবনের এই সব আত্ম-বিস্মৃত মুহূর্ত্ত-গুলির প্রকৃত মূল্য কি সে তাহা বোঝে। যাহা স্থায়ী—স্বামী, সংসার, সন্তান—এ সব সে ভাসাইয়া দেয় না। কিন্তু প্রণয়ীকে গোপনে সে নিজের ভাণ্ডার উজাড় করিয়া দেয়। আর ইংরেজ এরূপ ক্ষেত্রে অনুভব করে যে বিবাহিত জীবনে ভিন্ন প্রণয় অন্যায়, অস্বাভাবিক,—তাই বিচ্ছেদ-মোকদ্দমা, সন্তান লইয়া কাড়াকাড়ি—এ সবে তাহার জীবন কলহ-তিক্ত হইয়া উঠে।"

আমি কহিলাম "সত্যভঙ্গের কথা প্রকাশ করাই ত ধর্ম্মবুদ্ধির কাজ; আর প্রেম যেখানে নাই সেখানে প্রেমের অভিনয় ত এক ভয়াবহ ব্যাপার। ল্যাটিন নারী যখন জানে জিনিষটি স্থায়ী হইবে না, তখন সে যদি প্রণয়ীকে ভালবাসে মনে করে, তবে কোনো পক্ষকে না কোনো পক্ষকে ভীষণ প্রবঞ্চনা করে।"

বন্ধু কিছুক্ষণ উত্তর দিলেন না এবং একদৃষ্টে আমার চোখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তারপর একটু গম্ভীর সুরেই কহিলেন "তোমার মুখে একথা শুনিয়া সুখী হইয়াছি। বয়স যখন তোমার মত ছিল, তখন আমারো মত ঐ ছিল এবং থাকা উচিতও। আজো যে আমার মনের কোনো অংশ তোমার কথায় সায় দেয় না, তাহা নহে। কিন্তু সংসারের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা কি জানো—একটা জিনিষকে অনেক ভাবে দেখা যায়, এই সত্যটি গ্রহণ করা। ল্যাটিন নারী যদি প্রবঞ্চনা করে কাহাকেও, সে নিজেকে। বলিবে সেটি সুস্থ মনের চিহ্ন নয়। কিন্তু ভাবিয়া দেখ, আত্ম-প্রবঞ্চনা ছাড়া এই জগৎ কি এক মুহূর্ত্ত চলিত? নিসর্গসুন্দরী আমাদের এ দুর্ব্বলতাটি বেশ জানেন, এবং তাহা আশ্রয় করিয়া আমাদের দিয়া অনেক কাজ

করাইয়া নিয়া থাকেন আর আমরা মনে করি আমরা সমাজ-সংসারের কাছে আমাদের কর্ত্তব্য করিতেছি। অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুকে আমরা ভুলিয়া থাকি। সে যে মালঞ্চের মালাকরের মত কখন আসে তাহারো ঠিক্ নাই। শুনিয়াছি এক পথহারা তারার আকর্ষণে আমাদের সৌরজগতের আরম্ভ। আবার যে আর একদিন আর এক পথহারার আকর্ষণে তাহার শেষ হইবে না, কে বলিতে পারে। আর তাহা যদি নাও হয়, তাহা হইলেও ত এই পৃথিবীর জীবনের একদিন অবসান আছে।

মধ্যযুগের মানুষের মনের কথা তাই বোঝা সহজ ছিল। এ জীবন যখন একটি অনন্ত জীবনের প্রস্তাবনা তখন তাহারই জন্য প্রস্তুত হওয়ায় ছিল তৃপ্তি। সে বিশ্বাস আর নাই। তাই অনেক লেখক সেই অনন্ত জীবনের স্থানে বসাইয়াছেন অনন্ত ভবিষ্যৎ। এই পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে, সপ্ত সমুদ্র লেমনেডে ভরিয়া যাইবে। ধরিয়া লইলাম হইবে—কিন্তু আমার তাহাতে কি আসে যায়? ততদিন আমার কোনো বংশধর থাকবে কিনা তাহাও জানি না। সেদিনের জন্য আজ আমি কেন উপবাসী থাকি?

কিন্তু তবু ত সেই ভবিষ্যতের জন্য কাজ করিয়া যাই। মানুষের এ আত্ম-প্রবঞ্চনা মর্ম্মগত বস্তু। এ সে অতিক্রম করিতে পারে না। ল্যাটিন নারীও তাই চোখ খুলিয়াই স্বপ্ন দেখে।

আর ভালবাসা—হয়ত শব্দটি আমি ব্যবহার করিতেছি এক অর্থে, আর তুমি বুঝিতেছ আর এক অর্থে। হৃদয় যখন অন্যকে চায়, তখনও যাহার সহিত সুখে দুঃখে জীবন গড়িয়া উঠিয়াছে, সে তুচ্ছ নয়। তাহার বুকে মর্ম্মান্তিক আঘাত হানিবার অর্থাৎ তাহাকে সকল কথা বলিবার কারণ ল্যাটিন নারী খুঁজিয়া পায় না।

বলিতে পার তবে সে পথে না যাওয়াই ভাল। আমিও বলি তাহাই ভাল। কিন্তু মনের মত মানুষ পাওয়া যায় কই। মনকেই বরং শেখানো পড়ানো চলে। আর যে সে পথে গিয়াছে সে যে কেন গিয়াছে তাহা ঠিক্ তাহার হৃদয় লইয়া তাহার অবস্থায় না পড়িলে কখনও বুঝিবে না।”

তখন চারিদিক অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে। সহযাত্রী একবার বাহিরে

তাকাইয়া বলিলেন "ফ্রান্সের এক অতি সুন্দর প্রদেশের মধ্য দিয়া আমরা চলিতেছি কিন্তু এখানে বেশী লোক আসেনা। রিভিয়েরা-ই আজ-কালকার ফ্যাশান। দিনের গাড়ী হইলে সব দেখিতে পারিতে। এ দেশটি আমি ভাল করিয়া জানি। এইখানেই আমার এক বন্ধুর জীবনে একটি বিচিত্র ঘটনা ঘটিয়াছিল।

বন্ধুর নাম তোমায় বলিব না। আর বলিলেও তুমি মনে রাখিতে পারিবে না,—কারণ নামটি প্রায় দেড়হাত লম্বা। তাহাকে আমি ডন আন্দ্রে বলিয়া বলিব। সে আমার আশৈশব সহচর। এক সহরে আমাদের জন্ম—গত যুদ্ধের আরম্ভ অবধি আমরা স্পেন, ফ্রান্স ও ইংলণ্ডে একসঙ্গে জীবন কাটাইয়াছি। কিন্তু কিছুদিন আগে অবধি জানিতাম না যে সে যুদ্ধের পূর্ব্ব হইতেই জার্ম্মানীর গুপ্তচর ছিল। কিসের আশায় এ সাংঘাতিক কাজে যোগ দিয়াছিল জানি না। এ কাজে সাফল্য লাভ করা কঠিন। সর্ব্বদা ধরা পড়িবার ভয়, আর ধরা পড়িলে জগতে সাহায্য করিবার জন্য কেহ হাত বাড়াইবে না।

এখান হইতে খুব বেশী দূরে নয় একটি সহরে আন্দ্রে ১৯১৭ সালে জুন মাসে অবস্থিতি করিতেছিল। সেই সহরের নিকটেই ফরাসীদের একটি গোলা-কামানের কারখানা ছিল। সেখান হইতে গোপনীয় খবর কিছু সংগ্রহ করা ছিল উদ্দেশ্য। সে একজন ফরাসী ভদ্রলোকের মত ফরাসী ভাষা বলিতে পারিত এবং সেই সময়ে একজন ফরাসী অফিসারের ছদ্মবেশে ঘুরিতেছিল। সব সময়েই কিছু সংখ্যক অফিসার ছুটীতে থাকিত। যে অফিসারের ছদ্মবেশে গুপ্তচর ঘুরিত, তাহার রেজিমেণ্ট্-এর বিস্তৃত বিবরণ, যুদ্ধ সম্বন্ধে নির্ভুল খবর—এসব জানিলে, একস্থানে বেশীদিন না থাকিলে, এবং এক নামে বেশী দিন না চলিলে ইহাতে ধরা পড়িবার সম্ভাবনা থাকিলেও খুব বেশী ছিল না।

সে সহরটিতে আন্দ্রে সপ্তাহখানেক থাকিবে বলিয়া আসিয়াছিল। তিন-চার দিন অতীত হইয়াছে, কিন্তু তাহার কাজ কিছুই হয় নাই।

সে দিন পূর্ণিমার রাত্রি—আন্দ্রে সান্ধ্যভ্রমণের পর নিজের হোটেলে ফিরিতেছিল। চাঁদের আলোতে তখন ভুবন ভরিয়া গিয়াছে।

রাস্তায় জনপ্রাণী নাই, গাড়ী-ঘোড়া চলা নিষিদ্ধ। প্রতি জানালায় কালো পর্দ্দা, পথে কোনো বাতি নাই। কারণ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে দূরে হইলেও এখানে 'এয়ার-রেড্'-এর ভয় ছিল। আন্দ্রে কিন্তু তখন সে কথা ভাবিতে ছিল না। সে রাত্রির স্নিগ্ধ বাতাস ও কৃত্রিম-আলোকহীন জ্যোৎস্নাপ্লাবিত ধরণীর শোভা তাহার বিপদ-সঙ্কুল জীবনের প্রতিমুহূর্ত্ত যেন মিষ্টতায় ভরিয়া দিতেছিল।

ধীরে ধীরে সহরের যে স্থানে ঘন বসতি, আন্দ্রে সেইখানে আসিয়া পৌঁছিল। এইখানের নিস্তব্ধতা তাহার বড় অদ্ভুত লাগিতেছিল। যেন মৃত পৃথিবীর উপর ভরা চাঁদ উদাসীনের হাসি হাসিতেছে। তাহার নিজের পায়ের শব্দেই তাহার থাকিয়া থাকিয়া মনে হইতেছিল যেন কেহ তাহাকে অনুসরণ করিতেছে।

সহসা যেন পৃথিবী কাঁপিয়া উঠিল। কাছেই যেন কে তোপ ছাড়িতেছে। সঙ্গে সঙ্গে পাশের একটি বাড়ী ভাঙ্গিয়া পড়িল। এক মুহূর্ত্তে রাত্রির সেই শান্ত আকাশ এয়ারোপ্লেনের ইঞ্জিনের ঘর্ঘরে মুখরিত হইয়া উঠিল।

আন্দ্রে ছুটিতে আরম্ভ করিল। রাস্তা পার হইতেই গিয়া দেখে যে একটি স্ত্রীলোক অর্দ্ধ মূর্চ্ছিত অবস্থায় রাস্তার উপর পড়িয়া আছে। আন্দ্রে তাহাকে তুলিয়া লইয়া ছুটিতে লাগিল। রাস্তার উপরে কিছু দূরে একটি গির্জ্জা ছিল। দরজা ঠেলা দিতেই খুলিয়া গেল। গির্জ্জায় কেহ ছিল না। শুধু এক অন্ধকার কোণে একটি ভার্জ্জিন মূর্ত্তির পায়ের কাছে একটি মাত্র বাতি জ্বলিতেছিল।

নিজের কোলে রমণীটির মাথা রাখিয়া আন্দ্রে তাহাকে একটি বেঞ্চিতে শোয়াইয়া দিল। তখন বাহিরে কি হইতেছে, তাহা ঠিক্ বুঝিবার উপায় নাই। থাকিয়া থাকিয়া যে শব্দ তাহার কানে আসিতেছিল সে যেন কোনো বিজন সৈকতে তরঙ্গ ভাঙ্গিবার শব্দ।

প্রায় আধ ঘণ্টা পরে চারিদিক আবার নিস্তব্ধ হইয়া গেল। তারপর কয়েক মিনিটের জন্য সাইকেলের ঘণ্টা ও এম্বুলেন্স্ গাড়ীর শব্দে সহর যেন জাগিয়া উঠিল। কিছুকাল পরে তাহাও থামিয়া গেল।

এবার আন্দ্রে রমণীকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার মূর্চ্ছা ভাঙ্গিয়াছে কি ?"

ক্ষীণ কণ্ঠে রমণী উত্তর করিল, "হাঁ, আমাকে বাহিরে লইয়া চলুন।"

বাহিরে আনামাত্র রমণীটি আন্দ্রের হাত ছাড়িয়া সিঁড়িতে বসিয়া পড়িল। তারপর দুর্ব্বল অথচ স্পষ্ট স্বরে কহিল "আপনি আমার অশেষ উপকার করিয়াছেন, কিন্তু এবার আমি ফিরিতে পারিব। আপনি আমার জন্য আর দেরী করিবেন না।"

আন্দ্রে আপত্তি করিয়া বলিল "সে কি হয় ? এ অবস্থায় কি আমি আপনাকে একাকী যাইতে দিতে পারি ? চলুন আমি আপনাকে পৌঁছাইয়া দিয়া আসি।

রমণী উত্তর দিল "না, তাহার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই—এবার আমি যাইতে পারিব। কিছু মনে করিবেন না। যিনি আমার জীবন রক্ষা করিয়াছেন, সাহায্য লইবার প্রয়োজন থাকিলে অবশ্য তাঁহার সাহায্য লইতাম।" তারপর আন্দ্রেকে একটি ঠিকানা দিয়া বলিল—"এই ঠিকানায় যদি কাল সকালে আমার সহিত দেখা করিতে আসেন, বিশেষ সুখী হইব।"

এ বিষয়ে আর বাদানুবাদ করা নিষ্ফল মনে করিয়া আন্দ্রে নিজের পথ ধরিল। মাঝে মাঝে ফিরিয়া দেখিল রমণীটি তখনও সিঁড়ির উপর বসিয়া আছে। একবার মনে করিল ফিরিয়া যায়। তারপর ভাবিল রমণীটি হয়ত আরো একটু বিশ্রাম করিতে চায়—আর তারপর তাহার নিজেরই ত সহর !

সে দিন ঘুমাইবার আগে আন্দ্রে 'এয়ার রেড্' অপেক্ষা এই অপরিচি-তার কথা বেশী ভাবিয়াছিল। সাজসজ্জায়, কথাবার্ত্তায় তাহাকে ভদ্রকন্যাই মনে হইয়াছিল। যুবতী কিন্তু সুন্দরী নয়। তবু সে রূপের মধ্যে যেন কি একটা আকর্ষণ ছিল। তাহার এই ভবঘুরে জীবনে বহু নারীর সহিত বিভিন্ন রকমের পরিচয় হইয়াছে, কিন্তু ঠিক এমন ভাবে আর কেহ তাহার মন আলোড়িত করে নাই। ভাবিয়া ভাবিয়া আন্দ্রে একবার হাসিয়া উঠিয়া মনে মনে কহিল—'আর কিছু নয়, আমার স্বভাবই হইতেছে রহস্য ভালবাসা। এই অপরিচিতা যদি আমাকে তাহার সঙ্গে ফিরিতে দিত, তারপর তাহার পিতামাতার সহিত তাহার জীবন-রক্ষক বলিয়া আমার পরিচয় করাইয়া দিত

আমি উৎফুল্ল হইয়া ঘরে ফিরিতাম বটে, কিন্তু তাহার কথা আর দ্বিতীয়বার ভাবিতাম না। যাহা করা স্বাভাবিক, তাহা করে নাই বলিয়াই আমি তাহার কথা এত ভাবিতেছি।" ইহার পর তাহার ঘুমাইতে আর বিলম্ব হয় নাই। এবং সে রাত্রিতে যদি কিছু স্বপ্ন সে দেখিয়া থাকে, তবে পরদিন প্রভাতে তাহা তাহার মনে ছিল না।

সে প্রভাতে সে অপরিচিতা যেন তাহারই অপেক্ষা করিতেছিল। একটি বোর্ডিং হাউসে দুইটি ঘর লইয়া সে ছিল। সে সহরের মেয়ে সে নয়। বসিবার ঘরে যাহা থাকা উচিত তাহাই ছিল। দেয়ালে ছিল একখানা মাত্র ছবি। কোনো ফরাসী গ্রামের। গ্রামের পাশ দিয়া একটি খাল চলিয়া গিয়াছে এবং তাহার দুই কূলে দীর্ঘ পপ্‌লারের শ্রেণী।

এবার দিনের আলোতে আন্দ্রে রমণীকে দেখিল। মুখখানা অনেকটা চৌকোণ, নাকটি ঈষৎ স্থূল, ঘন জোড়া ভ্রূর নীচে ছোট দুটি চোখ, উজ্জ্বল ও তীক্ষ্ণ এবং একরাশ সোনালী চুল। যুবতীকে খর্ব্বাকৃতিই বলিতে হইবে, কিন্তু নিটোল সুঠাম গঠন। কি দেহে, কি সাজ-সজ্জায়, কি কথাবার্ত্তায় কোথাও তাহার কিছু শিথিলতা ছিল না। নাম মাদেলিন উরেল। বিশেষ কাজে এই সহরে প্রায় একমাস আছে।

এ ক্ষেত্রে আলাপ যেরূপ হইতে হয়, তাহাই হইল। তবে আন্দ্রে যখন বলিতেছিল যে সে বিশেষ কিছু করে নাই, মাদেলিন যখন আহত হয় নাই তখন একটু পরে বিনা সাহায্যেই জ্ঞান লাভ করিয়া ঘরে ফিরিতে পারিত তখন বাধা দিয়া মাদেলিন কহিল "সে কথা ঠিক্ নয়। আমি সে স্থানে আবার গিয়াছিলাম। যেখানে আমি পড়িয়া যাই, তাহার প্রায় দশ হাত দূরে পরে একটি বোমা পড়িয়া গর্ত্ত হইয়া গিয়াছে। আপনি আমাকে না সরাইয়া লইলে আমার মৃত্যু অনিবার্য্য ছিল।"

এই সব কথাবার্ত্তার মধ্যে আন্দ্রে অনুভব করিতেছিল যে আগের রাত্রির জ্যোৎস্নালোকে অনুভূত সেই আকর্ষণ আজ কি তীব্র হইয়া উঠিয়াছে। সব চেয়ে চোখে পড়ে রমণীর সুন্দর হাত দুটি। গ্রাম-ছাড়া পথের মত যেন কোন অচিনপুরীর ইঙ্গিতে ভরা।

উঠিবার আগে আন্দ্রে মাদেলিনকে তাহার হোটেলে সেই দিন

সান্ধ্যভোজে নিমন্ত্রণ করিল। রমণী ধন্যবাদ সহকারে সম্মতি জানাইল।

জীবনের কোনো অবস্থাতেই আন্দ্রে নিজের কাজ ভোলে নাই। তাহার এই অভিনব চাঞ্চল্য ভরা মন লইয়াও সে সারাদিন নিজের কাজ করিল। সন্ধ্যায় ফিরিয়া বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া নামিতে তাহার একটু দেরী হইল। কিন্তু মাদেলিন তখনও আসে নাই।

যুদ্ধের সময়ে কোনো হোটেলেই বিশেষ ভাল খাওয়া জুটিত না। খাইতে পাইত শুধু সৈন্যেরাই। তবু যাহা সব চেয়ে বেশী দাম দিয়া পাওয়া যায়, আন্দ্রে তাহারই আয়োজন করিয়াছিল। সান্ধ্য ভোজনের কিছু পর যখন মাদেলিনের ফিরিবার সময় হইল, তখন আন্দ্রে তাহাকে পৌঁছাইয়া দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে মাদেলিন কোনো আপত্তি করিল না।

এই পরিচয়ের এই সমাপ্তি আন্দ্রে কিছুতেই স্বীকার করিতে পারিতেছিল না। অথচ এই ভদ্রকন্যার সমস্ত ব্যবহারই কুরুচি-সঙ্গত ও সুশোভন, কোনো প্রগল্‌ভতার অবসর সে আন্দ্রেকে দেয় নাই। এ পরিচয় রাখিবার বা ইহাকে অন্তরঙ্গতায় পরিণত করিবার কোনো উপায় আন্দ্রে খুঁজিয়া পাইতেছিল না। মাদেলিনের সহিত কথা বলিতে বলিতে ও এই সব ভাবিতে ভাবিতে সে বোর্ডিং হাউসে উপনীত হইল।

মাদেলিনের নিকট চাবি ছিল। দরজা খুলিয়া আন্দ্রের দিকে মুখ ফিরাইতে আন্দ্রে সাহস করিয়া বলিয়া উঠিল "আমি উপরে আসিতে পারি কি ?"

ম্যাদেলিন দ্বিধা করিল না, স্নিগ্ধ-স্বরে কহিল "এস"।

প্রেমাস্পদের মুখে প্রথম 'তুমি'-সম্বোধন যে কি মধুর, একদিন তুমি তাহা বুঝিবে। ছেলে বেলায় অনেকে চাঁদের দিকে চাহিয়া মনে করে কতগুলি মই জোড়া দিলে চাঁদে পৌঁছানো যায়। আর আজ যেন সেই আকাশের চাঁদ নামিয়া আসিয়া আন্দ্রের কাছে ধরা দিল।

মাদেলিন ভালবাসিতে জানিত। যে ভাবে প্রেম-মুগ্ধা পত্নী স্বামীর কাছে ধরা দেয়, সেই ভাবে, স্নেহে, মোহে এবং করুণায় মাদেলিন আন্দ্রের কাছে ধরা দিল। তাহার মধ্যে কোনো স্থূলতা, কোনো কদর্য্যতা ছিল না।

খানিক পরে যখন তাহারা বসিবার ঘরে ফিরিয়া আসিল, তখন প্রায় মধ্য রাত্রি। এবার আন্দ্রের বিদায় লইবার পালা। মাদেলিনের হাত দুটি নিজের হাতে লইয়া বলিল "এখন আমার যাইবার সময়। তোমাকে কোনোদিন ভুলিব না। আমাকে তুমি মনে রাখিবে এ আশা আমি করি না। তবে যদি কোনোদিন স্মরণ-পথে আসি তখন মনে যাহাতে ঘৃণা না আসে, সেই চেষ্টা করিও।"

মাদেলিন যেন অন্যমনস্ক ছিল। আন্দ্রের কথা শেষ হইতে তাহার দিকে মুখ ফিরাইয়া উত্তর দিল "তোমারই ত ভুলিবার কথা। আমার সঙ্গে তোমার পরিচয় ত তোমার জীবনের একটি ছোট অধ্যায় মাত্র, কিন্তু আমি আমার জীবন-রক্ষককে কি করিয়া ভুলিব?"

আন্দ্রে কহিল "মাদেলিন—যদি সত্যই আমি তোমার জীবন-রক্ষা করিয়া থাকি, তবে সেইজন্যই তুমি আমাকে ভুলিবে এবং আমি তোমাকে ভুলিব না। যাহাতে সহজে ভুলিতে পার, সেই জন্যই তুমি আমাকে আজ স্বর্গের অধীশ্বর করিয়াছ। আমার চেয়ে বেশী কেহ জানে না আমি উহার কত অযোগ্য। কিন্তু উপকারের মত দুঃসহ বোঝা আর কিছু নাই। তার শোধ দিতে না পারিলে বা আর কোনো উপায়ে সেটি ভুলিতে না পারিলে মানুষ ছট্‌ফট্ করে। আর উপকার যে করে সে ঋণটি চিরস্থায়ী করিতে চায়। তাহা যদি নাও পারে, তবে স্বহস্তরোপিত তরুর প্রতি মানুষের যে স্নেহ হয়, সেই শ্রেণীর একটি স্নেহ উপকৃতের প্রতি তাহার চিরদিন থাকে।"

এবার উঠিয়া গিয়া মাদেলিন ঘরের অন্য বাতিগুলি জ্বালাইল। তারপর আন্দ্রের কাছে আসিল; কিন্তু না বসিয়াই কহিল "আমার মনে হয় তুমি সেই শ্রেণীর লোক যারা পূর্ণিমা রাত্রিতে শুধু চাঁদের বিপরীত দিকটার কথাই ভাবে। সে দিক্‌টা আছে সত্য, কিন্তু তাহা কি সর্ব্বদা না ভাবিলেই নয়?'

আন্দ্র উত্তর দিল "কিন্তু আলোক ভরা দিকটিও ত অখণ্ড সত্য নয়।"

"তাই বলিয়া সেটি ভোলাও ত উচিত নয়। আমার কি মনে হয় জান? তুমি শৈশবে মাতৃহীন, কোনো আত্মীয়ার কাছে মানুষ হইয়াছ।

সে তাহার খুসি অনুসারে তোমাকে ভালবাসিয়াছে, কখনও স্থায়ী স্নেহ পাও নাই। তোমার ভাইবোন ছিল না, ত্যাগের তৃপ্তি কখনও জানো নাই। কৈশোরে তোমার বেশী সহচর ছিল না। কোনোদিনই তুমি খেলাধূলা বেশী কর নাই। খোলা আকাশকে ভালবাস নাই। চিরদিন নিজের হৃদয়কে লইয়া কোনো ঘরের কোণে দিন কাটাইয়াছ। বহুদিন অবধি নিরাশ হইবার ভয়ে কিছু আশা কর নাই, কিছু চাহিতে পার নাই। তারপর শুধু কাড়িয়া লইয়াছ, কাহারো দানের অপেক্ষা করিতে শেখ নাই। তোমাকে হঠাৎ দেখিলে মনে হয় খুব প্রফুল্ল। কিন্তু তুমি শুধু হাসির জোগান দাও, তোমার মন হাসিতে শেখে নাই।"

এবার উঠিয়া গিয়া আন্দ্রে মাদেলিনকে কাছে টানিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু মাদেলিন ধরা দিল না। মুগ্ধ কণ্ঠে আন্দ্রে কহিল—"জানিতাম তুমি মায়াবিনী, তবুও এত খবর তুমি কি করিয়া জানিলে? ইহার প্রত্যেক কথাটি সত্য। হয়ত আমারি দোষ, কিন্তু জীবনে স্থিরভূমি আমি পাই নাই। স্রোতের শৈবালের মত ভাসিয়া চলিতেছি। কোথায় চলি, কিসের আশায় চলি, তাহাও অনেক সময় ভাবিয়া পাই না।"

এবার যেন সুপ্ত ফণিনী জাগিয়া উঠিল। মাদেলিনের এ কণ্ঠস্বর আন্দ্রের পরিচিত নয়। মাদেলিন বলিতেছিল—"কিসের আশায় ফ্রান্সের এ শত্রুতা সাধন করিতেছ, তাহা কি ঠিক করিতে পারিয়াছ? তোমার কাছে আমার দেশ কি অপরাধ করিয়াছে বলিবে কি? তোমাদের জাতি আমাদের মিত্রশক্তি। বলিবে কি কোন প্রলোভনে, কোন স্থির ভূমির আশায়, এ ঘৃণিত ব্যবসায় ধরিয়াছ?"

আগের রাত্রিতে যখন পায়ের কাছে বোমা ফাটিয়াছিল তখনও আন্দ্রে এত চমকিত হয় নাই। কিন্তু এখন তাহার দিশেহারা হইলে চলিবে না, তাই উত্তর দিল—

"ফ্রান্সের শত্রু আমি, মাদেলিন?"

এবার মাদেলিন সহজ সুরে কহিল—"আর প্রবঞ্চনা করিতে চেষ্টা করিওনা। ব্যবসায় তোমারও যাহা, আমারও তাই, শুধু পার্থক্য এই যে আমি এ কাজ দেশের জন্য করিতেছি।"

তোমার সকল খবর কাল আমার কাছে পৌঁছায়। যে নামে তুমি চলাফেরা করিতেছ, তাহাও তাহাতে লেখা ছিল। তুমি এই অঞ্চলেই আছ, তাহাও আমরা জানিতাম, তবে ঠিক্ কোথায় আছ সে খবর আমাদের ছিলনা। সে সব কাগজপত্র আমার হাতে ব্যাগের মধ্যে ছিল। গির্জ্জায় যখন আমার ভাল করিয়া জ্ঞান হয় তখন জানিতে পারি যে ব্যাগ আমার কাছে নাই। সেই স্থান অনুসন্ধান করিবার জন্য একলা ফিরিতে চাই। কিন্তু তোমার সম্মুখে করিব না বলিয়া তুমি অদৃশ্য না হইলে গির্জ্জার সিঁড়ি হইতে আমি উঠি নাই। ফিরিয়া গিয়া সে ব্যাগ আমি খুঁজিয়া পাইয়াছি।

তখনও জানিতাম না তুমি এই লোক কিনা। তোমাকে যে আসিতে বলিয়াছিলাম সে সত্যই আমার রুক্ষ ব্যবহারের জন্য ক্ষমা চাহিতে। কিন্তু তোমার নাম ও রেজিমেণ্ট যখন বলিলে, তখন আমার আর সন্দেহ রহিল না। শুনিলে বিস্মিত হইবে যে ঐ নামের অফিসারটি আজ এক সপ্তাহ হইল নিহত হইয়াছে। কিন্তু তোমার সহিত আলাপ করিয়া বুঝিয়াছি, তুমি ঘৃণার পাত্র নও, তুমি দয়ার পাত্র।"

অন্য সময়ে হয়ত আন্দ্রে নিজেকে বাঁচাইবার আরো চেষ্টা করিত। কিন্তু মাদেলিনকে দেখিয়া তাহার প্রতীতি হইয়াছিল যে সে মন একেবারে ঠিক্ না করিয়া কোনো কাজ করেনা। তাই শুধু জিজ্ঞাসা করিল—

"তুমি এখন কি করিতে চাও ?"

তেমনি সহজ সুরে মাদেলিন উত্তর দিল "তোমাকে ডাকিয়া আমি ধরাইয়া দিতে চাহি না। সন্ধ্যাবেলায় তোমার হোটেলে যাইবার সময়ে দেখিয়াছি যে খুব আস্তে গেলেও এখান হইতে সেখানে পৌঁছিতে পনেরো মিনিট লাগে। যদি কোন কারণে দেরী হয়, সেই জন্য আরো পনেরো মিনিট আমি অপেক্ষা করিব। তুমি এস্থান ছাড়িবার ঠিক্ আধঘণ্টা পরে মিলিটারী পুলিশ তোমার খবর পাইবে—তারপর তোমার অদৃষ্ট।"

আন্দ্রে কোনো উত্তর দিল না। শুধু মাদেলিনের চোখের দিকে চাহিয়া রহিল। মাদেলিন দৃষ্টি ফিরাইয়া লইল না। এবং কহিল "আমাকে অযথা নিষ্ঠুর মনে করিও না। তোমার নিকট আমার যাহা ঋণ তাহা আমার

শোধ দিবার কোন সম্ভাবনা নাই। আমার এ ধূলি-ধূসরিত দেহের আজ কোনো মূল্য নাই। তবু তোমাকে যাহা আজ আমি দিয়াছি, এ জীবনে আর কাহাকেও তাহা দিতে পারি নাই। দিতে চাহিয়াছিলাম একজনকে—সে গ্রহণ করে নাই।

তাহারি সঙ্গে আমার বিবাহ ঠিক্ ছিল।—যুদ্ধ বাধিতেই এবং তাহার ডাক না পড়িতেই সে যুদ্ধে যোগ দেয়। যে রাত্রিতে চলিয়া যায়, সেই সন্ধ্যায় আমি তাহার কাছে আত্মসমর্পণ করিতে চাহিয়াছিলাম। সে কোনো দিনই বেশী কথা কহিতে জানিত না। শুধু বলিয়াছিল 'মাদেলিন পারিতাম, যদি তোমাকে আর একটু কম ভালবাসিতাম। ভয় করিও না, আমি ফিরিয়া আসিব।' কিন্তু সে আর ফেরে নাই। ঐ যে ছবি দেখিতেছ উহা আমাদের গ্রামের ছবি। উহার একটি গাছও আজ নাই। ঐ গ্রামের প্রত্যেক ধূলিকণাটি ফরাসী রক্তে রঙ্গীন হইয়া গিয়াছে। আমার দুই ভাই ছিল—একজন মরিয়াছে, আর একজনের দুই চোখ গিয়াছে। আমার প্রৌঢ় পিতা চুলে কলপ লাগাইয়া, বয়স কম দিয়া যুদ্ধে যোগ দেন। তিনিও আর ফেরেন নাই। শুধু সান্ত্বনা এই যে যুদ্ধের এক বৎসর আগেই আমার মাতা ইহলোক ত্যাগ করেন।

এখন হয়ত বুঝিবে ফ্রান্সের কোনো শত্রুকে আমি কেন ছাড়িয়া দিতে পারিনা। অদৃষ্টের পরিহাস এই যে সেই শত্রুই আমার জীবন-রক্ষক। সে জীবন আমি তোমাকে ফিরাইয়া দিতেছি। যদি বিনা শব্দে আমাকে হত্যা করিয়া যাইতে পার, যাও। কিন্তু আর কিছু করিবার চেষ্টা করিও না। এই বাড়ীতেই মিলিটারী পুলিশের লোক আছে এবং এই ঘর না ছাড়িয়াই আমি তাহাকে যে কোন মুহূর্ত্তে ডাকিতে পারি। কিন্তু নিশ্চিত জানিও যে যে জীবন এই দেশ আমাকে দিয়াছিল সেই জীবন লইয়া আমি বাঁচিয়া রহিব, আর সেই দেশের মহাশত্রু তুমি, তুমি মুক্তি পাইবে সেই জীবন রক্ষা করিয়াছ বলিয়া, এ অসম্ভব।"

মাদেলিন থামিল। তাহার কথায়, চোখে মুখে কোনো উত্তেজনা ছিল না। যে পথ সে ধরিয়াছে সেই যেন তাহার একমাত্র পথ। তাহাতে তাহার দ্বিধা নাই, সঙ্কোচ নাই, সন্দেহ নাই।

এবার আন্দ্রে কথা বলিল। কহিল "তোমার কাছে আমার একটি ভিক্ষা আছে, দিবে কি ?"

মাদেলিন ভ্রূ তুলিয়া ইঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করিল "কি ?"

আন্দ্রে বলিল—"তোমাকে সঙ্কল্পচ্যুত করিব এত শক্তি আমার নাই, আর তাহা আমি করিতেও চাইনা। এ কাজে কি বিপদ তাহা জানিয়া শুনিয়াই যখন এ কাজে হাত দিয়াছি, তখন আজ আমার আক্ষেপ করিবার কিছু নাই। কাল দ্বিপ্রহরের আগে হয়ত যাহার জীবনের অবসান হইবে, তোমার কাছে তাহার মিথ্যা কথা বলিবার কিছু কারণ নাই। তোমাকে আমি ভালবাসিয়াছি। বহু দিন বহু নারীর কাছে এ কথা বলিয়াছি কিন্তু তখনও জানি নাই ভালবাসা কি! পৃথিবীতে আমার এই শেষ রাত্রিতে আমার সেই শ্রেষ্ঠ সম্পদ রাখিতে দাও। কাল ভোরে তোমাদের বাড়ী ছাড়িলেই তুমি তোমাদের কর্ত্তৃপক্ষকে খবর দিও।"

মাদেলিন ততক্ষণ মেজেতে কার্পেটের উপর বসিয়া পড়িয়াছে! আন্দ্রে দেখিল সে অন্যদিকে চাহিয়া আছে এবং তাহার চোখের কোণে দু'বিন্দু অশ্রু। আন্দ্রের কথার উত্তরে মাদেলিন কিছু বলিল না। মেজে হইতেই হাত দিয়া আন্দ্রেকে নিজের কাছে টানিয়া লইল।

প্রত্যাসন্ন মৃত্যু আন্দ্রের রক্তে যেন আগুন ধরাইয়া দিয়াছিল। আগে কখনও সে জানে নাই সুখের মর্ম্মস্থলে এত বেদনা। এক একবার মনে হইতেছিল আর তাহার নূতন করিয়া মরিতে হইবে না। সে মরিয়াছে, মাদেলিন মরিয়াছে। তাহাদের নিবিড়তম আলিঙ্গন জীবন-মৃত্যুর সন্ধিদ্বার খুলিয়া দিয়াছে। কোনোদিন বুঝিতে পারে নাই যে তাহারই মত রক্ত-মাংসে গড়া, ক্ষুধাতৃষ্ণা ভরা, ও সুখেদুঃখে মানুষ একটি নারীর মধ্যে এ অনন্ত বিস্ময় থাকিতে পারে। সে বিস্ময়ের গোপন উৎস যেন তাহারই স্পর্শ অপেক্ষা করিয়া আছে এবং সেখানেই পৌঁছিতে পারিলে যেন সে বুঝিতে পারিবে সৃষ্টির প্রহেলিকা, নরনারীর আকর্ষণ, জীবন-মৃত্যুর ছন্দ ও দেহমনের একাত্মতা। সেই ইশারাই ছিল বুঝি প্রভাতের তরুণ আলোয় দেখা মাদেলিনের যৌবন-কোমল বাহুদুটিতে। সেই বাহুর আহ্বান তাহাকে আনিয়াছিল এই মৃত্যুর অভিসারে এবং নিয়া চলিয়াছে মাদেলিনের অন্তরের

অন্তরে যেখানে মণিময় মঞ্জুষায় রহিয়াছে সেই গোপন কথাটি যাহা যুগ যুগান্ত ধরিয়া মানুষ খুঁজিয়াছে কাব্যে, চিত্রে ও সঙ্গীতে।

ঘরের বাতি তখনও জ্বলিতেছিল। নীল-সবুজ আলো। যেন সমুদ্র-গর্ভে কোনো মৎস্যকন্যার বিলাস-কক্ষ। আন্দ্রে দেখিল শ্রান্তি-নিমীলিত-নয়না মাদেলিনের একটি হাত তাহারই কণ্ঠলগ্ন। তাহারই দেহের উপর দুলিতেছিল মাদেলিনের নিঃশ্বাস-চঞ্চল বক্ষ—যেন তালে তালে উঠিতেছিল আরম্ভ-অবসানের, বাসনা ও বিরাগের এক অশ্রুত সঙ্গীত।

সহসা আন্দ্রের দৃষ্টি সোফাটির উপর পড়িল। হোটেল হইতে ফিরিয়া মাদেলিন এইখানেই তাহার টুপিটি খুলিয়া রাখিয়াছিল। টুপির কাছেই ছিল একটি হ্যাট্-পিন। তাহার পর যাহা ঘটিল, একটু আগেও আন্দ্রে তাহার কল্পনা করিতে পারে নাই। হাত বাড়াইয়া সে হ্যাট্-পিনটি লইল। মাদে-লিনকে একটু দূরে সরাইয়া সে তাহার বক্ষে একটি গভীর চুম্বন করিল এবং মুখ উঠাইয়া সেই চুম্বন-সিক্ত অংশের কাছে হ্যাট্-পিনটি আমূল বিদ্ধ করিয়া দিল।

তখনও যেন আন্দ্রের তন্দ্রা ভাঙ্গে নাই কিন্তু এবার সে সত্যই জাগিল। মনে করিল মাদেলিন বুঝি তখনই চীৎকার করিয়া উঠিবে, কিন্তু সে একটু অস্ফুট শব্দ করিল মাত্র। তারপর চোখ না মেলিয়াই অতি মৃদুস্বরে কহিল "বাতি নিবাইয়া দিয়া একটি জানালা খুলিয়া দাও।"

আন্দ্রে তাহাই করিল। কয়েক সেকেণ্ড পরে মাদেলিন কহিল "কাছে এস, আস্তে আসিও, নীচের লোক যেন না জাগে।"

আন্দ্রে কাছে আসিল। মাদেলিন এবার অতি ক্ষীণ কণ্ঠে কহিল "কি করিয়া জানাইব আমি তোমার কাছে কত কৃতজ্ঞ।"

তারপর কয়েক সেকেণ্ড সব স্তব্ধ। অকস্মাৎ ম্যাদেলিন কহিল "O, the air of France."

মাদেলিনের সেই শেষ কথা। আন্দ্রে উঠিয়া গিয়া জানালা বন্ধ করিয়া আবার বাতি জ্বালাইল। দেখিল ম্যাদেলিনের বক্ষ হইতে একটি ক্ষীণ রক্ত-ধারা কার্পেটে নামিয়াছে, গণ্ডের আরক্ত আভা মিলাইয়া গিয়াছে, দেহ শীতল।

অনেক ভয়াবহ মৃত্যুর দৃশ্য আন্দ্রেকে দেখিতে হইয়াছে। কিন্তু তাহারই রচিত এ দৃশ্য দেখিয়া তাহার মনে হইতেছিল যে সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া নিজেকে সংযত না রাখিলে সে তখনই পাগল হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিবে। কি ছিল কয়েক মিনিট আগে ঐ দেহের মধ্যে—কোন যাদুমন্ত্রে ফুটিয়াছিল ঐ দেহে রূপ আর তাহার দেহে ক্ষুধা। ঐ অসার বাহুদুটি কিছুক্ষণ আগে তাহাকে কি নিবিড় বাঁধনে বাঁধিয়াছিল, কখনও লতার মত কোমল, কখনও নাগপাশের মত কঠিন। কিন্তু এত ভঙ্গুর—একটি হ্যাট্-পিনের স্পর্শ আর সব ফুরাইয়া গেল!

মাদেলিনের বিস্তৃত কেশরাশি হইতে তখনও সৌরভ আসিতেছিল, আর তাহার সহিত মিশিতেছিল রক্তের তীব্র গন্ধ। আর সহ্য করিতে না পারিয়া আন্দ্রে বাতি নিবাইয়া দিয়া মাদেলিনের শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিল।

স্থির হইয়া তাহার অনেক বিষয় ভাবা প্রয়োজন। ভোরের আগে তাহার এ বাড়ী ছাড়া অসম্ভব। যদি নিঃশব্দে বাহিরে যাইতেও পারে, তবে ঘরের দরজা খোলা রহিবে। যদি কোন পরিচারিকা বা আর কেহ এ ঘরে ভোরের আগেই প্রবেশ করে। এ দিকে ভোরের আগে কোন ট্রেনও নাই। সুতরাং হোটেলেও তাহার ফেরা অসম্ভব।

কিন্তু থাকিয়া থাকিয়া তাহার মনে হইতেছিল এ হত্যায় সে নিমিত্ত-মাত্র। ইহা মাদেলিনেরই কোনো অলৌকিক শক্তিতে ঘটিত হইয়াছে। দেশের মহাশত্রুর কাছে সে ঋণী থাকিতে চাহে নাই। তাহাকে ধরাইয়া দিতেও তাহার মন সরে নাই। সুতরাং তাহারি রক্ষিত জীবন তাহারই হাতে শেষ করাইয়াছে। নতুবা হত্যার অব্যবহিত পূর্ব্বে অবধি এ কল্পনা ত তাহার মনে আসে নাই।

হঠাৎ একটি শব্দ শুনিয়া আন্দ্রে যেন কাঁপিয়া উঠিল। একটি ঘড়ির টিক্ টিক্ শব্দে মানুষের এত আতঙ্ক হইতে পারে, আন্দ্রে কখনও ভাবিতে পারে নাই। অথচ শব্দটি ঘরের কোণে একটি তিপয়ের উপরে রাখা ঘড়ির ছাড়া আর কিছুই নয়। টিক্ টিক্ টিক্—তার স্নায়ুজালে যেন ছুরির মত ঐ শব্দ বিঁধিতেছিল। এক একবার তাহার ইচ্ছা হইতেছিল উঠিয়া গিয়া কোনো

রকমে ঘড়িটি বন্ধ করিয়া আসে। টিক্ টিক্ টিক্—ও শব্দ-ধারা যেন মাদেলিনের বুকের রক্তধারার মত, প্রতি মুহূর্ত্তে মরণকে নিকটতর করিতেছে। ততদিনই আন্দ্রে শুধু বাঁচিয়াছিল যতদিন সে ছিল শুধু বিধাতার মনের স্বপ্ন। জন্মের পর মুহূর্ত্ত হইতেই ত মৃত্যুর পথ-যাত্রা। এ স্রোতে কে উজান বহে না?

তাহার সমস্ত শক্তির প্রয়োজন—কিন্তু শক্তি কোথায়। আন্দ্রে মনে মনে কহিল "আমার পাগল হইবার দেরী নাই। গুপ্তচর আমি, ধরা পড়িতে-ছিলাম, হত্যা করিয়া বাঁচিয়া গিয়াছি, আর মনের দুর্ব্বলতায় নানারূপ উদ্ভট কল্পনা করিতেছি।"

এই চিন্তার ধারা তাহার মনে কিছু স্বস্তি আনিয়া দিল। মাদেলিনের প্রসাধনের টেবিলের উপরে একখানা বই পড়িয়াছিল। আন্দ্রে উঠাইয়া দেখিল বইখানি লা ব্রুইয়ের্-এর রচনা হইতে একটি সঙ্কলন। একটি পাতার কোণ ভাঁজ করা রহিয়াছে। বইখানি খুলিতেই সেই পাতাটি চোখে পড়িল। লা ব্রুইয়ের বলিতেছেন "জীবনে সব চেয়ে বড় আকাঙ্ক্ষার ধন হয় মেলে না, না হয় যখন বা যে অবস্থায় মেলে তখন আর তাহার সুখ দিবার শক্তি নাই।"

এতক্ষণ পরে একটি গভীর বিষাদে আন্দ্রের মন ভরিয়া গেল। কি ছিল এ মেয়েটির শ্রেষ্ঠ আকাঙ্ক্ষার ধন,—কে জানে কি ছিল তাহার নিশীথের স্বপ্ন। কি সান্ত্বনা খুঁজিয়া পাইয়াছিল সে এই কয়টি ছত্রে?

তাহাকে বেশীক্ষণ ভাবিতে হয় নাই। কিছুক্ষণ পরেই গির্জ্জায় 'এঞ্জেলাস্'-এর ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। আন্দ্রেও বাহির হইয়া ষ্টেশনের পথ ধরিল।"

ইহার পর 'রেস্তোঁরা-কার'-এ আমরা প্রায় আধ ঘণ্টা ছিলাম, কিন্তু আমার সহযাত্রী আর বেশী কথা বলেন নাই। তাঁহার কথার আতসবাজি যেন পুড়িয়া শেষ হইয়া গিয়াছিল। দুএকবার কথা কহিতে চেষ্টা করিয়া 'হাঁ' 'না' উত্তর পাইয়া বাহিরে চাহিয়াছিলাম। সে দিন রাত্রিতে চাঁদ ছিল না, কিন্তু তারায় তারায় আকাশ ভরিয়া গিয়াছে। আর মনে হইতেছিল যেন তাহারা অনেক নীচে জমিয়া আসিয়াছে। অকস্মাৎ বন্ধু কহিলেন—

"কি সুন্দর তারা-ভরা আকাশ, নয় কি ? ট্রেনে যাইতে যাইতে, বা কোনো হোটেলে থাকিবার সময় অনেক দিন আমার মনে হইয়াছে, আমরাও প্রত্যেকে ঐ তারার মত। মনে হয় যেন উহারা পরস্পর কত কাছে কাছে। কিন্তু শোনা যায় একটি হইতে আর একটি লক্ষ যোজন দূরে। কিন্তু তবু কি জানো, সময়ে সময়ে মনে হইয়াছে এই ক্ষণিকের সহযাত্রীরাই মানুষের সত্যকার দরদী। আর দেখা হইবে না বলিয়াই তাহাদের কাছে অনেক কথা বলা যায়।"

কি একটি সন্দেহ অগোচরে আমার মনের মধ্যে আসিতেছিল, এতক্ষণে তাহা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল। ঠিক্ মনে হইতে লাগিল যে আমার সহযাত্রীই সেই আন্দ্রে, অন্য লোকের নাম করিয়া নিজের কাহিনীই বলিয়াছেন।

পরখ্ করিবার অবসর পাইলাম না। সহযাত্রী তখন উঠিয়া দাঁড়াইয়াছেন—কহিলেন "ইহার পরের ষ্টেশনে এ গাড়ীখানা খুলিয়া রাখিবে। ইতালীতে প্রবেশ করিলে নূতন 'রেস্তোর্াঁ-কার' এ ট্রেনের সহিত জুড়িয়া দিবে। তোমার পাসপোর্ট, ট্রাঙ্কের চাবি ও টিকিট কণ্ডাক্টার-এর কাছে দিয়া রাখিও, তাহা হইলে ফ্রান্স ছাড়িবার সময় আর উঠিতে হইবে না। এবার বিদায়, বন্ধু, জীবনে যত সুখ-সৌভাগ্য, তোমার হউক।"

চাহিয়া দেখিলাম তাঁহার চোখ দুটি আবার সেই কৌতুকোজ্জ্বলতা ফিরাইয়া পাইয়াছে।

নিজ কক্ষে আসিয়া শয়ন করিলাম।

ক্লান্ত ছিলাম, ঘুম আসিতে দেরী হইল না। কিন্তু সে ঘুম তেমন গভীর নয়। রাত্রিতে একবার মনে হইল যেন আমরা পৃথিবী ছাড়িয়া গিয়াছি। ছেলেবেলার একখানা বইয়ে সূর্য্যের দূরত্ব বোঝাইবার জন্য এক এক্‌স্‌প্রেস্ ট্রেনের কথা ছিল। মনে হইল এ সেই ট্রেন। লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া চলিবে। আমি ফুরাইব, আমার সাথীরা ফুরাইবে, কিন্তু ট্রেন চলিবে, নূতন যাত্রী আসিবে। সেই ট্রেনে রহিয়াছি এই মনে করিয়া এক অপূর্ব্ব তৃপ্তিতে মন ভরিয়া গেল।

শ্রীরাখালচন্দ্র সেন
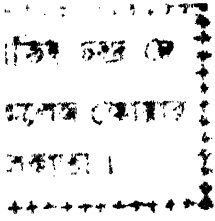
কবিতাগুচ্ছ

পথের কবিতা

মনে ব্যথার প্রেরণা ছিল
তাই নিয়ে স্থির হয়ে বসলেম প্রভাতে
আমার ঘরে।
বড়ো রাস্তার উপরে আমার ঘর,
দিনের বুক চিরে ট্রাম চলে, অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত,
আলোড়িত হয় জনতার কল্লোল
দৃষ্টির প্রবাহ।
ঘণ্টাধ্বনি, ভাঙা শব্দের ইঙ্গিত,
জমে ওঠে বিজ্ঞাপন, রঙের চীৎকার,
ধোঁয়াটে আকাশে উড়চে এরোপ্লেন কলের পাখা মেলে;
বাড়ি গাড়ির পাঁচমিশেলি।
এরি মধ্যে চলেছিল আমার মন ব্যথার গহনে,
ত্যাগ ক'রে ক'রে এই চেনা জগতের পরিধি
অলক্ষ্য কেন্দ্রের দিকে,
আপন নিঃসীম অনুভূতির কেন্দ্রে যেখানে আমি॥

দেহে মনে ভাবনায় আমার মাটিতে অন্তরীক্ষে
যে-মিলনের চলেচে আন্দোলন,
তার জাগরণ, আঘাত, তার অভিভূতি,
ছন্দে ঘূর্ণিত তার উচ্ছলিত আদিমতা
তাই নিয়ে প্রাণ রয়েচে তন্ময়।
কেমন ক'রে মেলাবো আমার দিনাবসানে
অসহ অপূর্ব্ব এই নব দীপ্তি—
সুন্দর সংস্কারের সঙ্গে আমার নূতন অভিজ্ঞান,

সুন্দরকে যা নিয়ে চলেচে দ্রুত অপ্রতিহত বেগে
চরমে, পরিচিতের পারে রিক্ত পূর্ণতার বিশ্বে ?
সত্তার সঙ্গিনী এলো আমার পথের পাশে
কেমন ক'রে নেবো তাকে আমার ভৈরবযাত্রায়
প্রেমের আগুন যেখানে হোলো হোমানল
আপনাকে পুড়িয়ে জানে অমর আত্মাকে ?
কণ্ঠধ্বনি এলো তার
অন্তিম রাগিণী আমার প্রাণের রন্ধ্রে রন্ধ্রে,
চোখের করুণা চাইল আমার গভীর কল্যাণ ॥

কেন্দ্রের পর কেন্দ্রও চলেচি পেরিয়ে
দুঃখসুখের ঊর্ম্মিঝড়ের উপর দিয়ে জাহাজে,
—আপন নিঃসীম অনুভূতির কেন্দ্রে যেখানে আমি।
মনে এলো সংসার, পার হলেম সংসার,
পৃথিবীর মাটি, গাছ, আকাশ এবং মেঘ,
আলোয় অনুরঞ্জিত আমার সেই কুটীরের জীবন মাঠের ধারে,
দূরান্তের আয়নায় ধরেচে শান্তির ছবি
বর্ণশ্রীর মায়ায় কম্পিত অতীত ধ্যানের আয়তন।
পার হয়ে এলেম প্রান্তর থেকে দিগন্তের দিকে,
অতন্দ্র উজ্জ্বল দিনের তলে নীল মুহূর্তে
আপন নিঃসীম অনুভূতির কেন্দ্রে যেখানে আমি।
ডাকলেম,
এসো তুমি আমার খুলে-যাওয়া প্রভাতে
কাল-হীন শুভ্রতার চরম স্থিতির শিখরে
নাও অগ্নি, প্রাণের পাথেয়, চিরবেদনার মর্ম্মতম বোধনা,
দাঁড়াও আমার পথিক, সমস্ত ভুবন পার হয়ে
—আপন নিঃসীম অনুভূতির কেন্দ্রে যেখানে তুমি।
জ্বলেচে সোনার দীপ,

অগণ্য শঙ্খ বাজে বিশ্বের পরিণয়-মন্দিরে
অণুপরমাণুতে কাঁপে আমাদের যুগ্মভাব মাধুরী,
চক্ষের জলে জাগ্‌ল সেই ভুবনের ছবি যেখানে বাজেনি সানাই।
পৌঁছলেম দুজনে,
কোন্ পথে ?
পথ চলেচে বিস্মিত মুক্তির দরজা খুলে
সমস্তের ভিতর দিয়ে,
আছে সংসার, মিলেচে নক্ষত্রলোক,
সহজের জীবন দোলে সুখের অতীত আনন্দে।
চির নিঃসঙ্গের সঙ্গতায় রইল এই স্পর্শ দুজনের
নবনব সম্বন্ধের মন্ত্রে তার পরিচয়।
পৃথিবীর রাস্তায় যেতে এই তো চেনা,
দেখেচি চোখে,
পেয়েচি সন্ধান
আপন নিঃসীম অনুভূতির কেন্দ্রে যেখানে তুমি আর আমি॥

পরিধির পর পরিধি বেড়ে গেল প্রত্যহের জগতে,
সংসার তরঙ্গিত হোলো আমার ঘরের ধারে ধারে,
ফিরল দুঃখ সুখ, আলো, রং, ঘণ্টাধ্বনি,
চলেচে আবার বাহিরে সহরের সবাক্ সচল চিত্র
ট্রামের তীব্রতা, কাগজ-অলার ডাক্,
এরোপ্লেন মিলিয়ে যায়, দূর আকাশের মৌমাছি
কলের পাখায় লেগেচে সূর্য্যাস্তের আভা।
এখনো বসে আছি আমি একা
বড়ো রাস্তার উপরে আমার ঘরে।

অমিয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী

ওফেলিয়া

১

তবুও এ দুঃসাহস। বসন্তের সঞ্চিত সঙ্গীত
যদি তুমি ছিঁড়ে' দাও, ভেঙে দাও জীয়ানো কুসুম,
স্রোতগ যাত্রার ছায়া ফেলে দাও, স্যাটিন্ এ ঘুম
যদিই জ্বালায়ে' দাও দীপ্ত লঘু কৈলাসের শীতে
তবুও এ দুঃসাহস। তবু আজ করে' যাবো গান।

২

তুমি যেন এক পর্দায় ঢাকা বাড়ী
আমি অঘ্রাণশিশিরে সিক্ত হাওয়া
নিদ্রাবিহীন দিনরাত ঘুরি ঘিরে'।

উদাসীন দেখ আকাশের গায়ে মেঘেরা ছড়ায় সোনা।
কথাগুলি মোর গৃহহারা করে ছায়াপথে আনাগোনা।
হৃদয় তোমার দ্যুলোকে বেঁধেছে বাসা?

পদ্মদীঘির পাড়ে
ফাল্গুনে গাঁথা গানেরে আমার কুচিকুচি করে' ছিঁড়ে'
ভাসালে নিথরজলে।
আমারই হৃদয় নিথর গভীর অতল পদ্মদীঘি।

৩

নয়নে জ্বালাও দীপশিখা।
আঁধার জমেছে হেথা কালো হয়ে' পাথুরে পাহাড়।
রোরুদ্য বর্ষার ভিজা শীতবায়ু করিছে আহত
কৃষ্ণাবাসা বনানীকে। শালতরু হারায়েছে সাড়
বনানীর আর্ত্তনাদে এ আঁধার হেডিসের মতো
ধরেছে হৃদয় মোর। বহ্নি তব দিক্ দীপশিখা।
তুলে' দাও, ছিঁড়ে' দাও জীবনের কৃষ্ণ যবনিকা।

রাত্রি রয়েছে পাশে—
তুষারশীতল কঠিনোজ্জ্বল ক্ষুরধার তরবারি।
রাত্রি ও আমি একা।

শরতের সাদা মেঘ—
পৃথিবী পাঠায় কাশের নিমন্ত্রণ।
নির্ব্বোধ, নির্ব্বোধ।

এনেছিলে বটে হাসি।
মেঘের রেশমআড়ালে দেখি নি
বজ্রের যাওয়াআসা।

৫

মুখরস্রোত বহিয়া যায় মাতাল অভিযানে—
স্তব্ধ শ্বেত বালুচরের দ্বীপ।
জীবনে কি সে পেয়েছে যতি? শান্তি তার গানে।
হৃদয় মোর ভোলালে, ওফেলিয়া।

৬

নীলরহস্য নয়নে ঘনায় তার
তুষারশিখরপ্রাচীরের মাঝে
স্নিগ্ধ গভীর দীঘি।

নিয়ে' এলে হাতে ঐন্দ্রজালিক মায়া
শ্যামল ঘুমের কোমলস্বপ্নে বোনা।
জেগে দেখি মোর পৃথিবীও গেছে উড়ে'।

উদ্ধত প্রেম উত্তোল হাতে আনো।
সন্ধ্যাআকাশে বৈশাখীহাসে
মরণের মায়া হানো।

৭

মরণে মোরা করিনি জয়, জীবনে বাহুডোরে
বালীর মতো বাঁধিনি আজো মোরা।
বিদায়রবি-বর্ণালোকে, শিশিরভেজা ভোরে
অনির্ব্বাণ তবুও পথে ঘোরা।

৮

অমরাবাসিনী, তোমার সন্ধ্যাপ্রণাম-মাঝে
ক্লিষ্ট আমার দিবসের ক্ষমা বারেক বাজে
শাপমোচনের সুরভি সুরে—এ মোর সাধনা।

ঝোড়ো হাওয়া ছোঁড়ে কালো কালো বুনোমেঘ
চৈতী পূর্ণিমাকে।
আমি যে তোমায় ভালোবাসি সেকি তাই শুধু, ওফেলিয়া ?

মুক্তিইসারা নয়নে তোমার দূরবিহঙ্গ নভোবিহার
শান্তিতুষার মুঠিতে তোমার ছড়াও বারেক বৃষ্টিধারে।
হৃদয়েরে নাও আকাশে, জীবন হোক্ তুষার।

৯

প্রসার্পিনা কুসুমে ছায়, বৈতরণীপাশে
ছড়ায় আহা ! কোমল নীল ঘুমের আবাহন।
লোলুপ তবু দ্বিধায় কার আবির্ভাব-আশে
প্রান্তরের প্রান্তে চেয়ে ভিক্ষু দেহমন।

১০

ট্রয়ের প্রাচীর হলো চূরমার এল্‌সিনোরেই।
ধূমকেতু এই বিশ্ব আমার তোমারই চোখে
পেয়েছিলো তার পরমাগতি।

বিষ্ণু দে

নরক

অন্ধকারে নাহি মিলে দিশা ॥

দীর্ঘায়িত নিশা
বয়ঃস্ফীত বারাঙ্গনাপারা
দুর্গম তীর্থের পথে হয়ে সঙ্গীহারা
ঘুমায়ে পড়েছে যেন আতিথেয় অজানার পাশে
দুর্মর অভ্যাসে।
কেশকীটে ভরা তার মাথা
লুটায় আমার কাঁধে, পরনের শতচ্ছিদ্র কাঁথা
বিষায় পরাণবায়ু সঙ্কীর্ণ কুটীরে,
তাহার বিক্ষিপ্ত বাহু ধরিয়াছে মোর কণ্ঠ ঘিরে,
ক্ষণে ক্ষণে
অজ্ঞাত দুঃস্বপ্ন তার সন্ত্রস্ত কম্পনে
সঞ্চারিত হয় মোর জাতিস্মর অবচেতনায় ॥

অতন্দ্রিত চক্ষু কিছু দেখিতে না পায় ;
শুধু মোর সঙ্কুচিত কায়া
অনুভব করে যেন নামহীন কাহাদের ছায়া
শিয়রে সংহত হয়ে উঠে,—
কোন্ যাদুঘর হতে দলে দলে পাশে এসে জুটে
কত প্রাক্‌পুরাণিক পশুদের ভূত
কুৎসিত অদ্ভুত।
অমূর্ত্ত আকাঙ্ক্ষা হানি, নিরাকার লজ্জা অসন্তোষ,
অসিদ্ধ দুরাশা দম্ভ, নিষ্ফল আক্রোশ,
কানাকানি করে অন্তরালে।

রন্ধ্রহীন বিস্মৃতির প্রতন পাতালে
অতিক্রান্ত বিলাসের, অস্থাবর প্রমোদের শব
অনুর্ব্বর সাম্প্রতেরে করিবারে চায় পরাভব
জোগায়ে জীয়ানরস অপুষ্পক বীজে ॥

অয়ি মনসিজে,
কোথা তুমি কোথা আজ এই স্থূল শরীরী নিশীথে ?
তোমার অতল কালো অতনু আঁখিতে
তারকার হিমদীপ্তি ভ'রে
তাকাও আমার মুখে। অনাত্মীয় অসিত অম্বরে
এলাও অস্পৃশ্য কেশ সূক্ষ্ম নিরুপম
স্বপ্নস্বচ্ছ বরাভয়ে আত্মত্যাগী বেরেনিস্-সম।
হেমন্ত হাওয়ার নিমন্ত্রণে
অনঙ্গ আত্মারে মোর ডাক দাও নীহারশয়নে
দুস্তর নাস্তির পরপারে ;
দাঁড়ায়ে যে-নির্ব্বাণের নির্লিপ্ত কিনারে
নিরুদ্বেগ নাচিকেতা দেখেছিলো অধোমুখে চাহি—
সম্ভোগরাত্রির শেষে ফেনিল সাগরে অবগাহি
কষিতকাঞ্চনকান্তি নগ্ন বসুন্ধরা
তারি প্রলোভনতরে সাজায়িছে যৌবনপসরা
রূপে রসে বর্ণে গন্ধে কামাতুর রামার সমান,
হে বৈদেহী, করো মোরে সেখানে আহ্বান ॥

পণ্ডশ্রম, নাহি মিলে সাড়া।
শূন্যতার কারা
অগোচর অবরোধে ঘিরে মোর আর্ত্ত মিনতিরে ;

যতই পলাতে চাই অভেদ্য তিমিরে
মাথা ঠুকে রক্তপঙ্কে পড়ি,
অগ্রজের মৃতদেহ যায় গড়াগড়ি
কৃমিভোগ্য দুর্গন্ধে যেখানে,
চরে যেথা ক্ষয়স্তূপে ভোজ্যের সন্ধানে
ক্লেদপুষ্ট সরীসৃপ, স্বেদস্রাবী বক্র বিষধর,
পঙ্কিল মণ্ডূক আর মূষিক তস্কর,
বজ্রনখ পেচক বাদুড়

বমনবিধুর
আমার অনাত্ম্য দেহ পড়ে আছে মৃন্ময় নরকে।
মৌন নিরালোকে
ভুঞ্জে তারে খুসিমতো গৃধ্রু নিশাচর।
দুস্তর, দুস্তর, জানি, শাস্তি মোর দুঃসহ দুস্তর।
মনে হয় তাই
আত্মরক্ষা হাস্যকর, সুসঙ্কল্প মৌখিক বড়াই,
জীবনের সারকথা পিশাচের উপজীব্য হওয়া,
নির্ব্বিকারে নির্ব্বিবাদে সওয়া
শবের সংসর্গ আর শিবার সম্ভাব।
মানসীর দিব্য আবির্ভাব,
সে শুধু সম্ভব স্বপ্নে, জাগরণে আমরা একাকী ;
তাহার বিখ্যাত রাখী,
সে নহে মঙ্গলসূত্র, কেবল কুটিল নাগপাশ;
মলময় তাহার উচ্ছ্বাস
বোনে শুধু উর্ণাজাল অসতর্ক মক্ষিকার পথে॥

অমেয় জগতে
নিজস্ব নরক মোর বাঁধ ভেঙে ছড়ায়েছে আজ,
মানুষের মর্ম্মে মর্ম্মে করিছে বিরাজ
সংক্রমিত মড়কের কীট।
শুকায়েছে কালস্রোত, কর্দ্দমে মিলেনা পাদপীঠ।
অতএব পরিত্রাণ নাই।
যন্ত্রণাই
জীবনে একান্ত সত্য, তারি নিরুদ্দেশে
আমাদের প্রাণযাত্রা সাঙ্গ হয় প্রত্যেক নিমেষে॥

ব্যাপ্ত মোর চতুর্দ্দিকে অনন্ত অমার পটভূমি ;
সবি সেথা বিভীষিকা, এমন-কি বিভীষিকা তুমি॥

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত

পুস্তক-পরিচয়

ব্রহ্মসূত্রম্—"ভাষ্যচ্ছায়া" নাম সরল সংস্কৃত টীকয়া তথা বহুলবিচারসমন্বিতেন রাজভাষানিবন্ধেন ভাষ্যেণ শ্রীসীতানাথ তত্ত্বভূষণেন ব্যাখ্যাতং সম্পাদিতঞ্চ। (Printed and published by Devendranath Bag at the Brahma Mission Press, 211, Cornwallis Street, Calcutta.)

ভক্তিরসায়নম্—পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্য-শ্রীমন্মধুসূদন সরস্বতী বিরচিতম্—মহামহোপাধ্যায় শ্রীমদ্ দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ মহোদয়েন ব্যাখ্যাতম্ অনূদিতম্ সম্পাদিতম্ চ। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যেন প্রকাশিতম্। (ভবানীপুর, কলিকাতা।)

বৈদান্তিক ব্রহ্মবিদ্যা যে আধারত্রয়ে সুরক্ষিত আছে তাহাদের নাম—"প্রস্থান"। স্থীয়তে অস্মিন্ ইতি স্থানং। প্র-স্থান = প্রকৃষ্ট স্থান, বিশিষ্ট আধার। বেদান্তের মুখ্য 'স্থান' উপনিষদ্—বেদান্তো নাম উপনিষদ্। আচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন, সেয়ং ব্রহ্মবিদ্যা উপনিষদ্ শব্দ বাচ্যা। উপনিষদ্ সংখ্যায় অনেকগুলি—১০৮এরও বেশী; তন্মধ্যে ঈশ, কেন প্রভৃতি দ্বাদশখানি মুখ্য উপনিষদ্—পাশ্চাত্যেরা যাহাকে Major Upanisads বলেন। এই সকল উপনিষদের আপাতদৃষ্ট-বিরোধভঞ্জন ও সমন্বয়-সাধনজন্য পারাশর্য্য-বাদরায়ণ ব্রহ্মসূত্র রচনা করেন। খৃষ্টপূর্ব্ব অষ্টম শতাব্দীতে সঙ্কলিত পাণিনিসূত্রে এই গ্রন্থের উল্লেখ আছে—সেখানে ইহাকে 'পারাশর্য্য প্রণীত ভিক্ষুসূত্র' বলা হইয়াছে—কারণ, ব্রহ্মসূত্র প্রধানতঃ চতুর্থাশ্রমী সন্ন্যাসমার্গী ভিক্ষুদিগেরই পাঠ্য ছিল। এই ব্রহ্ম-সূত্র হেতুমৎ ও বিনিশ্চিত—'ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব হেতুমদ্ভির্বিনিশ্চিতৈঃ'। উপনিষদের উপকারী এই ব্রহ্মসূত্রই বেদান্তের দ্বিতীয় প্রস্থান। বেদান্তের তৃতীয় প্রস্থান—মহা-ভারতের অন্তর্গত ভগবদ্গীতা। ঐ গীতা স্মৃতি গ্রন্থ হইলেও শ্রুতির ন্যায় মোক্ষার্থীর উপাদেয়—কারণ, উহাও ব্রহ্মবিদ্যা, উহাও উপনিষৎ-কল্প। সেইজন্য ভগবদ্গীতার প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে এই 'ধুয়া' সন্নিবিষ্ট আছে—ইতি শ্রীভগবদ্গীতাসু উপনিষৎসু ব্রহ্ম-বিদ্যায়াম্। অতএব বৈদান্তিক ব্রহ্মবিদ্যার সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় করিতে হইলে এই প্রস্থানত্রয় অর্থাৎ উপনিষদ্, গীতা ও ব্রহ্মসূত্র সাদরে আলোচনীয়।

শ্রীযুক্ত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ মহাশয় বহুবর্ষ যাবৎ এই প্রস্থানত্রয়ের সযত্ন আলোচনা করিতেছেন। বস্তুতঃ একথা অত্যুক্তি নয় যে, তাঁহার চেষ্টাতেই সাধারণ-ব্রাহ্ম-সমাজের মধ্যে একটি বৈদান্তিক চিন্তাধারা প্রবাহিত হইয়াছে। ঐ চিন্তাধারা অবশ্য হেগেলীয়ান চিন্তাধারা কতকটা অনুবিদ্ধ—কিন্তু সে অন্য কথা।

তত্ত্বভূষণ মহাশয় বেশ নিপুণতা সহকারে দ্বাদশখানি মুখ্য উপনিষদের সম্পাদন করিয়া সরল টীকা ও মূলের বঙ্গানুবাদ সহ বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত করিয়াছেন। উপনিষদ্ আলোচনার পক্ষে তত্ত্বভূষণ মহাশয়ের সম্পাদিত ঐ সংস্করণগুলি প্রবেশদ্বার স্বরূপ হইয়াছে। তৎসম্পাদিত ভগবদ্গীতাও বঙ্গীয় পাঠকের সমাদর লাভ করিয়াছে। এখন ব্রহ্মসূত্রের এই সংস্করণ প্রচার করিয়া তত্ত্বভূষণ মহাশয় প্রস্থানত্রয়-সম্পর্কীয় তাঁহার বহু-বর্ষের সাধনা সমাপ্ত করিলেন। এজন্য তিনি সকলেরই অভিনন্দনের পাত্র।

এ সংস্করণের বিশেষত্ব এই যে প্রত্যেক সূত্রের পর সরল সংস্কৃতে তাহার টীকা নিবিষ্ট হইয়াছে এবং তদনন্তর মূলসূত্রের ইংরাজী অনুবাদ এবং সংস্কৃত টীকার ভাবানুযায়ী expository and critical summary প্রদত্ত হইয়াছে। সংস্কৃত দর্শনে যাঁহাদের ব্যুৎপত্তি নাই, এই সরল টীকা ও ইংরাজী commentary তাঁহাদের বিশেষ উপকারে আসিবে এবং বেদান্তারণ্যের গহনে প্রবেশ করিবার প্রচুর সহায়তা করিবে।

গ্রন্থের ভূমিকা হইতে জানা যায়, তত্ত্বভূষণ মহাশয়ের ঐ সংস্কৃত টীকা প্রায় ২৭ বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল কিন্তু নানা ঘটনা-বিপর্য্যয়ে এ পর্য্যন্ত মুদ্রিত হইতে পারে নাই। মূলসূত্র ও টীকার ইংরাজী অনুবাদের এক-পঞ্চমাংশ তত্ত্বভূষণ মহাশয়ের নিজ-কৃত এবং অবশিষ্ট তাঁহার বন্ধু ও সহযোগী শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম, এ মহাশয় কর্ত্তৃক প্রণীত। ঐ অনুবাদ তিনি নিজে সযত্নে সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। তদ্‌ব্যতীত সমগ্র ব্রহ্মসূত্রের ১২০ পৃষ্ঠাব্যাপী একটি ইংরাজী উপক্রমণিকা গ্রন্থের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। "It is a summary, expository and critical of all the sixteen padas of the sutras. A clear idea of the entire sutra teaching will, it is hoped, be got from it even without going through the annotations and their translation."; এই অনুক্রমণিকার দ্বারা গ্রন্থের সৌষ্ঠব বর্দ্ধিত হইয়াছে।

তত্ত্বভূষণ মহাশয় প্রধানতঃ আচার্য্য শঙ্করের শারীরক ভাষ্যের অনুসরণ করিয়াছেন। কিন্তু সকল স্থলে নহে, স্থানে স্থানে ঐ সূত্র-গহনের মধ্যে তিনি নিজের পথ কাটিয়া লইয়াছেন। ব্রহ্মসূত্রের প্রকৃত ব্যাখ্যান সম্বন্ধে পূর্ব্বাচার্য্যদিগের মধ্যে বিলক্ষণ মতভেদ আছে। অতএব তত্ত্বভূষণ মহাশয়ের এইরূপ স্বতন্ত্রতায় আপত্তি করা উচিত নয়।

ব্রহ্মসূত্রের এই সংস্করণের এত গুণ সত্ত্বেও কয়েকটি অভাবের উল্লেখ করিতে চাই। সম্পাদক মহাশয় যদি সূত্রগুলিকে অধিকরণ-মালায় সজ্জিত করিতেন, তবে পাঠকের পক্ষে সূত্রের মর্ম্মগ্রহণের সুবিধা হইত; আশা করি, গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে এ বিষয়ে মনোযোগী হইবেন। ইংরাজী অনুবাদের স্থানে স্থানে কিছু কিছু ত্রুটি লক্ষিত হইল। ব্রহ্মসূত্রে 'প্রকরণ' শব্দ context অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। সম্পাদক অথবা তাঁহার সহকারী ১।২।১০ সূত্রস্থ 'প্রকরণ' শব্দের অনুবাদ করিয়াছেন section এবং ৪।৪।১৭ সূত্রস্থ প্রকরণ শব্দের অনুবাদ করিয়াছেন 'topic'। ৪।৪।৮ সূত্রগত সঙ্কল্প শব্দের অর্থ কি? অনুবাদক লিখিয়াছেন 'will'—কিন্তু সঙ্কল্প ঠিক will নহে। যে মানসিক ব্যাপার দ্বারা 'thoughts' 'things'এ পরিণত হয় তাহাই সঙ্কল্প—সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথা পূর্ব্বম্ অকল্পয়ৎ। ৪।৪।১৫ সূত্রে আছে প্রদীপবৎ আবেশঃ। এস্থলে আবেশ কি? Entering into several bodies similar to that of a lamp? অথবা আবেশের অর্থ Radiation? ৪।৪।১৯ সূত্রে 'বিকারাবর্ত্তি' শব্দ আছে—ইহার অর্থ কি? বিকার-অবর্ত্তি না বিকার-আবর্ত্তি? অর্থাৎ নির্ব্বিকার না বিকার-গোচর? সম্পাদক শঙ্করাচার্য্যের অনুসরণ করিয়া বিকার-অবর্ত্তি অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা কি ঠিক? ব্রহ্মসূত্রের ৪।২।১৭ সূত্র তদোকোঽগ্রজ্বলনম্ ইত্যাদি একটি প্রয়োজনীয় সূত্র। এই সূত্রের মূল বৃহদারণ্যক-উপনিষদের তস্য হ এতস্য হৃদয়স্য অগ্রং প্রদ্যোততে তেন প্রদ্যোতেন এষ আত্মা নিষ্ক্রামতি। এখানে উপনিষদের এবং

তদনুগামী সূত্রকারের লক্ষ্য—'দহরকোষ'—যাহাকে গুহা বা হৃৎ-পদ্ম বলে—হৃৎ-পদ্ম-কোষে বিলসৎতড়িৎপ্রভম্। ঐ গুহা—নীবার-শূকবৎ তন্বী বিদ্যুল্লেখেব ভাস্বরা। সূত্রে যে ওকোগ্রজ্বলন, উহা সেই চকিত-চমক, সেই বিদ্যুল্লেখার দীপ্তি। সম্পাদক তাঁহার টীকায় লিখিয়াছেন, ওকঃ হৃদয়ং, তজ্জ্বলনং ভাবি ফল স্ফুরণং ভবতি। "The lighting-up means the coming of a vision of the future।" ইহা কি ঠিক?

তত্ত্বভূষণ মহাশয় তাঁহার অনুক্রমণিকায় "কার্য্য"-ব্রহ্ম ও মোক্ষের স্বরূপ সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহার কিছু আলোচনা করিতে চাই—এ সম্বন্ধে তাঁহার সহিত আমার মর্ম্মান্তিক মতভেদ আছে।

উপনিষদের মতে ব্রহ্ম মহেশ্বর, পরমেশ্বর, সর্ব্বেশ্বর—(তম্ ঈশ্বরাণাং, পরমং মহেশ্বরম্ শ্বেত) অর্থাৎ, অনন্তশক্তি খচিতং ব্রহ্ম সর্ব্বেশ্বরেশ্বরম্—তিনি সমস্ত ঈশ্বরের ঈশ্বর, মহেশ্বর। অতএব ঈশ্বর বহু কিন্তু তিনি একমেবাদ্বিতীয়ম্। ঐ সকল ঈশ্বর "কার্য্য"-ব্রহ্ম, তাঁহারা নিত্য নহেন, জন্য। ব্রহ্মসূত্রের চতুর্থ অধ্যায়ের তৃতীয় পাদে এই 'কার্য্য'-ব্রহ্মের উল্লেখ আছে (৭, ১০ ও ১৪ সূত্র দ্রষ্টব্য)। ইনিই চতুর্থ পাদের ১৮ সূত্রোক্ত "আধিকারিক মণ্ডলস্থ"—ঋক্ বেদের হিরণ্যগর্ভ—

হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে
ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ।

উপনিষদে ইঁহার নাম ব্রহ্মা। ইনি ভূতের "জাতঃ পতিঃ"—'কার্য্য' বা অপর ব্রহ্ম। ইনি ৩৷৩৷৩২ সূত্রোক্ত একজন আধিকারিক পুরুষ—একটি ব্রহ্মাণ্ড বা সৌর মণ্ডলের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় কার্য্যে নিযুক্ত। ব্রহ্মাণ্ড যখন অসংখ্য, তখন ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর, এইরূপ কার্য্য (কার্য্য=creature) ব্রহ্মাও অসংখ্য। ইঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া উপনিষদ্ বলিয়াছেন

যো ব্রহ্মাণম্ বিদধাতি পূর্ব্বম্ * *
ঋষিং প্রসূতম্ কপিলং যম্ অগ্রে
জ্ঞানৈর্বিভর্ত্তি জয়মানঞ্চ পশ্যেৎ।

যিনি জন্য ঈশ্বর, তিনি কখনও নিত্য হইতে পারেন না। সেইজন্য শঙ্করাচার্য্যের উক্তি—ব্রহ্মা ইন্দ্র আদিত্য রুদ্র, কেহই চিরস্থায়ী নহেন—

অষ্ট কুলাচল সপ্ত সমুদ্রাঃ
ব্রহ্ম পুরন্দর দিনকর রুদ্রাঃ

সেইজন্য উপনিষদ্ নিত্য পরব্রহ্মকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন,—ঈশ্বরগ্রাসাৎ তুরীয় স্তুরীয়ঃ—সমস্ত ঈশ্বরগণকে গ্রাস করিয়া সেই নিত্যেশ্বর পরমেশ্বর পরব্রহ্ম বর্ত্তমান থাকেন।

যাঁহারা তত্ত্বভূষণ মহাশয়ের ন্যায় নিপট একেশ্বরবাদী, তাঁহারা এই বহু ঈশ্বরের প্রসঙ্গে বিচলিত হন এবং নানা কষ্ট কল্পনা করিয়া উপনিষদ্ ও ব্রহ্মসূত্রের স্বকল্পিত একেশ্বরবাদ অক্ষুণ্ণ রাখেন। তাঁহারা বলেন, জীবব্রহ্মের মধ্যে কোন মধ্যবর্ত্তী নাই, থাকিতে পারে না। ঐ ব্রহ্মাদি জন্য-ঈশ্বর সমস্তই কাল্পনিক—imaginary minor deities। তত্ত্বভূষণ মহাশয়ের অনুক্রমণিকার শেষ ২০ পৃষ্ঠা ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

এইজন্য তিনি বলিতে বাধ্য হইয়াছেন যে চতুর্থ পাদে ১৫ সূত্রের পর here is an abrupt halt। তাঁহার সান্ত্বনার জন্য স্মরণ করাইয়া দিই যে, বহু ঈশ্বর মানিলেও উপনিষদের ঋষিরা সম্পূর্ণ একেশ্বরবাদী ছিলেন, কারণ তাঁহাদের মতে—

অসংখ্যাতাশ্চ হরয়ঃ অসংখ্যাতাঃ পিতামহাঃ।
অসংখ্যাতাশ্চ রুদ্রাখ্যা এক এব মহেশ্বরঃ॥

ঐ মহেশ্বর পরব্রহ্ম কেবল এক নহেন, তিনি অ-দ্বিতীয়—তিনি শুধু unit নহেন, তিনি unique।

উপনিষদের আলোচনা করিলে দেখা যায়, ঋষিরা এই মনুষ্যলোকের উপর পর পর পিতৃলোক, দেবলোক, প্রজাপতিলোক ও ব্রহ্মলোক স্বীকার করিতেন। ঐ ব্রহ্মলোকের তিনটি স্তর—জনঃ, তপঃ ও সত্য। ব্রাহ্ম স্ত্রিভূমিকো লোকঃ। এই ব্রহ্মলোকই প্রপঞ্চের ঊর্দ্ধতম স্তর। তাঁহারা যাঁহাকে ব্রহ্মা বলেন, তিনি ঐ ব্রহ্মলোকের অধ্যক্ষ (Presiding Deity)—কার্য্যাত্যয়ে তদ্-অধ্যক্ষেণ সহ। ঋষিদিগের মতে, শরীর সত্ত্বে ইহলোকে যাঁহাদের সম্পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান হয়, তাঁহারা জীবন্মুক্ত অবস্থায় কিছুকাল অবস্থান করিয়া প্রারব্ধ-ক্ষয়ে দেহপাতের পর 'বিদেহ কৈবল্য' লাভ করিয়া—ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি। ইহাকেই বলে বিদেহ-মুক্তি। আর এক প্রকার মুক্তি আছে—তাহার নাম ক্রমমুক্তি। ক্রমমুক্তির অধিকারীরা দেবযান পথে পর পর কয়েকটি পর্ব্ব অতিক্রম করিয়া ঐ ব্রহ্মলোকে উপনীত হন, এবং ব্রহ্মাণ্ডের অবসান পর্য্যন্ত সেই লোকে অবস্থান করেন। ব্রহ্মলোকান্ গময়তি, তে তেষু ব্রহ্মলোকেষু পরাঃ পরাবতো বসন্তি—এবং কার্য্যাত্যয়ে ব্রহ্মার সহিত পরব্রহ্ম-রূপ পরম পদে প্রবিষ্ট হন।

তে ব্রহ্মলোকেষু পরান্ত কালে
পরামৃতাঃ পরিমুচ্যন্তি সর্ব্বে।—মুণ্ডক, ৩৷৬৷২,

অর্থাৎ ক্রমমুক্তেরা ঐ সকল ব্রহ্মলোকে পরান্তকালে (অর্থাৎ কল্পান্তে='at the end of time') পর-অমৃত হইয়া মোক্ষলাভ করেন। উপনিষদে ও ব্রহ্মসূত্রে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট উপদেশ আছে, এবং ছান্দোগ্য ও কৌষীতকী উপনিষদে এই দেবযানী জীবের ব্রহ্ম-লোকে উপস্থিতির বর্ণনা আছে। তত্ত্বভূষণ মহাশয়ের মতে এই দেবযান পথ "evidently means spiritual religion as contrasted with the merely ceremonial or traditional" এবং অগ্নি, বায়ু প্রভৃতি (যাহাদিগকে ব্রহ্মসূত্রে আতিবাহিক দেবতা বলা হইয়াছে),—তাঁহারা তত্ত্বভূষণ মহাশয়ের মতে "mean Henotheistic forms of religion"! জীব যখন উৎক্রান্তির পর দেবযান পথে যাত্রা করে, অর্থাৎ যখন "a pure form of theism is embraced, there is yet a long way to traverse before one reaches the divine city"। এই যে 'long way to traverse' (গন্তব্য দীর্ঘপথ)—দেখা যায়, তত্ত্বভূষণ মহাশয় কৌষীতকী-উপনিষদের প্রথম অধ্যায়ে রক্ষিত চিত্র-গৌতম-সংবাদে তাহার বিবরণ অবগত হইয়াছেন, এবং খৃষ্টানদিগের অভিমত Highest Heaven-এর অনুরূপ ঐ বর্ণনাতেই মুক্তির চরম মূর্ত্তির সাক্ষাৎ পাইয়াছেন। তাঁহার অনুক্রমণিকার শেষ কথাগুলি এই—"Can the father keep any thing from his son? * *

Wisdom, love, holiness, peace, joy, beauty and sweetness, all of which form the very essence of the divine nature and are beyond time and destruction are stored eternally in God and ever ready to be communicated to his children" ।

এ কথায় সম্ভবতঃ কাহারও আপত্তি হইবে না, কিন্তু ছান্দোগ্য-উপনিষদের অষ্টম অধ্যায়ের প্রতিধ্বনি করিয়া কুষীতক ঋষি ব্রহ্মলোকে নীত সাধকের যে বর্ণনা করিয়াছেন, তত্ত্বভূষণ মহাশয় কৃত তাহার ব্যাখ্যান শাস্ত্রসম্মত বলিয়া গ্রহণ করা কঠিন। প্রজাপতেঃ সভাং বেশ্ম প্রপদ্যে—ছা, ৮।১৪।১। তদ্ অরশ্চ হবৈ ণ্যশ্চ অর্ণবৌ ব্রহ্মলোকে তৃতীয়স্যাম্ ইতো দিবি। তদ্ ঐরংমদীয়ং সরঃ তদ্ অশ্বত্থঃ সোম সবনঃ তদ অপরাজিতা পুঃ ব্রহ্মণঃ প্রভুবিমিতং হিরণ্ময়ম্—ছা, ৮।৬।৩ প্রজাপতিঃ চতুর্মুখঃ। তস্য সভাং বেশ্ম প্রভুবিমিতং বেশ্ম প্রপদ্যে গচ্ছেয়ম্— শঙ্করভাষ্য। বিশেষতঃ যখন তত্ত্বভূষণ মহাশয় যাজ্ঞবল্ক্যের উদাত্ত মোক্ষবাদ—যে অবস্থায় এবং বা অরে অয়ম্ আত্মা অনন্তরঃ অবাহ্যঃ কৃৎস্নঃ প্রজ্ঞানঘন এব—এতেভ্যো ভূতেভ্যঃ সমুত্থায়, তান্যেব অনু বিনশ্যতি—ন প্রেত্য সংজ্ঞা অস্তি ইত্যরে ব্রবীমি—* * যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ, তৎ কেন কং জিঘ্রেৎ, তৎ কেন কং রসয়েৎ, তৎ কেন কং অভিবদেৎ, তৎ কেন কং শৃণুয়াৎ, তৎ কেন কং মন্বীত, তৎ কেন কং স্পৃশেৎ, তৎ কেন কং বিজানীয়াৎ—বৃ, ৪।৫।১৩,১৫। "এই অনন্ত, অবাহ্য প্রজ্ঞানঘন আত্মা—ভূতের সংঘাত দেহ হইতে উত্থিত হইয়া তাহাদের অনুসারে বিনষ্ট হয়। দেহের বিগমে (প্রেত্য) তাহার সংজ্ঞান থাকে না। * * যে অবস্থায় সমস্তই আত্মা হইয়া যায়, তখন কে কাহাকে দর্শন করিবে? কে কাহাকে আঘ্রাণ করিবে? কে কাহাকে স্বাদন করিবে? কে কাহাকে শ্রবণ করিবে? কে কাহাকে মনন করিবে? কে কাহাকে স্পর্শন করিবে? কে কাহাকে বিজ্ঞান করিবে?" অর্থাৎ ঐ অবস্থায় দ্বৈত তিরোহিত হয়, "অন্য" স্তিমিত হয়, উপাধি "সপদিগলিত" হয়—সেই একাকার মোক্ষাবস্থায় একমেবাদ্বিতীয় ব্রহ্ম ভিন্ন আর কোন কিছু থাকে না। যথানদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রে অস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়। —যখন ঐ মোক্ষবাদ প্রত্যাখ্যান করিয়া ক্রমমুক্তির নিম্নস্তর ব্রহ্মলোক-প্রাপ্তিকেই জীবের চরম নিয়তি বলিয়া প্রচার করেন, তখন তত্ত্বভূষণ মহাশয়ের অনুসরণ করা অসম্ভব হয়। যাজ্ঞবল্ক্যের মোক্ষবাদ সম্বন্ধে আমি 'পরিচয়ের' দ্বিতীয় বর্ষে সবিশেষ আলোচনা করিয়াছিলাম। এখানে তাহার পুনরুল্লেখ করিতে চাই না। আমার মতে ঐ মোক্ষবাদেই আমরা বেদান্তের তুঙ্গতম ভূমিতে আরোহণ করি—তত্ত্বভূষণ মহাশয়ের অনুমত গার্গ্যায়ণি চিত্রের মোক্ষবাদে নয়। সে যাহা হ'ক, তত্ত্বভূষণ মহাশয়ের এই গ্রন্থদ্বারা যে বেদান্ত-বিদ্যার্থীর উপকার হইবে একথা নিঃসন্দেহ এবং সেইজন্য এই গ্রন্থের আমি বহুল প্রচার কামনা করি।

বিখ্যাত অদ্বৈত-বেদান্ত গ্রন্থ 'অদ্বৈত সিদ্ধি'-প্রণেতা শ্রীমৎমধুসূদন সরস্বতী সকলেরই পরিচিত। তাঁর জন্মস্থান ছিল ফরিদপুর জেলাস্থ কোটালীপাড়ার অন্তর্গত উনসিয়া গ্রাম। তিনি আকবর বাদসাহের সমসাময়িক ছিলেন, এবং তাঁহার আবির্ভাব কালে কন্দর্পনারায়ণ বঙ্গাধিপ ছিলেন। ইহা হইতে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, তিনি খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ তৎ সম্পাদিত 'অদ্বৈত সিদ্ধি' গ্রন্থের ভূমিকায় বহু প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন

যে, মধুসূদনের জন্ম-সন খৃষ্টীয় ১৫২৫ হইত ১৫৩০-এর মধ্যে। তাঁহার পিতার নাম ছিল পুরন্দর আচার্য্য।

মধুসূদন কৈশোরেই সন্ন্যাস গ্রহণের সংকল্প করেন। তাঁহার প্রবল বৈরাগ্য দেখিয়া পিতামাতা বাধ্য হইয়া সে বিষয়ে অনুমতি দেন—এবং সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ব্বে তাঁহাকে প্রচুর জ্ঞানার্জ্জন করিতে উপদেশ দেন। সেই উদ্দেশ্যে মধুসূদন প্রথমতঃ নবদ্বীপে আসিয়া তদানীন্তন নৈয়ায়িক-প্রধান মথুরানাথের নিকট কয়েক বৎসর ন্যায়-শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। নবদ্বীপ হইতে যাত্রা করিয়া মধুসূদন অদ্বৈত চর্চ্চার কেন্দ্রস্থল কাশীধামে উপনীত হন, এবং সেখানে প্রসিদ্ধ বৈদান্তিক রামতীর্থের নিকট বেদান্ত এবং মীমাংসা-পারগ মাধবের নিকট মীমাংসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ইহার পর সন্ন্যাস গ্রহণের সঙ্কল্প সফল করিবার জন্য সন্ন্যাসী-মণ্ডলীর মণ্ডলেশ্বর বিশ্বেশ্বর সরস্বতীর শরণাপন্ন হন, এবং শুভদিনে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তাঁহার গ্রন্থের অনেক স্থলে 'শ্রীরাম বিশ্বেশ্বর মাধবানাম্' উল্লেখ আছে। মাধব তাঁহার বিদ্যাগুরু, বিশ্বেশ্বর আশ্রমগুরু কিন্তু শ্রীরাম কে? তিনি কি শ্রীরামতীর্থ?—যাঁহার নিকট মধুসূদন বেদান্ত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন? অথবা ঐ শ্রীরাম তাঁহার পরম গুরু, গুরুর গুরু?

মধুসূদন অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন—অদ্বৈত সিদ্ধি, ভগবদ্ গীতার টীকা, বেদান্তকল্পলতিকা, বেদান্তবিন্দু, অদ্বৈতরত্নরক্ষণ, আনন্দ মন্দাকিনী, ভক্তি-রসায়ন প্রভৃতি। অদ্বৈত-সিদ্ধির কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তাঁহার গীতার 'গূঢ়ার্থ দীপিকা' টীকা সর্ব্বজন-বিদিত। ঐ টীকার মধ্যে অদ্বৈতসিদ্ধি ও ভক্তিরসায়নের উল্লেখ আছে। অতএব 'ভক্তি রসায়ন' তাঁহার শেষ গ্রন্থ, এরূপ যে কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন, তাহা অমূলক।

মধুসূদন বেশ পরিণত বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। প্রবাদ এই যে হরিদ্বারে গঙ্গাতীরে সমাধিস্থ হইয়া তিনি স্বেচ্ছায় চিরসমাধিতে নিমগ্ন হন। এ সম্পর্কে শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় এইরূপ লিখিয়াছেন,—"শিষ্যবর্গ সন্ন্যাসীর অন্ত্যেষ্টিবিধি অনুসারে মধুসূদনের স্থূলদেহ গঙ্গা-সলিলে সমাহিত করিলেন। মধুসূদনের সূক্ষ্মদেহ জ্ঞান-গঙ্গায় মিশিয়া ব্রহ্ম-নির্ব্বাণ-সমুদ্রে ব্রহ্মরূপতা প্রাপ্ত হইল। বিশুদ্ধ জল-বিন্দু বিশুদ্ধ জলে মিশিয়া একীভূত হইয়া গেল।"

মধুসূদন অদ্বৈতবাদের একনিষ্ঠ উপাসক ছিলেন। কিন্তু তথাপি তিনি বিমল ভক্তিবাদী,—এবং এই 'ভক্তিরসায়ন' গ্রন্থে ভক্তিবাদের যথেষ্ট উৎকর্ষ খ্যাপন করিয়াছেন। সম্পাদক সাংখ্যবেদান্ততীর্থ মহাশয় যথার্থই বলিয়াছেন, মধুসূদন জ্ঞান ও ভক্তিকে আলোক ও অন্ধকারের ন্যায় পরস্পর বিরোধী মনে করিতেন না, পরন্তু জ্ঞানের সহিত ভক্তিমার্গের যে একটা সমন্বয় বা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, তাহাই তিনি বুঝিতেন এবং বুঝাইতে চেষ্টা করিতেন। তৎকৃত গ্রন্থ-সমূহ বিশেষতঃ এই 'ভক্তি রসায়ন' এ বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। ইহা হইতে প্রতিপন্ন হয় যে তিনি একাধারে উচ্চাঙ্গের জ্ঞানী ও ভক্ত ভাবুক ছিলেন।

তাঁহার রচিত একটি শ্লোক এই—

"যদ্‌ভক্তিং ন বিনা মুক্তি র্যঃ সেব্যঃ সর্ব্বযোগিনাম্।
তং বন্দে পরমানন্দ মাধবং নন্দনন্দনম্॥"

অর্থাৎ যিনি সর্ব্ব-যোগিজন-সেব্য, যাঁহার ভক্তি বিনা মুক্তি হয় না, সেই নন্দনন্দন পরমানন্দ মাধবকে বন্দনা করি।

তাঁহার আর একটি শ্লোক আরও চমৎকার—

"তস্যৈবাহং মমৈবাসৌ স এবাহমিতি ত্রিধা।
ভগচ্ছরণত্বং স্যাৎ সাধনাভ্যাস পাকতঃ॥"
(গীতার ১৮।৬৬ শ্লোকের টীকায়)

অর্থাৎ, প্রথম স্তরে জীব নিজেকে ভগবানের দাস মনে করে, দ্বিতীয় স্তরে ভগবান্‌কে নিজের অধীন মনে করে, এবং তৃতীয় স্তরে নিজেকে ভগবান্ হইতে অভিন্ন মনে করে।

ভক্তি রসায়ন স্বল্পকায় গ্রন্থ। ইহা তিন উল্লাসে বিভক্ত, প্রথম উল্লাসে ৩৬টি, দ্বিতীয় উল্লাসে ৮০টি এবং তৃতীয় উল্লাসে ৩০টি—গ্রন্থে মোট ১৪৬টি শ্লোক আছে।

প্রথম উল্লাসে ভক্তির সাধারণ লক্ষণ, দ্বিতীয় উল্লাসে ভক্তির বিশেষ লক্ষণ এবং তৃতীয় উল্লাসে ভক্তিরসের স্বরূপ নিরূপিত হইয়াছে। ভক্ত হইলেও মধুসূদন দার্শনিক; সেইজন্য এই গ্রন্থে ভক্তের "পরম ব্যাকুলতা" (বৈষ্ণবেরা যাহাকে 'লৌল্য' বলেন) এবং "পরম প্রেম সরূপতার" বীচিবিলাস নাই। কিন্তু দার্শনিক দৃষ্টিতে ভক্তির স্বরূপ, উৎপত্তি, স্থিতি, সাধনাদি বিষয়ে কার্য্যকারণ ভাব প্রভৃতি জ্ঞাতব্য বিষয়গুলির বেশ নিপুণ ভাবে নিরূপণ আছে।

বহুদিন পূর্ব্বেই এই অপূর্ব্ব ভক্তিগ্রন্থের বঙ্গানুবাদ সহ বঙ্গাক্ষরে মুদ্রণ ও প্রচারণ আবশ্যক ছিল, কিন্তু সে সম্বন্ধে কেহই অগ্রসর হন নাই। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে প্রথম উল্লাসের মূল মাত্র ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ অবস্থায় কলিকাতায় মুদ্রিত হইয়াছিল। তাহার পর কাশীধামের গোস্বামী দামোদর শাস্ত্রী মহাশয়ের যত্নে সমগ্র গ্রন্থ (প্রথম উল্লাসের স্বয়ং মধুসূদন বিরচিত ব্যাখ্যা সহ) নাগরাক্ষরে মুদ্রিত হয়। ঐ গ্রন্থের সহায়তা গ্রহণ করিয়া মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ মহোদয় এই সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন। গ্রন্থের অর্থ সহজবোধ্য করিবার জন্য পণ্ডিত মহাশয় সরলা নাম্নী একটি স্বকৃত টীকা ও প্রত্যেক শ্লোকের বঙ্গানুবাদ দিয়াছেন। এই অনুবাদ সরল ও মূলানুযায়ী হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে প্রথম উল্লাসের মধুসূদনের নিজকৃত ব্যাখ্যা (ঐ ব্যাখ্যা অনেক স্থলে বেশ দুরূহ এবং উহাতে বহু শাস্ত্র-বচন, বিশেষতঃ ভাগবতের অনেক শ্লোক উদ্ধৃত আছে), ঐ ব্যাখ্যারও বঙ্গানুবাদ দিয়াছেন। সাংখ্যবেদান্ততীর্থ মহাশয় এই সম্পাদন ও অনুবাদ কার্য্যে সিদ্ধহস্ত। তৎসম্পাদিত ও অনূদিত ব্রহ্মসূত্রের শঙ্কর ভাষ্য ও রামানুজ ভাষ্য এবং শঙ্কর ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ সহিত ঈশ-কেনাদি প্রধান প্রধান উপনিষদের বাংলা সংস্করণ সুধী সমাজে বেশ সমাদর লাভ করিয়াছে। এই ভক্তি রসায়নের সম্পাদনেও তাঁহার পটুতা, শ্রমশীলতা এবং শাস্ত্রজ্ঞানের যথেষ্ট নিদর্শন আছে।

এখন মূল গ্রন্থের কথঞ্চিৎ পরিচয় দিই। ভক্তি কি? মধুসূদন বলেন,—

দ্রুতস্য ভগবদ্ধর্ম্মাদ্ ধারাবাহিকতাং গতা।
সর্ব্বেশে মনসো বৃত্তির্ভক্তিরিত্যভিধীয়তে॥ ১।৩

অর্থাৎ দ্রবীভূত চিত্তের সর্ব্বেশ্বর ভগবানে যে অবিচ্ছিন্না গতি, তাহাই ভক্তি। মধুসূদন

বলেন, ভগবদ্‌ভাবে দ্রবীভূত চিত্ত যদি সেই সর্ব্বব্যাপী নিত্য পূর্ণ চিদানন্দ ভগবান্‌কে গ্রহণ করিতে পারে, তবে আর কি অবশিষ্ট থাকে ?

ভগবন্তং বিভুং নিত্যং পূর্ণং বোধসুখাত্মকম্।
যদ্ গৃহ্লাতি দ্রুতং চিত্তং কিমন্যদবশিষ্যতে ॥ ১।২৯

চিত্ত লাক্ষার ন্যায় স্বভাবতঃ কঠিন—'তাপক' বিষয়ের যোগে, তাহার দ্রবত্ব সম্পাদিত হয়—

তাপকৈর্বিষয়ৈর্যোগে দ্রবত্বং প্রতিপদ্যতে।

এই তাপক বিষয় কি কি ? প্রবলভাবে উত্থিত কাম, ক্রোধ, ভয়, স্নেহ, হর্ষ, শোক ও দয়াদি।

কাম ক্রোধ-ভয়-স্নেহ-হর্ষ-শোক-দয়াদয়ঃ।
তাপকাশ্চিত্ত-জতুনস্তচ্ছান্তৌ কঠিনন্তু তৎ ॥ ১।৫

মধুসূদন দ্বিতীয় উল্লাসে এই বিষয়ের বিস্তার করিয়াছেন, কৌতূহলী পাঠক ঐ উল্লাস দৃষ্টি করিবেন। তাঁর কথার সার মর্ম্ম এই যে, চিত্তের সকল প্রকার দ্রবীভাব ভক্তির অনুকূল নহে। তিনি বলেন, প্রথমতঃ জ্ঞান ও বৈরাগ্যদ্বারা চিত্ত সুস্থিত করিতে হইবে। কারণ,—

বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রযোজিতঃ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহৈতুকম্ ॥ ভাগবত, ১।২।৭

ভক্তির অনুকূল চিত্তের যে দ্রবীভাব, তদ্ভিন্ন চিত্তশুদ্ধি হইবে কিরূপে ?

কথং বিনা রোমহর্ষং দ্রবতা চেতসা বিনা।
বিনানন্দাশ্রুকলয়া শুদ্ধ্যেদ্ভক্ত্যা বিনাশয়ঃ ॥ ভাগবত, ১১।১৪।২৩

ঐ দ্রবীভাব নিষ্পন্ন করিবার জন্য বিবিধ উপায় অবলম্বন করিতে হয়।

কাঠিন্যং বিষয়ে কুর্য্যাদ্ দ্রবত্বং ভগবৎপদে।
উপায়ৈঃ শাস্ত্রনির্দ্দিষ্টৈরণুক্ষণমতো বুধাঃ ॥ ১।৩১

এই সকল শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট উপায় কি কি, তাহা মধুসূদন ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের প্রতিধ্বনি করিয়া যথাসম্ভব নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলেন, ভক্তির চরম ভূমিকা প্রেমের পরাকাষ্ঠা—উহা রতির অঙ্কুর হইতে উৎপন্ন হইয়া সমৃদ্ধ ও কাষ্ঠাত্ব প্রাপ্ত হয়।

প্রেমোহথ পরমা কাষ্ঠেত্যুদিতা ভক্তিভূমিকা ॥

তিনি বলেন, তামসী ও রাজসী ভক্তি প্রকৃত ভক্তি নহে, চিত্তে যখন শুদ্ধসত্ত্বের উদ্রেক হয় তখনই চিত্তক্ষেত্রে প্রকৃত ভক্তির উৎস। সনকাদি সিদ্ধ মহাত্মাগণ এবং ব্রজদেবীরা ইহার চরম দৃষ্টান্ত।

মধুসূদনের গ্রন্থের নাম 'ভক্তিরসায়ন'। ভক্তি কি 'রস' ? আলঙ্কারিকেরা বলেন, ভক্তি 'রস' নহে—ভাব মাত্র। তাঁহাদের মতে, মানুষের মন কতকগুলি 'স্থায়ী ভাবে'র আধার। এই স্থায়ীভাব কি কি ?

রতির্হাসশ্চ শোকশ্চ ক্রোধোৎসাহৌ ভয়ং তথা।
জুগুপ্সা বিস্ময়শ্চেতি স্থায়ীভাবাঃক্রমাদ্ অমী ॥

মানবের চিত্তে নিরূঢ় এই সকল স্থায়ী ভাব সাধারণতঃ অব্যক্ত থাকে। কিন্তু যখন

'বিভাব' 'অনুভাব' ও 'সঞ্চারী'-সহকারে উহারা ব্যক্তীভাব লাভ করে, তখনই তাহারা হয় 'রস'।

বিভাবেনানুভাবেন ব্যক্তঃ সঞ্চারিণা তথা।
রসতাম্ এতি রত্যাদিঃ স্থায়ীভাবঃ সচেতসাম্॥

মধুসূদনের এমতে আপত্তি নাই—তিনি বলেন,

স্থায়িভাবগিরাতোঽসৌ বস্ত্বাকারোঽভিধীয়তে।
ব্যক্তশ্চ রসতাম্এতি পরানন্দতয়া পুনঃ॥ ১।৯

তাঁহার মতেও—

বিভাবৈরনুভাবৈশ্চ ব্যভিচারিভিরপ্যুত।
স্থায়ীভাবঃ সুখত্বেন ব্যজ্যমানো রসঃ স্মৃতঃ॥ ৩।২

* * * *

স্থায়িনো রসতাং যান্তি বিভাবাদিসমাশ্রয়াৎ। ২।২৬

আমরা দেখিলাম, স্থায়ীভাব আটটি—রতি, হাস, শোক, ক্রোধ, উৎসাহ, ভয়, জুগুপ্সা এবং বিস্ময়। অতএব, রস আটটিই হওয়া উচিত। কোনও কোনও আলঙ্কারিক তাহাই বলিয়াছেন।

শৃঙ্গারহাস্য করুণ রৌদ্র বীর ভয়ানকাঃ।
বীভৎস্যাদ্ভুত সঞ্জ্ঞৌ চেত্যষ্টৌ নাট্যে রসাঃস্মৃতাঃ॥

কেহ কেহ কায়ক্লেশে এই অষ্টরসের উপর নবম 'শান্ত' রস স্বীকার করিয়াছেন।

শৃঙ্গার বীর বীভৎস্য রৌদ্র হাস্য ভয়ানকাঃ।
করুণাদ্ভুত শান্তাশ্চ নব নাট্যে রসাঃ স্মৃতাঃ॥

মধুসূদন ভক্তি-রসায়নে এই মত খণ্ডন করিয়াছেন। তিনি বলেন, ভক্তি-রস অলঙ্কারোক্ত নব রসের উপরিতন দশম রস।

দশমীম্ এতি রসতাম্ সনকাদে রিবাধিকাম্। ২।৭৪

তিনি বলেন, ভক্তি-রস আলঙ্কারিকের অনুমোদিত নবরসের তুলনায় যেন জোনাকির পাশে সূর্য্য। উহা অখণ্ড ও পরিপূর্ণ—

পরিপূর্ণরসা ক্ষুদ্ররসেভ্যো ভগবদ্রতিঃ।
খদ্যোতেভ্য ইবাদিত্য প্রভেব বলবত্তরা॥ ৩।৭৮

যিনি 'রসোবৈসঃ'—সেই পরমানন্দ-স্বরূপ শ্রীভগবানের প্রতি উদ্রিক্ত চিত্তবৃত্তি যদি রস না হয়, তবে রস আর কি?

ভগবান্ পরমানন্দ স্বরূপঃ স্বয়মেব হি।
মনোগতস্তদাকার রসতা মেতি পুষ্কলম্॥ ১।১০
নিত্যং সুখমভিব্যক্তং রসো বৈ সঃ ইতি শ্রুতেঃ।
প্রতীতিঃ স্বপ্রকাশস্য নির্বিকল্প-সুখাত্মিকা॥ ৩।২২

আলঙ্কারিকেরা বলেন, তাঁহাদের যে কাব্য-রস, তাহা "ব্রহ্মাস্বাদ-সহোদর"—

বেদ্যান্তরস্পর্শ শূন্যোব্রহ্মাস্বাদ-সহোদরঃ

তা' যদি হয়, তবে ভক্তি—যদ্দ্বারা সাক্ষাৎ ব্রহ্মানন্দের আস্বাদন হয়, তাহাই ত মুখ্য রস।

ভক্তি কি? শাণ্ডিল্য বলেন সা পরানুরক্তিঃ ঈশ্বরে। মধুসূদন এই পরানুরক্তিকে 'রতি' নাম দিয়াছেন—

রজস্তমোবিহীনা তু ভগবদ্বিষয়া মতিঃ।
সুখাভিব্যঞ্জকত্বেন রতিরিত্যভিধীয়তে॥ ২।৫৮

নারদ বলিয়াছেন—তদ্-অদর্শনে পরমব্যাকুলতা। মধুসূদনেরও সেই মত। তিনি বলেন—

বিরহাসহিষ্ণুতাত্মা প্রীতিবিশেষো রতির্নাম। ২।৫৯

বস্তুতঃ বিরহ-দুঃখের তীব্রতা-অনুসারেই রতির তারতম্য।

বিরহে যাদৃশং দুঃখং তাদৃশী দৃশ্যতে রতিঃ।
মৃদু-মধ্যাধিমাত্রত্বাদ্ বিশেষোঽত্রাপি বীক্ষ্যতে॥ ২।৬১

এ সম্পর্কে বৈষ্ণবভাবে ভাবিত হইয়া মধুসূদন বলিতেছেন, বৈকুণ্ঠে ঐ রতিভাব মৃদু তীব্র, দ্বারকায় মধ্য তীব্র আর শ্রীবৃন্দাবনে তীব্র তীব্র।

বৈকুণ্ঠে দ্বারকায়াং চ শ্রীমদ্ বৃন্দাবনে তথা।
মৃদুতীব্রা মধ্যতীব্রা তীব্র তীব্রা চ সা ক্রমাৎ॥ ২।৬২

চিত্ত-দ্রুতির কারণ-ভেদে ভক্তির ভিন্নতা—চিত্তদ্রুতেঃ কারণানাং ভেদাদ্ ভক্তিস্তু ভিদ্যতে। বস্তুতঃ ভক্তির রূপ বিবিধ ও বিচিত্র। তন্মধ্যে কিন্তু তিনটিই পুষ্কল—

বিশুদ্ধো বৎসলঃ প্রেয়ানিতি ভক্তিরসাস্ত্রয়ঃ। ২।৩৫

এই তিনটি ভক্তি-রসকে যথাক্রমে বিশুদ্ধ রতি, বৎসল রতি ও প্রেয়ঃরতি বলা হয়। বিশুদ্ধ রতি বৈষ্ণবদিগের 'শান্ত' ভক্তি। বৎসল রতি ও প্রেয়ঃ রতি ভক্তির দুইটি কমনীয় রূপ—স্নেহ ও কাম। স্নেহ ত্রিবিধ—সেব্য-সেবক ভাব (বৈষ্ণবেরা যাহাকে দাস্য বলেন), পাল্য-পালকভাব (ইহাই বৈষ্ণবদিগের বাৎসল্য), এবং সখা-সখী ভাব (বৈষ্ণবেরা যাহাকে সখ্য বলেন)।

স্নেহ পুত্রাদি বিষয়ঃ পাল্য-পালকলক্ষণঃ।
সেব্য-সেবক ভাবোঽন্যঃ, সোঽপ্যুক্তস্ত্রিবিধো বুধৈঃ॥ ১।৯
ভগবদ্দাস্য-সখ্যাভ্যাং মিশ্রিতং চাপরং জগুঃ॥ ২।১০

কাম-রতিই বৈষ্ণবদিগের মধুর ভাব। কাম শরীর সম্বন্ধ বিশেষে স্পৃহয়ালুতা। উহা সম্ভোগ ও বিপ্রয়োগ ভেদে দ্বিবিধ। ইহারাই যথাক্রমে বৈষ্ণবদিগের মিলন ও বিরহ (পূর্ব্বরাগ, মান, মাথুর ইত্যাদি)। এই মধুর রসে শান্ত, দাস্য, বাৎসল্য ও সখ্য —এই রতি-চতুষ্টয়ের অন্তর্ভাব। মধুসূদন বলেন যে, ব্রজগোপীতে এই সকল প্রকার রতিই দৃষ্ট হয়।

ব্রজদেবীষু চ স্পষ্টং দৃষ্টং রতিচতুষ্টয়ম্। ২।৭২

এই মধুর রসই 'পরম রস'। ইহা অতুল্য।

একদা যদ্যপি ব্যক্তমিদং রতিচতুষ্টয়ম্।
তদা তু পানকরস-ন্যায়েন পরমো রসঃ॥ ২।৭০

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

দিল্‌রুবা (কাব্যগ্রন্থ)—আবদুল কাদির প্রণীত। (পি, সি, সরকার এণ্ড কোং)

'দিল্‌রুবা'-খানি আর একবার পড়ে শেষ করলাম। প্রায় সবগুলো কবিতাই তো পরিচিত; তবু একটু খুঁটিয়ে পড়েছি। "চলিতেছি তোমার আদেশে" সব চাইতে ভালো লেগেছে। এ থেকে শেষ পর্য্যন্ত কবিতাগুলোই এই বইয়ের ভালো কবিতা। আগের দিকের কয়েকটি কবিতা বাদ দেওয়া উচিত ছিল, যেমন, আজাদ, মোয়াজ্জিন, জয়যাত্রা। এর একটি হলেই ভালো হতো, তা হলে প্রগতি সম্বন্ধে কবির বক্তব্য যেন দল মেলবার অবসর পেতো। এক সঙ্গে ক'টি হওয়ায় যেন ঠাসাঠাসি হয়েছে।

বন্দী, বিচিত্রা, প্রভৃতি ভালো কবিতাগুলো এর আগে দেখেছি ব'লে মনে হয় না। ভাষা এই শেষের দিকের কবিতাগুলোর বেশ মার্জ্জিত হয়েছে। "বিচিত্রা"-র দুটি লাইন ভারী সুন্দর হয়েছে—

> সে রূপদুলালী কভু দিবসের বিলাস-পাণ্ডুর
> দূর অস্তপারে
> দেহ-সন্ধ্যাগ্নিরে তার লুকাইত বিরহ-বিধুর
> রাত্রির অঙ্গারে।

মাঝে মাঝে তাঁর দুই একটি লাইনে ভারি খুসী হয়েছি—

> 'মেঘের অঙ্গনে বিজলী-বালিকা বাঁকা তলোয়ার খেলে।'

বিশেষ করে পরের লাইনটি—

> 'তিমির-ময়ূর মন-সুখে তার তারার পেখম মেলে।'

এ লাইনটি বেঁচে থাকবে। 'শ্রাবণ-শর্ব্বরী'-র প্রথম দু'টি স্তবকও বেশ জমেছে। কিন্তু শেষের স্তবকটি তেমন ভালো হয় নাই।

চিন্তার দিক দিয়ে "ফাতেহা-ই-দোয়াজদহম্" কবিতাটি বেশ পূর্ণাঙ্গ, তবু "আমীর প্রয়াণ" কবিতাটিই এই ধরণের কবিতার মধ্যে শ্রেষ্ঠ মর্য্যাদা পাবার যোগ্য—ওখানে প্রকাশ একই সঙ্গে আবেগময় ও সহজ হয়েছে।

'আবির্ভাব' ও 'তিরোধান' কবিতাটি বেশ কাটছাঁট করে ছাপানো উচিত ছিল। এর কতকগুলো লাইন বেশ হয়েছে। বিশেষ করে তিরোধানের আড়াই স্তবক। তার পরে রূপ ও রচনা দুয়েরই গড়ন ঢিলা হয়ে পড়েছে। কবিতা যদি চোখা তীরের মতো না হয় তবে কিছুই হয়না।

দিল্‌রুবার কবিকে দেখা যাচ্ছে শিল্পিরূপে; সে-শিল্পও কবিতার সমগ্রতায় তেমন নয়—স্তবকে অথবা ছত্রে। এখানে যে-মন প্রকাশ পেয়েছে সে-মনে অবসর যেন বেশ কম। এ-বাণীর জন্ম প্রধানতঃ মস্তিষ্কে। কিন্তু অবসর পর্য্যাপ্ত না হলে সে-মস্তিষ্কও নিজের পরিপূর্ণ রূপ প্রকাশ করতে অপারগ হবে। শেষের যে-কবিতাগুলো ভালো বলেছি তারও মূলে idea প্রবল, তবে ভাষা যেমন সুন্দর হয়ে এসেছে তাতে মনে হয় প্রয়োজনীয় অবসরের দিকেই কবির মন চলেছে।

এই বইখানিতে তো কবিকে শিল্পী বলেই চেনা যাচ্ছে; সেই শিল্পীই প্রবল হয়ে থাকবে, না যে একটি সবল কিন্তু অন্যমনস্ক অথবা বিব্রত চেতনা এই শিল্পীর অন্তরে রয়েছে সে কোনদিন পরিপূর্ণ আনন্দে জেগে উঠবে—কিছুই বলতে পারা যাচ্ছে না।

অনেকগুলো ঘটনার উপরে সব কিছু নির্ভর করছে। তা ভবিষ্যৎ নিয়ে অত মাথা ঘামিয়ে দরকার কি ? যা হওয়া যায় তাইই ভালো।

এই কবির ভিতরে একটি সহজ প্রকৃতি-প্রেম আছে, আর একদিকে তিনি চিন্তাশীল ও সংস্কারক। এই দুইয়ের কোন্‌টি যে তাঁর কবিতায় শেষ পর্য্যন্ত প্রবলতর হবে তা এখনো ভালো বুঝা যাচ্ছে না। আমার মনে হয়, এ দুয়ের পরিপূর্ণ মিশ্রণই তাঁর প্রতিভাকে যোগ্য মর্য্যাদা দিতে পারবে।

তাঁর রচনার শক্তি সহজেই প্রকাশ পেয়েছে, কিন্তু শালীনতার প্রকাশ তেমন সহজ হয় নাই। তার কারণ বোধ হয় এই যে, তিনি রচনায় যত্নপরায়ণ হলেও যথেষ্ট যত্নপরায়ণ নন, আর একটি কারণ তাঁর ভিতরকার কেমন একটি অবসাদ। মনে হয় মনটি তাঁর নিটোল নয়, বেশ একটু থেঁৎলানো। বোধহয় বহুদিন থেকেই নানা বিরুদ্ধতার ভিতর দিয়ে তাঁকে যেতে হচ্ছে, এইজন্যই এমন ঘটেছে।

কিন্তু কারণ যাইই হোক্ এ অসচ্ছন্দতা দূর করা তো চাইই। পরিপূর্ণ যৌবন দীপের মতো যদি কাব্য-দেউলে না জ্বলে তবে সে মন্দিরের পূর্ণ সৌন্দর্য্য কোন দিনই প্রকাশ পাবে না। এই যৌবন বিকাশের উপায় হচ্ছে পরিপূর্ণ আত্মবিসর্জ্জন। আজকালকার অনেক চিন্তাশীল এই প্রাচীন কথাটা মানতে পুরোপুরি রাজি নন, কিন্তু আমার বিশ্বাস সে তাঁদের ভুল। আবদুল কাদির আত্মবিসর্জ্জনের স্বাদ কিছু পেয়েছেন —আরো আত্মবিসর্জ্জন চাই। অবশ্য এই আত্মবিসর্জ্জন তাঁর জন্য কোন্ রূপে সত্য হবে সে কথা বলবার ক্ষমতা আমার নাই।

তাঁর আজকালকার কবিতা আরো ভালো। অনুভূতি সূক্ষ্মতর হচ্ছে। কিন্তু মনে হয়, কোনো একটি বড় বিষয় নিয়ে কাব্য রচনায় হাত দিলেই ভালো করবেন। জসীমউদ্দীনের যেটুকু নাম হয়েছে তার প্রধান কারণ এইই। জসীমের চাইতে প্রেম ও ঐকান্তিকতা (আত্মবিসর্জ্জন) এখনো আবদুল কাদিরের ভিতরে কম, কিন্তু সত্যকার সম্বল জসীমের চাইতে তাঁর বেশী।

কাজী আবদুল ওদুদ

Towards Standards of Criticism—By F. R. Leavis —(Whishart).

A B C of Reading—By Ezra Pound—(Routledge).

Active Anthology—By Ezra Pound.—(Faber & Faber).

Soviet Literature—By George Reavey and Marc Slonim —(Wishart).

এই প্রবন্ধ ও রিভিউগুলি Calendar of Modern Letters 1925-27 থেকে পুনর্মুদ্রিত, এবং এগুলিকে লীভিস্ প্রামাণ্য মনে করেন। এই বিশ্বাসের পিছনে যে যুক্তি আছে, তার বিচারে আমি অক্ষম। তিনি বলেছেন যে ক্যালেণ্ডার তাঁকে ক্লাসের কাজে সাহায্য করেছে। আমাদের বিদ্যালয়ের ছাত্র ও

অধিকাংশ অধ্যাপকদের নিয়ে যদি লীভিস্ শিক্ষাকাজ করে'ও একথা বল্‌তে পারতেন তো নিশ্চিন্ত হতুম। কারণ পারিপার্শ্বিক যখন বিরুদ্ধ, তখন সাহিত্যরুচি শিক্ষায় গঠিত করা সম্ভব কিনা সন্দেহ। লীভিস্ ও তাঁর কয়েকজন শিক্ষক বন্ধু বিশ্বাস করেন যে এই বর্ত্তমান গণসভ্যতার দিনে কারবারী মুদ্রাযান্ত্রিক সিনেমার আবহাওয়ায় রুচিকে শিক্ষাদান অথবা বাইরে থেকে শুধু মানসিক একটা অংশকে বিকশিত করা (বা জন্মদান করা?) প্রয়োজন ও সম্ভব। তাই তাঁরা বুদ্ধিমান পাঠক ও শিক্ষকের মুখ চেয়ে বই লেখেন ও যথেষ্ট আত্মত্যাগ করে' শিক্ষাদান করেন। এ পরিশ্রমের ফলে যদি অবশ্য কারো ব্রাউনিংকে ঘনিষ্ঠ মনে না হয় বা গসের ও ষ্টপ্‌ফর্ড্ ব্রুকের সঙ্গে এলিয়টের নামোচ্চারণ করতে বাধে, তা হলেও লীভিস্ ধন্যবাদার্হ।

কিন্তু এইজন্যেই হয়তো এই সব অনাচার রাজ্যের কাল্‌চার-মুস্কিলআসান্‌দের মধ্যে একটা প্রচারক মনোবৃত্তি পাওয়া যায়। সেটা যে ভ্রান্ত, তা নয়। তবে সেটা মুষ্টি তুলে'ই আছে। পাঠকের নির্ব্বুদ্ধিতা তো তার দৃষ্টি এড়ায়ই না, সাহিত্যিকদের পদস্খলনেও তার ভ্রূকুটি। আর্নল্ড্ বেনেটের সমালোচনার লীলা, হপ্‌কিন্‌স্ সম্বন্ধে ব্রিজেসের হঠোক্তি, চার্লস্ মর্গ্যান্ বা মিস্ সিটোএল্‌কে অকারণ প্রশংসায় তাই লীভিস্ না হেসে মহৎ বিরক্তিতে উত্তেজিত হয়ে' পড়েন।

নিঃসন্দেহ, ক্যালেণ্ডারের খরদৃষ্টি লেখকদের প্রতি তাই তার এত সমবেদনা। নাহলে' তিনি এই উপাদেয় সমালোচনা সংগ্রহে সমালোচনার মানদণ্ড খুঁজে পেতেন না। বাস্তবিক মানদণ্ড এ বইয়ের আটজন লেখক একবারও পকেট থেকে বার করেন নি। তাঁরা এই নিয়মাবলীর গোপনতা বা অস্পষ্টতার বিষয়ে ক্রাইটেরিয়ন্ সম্বন্ধে আপত্তি জানিয়েছেন ও সমালোচনায় রিচার্ডস্ যে বৈজ্ঞানিক মনোভাবের দাবি করেন, তার অসারতা দেখিয়েছেন। কিন্তু নিজেদের বেলায় বলেছেন যে তাঁদের বিচারের মাপকাঠি প্রসঙ্গত রচনাবলীতে প্রকাশ হবে। এটা অবশ্য বিনয়েরই কথা। কিন্তু হোম্‌স্-এর মতে অসংখ্য গুণ থাকা সত্ত্বেও talent নামক প্রবৃত্তিজাত প্রাথমিক মূল্যজ্ঞানের অভাবে রীড্ যখন স্রষ্টা হিসেবে অতখানি ব্যর্থ, তখন বিচারের মানদণ্ডকে প্রচ্ছন্ন না রাখাই কর্ত্তব্য। আর একটা কথা—মূল্যজ্ঞান কি সত্যই প্রশ্নাতীত? এবং যদি তা সহজ জ্ঞানই তো লোকশিক্ষা কল্পে এত পরিশ্রমই বা কেন? আর ঐ talent—মনোবিজ্ঞানে talent বলে' কোনো বিশেষ মানসিক ভাগও নেই। এক কথায় বল্‌লেই হতো যে রীডকে আমার ভালো লাগে না; সুতরাং রীডের শক্তি নেই। কিন্তু লীভিস্ বলেছেন যে এ সমালোচনাগুলি merely immobilised preference নয়। না হয় জঙ্গমই হলো, কিন্তু মনোবিজ্ঞান এখনও শৈশবে এবং তার স্বল্প ও বর্দ্ধমান জ্ঞান এখনও প্রায় সাহিত্যব্যাপারে ব্যবহৃত হয় নি। কথার অর্থপ্রসার ও অস্থিরতা আজো রহস্যই। গায়ের জোর ছাড়া নিজের মতামতকে সংখ্যবিজ্ঞানে বা পরীক্ষাগারে না চালিয়ে, সত্য বলে কিছুতেই চালানো যায় না। এম্‌প্‌সনের মতো বিশ্লেষণপূর্ণ সমালোচনা করলেও বা না হয় কথা ছিলো। তবু প্রবন্ধগুলির মতামতে মোটের উপরে সায় দিতে হয়।

সাহিত্যপাঠকের দুর্গতি নিবারণ-কল্পে শুধু যে ক্যালেণ্ডার ও স্ক্রুটিনিই উদ্যমশীল তা' নয়। এজ্‌রা পাউন্‌ড্‌ও। এবং পাউন্‌ড্ জীবিত তিনজন ইংরেজি কবিদের একজন ও দুর্দ্দান্ত পণ্ডিত। এবং তিনি সবুজ বিলিয়ার্ড কাপড়ের ইজের

পরেন, তাঁর কোট লাল, শার্ট নীল, টাই জাপানী বন্ধুর হাতে আঁকা, তাঁর এক কানে একটা নীল ইয়ারিং ও লাল ছুঁচলো দাড়ি এবং টাইম্‌সের এক লেখককে মিলটন্‌ সম্বন্ধে উচ্ছ্বাস করায় তিনি ডুয়েলে ডেকে ছিলেন। কিন্তু তাঁর How to Readএ 'টিকে দেওয়া' অধ্যায়ে তিনি যা বলেছেন তা তাঁর প্রতিও আরোপ্য। I suggest that we throw out all critics who use vague general terms. Not merely those who use vague terms because they are too ignorant to have a meaning; not merely the blah or the Murr-ys and ays, Middleton and Gilbert, and the forty habitual writers around and about ইত্যাদি। কারণ তিনি নিজে প্রায়ই শুধু চীৎকার করেন, স্পষ্টতার জন্যে নয়, লোক জড়ো করতে। বার্নার্ড শ আয়ার্ল্যাণ্ড্‌ থেকে এসে নিজের জায়গা করেন, পাউন্‌ড্‌কে করতে হয়েছে মিড্‌ল্‌ ওয়েষ্ট্‌ থেকে। দান্তের সঠিক স্পষ্টতা A B C of Readingএ তিনি একাধিকবার প্রশংসা করেছেন। কিন্তু হায়! ছন্দের বর্ণনা a form cut into Time এবং শেষের অধ্যায় Treatise on Metreএর সব চেয়ে স্পষ্ট কথা ও সার মর্ম্ম হলো—ভাষার কয়েকটা articulate sounds আছে, আর আছে সিলেবল্‌স। These syllables have differing weights and durations। অথবা A classic is a classic not because it conforms to certain structural rules or fits certain definitions। সাহিত্য হচ্ছে language charged with meaning to the utmost possible degree। এ মাত্রার মাপ অবশ্য পাউন্‌ডের মনে এবং কথঞ্চিৎ এ বইয়ে। তারপর ভাষা—ভাষার সৃষ্টি ও ব্যবহার for communication। মিষ্টার্‌ পাউন্‌ডের মন এ বিষয়ে সরল। রিচার্ড্‌সের Practical Criticism বোধহয় তিনি পড়েন নি। রিচার্ড্‌স্‌ তাঁর বিশেষ প্রশংসা করেন নি তো কোথাও। কিন্তু ভাষার আপেক্ষিকতা ও পাঠকে পাঠকে শারীরিক মানসিক প্রভেদ পাউন্‌ডের চিকিৎসা-পুস্তকে না থাক্‌লেও তা বাদ দেওয়া যায় না। বইটিতে গভীরতা বা যুক্তিযুক্ততার নামগন্ধ নেই—উপকৃত হওয়া যেতো এই অসামান্য কবি যদি দান্তের De Vulgari Eloquentiaর দ্বিতীয় ভাগের মতো নিজের technical মতামত সোজাসুজি লিখে যেতেন, যেতে পারতেন। তার বদলে পেলুম খুব জানা কথার বিস্মিত আবিষ্কার এবং ঠিক কথার বাঁকা চেহারা। আর পেলুম সিলেবাস্‌—হোমার, সাফো, ওভিড্‌, কাটুল্লুস, প্রোপার্টিউস্‌, ট্রুবাডুর, বায়োন্‌, মিন্‌এ সিঙ্গার, ভঁাদালের দেড়খানা বই, কন্‌ফিউসিউস্‌ ইত্যাদি। পাউন্‌ডের How to Readএর উত্তরে লীভিস How to Teach Reading: A Primer for Ezra Pound পুস্তিকায় এ বিষয়ে যথেষ্ট ব্যঙ্গ করেছেন। যে সব ভাষা পাউণ্ড্‌ ভালো বা সামান্য জানেন, মোটামুটি সেই সব ভাষাতেই শুধু নিছক সাহিত্যের শুদ্ধ ও আদি মূর্ত্তি প্রাপ্তব্য। এবং পাউণ্ড যে সাহিত্যিকদের ছয় ভাগে ভাগ করেছেন এবং কবিতাকে তিনভাগে Melopeia, phanopeia, logopeia সেও কি ভ্রান্ত বা অর্থহীন নয়? প্রথমত, পাউণ্ড্‌ ভুলে গেছেন যে ভালো কবিতায় ঐ তিন গুণ বিচ্ছিন্ন থাকে না। দ্বিতীয়ত সঙ্গীতগুণ বা melopeia কবিতায় স্বতন্ত্র নয়, কারণ কবিতার কথায় সুর জড়িত থাকলেও অর্থও থাকে। তৃতীয়ত phonopeia বা চিত্রগুণ বল্‌তে পাউণ্ড্‌ সরলভাবে শুধু visual images বোঝেন, অথচ imagery

আমাদের মনে বহুস্মায়ুজড়িত বিচিত্র হ'য়ে ওঠে, বিশেষ ভালো কবিতার সঙ্গে দেখা হ'লে।

তারপরে ধরা যাক পাউণ্ডের আশ্বাস বাক্য, যার জোরে তাঁর সম্বন্ধে প্রগল্‌ভ আচরণ সম্ভব। পাউণ্ড বলেছেন যে তাঁর সিলেবাস্ অনুসারে পড়বার জন্যে বহু ভাষা মোটেই ভালো করে' শেখবার দরকার তো নেইই; অনুবাদেও চলবে,—কারণ মিষ্টার পাউণ্ডই কি এর অনেক কিছু অনুবাদ করেন নি? অথচ melopeia ও logopeia যে কি ক'রে অনুবাদ্য তা মিষ্টার পাউণ্ডও বল্‌তে পারেন না। তবে এই আশ্বাসবাক্যের জোরে বল্‌তে পারা যায় যে যাঁদের পাউণ্ড পাঠিতব্য বলে' ধরেছেন, তাঁরা সকলেই পাঠিতব্য এবং তাঁরা যে কোনো না কোনো নতুন চালে কবিতা লিখেছেন সে কথা বিদেশী অজ্ঞেরও মনে হয়। কিন্তু তাই বলে শেক্‌স্‌পিয়র্ বাদ? এবং ডন্‌কি ড্রামণ্ড্ বা হেরিক্, ওয়াট্ বা ব্রাউনের পর্য্যায়ে? এবং গতিয়ে গ্রাহ্য অথচ বদ্‌লেয়র অপাংক্তেয়? অবশ্য যখন শুধু অধ্যাপকেরা নয়, সাহিত্যিকরাও কোনো কবিকে নিয়ে হৈচৈ করেন, তখন পাউণ্ডের মতো ব্যক্তির স্বকীয়তায় ঘা লাগা স্বাভাবিক। কিন্তু পাউণ্ডের রুচির বৈচিত্র্য আরো গভীর কারণে। পাউণ্ডের সমস্ত রচনা পড়লে বোঝা যায় যে তিনি aesthetеদের শেষ বংশধর এবং টেক্‌নিক্ বল্‌তে তিনি অভিজ্ঞতায় সম্পূর্ণ ও সজীব টেক্‌নিক্ বোঝেন না। বোঝা যায় যে তিনি মানসজীবন থেকে ছিন্ন pure artএর টেক্‌নিকে আস্থাবান। তাঁর Cantos সেইজন্যেই আশ্চর্য্য কবিতার অসম্বন্ধ প্রলাপ। তাঁর ঐতিহ্য তাই এলিয়টের ঐতিহ্য তো নয়ই, ক্যালেণ্ডারের অপেক্ষাকৃত ব্যাপক ভাসা ভাসা ঐতিহ্যও নয়। পাউণ্ডের সম্বন্ধে সব চেয়ে বড়ো আপত্তি এইখানে। অবশ্য তাঁর সার্কাস প্রবৃত্তিও মজার। যথা, তাঁর রাস্কিনের মতো শব্দতাত্ত্বিক গবেষণা ও আবিষ্কার—Kinoর সঙ্গে criticএর যোগ বা জার্মান্ dichtung = কবিতা ও dichten = condensare এই থেকে প্রতিপাদন করা যে কবিতা হচ্ছে ঘনীভূত ভাষা। মিষ্টার্ পাউণ্ড্ নিজে গাঢ়বদ্ধ রীতির কবি, ব্যক্তিগত ভাবে হয়তো আমিও এই রীতির কবিতা ভালোবাসি; কিন্তু এই নিদারুণ বৈজ্ঞানিক পাণ্ডিত্য! এবং এই পাণ্ডিত্যের জন্যেই হয়তো পাউণ্ড্ How to Readএ যে-চসারকে le Grand Translateur বলে' বাতিল করেন, সেই চসারকেই এবার বহু পৃষ্ঠায় শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। কিন্তু চসার শেক্‌স্‌পিয়রের চেয়ে ঢের বড়ো কেন? না, চসার্ কোর্টে ও ব্যবসায়ী জগতে মিশেছেন এবং was a man with whom we could have discussed Fabre and Fraser। চসার দান্তের চেয়ে বড়ো কারণ he was more compendious than Dante। পাউণ্ডের সমালোচনার চশমা অবিশ্রাম বদ্‌লায়। মাঝে হতে গলভিন্ ডগলাস্ এবং ব্রাউনিং অহৈতুক মর্য্যাদা পেয়ে যান। এবং শুনতে হয় নাট্যকাব্য মাত্রেই নাকি গীতি বা বর্ণনা বা গল্পকাব্যের চেয়ে নিকৃষ্ট। অবশ্য কবিতা সম্বন্ধে ও অনেক কবি সম্বন্ধে —যথা প্রভাঁসাল্ ও চসার্ সম্বন্ধে পাউণ্ড বহু সারগর্ভ কথাই বলেছেন। কবিতার সঙ্গে গানের যোগের প্রয়োজনীয়তা-বিষয়েও তিনি বারম্বার বাক্যনিক্ষেপ করেছেন। ইয়েট্‌স্ আধুনিক কালে পাউণ্ডের আগেই একথা বলেছেন ও কবিতায় তা প্রমাণ করেছেন। কিন্তু তাই বলে যে সিলেবাস্ অতি সংক্ষিপ্ত, তাতে রুচেষ্টার্ ও ওয়ালারকে অনুপ্রবিষ্ট করা কি একটু ভারসাম্যের অভাব নয় এবং যদিচ পাউণ্ডের কবিত্বশক্তি অসামান্য,

পাণ্ডিত্য সর্ব্বভুক্ এবং কান আশ্চর্য্য সুকুমার, তবু এ কথাকে ব্যক্তিগত রুচি ছাড়া আর কি বলা যাবে—"There are three kinds of melopeia, that is, verse made to sing, to chant or intone; and to speak." "The older one gets the more one believes in the first".—অর্থাৎ গীতবিতানের যে কোনো গান রবীন্দ্রনাথের যে কোনো কবিতার চেয়ে ভালো। প্রসঙ্গত মনে হচ্ছে পাউণ্ড বাংলা জান্‌লে একই ভাষায় ও একই কবির লেখায় তাঁর বর্ণিত সব রকম কবিতা পেতেন ও তাঁর সিলেবাস্ মতে লেখাপড়া শেখাও সহজ হতো।

ইতিমধ্যে এ বর্ণপরিচয় উপভোগ্য। এবং প্রায়ই গ্রহণীয় কথাও বেরিয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু পাউণ্ডের আত্মবঞ্চনা হাস্যকর। যেহেতু তিনি রেমি দ গুরমঁর শরীরতত্ত্ববিষয়ক একটি সৌখীন বই অনুবাদ করেছেন এবং যেহেতু ফেনোলোসার চীনভাষাসম্বন্ধীয় প্রবন্ধটি তাঁর কাছে ছিলো, তাই তাঁর ধারণা তিনিও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি আয়ত্ত করেছেন। মাছের বর্ণনার গল্প সত্ত্বেও কিন্তু তিনি নিতান্তই ব্যক্তিগত সমালোচনাই করেন। মনের ভুলে অন্যত্র তিনি সে কথা জাহিরও করেছেন সগর্ব্বে।

বলাবাহুল্য, বর্ত্তমান সমাজরাষ্ট্রে সাহিত্যের স্থানাভাব ও গণসভ্যতার মধ্যে অভিজাতবাদের অসুবিধাই হচ্ছে এ বইয়েরও উৎস। যে ব্যবস্থায় এ অবস্থা সম্ভব সে বিষয়ে পাউণ্ড নিরুৎসুক এবং হাইব্রাউরা অবশ্য বিশ্বাস করেন যে লেখক পাঠকের জন্যে নয়, পাঠকই লেখকের জন্যে। পাউণ্ডের চিকিৎসা তাই তাঁর প্রিয় কবিদের পাঠ্য করেই শেষ। এই একাগ্রতা ও সারল্য তাঁর Active Anthologyতেও দ্রষ্টব্য। সংক্ষেপে বল্‌তে গেলে বর্ণপরিচয়ে তিনি মৃত প্রিয় কবিদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন আর চয়নিকায় জীবিত বন্ধুবান্ধবদের প্রতি। কবিতাগুলি ও দীর্ঘ ভূমিকাটি পড়লে চোখে পড়বে পাউণ্ডের টেক্‌নিক্ সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত শুদ্ধবাদ—যে শুদ্ধবাদে সেকালে লোকে নিউম্যান্‌কে ছেড়ে পেটারের রীতি নিয়ে হৈ চৈ করতো। এই শুদ্ধবাদেই কবিতার সোজাসুজি melopeia, phanopeia, logopeia, ভাগ সম্ভব। তারপরে মনে হয় যে পাউণ্ড ভুলে' গেছেন dichten—condensare হলেও গাঢ়বদ্ধ ভাষা হলেই একটি কবিতা হয় না। তাছাড়া, তিনি নিজে তাঁর বন্ধু অনুচরদের মনের শুভবুদ্ধিকে, কবিতায় তার অস্তিত্ব না থাকলেও, বিচারকালে স্বপক্ষে ধরেন ও আমাদের কবিতাগুলি উপহার দেন। অন্য সমালোচক, ধরা যাক্ মারি, যখন কীট্‌সের পত্রস্থ ইচ্ছা ও আদর্শকে কবিতায় কৃতকার্য্য বলে' ভেবে মোটা মোটা বই লেখেন, তখন পাউণ্ড্ হয়তো তাকে blah বলে' উড়িয়ে' দেন।

অবশ্য তাঁর দুর্ব্বলতার অন্য কারণও থাক্‌তে পারে—উইলিয়াম্‌স্ কি তাঁর বহুকালের বন্ধু নন এবং জুকোফ্‌স্কি বা বান্টিং বা আরাগন্ কি তাঁর পরম ভক্ত নন? আশ্চার্য্য লাগ্‌লো শুধু একটি কবির অভ্যর্থনায়—এলিয়টের; কারণ, শুধু যে তাঁর কবিতাটি কবিতা, তা নয়, তাঁর ইচ্ছা ও আদর্শও—বাকি কবিদের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তাঁর কবিতার ভাব, বিষয় ও টেক্‌নিক্ একজ, অভিজ্ঞতা, বুদ্ধি ও শিল্প মিলে' সজীব।

পাউণ্ডের মূল্যজ্ঞান যেমন চৈনিক ideographic অক্ষরের অভাব দুরার্থে কামিংস্ প্রমুখ কবিদের মুদ্রাঙ্কনকে সাহায্য করে, তেমনি পাছে তাঁকে কেউ জীবন-পলাতক রোমান্টিক ইস্থেট্ ভাবে সেই ভয়ওআত্মপ্রকাশ করে। নচেৎ আরাগন্-

এর The Red Front কবিতা চয়ন করা হলো কেন? এর বিরক্তিকর কপটতা ও ব্যর্থতা স্পষ্ট হবে যদি Soviet Literature-এর কোনো কবিতার, যথা ফিউচারিষ্ট্ মায়াকফ্স্কির কবিতার সঙ্গে পড়া যায়। রীতিমতো কবিতা ছাড়াও মায়াকফ্স্কির একটি agitverse কবিতার অনুবাদ এ বইটিতে রয়েছে—

> সাম্রাজ্যবাদের কন্যা রণচণ্ডী
> প্রেতচ্ছায়ার মতো ঘোরে
> পৃথিবীর অলিতে গলিতে।
> কর্ম্মীরা তোলো অট্টরব—চীন থেকে তোলো মুঠি। ইত্যাদি।

এ কবিতা বোঝা যায়, এর উদ্দেশ্যও বোঝা যায়। মায়াকফ্স্কি বিশেষ কুশলী কবি, সেটা অবশ্য অনুবাদে মেনে নিতে হলো। কিন্তু এর উপরে তো লেখাই agitverse।

আশ্চার্য্য লাগে এই অপেক্ষাকৃত স্বাচ্ছন্দ্য ও স্পষ্টতাই। সিম্বলিষ্ট, ফর্ম্যালিষ্ট, সেরাপিয়ন্ ব্রাদারস্ তাঁদের ম্যানিফেষ্টো বার করেন, টেক্নিকল দুঃসাহসেরও অভাব নেই—যদিচ রীতিচাতুর্য্য এ অনুবাদে খোঁজা অন্যায়। অথচ ব্লক্ জনপ্রিয়, বেলি ও বাবেল, বা পিল্নিয়াক্ বা পাষ্টেরনাক্‌কেও সবাই চেনে। এবং রাষ্ট্র সাহিত্যিকদের সহায়তা দেয় ও নেয়। লেখকে পাঠকে ও পাঠকে পাঠকে প্রভেদ, হাইব্রাউ কবি ও সাধারণের যোগ বিয়োগ ইত্যাদি সমস্যার জ্বালা তাই এ চয়নিকার সমালোচনা ভাগে দুর্ল ভ। অরণ্যরোদন ছেড়ে তাই এঁরা করেছেন যূথবদ্ধ নির্দ্দেশ ও আলোচনা। এবং সে নির্দ্দেশ স্থবির নয়। ১৯১৮ সালের সেপ্টেম্বরের সভামতের পরিবর্ত্তন দেখা যায় ১৯৩২এর এপ্রিলে—পঞ্চবার্ষিকী সঙ্কল্পের শেষে যখন কর্ত্তারা সাহিত্যিক জঙ্গীলাট র‍্যাপ্‌কে ভেঙে দিলেন।

এ বইটিতে সমালোচনা অবশ্য কমই তুলনায়। গল্পোপন্যাস ও কবিতাই প্রায় চারশো পৃষ্ঠা। কিন্তু এ রচনাগুলিও সমালোচনার কাজ করে সাহিত্য ও জীবন সম্পর্কে প্রশ্ন তুলে', আর যদিচ এগুলি অনুবাদ—এক পিল্নিয়াকের একটি রচনার অনুবাদ ছাড়া সবই একটি লোকের দ্রুত অনুবাদ—তবু টিপ্পনীর সাহায্যে সাহিত্যিক-রীতি-ঘটিত প্রশ্নও আন্দোলিত করে। প্রশ্ন তার বাইরেও চলে' যায় অবশ্য—সামাজিক পরিবর্ত্তনের আমূলতা, যূথশক্তি-ব্যবহারের ভাবী শুভাশুভ, এমন কি এই নবব্যবস্থায় মানবস্বভাব-বিরুদ্ধতার আশঙ্কা, কার্য্যক্ষেত্রে তাতে অবশ্যম্ভাবী ব্যাবহারিক ফাঁকি এবং হয়তো তার নশ্বরতাও।

কয়েকজন উৎকৃষ্ট লেখক, যথা গোর্কি, ভেসেলি, টলষ্টয় এ বইয়ে নেই এবং সম্ভবত দু এক জায়গায় ঐতিহাসিক ভুলও টিপ্পনীগুলিতে আছে।

বিষ্ণু দে
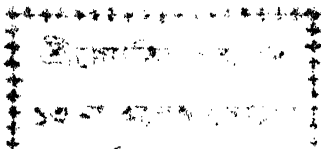
Beauty and Other Forms of Value—By S. Alexander. (MACMILLAN & CO.)

অধ্যাপক এলেক্‌জ্যাণ্ডর্‌-এর নূতন বইখানির সমালোচনা আমার অসাধ্য; এমন-কি তাঁর বক্তব্য ঠিকমতো বুঝেছি, তাও হয়তো বলতে পারি না। আমি দার্শনিক নই; এবং মনস্তত্ত্ব-সম্বন্ধে আমার ধারণা অত্যন্ত প্রাথমিক। অথচ এই দুটো বিদ্যায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন না-হলে, মূল্যবিচার তো দূরের কথা, কেবল কলাশাস্ত্রের আলোচনাও অনধিকার চর্চ্চা। তাছাড়া এলেকজ্যাণ্ডর্‌-এর রচনারীতিতে প্রসাদ-গুণের অভাব আছে; সহজ বিষয়কে শক্ত ক'রে বলতে তিনি যতখানি পটু, শক্ত বিষয়কে সহজ ভাবে বোঝাতে তেমন পারদর্শী নন। আমি অবশ্য ক্রোচে-র মতকে প্রামাণ্য ব'লে ভাবি না, তাই আমি মানতে পারি যে চিন্তা স্পষ্ট ও পরিণত হলেও, তার অভিব্যক্তিতে অনেক সময়েই অপরিচ্ছন্নতা ঘটে। তবু জটিলতা যে তত্ত্বরচনার অপরিহার্য্য লক্ষণ, তা আমি বিশ্বাস করি না। ব্র্যাড্‌লি, জেম্‌স্‌, বের্গ্‌সঁ, রাসেল্‌ ইত্যাদির লিপিস্বাচ্ছন্দ্য যদিই বা নিয়মাতিরিক্ত হয়, তাহলেও আজকালকার দর্শন-সাহিত্যকে অপ্রাঞ্জল বলার উপায় নেই। অতগুলো সাংঘাতিক মুদ্রাদোষ এবং ও-রকমের উদ্‌ভট জীববাদ সত্ত্বেও হোয়াইট্‌হেড্‌ যখন তাঁর লেখায় অতখানি মাধুর্য্য আন্‌তে পারেন, তখন কান্তবিদ্যার মতো অপেক্ষাকৃত সরল প্রসঙ্গে এ-ধরণের দুর্ব্বোধ্যতা অমার্জ্জনীয়।

বলাই বাহুল্য এলেক্‌জ্যাণ্ডর্‌-এর ভাষা-সম্বন্ধে আমার আপত্তি বিদেশীর আপত্তি, এবং এ-রকমের আপত্তি অকিঞ্চিৎকর। ইংরেজির সঙ্গে আমি আবাল্য পরিচিত হলেও, ও-ভাষা আমার অনাত্মীয়; এবং পাশ্চাত্য ভাবলোকে অনাহূত প্রবেশের অধিকার আমি যদিও বহু পরিশ্রমে অর্জ্জন করেছি, তবু আমার ধমনীতে প্রবাহিত ভারতীয় চিন্তার ফল্গুধারা, প্রাচ্যের অতিজীবিত আদর্শেই আমি উত্তরাধিকারী। তাই আমার মতো আচারপন্থীর পক্ষেও আধুনিক বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদকে নির্ব্বিবাদে মেনে নেওয়া দুষ্কর। আমি যদিও জ্ঞানত বেদান্তের ত্রিসীমানা মাড়াই না, তবু অন্যান্য হিন্দুর মতো আমার অবচেতনাও অদ্বৈতবাদের লীলাভূমি; এবং আমি স্বভাবত জড়ধর্ম্মের পক্ষপাতী হলেও, এমন সিদ্ধান্তে আমার সমর্থন নেই যে এই বহুধাবিভক্ত জগৎপ্রপঞ্চ আসলে নানাত্বেরই নৈরাজ্য। তবে এ-ক্ষেত্রে আমার অশ্রদ্ধা অক্ষম, কারণ উক্ত নব্যদর্শনের পিছনে কেবল মূর, রাসেল্‌, এলেক্‌জ্যাণ্ডর প্রমুখ স্বনামধন্য মনীষীদের পৃষ্ঠপোষণই নেই, ফলিত বিজ্ঞানের সকল পরীক্ষা-নিরীক্ষাই বোধহয় ওই মতে সায় দেয়। ফলে এখানকার সুধীসমাজে আদর্শবাদ আর আমল পায় না, তার আসন অধিকার করেছে লোকায়তের আধুনিক সংস্করণ প্র্যাগ্‌ম্যাটিজ্‌ম্‌।

সৌভাগ্যক্রমে পরমার্থ সত্যই দর্শনানুশীলনের একমাত্র লক্ষ্য নয়। তাই বস্তু-স্বাতন্ত্র্যবাদের সাহায্যে জগতের মূল রহস্য উদ্‌ঘাটিত হোক বা না হোক, তার আলোকে সৌন্দর্য্যতত্ত্বের মতো ছোটখাট লৌকিক সমস্যা উদ্‌ভাসিত হয়ে ওঠে। সৃষ্টির চূড়ান্তে যতই ঐক্য থাকুক, মানুষের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা যে বিষয় আর বিষয়ীতে বিভক্ত, তাতে কোনো রকমের সন্দেহ নেই। এ-কথা আত্যন্তিক আদর্শবাদীরাও অস্বীকার করেন না; তবে তাঁরা বলেন যে বিষয় বিষয়ীর অঙ্গীভূত এবং অবগতি

মানেই আত্মদর্শন। এ-মতের প্রারম্ভে যদিও সুযুক্তিই আছে, তবু এর পরিণাম স্বোহংবাদে; এবং সেইজন্যে অনেক আদর্শবাদী জ্ঞানের প্রধান বাহন চৈতন্যকে ব্যক্তির মধ্যে আবদ্ধ না-রেখে তার সঙ্গে সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মের সমীকরণ করেছেন। এর ফলে আধ্যাত্মদর্শনে সৌন্দর্য্য, সত্য, সাধুতা, ইত্যাদির কোনো সাংসারিক সংজ্ঞা নেই, ওর প্রত্যেকটিই বিদ্যমান বস্তুর অঙ্গ এবং প্রত্যেকটিই নিরুপাধি ও স্বয়ংসিদ্ধ। বলাই বাহুল্য যে এই সিদ্ধান্তে সায় দিলে মূল্যনির্দ্ধারণ আর তর্কাধীন থাকেনা, সেটা হয়ে ওঠে মরমী সাধকদের অনির্ব্বচনীয় অনুভূতির বিষয়। সেই-জন্যে লোকায়তপন্থীরা সৌন্দর্য্য প্রভৃতির এই লোকোত্তর ব্যাখ্যায় অসম্মত। তাঁদের বিবেচনায় মূল্য জিনিসটা মানুষের প্রয়োজনসিদ্ধির উপায় মাত্র; অতএব ইষ্টানিষ্টের কোনো অলৌকিকতা নেই, তাকে সনাতন বলাও অসম্ভব; আমাদের প্রয়োজন যখন যুগে যুগে বদলাচ্ছে, তখন আজ যাকে দায়ে প'ড়ে সুন্দর ভাবি, কাল দায়-মুক্তির পরে তাকেই আবার কুৎসিত বলবো। বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীরা আধ্যাত্মদর্শনের সমর্থনে অপারগ হলেও, প্রাগ্‌ম্যাটিজ্‌ম্‌-এও তাঁদের আস্থা নেই। তাই তাঁরা মূল্য-বিচারে মাধ্যমিক মতের প্রচার করেছেন। সৌন্দর্য্যকে অস্তিত্বের অবিভাজ্য অংশ বল্‌তে তাঁরা যেমন অনিচ্ছুক, সৃষ্টির এই সম্পদকে মানবমনের নিঃসার কল্পনা ব'লে উড়িয়ে দিতেও তাঁরা তেমনি অক্ষম। তাঁদের কাছে বিশ্ব কোনোদিনই একনিষ্ঠার পরিচয় দেয়নি। তাঁরা সকলেই হয়তো নানাত্বে বিশ্বাস করেন না, কিন্তু আমাদের অবগতি যে অন্তত কর্ত্তা এবং কর্ম্ম এই দুই সুনির্দ্দিষ্ট ভাগে বিভক্ত, সে-সম্বন্ধে তাঁদের কারো সন্দেহ নেই। কাজেই তাঁদের বিচারে সত্য, সৌন্দর্য্য, সাধুতা, এ-সমস্তই হচ্ছে বিষয় এবং বিষয়ীর ঘাত-প্রতিঘাতের যোগফল। এখানে লক্ষ্য করা উচিত যে এই নিষ্পত্তি মূল্যনির্দ্ধারণে জনমতের পরাক্রমকে খর্ব্ব করছে না। মূল্যবিচারে স্বনিযুক্ত রুচিবাগীশদের ব্যবস্থা এবং সেই ব্যবস্থা পালনে মামুলি মানুষের মেষবৃত্তি মেনে নিয়েও এলেক্‌জ্যাণ্ডর মূল্য-শব্দের একটা সার্ব্বভৌম ও স্থিতিশীল অর্থের সন্ধান পেয়েছেন। এই অর্থ যদিও নানা দর্শনের সংমিশ্রণে শবল, তবু এর প্রামাণিকতাও সুপ্রচুর।

আলোচ্য পুস্তকে সৌন্দর্য্যের অভিব্যাপ্তি গোড়া থেকেই উপদিষ্ট হয়েছে। কিন্তু তাই ব'লেই তাকে নিসর্গজাত বলা চলে না, তার উৎপত্তি দ্রষ্টার মনে। তথাকথিত স্বভাবসুন্দর বস্তু আসলে সুন্দর নয়, সে শুধু প্রীতিকর। অর্থাৎ এই ধরণের বস্তুর সাহায্যে জীবনযাত্রা নির্ব্বিঘ্ন হয় বটে, কিন্তু এগুলোর ধ্যানে আমাদের ইন্দ্রিয়াতীত সত্তা আনন্দ পায় না। সবুজ মাঠ একাধারে গাভীর ক্ষুন্নিবৃত্তি করে এবং তার তাপক্লিষ্ট চোখকে আরাম দেয়; কিন্তু সেইজন্যেই এমন মন্তব্য করা চলে না যে গোজাতি শষ্পশ্যামলিমার সৌন্দর্য্য-সম্বন্ধে সচেতন। কারণ তৃণজনিত সন্তোষ সে হচ্ছে শরীরধর্ম্মী, তার অনুগ্রহে আমাদের কায়িক প্রয়োজন সিদ্ধ হলেও, তা সঙ্কল্পের সংস্পর্শে বঞ্চিত। সুতরাং নবদূর্ব্বাদল কেবল সংবেদনীয়, তার আনন্দ দেবার শক্তি নেই; সে-বস্তু নিত্য নয়, কেবল নৈমিত্তিক। আনন্দ একটা অভিপ্রেত অবস্থা, তাকে চাইলে আর বস্তুমাত্রার প্রাকারে বন্দী থাকলে চলে না, বেদনীয় বস্তুর সার্থকতা-সম্বন্ধে সমুৎসুক হয়ে উঠতে হয়। অতএব সবুজ মাঠকে সুন্দর বল্‌লে অন্যায় হবে, সে-আখ্যা নবদূর্ব্বাদল-প্রসূত অনুভূতিরই প্রাপ্য, এবং এই অনুভূতির উৎপত্তি যদিও দেহাশ্রিত, তবু এর পরিণতি মানসিক।

এইখানে বলে রাখা ভালো যে উপরে যে-ধ্যানলব্ধ আনন্দের উল্লেখ করা হয়েছে, তার সঙ্গে স্বদেশী সমাধির কোনো কুটুম্বিতা নেই। এলেক্‌জ্যাণ্ডর যদিও বিবর্ত্তনে বিশ্বাস করেন, তাঁর মতে আজকের বৈচিত্র্যময় বিশ্ব যদিও একটা অবিচ্ছিন্ন প্রাক্তন দেশ-কালেরই অভিব্যক্তি, তবু তিনি সকল জীবকে একই ঈশ্বরের দ্বারা পরিশাসিত ব'লে মানতে প্রস্তুত নন; তাঁর দর্শনে জীবপর্য্যায়ের উর্দ্ধতন পুরুষ অধস্তনের নিকটে ভগবান-স্থানীয়। কিন্তু তাহলেও তিনি জড়বাদী নন, বস্তুস্বাতন্ত্র্য-বাদী মাত্র। অর্থাৎ আমাদের ভাবনা-বেদনাকে মুখ্যত আচারমূলক ব'লে ভাবার পরেও এলেক্‌জ্যাণ্ডর ওয়াট্‌সন্‌-এর দৃষ্টান্তে মানুষের যান্ত্রিকতার পরিপোষণ করেননি, তার মন এবং দেহ, তার ইচ্ছা এবং প্রবৃত্তি, এই উভয় দিকের সমকালবর্ত্তিতা মেনে নিয়েছেন। কম্‌প্রেজেন্‌স্ বা সমকাল প্রত্যয়ের সাহায্যে তিনি দেখিয়েছেন যে আমাদের ইন্দ্রিয়বোধ যদিও বাহ্য বস্তু ব্যতিরেকে অসম্ভব, তবু এইখানেই আমাদের অবগতির শেষ হয় না, তার উপসংহার অনুভূতিতে। তাঁর মতে বিষয় ধ্যেয় আর ধ্যান উপভোগ্য, এবং এই দ্বিধাবিভক্ত ক্রিয়া একই কর্ত্তার মধ্যে একত্রে সম্পন্ন হয়। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত ধ্যান আর এই উপভোগ এক জাতীয়, এরা তৃতীয় পর্য্যায়ের জিনিস; কারণ এই বংশের আদি পিতার নাম বস্তু, এর দ্বিতীয় পুরুষ হচ্ছে ধ্যান, এবং এর অন্তিম বিকাশ আনন্দে।

সৌন্দর্য্য-বিচারে উপরোক্ত ধ্যানই যদিও অগ্রগণ্য, তবু তার সংগঠন থেকে বস্তুকে বাদ দিলে চলবে না। আনন্দ উদ্‌গত পরিতৃপ্তি ছাড়া আর কিছু নয়। তারও মূলে একটা প্রবৃত্তি আছে; সেই প্রবৃত্তির নিবৃত্তি না-হলে দেহ শান্তি পায় না, এবং দেহ অশান্ত থাকলে চিত্তের প্রসাদ অসম্ভব। অবশ্য প্রবৃত্তির জন্ম-সম্বন্ধে মনস্তত্ত্ব এখনো একমত হতে পারেনি, কিন্তু তার সঙ্গে প্রতিবেশের সম্পর্ক যে ঘনিষ্ঠ, সে-প্রসঙ্গে জীববিজ্ঞানের প্রমাণ প্রকাট্য। প্রবৃত্তির উদ্ভব প্রাণলোকের যেখানে যেমন ক'রেই ঘটে থাকুক, তার পরিসমাপ্তি সর্ব্বত্রই বস্তুর অপেক্ষা রাখে। ভয়-প্রবৃত্তি ভয়ের বিষয়কে আবেষ্টন থেকে তাড়িয়ে তবে নিষ্ক্রিয় হয়. কামপ্রবৃত্তি কামনার বস্তুকে নাগালে না-পাওয়া পর্য্যন্ত বিরাম পায় না, নির্ম্মাণপ্রবৃত্তি প্রশমিত হয় যদৃচ্ছ পরিমণ্ডলকে অভীষ্ট আকারে পরিবর্ত্তিত ক'রে। আমাদের সৌন্দর্য্যবোধ এই নির্ম্মাণপ্রবৃত্তির সঙ্গে সংযুক্ত; এবং আমাদের সত্যবোধ আর ন্যায়বোধ, এ দুয়ের গোড়ায় আছে কৌতূহল ও সামাজিকতা নামক প্রবৃত্তিদ্বয়। সুতরাং মূল্যজ্ঞানের ব্যাখ্যায় আধ্যাত্মবাদ নিষ্প্রয়োজন; এবং ইষ্টসন্ধানের চরমোৎকর্ষও যখন প্রবৃত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত, তখন এই ব্যাপারকে কেবল মানুষী সভ্যতায় সীমাবদ্ধ ক'রে দেখলে অন্যায় হবে, এর সঙ্গে প্রাণীমাত্রের সম্পর্কও অবশ্যস্বীকার্য্য। শুধু তাই নয়, খুঁজলে হয়তো জড়জগতেও এই অন্বেষণের প্রকারান্তর মিলবে, লেয়ার্ড্‌-এর নির্দ্দেশে আমাদেরও হয়তো বলতে হবে যে লোহার প্রতি চুম্বকের একটা স্বাভাবিক টান যখন নিঃসন্দেহ, তখন লোহা নিশ্চয়ই চুম্বকের কাছে মূল্যবান।

কিন্তু তাহলেও মূল্য শব্দকে অতখানি ব্যাপক অর্থে ব্যবহার না-করাই বাঞ্ছনীয়। কল্যাণবোধকে বস্তুমাত্রের স্বাভাবিক ধর্ম্ম ব'লে ভাবলে, শিব, সত্য, সুন্দরের যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায় না, আমাদের জিজ্ঞাসার অকাল মৃত্যু ঘটে আদর্শবাদের প্রতিধ্বনিমুখর শূন্যতায়। তাই আমরা মানতে বাধ্য হই যে সৌন্দর্য্য আবিষ্করণীয়

নয়, সৃজনীয়; তাকে খুঁজতে গেলে জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তিসমূহের শরণ নেওয়া বৃথা, সেজন্যে চিৎশক্তিকেই কাণ্ডারীর পদে বরণ করা দরকার। এই চিৎশক্তির উদ্বোধনে বস্তু একান্ত অক্ষম; সে কেবল প্রবৃত্তির ঘুম ভাঙাতেই সিদ্ধহস্ত; সঙ্কল্পের তন্দ্রাবসান হয় বস্তুনির্ভর ধ্যানের সংঘাতে। সুতরাং সৌন্দর্য্যপিপাসুর কাছে বিষয় গৌণ, বিষয়ের ধ্যানই মুখ্য। শুধু তাই নয়, ধ্যানকে রীতিমতো উপায়ে উপভোগ করতে গেলে, তার স্বাতন্ত্র্য অপরিহার্য্য হয়ে পড়ে, ক্ষণভঙ্গুর ইন্দ্রিয়জ্ঞানের সঙ্গে তার যোগ-সূত্র ছেদন করা অনিবার্য্য হয়ে ওঠে; এবং তখন বিষয়বিলাসীর কাছে বস্তু যে-রকম চিরন্তন, বস্তুর ধ্যানও ঠিক তেমনি অমরতার দাবি করে। অবাস্তবকে এই বাস্তব পদবীতে উন্নীত করাই হচ্ছে সৃষ্টি, এবং শিল্পী, সাধু ও সত্যসন্ধানী, এঁরা সকলেই প্রাণপাত করেন সত্তাকে অজ্ঞাতবাসে পাঠিয়ে তার শূন্য সিংহাসনে স্বরূপকে বসানোর চেষ্টায়। কিন্তু শিল্পী, সাধু এবং সত্যসন্ধানী, এঁরা মানুষ। কাজেই এঁদের বিধাতার সমকক্ষ ব'লে ভাবা হাস্যকর। এঁদের সৃষ্টি বিশ্বরচনার মতো নাস্তিকে অস্তির দ্বারা পরিপূর্ণ ক'রে তোলে না; দৈবাগত উপকরণকে নিকামত সাজাতে পারলেই এঁরা ধন্য। অতএব এখানেও বস্তুজগৎ আবার এঁদের পেয়ে বসে, এমন-কি যাঁরা বিশুদ্ধ গণিতের অথবা স্বাবলম্বী সঙ্গীতের সাধক, তাঁদেরও।

স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য, আলেখ্য ইত্যাদির মতো সুপরিচিত শিল্পে বস্তুর প্রতিপত্তি সর্ব্ববাদিসম্মত। এর একটার উপাদান বা কলাকৌশল অন্যটার কাজে তো লাগেই না, এমন-কি যে-ভাব এর একটাকে আশ্রয় ক'রে থাকে তা অন্যত্র প্রকাশ্য কিনা, সে-সম্বন্ধেও প্রশ্ন আছে। মাইকেল্ এঞ্জেলো-র ডেভিড্ মূর্ত্তি নিছক মনঃপ্রসূত, একথা আর যেই ভাবুক, শিল্পী নিজে ভাবতেন না; কারণ তিনিই ব'লে গেছেন, ওই মূর্ত্তির পরিকল্পনার জন্যে তাঁর মনীষা ততটা প্রশংসনীয় নয়, যতটা উল্লেখযোগ্য ফ্লরেন্স্-এর নগরসভার দেওয়া মর্ম্মরখণ্ডের আপতিক আকার। কিন্তু তাঁর প্রেরণার এই দৈবঘটিত দিকটা মেনে নিলেও, উক্ত শিল্পসৃজনে তাঁর মনের কৃতিত্ব লাঘব হয় না। সেই পাথরখানার ধ্যানকালে তিনি নিশ্চয়ই তাঁর ধ্যানের সৌন্দর্য্য হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন; এবং সে-সৌন্দর্য্য তাঁর অন্তরে চিত্রার্পিত হয়ে গিয়েছিল ব'লেই, আসল খোদায়ের বেলা তাঁর হাতুড়ি ছেনি আর অদৃষ্ট মেনে চলেনি, চলেছিলে সঙ্কল্পের নির্দ্দেশ-অনুসারে। কাজেই বস্তুসর্ব্বস্ব শিল্প থেকেও মনকে বাদ দেওয়া অসাধ্য। তবে এমন সিদ্ধান্ত হয়তো সঙ্গত যে ওই মননব্যাপার সকল শিল্পে সমান নয়। সঙ্গীতে মানসীর একাধিপত্য প্রায় নিঃসন্দেহ, এবং বাহিরের উপদ্রব নিরোধে সাহিত্য যদিও সঙ্গীতের সমকক্ষ নয়, তবু তাকেও বোধহয় চিদাত্মক বলাই শ্রেয়। কিন্তু তাহলেও কাব্যসরস্বতী মাটি দিয়েই তৈরি; তাঁর প্রাণপ্রতিষ্ঠার মন্ত্র যে-স্বয়ম্ভূ ওঙ্কারধ্বনিতেই রচিত হয়ে থাকুক, সেই নিবিদের বর্ত্তমান বিকৃতি গদ্য এবং পদ্য কখনোই একেবারে বস্তুবিরহিত হতে পারে না।

আলোচ্য পুস্তকখানি হাতে আসার আগে আমি অন্য এক প্রবন্ধে বলেছিলুম যে কাব্যজাত শব্দসমূহ বস্তুর প্রতিদ্বন্দ্বী। অর্থাৎ বস্তুর যে স্বাবলম্বন ও সর্ব্ববল্লভতা আছে, তাতে কবিতার শব্দাবলীও বঞ্চিত নয়; এবং একই বস্তুর বিষয়ে আমাদের একজনের জ্ঞান যেমন আর একজনের জ্ঞানের থেকে স্বাভাবতই আলাদা হয়, কাব্য-বিশেষের অর্থ-সম্বন্ধেও ঠিক তেমনি মতান্তর সহজ ও সম্ভব। এলেক্জ্যাণ্ডর্-এর

পৃষ্ঠপোষণে আমার দুঃসাহস আপাতত আরো বেড়ে গিয়েছে; এখন আমি, আর কেবল কাব্যের ভাষায় নয়, ভাষামাত্রেরই স্বাধিকার স্বীকার করি। ইন্দ্রিয়বোধের অনুগ্রহে আমরা বস্তুর যে-মূর্ত্তি দেখি, তা বিদ্যুদ্‌বিলাসের মতোই অস্থায়ী। শুধু সেইটুকু দেখার দৌলতে সে-প্রসঙ্গে মনুষ্যসমাজে সংস্কারবিনিময় তো দুষ্কর বটেই, এমন-কি বস্তুকে পাশব প্রয়োজনে লাগাতে হলেও সে-সম্বন্ধে আমাদের ধারণার স্থৈর্য্য আবশ্যিক। এই ধ্রুবান্বেষণে ভাষাই মানুষের প্রধান সহায়; এবং প্রত্যক্ষের পুনরাবর্ত্তনে বস্তু যেমন ক্রমে ক্রমে গুণার্জ্জন করে, ভাষাও তেমনিতর যুগ-যুগ-সঞ্চিত অভিজ্ঞতার আধার হয়ে আস্তে আস্তে অর্থঘন হয়ে ওঠে। ফলে সভ্যতার অধুনাতনী অবস্থায় কথামাত্রেই বস্তুর প্রতিযোগী, তারা উভয়েই মৌরসী পাট্টা চায় ও পায়, এবং উভয়েই মানসিক ক্রিয়ার—অর্থাৎ ধ্যানের—বিষয় হয়ে উঠতে পারে। এমন বিশ্বাসের কোনোই ভিত্তি নেই যে প্রাকৃত মর্ম্মরের ধ্যানে বিভোর হয়ে ভাস্কর যে-প্রতিমা রচনা করে, তার প্রাণ বাঙ্ময় মর্ম্মরে গঠিত মানসসুন্দরীর চেয়ে বেশি অবিনাশী। আয়ুর বিচারে শেষোক্তই বরং অগ্রগণ্য; কারণ স্থায়ত বস্তু আর শব্দ যদিও তুল্যমূল্য, তবু ধ্যানকে উপভোগ করার জন্যে যে নিরাসক্তি তার পক্ষে অপরিহার্য্য, তাতে বস্তুর চেয়ে শব্দই অধিক সম্পন্ন। বস্তুর ব্যাবহারিক দিকটা ভোলা শক্ত; কিন্তু শব্দের সাঙ্কেতিক প্রয়োগে কেবল কবিরাই অসমর্থ নন, নিরুক্তের মতো নীরস শাস্ত্রও ভাষা-সম্বন্ধে অহৈতুক প্রেমের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। বলাই বাহুল্য যে শব্দের অভি-প্রায়কে উড়িয়ে দেওয়া আমার উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু আমার মতে সাহিত্যের শব্দ অর্থের জন্যে গৃহীত হয় না, গৃহীত হয় রূপের খাতিরে; সেখানে প্রত্যেক শব্দই এক একটি ধ্যান, এবং ধ্যান ব'লেই প্রত্যেই শব্দ স্বাধিকারগুণে আনন্দদায়ক। অবশ্য তথাকথিত সাহিত্যে এ-নিয়মের বহু ব্যতিক্রম মিলবে। আমাদের অনেক লেখাই রূপসৃষ্টি নয়, রূপবর্ণনা; অর্থাৎ সে-ধরণের রচনা নিজের জোরে আমাদের চিত্তপ্রসাদ দিতে পারে না, তাতে আমরা পাই শুধু এমন কোনো আত্মনিষ্ঠ বস্তুর ঠিকানা যার সংস্পর্শে আমাদের চিকীর্ষার উদ্বোধন ঘটে। সুতরাং সে রকম সাহিত্যকে, তথা অন্যান্য শিল্পকে, ললিত কলার অন্তর্ভুক্ত না-ক'রে, তাকে কারুকর্ম্মের সীমাবদ্ধ করাই শ্রেয়; কারণ তার উপকারিতা যদিও নিঃসন্দেহ, তবু তার সৌন্দর্য্য ধার-করা, তার পিছনে যে-প্রেরণা আছে, সে হচ্ছে সেই জাতির প্রেরণা যার তাড়নে মৌমাছি অমন চমৎকার চাক বানায়। সে-সমস্ত কারুকার্য্য আরসির তুল্য, যার কোনো স্বকীয় মূল্য নেই, প্রতিফলিতের মূল্যেই যা মূল্যবান; এবং এলেক্‌জ্যাণ্ডর্-এর বিবেচনায় এই প্রতিবিম্বপরায়ণতা হচ্ছে গদ্যের লক্ষণ। কাব্যের ধর্ম্ম শুদ্ধ চৈতন্যের উপাসনা; তাই শিল্পমাত্রেই যখন উৎকর্ষে পৌছায়, তখন তাকে কাব্যের অনুকরণ করতে দেখা যায়; তখনো হয়তো তার অর্থ থাকে, কিন্তু সে-অর্থ সার্থকতারই নামান্তর।

সৌন্দর্য্যে মনের নেতৃত্ব সুনিশ্চিত; কাজেই সেখানেও যদি বস্তুকে উপেক্ষা করা অসম্ভব হয়। তবে সত্যের রাজ্যে তাকেই ছত্রপতি বলতে হবে। কারণ ব্র্যাড্‌লি প্রকৃতি ও প্রপঞ্চের সম্পর্কটাকেই সত্য নামে অভিহিত করেছিলেন, এবং সত্য-শব্দের এই অভিধা আজকে বোধহয় অনেকেই মানেন। সত্যের ভিত্তি কৌতূহলপ্রবৃত্তিতে, এবং সে-প্রবৃত্তির প্রভাব শুধু মনুষ্যসংসারেই আবদ্ধ নয়। তারি নির্দ্দেশে কুকুর

মাটি শুঁকে অপরাধীকে ধরিয়ে দেয়, নিউটন্-ও মাধ্যাকর্ষণের দুর্লঙ্ঘ্য নিয়ম আবিষ্কার করেন তারি প্রণোদনে। তবু এ-দুটো ব্যাপার একেবারে এক নয়। কুকুরের চোর ধরা গরুর সবুজপ্রীতির মতোই নিছক দেহাশ্রিত; নিউটন্-এর মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কারের পিছনে মহামনের ইসারা আছে। কারণ তত্ত্বের খাতিরে আমরা যে দিকেই ঝুঁকি না কেন, তথ্যের শাসনে আমরা সকলেই নামবাদী। সূর্য্যের সঙ্গে পৃথিবীর আকর্ষণ-বিকর্ষণের কোনো সম্বন্ধই ইন্দ্রিয়গোচর হতে পারে না। কিন্তু তাহলেও সূর্য্যের প্রচণ্ড প্রতাপ উপেক্ষা করা অসাধ্য। প্রত্যক্ষের সঙ্গে প্রয়োজনের এই যে প্রচণ্ড বিরোধ, এরি সমাধান-কল্পে মানুষ সত্য আবিষ্কার করে; এবং এ-সত্যকে সে খুঁজে পায় প্রত্যয় আর পদার্থের মধ্যস্থতায়। সে ভাবে, আসল জগতের ব্যাপ্তি তার ইন্দ্রিয়জ্ঞানকেও ছাড়িয়ে গেছে, এবং সেই অদৃশ্যকে সে জানতে চায় বুদ্ধি বা আস্থা-প্রসূত অনুমানের সাহায্যে। এই অনুমানের উদয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বস্তু-বিশ্ব পিছিয়ে পড়ে। তখন আর প্রকৃতিকে প্রত্যক্ষ করা তার মুখ্য উদ্দেশ্য থাকে না। তখন তার লক্ষ্য হয় অনুমানকে প্রকৃতির প্রতিবাদ থেকে বাঁচানো। কাজেই এখানেও বস্তু কেবল ধেয়, সেই ধ্যান পরিচ্ছিন্ন হয়ে উপভোগ্য না-হওয়া পর্য্যন্ত তার সত্যাসত্যের কোনো তর্কই ওঠে না।

কিন্তু তাহলেও সত্যের ক্ষিতিনির্ভরতা সৌন্দর্য্যের বস্তুনিষ্ঠার চেয়ে বেশি। শিল্পী আবহমানকাল মর্ত্ত্যের উপাদানে অমরাবতীকে চিত্রার্পিত ক'রে এসেছে। এর জন্যে সে কখনো নিন্দনীয় হয়নি, বরং বিশ্ববিধাতার উপমেয় ব'লে সম্মান পেয়েছে। কারণ সে আবিষ্কারক নয়, উদ্ভাবক; বিশ্লিষ্ট উপকরণে অভূতপূর্ব্ব অবৈকল্য নির্ম্মাণ ক'রেই সে সার্থক; তার অভিযান জ্ঞাত বিষয় থেকে অজ্ঞাতের অভিমুখে। সুতরাং তার ব্রহ্মাস্ত্র সত্য নয়, শুধু সম্ভাব্যতা; অর্থাৎ তার সৃষ্টিরও যদিচ সঙ্গতি আবশ্যক, তবু সে-সামঞ্জস্য বস্তুর সঙ্গে বস্তুর সামঞ্জস্য নয়, সে হচ্ছে বস্তুর সঙ্গে মনের লয়। সত্যসন্ধানী বৈজ্ঞানিকের আদর্শ এর বিপরীত। স্বতোবিরোধী তথ্যের মধ্যে ঐক্য-স্থাপনেই সে চরিতার্থ হয়। এই ঐক্য যদিও কল্পনার কল্যাণেই আসে, তবু এ-কার্য্যে মনই বস্তুর বশ্যতা মানে; কোনো জ্ঞাত তথ্য যদি বৈজ্ঞানিকের ব্যক্তিগত পক্ষপাতকে অবহেলা করে, তবে তথ্যের জয়ই অবশ্যম্ভাবী। সেইজন্যেই এক-দেশদর্শিতা শিল্পীর পক্ষে মার্জ্জনীয় হলেও, বিজ্ঞানে তার স্থান নেই। অবশ্য বিশুদ্ধ গণিতের মতো অকারী বিদ্যাকে আপাতদৃষ্টিতে বস্তুবিবর্জ্জিত ব'লে মনে হতে পারে। কিন্তু বিচারে সে-বিশ্বাস টিঁকে না। গণিতের সমাপ্তি যতই খেয়ালি হোক না কেন, তার সূত্রপাত বেদীরচনায় মতো অত্যন্ত ধ্রুপদী উপলক্ষ্যে। উপরন্তু মনোরোগীর কষ্টকল্পনার মতো অঙ্কশাস্ত্রের সূক্ষ্মতম ব্যাসকূটগুলোও বহিরাশ্রয়কে অবদমিত করে মাত্র, তার অবাধ্য হতে পারে না। রীমান্-এর জ্যামিতি যদিও তার উদ্ভাবকের বুদ্ধিমত্তার বিজ্ঞাপন হিসেবেই প্রস্তাবিত হয়েছিলো, তবু আইন্‌ষ্টাইন্ সেই জিওমেট্রিকেই নিযুক্ত করেছেন আসল আকাশের পরিমাপে; এবং তথাকথিত অব্যবহার্য্য অঙ্কের এতাদৃশ নৈমিত্তিক পরিণতি বিজ্ঞানের ইতিহাসে এত সুলভ যে ব্যাপারগুলোকে দৈবাৎ ব'লে উড়িয়ে দেওয়া দুষ্কর। স্পাইনোজা বলেছিলেন যে গণিতের উপক্রমণিকা বোধিজাত। সে-অনুমান সত্য হলেও বিজ্ঞানের প্রকৃতিপরায়ণতা ঘুচবে না। আদর্শবাদী জীন্‌স্‌ও এ-কথা প্রকারান্তরে মেনে নিয়েছেন; এবং তাঁর মতে স্বয়ং ভগবানই যখন

গণিতবিলাসী, তখন অঙ্কশাস্ত্রের নিয়মাবলী কখনোই মানসিক নয়, সর্ব্বত্রই নৈসর্গিক। সুতরাং এডিংটন্-এর আত্মদর্শন আমরা অগ্রাহ্য করতে বাধ্য। প্রকৃতি যে আমাদের বিশ্বস্ত গোমস্তা, তার কাছে আমরা যা গচ্ছিত রাখি, সে তাই সুদে আসলে, কড়ায় গণ্ডায়, আমাদের ফিরিয়ে দেয়, এমন সিদ্ধান্তের কোনো প্রামাণিক ভিত্তি নেই। বরং উল্‌টো মতটাই বেশি পোষণীয়; সে হয়তো কাফ্‌কা-র ঈশ্বরের মতো, আমাদের প্রতি যার ঔৎসুক্যের একমাত্র অভিব্যক্তি হচ্ছে অত্যাচার বা প্রতারণা। বহির্জ্জগৎ তো শূন্যগর্ভ নয়ই, এমন-কি আমাদের সহজাত জ্ঞানের মায়া-মুকুরেও আমরা যে-মানসীমূর্ত্তি দেখি, তা সেই বহুরূপীরই প্রতিচ্ছবি। সত্য এই প্রকৃতিরই পদসেবী; তাই শিল্পের পক্ষে নৈর্ব্যক্তিক হওয়াই যথেষ্ট, কিন্তু বিজ্ঞানের পরাকাষ্ঠা অমানুষিকতায়।

সৌন্দর্য্য-বিচারে মনের মর্য্যাদা যদিও উত্তুঙ্গ, তবু বস্তুর প্রতিযোগিতাও সেখানে এত উগ্র যে উভয় পক্ষকে সমবল বললেও অত্যুক্তি হয় না। সত্যের আসরে মনের উপস্থিতি আবশ্যিক হলেও, বস্তুই সে-ক্ষেত্রে সর্ব্বেসর্ব্বা। কিন্তু সদাচারের আলোচনায় বস্তু অবান্তর; মানবসংসারে বোধহয় এই একটিমাত্র প্রদেশ আছে যেখানে মনই রাজচক্রবর্ত্তী। তাহলেও আমাদের সদসদজ্ঞানের উৎপত্তি ব্রহ্মলোকে হয়নি, তারও মূলে একটা প্রবৃত্তিই বর্ত্তমান। এই প্রবৃত্তিকে যদিও সমাজব্যবহারের মতো কোনো গুরুগম্ভীর নামে অভিহিত করা যায়, তবু এটা আমাদের স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তি নয়, এখানে আমরা বহুচর পশুপক্ষীরই উত্তরাধিকারী। এই সংঘপ্রীতিকে জীবেরা যখন প্রতিবেশের পরামর্শেই আয়ত্ত করেছিলো, তখন "ক্যাটিগরিক্যাল্ ইম্প্যারেটিভ্" প্রকৃতিরই আকাশবাণী, এবং শৈবেরা কেবল মঙ্গলময় মহেশ্বরেরই পূজারী নয়, পশুপতিও তাদের উপাস্য। কিন্তু সমাজব্যবহার অন্যান্য প্রবৃত্তির মতোই বিষয়াশ্রিত হলেও, তার উপরে বস্তুর প্রভাব অতিশয় পরোক্ষ। বস্তুর দ্বারা উদ্বেজিত না-হলে মানুষ কোনো কার্য্যে হস্তক্ষেপ করে না বটে, কিন্তু সদাচারী সামগ্রীর জন্যে ততটা উন্মুখ নয়, যতটা উৎসুক তার কামনা-বাসনার মর্ম্মানুসন্ধানে। প্রমাণাভাবে আমরা যদিও কাণ্ট্-এর সুমিনাবাদকে প্রত্যাখ্যান করেছি, তবু নীতিপরায়ণের সামনে তিনি যে-আদর্শ রেখে গেছেন, তা অবিনশ্বর; এখনো পর্য্যন্ত সাধুতার একমাত্র নিকষ হচ্ছে এমন আচরণ যার মূলসূত্র সাধারণ বিধানের অঙ্গীভূত হতে পারে। এ-কথা সুবিদিত যে সকল সামান্য বিধিই বিষয়বিবিক্ত। কাজেই সদাচারের প্রেরণা বস্তুপ্রসূত নয়, এমন-কি তার প্রবর্ত্তনা বস্তুর ধ্যান থেকে আসে কিনা, তাও জিজ্ঞাস্য। কারণ একই দ্রব্যের লোভে যখন একাধিক লোক লালায়িত হয়ে ওঠে, তখন সাধু সমাজরক্ষার উদ্দেশ্যে স্বকীয় চিত্তবৃত্তির নিরোধ করেন। এ-সময়ে তাঁকে বস্তু বিচলিত ব'লে ভাবলে সত্যের অপলাপ হবে। এই অবস্থায় তিনি যে-সমস্যার সমাধানে অগ্রসর হন, সে-সমস্যা অভিলাষের সঙ্গে অভিলষিতের মিলনে তিরোধান করে না, তার মীমাংসা বিসংবাদী অভিলাষীদের তুলাসাম্যে। অবশ্য এই উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যেও সাধু ধ্যানে বসেন। কিন্তু তখন আর তিনি বস্তুর ধ্যানে প্রত্যাদেশ খুঁজে পান না, তখন তাঁর ধ্যেয় হয়ে ওঠে নিষ্কাম বিনয়-ব্যবহারের বিভিন্ন রূপকল্প। সুতরাং সাধুও শিল্পী, শুধু তাঁর শিল্পের উপকরণ বস্তু নয়, ব্যক্তি নয়, ব্যক্তিস্বরূপ। বহুর ব্যক্তিস্বরূপের সঙ্গে নিজের ব্যক্তিস্বরূপ মিশিয়ে তিনি

যে-সক্রিয় সদাচারের প্রতিমান জগৎসমক্ষে উন্নীত করেন, তার অনুকরণেই সামাজিক জীবের ইষ্টসাক্ষাৎ সম্ভবপর।

কিন্তু তাই বলেই ইষ্টানিষ্ট নির্ব্বিকল্প বা নির্ব্বিকার নয়। অন্যত্র লোকায়তের উপদেশ যতই অগ্রাহ্য হোক, আচারবিজ্ঞানে তার মন্ত্রণাই অবশ্যপালনীয়। এখনো পর্য্যন্ত সকল নৈয়ায়িকই শূন্যবাদে এসে পথ হারিয়েছেন, আমাদের বিচারতৎপর প্রজ্ঞার অতিমর্ত্ত্যতা প্রমাণে সক্ষম হয়নি ; এবং "সুপের ঈগো-"র কুলপঞ্জিকায় ফ্রয়েড্ এমন বর্ণসঙ্করতার খবর পেয়েছেন যে বিবেকের আভিজাত্য ঘোষণা করা আজকে একেবারেই অসাধ্য। অতএব জীববিদ্যার সাক্ষ্য মেনে নেওয়াই নিরাপদ ; এই কথা মনে করাই শ্রেয় যে আমাদের পারত্রিক কল্যাণবোধের আড়ালেও শতসহস্র বৎসরের পাশবিক পরীক্ষা-প্রয়োগই ছায়াচ্ছন্ন হয়ে আছে। অন্ততপক্ষে এটা নিশ্চয় যে অসদের সংসর্গে সাধু যে-বিতৃষ্ণা অনুভব করেন, দুর্ব্বল স্বজাতির প্রতি যূথের বিদ্বেষেই তার সূচনা ; এবং সজ্জন-সম্বন্ধে আমাদের সাধুবাদের আরম্ভ হস্তিপালের দলপতি নির্ব্বাচনে। সদাচারী জ্ঞানত কৈবল্যকামী হলেও কার্য্যত সে প্রকৃতির প্রশ্রয়ই খোঁজে, এবং তার তীর্থযাত্রা যদিও অমৃতের দানসত্রে এসেই থামে, তবু সে যেহেতু সচেতন পুরুষ, তাই তাকে এ-প্রশ্নের উত্তর দিতেই হয় যে নিসর্গনিপীড়িত মানুষের অভীপ্সায় কী ধরণের অমরাবতীর কতখানি প্রয়োজন আছে। ফলে হিতৈষণার কোনো আদর্শই চিরাচরিত হয় না ; সদনুষ্ঠানের সংজ্ঞা তো দেশ থেকে দেশান্তরে, কাল থেকে কালান্তরে, বদলাতে থাকেই, উপরন্তু একই দেশে এবং কালে, এমন-কি একই সংঘে অথবা পরিবারে, স্বভাবতই তার প্রকারভেদ মেলে। মহাত্মার পক্ষে সত্যভাষণ যদিও নিত্য কর্ত্তব্য ব'লেই বিবেচিত হয়, তবু কবিরাজের বেলায় রোগীর কাছে অপ্রিয় সত্য প্রকাশ করা মহাপাপ। ঐতিহাসিক মহারথীদের বিচারে এর চেয়ে বেশি ব্যতিক্রমও ক্ষমণীয়। তবে নেপোলিয়ন্, বিস্মার্ক্-এর মতো ব্যক্তিকে আমরা স্মরণীয় ব'লে স্বীকার করলেও, সচ্চরিত্রে তাঁরা বুদ্ধ বা যীশুর সমপাংক্তেয় নন ; নীতির দিক থেকে তাঁদের মার্জ্জনায় হয়তো এইটুকুই বলা চলে যে স্বেচ্ছায় সকল ধর্ম্মবিধান ভেঙে থাকলেও, তাঁরা অজ্ঞানত জার্ম্মানির ঐক্যসাধন অথবা ফ্রান্সের বন্ধনমোচন ক'রে বৃহত্তম সংখ্যার মহত্তম মঙ্গলই ঘটিয়ে গেছেন। আপাত দৃষ্টিতে ভাবিকথকদের এই নিয়মের বহির্ভূত ব'লে লাগলেও, আসলে তাঁদের উৎকেন্দ্রিকতাও প্রয়োজনসাপেক্ষ। কিন্তু তাঁরা যেহেতু প্রকৃতির প্রিয়পাত্র, তাই তাঁদের গবেষণা আর বর্ত্তমানের সংক্ষিপ্ত সীমায় ক্ষান্ত হয় না, আগামী কালের আহ্বানে তাঁরা সাময়িক সমাজব্যবস্থাকে অবজ্ঞা করেন।

কিন্তু উপরোক্ত অদল-বদলে ধর্ম্মের পার্থিব মূল ধরা পড়লেও, বিস্তারে সে বস্তু-বিরাগী। সৌন্দর্য্য বা সত্যের আলোচনায় জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের মধ্যে যে-জাতিভেদ দেখি, আচারশাস্ত্রের সাম্যবাদে তার লেশমাত্র নেই। এখানে বিষয় আর বিষয়ীর অধিকার সমান, তাদের পার্থক্য কেবল স্থানের, মানের নয়। অর্থাৎ ধর্ম্ম-বিচারে একজনের মন অন্য মনের পরিচয় খোঁজে ; এমন-কি অনেক আচারনিষ্ঠের কাছে তাঁদের নিজের মনই বিদ্যাভ্যাসের সামগ্রী হয়ে ওঠে। হয়তো এইজন্যেই ধর্ম্মচর্চ্চায় এতদিন আদর্শবাদীরাই পুরোধা হয়ে এসেছেন ; কারণ এই আত্মব্যবচ্ছেদ তাঁদের আত্মজ্ঞানেরই নামান্তর। কিন্তু আত্মজ্ঞান যদি আচারের বেলা সুলভ হয়, তবে অন্যত্রও তাকে অব্যাহত প্রবেশের অনুমতি দিতে হবে ; এবং এ-ক্ষেত্রে চৈতন্য যেকালে ইচ্ছামতো নিজের মধ্যে ব্যবধান

এনে জ্ঞানের বিষয়কে গ'ড়ে নিতে পারে, তখন শঙ্করসম্মত ব্রহ্মবাদের বিরুদ্ধে আপত্তি তোলাও একান্ত অসঙ্গত। অবশ্য উপনিষদের ব্রহ্ম দ্বৈত স্বীকার করেন কেবল মায়াচ্ছলে; কিন্তু আসলে তিনি নির্গুণ ও নির্দ্বন্দ্ব হলেও, তাঁর মধ্যে চোখ, কান, মুখ ইত্যাদি সকল ইন্দ্রিয়ই বর্ত্তমান, শুধু সন্নিকটে বেদনীয় বস্তুর অভাব বশত তাঁর জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তির কোনো কাজ নেই। সম্ভবত এই কারণেই সাধুর সম্বিতের সঙ্গে ব্রহ্মের তুলনা করা চলে না; তার উপমেয় হচ্ছে ভালেরি-র স্বাবলম্বী ভুজঙ্গ যে নিজের পুচ্ছকে উপজীব্য ক'রে অনাদ্যন্ত কাল জ্ঞানতরুর মূলে পাহারা জাগে। কিন্তু সত্য আর সৌন্দর্য্যের সন্ধানে বেরিয়ে আমরা যখন সেই শেষনাগকে অতিক্রম ক'রেই বাস্তবিক অবগতির আস্বাদ পাই, তখন সদাচারের মতো লৌকিক ব্যাপারেই বা আমরা তার বিষদংশন সইবো কোন্ লোভে? বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদ যদি এ-প্রশ্নের সদুত্তর দিতে না-পারে, তবে আর বর্ক্‌লি-র প্রজ্ঞাবাদকে উপেক্ষা করা চলবে না, তাহলে মানতে হবে যে শুধু সত্য নয়, যে-বস্তু সত্যের আধার, তারও অস্তিত্ব নির্ভর করে আমাদেরই জানার উপরে।

অবশ্য উক্ত তর্ক পরাবিদ্যারই অন্তর্গত; এবং এলেক্‌জ্যাণ্ডর বারম্বার বলেছেন যে আলোচ্য পুস্তকে তিনি তত্ত্বজিজ্ঞাসু নন, তথ্য-অনুসারে মূল্যবিচারই তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য। কাজেই এ-প্রসঙ্গে আমার পারমার্থিক কৌতূহল হয়তো নিতান্ত অশোভন। কিন্তু তথ্য সম্ভবত তত্ত্বেরই অপভ্রংশ; অন্ততপক্ষে এটা নিঃসন্দেহ যে পদার্থবিদ্যার মতো তথ্যভূয়িষ্ঠ বিজ্ঞান প্রতিনিয়তই আমাদের স্থূল বুদ্ধির পদলাঘব করে। যা প্রত্যক্ষে পাই, তাই যদি তথ্য হয়, তবে সত্য আর অপলাপের মধ্যে তফাৎ থাকে না, এবং তখন তত্ত্ব যে-উপায়ে মরে, তথ্যও সেই ভাবেই করে আত্মহত্যা। সুতরাং তথ্য কেবল তথ্য হিসেবেই গ্রহণীয় নয়; প্রত্যক্ষদৃষ্টির পিছনে যে-অনুমান আছে, তার সঙ্গে সামঞ্জস্য না-ঘটা পর্য্যন্ত তথ্যজ্ঞান দুষ্প্রাপ্য, এবং দুষ্প্রাপ্য ব'লেই সমষ্টিবিজ্ঞানের আবিষ্কারগুলো আজ এত বাদবিতণ্ডার সৃষ্টি করছে। বলাই বাহুল্য যে এ-কথা এলেক্‌জ্যাণ্ডর-ও জানেন; এবং এ-পুস্তকে তিনি প্রকাশ্যে তত্ত্ববিমুখ হলেও, তাঁর সমকাল-প্রত্যয়ের পিছনে একটা সর্ব্বব্যাপী মতবাদ প্রচ্ছন্ন আছে। এই প্রত্যয়টি যদি আমার কাছে হোয়াইট্‌হেড্-এর দ্বিধ্রুবীয় উপলব্ধিগোলকের মতোই রহস্যাবৃত হয়, তাহলে এলেক্‌জ্যাণ্ডর-কেও হোয়াইট্‌হেড্-এর সঙ্গে বের্গ্‌সঁ-পন্থী না-ব'লে, আমাকেই দর্শনান্ধ বলা বিধেয়। হয়তো ভারতবর্ষে জন্মানোর দরুন, কিম্বা তত্ত্বজ্ঞানে অনভ্যস্ত ব'লে আমার মন দ্বিত্ব সমর্থনে অনিচ্ছুক; অথচ চক্ষু-কর্ণের প্রতিকূলতায় আমার দেহ বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদেও পৌঁছুতে পারে না; এবং আমার জীবনে দেহ যেহেতু মনের অভিভাবক, তাই অন্তত সংসারে আমি বাধ্য হয়েই দ্বৈধ অঙ্গীকার করি। কিন্তু আবশ্যিক সম্মতি সর্ব্বদাই অস্থায়ী; ফলে ব্যবহারের তাগিদ যেই ঢিলে হয়, আমার বুদ্ধি অমনি বিদ্রোহে মেতে ওঠে; এবং অবিকল ও অবিভাজ্য অভিজ্ঞতাকে বুঝতে গিয়ে তাকে বিভিন্নধর্ম্মী কর্ত্তা আর কর্ম্মের সঙ্কলন ব'লে ভাবা কোনোমতেই আমার সাধ্যে কুলায় না। এই রকম সময়ে দর্শনচর্চ্চাতে আর সংশয় ঘোচে না; তখন উপলব্ধির অখণ্ডতা প্রমাণে "গেষ্টাল্‌ট্ সাইকলজি-"র শরণ নিই; এবং তার অখিল আত্মন্তরিতার মধ্যে যখন বিশ্বম্ভর ভূমার অনুস্যূতি দেখি, তখন গিয়ে ধর্ণা দিই পাভ্‌লোভ্-এর পায়ে। কিন্তু এখানেও নিশ্চয়ের খবর পাই না; কারণ তাঁর রাজ্যের প্রজারা যদিও

মনের বালাই ঘুচিয়ে শ্রেণীবিরোধের অতীত হয়ে গেছে, তবু এর সীমান্তরে ফ্রয়েড্-এর শাসনে যারা বাস করে, তারা শুধু নামেই দেহী, আসলে মনই তাদের সর্ব্বস্ব। তখন আর পলায়ন ছাড়া জীবনরক্ষার অন্য গতি থাকে না, এবং ছুটতে গিয়ে প্রথমেই চোখে পড়ে সমকাল-প্রত্যয়ের জোড়ানৌকো। কিন্তু অগত্যা এই যানে আত্মসমর্পণ করলেও বুকে বল পাইনা; সর্ব্বদাই ভয় হয় যে তত্ত্বের সমুদ্রে এসে হঠাৎ কোনো বিপরীতগামী স্রোতের মুখে পড়লেই যুগ্মতরীর সমবর্ত্তী সূত্র ছিঁড়ে গিয়ে ভরাডুবি অনিবার্য্য হবে। আলোচ্য পুস্তকের গোড়ার দিকে ভেবেছিলুম যে এতদিনে হয়তো এই সঙ্কটত্রাণের উপায় আবিষ্কৃত হয়েছে; কিন্তু গ্রন্থিটা এবারেও শেষপর্য্যন্ত টিঁকলোনা। তাই এলেক্জ্যাণ্ডর্-এর গবেষণার ব্যাবহারিক মূল্য মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করলেও, তার পারমার্থিক মূল্য আমি কায়মনে মানতে পারলুম না। অবশ্য আমার সত্তার এই বিবাদী অঙ্গদ্বয়ের সংযোজন একা আমারি কর্ত্তব্য। কিন্তু লজ্জার সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে আজ পর্য্যন্ত নিজে ভেবে বা পরের পক্ষপাত কুড়িয়ে এ-সমস্যার কোনো কূলকিনারাই আমি পাইনি। তবু মানুষের আশা দুর্ম্মর; তাই বিশ্বাসের কোনো হেতু না-থাকলেও আমি মনে করি এর মীমাংসা দ্বৈতবাদে নয়, মনোবাদে নয়, অবিমিশ্র দেহাত্মবাদে।

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত

The Collected Poems of Harold Monro—(Cobden-Sanderson)

Poems, Nineteen Thirty to Nineteen Thirty Three—By Robert Graves—(Arthur Barker)

Winter Harvest—By Andrew Young—(Nonesuch Press)

হ্যারল্ড্ মানরো-র সংগৃহীত কাব্যগ্রন্থ হাতে লইলেই মনে পড়ে মানুষটির কথা। এমন কাব্যোন্মাদগ্রস্ত অস্থিরতা খুব কম কবির জীবনে প্রকাশ পায়। তিনি ছিলেন একাধারে কবি, কাব্য-সম্পাদক, ও কাব্য-প্রকাশক। কাব্য-সরস্বতীর সেবায় তিনি লাগিয়াছিলেন সর্ব্বস্ব পণ করিয়া; ফলে যে দুর্ভোগ তাঁহার ভাগ্যে জুটিয়াছিল তাহার পরিমাণও নিতান্ত কম নয়। অথচ এ নেশা তাঁহাকে বাল্য বয়স হইতে পাইয়া বসে নাই। এমন কি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রাবস্থাতেও তাঁহার মন ছুটিত গ্রন্থাগারের নিভৃত কক্ষের দিকে নয়, ঘোড়দৌড়ের মাঠের পানে। বাজী জিতিবার জন্য তিনি একটি নিয়ম আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তাহাতে ক্রমাগত হারার পর যেবার এমন জয় হইল যে সমস্ত পূর্ব্বের ক্ষতি পূরণ হইবার কথা, সেবার বুক-মেকারটি বিনা বাক্যব্যয়ে নিরুদ্দেশের পথে সরিয়া পড়িল। ঋণ শুধিলেন মানরোর মাতাঠাকুরাণী; মানরোর মন হইতেও ঘোড়দৌড়ের নেশা ছুটিয়া গেল।

এমন সময় মানরো শেলির দেখা পাইলেন, অর্থাৎ শেলির কাব্যের সহিত তাঁহার মনের সংযোগ সংস্থাপিত হইল। যুবকচিত্তের উপর শেলির কবিতার প্রভাব কি প্রচণ্ড তাহা কে না জানে। মানরোর জীবনের ধারা গেল বদলাইয়া। বাঁচিয়া থাকাটা

আর সহজ ছেলেখেলা রহিল না, হইয়া উঠিল যেন একটা কঠিন ব্রত-সাধন। কেম্ব্রিজ হইতে পাস করিয়া বাহির হইয়া তিনি ইউরোপের নানাস্থানে নানা কাজে-অকাজে ঘুরিয়া কাটাইলেন, বিবাহ করিলেন, পুত্রসন্তান জন্মিল, কিন্তু কিছুতেই শান্তি পাইলেন না। বয়সে বৃদ্ধ না হইলেও সদাই আত্মচিন্তায় ম্লান, সংসারের কোনো কিছুতেই মনস্তুষ্টি নাই; নূতন দেশের নূতন আকাশের তলে উন্মত্ততর কিছু যেন তাঁহার উদ্‌ঘাটনের অপেক্ষায় আছে—এই ভাব তাঁহাকে সর্ব্বদা উদ্‌ব্যস্ত করিয়া রাখিত। রাসেল-প্রমুখ সোশ্যালিষ্টগণের সংস্পর্শে আসায় এই অস্থিরতা অনির্দ্দেশ আদর্শবাদিতায় রূপান্তরিত হইল। তিনি নিরামিষাশী হইলেন, ও ছাপাখানা খুলিয়া তাহার নাম দিলেন সামুরাই প্রেস। এই নামের পিছনে কি মানরোর তখনকার মনের উদ্দামতা ধরা পড়ে না? প্রেসের প্রতিষ্ঠা হইল, বিখ্যাত পুস্তকও তাহাতে ছাপা হইল, কিন্তু উদ্দাম আদর্শবাদিতায় প্রেস চলে না। দেনার দায়ে মানরো ইংলণ্ডের বসবাস উঠাইয়া কন্টিনেণ্টে যাযাবর জীবন যাপিতে লাগিলেন। মিলান-নগরে কোন এক সময়ে সুবিখ্যাত সাহিত্যিক মরিস হিউলেট্‌-এর সহিত সাক্ষাৎ। কথাপ্রসঙ্গে মানরো ইংরাজী কাব্য সাহিত্যের দুরবস্থার উল্লেখ করায়, হিউলেট উত্তর দিলেন—"If you feel like that, for God's sake go back to England and do something."

এই বীজ বপনের ফসল ফলিতে বেশী দেরী হইল না—মানরো স্বদেশে ফিরিয়া আসিলেন, ও আসিয়া নিশ্চেষ্ট রহিলেন না। তাঁহারই সম্পাদনায় বাহির হইল—দি পোয়েট্রি রিভিয়ু। পত্রিকার ভাগ্যে খ্যাতি আসিয়া জুটিল, জুটিল না পাথেয়। সহযোগী কবিরা সম্পাদকের মতো ভাবপ্রবণ কল্পনাবিলাসী না হওয়ায় মূল্যের দাবী জানাইতে লাগিলেন, ও তাঁহাদের ক্ষুধা মিটাইবার প্রয়াসে মানরো নিজের অনেক টাকা গচ্চা দিয়া কাগজখানি হারাইলেন।

পরাজিত হইবার লোক মানরো নহেন—মৃত্যু ছাড়া কিসেই বা তাঁহাকে পরাজিত করিতে পারিয়াছে। তিনি এইবার দোকান খুলিলেন—কবিতা-পুস্তকের দোকান। এখানে কাব্যানুরাগী পাঠক এমন পুস্তক বিক্রেতার সাক্ষাৎ পাইবে যিনি কাব্য সম্বন্ধে তাহাকে মূল্যবান নির্দ্দেশ দিতে পারিবেন। কাব্যপাঠ ও কাব্য-আলোচনার বৈঠকও বসিবে, প্রয়োজন মতো কবিরা দুচারদিন এখানে বাস করিতেও পারিবেন। গিবসন, ওয়েন প্রভৃতি কবির কলগুঞ্জনে এ বাণীকুঞ্জটি দিন কতক মুখরিত হইয়া উঠিল। চালাক লোকে বুঝিতে পারিল, কবিতায় উৎসাহ দেখাইতে পারিলে এখানে দোকান বন্ধের পরেও বিনা ব্যয়ে পানীয় সেবনের সুবিধা পাওয়া যায়। ইহা সত্বেও কবিরা তাঁহাকে ত্যাগ করিল। ডেভনসায়ার ষ্ট্রীটের বস্তীপল্লীর মধ্যে দোকান করায় মানরোর উদ্দেশ্য ছিল, দরিদ্র সমাজে কবিতার প্রচলন। কিন্তু ডেভন-সায়ার ষ্ট্রীটের ভারী বাতাসে কজন কবির নাসিকা তুষ্ট থাকিতে পারে? কাজেই দোকানের ব্যয় তাহার আয়কে বহু পশ্চাতে ফেলিয়া রাখিল ও মানরোর ভাগ্যে লাভ হইল দেনার ভার। তবে একটা লাভ তাঁহার হইয়াছিল। কবিতাপাঠক সমাজে তাঁহার নাম ছড়াইয়া পড়ায় বক্তৃতা করার জন্য তিনি নানাদিক হইতে আহ্বান পাইতে লাগিলেন।

এই সময়ে তাঁহার আলাপ হইল অ্যালীডা ক্লেমানটাস্কীর সহিত, যিনি পরে মানরোর দ্বিতীয় পত্নীত্বে বৃত হন—প্রথম পত্নীর সহিত বিচ্ছেদ ইতিপূর্ব্বেই সম্পূর্ণ

হইয়াছিল। তরুণী সুন্দরী অ্যালীডাও আদর্শপন্থী, জগৎ-হিতায় জীবন উৎসর্গে প্রস্তুত। তাঁহার কাম্য ছিল ডাক্তার হওয়া, ও পতিতারমণীর পুনরুদ্ধার। কবিতার প্রতিও তাঁহার বিশেষ টান ছিল। মানরোর সংসর্গে কাব্যসেবাই জীবসেবার স্থান অধিকার করিয়া লইল।

পত্নীর প্রভাবে পতির জীবনেও পরিবর্ত্তন ঘটিল। মানরো যেন এতদিনে জীবনের কেন্দ্রকে খুঁজিয়া পাইলেন। তিনি এতকাল কাব্যের বেসাতি করিয়া কাটাইয়াছেন; তাঁহার রচিত কবিতায় স্বকীয়তা অপেক্ষা পরানুচিকীর্ষার মিশ্রণ ছিল অনুপাতে প্রবলতর। স্বামীর এই ঋণগ্রস্ত ভাব ও প্রতিধ্বনিশীল ভাষা অ্যালীডার সহ্য হইত না। তাঁহার রসবোধ ছিল তীক্ষ্ণ—বিশেষতঃ হাস্যরসবোধ। রসনা ও লোচনের হাস্য-স্নিগ্ধ অন্তর্ভেদী সমালোচনায় মানরোর জীবন হইতে যেমন খামখেয়ালিত্বের যুগ অপসৃত হইল, তাঁহার কাব্যও তেমনি চলনে বলনে ঋণমুক্ত স্বাধীন হইয়া উঠিল। মানরোর যা কিছু ভালো কবিতা, অ্যালীডার প্রভাবেই লিখিত।

তরুণ নবীন কবির কাব্য প্রকাশে মানরোর উৎসাহের অন্ত ছিল না। কিন্তু নির্ব্বাচিত কবিতাগ্রন্থ প্রকাশের পক্ষপাতী হইলেও কবির জীবদ্দশায় সংগৃহীত কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের উপর মানরো ছিলেন খড়্গহস্ত। এ বিষয়ে তাঁহা প্রখর বিদ্রূপ লিপিবদ্ধ হইয়া আছে। তাঁহার মতে ইহাতে অল্পবয়স্ক কবিকে অকাল প্রাধান্য দেওয়া হয়। তাই, ১৯৩২ সালে মানরোর মৃত্যু হওয়ায় স্বামীর নির্দ্দেশানুসারে পত্নী এই কাব্য-সংগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন।

মানরো মানুষ হিসাবে অসামান্য হইলেও কবি হিসাবে অসমান। তাঁহার রচনার আদিযুগ বিশেষত্ববর্জ্জিত, স্বকীয়তাহীন। পরে যখন তাঁহার কবিতা আপন রূপ খুঁজিয়া পাইল তখন তাহা এতই স্বশীল ও আত্মকেন্দ্র হইয়া উঠিল যে পাঠকেরা আকৃষ্ট না হইয়া প্রতিহত হইতে লাগিল। কারণ, তাঁহার কবিতা তাঁহার সমকালিক কবিগণের সৃষ্টি হইতে একান্ত বিভিন্ন। ইতিহাসের বিচারে তাঁহাকে ইংরাজী সেই কবিদলের অন্তর্ভুক্ত করিতে হয় যাহাদিগকে বর্ত্তমানে "জর্জ্জীয়ান্" বলা হয়। মানরো আর যাহাই হউন জর্জ্জীয়ান নহেন। সহজ নিসর্গ-প্রীতি, সুললিত অথচ ব্যঞ্জনাহীন ভাষা, সাধারণ-বোধগম্য ভাবাবেগ—মানরোর ইহার কিছুই নাই। তাঁহার চিত্ত ছিল অতৃপ্ত, প্রার্থিত ও অর্জ্জিতের সংঘাতে সংক্ষুব্ধ। তাঁহার কবিতা এই সংক্ষোভের প্রকাশ। তাই ইহার মধ্যে আছে এমন তিক্ততা যাহা সাধারণতঃ পাঠককে আঘাত করে, আনন্দ দেয় না। এই বিষয়ে তিনি তাঁহার পরবর্ত্তী যুগের কবিগণের সমগোত্রীয়। তবু, এই তিক্ততা সত্ত্বেও তিনি কবি; কারণ তাঁহার অনুভূতি সত্য, এবং তাহার প্রকাশ অকপট ও আবেগবান। কোনো একটি কবিতায় কবির মনের ছবি সম্পূর্ণ ধরা পড়ে না। টি, এস, এলিয়ট-এর মতে Bitter Sanctuary কবিতাটি মানরোর কবিত্বশক্তির প্রতিভূকল্প; তাই সেটি এখানে উদ্ধৃত করা উচিত ছিল। কিন্তু কবিতাটির দৈর্ঘ্য তাহার উদ্ধারের প্রতিকূল। এটি কবির শেষ রোগশয্যায় লিখিত। Bitter Sanctuaryর অভাবে রোগশয্যা সম্বন্ধীয় অন্য একটি কবিতা উদ্ধৃত করা হইল।

The Sickroom

A wrinkled hag beyond the reach of gloom,

Whom even grief neglects, but on a tomb
She mumbles (which has now become this room)
Her groping moan of pain.
Pain ? Can he be that wily ghost who creeps
From corner to corner ?—Then he leaps
With pinch, thud, grip and yell ; recoils and weeps
Waiting to leap again.
Oh, the dull mirror ! Never will it hold
A new reflection, less deformed and old ?
Roll up the long scroll, far too long unrolled.
Throw down the toppling stone.
People move out, move in, all far away.
Is there a difference between night and day ?
In which direction move the hours ? But, stay !
Who groaned ? Ah, me ! Who groaned ?

রবার্ট গ্রেভস-এর পরিচয় এখানে নূতন করিয়া দেওয়া অনাবশ্যক। 'পরিচয়ে'র এক অতীত সংখ্যায় তাঁহার কবিতার সবিস্তার আলোচনা হইয়া গিয়াছে। গ্রেভস্ তাঁহার কবিতাবলী বৎসরক্রমে সাজাইয়া প্রকাশ করিতেছেন। বর্ত্তমান আলোচ্য গ্রন্থখানিকে সেই পূর্ব্বতন আলোচিত গ্রন্থের সম্প্রসারণ বলিয়া ধরা যাইতে পারে। কিন্তু সম্প্রসারণ বলিলে সবটা বলা হয় না; কারণ ইতিমধ্যে কবির মন অনেকটা পরিণতি লাভ করিয়াছে। তিনি আর আগের মতো কথা লইয়া ছিনিমিনি খেলার ছেলেমানুষীতে তৃপ্ত নহেন। ভাষা অনেক সংযত ও সুসংবদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। গ্রেভস্ সর্ব্বদাই স্বশীল ও স্বাবলম্বী। তাঁহার বিরুদ্ধে প্রতিধ্বনিশীলতার অভিযোগ আনা অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু এই আত্যন্তিক স্বশীলতাই তাঁহার কবিতাকে অনেক সময় উদ্ভট করিয়া তোলে। নূতন কিছু বলিতেই হইবে—এ-ঝোঁক যেন ভূতের মতো তাঁহাকে পাইয়া বসে। অবশ্য কাব্যমাত্রেরই উচিত পুরাতনের পুনরাবৃত্তি যথাসম্ভব পরিহার করা। কিন্তু পুরাতনের পরিহার অর্থে ইহা বুঝিলে চলে কি যে নূতন মাত্রেই নিমন্ত্রণ-যোগ্য ? ঈক্ষণার অপরূপ আলোকে চিরন্তন যেখানে সদ্য নবীনতার বিস্ময় জাগাইয়া তুলিতে পারে—সেখানেই ত কবি-প্রতিভার সার্থকতা। গ্রেভস্ নূতনত্বের পুরোহিত হইলেও এ স্বার্থকতার দাবী করিতে পারেন, তাহা মনে হয় না। তাঁহার চিত্তবৃত্তি অতিসজাগ, তাঁহার প্রকাশসামর্থ্য অবিসংবাদিত, ইহা সত্ত্বেও মুখ্য কবির উচ্চ আসন ক্রমাগতই তাঁহাকে এড়াইয়া যাইতেছে। অতিরিক্ত রিরংসা-প্রীতি তাঁহার মানসিক অপরিণতির অন্য একটি লক্ষণ। গ্রেভস্-এর এই ধরণের লেখার মধ্যে কেমন একটা জেদ আছে, বাহাদুরীর আড়ম্বর আছে। জেদ লইয়া, আড়ম্বর লইয়া আর যাহাই হওয়া যাউক না কেন, কবি হওয়া চলে না। কবির চাই বিনতি, স্বীয় মানসলব্ধ অভিজ্ঞতার নিকট একান্ত আত্মনিবেদন। এই বিনতি ও আত্মনিবেদনের অভাবেই গ্রেভস্ আপন সম্ভাব্য প্রাপ্য হইতে আজও বঞ্চিত রহিয়াছেন। তিনি যে মাঝে মাঝে নিজেকে জাহির করার লোভ সংবরণ করিতে পারেন তাহার প্রমাণ নিম্নোদ্ধৃত সুন্দর কবিতাটিতে পাওয়া যায়।
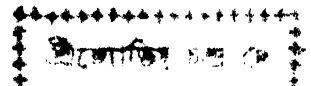
On Rising Early

Rising early and walking in the garden
Before the sun has properly climbed the hill,
His rays gilding the roof, not yet the grass
That is white with dew still,

And not enough breeze to eddy a puff of smoke
And out in the meadows a thick mist lying yet
And nothing anywhere ill or noticeable—
Thanks indeed for that.

But was there ever a day with wit enough
To be always early, to draw the smoke up straight
Even at three o'clock of an afternoon,
To spare dullness or sweat ?

Indeed, many such days I remember
That were dew-white and gracious to the last,
That ruled out meal-times, yet had no more hunger
Than was felt by rising a half-hour before breakfast,
Nor more fatigue. Where was it then I wandered
A stranger to my yesterdays, with steps
Untaught by the sage past ?

সমস্ত গ্রন্থখানি পড়িতে গিয়া দুঃখ হয় যে কবি এভাবে লিখিতে পারেন তিনি কেন ইহাতে সন্তুষ্ট থাকিতে না পারিয়া The Succubus-শ্রেণীর কবিতা লিখিতে ও ছাপিতে প্রলুব্ধ হন। আমি ইহা বলিতে চাহি না যে ও-কবিতায় কবির কোনো শক্তিরই প্রকাশ নাই। কিন্তু শক্তির অপেক্ষা শক্তির ব্যবহার দিয়াই কি মানসিক উৎকর্ষের বিচার হয় না ?

অনেকের মতে, নির্ল্লজ্জ অসঙ্কোচ রিরংসাপ্রবণতা ফ্রয়েড-প্রভাবিত আধুনিক যুগের দুরন্ত ব্যাধির দুর্ল্লক্ষণ। কিন্তু এই অভিনব মনোবৃত্তির আলোকে তিন হাজার বৎসরের পুরাতন হোমরীয় ইউলিসিস চরিত্র কিরূপ দেখায় তাহা গ্রেভস্ একটি কবিতায় বিবৃত করিয়াছেন। ইউলিসিস্-এর সে চিত্রকে হোমরের বিকৃত ব্যাখ্যা বলা চলে না বলিয়াই আমার বিশ্বাস উহার সত্যনিষ্ঠা এমন সুদৃঢ়। সেই কবিতায় গ্রেভস্ যে তীক্ষ্ণদৃষ্টি ও প্রকাশনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে তাঁহার কবিত্বশক্তির যতটা না হউক, সূক্ষ্ম সাহিত্যবিচারশক্তির স্তুতি করিতেই হয়।

গ্রেভস্ কবি হইলেও সাহিত্যের অধ্যাপক। বিভিন্নযুগের সৃষ্ট সাহিত্য লইয়া তাঁহাকে চিন্তা ও আলোচনা করিতে হয়। তাই অতীতের সাহিত্য তাঁহার মানসজীবনের নিত্যসঙ্গী। তাঁহার রচনা সেই ঘনিষ্ঠতার নিদর্শন স্বীয় অঙ্গে বহন করিতে বাধ্য। আলোচ্য গ্রন্থের শেষ কয়েক পৃষ্ঠায় গদ্য রচনা জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে, গ্রেভস্ যাহাদের নাম: দিয়াছেন—As It Were Poems। তাহা হইতে যে খণ্ডাংশটুকু তুলিয়া দেওয়া যাইতেছে, তাহাতেই তাঁহার সাহিত্যপ্রীতির ব্যাপ্তি ও কল্পনার বিলাস লক্ষিত হইবে।

In the legend of Troy where was I ?

I was in the person of Ajax the son of Telamon. And Odysseus cheated me of the prize of dead Achilles' arms. For he suborned Trojan captives to testify that it was he who of us all had done their city the most harm. Angered by this, I drove Troy's whole forces single-handed from the field. But he covertly disposed slaughtered sheep in the place of the dead men that I had strewn behind me and so fastened on me the name of madman.

In the legend of Robin Hood and his Merry Men, where was I ?

I would prefer to be written down for the Sheriff of Nottingham, Robin's enemy. But the natural truth is that I played the part of jolly Friar Tuck. I took and gave great buffets. I was the gross fool of the greenwood.

In the legend of Jesus and his companions where was I ?

I was not Jesus himself, I was not John the Baptist, nor Pontius Pilate, nor Judas Iscariot, nor even Peter. I was Lazarus sickening again in old age long after the Crucifixion, and knowing that this time I could not cheat death.

In the legend of Tobit, where was I ?

I was not old Tobit himself, nor his kinsman Raguel, nor Sarah, Raguel's daughter, nor the angel Raphael, nor the devil Asmodaeus. I was Tobias, in the sight of the towers of Ecbatana, with the gall, heart and liver of the fish in a pouch by my side.

রবার্ট গ্রেভস্‌-এর পর এণ্ড্রু ইয়ং পড়িতে বসিলে হঠাৎ বিশ্বাস করা কঠিন হয় যে ইয়ং আজকালকার কবি, যে তাঁহার প্রথম কাব্যগ্রন্থ "উইণ্টার হারভেষ্ট" মাত্র কয়েক মাস হইল প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা সত্য যে গ্রন্থাকারে প্রকাশের পূর্ব্বেও ইয়ং-এর কয়েকটি ইতস্তত প্রকাশিত কবিতা রসগ্রাহী পাঠকের কৃতজ্ঞ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল, কিন্তু তাহাদের সংখ্যা এতই স্বল্প যে নগণ্য বলিলেই হয়। কাব্য জগতে ইয়ং-এর প্রথম লক্ষ্যযোগ্য আবির্ভাব এই গ্রন্থে। অথচ ইহাতে মন্মথ-মথিত বিংশ শতাব্দীর প্রভাব নাস্তিতে প্রকট। গ্রেভস্‌-এর বৈপরীত্যে মনে হয় ইঁহার কবিতা রচিত যেন মদনভস্মের পরের যুগে। রিরংসার কোনো উল্লেখ ইহাতে নাই। গভীর প্রেমের বেদনা-সঞ্জাত যে ম্লানিমা ইহাকে করুণ করিয়া তুলিয়াছে তাহাও মিশিয়া গিয়াছে নিসর্গ-আরাধনার পবিত্র প্রশান্তির মধ্যে। প্রকৃতিপূজন ইংরাজী কাব্য-সাহিত্যের একটি প্রধান—হয়ত প্রধানতম—ধারা ; ইংলণ্ডের আকাশে বাতাসে যেন কবিত্বের অনুপ্রেরণা বৈজ্ঞানিক কল্পিত ইথারের মতো সর্ব্বত্র ছড়াইয়া আছে, কবিরা যাহাকে আপন নিঃশ্বাসের মতো বোধাতীত সহজভাবে গ্রহণ করিয়া তেমনি সহজে কাব্যে প্রশ্বাসিত করিতেছে। ভাবিতে অবাক্ লাগে ছোট একটি দ্বীপের একটি অংশের সবুজ-শোভা জগতের শ্রেষ্ঠ নিসর্গ-সাহিত্যের অফুরন্ত উৎস। যুগের পর যুগ কত না কবি এ সৌন্দর্য্যের পাত্রে প্রাণ ভরিয়া গণ্ডূষ করিয়াছেন, তথাপি সে পাত্রের পূর্ণতায় ত্রুটি নাই। ইংরাজী কাব্য-সাহিত্যের এই বহুপদসেবিত পথে এণ্ড্রু ইয়ং নবীনতম পথিক। ইঁহার গ্রন্থের নাম-সূচিকার উপর চোখ বুলাইয়া গেলে দেখা যায় এই সব নাম—In December, In Moonlight, The Spider, An Old Road, The Last Leaf, The Dead Bird, The Flood, The Burnt Leaves

ইত্যাদি। ইয়ং-এর বিশেষত্ব এইখানে যে তিনি গ্রেভস্-এর মতো অভিনবত্বের প্রয়াসী না হইয়াও স্বতন্ত্র কবি। সে স্বাতন্ত্র্য চমকপ্রদ নয়, প্রীতিপদ, অনাড়ম্বর ঐশ্বর্য্যে গরীয়ান্। তাঁহার বর্ণনার হাত একেবারে মন্ত্রসিদ্ধের মতো নিখুঁত। আমাদের চিরপরিচিত বিশেষ্য বিশেষণগুলির অন্তরালে কত যে বিস্ময়কর রূপোৎঘাটিনী শক্তি থাকিতে পারে তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে নীচের কবিতাটিতে :—

The Old Tree

The wood shakes in the breeze
Lifting its antlered heads ;
Green leaf nor brown one sees
But the rain's glassy beads.

One tree-trunk in the wood
No tangled head uprears,
A stump of soft touchwood
Dead to all hopes and fears.

Even the round-faced owl
That shakes out its long hooting
With the moon cheek-a-jowl
Could claw there no soft footing.

Riddled by the worm's small shot,
Empty of all desire,
It smoulders in its rot,
A pillar of damp fire.

তুচ্ছ, সর্ব্বদা অবহেলিত ঘটনাও—এত তুচ্ছ যে তাহাকে ঘটনা বলা চলে কিনা সন্দেহ — ইয়ং-এর নিকট কত অর্থপূর্ণ হইতে পারে দেখিতে পাই যখন পড়ি

Whether that popinjay
Screamed now at me or his mate
I could not rightly say,
Not knowing was it love or was it hate.

I hoped it was not love
But hate that roused that gaudy bird ;
For earth I love enough
To crave of her at least an angry word.

এই অনুচ্চকণ্ঠ কবির আভরণহীন শুক্লতা-অভিসারী কবিতাগুলির সম্বন্ধে আর অধিক বাক্যব্যয় অশোভন।

শ্রীনীরেন্দ্রনাথ রায়

"নীললোহিতের আদি প্রেম"—শ্রীপ্রমথ চৌধুরী, প্রঃ কুন্দ ভাদুড়ী, ৯নং রুস্তমজী ষ্ট্রীট, বালীগঞ্জ।

"প্রকৃতির পরিহাস"—শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়, প্রঃ ডি এম লাইব্রেরী।

"আগামী বারে সমাপ্য"—মোহাম্মদ কাসেম; প্রঃ এম্পায়ার বুক হাউস, ১৫নং কলেজ স্কোয়ার।

"দেবারু"—শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত; প্রঃ বরেন্দ্র লাইব্রেরী।

"সোনার কাঠী"—শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু; প্রঃ কুন্দ ভাদুড়ী, ৯নং রুস্তমজী ষ্ট্রীট।

"নীললোহিতের আদি প্রেম"-খানি হাতে নিয়েই আমার মন এই আশায় উৎফুল্ল হল যে আবার সেই শ্রেণীর অপূর্ব্ব গল্প পড়তে পাব যা চৌধুরী মহাশয়ের নীললোহিতের স্বয়ম্বরে রূপ ও প্রাণ নিয়ে আত্মবিকাশ করেছিল। দেখি ঠিক তাই, ছ'টি গল্প, তার মধ্যে একটি নীললোহিতের কিন্তু বাকী পাঁচটি নীললোহিতের না হলেও সেই বহুমূল্য চরিত্রের যা সূক্ষ্ম হতেও সূক্ষ্মাতীত হয়ে বাহ্য যাচাই ও বিশ্লেষণে ধরা দেয় না কিন্তু তবু কেমন করে আপনার আন্তরিক গুণে অবলীলাক্রমে সাহিত্য-রসিকের কাছে গুণগ্রাহিতার শ্রেষ্ঠ দাবী জাহির করে বসে! প্রমথ বাবুর গল্প-সাহিত্যের দান সম্বন্ধে সম্যক বিচার কে কবে করবেন বলতে পারি না,—অন্ততঃ আজও ত তার কোন বিশেষ চেষ্টা হল না। না হোক সাহিত্য-রসিকের পক্ষ হতে কোন ভুল-ভ্রান্তি হবার সম্ভাবনা নেই যে কোথায় প্রমথ বাবুর গল্পের প্রকৃত সম্পদ নিহিত রয়েছে। প্রথম যখন চৌধুরী মহাশয়ের চারইয়ারী কথা বার হয়েছিল তখন আশ্চর্য্য লেগেছিল এর গল্প-সাহিত্যে নূতন রস-বৈভব রচনা করবার প্রেরণায় ও দক্ষতায়। সে সময়ে গল্পের মূর্ত্তি ও গল্পের আদর্শ বা প্রথা নিবদ্ধ ছিল একদিকে রবীন্দ্রনাথের ও আর একদিকে প্রভাত বাবুর গল্পে, তারই ভিতর থেকে বেরিয়ে এল চারইয়ারী কথা নূতন প্রথা নূতন রূপ সৃষ্টি করবার সাহস সংগ্রহ করে। আমি ত মনে করি তখনও যেমন ছিল রবীন্দ্রযুগ আজও মূলতঃ চলেছে সেই যুগই, কিন্তু ওরই মধ্যে চৌধুরী মহাশয়ের গল্পে এমন কিছু আছে যা নূতন, যা শুধু পুরাতনের পদানুসরণ নয়।

সাহিত্যে স্থায়িত্বের দাবী তারই আছে যে এই নূতনকে পরিকল্পনা ও সৃজন করতে পারে; কেননা সাহিত্যে ও তথা আর্টে সম্ভবপর রূপ-প্রকরণ হল অশেষ; কিন্তু প্রকৃতির ক্ষেত্রে ও তথা দর্শন বিজ্ঞানে তা অপরিসীম হলেও অশেষ নয়। নূতনেই অশেষ উন্মেষিত হয়; পক্ষান্তরে প্রাচীনের পদানুসরণ অশেষকে বিলুপ্তির সর্ব্বনাশ থেকে বাঁচিয়ে রাখে। সেইজন্যে নূতনকে আমরা সব সময়ে হঠাৎ চিনে উঠতে পারিনে, চিনতে পারি তখন যখন তার সালঙ্কার পুনরাবৃত্তি হয়ে তা বহু হয়ে বিকশিত হয়। এই অশেষকে নূতনরূপে ব্যক্ত করার গৌরবের দাবী রয়েছে চৌধুরী মহাশয়ের গল্প-সমুদয়ে। চারইয়ারী কথা ও তার টেকনিকের বহু পুনরাবৃত্তি বহু অনুকরণ হয়েছে, এতই হয়েছে যে এখন তার মেরুদণ্ডহীন বাহ্যিক অনুকরণ তীব্র বিতৃষ্ণা জাগায়, কিন্তু নীললোহিত সিরিজকে এখনও কেউ আত্মসাৎ বা অনুকরণ করতে পারেন নি,—এতই তার অভিনবত্ব।

নীললোহিত গল্প-সমুদয়ের প্রধান লক্ষণ এই যে এগুলি একেবারে অলীক অথচ সত্যের মতই খাঁটি। অলীক মানে সম্পূর্ণ ভাবে অলীক, প্রস্তাবনাতেই তা অলীক।

এইখানে অন্যান্য গল্পের সঙ্গে নীললোহিতের গল্পের কত তফাৎ; অন্যান্য গল্প—অর্থাৎ বাংলা সাহিত্যের আধুনিক গল্প,—প্রাণপণে বোঝাবার চেষ্টা করে যে তারা অলীক নয় তারা রিয়ালিষ্টিক, তারা সাইকোলজিক্যাল, তারা সায়েন্টিফিক; আর নীললোহিতের গল্প পদে পদে থমকে দাঁড়িয়ে পাঠকের কাঁধে হাত দিয়ে নিজেকেই রহস্য করে বলতে পারে,—কেমন এ অলীক কাহিনী তোমার মনোরঞ্জন করল কি? ভাষায় ঘুমপাড়ানি কাব্যি নেই, অলঙ্কার অনুপ্রাসের বাহুল্য নেই, আছে স্বচ্ছতা ও অপূর্ব্ব সরসতা। এ রকম লেখা সম্বন্ধে বলা যেতে পারে, যে-আত্মাপসরণ গল্প সাহিত্যের প্রধানতম গৌরব সেই রকম আত্মাপসরণের আদর্শস্থানে পৌঁছেছে এই লেখা। পাঠক এ গল্পগুলিকে গ্রহণ করতে পারে সেই রকম অবাধে যেমন সে তুলে নিতে পারে তার নিজের প্রিয় বইখানিকে। অথচ গল্পগুলি মূলেই অলীক, তার নায়িকা কোথাও সংস্কৃত সাহিত্যের নায়িকার মত স্বয়ম্বর সভায় এসে আগন্তুকের গলায় মালা পরিয়ে দেয়, কোথাও বা সে ন'বছরের বালিকা হয়েও পূর্ণ প্রেমে বালক প্রণয়ীকে দেখে নয়ন আনত করে। তার মায়ামন্ত্রে প্রাচীন কিংবদন্তী জড়প্রকৃতিকে রূপান্তরিত করে, তার অদম্য ইঙ্গিতে মানসিক বিকার সত্যরূপে সঞ্জীবিত হয়ে স্থলে জলে পর্ব্বতে অরণ্যে নায়ককে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়ায়। আমার ক্ষোভ নেই যে, বলতে পারলাম না চৌধুরী মহাশয়ের গল্প গী দ মোপাসাঁর মত বা চেকভের মত,—এতে কোন অগৌরব নেই যে তাঁর গল্প একা তাঁরই মত; আর আমার বিশ্বাস যে যেদিন সব দেশের শ্রেষ্ঠ গল্প সুচারুরূপে এক ভাষায় একত্রিত হবে সেদিন চৌধুরী মহাশয়ের গল্প আপন প্রতিভায় তাদের মধ্যে উজ্জ্বল নক্ষত্ররূপে বিরাজ করবে। অথচ স্বদেশে প্রমথবাবুর গল্প আজও যোগ্য সমাদর পেল না!

অনেক কথাই হয়ত বলা হল অথচ নীললোহিতের আদি প্রেম সম্বন্ধে হয়ত বিশেষ কিছুই বলা হলনা। প্রকৃতপক্ষে পাঠকের ওপর সে ভার থাকাই ভাল। আমি শুধু সংক্ষেপে এটুকু বলে নি যে বইটির "ট্রাজেডির সূত্রপাত" গল্পে প্রৌঢ় নৃপেন ও ষোড়শী প্রতিমার মধ্যে প্রেম সঞ্চারণের কাহিনী বাংলা গল্প সাহিত্যে অভূতপূর্ব্ব। "অবনীভূষণের সাধনা ও সিদ্ধি"তে সেই subtlety আছে যা নীললোহিত গল্প সিরিজের প্রকৃষ্ট বৈশিষ্ট্য। পড়ে মনে হয় এতে গল্প কই, এ ত বলার ঢং,—কিন্তু এই কথাই ত নীললোহিত সিরিজের বার্ত্তা,—হোক না গল্প-ভাগ সামান্য, অকিঞ্চিতকর, অপ্রাকৃত, তার বলার ঢংই তাকে প্রথম পংক্তিতে বসায়। প্রথম গল্প "নীললোহিতের আদি প্রেমে"র পাঁচ ছ বছরের নায়িকার কথা আগেই বলেছি। দুটি ভ্রমণকাহিনী আছে,—ঠিক গল্প নয়, কিন্তু গল্প কয়টির মতই অনবদ্য। বেশী কথা বলতে চাইনা, চৌধুরী মহাশয়ের বীরবলের হালখাতা কি সনেট পঞ্চাশৎ কি গল্প-সমুদয় কোনটি তাঁর শ্রেষ্ঠ অবদান সে কথা আমার কাছে এক রকম মীমাংসিত হয়ে গেছে।

আমরা এতদিন অন্নদাশঙ্করের উপন্যাস ভ্রমণ কাহিনী পড়ে আসছিলাম, এবার তাঁর প্রথম গল্পের বই "প্রকৃতির পরিহাস" পড়ে প্রথম বুঝতে পারলাম যে অন্নদাশঙ্করের প্রকৃত genius রয়েছে তাঁর গল্পের হাতে। প্রকৃতির পরিহাসে অন্ততঃ তিনটি গল্প আছে—উপযাচিকা, স্ত্রীর দিদি ও স্তনদ্বয়, যা নিটোল পারিপাট্যে, ভাষায় ও অব্যর্থতায়, বোধহয়, বাংলা গল্পে তুলনাহীন বল্লেও অন্যায় হয় না। গল্পগুলি শ্লেষাত্মক, শ্লেষাত্মক হলেও করুণা থেকে বঞ্চিত নয় আর বিশেষ উপভোগ্য হল এর ভাষা ও সংক্ষিপ্ত strokes। আমাদের জীবনে রোমান্স অতি অপ্রচুর বরং তার পরিধির মধ্যে শ্লেষের

দাবীই বেশী, আমাদের গল্প লেখকরা যদি একথা হৃদয়ঙ্গম করেন তবে তাঁদের সম্মুখে উন্মুক্ত উর্ব্বর জমি বিস্তৃত থাকবে। এ সম্পর্কে আমার মনে হয় একটা শঙ্কা আছে এই যে অন্নদাশঙ্করের ব্যঙ্গ মাঝে মাঝে মাত্রা ছাড়িয়ে যায় ও মাঝে মাঝে অযোগ্য অক্ষম অপাত্রে তাঁর শ্লেষের খড়্গা পতিত হয়। সে যা হোক, শ্লেষই যে চরম নয় একথা গ্রন্থকার খুব ভাল করেই বুঝেছেন, অন্ততঃ উপযাচিকায় তার চমৎকার নিদর্শন পাই। শ্লেষের মধ্যেও যে নিবিড় ট্রাজেডি সম্পাদন করেছেন, বাঙ্গালী মেয়ের যে বিদ্যুদ্দীপ্তি দেখিয়েছেন তা যে কোন শ্রেণীর পাঠককে চমৎকৃত করবে। গল্পগুলি—অন্ততঃ যে তিনটির উল্লেখ করেছি, সর্ব্বাংশে আধুনিক, সেজন্যও আমি গ্রন্থকারকে ধন্যবাদ দি। আর এক কথা, গল্পগুলি খুব বেশী করে প্রভাত বাবুর গল্পের কথা মনে করিয়ে দেয় কিন্তু প্রভাত বাবুর গল্পের চেয়েও অন্নদাশঙ্করের গল্প সূক্ষ্মগুণাশ্রিত; আমার মনে হয় এঁর সম্মুখে গল্প সাফল্যের ভবিষ্যৎ অবারিত রয়েছে।

হিন্দু সমাজে যেমন রোমান্সের ক্ষেত্র অল্প সে তুলনায় বাংলা মুসলমান সমাজে হয়ত সে ক্ষেত্র অপেক্ষাকৃত প্রসারিত। মোহাম্মদ কাসেমের নূতন ও প্রথম উপন্যাস "আগামী বারে সমাপ্য" তরুণী সুফিয়ার যে রোমান্টিক কাহিনী চিত্রিত করেছে তার লাবণ্য বর্ণগন্ধময়;—তা পাঠক শ্রেণীর মনোহরণ করবে। এমন অনুরাগে ভরা মেয়ের গল্প-উপন্যাসেও যে সাক্ষাৎ পাওয়া যায় এ কম আশা আনন্দের কথা নয়। গ্রন্থকার নায়ক ওসমানকে শেষে একেবারে হঠাৎ দারুণ হৃদয়হীন করেছেন; আমার কাছে এটা একটু অপ্রত্যাশিত লেগেছে, কেননা ওসমানের এ রকম আকস্মিক পরিবর্ত্তনের জন্যে গ্রন্থকার পাঠককে কোথাও প্রস্তুত করেন নি।

আমাদের জীবনে রোমান্সের অবসর অপ্রচুর হলেও শ্রীযুক্ত চারু দত্তের "দেবারু"র মালতীর জীবনে তা হয়েছিল পরিপূর্ণতম, সার্থক। মালতী দুলের মেয়ে, সদ্যমুকুলিত কুসুম, বনের নয় বাগানের নয়, বোধ হয় নন্দন-বনের; রায়নগরের জমীদারের ভালবাসা সে পেয়েছিল ও নারীজাতির যত শ্রেষ্ঠ ভালবাসা, শ্রেষ্ঠ প্রেম তা উজাড় করে সে রাজাবাবুর চরণে ঢেলে দিয়েছিল। স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপির প্রচলিত অর্থ যাই হোক তার একটা অর্থ নিশ্চয় এই যে রমনী আপন স্বোদ্ভিন্ন হৃদয় বৃত্তিতেই রত্নসদৃশ; হোক না সে দুলের ঘরের, হোক না সে আঁস্তাকুড়ের। মালতী সেই হৃদয়-বৃত্তিতেই রত্ন-শ্রেষ্ঠ। সংস্কৃত সাহিত্যে শকুন্তলা আছে, বাংলায় কুন্দনন্দিনী, আশা, সাবিত্রী আছে, কিন্তু বাংলার সাহিত্যে মালতীর দোসর নেই; আমি এজন্য বলছি একথা যে যদিও দুলে সমাজে বা নিম্ন সমাজে বা উচ্চ সমাজের মধ্যে এমন প্রেম-হৃদয়বৃত্তি-সম্পন্ন রমনীর সাক্ষাৎ বাংলা সাহিত্যে বহু পাওয়া যায়, তবু যেখানে নিম্ন সমাজের মালতীকে উচ্চ সমাজের রাজাবাবু ও রাজপরিবারের কাছে পরীক্ষায় পড়ে হৃদয়বৃত্তিতে উত্তীর্ণ হতে হয়েছে, সেখানে মালতীর দোসর বাংলা সাহিত্যে খুঁজে পাওয়া যাবে না। নিয়তির প্রহার মালতীর ওপর কম হয় নি, কিন্তু সে কথা আমি উত্থাপনই করলাম না। মালতী যেমন, মালতীর সন্তান দেবারুও তেমনি অপূর্ব্ব সুধামণ্ডিত। এখানে আজ আমার অবসর এতই অল্প যে দেবারু গল্প পাঠককে উপহার দেবার ভার নিতে পারলাম না, শুধু এইটুকু বলে ক্ষান্ত হই যে মালতী যখন অকালে দেহত্যাগ করল ও দেবারু যখন যৌবনেই বৈষ্ণব ধর্ম্ম বরণ করে গোবিন্দদাস নাম নিয়ে পথে পথে নামকীর্ত্তন করবার জন্য বেরিয়ে পড়ল, তখন আবার তাকে প্রেমের ফাঁসে বাঁধল অতি আধুনিকা মিস

চক্রবর্ত্তী—; এখানেও দত্ত মহাশয় দেখিয়েছেন সেই স্ত্রীরত্নং,—সে রত্ন হৃদ-বৃত্তিতেই মহৎ—কোন বাহ্যিক কালচারের খোলস তার রত্নহৃদয়কে নিষ্প্রভ করতে পারে না। বইখানি senarioর পক্ষে এতই চমৎকার যে আমি আশা করি অচিরে এটি ফিল্মে তোলা হবে।

হাতের কাছে এসেছে শিশুদের জন্য লেখা মণিবাবুর সোনার কাঠি; এমন সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ছেলেদের গল্পের বই আগে আমি পড়ি নি।

শ্রীগিরিজাপতি ভট্টাচার্য্য

Goldsworthy Lowes Dickinson.—By E. M. Forster (Edward Arnold & Co.)

বিখ্যাত ঔপন্যাসিক কোনান্ ডয়েল্-এর 'দি হাউণ্ড অফ্ দি বাস্কার্ভিল্স্' অতি ভয়াবহ বই। কিন্তু এই বইতে একটি অতি কৌতুকপ্রদ ব্যক্তির বর্ণনা আছে। তাহার একমাত্র কাজ ছিল মামলা করা—কখনো ইহার নামে, কখনো উহার নামে, কখনো এ কারণে, কখনো সে কারণে। কিন্তু এই সকল বিচিত্র কারণের মধ্যে একটি মূল সূত্র ছিল—ব্যক্তিগত অধিকারের প্রতিষ্ঠা। এই মূলসূত্রের প্রয়োগে সে পরের বাগানের মধ্যে সরকারী সদর রাস্তার দাবী করিত এবং নিজের বাগানে অপরের পদার্পণ দেখিলেই তাহার ব্যক্তিগত অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য আদালতে দৌড়াইত। বিখ্যাত উপন্যাসিক ই-এম্-ফর্স্টার রচিত গোলড্স্ওয়ার্দ্দী লাওয়েস্ ডিকিন্সন্-এর জীবনী পাঠ করিয়া 'হাউণ্ড অফ্ দি বাসকার্ভিল্স্'এ বর্ণিত এই আইন-গতপ্রাণ ব্যক্তিটির কথা কেন মনে পড়িল তাহার কারণ এই যে ডিকিনসন্ও ব্যক্তিগত অধিকারবাদে বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া সময়ে সময়ে এমন সব কৌতুকপ্রদ বিরোধী মতামত প্রকাশ করিতেন যাহার মধ্যে কোনো সঙ্গতি খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। হয়তো পৃথিবীর কোনো মহাপুরুষেরই কার্য্যাবলী বা মতামত ন্যায়শাস্ত্রসম্মত সঙ্গতির বন্ধনরজ্জুতে সংগ্রথিত করা যায়না। সুতরাং, এই দিক দিয়া দেখিতে গেলে, ডিকিনসন্কে মহাপুরুষদের পর্য্যায়ভুক্ত করিতে কোনো বাধা নাই। কিন্তু মহাপুরুষদের জীবনের আর আর কোনো লক্ষণই ফর্স্টার-বর্ণিত ডিকিন্সন্-এর জীবনে আদৌ পাওয়া যায়না।

আমি ডিকিন্সন্কে যথেষ্ট শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিনা কেহ যেন একথা না মনে করেন। ফরস্টার ডিকিন্সন্কে যে ভাবে আঁকিয়াছেন তাহাতে তাঁহাকে শ্রদ্ধা না করিয়া পারা যায়না। তাঁহার জীবনী পড়িতে পড়িতে বারবার মনে পড়ে ভারতবর্ষের প্রাচীন যুগের তপোবনবাসী মুনিঋষিদের কথা। ডিকিন্সনের তপোবন ছিল কেমব্রিজ। ১৮৮৪ সালে ২২ বৎসর বয়সে তিনি বিখ্যাত কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তিন বৎসর অধ্যয়ন অন্তে উপাধিলাভ করেন এবং তাহার তিন বৎসর পরে এই বিশ্ববিদ্যালয়েই স্থায়ী ভাবে অধ্যাপনার কার্য্যে নিযুক্ত হন। তাহার পর ১৯৩২

সালে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত দীর্ঘ পঞ্চাশবর্ষ তাঁহার প্রায় কেমব্রিজেই কাটে। তিনি চিরকুমার ছিলেন, ভোগবিলাসে তাঁহার আসক্তি ছিলনা, জগতের মঙ্গলচিন্তায় তাঁহার নিঃসঙ্গ জীবনের শূন্যতা পূর্ণ হইত। তদুপরি ছিলেন তিনি অত্যন্ত স্নেহশীল বন্ধু। মিষ্টার ফর্‌স্টার্‌-এর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। এহেন লোককে যদি মুনিঋষিদের সহিত তুলনা না করি, তাহা হইলে কাহাকে করিব?

কিন্তু তপোবনবাসী মুনিঋষিদের কয়জন সত্যই মহাপুরুষ ছিলেন? যে সকল অগণিত ব্যক্তি এই ভাবে তপশ্চর্য্যায় দিন কাটাইতেন তাঁহাদের বেশীর ভাগেরই জীবন কি চিরাচরিত আচার ও প্রথার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতনা? ইঁহাদের জীবনে অধ্যাত্ম সম্পদের অভাব ছিলনা এবং এই মহান্‌ সম্পদের অনুপম মাধুর্য্য ও জ্যোতি তপোবন হইতে বহুদূরে নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে বিকীর্ণ হইত। তৎকালীন অভিজাত ও ইতর সকল শ্রেণীর লোকের জীবন এই মাধুর্য্যের ও জ্যোতির স্পর্শ পাইত। এই ভাবে শ্রেণীর সহিত শ্রেণীর যোগসাধন হইত—সমাজের বন্ধন দৃঢ়তর হইত। কিন্তু যে-সমাজের বন্ধনকে তাঁহারা দৃঢ়তর করিতেন তপোবনবাসী মুনিঋষিরাও ছিলেন সেই সমাজেরই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ—সেই একই রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আবেষ্টনের অনিবার্য্য ফল। মাঝে মাঝে দুই একজন তপোবনবাসী বা লোকালয়বাসী ব্যক্তির উদয় হইত যাঁহাদের বিরল ব্যক্তিত্ব প্রচণ্ড শক্তিতে এই আবেষ্টনের দৃঢ় বন্ধন অস্বীকার করিতে পারিত এবং হয়তো দৃঢ়তর বন্ধনের সৃষ্টি করিত। ইতিহাসে বা কিম্বদন্তীতে আজ তাঁহারাই স্মরণীয় হইয়া আছেন।

ডিকিন্‌সন্‌কে এই জাতীয় স্মরণীয় পুরুষদের পর্য্যায়ভুক্ত করা কিছুতেই চলেনা—ব্যক্তিত্ববাদের সমর্থনে মহাপুরুষোচিত অসঙ্গতিসত্ত্বেও। কেননা, ডিকিন্‌সন্‌ যে-ব্যক্তিত্ববাদের সমর্থন করিতেন তাহাও কালধর্ম্মের একটি বিশিষ্ট রূপ মাত্র। একদা ইওরোপে—বিশেষভাবে ইংল্যাণ্ডে—এই ব্যক্তিত্ববাদ অত্যন্ত উগ্র হইয়া উঠিয়াছিল। দলে দলে নরনারী ইহার সমর্থন করিয়া আদর্শনিষ্ঠার অতিশয্যে অত্যন্ত উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেন। কিন্তু ইহার রূপ ইতিমধ্যেই অনেকখানি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। কাল-ধর্ম্মের স্রোত আজ কোন দিকে বহিতেছে তাহা বলা শক্ত। ব্যক্তিত্ববাদের পরিপন্থী একাধিক শক্তির সঙ্ঘর্ষে আজ সমগ্র মানবসমাজ আলোড়িত। তাই আজ ডিকিন্‌সনের মতো যাঁহারা এখনো ব্যক্তিত্ববাদের বানচাল তরী আশ্রয় করিয়া পরম আশ্বস্তিতে জীবনযাপন করিতেছেন তাঁহারা ভাগ্যবান কি দুর্ভাগ্য তাহা জানিনা। কিন্তু বর্ত্তমান বা পরবর্ত্তী কোনো যুগে তাঁহাদের কথা স্মরণ রাখিবার প্রয়োজন পৃথিবীর লোকের আছে বলিয়া মনে হয়না। তাঁহারা তাঁহাদের মানসলোকের তপোবনে দিনযাপন করুন। এই মানসলোকের অবস্থান নৈমিষারণ্যে না কেমব্রিজে তাহা অবান্তর। বাহিরের বিপুল পৃথিবীর আঘাত সংঘাত সম্বন্ধে তাঁহারা উদাসীন নন তাহা জানি। মাঝে মাঝে বিশ্বহিতব্রতে তপোবনের বাহিরে তাঁহাদের আবির্ভাব হয়। দুর্ব্বলের প্রতি প্রবলের অত্যাচারের বিরুদ্ধে তাঁহারা প্রতিবাদ করেন, ন্যায়ের শক্তি যে পরিণামে জয়ী হইবে এই বাণী মানবজাতির কর্ণে তাঁহারা অহরহ বর্ষণ করেন। কিন্তু তাঁহাদের মনোবৃত্তি তপোবনের, তপোবনের অঙ্গনে তাঁহাদের দৃষ্টি অত্যন্ত স্নিগ্ধ, মানবজাতির মঙ্গলসাধনের স্বপ্নে তাঁহাদের দিবানিদ্রা অত্যন্ত রমণীয়।

তাই দেখি, ভারতবর্ষ বা চীনদেশ, ইওরোপ বা আমেরিকা, যে-দেশের কথাই ডিকিন্‌সন্‌ আলোচনা করুন না কেন—কেম্‌ব্রিজ্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ের যে-আবেষ্টনে তাঁহার দীর্ঘজীবনের অধিকাংশ সময় কাটিয়াছে, তাহার স্বাচ্ছন্দ্য ও সৌন্দর্য্য, পাণ্ডিত্য ও আদর্শ-নিষ্ঠা, এবং সর্ব্বোপরি নিভৃত নিরাপদ নির্লিপ্ততা পাতায় পাতায় অত্যন্ত মধুর প্রলেপ বুলাইয়া দিয়াছে। তাঁহার কনফ্যুসিয়াস-বিলাসী জন চায়নাম্যান খৃষ্ট-বিলাসী জন বুলকে নির্ভয়ে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আবাহন করিতে পারে, তাঁহার 'মডার্ণ সিম্‌পোসিয়াম্‌'-এর সমাজতন্ত্রবাদী ও নৈরাজ্যবাদী, প্রচলিত রাষ্ট্রনীতি ধর্ম্মনীতি সমাজনীতি অগ্রাহ্য করিতে পারে। কিন্তু কেমব্রিজের সেই নিভৃত শান্তির নীড়ে যে-দিবাস্বপ্নের জাল বোনা হয় তাহা একটুও ক্ষুণ্ণ হয়না। কেননা, এই সকল দ্বন্দ্ব বা সঙ্ঘর্ষের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম যে এক অতি গৌরবময় সমন্বয় তাহাতে সন্দেহ কি? এবং এই সমন্বয় সাধনের জন্য রক্তপাতের প্রয়োজন নাই, বিপ্লবের প্রয়োজন নাই, এমন কি দুঃখেরও প্রয়োজন নাই—প্রয়োজন আছে বোধহয় শুধু লীগ্‌ অফ্‌ নেশ্যন্‌স্‌-এর এবং কেম্‌ব্রিজের। তাই বোধহয় মিষ্টার ফর্‌স্‌টার প্রমাণ করিবার জন্য ব্যাগ্র হইয়াছেন জাতিসঙ্ঘের প্রস্তাবনা সর্ব্বপ্রথম করেন ডিকিন্‌সন্‌, অন্তত প্রতিষ্ঠার বহুপূর্ব্বে ইহার নামকরণ যে তিনিই করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। এই লীগ্‌ অব নেশ্যন্‌স্‌-এর ভিত্তি কি যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন তাহার উত্তর 'মডার্ণ সিম্‌পোসিয়াম্‌'-এর এক বক্তার ভাষায় দেওয়া যাইতে পারে—the nexus shirt of property। ডিকিন্‌সন্‌ নিজে প্রপার্টি সঞ্চয়ের জন্য চেষ্টা করেন নাই তাহাতে কি আসে যায়? প্রপার্টির ভিত্তির উপর যে-সমাজ স্থাপিত ডিকিন্‌সন্‌ ছিলেন সেই সমাজের অপরিহার্য্য অঙ্গ। যদি একদিন জগৎ হইতে এই সমাজব্যবস্থা চিরদিনের মতন অন্তর্হিত হয় তাহা হইলে শুধু ডিকিন্‌- সন্‌ নিজে নয়, তাঁহার সমজাতীয় কোনো ব্যক্তিরই প্রয়োজন থাকিবে না।

এই প্রপার্টি-অবলম্বী সমাজের বহু ব্যক্তি যে শিল্পে, সাহিত্যে, দর্শনে, বিজ্ঞানে জগৎকে এমন সম্পদ দান করিয়াছেন যাহা হয়তো সকল কালের নানা বিরোধী সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যেও পরম দান বলিয়া গৃহীত হইবে সে কথা আমি অস্বীকার করিনা। যাঁহারা এই জাতীয় সম্পদের সৃষ্টি করিয়াছে ব্যক্তিত্ববাদে তাঁহারা বিশ্বাস করুন বা না করুন, তাঁহাদের কীর্ত্তি চিরকালের জন্য পৃথিবীতে ব্যক্তিত্বের গৌরব ঘোষণা করিবে। যে-সমাজে প্রপার্টি স্বীকৃত হয় এবং যে-সমাজে হয়না, সর্ব্বত্র তাঁহাদের আসন পাতা। ডিকিন্‌সন্‌ যদি তাঁহার রচনায় এই জাতীয় সম্পদ সৃষ্টি করিতেন তাহা হইলে এত কথা বলিবার প্রয়োজন হইতনা। কিন্তু তাহা না করিয়াও কি কারণে তিনি জগতের লোকের শ্রদ্ধার ও সম্মানের দাবী করিতে পারেন, তাঁহার জীবনী-লেখক তাহার আলোচনা করিয়া বলিয়াছেন, কোনো একটি বিশেষ বিষয়ে তাঁহার হয়তো অসাধারণ উৎকর্ষ ছিলনা, কিন্তু তাঁহার মধ্যে বহু উৎকর্ষের যেরূপ সমন্বয় দেখা যায় তাহা সত্যই অসাধারণ। হয়তো তাহা সত্য। কিন্তু এই সমন্বয় যে-সম্ভব হইয়াছিল তাহার একমাত্র কারণ মনে হয় যে ডিকিন্‌সন্‌ ছিলেন একেবারে খাঁটি বুর্জ্জোয়া। এত খাঁটি যে বুর্জ্জোয়া বলিয়া তাঁহাকে চেনা শক্ত। যে-সকল বিচিত্র উৎকর্ষ তাঁহার জীবনকে এত সুন্দর করিয়াছিল তাহা বুর্জ্জোয়া-আবেষ্টন ছাড়া অন্য কোনো আবেষ্টনে সম্ভব হইতনা।

কিন্তু, তবু, ফরস্টার-এর বই-এর পাতায় যে-মানুষটির অন্তরঙ্গ জীবন স্তরে স্তরে আমাদের নিকট প্রকাশিত হয় তাঁহাকে ভালো না বাসিয়া পারা যায় না। ইহা ডিকিনসনের বিরল ব্যক্তিত্বের গুণে, না ফরস্টার-এর লেখনীর যাদুকরী শক্তির গুণে, না আমার বুর্জ্জোয়া মনোবৃত্তির গুণে, তাহা আমি কি করিয়া বলি?

শ্রীহিরণকুমার সান্যাল

সোজন বাদিয়ার ঘাট—জসীমউদ্দীন (গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্)

ইতিপূর্ব্বে "নক্সীকাঁথার মাঠ" নামে জসীমউদ্দীনের একখানি গাথা-কাব্য প্রকাশিত হইয়াছে। সেখানে কবিকে দেখিয়াছিলাম একান্তভাবে শিল্পিরূপেই,—কিন্তু "সোজন বাদিয়ার ঘাট"-এ তিনি যেন শিল্পী পুরোপুরি নহেন। নক্সীকাঁথার মাঠের সমস্ত ঘটনা-সংস্থান ও চরিত্র-চিত্রণ তার পরিকল্পনার জন্য অপরিহার্য্য; কিন্তু সোজন বাদিয়ার ঘাট প্রারম্ভে বহু পারিপার্শ্বিক ঘটনা ও পাত্রপাত্রীর সমবায়ে সংরচিত হইয়া শেষের দিকে মাত্র নায়ক-নায়িকাকে নিয়া পরিণতি লাভ করিয়াছে, তাহাতে অন্যান্য চরিত্র ও পরিপার্শ্বের ঘটনাবলী মূল আখ্যানের বিকাশের জন্য অপরিহার্য্যরূপে সন্নিবেশিত ও বিকশিত না হওয়ায় সে-সবের পরম সার্থকতালাভ তেমন ঘটে নাই। সম্ভবতঃ কবি সেখানে গ্রাম্য সমাজকে পূর্ণাঙ্গরূপে প্রতিফলিত করিবার জন্যই মণির মুন্সী, ছমির শেখ, মদন কুলু, গদাই মোড়ল, নিতাই ধোপা প্রভৃতি বহুসংখ্যক অপ্রধান চরিত্র, এবং মোহররমের লাঠিখেলায় নমঃশূদ্র মুসলমানে দাঙ্গা, নায়েবের চক্রান্ত, মুসলমানদের বিরুদ্ধে নমঃশূদ্রদের অভিযান, পরিশেষে নমঃশূদ্র মুসলমানে মিলিয়া নায়েবকে হত্যা, ইত্যাদি ঘটনার সমাবেশ করিয়াছেন। ইহাতে অনুকূল পরিবেষ্টনের সৃষ্টি হইয়াছে নিশ্চয়ই; কিন্তু মূল আখ্যায়িকার বিকাশের প্রয়োজনে এসব চরিত্র ও ঘটনার অপরিহার্য্যতা তেমন ফুটিয়া ওঠে নাই। সমস্ত পাত্র-পাত্রীকে জড়াইয়া ঘটনার পরম্পরা যে এক বিপুল পরিণতির দিকে অগ্রসর হইতে পারে নাই, তার কারণ কবির শিল্পিজনোচিত সজাগ ও সচেতন বুদ্ধির অভাব, এবং সেজন্য গাথা কাব্য হিসাবেই হয়ত তাহার রূপ অনবদ্য হয় নাই।

গ্রামের গাথা, ছড়া, ঘাটু, জারী প্রভৃতির প্রভাব জসীমউদ্দীনের উপর অসামান্য; ফলে লোক-কাব্যের কথকতার ভঙ্গীও তাঁহার মধ্যে দেখা দেওয়া অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু নক্সীকাঁথার মাঠের স্থানে স্থানে গল্প বলার যে ভঙ্গী শিল্প-সুষমার মধ্যে প্রচ্ছন্ন হইয়াছিল, সোজন বাদিয়ার ঘাটের প্রারম্ভে তাহা প্রবলতর হইয়া দেখা দিয়াছে। "বলছি শপথ ক'রে" (৬ পৃষ্ঠা) "শপথ করে বলতে পারি" (৭ পৃষ্ঠা) "আমরা বলিতে পারি" (১১ পৃষ্ঠা) ইত্যাদি উক্তির মধ্য দিয়া কবি প্রথমে কথক-রূপে নিজেকে জাগ্রত রাখিতে প্রয়াস পাইয়াছেন; কিন্তু কাব্য যখন জমিয়া উঠিয়াছে তখন নিগূঢ়তর রস-প্রেরণায় এই ত্রুটি আপনা হইতেই অপনোদিত হইয়া গিয়াছে।

নক্সীকাঁথার মাঠের দুই একটি ছত্রে কবির মানব-প্রেমিকতার আদর্শ কাব্যশ্রীর

উর্দ্ধে প্রধানতর মনে হইতে পারে ; কিন্তু সোজন বাদিয়ার ঘাটের স্থানে স্থানে কবির socialist, feminist ও humanist আদর্শ কাব্যমহিমাকে আছন্ন করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। মুকুন্দরামের কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে বাঙ্গালী জাতি তার হ্রস্বদৃষ্টি, ধর্ম্মমূঢ়তা অপরিচ্ছন্ন ভাব-বিহ্বলতা ও হীনদর্শন জীবন-যাত্রা নিয়া শোভন না হইলেও সহজ ও স্বাভাবিক রূপ লাভ করিয়া আছে ; কিন্তু এখানে বাংলার পল্লীবাসীরা অনেকখানি সচেতন ও মুক্তদৃষ্টি,—কবি যে নিজের আধুনিকতার আদর্শের রঙে তাহাদের মনকে রাঙাইয়া তুলিয়াছেন একথা বলাই বাহুল্য! তবে প্রাদেশিক পরিভাষা, উপমা ও অলঙ্কারের সাহায্যে সেই সজাগ মনোভাবকে তিনি প্রচ্ছন্ন রাখিতে অনেকখানি সমর্থ হইয়াছেন। তবুও শিল্পসৌন্দর্য্য ম্লান করিয়া কোথাও কোথাও অবাস্তবতা ও বক্তৃতা-বাহুল্য দেখা দিয়াছে। এই অবাস্তবতা ফুটিয়া ওঠার কারণ বোধহয় চরিত্রগুলির মধ্যস্থতায় নিজের হৃদয়াবেগে কবির অতিরিক্ত কবিত্ব প্রকাশ। আর বক্তৃতা-বাহুল্যের জন্য কবির দেশবাসীর বর্ত্তমান মনোভাবও কিছুটা দায়ী! উদাহরণতঃ সোজন ও দুলালীর পলায়ন-কালে এরূপ সুদীর্ঘ কথা কাটাকাটির পালা অবতারণা করার কারণ, বোধহয়, কবি মনে করিয়াছেন যে শিল্পশ্রীর দিক দিয়া আপত্তিকর হইলেও ইহা ব্যতিরেকে হিন্দু-মুসলমান-সমস্যা-পীড়িত এদেশের স্থূলবুদ্ধি পাঠকদের মনের স্বস্তি রক্ষা সম্ভবপর হইবে না।

বঙ্গপল্লীর সমস্ত ক্ষুদ্রাণুক্ষুদ্র বিষয় সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান যে কত গভীর, পল্লী-জীবনের সুখ-দুঃখের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় যে কত ঘনিষ্ঠ, সে প্রমাণ নক্সীকাঁথার মাঠেই পাইয়াছি। শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "পথের পাঁচালী"র পটভূমিকায় পল্লীজীবনের সুখ-দুঃখ অপেক্ষা প্রধানতর পল্লীপ্রকৃতির সৌন্দর্য্য ; কিন্তু জসীমউদ্দিনের কাব্যে সেই পল্লী-সৌন্দর্য্যের কোলে লালিত জীবনের সুখদুঃখই সুস্পষ্টতর। সোজন বাদিয়ার ঘাটে নমাজের মহফিল, বেদের বহর প্রভৃতি যে সব গ্রাম্য ছবি ফুটানো হইয়াছে তাহাতে মানুষেরই সঙ্গে কবির আত্মীয়তাবোধ তীব্রতর হইয়া দেখা দিয়াছে। কবির প্রবলতর হৃদয়-প্রেরণায় চরিত্রগুলিই সেখানে অধিকতর জীবন্ত। কাব্যখানিতে কথার গাঁথুনি যথেষ্ট আঁটসাঁট না হইলেও এই প্রবল প্রেমপরায়ণতার জন্যই এই কাব্যখানি উল্লেখযোগ্য হইয়া থাকিবে।

জীবনের দিকে দৃষ্টি বেশী পড়াতে চারিপাশের সৌন্দর্য্যের দিকে দৃষ্টি যে কিছু কম পড়িবে ইহা স্বাভাবিক। তবুও পল্লীশ্রীর যে রূপ কবি একাব্যেও ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, তাহারও তুলনা বিরল। প্রথমেই আসরে দেখা দিল এক গ্রাম্য নমঃশূদ্রের কালো-বরণ মেয়ে দুলালী—

ইতল্ বেতল্ ফুলের বনে ফুল ঝুরঝুর করে
রে ভাই, ফুল ঝুরঝুর করে ;
দেখে এলাম কালোমেয়ে গদাই নমুর ঘরে।
ধানের আগায় ধানের ছড়া, তাহার পরে টিয়া,
নমুর মেয়ে গা মাজে রোজ তারির পাখা দিয়া।
দূর্ব্বাবনে রাখলে তারে দূর্ব্বাতে যায় মিশে,
মেঘের খাটে শুইয়ে দিলে খুঁজে না পাই দিশে।
লাউয়ের ডগায় লাউয়ের পাতা রৌদ্রেতে যায় উনে—
গা ভরা তার সোহাগ দোলে এই কথাটি শুনে।

তারপর সৌন্দর্য্য বিচ্ছুরণ করিতে করিতে কাব্যের আখ্যান-ভাগ গড়াইয়া চলিয়াছে শিমুলতলী গ্রামকে কেন্দ্র করিয়া ; ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে কাব্যের নায়ক ও নায়িকা সোজন ও দুলালীর চরিত্র উজ্জ্বলতর হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। মৈমনসিংহ-গীতিকার "মহুয়া"র পরিকল্পনার সঙ্গে সামান্য সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হইলেও, যে অশ্রুধারার মধ্য দিয়া কবি এই শোক-গাথা সমাপ্ত করিয়াছেন, সারা কাব্যখানিতে ফুটিয়া রহিয়াছে চাষী জীবনের সুখ দুঃখের যে অপূর্ব্ব বেদনাবোধ, তাহাতেই বাঙ্গালী পাঠকের কাছে ইহা সমাদৃত হইবে, এ আশা করা অন্যায় নয়।

আবদুল কাদির

The Reconstruction of Religious Thought in Islam —By Sir M. Iqbal (Oxford University Press).

The Mystical Life—By Roger Bastide (Jonathan Cape).

An Examination of the Mystic Tendencies of Islam in the Light of the Quran and Traditions—By Prof. M. M. Zuhuruddin Ahmad Andheri (Bombay).

The Transformation of Nature in Art—By A. K. Coomerswamy (Harvard University Press).

জাপানী চন্দ্রমল্লিকার সৌন্দর্য্য দুভাবে উপভোগ করা যায়, এক, সব কুঁড়ি ছেঁটে মাত্র একটি ফুল ফুটিয়ে, এবং একটিও না ছিঁড়ে সব কুঁড়ি ফুটতে দিয়ে। প্রথম উপায়ে ফুলটি হয় বড়, তখন তার অতিকায়ত্বই হয়ে ওঠে আনন্দের মাত্রা ও উপদান। দ্বিতীয় উপায়ে ফুলের আকার ছোট হয়, কিন্তু ক্ষুদ্রতার ক্ষতিপূরণ সম্ভব গুচ্ছের বিচিত্র সম্ভারে। মহাত্মাজী ও হিট্‌লারের কাণ্ড দেখে এবার মালিকে বলেছি—মহাকায় এক-এ আর কাজ নেই. গোছাই কর্। তাই বইগুলির একত্র সমালোচনা করছি, নচেৎ প্রত্যেক বইখানির দীর্ঘ সমালোচনা সম্ভব, উচিতও বোধহয়, কিন্তু মেজাজের উপর হাত নেই। মহাত্মাজীর বাণপ্রস্থের পর কংগ্রেস-সাধারণতন্ত্রের পাল্লায় যখন জন-সাধারণ বিধ্বস্ত হচ্ছে বুঝব, তখন আবার না হয় প্রত্যেক বইএর মর্য্যাদা অনুসারে পৃথক সমালোচনা লিখব। তার পূর্ব্বে নয়।

য়ুরোপে ধর্ম্ম নিয়ে আলোচনা আজকাল একটু বেশী রকমেরই চলছে। যুদ্ধের পর ধর্ম্ম সংক্রান্ত আগ্রহাতিশয্যের মধ্যে একপ্রকার স্নায়ুবিকার বর্ত্তমান ছিল। কিন্তু এখন যা দেখছি সেটা ধাতস্থ প্রকৃতির স্বাভাবিক অনুসন্ধিৎসা, এর মধ্যে না আছে বাচালতা, না আছে প্রতিক্রিয়ার অবসাদ, না আছে প্রতিবাদের তীব্রতা। পৃথিবীর আর্থিক দুরবস্থার সঙ্গে এই মনোভাবের কোন কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ সুস্পষ্ট নয়। এই ঔৎসুক্য বণিক-সম্প্রদায়ের স্বার্থপ্রসূত নয়, শ্রমিক-সম্প্রদায় ও জনসাধারণকে ঠকাবার ফন্দী নয়, মূর্খদের আফিং সেবন করানো নয়। এই কৌতূহলকে নির্য্যাতিত,

প্রপীড়িত, পদদলিত দরিদ্রের যুক্ত্যাভ্যাস বলতে কুণ্ঠা হয়। এই নতুন ধারার পিছনে আছে সেই প্রচণ্ড শক্তি যার জোরে য়ুরোপ অত বড়। তাকে জ্ঞানের গরজ কিংবা আজকালকার মনোজ্ঞ ভাষায় বিজ্ঞানের প্রতি অনুরাগ বলা চলে।

য়ুরোপে অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের মধ্যে একটা বিরুদ্ধভাব চলে আসছিল। জ্ঞানের অর্থ ধরা হয়েছিল দর্শন, এবং দর্শন বলতে অন্তর্মুখিনতা ও আদর্শবাদই সাধারণে বুঝত। বিংশ শতাব্দীতে পদার্থ-বিজ্ঞানের কৃতিত্ব ও কীর্ত্তি কমানোর জন্য সাধারণের কাছে অর্থ গেল বদলে। অন্তর্মুখী হল বহির্মুখী, ঘর হইল বাহির, বাহির হইল ঘর, আদর্শবাদ হল রিয়ালিজম্। কিন্তু যে সভ্যতা জীবন্ত সেখানে কোন মতই চিরস্থায়ী হতে পারে না। তাই যুদ্ধের পূর্ব্ব থেকেই Aliottaর ভাষায় একটা Idealistic Reaction against Science আসছিল। যুদ্ধের মধ্যেও এই প্রতিক্রিয়া লুপ্ত হয় নি, তবে ভিন্ন ও বিকৃত রূপ ধারণ করেছিল। আজ রূপটি সহজভাব ধারণ করছে মনে হয়। জ্ঞানের প্রতি অনুরাগই য়ুরোপীয় ধর্ম্মালোচনার প্রধান প্রেরণা।

এ দেশেও পরা ও অপরাবিদ্যার মধ্যে পার্থক্য ছিল, কিন্তু কোন পার্থিব জ্ঞানই ব্রহ্মজ্ঞান থেকে বিচ্ছিন্ন হয় নি। বিজ্ঞান বলতে আমাদের শাস্ত্রে বিশদরূপে জ্ঞান অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানই সূচিত হয়েছে। কিন্তু ইংরেজী শিক্ষার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সমগ্র বিদ্যা ওদের অপরা বিদ্যার সামিল হল। কারণ সূচনা লুপ্ত হওয়ার মতন সহজ কাজ আর নেই। আমরা আজ য়ুরোপীয় ঊনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান ও mechanistic মনোভাবকে বরণ করেছি। লাভ কতটা হয়েছে জানিনা, কিন্তু ক্ষতিটা সুস্পষ্ট। আমরা আধ্যাত্মিক বিদ্যাকে ঘৃণা করিতে কিংবা হেসে উড়িয়ে দিতে শিখেছি, নতুন নতুন কলকব্জা, নতুন থিওরীও তৈরী করছি না; আমাদের মধ্যে যাঁরা ওদেশের খবর রাখেন তাঁরা এডিংটন জীন্‌স্ পড়ে সমগ্র বিজ্ঞানেরই গলদ্ দেখছেন, এবং হাঁচি টিকৃটিকির ব্যাখ্যা করছেন হাইসেনবার্গের মতামত দিয়ে। ওদের গরজ জ্ঞানের, আমাদের তাগিদ মাত্র আত্মসম্মানের। যে জাতি সর্ব্বদাই প্রমাণ করতে ব্যস্ত যে আমরাও বৈজ্ঞানিক হতে পারি, আমাদেরও ধর্ম্ম আছে এবং সে ধর্ম্মের সঙ্গে তোমাদের আধুনিকতম বিজ্ঞানের গরমিল নেই, মিল আছে, সে জাতির পক্ষে নতুন চিন্তা করবার অতিরিক্ত শক্তি থাকা অসম্ভব। আমাদের চিন্তা বন্ধ রয়েছে। অথচ প্রত্যেক ব্যক্তিরই কর্ত্তব্য হল শুদ্ধভাবে চিন্তা করা—তাকে যে নামই দেওয়া হোক না কোন? যে বইগুলি পড়ে আমর ঐ সব কথা মনে উঠেছে সেগুলিতে স্বচ্ছ চিন্তার ছাপ বর্ত্তমান। একই ধরণের ছাপ নয়, কোথাও বেশী, কোথাও কম—কিন্তু আছে—এইজন্যই আমি কৃতজ্ঞ। লেখকদের সিদ্ধান্ত ও বক্তব্য যে এক, তাও বলছি না।

স্যার মহম্মদ ইকবালের মতে ইসলাম ধর্ম্ম ও সভ্যতার সঙ্গে বর্ত্তমান বিজ্ঞানের কোন আন্তরিক বিরোধ নেই। কারণ হল দুটি—The birth of Islam is the birth of the inductive intellect, এবং কোরাণে আছে constant appeals to Reason, History, Nature and Experience। যুক্তির দিক থেকে যেমন ইসলাম ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য এই concrete, finite এবং objective মনোভাব, ইতিহাসের দিক থেকে তেমনি গতিশীলতা, অভিজ্ঞতার দিক থেকে

তেমনি স্বাধীনতা, প্রকৃতির দিক থেকে তেমনি ব্যক্তিগত বৈচিত্র্য এবং পর্য্যবেক্ষণ-শীলতা। বলা বাহুল্য এই হিসেবে বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক সভ্যতার সঙ্গে প্রকৃত মুসলমান সভ্যতার কুটুম্বিতা স্থাপন সম্ভব। আরব-সভ্যতার দানের কথাও আমরা সকলেই জানি। ডাঃ ইক্‌বালের প্রতিপাদ্য হল এই—

The truth is that the religious and scientific processes, though involving different methods, are indentical in their final aim. Both aim at reaching the most real and to both the way to pure objectivety lies through what may be called the purification of experience.

এই মন্তব্যটির অর্থ পরিষ্কার করবার জন্য অভিজ্ঞতাকে তিনি শ্রেণী বিভাগ করেছেন—as a natural fact, significant of the normally observable behaviour of reality and experience as significant of the inner nature of reality। প্রথমটির জন্য যেমন অভিজ্ঞতার পূর্ব্বতন মানসিক ও দৈহিক ঘটনা বুঝতে হবে, দ্বিতীয়টির জন্য তেমন অভিজ্ঞতারই আন্তরিক সামঞ্জস্য। তারপর ডাঃ ইক্‌বাল বলেছেন—

The scientific and the religious processes are in a sense parallel to each other. Both are really descriptions of the same world with this difference only that in the scientific process the ego's stand point is necessarily exclusive, whereas in the religious process the ego integrates its competing tendencies and develops a single inclusive attitude resulting in a kind of synthetic transfiguration of his experiences.

এই synthetic transfigurationই হল ধর্ম্মের গূঢ় কথা — এবং এই-জন্যই ডাঃ ইক্‌বাল বর্ত্তমান Psychology of Religionকে—বিশেষতঃ নব মনো-বিজ্ঞানের Analytical Psychologyকে অসম্পূর্ণ বিবেচনা করেন। A careful study of the nature and purpose of these really complementary processes shows that both of them are directed to the purification of experience in their respective spheres—অর্থাৎ বাহ্যিক ও আন্তরিক ব্যবহার। পূর্ব্বোক্ত উপায়ে ডাঃ ইক্‌বাল পরীক্ষামূলক জ্ঞান এবং বিশদ জ্ঞানকে সমন্বয় করেছেন। ডাঃ ইক্‌বালের উৎকৃষ্ট ভাষা, অগাধ পাণ্ডিত্য দেখে মুগ্ধ হতে হয়। ডাঃ ইক্‌বাল বলেছেন যে বর্ত্তমান মুসলমান সমাজে ইসলাম ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব অর্থাৎ Constant Appeal of Nature, History, Reason and Experience মর্ম্মে মর্ম্মে গ্রাহ্য করা একান্ত কর্ত্তব্য। আমার বিশ্বাস এই কর্ত্তব্যটি হিন্দুসমাজেও মধ্যে মধ্যে স্মরণ করলে মন্দ হয় না। কোরাণের ব্যাখ্যায় ডাঃ ইক্‌বাল কতটা নৈষ্ঠিক কিংবা শাস্ত্রানুযায়ী আমার বিচার করবার ক্ষমতা নেই। কিন্তু ইসলাম সভ্যতা সম্বন্ধে আমি যা বিদেশী বই পড়েছি তার জোরে আমি তাঁর বর্ণনার সমর্থন করিতে পারি।

Bastideএর বইখানির সার্থকতা এই যে তাতে mystical অভিজ্ঞতাকে বিজ্ঞানের দিক থেকে দেখা হয়েছে—'the book is planned to be one of pure science'। বলা বাহুল্য যে য়ুরোপীয় বিজ্ঞানের অর্থই হল বৈজ্ঞানিক

পদ্ধতি। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি একাধিক প্রকারের, তার মধ্যে কোনটা ভাল কোনটা মন্দ পূর্ব্বে থেকেই বিচার করা চলে না—ক্ষেত্রানুযায়ী বিচার সম্ভব। Bastide যেটি অবলম্বন করেছেন তাকে তুলনামূলক পদ্ধতি বলা চলে। ফ্রান্সে এই পদ্ধতির অবলম্বনে উৎকৃষ্ট কাজ হচ্ছে — যেমন Masson-Oursel এর Comparative Philosophy। খৃষ্টান, মুসলমান, বৌদ্ধ ও হিন্দু (লেখক শেষোক্ত দুটি ধর্ম্মের মধ্যে পার্থক্য বোধ হয় বিশ্বাস করেন না) মিষ্টিক্‌দের জীবনবৃত্তান্ত আলোচনা করে বাষ্টিড্‌ নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন—

Indeed in all Mysticism, there is an indentical psychological experience ...I am almost inclined to make this experience consist of a certain inward sentiment in which there are two distinct elements: on the one hand a sense of depersonalization, or annihilation of the self, which being emptied of its normal thoughts and emotions causes the mystic to feel that he is living a life quite different from his usual one. On the other hand he does not because of this lose himself in an utter void: other emotions and thoughts rise within him. But he does not feel them to be his own: they seem foreign to him and he submits to them passively.

এই দুটি ধারার প্রকৃতি এবং ইতিহাস আলোচনার পরে বাষ্টিড্‌ বলেছেন যে মিষ্টিক অভিজ্ঞতার প্রথম অবস্থায় নানাপ্রকার স্নায়ুবিকার জুড়ে থাকলেও পরিণত অবস্থায় সেগুলি খসে যায়।

The crises and raptures which are part of mystical experience are not constantly recurring factor of Mysticism but something that is merely ephemeral. Its very essence is that it is *a method of life and knowledge*, an attempt by man to conquer man, and an effort towards *negation as well as towards liberation.* Finally, it is an heroic attempt to *transcend oneself* and the world, and then, if the transcendent is found, to apprehend it with a triumphant intuition.

Italicised অক্ষরগুলির প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি — প্রথমতঃ একটি উপায়, তারপর জীবন-যাত্রার এবং জ্ঞানের উপায়, শেষে এই জীবনকে অতিক্রম করার উপায়। বাষ্টিডের effort towards negation as well as towards liberation ডাঃ ইক্‌বালের purification of experience-এর কথা স্মরণ করিয়া দেয়। অন্তরের বস্তু হলেই যে বিজ্ঞানের অতিরিক্ত হল, কিংবা বিজ্ঞানের বস্তু ও পদ্ধতি থেকে পৃথক হল, এমন কোন কথা নেই। Instrospection যে পদার্থবিজ্ঞানেরও সুপরিচিত পদ্ধতি একথা আজকাল সবাই জানে, এবং Experimental Psychologyতেও প্রশস্তরূপে ব্যবহৃত হচ্ছে, তার খবর পাওয়া যায় Woodworth এর Contemporary Schools of Psychologyতে। Woodworth যাকে Existential School বলছেন, তাদের পদ্ধতি ভাল করে দেখলেই বোঝা যাবে যে Introspection এর দোষগুলি তর্কবুদ্ধির সাহায্যে দূর করা সম্ভব। আদৎ কথা—শুদ্ধ পদ্ধতি। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে শুদ্ধির দুটি উপায় —এক ন্যায়তর্ক বিচার — দ্বিতীয় যন্ত্র। Mysticism এও তাই বলা হয়,

চিত্তশুদ্ধি পরীক্ষা করতে হবে নিজেকে নিয়ে (সাধনা), অতএব এখানে বুদ্ধির বিশেষ প্রয়োজন। বাষ্টিড্ যাকে subsconcious বলেছেন সেটা নির্ব্বুদ্ধির ভাণ্ডার নয়।

তা হলে Mysticism এবং বিজ্ঞানের মধ্যে পদ্ধতি হিসাবে অর্থাৎ methodologically, পার্থক্য কম। উপকরণ নিয়ে পার্থক্য আছে। আর আছে লাভে— transcend oneself and the world, and then, if the transcendent is found, to apprehend it with a triumphant intuition। এখানেও আমি মিল পাই। আইনষ্টাইন অঙ্ক কষবার সময় কি নিজের ও পৃথিবীর সীমা অতিক্রম করেন না? তাঁর যে intuitionএই সত্যের সাক্ষাৎ হয়, এবং সাক্ষাৎ হলে তিনি যে অতিরিক্ত আনন্দ পান এ কথারও প্রকাশ আছে। তাই আমার মনে হয় Mysticismএর বিশেষ দাবী অতিক্রমে নয়, ডাঃ ইক্বালের ভাষায় synthetic transfiguration of experienceএ। এই অভিজ্ঞতার সাহায্যে 'সমন্বয় ও পরিবর্ত্তনের quality বিচার করবার ক্ষমতা আমার নেই—কারণ সকলেই মানে যে Mysticismএর অভিজ্ঞতা বই পড়ে হয় না, তা অর্জ্জন করবার জন্য সাধনা করতে হয়। তবে জহরুদ্দিন আহমদ সাহেবের সুফী Mysticismএর বর্ণনা পড়ে আমার ধারণা হয়েছে যে হয়ত বা এই নতুন synthesis, transformationএর quality আরো ব্যাপক, আরো গভীর ভাবের সমন্বয়। মিষ্টিক অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করা শক্ত, কেবল সদৃশ কোন অভিজ্ঞতার ভাষায় আভাস দেওয়া যায়। সুফী কবিতা পড়লে মনে হয় যেন নসীরুদ্দীন, শ্রীকৃষ্ণের শুদ্ধ স্বর, এনায়েৎ-হাফেজের শুদ্ধ টিপ্ শুনছি। কোন ভুল চুক্ নেই এর মধ্যে; একেবারে খাঁটি জিনিষ।

ডাঃ কুমারস্বামীর মতে আর্ট ও মিষ্টিসিজ্‌মের অভিজ্ঞতা সদৃশ অভিজ্ঞতা নয়, একই অভিজ্ঞতা। তিনি অনেক দিন থেকে বলে আসছেন যে ভারতবর্ষের সৌন্দর্য্যতত্ত্ব ও চর্চ্চার পিছনে আছে যোগ। এই বইখানিতে তিনি সেই পূর্ব্বমতের সমর্থন করেছেন ভারতবর্ষ, চীনদেশের আর্টের দৃষ্টান্ত দিয়ে। ঐত্তেরেয় ব্রাহ্মণের (৬, ২৭) সূত্রই হল, কুমারস্বামীর মতে, এশিয়ান আর্টের মূলতত্ত্ব।

"It is in imitation (অনুকৃতি) of the angelic (দেব) works of art (শিল্পানি) that any work of art (শিল্প) is accomplished (অধিগম্যতে) here: for example, a clay elephant, a brazen object, a garment, a gold object, and a mule-chariot are 'works of art.' A work of art (শিল্প) indeed, is accomplished in him who comprehends this. For these (angelic) works of art (শিল্পানি, viz., the metrical silpa texts) are an integration of the self (আত্ম-সংস্কৃতি); and by them the sacrificer likewise integrates himself (আত্মাণম সংস্কুরুতে) in the mode of rythm (ছন্দোময়).

আত্ম-সংস্কৃতি আর ডা: ইকবালের purification of experience একই বস্তু। অতএব বিজ্ঞান, গুহ্যধর্ম্ম এবং সৌন্দর্য্য-চর্চ্চার মধ্য দিয়ে একই ধারা প্রবাহিত হচ্ছে। চীনদেশের কলাবিৎও ঠিক্ ঐ কথাই বলেন, একই ভাবে প্রকৃতিকে দেখে এসেছেন। অল্প কয়দিন পূর্ব্বে আনন্দরাজ মূলক-এর ভারতবর্ষীয় সৌন্দর্য্যতত্ত্ব বিষয়ে একটা বই পড়ি। তাতেও এই imitation of Natureএর অর্থ একই প্রকার দেওয়া হয়েছে। ডাঃ কুমারস্বামীর বইখানিতে Meister Eckhart নামে যে ব্যক্তির মত

আলোচিত হয়েছে, তিনি ছিলেন একজন মধ্যযুগের য়ুরোপের বিখ্যাত যোগী। তাঁরও বক্তব্য এই যে অন্তর্জ্ঞেয় জ্ঞানসত্বরূপ চিদাকাশে প্রতিবিম্বিত, কিংবা স্বপ্নবৎ হয়ে যে রূপ গ্রহণ করে তাকেই কলাবিৎ ও শিল্পী অনুকরণ করে, তারই প্রতিকৃতির নাম চারুকলা কিংবা কারু শিল্প। এ ক্ষেত্রে চারুকলা এবং শিল্পের মধ্যে কোন প্রভেদ নেই, এবং চীনদেশের ও মধ্যযুগের সৌন্দর্য্যতাত্ত্বিকের মধ্যেও তিলমাত্র পার্থক্য নেই। Eric Gill তাঁর নতুন বই Artএ একই কথা বলেছেন। ধ্যান মূর্ত্তিই সকল আর্টের মূল, এবং ধ্যানের পদ্ধতিতেও সেই চিত্তশুদ্ধির আদর্শ।

বর্ত্তমান যুগের Lipps প্রভৃতির বই-এর সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে, তাঁরা জানেন যে আজকালকার অনেক য়ুরোপীয় মনীষীরাও বিশ্বাস করেন যে এই empathy ভিন্ন প্রকৃতির অন্ধ অনুকরণে আর্ট তৈরী হয়না। য়ুরোপের সৌন্দর্য্যতত্ত্ব আজকাল এই মধ্যযুগীয় মনোভাবের বশবর্ত্তী হয়ে পড়েছে। Maritainএর Art and Scholasticism বইখানি এই প্রসঙ্গে পরিচয়ের পাঠকবর্গকে পড়তে অনুরোধ করছি। য়ুরোপে—বিশেষতঃ ফ্রান্সে আজকাল Neo-Thomsimএর ধুম লেগেছে—কারণ বোধহয় এই যে বর্ত্তমানের Art, Science, Philosphyএর মধ্যে সরিকি বিবাদে জ্ঞানের যৌথ-পরিবার আজ বিধ্বস্ত।

আমার বক্তব্য এই যে আর্টে ও বিজ্ঞানে প্রকৃতির যে *Transformation* সাধিত হয় সেটি বৈজ্ঞানিকের এবং যোগীর মনোভাব ভাল করে আলোচনা করলেও চোখে পড়বে। কেবল তাই নয়,—যেমন যোগ-পদ্ধতিতে, তেমনিই বিজ্ঞানেও চিত্তশুদ্ধি, purification of experience না হলে কোন প্রকার সত্যেরই আভাস পাওয়া যায় না। এবং এই purificationএর সাধনায় তর্কবুদ্ধির ও পরীক্ষার নিতান্ত প্রয়োজন। উপকরণে পার্থক্য থাকলেও পদ্ধতিতে কোন পার্থক্য নেই। অন্ততঃ আমার চোখে আপাততঃ ধরা পড়ছে না।

শ্রীধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

An Essay on Philosophical Method—By R. G. Collingwood. (Oxford : Clarendon Press)

অধুনাতন দর্শনের সঙ্গে যাঁদের কারবার আছে, কলিংউডের (Collingwood) নাম তাঁদের কারো কাছেই অজানা নয়। বরং কলিংউড সম্বন্ধে বলা চলে যে পেশাদার দার্শনিক মহলের বাইরেও তাঁর প্রতিপত্তি ও প্রভাব খনিকটা ছড়িয়েছে—অন্য কোন বইয়ের কথা হোক আর না হোক, (Speculum Mentis) স্পেকুলাম মেন্টিসের নাম সাধারণ পাঠকের মধ্যেও অনেকেই জানেন। আধুনিক সাহিত্য এবং দর্শন—এ দুইয়ের সম্বন্ধেই তিনি স্পেকুলাম মেন্টিসের এক জায়গায় বলেছেন, আমাদের যুগে যে দার্শনিক বা সাহিত্যিকের অভাব রয়েছে এ কথা মনে করলে ভুল হবে। বরং বলা চলে যে কোন যুগেই বোধহয় একসঙ্গে এত বেশী সংখ্যক ক্ষমতাশালী লোক সাহিত্য বা দর্শনের ক্ষেত্রে নামেননি। অন্য পক্ষে দর্শন বা সাহিত্যের আজকাল আদর

নেই এ কথাও ঠিক নয়—সর্ব্বসাধারণের মধ্যে পাঠেচ্ছা বহু পরিমাণে বেড়েছে, কমে নি। সাহিত্য বা দর্শনের নামে বাজারে যে মেকীর কোন অভাব নেই, তা থেকেও প্রমাণ হয় যে মানুষের মনে তার জন্য তাগিদ রয়েছে, তা নইলে জোলো প্রেমের কাহিনী বা সস্তা আধ্যাত্মিকতার এত চাহিদা থাকত না। তবু কিন্তু মনে হয় যে সাহিত্য বা দর্শনের দিন বুঝি ফুরিয়েছে—একদিকে শক্তিশালী লেখকের দল, অন্যদিকে উৎসুক পাঠক সমাজ,—কিন্তু তাদের মধ্যে যোগ-সূত্র কেমন করে হারিয়ে গিয়েছে বলে দুই পক্ষই অতৃপ্ত, ব্যর্থতা-বোধে তাদের সাধনা প্রাণহীন। কলিংউডের মতে এই বিয়োগের প্রধান কারণ আমাদের জীবনের বিখণ্ডতা। পূর্ব্বে সুখে দুঃখে আমাদের যে জীবন কেটেছে, তাতে জটিলতা ছিলনা বলা হয়তো অত্যুক্তি, কিন্তু আধুনিক জীবনের বহুমুখী ও বহুবিচ্ছিন্ন প্রকাশের তুলনায় আগেকার জীবন-ধারা যে অনেক সহজ, অনেক সরল ছিল, সে কথা স্বীকার না করে থাকা যায় না। আধুনিক যুগের এই বৈচিত্র্য ও ব্যাপকতার ফলে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধও একদিকে যেমন জটিল হয়ে উঠেছে, অন্যদিকে তেমনি আংশিক ও অসম্পূর্ণ হয়ে পরস্পরকে পরস্পরের কাছে দুর্ব্বোধ্য করে তুলেছে এবং তুলছে। আগে ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির যে সম্বন্ধ ছিল, তাতে প্রত্যেকেরই ব্যক্তিত্ব প্রকাশের অবকাশ ছিল—আজকাল ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সংস্পর্শ ঘটে দৈবাৎ, তার বদলে আধুনিক সমাজে আমরা পাই প্রয়োজনের দাবী এবং সেই প্রয়োজন মেটাবার চেষ্টা। এক কথায়, আজকাল মানুষের সম্বন্ধের মধ্যে ব্যক্তিত্বের বিকাশ অল্প, সে সম্বন্ধকে ইংরেজিতে বলা চলে economic, বাংলায় অর্থনৈতিক বল্‌লে তার পরিচয় ঠিক মেলেনা।

তার ফলে মানুষ মানুষের কাছে দুর্ব্বোধ্য হয়ে উঠ্‌ছে, এবং সেই দুর্ব্বোধ্যতাকে আরো বাড়িয়ে তোলে মৌলিকতার মোহ। নির্দ্দিষ্ট উপাদানে, রচনা-ভঙ্গিতে বা সংগঠনে যে মৌলিকতার অবস্থান নয়, সে কথা ভুলে গিয়ে এই সবেরই মধ্যে মৌলিকতা খোঁজার ফলে বহু ক্ষেত্রেই আধুনিক সাহিত্য হয়ে ওঠে, যাকে এক কথা বলা চলে আদেখ্‌লা (precious)। আধুনিক সাহিত্য অনেক সময়ে এত কঠিন এবং কৃত্রিম মনে হয়, তার অনেকখানি কারণ এখানেই মেলে, কিন্তু কলিংউডের বক্তব্য বিশেষ ভাবে দর্শনের সম্বন্ধে। সে বিষয়ে আরো বলা চলে যে দর্শনের দুর্ব্বোধ্যতা ও জীবনের সঙ্গে যোগ-বিচ্ছেদের একটি প্রধান কারণ তার ভাষার কৃত্রিমতা। বিজ্ঞানের বিকাশে প্রতীক (symbol) অবর্জ্জনীয়, তাই বিজ্ঞানের সাফল্যে মুগ্ধ দার্শনিকেরাও অনেকে ভাবেন যে দর্শনে প্রতীক ব্যবহার প্রয়োজন।

কলিংউডের মধ্যে সে গোঁড়ামী নেই বলে তাঁর সমস্ত লেখাই সুপাঠ্য, এবং আলোচ্য বইখানিতে তিনি প্রতীক বর্জ্জনের স্বপক্ষে যুক্তি দেখিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, এই যে দর্শন সাহিত্যের অঙ্গীভূত—সাহিত্য যেমন জীবনের অভিজ্ঞতায় প্রতিষ্ঠিত বলে অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই সাহিত্যের রস গ্রহণ করতে পারেন, এবং সে অভিজ্ঞতায় জীবনের ব্যাপকতা যত বেশী ধরা পড়ে, ততই সাহিত্য সমৃদ্ধ যে উঠে, তেমনি দর্শনও অভিজ্ঞতার স্বরূপ নির্ণয় করতে চায় বলে অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই তার রসাস্বাদনে অধিকারী। তাই দুর্ব্বোধ্যতা বা কৃত্রিমতার স্থান দর্শনে নেই, প্রতীক ব্যবহারের কোন প্রয়োজন নেই। দর্শন জটিল হ'তে পারে, কিন্তু সে জটিলতা বুদ্ধিকে আড়ষ্ট

করবেনা—অভিজ্ঞতার জটিলতায় বুদ্ধি আপনার যে বিকাশ দেখেছে, দর্শনে তারই পরিচয় সহজেই তার কাছে বোধগম্য হবে।

এ সমস্ত কথার বিরুদ্ধে যে অনেক যুক্তি তর্ক উঠতে পারে সে কথা কলিংউডের অজানা নয়। তার উত্তরও তিনি খানিকটা দিতে চেষ্টা করেছেন, কিন্তু সে যুক্তি এবং তার উত্তরের আলোচনা করতে গেলে তাঁর প্রধান বক্তব্যের কথা অনুক্ত থেকে যাবে।

তাঁর প্রধান বক্তব্য এই যে দর্শন ও বিজ্ঞানের রীতি ভিন্ন এবং ভিন্ন হ'তে বাধ্য। অনেক দার্শনিকই একথা ভুলে গিয়ে দর্শনকেও বিজ্ঞানেরই সামিল ক'রে তুলতে চেয়েছেন বলেই দর্শনে আজ এত বিভ্রাট। দর্শনকে আজ তাই দেখতে হবে কোথায় এবং কি কারণে বিজ্ঞানের রীতি দর্শনে অচল। কলিংউডের বর্ত্তমান বইখানি এই প্রশ্নেরই বিচার।

কলিংউডের মতে আমাদের জ্ঞানকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়—প্রত্যেক বিভাগে জানবার পদ্ধতি আলাদা। আমরা যাকে ব্যাবহারিক বিজ্ঞান (empirical science) বলি, প্রথম বিভাগে প্রধানত তারই পরিচয় মেলে। ব্যাবহারিক জ্ঞানও (empirical knowledge) এই বিভাগের অন্তর্গত। এ রকম জানবার পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য এই যে এখানে আমাদের জ্ঞানের প্রারম্ভ সম্বন্ধে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। টুকরো টুকরো তথ্য (facts) এ রকম জ্ঞানের ভিত্তিমূলে এবং এ সমস্ত তথ্যকে অবিশ্বাস করবার উপায় নেই। মাতাল পথ চলতে চলতে দেখে যে দলে দলে "গোলাপী ইঁদুর—" রাস্তা দিয়ে ছুটোছুটি করছে। গোলাপী ইঁদুর বলে কোন পদার্থ হয়তো দুনিয়ায় মেলেনা, অন্ততঃ এ কথা সত্য যে রাস্তায় তখন গোলাপী হোক বা বেগুনী হোক কোন ইঁদুরেরই নাম গন্ধ নেই। তবু তথ্য হিসাবে মাতাল যা দেখছে, তাকে অস্বীকার করা যায় না। তার ইন্দ্রিয়মণ্ডলের আবির্ভাব নিঃসন্দেহ, সন্দেহের অবকাশ ওঠে যখন পুরানো অভিজ্ঞতার ফলে আমরা সে আবির্ভাবে গুণলক্ষণ আরোপ করি, শ্রেণী নির্দ্দেশ ক'রে তার নামকরণ করি। এই রকম সমস্ত তথ্য নিয়ে সাধারণ কোন নিয়মের সূত্রে তাদের প্রকাশই ব্যাবহারিক জ্ঞানের লক্ষ্য। সাধারণ সূত্রগুলি কিন্তু তথ্যকে প্রতিষ্ঠিত করেনা—তথ্যের উপর তারা নিজেরা প্রতিষ্ঠিত। তবু তথ্যের নিংসন্দেহ নিশ্চয়তা এ সমস্ত সাধারণ সূত্রে মেলেনা—সাধারণ সূত্রগুলি চিরদিনই কেবলমাত্র সম্ভাব্যের রাজ্যে থেকে যায়।

তথ্য এবং সাধারণ সূত্র সম্বন্ধে বিজ্ঞান সচেতন, কিন্তু যে চিন্তাধারার ফলে তথ্য সাধারণ সূত্রে গ্রথিত হয়—সে সম্বন্ধে বিজ্ঞান অমনোযোগী। এই চিন্তাধারা কি ভাবে চালিত হয়, তার বিচার হয় ন্যায়ের প্রশ্নে, বিজ্ঞান যে সম্বন্ধে নির্ব্বাক। কিন্তু সে পদ্ধতিকে ন্যায়ের রীতি বা কেবলমাত্র মানুষের অনুমান (assumption) যাই মনে করা যাক্ না কেন, বিজ্ঞানের তথ্য বা সাধারণ সূত্র দিয়ে তার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাই বিজ্ঞানের রাজ্যে অন্তর সম্বন্ধ এবং নিশ্চয়তার সর্ব্বত্রই অভাব। তথ্য তথ্য হিসাবে নিংসন্দেহ, কিন্তু তথ্য কোনদিন সূত্রকে নিশ্চিত প্রতিষ্ঠা দিতে পারেনা. তথ্য এবং সূত্র দুইয়ের কোনটিই একক অথবা একত্রে আমাদের চিন্তাপদ্ধতিকে প্রতিষ্ঠিত করতে অপারগ।

কলিংউডের দ্বিতীয় বিভাগে গণিতই প্রধান। জ্ঞানের এ প্রদেশের বিশিষ্ট লক্ষণ নিশ্চয়তা—কিন্তু সে নিশ্চয়তাও আনুমানিক (hypothetical)। অনুমান (assumptions) থেকে এক্ষেত্রে জ্ঞানের আরম্ভ, এবং স্বতঃসিদ্ধ (axiom) অবলম্বন করে তার বৃদ্ধি। ফলে যে সিদ্ধান্তে আমরা পৌঁছেছি, দত্ত (data) বা প্রারম্ভের সঙ্গে তার সম্বন্ধ নিশ্চিত, কিন্তু এক্ষেত্রেও আমাদের জ্ঞান একমুখিনতাকে সম্পূর্ণ অতিক্রম করতে পারে নি। স্বতঃসিদ্ধ অবলম্বন ক'রে আমার সিদ্ধান্তে পৌঁছাই, কিন্তু সিদ্ধান্ত থেকে স্বতঃসিদ্ধে আসা যায় না—এক্ষেত্রেও জ্ঞানের পরিণতি অপরাবর্ত্তনীয়। ব্যাবহারিক বিজ্ঞানের পদ্ধতির সঙ্গে এখানে দুটি প্রধান পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। প্রথমতঃ ব্যাবহারিক বিজ্ঞানের দত্ত এবং সিদ্ধান্তের মধ্যে সম্বন্ধের নিশ্চয়তা নেই। দ্বিতীয়তঃ ব্যাবহারিক বিজ্ঞানে চিন্তাপ্রণালীর স্বরূপের প্রশ্ন ওঠে না। গণিত সে সম্বন্ধে সচেতন; তা নইলে গণিতে স্বতঃসিদ্ধের স্থান থাকত না। কিন্তু গণিতের পক্ষে সে প্রশ্ন সমস্যা নয়, বিনা বিচারে গণিত তাদের স্বতঃসিদ্ধ বলে মেনে নেয়।

এই দুই বিভাগের সাথে দর্শনের প্রধান পার্থক্য এইখানে। দর্শনে স্বতঃসিদ্ধের স্থান নেই। দর্শনের প্রত্যেক সূত্র, প্রত্যেক প্রতিজ্ঞা প্রমাণ্য। তারই ফলে দর্শনের জ্ঞান পরাবর্ত্তনীয়। এক পক্ষে যেমন আমরা দত্ত থেকে সিদ্ধান্তে যেতে পারি, অন্যপক্ষে ঠিক তেমনি আমরা সিদ্ধান্ত থেকে দত্তে আসতে পারি। একপক্ষে যেমন দত্ত ও সিদ্ধান্তের সম্বন্ধের ওপর আমাদের মীমাংসা নির্ভর করে, অন্যপক্ষে আমাদের চিন্তা-ধারার স্বরূপের উপর দত্ত এবং সিদ্ধান্তের সম্বন্ধও সমান নির্ভরশীল। ফলে দর্শন ক্রম-বর্দ্ধনশীল, এবং সে ক্রমবর্দ্ধনে কোথাও আরম্ভ বা শেষ নেই। দর্শনের জ্ঞানে তাই এক অর্থে কোথাও কোন নতুনত্ব নেই, কেননা নতুন সূত্রও পুরোনো জ্ঞানের মধ্যে নিহিত ছিল, অন্য অর্থে দর্শনের সমস্ত জ্ঞানই নতুন। কারণ প্রতিপদে দর্শন নিত্য নতুন সম্বন্ধ আবিষ্কারের ফলে আমাদের জ্ঞানজগৎকে নতুনভাবে দেখতে শেখায়। এক কথায় দর্শনের সত্য ও মিথ্যা দুইই তাই আপেক্ষিক।

দর্শনের এ বৈশিষ্ট্যের স্বপক্ষে কলিংউড অনেক যুক্তি দেখিয়েছেন, তার একটির মাত্র এখানে উল্লেখ করব। বিজ্ঞানে যে শ্রেণী বিভাগ হয়, তার ফলে পরস্পর বিরোধী (exclusive) শ্রেণী গড়ে ওঠে। কোন একটি বিশেষ দৃষ্টান্তে তাই বিভিন্ন শ্রেণীর গুণের সমাবেশ অসম্ভব। দর্শনে কিন্তু তা নয়। দর্শনের শ্রেণীর বৈশিষ্ট্যই এই যে শ্রেণীগুলি বিভিন্ন হয়েও বিরোধী নয়। জীব-বিজ্ঞানে মেরুদণ্ডের উপস্থিতি বা অভাবে যে বিভিন্ন শ্রেণী বিভাগ, তাদের বিশেষগুলি পরস্পর বিরোধী। কোন জন্তুই মেরুদণ্ডশালী এবং মেরুদণ্ডহীন একসঙ্গে হ'তে পারে না। কিন্তু দর্শনে যে চিন্তাকে ধারণা (concept), প্রতিজ্ঞা (proposition) এবং যুক্তি (inference) এই তিন ভাগে ভাগ করা হয়, এ বিভাগগুলি পরস্পর বিরোধী নয়। এক্ষেত্রে বিশেষ দৃষ্টান্তে তিন শ্রেণীরই লক্ষণের পরিচয় পাওয়া যায়—ফলে বৈজ্ঞানিক শ্রেণী বিভাগ এক্ষেত্রে প্রয়োগ করা চলে না।

জ্ঞানের যে আপেক্ষিকতা কলিংউডের মতে দর্শনের বৈশিষ্ট্য, তারও অর্থ এইখানে পাওয়া যায়। দর্শনের শ্রেণী বিভাগ একান্ত (absolute) নয় বলেই দর্শনের বেলা জ্ঞান এবং অজ্ঞানের স্বাতন্ত্র্য সম্পূর্ণ নয়। দর্শনের কাছে তাই জ্ঞান প্রতি মুহূর্ত্তে অজ্ঞান বা ভ্রান্তিতে পরিণত হয়। কারণ প্রতি মুহূর্ত্তের নূতন জ্ঞানের ফলে পুরাতন জ্ঞান ভাণ্ডারের কেবল অবয়ব বৃদ্ধি হয় তা নয়, সংগঠনও বদলায়। ফলে পুরানো সত্য

আংশিক ভাবে মিথ্যা বলে প্রতিপন্ন হয়। এ কথাকেই ঘুরিয়ে আবার বলা চলে যে দর্শনের কাছে অজ্ঞান প্রতিমুহূর্ত্তে জ্ঞানে পরিণত হয়। অতএব জ্ঞান এবং অজ্ঞান দুইই আপেক্ষিক—তাদের মধ্যে কোন দুর্লঙ্ঘ্য পার্থক্য নেই।

জ্ঞানের বিবরণ হিসাবে এ আলোচনা হয়তো স্বীকার করে নেওয়া চলে—কিন্তু প্রশ্ন ওঠে যে কলিংউড কি দর্শনের পদ্ধতিতে সত্যসত্যই কোন বৈশিষ্ট্য দেখিয়েছেন? তাঁর কথা কি বিজ্ঞানের বেলায়ও সম্পূর্ণ প্রযোজ্য নয়? সেখানেও পুরাতন জ্ঞান প্রতিমুহূর্ত্তে আংশিক ভ্রান্তি বলে প্রতিপন্ন হয়েও আংশিক ভাবে নতুন সত্যের মধ্যে চিরঞ্জীব হয় না কি? এক কথায় বোধহয় বলা চলে যে এক্ষেত্রে কলিংউড নিজেই নিজের পদ্ধতির আরোপে বিমুখ। কারণ দর্শনের সমস্ত জ্ঞান আপেক্ষিক ও পরাবর্ত্তনীয়, এই যদি তাঁর প্রতিপাদ্য হয়, তবে দর্শনকে অন্য সমস্ত জ্ঞানমণ্ডলী থেকে বিচ্যুত করবার যৌক্তিকতা কোথায়? আপেক্ষিকতা কেবলমাত্র দর্শনের নিজের রাজ্যে প্রযোজ্য, অথচ দর্শনের সীমানায় এসে কোন মন্ত্রবলে সে আপেক্ষিকতা হঠাৎ নিষ্ফল ও ব্যর্থ হয়ে পড়বে? আপেক্ষিকতা ও পরাবর্ত্তন পরস্পর-সাপেক্ষ, তাই আপেক্ষিকতার এ পরাজয়ে পরাবর্ত্তনই বা কেমন করে টিঁকবে?

হুমায়ুন কবির

বুকের বীণা—শ্রীমতী অপরাজিতা দেবী।

আঙিনার ফুল—শ্রীমতী অপরাজিতা দেবী।

শ্রীমতী অপরাজিতা দেবীর নূতন কবিতার বই 'আঙিনার ফুল' ও আগের লেখা 'বুকের বীণা' পড়লাম। এ এক শ্রেণীর মনমাতানো অপরূপ সুন্দর কবিতা। অন্য সব কবিদের কবিতায় ব্যর্থ প্রেম, নিরাশা, স্মৃতির জ্বালা, বিরহ বা মহান প্রকৃতি বা বিশ্বদেবতা, এই সবের ছড়াছড়ি। কিন্তু অপরাজিতা দেবীর কবিতার বিষয় মানুষের সেই সব সাধারণ দৈনন্দিন ঘটনা যা বাঙালীর মেয়েকে সর্ব্বদা ঘিরে রেখেছে, যার ভেতর তার নিত্য সুখ দুঃখের উদয় অস্ত; জন্মতিথিতে 'তার' আগমন প্রতীক্ষা যার জন্য বুক কাঁপে, সোহাগের কপট শাসন, নিশি-দিনের কলহ-বিলাস, বর্ষার প্রতি মৃদু মধুর তীক্ষ্ণ বাক্যবাণ, কলেজ বোর্ডিংএ দরদ ভরা মেয়েটি, মেয়েদের মুখে আধুনিক স্ক্যাণ্ডাল, বাসর ঘর। লোকে বলে জীবনের তুচ্ছ সামান্য অসুন্দর "রাবিশ চীজ"কে সুন্দর সার্থক করাই রমণীর ধর্ম্ম; অপরাজিতা দেবী কবিতাতেও এই রমণীর ধর্ম্ম, রমণীর মহিমা বজায় রেখেছেন। বাঙালী মেয়ের গৃহস্থালী জীবনের প্রতিদিনের খুঁটিনাটি ব্যাপার সরস নিবিড় ও মধুর হয়ে দেখা দিয়েছে। স্বামীর আদরে জীবন যে কত রসে, কত সুখে, কত মাধুর্য্যে ভরে থাকে, নূতন মা হওয়ায় কত যে মধুর আস্বাদ পাওয়া যায়, তার গুপ্ত খবরটি অপরূপ হয়ে ফুটে উঠেছে অপরাজিতা দেবীর কবিতায়। শুধু অপরূপ নয়; বাঙালী মেয়ের বুকের কথা ব্যক্ত করে বলার দুর্জ্জয় সাহস তাঁর আছে। তর্ক, গল্প, ঝগড়া, মান, অভিমান একজনই অনর্গল শতমুখে বলে যাচ্ছে,

তাই অপরূপ ছন্দে ভাবে, ভাষায় ও শব্দরচনায় অপূর্ব্ব সুরে বেজে উঠেছে। এইটেই অপরাজিতা দেবীর নূতনত্ব। তাঁর কবিতা যেন হালকা ফিনফিনে ঢেউ, যা আজব খেয়ালে যখন তখন নূতন ভাবে দুলে উঠে। তাঁর এই খেয়ালের সম্বন্ধে তিনি বলেছেন :—

"সাহিত্য ক্ষেতে কলম চালাতে
কাগজের জমী নিয়নি লীজ,
অবসর কালে খুসীর খেয়ালে
যা লিখি জানি তা রাবিশ চীজ"।

কিন্তু অবসর কালে আপন খুসীর খেয়ালে তিনি যা চয়ন করেছেন তা আমাদের কাছে নূতন রসের আস্বাদ ও নূতন প্রতিভার সন্ধান এনে দিয়েছে। তাঁর কবিতায়—বিশেষতঃ বর্ষার কবিতায় অনেক জায়গায় রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করিয়ে দেয়, কিন্তু তা হলেও সে সব কবিতা লেখিকার সম্পূর্ণ নিজস্ব। তাঁর লেখায় এমন একটা প্রবাহধারা আছে যা কোথাও থামে না বা শুধু অর্থহীন কথা গেঁথে গেঁথে ফেনিয়ে ঘোলাটে আবহাওয়ার সৃষ্টি করে না। তাঁর লেখার তরঙ্গ স্ফটিক-স্বচ্ছ। অন্তরাগ, খোকার মধ্যস্থতা, বিদায় রাত্রে গলা জড়িয়ে বলা, "এমনি ডাকচি! তোমায় ডাকতে লাগে যে ভাল," এ-সব বাস্তবিক আমার এত ভাল লেগেছে যে বল্‌তে পারিনে। অপরাজিতা দেবীর ছন্দের হাত যে কি অপূর্ব্ব,—একটু তার নমুনা দিই ;—

ভালে নেই মোর
অলকা তিলক
　তনুতে পত্র লেখা
ভবন-বলভি
শিখরে আমার
　নাচে না মত্ত কেকা ॥
যূথী পরিমলে
গৃহ গুহা মোর
　　মোটে নয় সুরভিত,
প্রবাসী প্রিয়ের
বিরহ দহনে
　　গুমরি দহেনা চিত।

*　　*　　*　　*　　*

সোজা সুদীঘল
পাইনের দল
দোলে গান গেয়ে গেয়ে,
ঝির ঝির ঝির
ঝরে জল কণা
　　ঝাউয়ের ঝরকা বেয়ে ॥
ড্রিমি ড্রিমি ড্রিমি
　বাজিছে মাদল
　　দামামা নাকাড়া নানা
পুঞ্জে পুঞ্জে চেরাপুঞ্জির
　　মেঘ সেনা দেয় হানা ॥

হয়ত এতে রবীন্দ্রনাথের ছন্দের প্রতিধ্বনি একটু বেশী আছে, কিন্তু তাঁর অন্যান্য কবিতার ছন্দ প্রকৃতই তাঁর সম্পূর্ণ নিজের। শক্ত শক্ত ইংরাজী শব্দ তিনি কিরকমে কৌশলে বাংলার সঙ্গে গেঁথেছেন তা পড়ে বিমোহিত হতে হয়।

কবিবরকে উৎসর্গ করে লেখিকা লিখেছেন :—

"তুমি এনে দেছো স্বপনপুরের সুন্দর সুর ছন্দ
কল্পলোকের নব নব রূপ, মন্দার মধু গন্ধ।
আমি এনেছিনু তোমার চরণে অনাদৃত ফুলগুচ্ছ
জানি বিদুরের তণ্ডুলকণা নহে মাধবের তুচ্ছ।"

ভূমিকায় লিখেছেন :—

গন্ধবিহীন দীন কাল ফুলে
সভায় আমারে এনো না ডাকি
প্রিয়-বল্লভ পল্লব ছায়ে
বেড়ার আড়ালে গোপনে থাকি।
রবির আলোয় চন্দ্র কিরণে
ফোটে কত শত রঙীন ফুল ;
আমি আঁধারের আমাকে খুঁজিয়া
রসিকজনেরা কোরনা ভুল।"

এ বিনয় অপরাজিতা দেবীর কৃতিত্বের পাশেই শোভা পায়।

শ্রীঅদিতি দেবী

প্রকাশক—শ্রীসুরেশ চক্রবর্ত্তী, ১৩৯-এ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
রামকুমার মেশিন প্রেস, ১৬৩, মুক্তারাম বাবু ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীসুরেশ চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক মুদ্রিত।
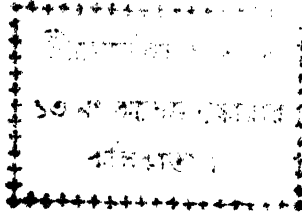
৪র্থ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা
মাঘ, ১৩৪১

সমৃদ্ধি, সঙ্কট ও সঙ্কল্প

১

এক শতাব্দীর উপর আমরা গণতন্ত্রের ব্যাপক প্রভাবের মধ্যে বাস করিয়াছি, জগতের নানা দেশে কি ভাবে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহা লক্ষ্য করিয়াছি এবং গণতান্ত্রিক মিষ্টান্নে কি পরিমাণ ইতরজনের ক্ষুধানিবৃত্তি হইয়াছে তাহার বহু পরিচয় পাইয়াছি। এই শতাব্দীসঞ্চিত অভিজ্ঞতার ফলে গণতন্ত্র সম্বন্ধে কয়েকটি তথ্য আজ অনেকেরই নিকট অত্যন্ত স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। যথা, প্রথমত, গণতন্ত্র নামে গণতন্ত্র মাত্র, কেননা কার্য্যত দেখা যায় জনসাধারণের ক্ষমতা একমাত্র 'ভোট' বা প্রতিনিধি-নির্ব্বাচন ব্যাপারে আবদ্ধ। রাষ্ট্রের শাসনযন্ত্র এত জটিল যে তাহার পরিচালন বিশেষ দক্ষতা ও অভিজ্ঞতাসাপেক্ষ। এই দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা জনসাধারণের আয়ত্তের বাহিরে। দ্বিতীয়ত, যাঁহারা এই দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়া শাসনকর্ত্তৃপদের যোগ্য বলিয়া স্বীকৃত হন, সমগ্র জনসাধারণ বা নির্ব্বাচকমণ্ডলীর তুলনায় তাঁহারা সংখ্যায় মুষ্টিমেয় হইলেও তাঁহাদের মধ্যে প্রতিযোগিতার অন্ত নাই। ইহার ফলে দেশ জুড়িয়া দুই বা ততোধিক দলের স্বষ্টি হয়। এক বা একাধিক দল-সমষ্টি অপর বা অন্যান্য দলগুলির সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া শাসনযন্ত্র হস্তগত করিবার জন্য নিয়ত চেষ্টা করিতে থাকে। ফলে, দেশময় দলাদলির ঘূর্ণাবর্ত্তের স্বষ্টি হয়। তাহারই ধূলায় অন্ধ হইয়া জনসাধারণ ভাবে শাসনযন্ত্র জোর চলিতেছে। শাসনযন্ত্র চলুক

না চলুক, চলে বিভিন্ন দলের স্বার্থান্বেষণ-চেষ্টা। প্রশ্ন উঠে, এই যে বিভিন্ন দলের স্বার্থ, তাহা কি প্রকারের? অবশ্য অর্থনৈতিক। এবং এই স্বার্থ বজায় রাখিবার জন্য বিভিন্ন দলে প্রতিযোগিতা এবং সহযোগিতা যুগপৎ দেখা যায়। কেননা বাহিরে দলাদলি যতই প্রখর হউক না কেন, মূলত তাহাদের উদ্দেশ্য এক, এবং এই উদ্দেশ্য জনসাধারণের ভোটে শাসন-যন্ত্রের পরিচালনভার লাভ করিয়া নিজেদের হস্তে সমগ্র সমাজের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শক্তির সংহতি ও সমাবেশ—আপন আপন স্বাচ্ছন্দ্য ও সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য। ইহাই গণতন্ত্র, ইহাই হইল প্রতিভূমূলক শাসন ব্যবস্থার রীতি, ইহারই জন্য আজ ভারতবর্ষে আমরা এত লালায়িত।

গণতন্ত্রের ইতিহাস আলোচনা করিতে হইলে পৃথিবীর বহু শতাব্দীর ইতিহাস আলোচনা করিতে হয়। কেননা প্রাচীন গ্রীস্ দেশে যে গণতন্ত্র ছিল তাহার প্রমাণ আছে। প্রাচীন ভারতবর্ষেও যে গণতন্ত্র ছিল তাহারও নাকি ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে বা সৃষ্ট হইয়াছে। এই সব ঐতিহাসিক তথ্যের আলোচনা ছাড়িয়া দিয়া মোটামুটি বলা যায় যে বর্ত্তমান যুগে গণতন্ত্রের আরম্ভ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ বা ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে এবং যদি কোন্ বিশেষ ঐতিহাসিক ঘটনা হইতে গণতন্ত্রের উৎপত্তি তাহা নির্দ্দেশ করিতে হয়, তাহা হইলে ফরাসী বিপ্লবের নাম করা ছাড়া উপায় নাই। ফরাসী বিপ্লব ঘটিয়াছিল অনেক কারণে, কিন্তু বিশেষ একটি ব্যক্তির প্রভাব ফরাসী বিপ্লবের পূর্ব্বে ফ্রান্‌স্ দেশে মানুষের মনকে বিপ্লবের ভাবে দীক্ষিত করিতে সাহায্য করিয়াছিল। এই মানুষটির নাম রুসো। তিনি মুক্তকণ্ঠে প্রচার করিয়াছিলেন যে, রাজা রাষ্ট্রশক্তির আধার নহে, পরিচালক মাত্র—রাষ্ট্রশক্তির আধার জনসাধারণ। রুসোর মতে দেশের কর্ত্তৃত্বভার জনসাধারণের হস্তে রাষ্ট্র-ইতিহাসের আদিম যুগ হইতে ন্যস্ত আছে; গভর্ণমেণ্ট বা শাসকসম্প্রদায় জনসাধারণের ভৃত্যমাত্র, প্রভু নয়। সুতরাং, যদি রাজা বা শাসকসম্প্রদায় প্রভুত্বের দাবী করেন তাঁহাদের উচ্ছেদ তাহার একমাত্র উত্তর। গণতন্ত্রের ভিত্তি হইল এই মতবাদ। বর্ত্তমানকালের রাজনৈতিক চিন্তায় এই মতবাদ ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত।

২

রাজার প্রভুত্বের উপর আক্রমণ শুধু রাজনৈতিক ক্ষেত্রে হয় নাই, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও হইয়াছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপের একাধিক দেশে, বিশেষ করিয়া ফ্রান্স্-এ, রাজারা কর আদায়ের উদ্দেশ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য কৃষিশিল্পের উপর অযথা হস্তক্ষেপ করিতে দ্বিধা করিতেন না। দারুণ দুর্ভিক্ষে যখন ফ্রান্স দেশের জনসাধারণ প্রায় নিঃশেষ হইবার উপক্রম তখনও লুই রাজাদের বিলাসব্যয় নির্ব্বাহের জন্য কর আদায় পূরাপূরি চলিয়াছে। এই জাতীয় অত্যাচারই রুসোর অগ্নিময়ী লেখনীর ইন্ধন জোগাইয়াছিল। রুসো একেবারে রাজশক্তির মূলে আঘাত করিয়াছিলেন। কিন্তু আর একদল—তাঁহাদের মধ্যে ইংরাজ লেখক অ্যাডাম স্মিথ স্মরণীয়—রাজশক্তির বিরুদ্ধে শুধু এই সমালোচনা করিয়া ক্ষান্ত ছিলেন যে, ব্যবসা-বাণিজ্য ব্যক্তিগত ব্যাপার, তাহাতে রাজার হস্তক্ষেপ সমীচীন নহে, কেননা একমাত্র অবাধ প্রতিযোগিতাই ব্যবসাবাণিজ্যের প্রসারের শ্রেষ্ঠ উপায়। এই সময় প্রথম মানুষের নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্য উৎপাদনের ও পৃথিবীর নানাস্থানে বিতরণের জন্য বাষ্পশক্তি ও বৈদ্যুতিক শক্তির ব্যবহার আরম্ভ হয়। এই ভাবে যে নবযুগের প্রবর্ত্তন হয় তাহাকে কারখানা-যুগ বলা যাইতে পারে। একএকটি কারখানার উৎপাদন কার্য্যের জন্য এবং জাহাজে বা রেলে এই সকল উৎপাদিত দ্রব্য দেশবিদেশে আমদানি রপ্তানির জন্য বহু মানুষের শ্রমশক্তির ও বহুল অর্থের একত্র সমাবেশ প্রয়োজন। ভিন্ন ভিন্ন কারখানায়, ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানে বা বাণিজ্য-সঙ্ঘে এই সমাবেশ আমরা দেখিতে পাই। অ্যাডাম স্মিথ-পন্থীরা বলেন যে, এই সমাবেশের চরম ফল পাওয়া যায় যদি এই সকল সঙ্ঘ বা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অবাধ প্রতিযোগিতা থাকে। আর যদি এই প্রতিযোগিতার পথ বন্ধ হয় তাহা হইলে দেশের উৎপাদন শক্তি সঙ্কুচিত হইয়া সমৃদ্ধির পথও বন্ধ হইবে। সুতরাং ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপারে রাজার হস্তক্ষেপ বাঞ্ছনীয় নহে।

ইতিহাসের গতি বিচিত্র। দেখিতে দেখিতে রাজশক্তি হয় চূর্ণ বিচূর্ণ, নয় সঙ্কুচিত হইল। রাজশক্তির স্থান অধিকার করিল কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রশক্তি। রুসোপন্থিগণের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল। অ্যাডাম স্মিথ যে চিন্তাধারার

প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন তাহাও শাখা-প্রশাখায় বিস্তার লাভ করিল। ব্যবসা-বাণিজ্যের অবাধ প্রসারই হইল জাতীয় সমৃদ্ধির মূল, সুতরাং স্বার্থান্বেষী রাজাই হউন বা জনসাধারণের প্রতিভূস্থানীয় শাসকমণ্ডলীই হউন, ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধে তাঁহারা যেন শাসনাধিকার দাবী না করেন। ক্রমে এই মতবাদ ব্যক্তি-স্বাধীনতার গৌরবময় মন্ত্রে পরিণত হইয়া বহু বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক অলঙ্কারে ভূষিত হইতে বিলম্ব হইল না। ব্যক্তি-স্বাধীনতার বিপুল যজ্ঞে ইংরাজ জাতির উৎসাহের আর অবধি রহিল না। ব্যবসা-বাণিজ্যের যাঁহারা পরিচালক তাঁহাদের ব্যক্তিত্বের দ্রুত বিকাশের ফলে দেশময় বহুলোক দারিদ্র্যের চরম দশায় উপস্থিত হইল, কিন্তু ব্যক্তিত্বের সম্মোহনমন্ত্রে দীক্ষিত শাসকসম্প্রদায় এই সকল ব্যবসাদারদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিলেন না। অবাধ বাণিজ্যের গুণকীর্ত্তনে ইংরাজ চতুর্ম্মুখ হইল। দেশবিদেশে পণ্য প্রেরণ করিয়া ইংরাজ বণিকগণের সমৃদ্ধি দিন দিন বৃদ্ধি পাইল। মূঢ় দুর্ব্বল দুঃসাহসী চীন ইংরাজের অবাধ বাণিজ্য নীতিতে সন্দেহ প্রকাশ করিলে, পণ্যবাহী বাণিজ্য-তরীর সাক্ষী হইয়া ব্রিটিশ রণতরী যখন অবাধ বাণিজ্যের বার্ত্তা বহন করিয়া চীন দেশে উপস্থিত হইল, তখন চীনা জাতির আর সন্দেহ রহিল না যে ব্রিটিশ বাণিজ্যনীতি সত্যই অতি উদার। আদর্শনিষ্ঠার প্রভাব বাস্তবিকই বিচিত্র! গণতন্ত্রের আদর্শের সঙ্গে ব্যক্তিত্ববাদের আদর্শ যুক্ত হইল। বহুলোকের ভোট, বহুলোকের সঞ্চিত অর্থ এবং বহুলোকের শ্রম, এই তিন গণতান্ত্রিক উপাদানে যে প্রচণ্ড রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শক্তির সৃষ্টি হইল তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য হইল দেশবিদেশে ব্যক্তি-স্বাধীনতার পুণ্য মন্ত্রের সাধন। ফলে, মুষ্টিমেয় ধনীর ধনভার এবং অগণিত নরনারীর দারিদ্র্য বাড়িয়া চলিল। কিন্তু এই মুষ্টিমেয় সংখ্যার সমৃদ্ধিতে সমগ্র সমাজ সমৃদ্ধ হইতেছে এই কথা ভাবিয়া ব্যক্তিত্ববাদের সম্মোহিত সমর্থকগণ পরম তৃপ্ত হইলেন। ক্যাপিট্যালিষ্ট বা ধনিকবৃত্তির প্রসারের ইহাই কাহিনী।

৩

ক্রিয়া ও প্রক্রিয়ার দ্বৈত প্রভাবের মধ্য দিয়া ব্যক্তি বা জাতির জীবন ক্রমপরিণতি লাভ করে। অবাধ বাণিজ্য, ব্যবসা-ক্ষেত্রে অপ্রতিহত

প্রতিযোগিতা প্রভৃতি আদর্শের প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে ইহার পরিপন্থী আদর্শও প্রচার হইতে বিলম্ব হইল না। এই আদর্শ অনুযায়ী সমাজ-জীবনের মূলমন্ত্র প্রতিযোগিতা নয়, সহযোগিতা—কি রাষ্ট্রনৈতিক কি অর্থনৈতিক সকল ব্যাপারে; এবং এই সহযোগিতার একমাত্র যোগ্য নিয়ামক রাষ্ট্র। রাষ্ট্র বলিতে অবশ্য গণতান্ত্রিক যুগে বোঝায় জনসাধারণের প্রতিভূস্থানীয় কেন্দ্রীয় শক্তি বা শাসকসম্প্রদায় অর্থাৎ ইংরাজিতে যাহাকে বলে গভর্ণমেণ্ট। এই জাতীয় মতবাদই সোশ্যালিজম্ বা সমাজতন্ত্রবাদ নামে খ্যাত। এই মতবাদের দুইটি ধারা নির্দ্দেশ করা যায়। একটি রাজনৈতিক—ব্যক্তিত্ব-বাদের লোপ; আর একটি অর্থনৈতিক—ব্যক্তিগত সম্পত্তির উচ্ছেদ। এই দুইয়ের সংযোগে যাহা দাঁড়ায় তাহা এই:—রাষ্ট্র সর্ব্বব্যাপক ও সর্ব্বগ্রাসী, ব্যক্তিগত রাষ্ট্রিক অধিকার বা সম্পত্তিরক্ষার বালাই থাকা উচিত নয়, তৎপরিবর্ত্তে রাষ্ট্র হইবে সকল সম্পত্তির রক্ষক ও পরিচালক, পণ্যের উৎপাদন ও বিতরণ করিবে রাষ্ট্রশক্তির কেন্দ্রীয় পরিচালক সঙ্ঘ অর্থাৎ গভর্ণমেণ্ট, এইভাবে সমাজ-জীবনে বৈষম্য দূর হইয়া প্রকৃত সাম্যের প্রতিষ্ঠা হইবে।

দেখিতে দেখিতে সোশ্যালিজ্‌ম্ দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়িল। ধনিকবৃত্তির সমর্থকগণের সহিত সোশ্যালিষ্টদের সঙ্ঘর্ষ আরম্ভ হইল। এই সঙ্ঘর্ষের ইতিহাস ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্দ্ধের ইতিহাস। বিংশ শতব্দীতে গত মহাযুদ্ধের সময় এই সঙ্ঘর্ষ রুশদেশে অকস্মাৎ প্রচণ্ড অন্তর্বিপ্লবে পরিণত হইল। প্রথমে গেল বহুশতাব্দীর জার সাম্রাজ্য ও তৎপরিবর্ত্তে প্রতিষ্ঠিত হইল নব্যশাসনতন্ত্র, ; ইহাও দুদিনে ধূলিসাৎ হইল। বিপুল সমারোহে বলশেভিস্ট দল সমাজতন্ত্রের প্রবর্ত্তন করিলেন। পৃথিবীর ইতিহাসে নবযুগের সূচনা হইল।

একদা ফরাসীদেশে রাজশক্তির আকস্মিক পতনে ইউরোপের রাজন্যবর্গ সন্ত্রস্ত হইয়াছিলেন। রুশদেশে সমাজতন্ত্রের প্রবর্ত্তনে সেইরূপ যাবতীয় দেশে ব্যক্তিগত সম্পত্তির সঙ্কীর্ণ ও সুদৃঢ় ভিত্তির উপর যাঁহারা সমৃদ্ধির বিপুল সৌধ নির্ম্মাণ করিয়া রাষ্ট্রশক্তির আশ্রয়ে পরম সুখে কালপাত করিতেছিলেন তাঁহাদের সুখনিদ্রা ভাঙিল। রুশদেশের এই নব ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আন্দোলন চলিল, রুশদেশের সহিত অন্যান্য দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য

যাহাতে না চলে তাহারও ব্যবস্থা হইল। এইভাবে একঘরে হইয়া এই নবব্যবস্থা যে অচিরে পঞ্চত্ব পাইবে অনেকে এই আশা করিয়াছিলেন। সে আশা পূর্ণ হয় নাই। রুশদেশের সহিত আবার অন্যান্য দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য সুরু হইল এবং রুশদেশ হইতে শুধু পণ্য নয় অর্থনীতির নূতন আদর্শও দেশবিদেশে ছড়াইয়া পড়িল। একটি বিশিষ্ট আদর্শ এইভাবে আজ পৃথিবীর সর্ব্বদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছে—ইহাকে বলা হয় ইকনমিক প্ল্যানিং।

৪

১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দ স্মরণীয় বৎসর। ঐ বৎসর কার্ল মার্কস্ ও এন্‌গেল্‌স্ দুই বন্ধুতে মিলিয়া 'কম্যুনিষ্ট ম্যানিফেষ্টো' এই নামে সমাজতন্ত্রবাদের আদর্শ ও কার্য্যবিধি সর্ব্বপ্রথম প্রণালীবদ্ধভাবে প্রচার করেন। ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর গ্রীষ্মকালে ও শীতকালে সমাজতন্ত্রবাদীদের উপর্য্যুপরি দুইটি সম্মেলন বসিয়াছিল। ইতিপূর্ব্বে ঐ জাতীয় বৈঠক আর কখনো হয় নাই। এই সম্মেলন কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়াই তাঁহারা সর্ব্বপ্রথম সমাজতন্ত্রবাদের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি ও কর্ম্মবিধির আলোচনায় অগ্রসর হন। শুধু আলোচনায় তাঁহারা ক্ষান্ত হন নাই, পৃথিবীব্যাপী শ্রমিক-সম্প্রদায়কে 'উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত' বলিয়া তাহারা ধনিকতন্ত্রের উচ্ছেদসাধনের উদ্দেশ্যে সঙ্ঘবদ্ধ হইবার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন। ১৯১৭ সালে রুশদেশের বলশেভিক বিপ্লব ইহারই পরিণতি।

কিন্তু শুধু এই এক কারণে ১৮৪৮ সাল স্মরণীয় নহে। ঐ বৎসর বিখ্যাত ইংরাজ লেখক জন ষ্টুয়ার্ট মিল-রচিত অর্থনীতি সম্বন্ধে এক বিরাট গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে মিল অ্যাডাম্ স্মিথ রিকার্ডো প্রমুখ পূর্ব্বাচার্য্য-গণের মতামত একত্র সমাবেশ ও বিশ্লেষণ করিয়া অর্থশাস্ত্রের ভিত্তি নির্দ্দেশের চেষ্টা করেন। অ্যাডাম্ স্মিথ-এর দল অবাধ প্রতিযোগিতার উপর প্রতিষ্ঠিত উৎপাদন-ব্যবস্থাই জাতীয় সমৃদ্ধির প্রধান সহায়ক বলিয়া প্রচার করিয়া-ছিলেন। মিল জোর করিয়া বলেন উৎপাদন অপেক্ষাও প্রয়োজনীয় বিষয় বিতরণ, কেননা বহুমানবের শ্রম ও বুদ্ধির সহযোগে যে সম্পদ সৃষ্ট হয়, তাহা বহুমানবের মধ্যে যথাযথ বিতরিত না হইলে জাতীয় সমৃদ্ধি অর্থহীন বাক্যমাত্রে পর্য্যবসিত হয়, প্রকৃত যাহা হয় তাহা সম্প্রদায়বিশেষের অর্থাৎ

ধনিক্‌কুলের সমৃদ্ধি। মিল ঘোরতর ব্যক্তিত্ববাদী ছিলেন, তাই বিতরণ ব্যবস্থার সুনিয়ন্ত্রের জন্য তিনি সোশ্যালিজ্‌ম্‌-এর সমর্থন করেন নাই। কিন্তু জাতীয় সমৃদ্ধির যে ভিত্তি তিনি নির্দ্দেশ করেন তাহার উপর একদিকে ব্যক্তিস্বাধীনতালোপী সমাজতন্ত্র অপরদিকে লাভমূলক ধনিকতন্ত্র, এই দুইয়েরই পরিবর্ত্তে এক নবতর ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের ইঙ্গিত মিল-এর রচনায় প্রচ্ছন্ন ছিল বলিলে অন্যায় হইবে না।

আশ্চর্য্য এই মিল-এর গ্রন্থ প্রকাশিত হইবার কয়েক বৎসর পূর্ব্বে মিল-এর স্বদেশেই এই জাতীয় এক অভিনব ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। ১৮৪৪ সালের ডিসেম্বর মাসে ইংল্যাণ্ডের রক্‌ডেল সহরে আটাশ জন তাঁতী মিলিয়া একটি 'সমবায়' ভাণ্ডার স্থাপন করেন। এই ভাণ্ডারের মূল কার্য্যনীতি ছিল দুটি। প্রথমত, কারবারের উপর যে লাভ হইবে সভ্যেরা যিনি যে-পরিমাণ মূলধন যোগাইয়াছেন অর্থাৎ সমিতির অংশ কিনিয়াছেন তদনুযায়ী এই লাভের ভাগ দাবী করিতে পারিবেন না, যিনি যে-পরিমাণ সমিতির নিকট পণ্য ক্রয় করিবেন তদনুযায়ী এই লাভের ভাগ পাইবেন। দ্বিতীয়ত, সমিতির শেয়ার যে সভ্যের যতই হউক না কেন প্রত্যেকের ভোট মাত্র একটি—অর্থাৎ সাধারণ যৌথ কারবারে যেরূপ প্রতি শেয়ার পিছু একটি ভোট থাকে তাহার পরিবর্ত্তে ভোট থাকিবে মাথা পিছু একটি। এই দুটি সূত্রই ধনিক্‌তন্ত্রমূলক ব্যবসায়নীতির সম্পূর্ণ বিরোধী। সুতরাং রকডেল-এর সেই আটাশ জন তাঁতী অর্থনৈতিক জগতে এক বিপ্লবের সূচনা করেন বলা যাইতে পারে। কিন্তু এই বিপ্লব এত নীরবে ও ধীরে প্রচারলাভ করে যে পৃথিবীর অনেক লোকই এখনও জানেন না যে সমবায়ের সূত্র এক নবতর আর্থিক ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করিয়াছে।

কিন্তু সকলে জানুক বা না জানুক, আজ দেশবিদেশে রক্‌ডেল-মন্ত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে এবং সমবায় ভাণ্ডারের যে-দুইটি মূলনীতি প্রথম রকডেল-এ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল আজ তাহাদের অবলম্বন করিয়া শুধু সমবায় ভাণ্ডার নহে, সমবায় ঋণ সমিতি, সমবায় শস্যবিক্রয় সমিতি প্রভৃতি নানা জাতীয় সমবায় সমিতি গঠিত হইয়া পৃথিবীব্যাপী এক বিরাট সমবায় প্রচেষ্টা গড়িয়া উঠিয়াছে। এই প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য ব্যক্তিগত লাভের উচ্ছেদ করিয়া সমাজের

সকল শ্রেণীর মধ্যে জাতীয় সম্পদ বিতরণের ব্যবস্থা করা এবং এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য জাতীয় ও আন্তর্জ্জাতিক ক্ষুদ্র ও বৃহৎ নানা সমবায় সঙ্ঘ স্থাপন করিয়া পৃথিবীর সকল জাতির, মানবের সকল শ্রেণীর, স্বার্থ ও কল্যাণ একসূত্রে গ্রথিত করা। সোশ্যালিজম্ ব্যতীত যদি অপর কোনো 'ইকনমিক প্ল্যান' আজ পর্য্যন্ত পরিকল্পিত ও প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে তাহা এই সমবায় প্রচেষ্টা।

সমবায় বা সোশ্যালিজ্‌ম্-এর আদর্শ ন্যূনাধিক এক শতাব্দী হইল প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। কিন্তু 'ইকনমিক প্ল্যানিং' কথাটির প্রচলন হইয়াছে হালে। শুধু তাহা নয়, 'ইকনমিক প্ল্যানিং' বলিয়া যাঁহারা পাগল হইয়াছেন তাঁহারা সমবায় বা সমাজতন্ত্রবাদ এই দুইয়েরই ধার ধারেন না। তাঁহারা চান লাভমূলক ধনতন্ত্র এবং তাহারই আশ্রয়রূপে চান প্রতিভূ-শাসন-অবলম্বী গণতন্ত্র। কেন তাঁহারা হঠাৎ 'ইকনমিক প্ল্যানিং' বলিয়া ব্যস্ত হইলেন অতঃপর তাহার আলোচনা করা যাইতে পারে।

৫

১৯৩১ সালে অষ্ট্রিয়ার ক্রেডিট্ আন্‌স্টাল্ট্ নামক বিখ্যাত ব্যাঙ্কের জনৈক পরিচালক ব্যাঙ্কটির আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে তদন্ত করার জন্য তাগিদ দেন। এই তাগিদের ফল যে কিরূপ দাঁড়াইবে তাহা বোধ হয় তাঁহার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। তদন্ত করিয়া ব্যাঙ্কটির সম্পত্তির অবস্থা যাহা জানা গেল তাহাতে অষ্ট্রিয়া শুদ্ধ লোক চমকাইয়া উঠিল। দুদিন পরে ব্যাঙ্কটি দ্বার বন্ধ করিতে বাধ্য হইল। বর্ত্তমান জগতে টাকার লেনদেন ব্যাপারে এক দেশের সহিত অপরাপর দেশ অঙ্গাঙ্গিভাবে বিজড়িত। ক্রেডিট্ আন্‌স্টাল্ট্-এর পতন পৃথিবীব্যাপী এক গুরুতর সঙ্কটের সৃজন করিল। বর্ত্তমান যে অর্থসঙ্কটের কথা অহরহ শোনা যায় এই হইল তাহার সুরু। সার আর্থার সল্‌টার-এর 'রিকভারি' পুস্তক যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা এই সব কথা ভালো করিয়াই জানেন।

এই যে ব্যাপার ঘটিল তাহার জন্য অবশ্য ক্রেডিট্ আন্‌স্টাল্ট্-এর যে-পরিচালক তদন্তের তাগিদ দিয়াছিলেন তাঁহাকে দোষ দিলে চলিবে না। তিনি ভালো বুঝিয়াই ঐরূপ করিয়াছিলেন। ভিতরে ভিতরে যে ভাঙন

ধরিয়াছিল একদিন না একদিন তাহা ধরা পড়িতই, এবং এই ভাঙন ধরিয়াছিল শুধু অষ্ট্রিয়ার একটি ব্যাঙ্কে নয়, সমগ্র পৃথিবীর অর্থনৈতিক ব্যবস্থায়। তাই একটি ব্যাঙ্কের পতনের ধাক্কায় সমগ্র পৃথিবী অস্থির হইল।

অর্থনৈতিক জগতে ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার লীলা নিয়ত চলিতেছে। প্রসার ও সঙ্কোচ, সমৃদ্ধি ও সঙ্কট, দিন ও রাত্রির মত কারখানা-যুগের প্রারম্ভকাল হইতে পরস্পরের অনুসরণ করিয়াছে। আমেরিকার টাকার বাজারের কেন্দ্র ওয়াল ষ্ট্রীটের কার্য্যকলাপের খোঁজ যাঁহারা রাখেন তাঁহারা জানেন এক সময় শেয়ারের দাম কিরূপ চড়িয়া বাজার আগুন হইয়া উঠে, তাহার পর আবার বাজার পড়িতে আরম্ভ হয়, দেখিতে দেখিতে অনেক শেয়ার যে কোথায় তলাইয়া যায় তাহার ঠিকানাও পাওয়া যায় না এবং সঙ্গে সঙ্গে বহু ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান ব্যাঙ্ক প্রভৃতিরও অপঘাতমরণ হয়। অন্যান্য সব দেশেই এইরূপ হইয়া থাকে, তবে আমেরিকার মতন ব্যাপকভাবে আর কোথাও হয় না। বিশেষত, যুদ্ধের পর পৃথিবীর টাকার বাজারের কেন্দ্র লণ্ডন ছাড়িয়া নিউইয়র্ক-এ যখন হইতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে তখন হইতে এই অবস্থা ক্রমশ বাড়িয়া চলিয়াছে। বলা বাহুল্য 'ক্রেডিট্ আন্‌স্‌টাল্‌ট্'-এর পতনের ধাক্কায় ওয়াল ষ্ট্রীট একেবারে বিপর্য্যস্ত হইয়াছিল।

কেন এইরূপ অবস্থা হয়? এই জটিল প্রশ্নের উত্তর এক কথায় ঠিকভাবে বলা অসম্ভব, কেননা সমগ্র ধনিক্‌তন্ত্রের ব্যবস্থা বা অব্যবস্থার মধ্যে ইহার কারণ নিহিত আছে। মোটামুটি বলা যায় যে, ধনিক্‌সম্প্রদায়ের অত্যধিক লাভের ইচ্ছাই প্রধানত ভাগ্যের এইরূপ দ্রুত হেরফেরের জন্য দায়ী। কিন্তু সে যাহাই হউক, যুদ্ধের আগে পর্য্যন্ত যতদিন এই জাতীয় সমৃদ্ধি ও সঙ্কট অত্যন্ত ব্যাপক হইয়া উঠে নাই ততদিন ইহা অমোঘ প্রাকৃতিক নিয়মের ন্যায় অনিবার্য্য বলিয়া মানিয়া লওয়া হইত এবং ইহার প্রতিকারের জন্য লোকে বিশেষ মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন অনুভব করিত না।

মহাযুদ্ধের সময় জাতির সকল শক্তি, সকল সম্বল রাষ্ট্রের পরিচালনায় যুদ্ধ জয়ের উদ্দেশ্যে নিযুক্ত হইয়াছিল। রাষ্ট্র-ক্ষমতার এই আকস্মিক বিপুল প্রসার ব্যক্তিত্ববাদের পরিপন্থী হইলেও যুদ্ধের নেশায় লোকে তাহা নির্ব্বিবাদে মানিয়া লইল। কিন্তু যুদ্ধজয়ের পর যখন দলে দলে সৈন্য

যুদ্ধক্ষেত্র হইতে ঘরে ফিরিল তখন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের দোহাই দিয়া রাষ্ট্র-পরিচালকগণ তাহাদিগকে নিজ নিজ ভাগ্যান্বেষণের স্বাধীনতা দিলেন। ফলে কর্ম্মহীন বেকারের সংখ্যা বাড়িতে লাগিল। অপর পক্ষে, যুদ্ধবিরতির অবসাদের পর দেশে দেশে কারখানায় কারখানায় উৎপাদন কার্য্য নব উৎসাহে আরম্ভ হইল। ইতিমধ্যে বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে এমন সব যন্ত্রপাতি ও প্রক্রিয়া আবিষ্কৃত হইয়াছিল যে, পূর্ব্বাপেক্ষা কম শ্রমশক্তিতে অনেক বেশী উৎপাদনকার্য্য সম্ভব হইল। শুধু কারখানা-শিল্প নহে, কৃষিকার্য্যেরও দ্রুত প্রসার হইয়া উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ বাড়িয়া চলিল। কিছুকাল মনে হইল, পৃথিবীর ব্যবসাবাণিজ্য মহাযুদ্ধের ধাক্কা সামলাইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু দেখা গেল উপার্জ্জনহীন বেকারের সংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছে। তদুপরি জার্ম্মানী প্রভৃতি বিজিত দেশের নিকট ক্ষতিপূরণের যে দাবী করা হইল অন্যান্য দেশে, বিশেষত আমেরিকায়, পণ্য বেচিয়া তাহা পরিশোধ করিবার পথ বন্ধ করা হইল উচ্চহারে শুল্ক বসাইয়া। তাহা ছাড়া আমেরিকা ও ফ্রান্‌স্‌-এ অন্যান্য দেশ হইতে যুদ্ধ-ঋণ পরিশোধ ও ক্ষতিপূরণ বাবদ যে-পরিমাণ সোনা জমিয়া উঠিল অন্যান্য দেশে সোনার ভাগ সেই পরিমাণ কমিল। ফলে, বিভিন্ন দেশের আপেক্ষিক মুদ্রা-মূল্য বিপর্য্যস্ত হইয়া ব্যবসা-বাণিজ্য হইল এক প্রকার অচল। এইভাবে নানা কারণে দাহ্য পদার্থ স্তূপীকৃত হইলে ক্রেডিট্‌ আন্‌স্‌টাল্‌ট্‌-এর পতন তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিল মাত্র।

এই যে প্রচণ্ড সঙ্কট ইহার বিশেষত্ব এই যে, একদিকে পণ্য বা ফসল উৎপাদন হইতেছে বিপুল পরিমাণে কিন্তু ক্রেতার অভাবে তাহার দাম উঠিতেছে না, অপরপক্ষে অগণিত লোক আহার্য্য পরিধেয় যাহা নিতান্ত না হইলে নয় তাহারও সংস্থান করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। পৃথিবীতে এইরূপ অবস্থা ইতিপূর্ব্বে এমন ব্যাপক ভাবে কখনো হয় নাই। ধনী ও দরিদ্র চিরকালই পৃথিবীতে আছে। কারখানা-যুগের আদি হইতে ধনী ও দরিদ্রের ব্যবধান ক্রমশ বাড়িয়া গিয়াছে। অগণিত অর্দ্ধভুক্ত জীর্ণবাস শ্রমিকের শ্রমশক্তি মুষ্টিমেয় ধনিকের স্বাচ্ছন্দ্য ও বিলাসের উপকরণ যোগাইয়াছে। কিন্তু ধনিকতন্ত্রের উৎপাদন-বিতরণ-ব্যবস্থা তাহাতে কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই। কৃষিজীবী বা শ্রমজীবীদের অবস্থা যতই শোচনীয় হউক না কেন, নিত্যব্যবহার্য্য

দ্রব্যাদি সামান্য আয়ের মধ্যে যতটা পারা যায় তাহারা কিনিবেই। সুতরাং ধনিকতন্ত্রের উৎপাদন-যন্ত্র অবিরত চলিয়াছে এবং ভারে ভারে পণ্য উদ্‌গীরণ করিয়া ধনিক্‌কুলের রাশি রাশি লাভের সংস্থান করিয়াছে। কিন্তু বহুদিনকার ফাঁকি জমিয়া আজ এই যন্ত্রটি অচল। তাই হঠাৎ লোকের খেয়াল হইল, তাই তো, শুধু উৎপাদন করিলে চলিবে না, চাই বিতরণের ব্যবস্থা, এবং এই ব্যবসা যে এতদিন ধনিক্‌সম্প্রদায়ের স্বার্থান্বেষণ-চেষ্টা ব্যতীত অন্য কোনো শক্তিতে পরিচালিত হয় নাই স্বীকার না করিলেও সকলের কাছে তাহা স্পষ্ট হইয়াছে। মিল বিতরণ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, আজ ধনিক্‌সম্প্রদায়ের মুখে তাহা বাঁধা বুলির মত হইয়া উঠিয়াছে। কি করিয়া বিতরণের সুব্যবস্থা করিতে পারা যায় ধনিক্‌সম্প্রদায়ের ইহাই এখন প্রধান চিন্তার বিষয়। মার্কস্ অবশ্য বিতরণের পন্থা নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা ধনিক্‌তন্ত্রের বিনাশের পন্থা। সমবায় প্রচেষ্টা উৎপাদন ও বিতরণের সাম্যস্থাপনের চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু এই চেষ্টা এত মন্থর গতিতে হইতেছে যে, ধনিক্‌সম্প্রদায়ের সম্মুখ যে আশু বিপদ তাহা হইতে নিস্তার সমবায়দ্বারা অসম্ভব। তাহা ছাড়া সমবায়ের চরম পরিণতি ধনিক্‌সম্প্রদায়ের স্বার্থবিরোধী, তাই আজ ইউরোপের প্রায় সকল দেশেই ধনিক্‌গণ সাধ্যমত সমবায় প্রচেষ্টার বিরুদ্ধাচরণ করিতেছে। এই অবস্থায় উপায় কি? হঠাৎ শোনা গেল, উপায় ইকনমিক প্লানিং বা সমৃদ্ধিলাভের বৈজ্ঞানিক সঙ্কল্প অর্থাৎ রাষ্ট্রকর্ত্তৃক উৎপাদন ও বিতরণের সাম্য-স্থাপনের ব্যবস্থা। যাঁহারা একদা ব্যবসাবাণিজ্যের উপর রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে ব্যক্তিস্বাধীনতার নামে তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, আজ তাঁহারাই ঐ ব্যক্তিস্বাধীনতার দোহাই দিয়া বলিতেছেন— সম্মুখে রহিয়াছে মার্কস্-পন্থা, যে-পথে রাশিয়া গিয়াছে এবং যে-পথে সভ্যতার (অর্থাৎ আমাদের) বিনাশ; সুতরাং নিষ্কৃতির উপায় অবাধ প্রতিযোগিতার নিয়ন্ত্রণ যাহাতে ধনিক্‌তন্ত্রের উৎপাদন-যন্ত্র একেবারে অচল হইয়া না পড়ে।

ইহাই হইল ইকনমিক প্ল্যানিং-এর উৎপত্তি ও উদ্দেশ্য।

৬

ভিক্টোরীয় যুগের ইংরাজ দার্শনিক হার্ব্বার্ট স্পেন্‌শার ব্যক্তিত্ববাদের সমর্থনে রাষ্ট্রের ক্ষমতা প্রায় নির্ম্মূল করিয়া নৈরাজ্যের সদর দরজা পর্য্যন্ত

অগ্রসর হইতে কুণ্ঠিত হন নাই। কিন্তু অন্দরে প্রবেশ করিতে তাঁহার সাহসে কুলাইল না। তাই ব্যক্তিস্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার উদ্দেশ্যে তিনি চাহিয়াছিলেন শুধু ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও প্রাণরক্ষার জন্য রাষ্ট্রীয় বিধান—আর কোনো বিধান তিনি সঙ্গত বলিয়া মানিতেন না। এই জন্য তাঁহার ব্যক্তিত্ববাদকে উপহাস করিয়া বলা হইয়াছে পাহারাওয়ালাযুক্ত নৈরাজ্য (anarchism plus the police constable)।

আজ পৃথিবীতে যে দুইটি আদর্শ দুই বিপরীত চিন্তাস্রোতের সৃষ্টি করিয়াছে তাহার একটির চরম প্রকাশ দেখা যায় রুশদেশে। এখানে ব্যক্তিগত সম্পত্তির উচ্ছেদ এবং রাষ্ট্রক্ষমতার সর্ব্বব্যাপী প্রসার যে নববিধানের প্রবর্ত্তন করিয়াছে তাহার চরম লক্ষ্য যে নৈরাজ্য ও পূর্ণ ব্যক্তিতন্ত্র একথা মার্কস্‌-পন্থীরা নিজেরাই বলিয়া থাকেন। কিন্তু চরম লক্ষ্য যাহাই হউক, বর্ত্তমানে সামাজিক কল্যাণের যূপকাষ্ঠে পরাক্রমশালী সম্প্রদায়বিশেষ যে নিঃসঙ্কোচে ব্যক্তিত্বের বলিদানে ব্রতী হইয়াছেন ইহা অবিসম্বাদিত। পৃথিবীর লোকে এই নৃশংসতায় শিহরিয়া উঠিয়া কি উপায়ে এই অমানুষিক আদর্শের প্রচার প্রতিরোধ করা যায় সেই চিন্তা করিতেছে। এই চিন্তাধারার গতি একটু তলাইয়া দেখিলে স্পষ্ট বোঝা যায় রুশদেশের বলশেভিষ্ট শাসন-তন্ত্রের বিরুদ্ধে আপত্তি শুধু ব্যক্তিগত রাষ্ট্রিক স্বাধীনতার লোপের অজুহাতে ততটা নয়, যতটা ব্যক্তিগত সম্পত্তির উচ্ছেদের অজুহাতে। তাই ইটালি ও জার্ম্মানী এই দুই দেশেই বলশেভিক শাসনতন্ত্রের পরিপন্থী যে নব শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তিত হইয়াছে তাহার ফলে রুশদেশ অপেক্ষাও বোধ হয় নৃশংসতরভাবে শাসকসম্প্রদায় সর্ব্বগ্রাসী রাষ্ট্রের দোহাই দিয়া ব্যক্তিগত অধিকার খর্ব্ব করিয়াছেন শুধু এক উদ্দেশ্যে—ব্যক্তিগত সম্পত্তির ভিত্তির উপর স্থাপিত ধনিকতন্ত্রের যাহাতে বিনাশ না হয়।

হার্ব্বার্ট স্পেন্‌শার চাহিয়াছিলেন ব্যক্তিগত প্রাণ ও সম্পত্তির রক্ষা এবং এই এক উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোনো উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রীয় বিধানদ্বারা ব্যক্তিত্বস্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হইবে না এই ছিল তাঁহার মত। আজ ফাসিষ্ট ও নাৎসি-সম্প্রদায়, রাশিয়াতে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও সম্পত্তির উচ্ছেদ করিয়া যে সর্ব্বগ্রাসী রাষ্ট্র প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহার পরিবর্ত্তে চাহিতেছেন এমন রাষ্ট্র গড়িয়া তুলিতে যাহা স্বৈরাচারে

ও প্রজাশক্তির লোপে বর্ব্বর যুগের রাজশক্তিকেও হার মানাইবে, কিন্তু যে-রাষ্ট্রের একাধারে আশ্রিত ও আশ্রয় হইবে ব্যক্তিগত সম্পত্তিভোগী ধনিক্-সম্প্রদায়। এইভাবে একদিকে আদিম বর্ব্বরযুগের প্রত্যাবর্ত্তন, অপরদিকে নৈরাজ্য-অভিসারী বলশেভিকদের নববিধানের প্রবর্ত্তন—এই দুই সমূহ বিপদের মধ্যে দাঁড়াইয়া শুধু ব্যক্তিগত সম্পত্তি নহে, ব্যক্তিগত রাষ্ট্রিক অধিকারে বিশ্বাসী অন্যান্য দেশের ধনিকসম্প্রদায় 'ইকনমিক্ প্লানিং' মন্ত্র জপ করিয়া প্রলয়ান্ধকারে আলোকের সন্ধান করিতেছেন। তাঁহারা আশা করিতেছেন ব্যক্তিগত সম্পত্তি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া এবং ব্যক্তিগত রাষ্ট্রিক্ অধিকার খর্ব্ব না করিয়া এমন ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন যাহার ফলে ক্রেতা ও বিক্রেতা, উৎপাদক ও ব্যবহারক, সকলের স্বার্থ রাষ্ট্রীয় বিধানদ্বারা নিয়মিত হইয়া অর্থনৈতিক আদানপ্রদানে সাম্যের প্রতিষ্ঠা করিবে। এইভাবে ধনিকতন্ত্রও প্রাণে বাঁচিবে, ব্যক্তিত্ববাদেরও মানরক্ষা হইবে। অবশ্য, ব্যক্তিত্ববাদের প্রধান সূত্র, অবাধ প্রতিযোগিতার বুলি, ইতিপূর্ব্বেই বর্জ্জিত হইয়াছে। কিন্তু উপায় কি? ব্যক্তিত্ববাদীরা শুধু আদর্শনিষ্ঠার নহে, পাণ্ডিত্যেরও দাবী করেন, সুতরাং সর্ব্বনাশের সমুপস্থিতিতে তাঁহারা বিন্দুমাত্র অধীর না হইয়া শান্ত স্থির ভাবে 'অর্দ্ধং ত্যজতি'—এই উদাহরণ দেখাইতে কুণ্ঠিত হন নাই। *

শ্রীহিরণকুমার সান্যাল

* পলিটিক্স ক্লাব-এর অধিবেশনে পঠিত
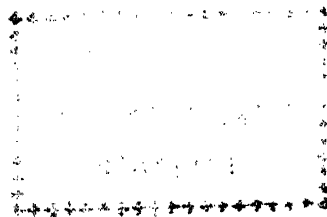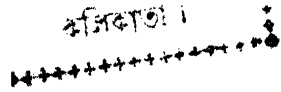
সুন্দর ও বাস্তব

সুন্দর কথাটা এখানে সেই উন্নীত অর্থে ব্যবহার করা হবে যে-অর্থে বেটোফেনের নবম সিম্‌ফনি সুন্দর, রবীন্দ্রনাথের নিরুদ্দেশ-গামী বলাকা সুন্দর, আশ্বিনের বৃষ্টিরিক্ত মেঘের উপর সূর্য্যাস্তের অন্তিম বর্ণচ্ছটা সুন্দর। এই অর্থ করার পক্ষে সাহিত্যিক প্রচলন ও আভিধানিক গবেষণায় কতখানি সমর্থন পাওয়া যাবে সে-প্রশ্ন আপাতত অনাবশ্যক। মণিমুক্তা-খচিত সুগঠিত অলঙ্কারের সৌন্দর্য্যে যখন চমক লাগে, জ্যৈষ্ঠের রৌদ্রক্লান্ত সন্ধ্যার গুমোট ভেঙ্গে স্নিগ্ধ দখিন হাওয়া বইলে যখন বলি সুন্দর বাতাস দিচ্ছে, ধ্যানচাঁদের ষ্টিক চালানোর নিখুঁত কৌশলে মুগ্ধ হয়ে যখন ব'লে উঠি কি সুন্দর,—তখন সুন্দরের সঙ্গে প্রীতিকর ও তুষ্টিকরের অযথা গোল পাকানো হয়। সুন্দর-যে সে প্রীতিকর হতেও পারে, কিন্তু প্রীতিকরতা তার মর্ম্মকথা নয়, অপরিহার্য্য অঙ্গও নয়। ম্যাক্‌বেথ্‌কে প্রীতিকর বলা শক্ত হবে, যদিও সৌন্দর্য্যের দাবী তার অবিসংবাদিত। অবশ্য সৌন্দর্য্য-উপলব্ধি মাত্রই আনন্দময়; সে-আনন্দের স্ফুরণ কিন্তু চিত্তের ঊর্দ্ধতম অন্তরীক্ষে, সন্দেশভক্ষণজাত প্রীতির সমপর্য্যায়ে তাকে ফেলা যায় না।

তত্ত্বান্বেষী মনে স্বতই প্রশ্ন জাগে, সৌন্দর্য্যের অবস্থিতি কোথায়, সে কি দৃশ্য বস্তুর ধর্ম্ম, না দ্রষ্টার মনোগত প্রতিক্রিয়া মাত্র। প্রাচীনেরা যত সহজে যত নির্ভয়ে এই সমস্যার নিরাকরণে এগুতেন, দর্শনের বর্ত্তমান জটিলতায়,—বাস্তব ও অবাস্তব, সত্য ও অসত্য, প্রত্যক্ষ ও কল্পনার সীমারেখা নিয়ে যখন বাদ-প্রতিবাদের অন্ত নেই,—আমরা স্বভাবতই তাতে বঞ্চিত। যাঁরা বলতেন সৌন্দর্য্য বস্তুগত, আমাদের দেখা না-দেখার উপর নির্ভর করে না, তাঁদের প্রমাণের ভিত্তি ছিল সুন্দর বস্তুর কোনো একটি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাস্তব গুণের সঙ্গে তার সৌন্দর্য্যের সমীকরণ। প্রতিসাম্য অর্থাৎ symmetry গুণটাই বিশেষরূপে তাঁদের চোখে পড়েছিল। ঐ শব্দের একটা সুবিদিত সংজ্ঞা গণিতশাস্ত্রে দেওয়া হয়ে থাকে, সে-সংজ্ঞা অনুসারে অল্প বিস্তর প্রতিসাম্য শতদল পদ্মে কিংবা তাজমহলে পরিলক্ষিত হয় সন্দেহ নেই। কিন্তু গহন অরণ্যকে, নিঃশব্দ অন্ধকার রাত্রির

তারকা-খচিত ছায়াপথ-প্রজ্বলিত আকাশকে, অথবা মানবজীবনেরই মত প্রকাশ-বৈচিত্র্যবান ফর্সাইট্-সাগাকে প্রাতিসাম্যিক বলতে গেলে ঐ নিরীহ শব্দের উপর বড় বেশী অত্যাচার করা হয়। তা' ছাড়া সৌন্দর্য্য আর প্রতিসাম্য যদি সমার্থবাচক হয় তা' হলে স্বীকার করতেই হবে যে, একটি সযত্ন-অঙ্কিত নিখুঁত বৃত্তের মূল্য মোনা লিসার ছবির চেয়ে বহু গুণে বেশী। প্লটাইনস্ বস্তুর সারল্যের মধ্যে তার সৌন্দর্য্যের সন্ধান পেয়েছিলেন, বর্ক্ আয়তনের স্বল্পতায়।

পক্ষান্তরে যাঁরা সৌন্দর্য্যের অবস্থিতি দ্রষ্টার মনের মধ্যে নির্দ্দেশ করতেন, প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে তাঁদের সম্বল ছিল একটি অব্যর্থ যুক্তি। সৌন্দর্য্য যদি বস্তুরই ধর্ম্ম হয় তা' হলে সুন্দরের বিচারে এমন অসীম বৈষম্য দেখা যায় কেন। যে-তাজমহলের শুভ্র সমুজ্জ্বল মূর্ত্তি রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভাকে উদ্ভাসিত ক'রে দিয়েছিল, অল্ডস্ হক্স্লির বিশ্লেষণী দৃষ্টিতে তা' স্থাপত্য-শিল্পের অজস্র দোষে দুষ্ট। টল্স্টয় শেক্স্পীয়রের বিপুল বিধাতৃতুল্য সৃষ্টির কোনোই মূল্য দিতে প্রস্তুত ন'ন। চৈনিক বা রাজপুত দ্বিরায়তনিক চিত্রের সমাদর বিশেষজ্ঞের কাছে কম নয়, কিন্তু আমরা ক'জন তাতে রস পাই? বিচারের বৈপরীত্য প্রমাণ করছে যে, তাজমহল স্বয়ং সুন্দরও নয় অসুন্দরও নয়; রবীন্দ্রনাথের মনে ঐ বস্তুর সাক্ষাতে যে-অনুভূতি জাগে সৌন্দর্য্য তারি ধর্ম্ম, এবং হক্স্লির মনে যে-ভাবের উদ্রেক হয় তাকেই অসুন্দর বলা সমীচীন। তাজমহল একই কালে সুন্দর এবং অসুন্দর হতে পারে না, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের অনুভূতি যদি সুন্দর হয় এবং হক্স্লির অনুভূতি অসুন্দর—তাতে কোনো নৈয়ায়িক বিসংবাদ নেই।

এ-যুক্তির প্রামাণ্যতায় যাঁরা বিশ্বাসী তাঁরা হয় ত ভেবে দেখেননি যে, এর সার্থকতা সৌন্দর্য্য-গুণেই নিঃশেষ হয়ে যায় না, এর সাহায্যে বস্তুর সমস্ত গুণকে নির্ব্বিশেষে মনোগত ব'লে প্রমাণ ক'রে দেওয়া যায়। ম্যালেরিয়াজ্বরাক্রান্ত রোগী যখন শীতে কাঁপছে তখন হয় ত আপনি পাশে ব'সে ঘেমে অস্থির হচ্ছেন। অতএব কক্ষস্থ বায়ুমণ্ডল শীতলও নয় উষ্ণও নয়, ও-দুটো বিশেষণ আপনাদের বিভিন্ন অনুভূতির ক্ষেত্রেই

প্রযোজ্য। এই চিন্তাধারা অনুসরণ ক'রে লক্ বস্তুর গুণসমূহকে দুই পর্য্যায়ে ভাগ করেন। প্রথম পর্য্যায়ের গুণ হল আকৃতি, অভেদ্যতা প্রভৃতি, বস্তুর নিজস্ব ও নিরপেক্ষ ধর্ম্ম। দ্বিতীয় পর্য্যায়ের গুণ হল বর্ণ গন্ধ উষ্ণতা ইত্যাদি, এদের উৎপত্তি বিষয় ও বিষয়ীর সংঘাতে, অবস্থিতি প্রত্যক্ষকারীর চৈতন্যে। বস্তু, অর্থাৎ দ্রব্য নামক এক অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় ঐক্যসূত্রে গ্রথিত প্রথম পর্য্যায়ের গুণসমষ্টি, দ্বিতীয় পর্য্যায়ের গুণের অনুভূতি প্রত্যক্ষীর মনে উদ্রেক করতে পারে মাত্র, তাদের সঙ্গে এর চেয়ে ঘনিষ্ঠতর কোনো সম্বন্ধ নেই তার। পদার্থবিদ্যা তার অধুনাতন ভীতিপ্রদ গাণিতিক উর্ণাজালে জড়িত হওয়ার আগে পর্য্যন্ত মোটামুটি এই মতেরই সমর্থন ক'রে এসেছে। এ-যুক্তিধারার অব্যর্থ নৈয়ায়িক পর্য্যবসান যে বিশুদ্ধ বিজ্ঞানবাদে, বর্ক্‌লীকে সে-সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে খুব বেশী বেগ পেতে হয়নি। একটি পয়সাকে সামনে থেকে দেখলে বৃত্তাকার দেখায়, পাশ থেকে বৃত্তাভাসিক, দূর থেকে বিন্দুবৎ। এর মধ্যে বৃত্তটাকে পয়সার নিজস্ব ধর্ম্ম এবং অন্যগুলোকে মনোগত বলা অন্যায় পক্ষপাত। নৈয়ায়িক সঙ্গতির দাবী মানলে স্বীকার করতে হবে যে, আকৃতিও মনোগত, প্রত্যক্ষকারীর বেদনামাত্র। তেমনি অভেদ্যতাও আমাদের ত্বাচ ও গতিবেদনী (kinaesthetic) প্রত্যক্ষের উপর নির্ভরশীল। যে-যুক্তিপ্রয়োগে লক্ দ্বিতীয় পর্য্যায়ের গুণগুলিকে মনোগত প্রমাণ করেছিলেন, অবিকল সেই যুক্তিই প্রথম পর্য্যায়ের বেলাতেও কার্য্যকর। সুতরাং বস্তুর নিজস্ব কোনো গুণ আর অবশিষ্ট থাকে না, সমস্তই প্রত্যক্ষীর চৈতন্যভুক্ত হয়ে পড়ে; এবং এ-অবস্থায় নির্গুণ, কাজে কাজেই সম্পূর্ণ অজ্ঞেয়, বস্তুর বাস্তবতায় বিশ্বাস ধার্ম্মিক-সুলভ গোঁড়ামি। এর পরে স্বপ্নে কল্পনায় প্রতিভাসে ও প্রত্যক্ষে তফাৎ করতে যাওয়া বিড়ম্বনা, এর সবগুলিই এখন সমানভাবে মনোগত। এই অপ্রত্যাশিত ও অসহ্য সিদ্ধান্তে দর্শন শাস্ত্রে একটা সাড়া প'ড়ে গেল, কাণ্ট্ থেকে আরম্ভ ক'রে আজ পর্য্যন্ত অনেক ছোট বড় দার্শনিককে এর খণ্ডনের চেষ্টায় প্রাণপাত করতে হয়েছে। উপরি-উক্ত মতগ্রহণে জ্ঞানতান্ত্রিক ও বস্তুতান্ত্রিক উভয় দলই সমান পরাঙ্মুখ হলেও, জ্ঞানতান্ত্রিক সে-সমস্যার পাশ কাটিয়ে চলতেই

অভ্যস্ত। গুণের প্রতীয়মান বৈষম্যের সঙ্গে তার জ্ঞান-নিরপেক্ষতার সামঞ্জস্য-বিধানে অধুনাতন বস্তুতান্ত্রিকদের গবেষণা সর্ব্ববাদিস্বীকৃত না হলেও প্রণিধান-যোগ্য। তাঁরাও কিন্তু তৃতীয় পর্য্যায়ের গুণ অর্থাৎ সৌন্দর্য্য শ্রেয়তা ও সত্যের অবস্থিতি-নির্ণয় নিয়ে দিশেহারা হয়েছেন। সে যাই হোক, এ-সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্তে যে-কথাটা বর্ত্তমান আলোচনায় প্রাসঙ্গিক সেটা এই যে, কোনো ক্ষেত্রে দ্রষ্টার বিচারের বৈষম্য বিচার্য্য বিষয়ের মনোগত হবার অকাট্য প্রমাণ—এ-কথা মতবাদ নির্ব্বিশেষে কোনো দার্শনিকই আজ মানতে প্রস্তুত ন'ন।

সৌন্দর্য্যানুভূতির যে-লক্ষণটা সবচাইতে সুবিদিত ও অপ্রতর্কিত সে হচ্ছে তার তন্ময়তা। সুন্দরের ধ্যানে অপরাপর সকল বিষয়ের অবগতি হতে মন আকুঞ্চিত হয়ে নিবিড় একাগ্রতায় অন্তঃপ্রবিষ্ট হয় তার মধ্যে, আমাদের চিত্তপটভূমিতে তারি চিত্র অপ্রতিহত একাধিপত্যে বিরাজ করে, অন্য সমস্ত তুলির আঁচড় মিলিয়ে যায় অচৈতন্যের ঘনান্ধকারে। একাধিপত্য কিন্তু বাস্তবতার পরিপন্থী; কারণ কাণ্টের দোহাই না পেড়েও আজ আমরা নির্ব্বিবাদে বলতে পারি যে, কোনো বস্তুর বাস্তবতার মানেই হচ্ছে অপরাপর সকল বস্তুর সঙ্গে তাকে কতকগুলো নিত্য ও সার্ব্বভৌম নিয়মের সূত্রে গ্রথিত করা। এই নিয়মসূত্রগ্রন্থনে যে-বস্তু বাধা দেয়, যার ব্যবহারে ব্যত্যয় ঘটে তাকেই আমরা বলি অলীক, অধ্যাস, অবাস্তব। যেমন রজ্জুদর্শনে সর্পভ্রম। সে-সর্প আপন জৈব ধর্ম্ম পালন করে না, কাছে গেলে ফণা উদ্যত ক'রে ছোবলাতে আসে না, তাড়া করলে বঙ্কিম গতিতে পালায় না,—কাজেই তাকে আমরা বলি অবাস্তব। সুন্দর বস্তু আপনার অস্তিত্বের নিবিড়তায় সমগ্র চৈতন্যকে এমনভাবে আপ্লুত ক'রে দেয় যে, সেখানে আর কোনো কিছুর অবকাশমাত্র থাকে না। সুতরাং অন্যান্য বস্তুর সঙ্গে তার সম্বন্ধ-বন্ধনের কথাই ওঠে না। বাস্তব তাকে বলতে পারি না যেহেতু বস্তুর সঙ্গে বস্তুর সম্বন্ধতন্তুজাল বুনে আমরা যে বাস্তবজগৎ রচনা করেছি সেখানে তার স্থান নেই। অবাস্তবও তাকে বলা চলে না, কারণ অবাস্তবতার মানেই নিয়মকে লঙ্ঘন করা, সম্বন্ধকে অস্বীকার করা; সম্বন্ধ যেখানে আরোপিত হয়নি অবাস্তবতা সেখানে অর্থহীন। অতএব

সুন্দর-যে সে বাস্তব-অবাস্তব-বহির্ভূত, বাস্তবতা-অসম্পৃক্ত, দর্শনের পরিভাষায় সদসৎ-অবিলক্ষণ। দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরা যাক গোলাপ ফুলের কথা। সাধারণ দৃষ্টিতে যখন তাকে দেখি তখন সে পুষ্পপাত্রে সুবিন্যস্ত, গৃহ সজ্জার অঙ্গ, চিত্ত-বিনোদনের উপাদান। অথবা সে উদ্যান-বৃক্ষে বৃন্ত-সংলগ্ন, সজীব; মাটি থেকে আহরণ করছে খাদ্য, সূর্য্যালোক থেকে সঞ্চয় করছে শক্তি। সেই পুষ্পটি যখন সৌন্দর্য্যধ্যানে প্রস্ফুটিত হয় তখন বাইরের সঙ্গে তার সম্বন্ধ গেছে ঘুচে, সে আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ। তখন তাকে বাস্তব বলব কোন অধিকারে? এমন মনে করলে অন্যায় হবে যে, গোলাপ ফুলের বর্ণ গন্ধ ওজন আকৃতি বাস্তব, শুধু তার সৌন্দর্য্য নামধারী অলৌকিক গুণটাই বাস্তবতা-অসম্পৃক্ত। ব্যাবহারিক বা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে গোলাপের বাস্তবতা নিঃসন্দেহ, কিন্তু রূপদ্রষ্টার ধ্যানদৃষ্টিতে সমগ্র ফুলটাই বাস্তবসত্তার বৃন্তচ্যুত হয়ে খসে পড়ে কল্পনার শূন্যমার্গে। সুন্দরের এই বন্ধন-মুক্তি ও অন্তরীক্ষ-প্রয়াণ সাধনা ব্যতীত সম্ভব নয়। আমাদের চিত্ত আপন সহজাত প্রবৃত্তির তাড়নে সব কিছুকে কোনো না কোনো উপায়ে বাস্তবের জালে ফেলতে সর্ব্বদা তৎপর। সে-প্রবৃত্তিনিরোধ ও নিরালম্ব ধ্যানে সক্ষম-যে তাকেই বলা যায় রূপদক্ষ। আরো অধিক ক্ষমতা চাই শিল্পীর, যে এই তপস্যালভ্য দৃষ্টিকে অভিব্যক্ত করতে পারে এমন শব্দ-বিন্যাসে বা বর্ণ-সংস্থানে যার মারফতে রূপদক্ষতা-বঞ্চিত সাধারণ মানুষও সুন্দরের ত্রিদিব-সীমানাতে অনায়াসে উপনীত হয়।

সুন্দরকে নিরালম্ব ও স্বয়ং-সম্পূর্ণ বলার মানে এ নয় যে তার সঙ্গে জীবনের ইতিহাসের সভ্যতার ক্রমবিবর্ত্তনধারার কোনো যোগাযোগ নেই। সৌন্দর্য্য, তা' সে প্রাকৃতই হোক আর শিল্পপ্রসূতই হোক, মানব মনের ক্রমবিকাশের সঙ্গে পা মিলিতে চলতে বাধ্য, তাতে জীবনের চিত্রল ছায়া পড়বেই। এ-যুগের শিল্পীদের চিত্রকল্প (imagery) ও মানসপ্রতীক বিশ্লেষণ ক'রে ফ্রয়েড তাতে অবলুপ্ত মিসরী সভ্যতার আভাস পেয়েছেন— সে-কথা উল্লেখ করা এখানে নিষ্প্রয়োজন। জ্ঞানত অজ্ঞানত বর্ত্তমান ও অতীত সমাজ-পরিবেষ্টনীর সংস্পর্শ এড়িয়ে চলা আমাদের সাধ্যের বাইরে। এ-সত্যের গুরুত্ব অতি বড় মূর্খও অস্বীকার করবে না, কিন্তু এ-কথা ভুললেও

অন্যায় হবে যে, এই পরম সত্যটির অবগতি আমাদের শিল্প-সমালোচনী এবং ইতিহাস-সন্ধানী দৃষ্টিভঙ্গিতেই আবদ্ধ। যখন আমরা একাগ্র স্তিমিত চিত্তে সুন্দরের ধ্যানে নিমগ্ন, তখন জীবনের সমাজের বহিঃসংসারের কোনো অস্তিত্ব নেই। প্রকারান্তরে বলা যেতে পারে যে, সমগ্র বিশ্বজগৎ তখন সেই সুন্দরের ধ্যানলব্ধ মূর্ত্তিতে অন্তর্লীন হয়ে তাকে অপ্রতিদ্বন্দ্বিত সত্তাগৌরবে গরীয়ান ক'রে তোলে। বাস্তব তথ্যের আছে বহিঃসঙ্গতির বিস্তৃত জাল, বাস্তব-সম্পর্কবিহীন সুন্দরের আছে অন্তঃসঙ্গতির বিপুল ঐশ্বর্য্য। এই অন্তঃসঙ্গতিকে এলেক্‌জ্যাণ্ডার সুন্দরের কেবল কল্পনামূর্ত্তি নয়, তার যে প্রত্যক্ষগোচর বাস্তব ভিত্তি, তারও বৈশিষ্ট জ্ঞান করেন। কিন্তু রূপদ্রষ্টার সৌন্দর্য্য-স্বপ্নপ্রয়াণের যে-পাথুরে ভূমিতে যাত্রারম্ভ, তার কি কোনো বৈশিষ্ট থাকে, কিংবা থাকবার প্রয়োজন আছে? সে হতে পারে ফুল, পাখী, নারিকেলকুঞ্জের ছায়া, আড় চোখের বাঁকা চাউনি, নির্ব্বোধ শিশুর অহৈতুক কান্না। এই অতি সাধারণ অকিঞ্চিৎকর বাস্তবের টুক্‌রোকে কল্পনার বৃহৎ পরিপ্রেক্ষিতে সংস্থিত ক'রে, সমস্ত জীবনের সমস্ত ইতিহাসের অভিজ্ঞতায় তাকে সমৃদ্ধ ক'রে যে-তপস্যালভ্য ধ্যানগম্য মূর্ত্তি গঠন করা হয়, তার মধ্যেই আমরা পাই ঐক্য, সঙ্গতি, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের স্নিগ্ধ সমাবেশ।—প্রশ্ন উঠতে পারে, মৃণাল-বাহু সম্বন্ধে গানের কাব্যের চিত্রের ইয়ত্তা নেই, কিন্তু ড্রেন পাইপ শিল্পীমাত্রেরই অবজ্ঞাভাজন—এর হেতু কী? এর হেতু মৃণাল-বাহু ও ড্রেন পাইপের কোনো বস্তুগত পার্থক্যে খুঁজলে চলবে না। এর জন্য দায়ী আমাদের সুকুমার কলাপদ্ধতির যুগযুগান্তর-ব্যাপী প্রথা। বংশানুক্রমে আমরা প্রীতিকরের মর্ম্মর-বেদীতে সুন্দরের উপাসনা ক'রে এসেছি। অপ্রীতিকরের মধ্যে রূপসাধনা বিংশ শতাব্দীর নবধর্ম্ম। এ-ধর্ম্মের ঐতিহ্য গ'ড়ে উঠুক, এর প্রভাব শোণিতে প্রবেশ করুক, এর মন্ত্র ধ্বনিত হোক দেশে দেশান্তরে,—তখন যাচাই করবার সময় আসবে ড্রেন পাইপ আর ডাঁটাচচ্চড়ি কাব্যের বর্ণাশ্রমে সত্যিই অস্পৃশ্য কি না।

এতক্ষণ সৌন্দর্য্যের অন্তর্নিহিত সামঞ্জস্য ও অনন্যযোগিতার কথাই বলা হল। কিন্তু তার স্বাতিক্রমণের (self-transcendence) যে একটা দিক আছে সে-কথাও আলোচনার যোগ্য। সত্য বটে,

তার কল্পনা-দৃষ্টির অখণ্ডতায় বহির্জগতের যাবতীয় ক্ষুদ্র ও বৃহৎ বস্তু-সমারোহ অবলুপ্ত ; কিন্তু দ্রষ্টা স্বয়ং তখন অবলুপ্তও নয়, সুন্দরের ব্যক্তি-স্বরূপে বিলীনও নয়। বরং সেই মুহূর্ত্তেই সে আপনার গভীরতম সত্তার নাগাল পায়। বলা যেতে পারে যে, সুন্দরের অভিজ্ঞতায় বিষয় ও বিষয়ীর সমস্ত বিভেদ সমস্ত ব্যবধান ঘুচে যায়, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় তাদের সাহিত্য অর্থাৎ সম্মিলন ঘটে, সেই সম্মিলনের ফলে এমন এক অভিনব অখণ্ড সত্তা জন্মলাভ করে যার মধ্যে দ্রষ্টা ও দৃশ্যের খণ্ডিত অস্তিত্বের পরম পর্য্যবসান। এলেক্‌জ্যাণ্ডার মনে করেন যে, সৌন্দর্য্যের অবস্থিতি বস্তুতেও নয় মনেও নয়, তাদের এই সম্মিলিত সত্তাই সুন্দর উপাধির প্রকৃত অধিকারী। ক্রোচের সৌন্দর্য্যতত্ত্বের মর্ম্মকথা, উপলব্ধি ও অভিব্যক্তির অভিন্নতাতেও এই সম্মিলনের ইঙ্গিত রয়েছে। অভিব্যক্তির অর্থ তাঁর লেখায় যে খুব পরিস্ফুট হয়েছে তা' বলা যায় না। তবে এটা নিশ্চিত যে অভিব্যক্তির মানে অন্যের কাছে প্রকাশ নয়। তাঁর মতে অন্তঃপ্রকাশ ও বহিঃপ্রকাশের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান, ও-দুটো সম্পূর্ণ অসমজাতিক ক্রিয়া—প্রথমটা তত্ত্বগত এবং দ্বিতীয়টা ব্যবহারগত। অন্তঃপ্রকাশের সঙ্গেই অভিব্যক্তির তাদাত্ম্য, বহিঃপ্রকাশকে ত তিনি সৌন্দর্য্য-তত্ত্বের আলোচ্য প্রসঙ্গই মনে করেন না। অভিব্যক্তির অর্থবিভ্রাট ঘটেছে অন্য দিক দিয়ে। এক স্থলে তিনি লিখেছেন যে যারা নিজেকে সমাদর-বঞ্চিত গুণী মনে করে, ভাবে যে তাদেরও শেক্স্‌পীয়রের মত রেম্‌ব্রাণ্টের মত উপলব্ধির গভীরতা ও ব্যাপ্তি আছে কেবল টেক্‌নিকের অভাবে তা' অব্যক্ত ও অনাদৃত, তারা আত্মপ্রবঞ্চক, তারা জানে না যে তাদের উপলব্ধিই অঙ্কুরিত হয়ে ওঠে নি। অপ্রকাশিত উপলব্ধি আকাশ-কুসুমের মতন অলীক, চতুষ্কোণ বৃত্তের মতন স্বতোবিরুদ্ধ। এই প্রকাশের মূল্য অন্যের কাছে কী সে-কথা অবান্তর, এর বাহন যে-শব্দবর্ণসঙ্কলন তারও সাধারণের প্রত্যক্ষ-গোচর হবার কোনো দরকার নেই, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা' কাল্পনিকই হয়ে থাকে। তবে কিছু একটা ফুটে ওঠা চাই, নইলে উপলব্ধির দাবী বৃথা। এখানে ত মনে হয় প্রকাশ করার অর্থ সুস্পষ্ট করা, সুনির্দ্দিষ্ট করা। আবার

অন্যত্র তিনি লিখেছেন যে, সুন্দরের মধ্যে অভিব্যক্ত হচ্ছে রূপদ্রষ্টার অনুভূতি, তার অন্তরাত্মা। সেই উপলব্ধিই সার্থক উপলব্ধি, প্রকাশ-জ্যোতিষ্মান উপলব্ধি, যাতে সম্ভব হয়েছে বিষয় ও বিষয়ীর সাযুজ্য, আত্মা ও অনাত্মের সেতুবন্ধন। মন যখন ব্যবধান লঙ্ঘন ক'রে নিজেকে প্রকাশ করে বস্তুর মধ্যে, তখন তার অনাত্মীয় নিছক প্রাকৃতিক রূপকে মানসিকতার আস্তরণে আবৃত ক'রে তার সঙ্গে মিলনের পথ সহজ ক'রে নেয়। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় এই সাহিত্য-সাধনই সাহিত্যের তাৎপর্য্য। সৌন্দর্য্য-উপলব্ধিতে বস্তু যেমন মনোগত হয়ে ওঠে, মনও তেমনি বস্তুগত হয়, তন্ময় হয়, এ-কথাটা অতি সুবিদিত ও সনাতন বলেই বোধ হয় কবি উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন মনে করেছেন। পূর্ব্বেই বলা হয়েছে যে, ক্রোচের কাছে উপলব্ধি ও অন্তঃপ্রকাশ অভিন্ন। এই অন্তঃপ্রকাশের মধ্যে টেক্‌নিক অবর্ত্তমান, সাধারণ মানুষও এতে বঞ্চিত নয়; তবে প্রকাশের গভীরত ও ব্যাপকতার তারতম্য অবশ্য অনিবার্য্য। এ-ক্ষমতা না থাকলে শুধু যে রসসৃষ্টি অসম্ভব তাই নয়, রসসম্ভোগও অসাধ্য। টেক্‌নিকের আবশ্যকতা বহিঃপ্রকাশের বেলা। তার সাহায্যে শিল্পী আপন উপলব্ধিকে এমন সব সাধারণের প্রত্যক্ষগোচর বাস্তব সামগ্রীতে পরিণত করে যা' দর্শক বা শ্রোতার মনে অনুরূপ উপলব্ধি জাগাতে সক্ষম। এই বাস্তব শিল্প-সামগ্রীকে সুন্দর বলতে ক্রোচে একান্তই অনিচ্ছুক; তাঁর বিবেচনায় সৌন্দর্য্যের দাবী একমাত্র সেই ধ্যানমূর্ত্তির, শিল্পীর অন্তরাত্মা যার সঙ্গে সম্মিলিত, এবং যাকে সে অন্যের মনে উদ্দীপ্ত ক'রে তার আত্মপ্রকাশকে পূর্ণতর ক'রে তোলে। শিল্প-সামগ্রী—পটের উপর বর্ণ-বিন্যাস, খোদাই-করা মর্ম্মর-প্রস্তর, ধ্বনি-তরঙ্গ, ছাপার অক্ষর—এ-সমস্তই সেই উদ্দীপনার ভৌতিক উপকরণ মাত্র। যাকে বলি প্রকৃতির সুন্দর দৃশ্য সেও তাই। চিত্র বা সঙ্গীত যে-অর্থে উদ্দীপক, ছাপার অক্ষরে কবিতা সে-অর্থে উদ্দীপক নয়, তাকে বরঞ্চ উদ্দীপকের উদ্দীপক বলা যেতে পারে। প্রথমত সে উদ্দীপ্ত করে শুধু ধ্বনি-হিল্লোল ও চিত্রকল্প; পরে, এদের উদ্দীপনায় পাঠকের মনে জাগে শিল্পীর উপলব্ধ ভাবরূপ। সে-উপলব্ধি অবশ্য পাঠকেরই,

তার সঙ্গে শিল্পীর উপলব্ধির কোনো রহস্য-নিগূঢ় তাদাত্ম্য নেই, আছে অতিশয় পার্থিব আনুরূপ্য বা সাদৃশ্য মাত্র।

কলিংওয়ুড্ অভিব্যক্তির এমনতরো অন্তর্মুখী অর্থ করতে নারাজ। তাঁর কাছে সুন্দরের দ্যোতনায় দৃশ্য ও দ্রষ্টা দু'য়েরই অতীত একটা বৃহত্তর সত্তার ইঙ্গিত নিহিত। সৌন্দর্য্যের একটি স্বতোবিরুদ্ধতার কথা তিনি উল্লেখ করেছেন; সুন্দর বস্তু একদিকে বাস্তব বিশ্বের সঙ্গে অসম্পৃক্ত, তাঁর ভাষায় বিশুদ্ধ কল্পনা; অন্যদিকে সে দাবী করে উত্তর-প্রপঞ্চ পরম সত্তারই অভিব্যক্তি। এ-অভিব্যক্তি অবশ্য অনুভবগত, চিত্তগত নয়। কী অভিব্যক্ত হচ্ছে তার সুনির্দ্দিষ্ট সম্যক-বোধগম্য পরিচয়ে আমরা বঞ্চিত, কিন্তু কিছু একটা ইঙ্গিত যে সুন্দরকে অর্থ-জ্যোতির্ম্ময় ক'রে তোলে, রূপদ্রষ্টার মনে তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। সে-অনির্দ্দিষ্ট ইঙ্গিতের অর্থ কী তা' শিল্পী জানে না, জানতে চায়ও না,—তাকে সুনির্দ্দিষ্ট করবার সমস্যা দার্শনিকের। যে-মনোবৃত্তির প্রণোদনায় কলিংওয়ুড্ অভিব্যক্তির এই বহিরাশ্রয়ী বিশাল অর্থ করেছেন তার জন্যে নিশ্চয়ই তিনি হেগেল-প্রবর্ত্তিত ব্রহ্মবাদের কাছে ঋণী। সে মতবাদের সৌন্দর্য্যতত্ত্ব বেদমন্ত্রের মত একটি সংক্ষিপ্ত অর্থঘন বাক্যে সর্ব্বত্রই ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হয়ে থাকে—ইন্দ্রিয়গম্যের মধ্যে ইন্দ্রিয়াতীতের আবির্ভাব। কথাটা কিন্তু এতই ব্যাপক যে, সমস্ত বিজ্ঞানকেও অনায়াসে এর পরিধির মধ্যে টেনে আনা যায়। নিউটন-জীবনীর সেই সুবিখ্যাত, যদিও কল্পনা-প্রসূত, বৃত্তান্তের কথাই ধরা যাক। আপেল-পতনে মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্বের উদ্‌ঘাটন কি ইন্দ্রিয়গম্যের ভিতরে ইন্দ্রিয়াতীতের প্রকাশ নয়? অবশ্য বিজ্ঞানের ইন্দ্রিয়াতীতের প্রকৃতি আলাদা, সে হচ্ছে গাণিতিক-সঙ্গতি-প্রতিষ্ঠিত সার্ব্বজনীন তত্ত্বশৃঙ্খলা, সমস্ত বিচ্ছিন্ন খণ্ডিত তথ্য যার মধ্যে দানা বেঁধেছে যুক্তির অটুট সূত্রে। আর্টের ইন্দ্রিয়াতীত কী? হেগেল-বাদীরা বলবেন তাঁদের সেই ব্রহ্ম, যার শতাব্দীব্যাপী ব্যাখ্যার পরে আজো সন্দেহ দূর হয় না যে, তার পরিগ্রহণে যুক্তির চেয়ে নিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তাই অধিক। আস্তিককেও এর উত্তর দিতে দিশেহারা হতে হবে না, সকল সমস্যার চরম নিষ্পত্তি-

রূপে রয়েছেন তার ভগবান। রবীন্দ্রনাথ অনায়াসে লিখতে পেরেছিলেন; "ফুলও আমাদের কাছে সেই প্রিয়তমের দূত হয়ে আসে। সংসারের সোনার লঙ্কায় রাজভোগের মধ্যে আমরা নির্ব্বাসিত হয়ে আছি; রাক্ষস আমাদের কেবলি বলছে, আমিই তোমার পতি, আমাকেই ভজনা করো। কিন্তু সংসারের পারের খবর নিয়ে আসে ঐ ফুল। সে চুপি চুপি আমাদের কানে এসে বলে, আমি এসেছি, আমাকে তিনি পাঠিয়েছেন, আমি সেই সুন্দরের দূত।" কিন্তু যাঁরা ঈশ্বরবাদে আস্থা হারিয়েছেন, এই সোনার লঙ্কাকেই সর্ব্বস্ব জ্ঞান করেছেন, সৌন্দর্য্যধ্যানদৃষ্টির স্তিমিত নয়নে কোন্ নভোপ্রান্তরচারিণীর সুদূর ছায়াঞ্চল দেখবেন তাঁরা?

আবু সয়ীদ আইয়ুব
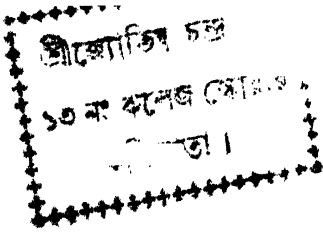
মৃত্যুর পূর্ব্বে ও পরে

ইতিপূর্ব্বে আমি একটা ভূতের গল্প লিখেছি। বন্ধুবান্ধবেরা জিজ্ঞাসা করেছেন গল্পের মধ্যে সত্যাংশ কতটুকু। এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আমার সাধ্য নয়। শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের বাড়িতে 'পরিচয়ে'র বৈঠকে তাঁর পুরানো কথায় বর্ণিত কোন একটি ভৌতিক ঘটনা নিয়ে আলোচনার জের টানা হয়। সত্য ও কল্পনার সীমানা সম্বন্ধে তর্ক যখন 'অন্ধ-গলিতে' এসে পথ হারাচ্ছে, তখন ঐ গল্পটি আমি মুখে মুখে বলি। দু'একজন বন্ধুর অনুরোধে মৌখিক গল্প লিপিবদ্ধ হয়। গল্পের মধ্যে অভিজ্ঞতার অংশই বেশী। তার টেক্‌নিকের সঙ্গে অন্য একটি বিলেতী গল্পের সাদৃশ্য আছে। তবে তার জন্য আমি দায়ী নই, কারণ যাঁরা আমাকে উক্ত উপায়ে ভয় দেখান তাঁরা আমার পূর্ব্বে হয়ত বিলেতী গল্পটি পড়েছিলেন। আমার অভিজ্ঞতার মূলে ছিল তাঁদের কল্পনা, সে কল্পনায় কৃতিত্ব থাকলেও স্বকীয়তা ছিল না। গল্প বলার ও লেখার ভঙ্গী কিন্তু আমার নিজের। আদৎ কথা এই, সত্য ও কল্পনা ক্যালকাটা মোহনবাগানের খেলা নয়, দুটি দেশী টিমের খেলা, এ দলের খেলোয়াড় কিছুকাল পূর্ব্বে অন্য দলে ছিল, অন্য দলের খেলোয়াড় কিছুকাল পরে এ দলে সহজেই চলে আসতে পারে। টানা ও পোড়েন না হলে বস্ত্রবয়ন হয় না।

কিন্তু আজ যে গল্পটি লিখছি সেটি নিছক সত্য। আমার বর্ণনার মুল্য প্রধানত পরলোকতাত্ত্বিকের কাছে, গল্পটির মধ্যে অতিরঞ্জন নেই, রঞ্জন যদি থাকে তাহলে সেটি স্মৃতিশক্তিরই স্বভাবদোষে। সে রাত্রের ঘটনা এখনও ভুলতে পারিনি, ভীষণ রকম কোন অসুখ না কর্‌লে ভুলতে পারব মনে হয় না, সে রাত্রের ঘটনার ব্যাখ্যা এখনও করতে পারিনি। যোগী না হলে নিজের কাছেও সন্তোষজনক ব্যাখা করতে পারব মনে হয় না। অতএব স্বীকার করছি যে, ভয় ও ভাবনা মিশে থাকার দরুণ আমার স্মৃতি-শক্তি বিশুদ্ধ ও সাত্ত্বিকভাবে কাজ করছে না। তবু ঘটনাটি যে ঘটেছিল শপথ করে বলতে পারি। সাক্ষী হাজির করতে পারব না—

যাঁরা সে রাতে উপস্থিত ছিলেন তাঁদের মধ্যে তিনজন পরলোকে, একজন পরলোক-চিন্তায় মগ্ন, অর্থাৎ সন্ন্যাসী, বাকি দু'জনের মধ্যে একজন পাগল, অন্য ব্যক্তি অধ্যাপক। আরো যাঁরা ছিলেন তাঁরা কম মাইনে পান, অতএব কোন ভদ্রলোকে তাঁদের কথায় বিশ্বাস করবেন না—তাঁদের সাক্ষী মানা বৃথা।

১৯১৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহের কথা। তখন আমার যুবা বয়স, স্বাস্থ্য ভাল, এবং মন খারাপ। নেশা এখনও যা আছে তখনও তাই ছিল—চা, সিগারেট, গল্প, গান এবং বই। নেশার সুবিধা কোলকাতাতেও যথেষ্ট মিলত, কিন্তু ততটা নয় যতটা হালিসহরে। হালিসহর আমার মামার বাড়ি। অবশ্য মামার বাড়ি বলতে লোকে যা বোঝে ঠিক তা নয়। আমার জন্মাবার পূর্ব্বেই বোধ হয় সে গোষ্ঠীর ভাঙ্গন ধরেছিল, আমার শৈশবকালেই প্রায় সব শেষ হয়ে যায়। আমার সে ঐশ্বর্য্য দেখবার সৌভাগ্য হয়নি, কেবল তার গল্পই শুনে এসেছি। আমার মাতামহের দান-ধ্যানের কাহিনী আমার যুবা বয়সেই প্রবাদ বাক্যে পরিণত হয়েছিল। তাঁর নামোচ্চারণ করবার সঙ্গে সঙ্গে লোককে হাত তুলে নমস্কার করতে দেখেছি। কেউ বলত দাতাকর্ণ, কেউ বলত দধীচি, কেউ বলত রাজা, কেউ বা মহাত্মা। শুনে আত্মপ্রসাদ হোত, আর মধ্যে মধ্যে হালিসহর যাবার ইচ্ছা করত।

পূর্ব্বে লিখেছি, আমার শৈশবকালে মামার বাড়ির প্রায় সব শেষ হয়ে যায়। 'প্রায় সব' অর্থে, মাত্র দু'জন অবশিষ্ট ছিলেন—আমার বৃদ্ধা মাতামহী এবং তাঁরই শিবরাত্রের সল্‌তে একমাত্র পৌত্র। আর ছিল ঐ বাড়ি। বিরাট তার বপু, এত বড়, এত উঁচু, এত খোলা যে পাড়াগাঁয়ের পক্ষে অশোভন। আমার মাতামহীর মতন স্ত্রীলোক এ যুগে দুর্লভ। মাত্র দুই বৎসরের মধ্যে তিনি স্বামী ও বড় বড় দুই ছেলে হারান, রাজরাণী থেকে পথের ভিখারিণী না হলেও সাধারণ মধ্যবিত্তের শ্রেণীতে পরিণত হন। ছোট্ট খাট্ট মানুষটি, মেজাজ অতিশয় ঠাণ্ডা, স্বার্থত্যাগী, উচ্চমনা, পাড়ার কোন কলহ বিবাদে নেই, নিতান্ত লাজুক প্রকৃতির। অত শোক পেয়েও, শ্মশানের মধ্যে থেকেও, কোনও প্রকার দুঃখবিলাস ছিল না—কখনও

শুনিনি যে তিনি কি ছিলেন কি হয়েছেন। কেবল কথায় কথায় পরের দুঃখে জল ভরে উঠত চোখে। গলার আওয়াজ ছিল অত্যন্ত মধুর, আর হাঁটতেন অতি আস্তে। কেবল বুড়ো আঙ্গুলের সামান্য মুট মুট শব্দ হোত। তাঁর সমগ্র স্নেহ ও চেতনা দানা বেঁধেছিল তাঁর পৌত্র, আমার দাদার চারধারে; দাদাকে যে ভালবাসে সেই তাঁর স্নেহের পাত্র হবে। আর তিনি ভালবাসতেন ঐ বাড়িকে।

দাদা ছিলেন ভালবাসারই পাত্র। সুন্দর চেহারা, রং ফর্সা, একটু বেশী রোগা, চোখে কুড়ি পাওয়ারের ভীষণ মোটা চশমা। এমন মধুকণ্ঠ বোধ হয় দিলীপকুমারও ছিল না—অথচ আওয়াজ জোর, অত বড় ঘরেও গাইলে মনে হোত সার্শির কাচগুলো ভেঙ্গে পড়বে। সিদ্ধেশ্বরীতলায় গঙ্গার ঘাটে দাদা গাইছে, ওপার থেকে বন্ধুরা গলা শুন্‌তে পেয়েছে। তানপুরো নিয়ে সাধেনি কখনও, কিন্তু শ্রুতিশুদ্ধ। তান ভর্‌ ভর্‌ করছে—এক-একটি তান যেন মুক্তোর দানা, ওপরের পঞ্চম থেকে যখন গলা নামত তখন মনে হোত যেন আতসবাজির রকেট গেল ফেটে, রঙ্গীন সূতো কাঁপতে কাঁপতে ঝরে পড়ছে। সুর দিলেই মনে হোত যেন ঝিঁঝিঁ পোকা ডাকছে। অত পাৎলা দেহ থেকে অত উদাত্ত কণ্ঠস্বর কি করে বেরুত ভেবে পেতাম না। বোধ হয় সাত্ত্বিক ব্রহ্মচারী ছিলেন বলেই।

দাদাকে লোকে সাধু বলত। একবার গঙ্গার ঘাটে পরমহংস দেবের কথা ওঠে। একজন বয়োজ্যেষ্ঠ বলেন, তাঁকে দেখিনি, তবে তোমার দাদাকে দেখেছি। আমারও তাই বিশ্বাস। দাদা ষড়্‌রিপুকে জয় করেছিল অথচ জয়ের ক্ষতচিহ্ন তাঁর কোন ব্যবহারে ছিল না। দাদা কখনও মুখে মিথ্যা কথা বলেনি ত বটেই মনেও কখন মিথ্যাচরণ করেনি। জীবনে বোধ হয় কাউকে কটুকথা বলেনি। বেশী কথা কইত না, একবার কাউকে কোন কথা দিলে সে প্রতিজ্ঞা পালন করবেই। হৃদয় ছিল স্নেহশীল, পবিত্র। দাদার সচ্চরিত্রতার আর কি প্রমাণ দেব? দাদার নামে পাড়ার মেয়ে ও পুলিশে পর্য্যন্ত কাণাঘুষো করেনি। দাদাকে পাড়ার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা দেবতা ভাবত, তার কাছে ছোট মেয়েরা পড়া বলে নিতে আসত, তার কাছে স্বামীরা এলে নববিবাহিতারা রাগ করত না, গ্রামের বয়ঃস্থারা

ঠাকুরপোকে ডেকে পাঠিয়ে গান শুনতে ভালবাসতেন। আবার তার কাছে বৃদ্ধারাও ধর্ম্মোপদেশ ও বৌমাদের নিন্দে করতে আসতেন, দাদা উপদেশও দিত না, নিন্দেও শুনত না, তবু দাদার নিন্দে রটেনি। পুলিশের সবইন্‌সপেক্টরও বলত—ও বাড়ির আড্ডায় কোন গোলমাল হওয়া অসম্ভব।

গোলমাল হোত অন্য রকমের—হাসির কলরোলে। শনিবার রবিবার ওপরের ঘরে প্রায় পনের-কুড়িজন যুবক সারাদিন-রাত আড্ডা দিত, ঘুমাত, তাস খেলত, থিয়েটারের মহলা দিত, তর্ক করত, চা ও সিগারেট খেত। বাড়ি বড়, ঘরগুলো রাক্ষুসে, কোন গুরুজন নেই, বদনামের ভয় নেই, হরদম চা সিগারেট পাওয়া যায়, আর মালিক ঐ রকম। তা ছাড়া বাড়ির একটা ইতিহাস আছে ত। নীচের তলায় তিনটে বৈঠকখানা এখনও রয়েছে ত, যদিও চাবিবন্ধ—নামের খাতির আছে ত! এ বাড়িতে লোকে আসবে না ত কোথায় যাবে! তা ছাড়া, ভাল ভাল বইও রয়েছে—আলমারী ভর্ত্তি বই, বেশীর ভাগ সাহিত্য ও দর্শন ও মনস্তত্ত্বের। আর শোবার যায়গা ও ঘরের অভাব নেই। কটা ঘর, কটা বিছানা, কটা খাট চাই? সবই রয়েছে—দেখলে মনে হয় সবই নতুন কেবল পুরাতনের গন্ধটুকু। অদ্ভুত এই ঘরের ও আসবাবের গন্ধ! ছারপোকা তেলাপোকার গন্ধটুকুই বিশ্লেষণ করতে পারতাম, গন্ধের অন্য উপকরণটি বুঝতেই পারিনি—বোধ হয় ইতিহাসের, কারণ ফতেপুরসিক্রীতে ঐ গন্ধের আভাস পাই মনে আছে।

এই সব নানা কারণে যুবা বয়সে হালিসহর আমার মনকে জাদু করেছিল। দাদা আমার সঙ্গে সমান তালে চা, চুরুট, সিগারেট খেত, বই পড়ত, গল্প করত। দাদা ছিল আমার যুবা বয়সের হিরো। এখনও আছে—তবে দাদা আর সংসারে নেই।

*   *   *   *

ভাদ্রমাসে কোলকাতা সহরে ভদ্রলোকের থাকা অসম্ভব। তাই শনিবার দুপুর বেলা যখন পাখার হাওয়ায় শানাচ্ছে না, তখন মনঃস্থ করলাম হালিসহর পালাই। যথা ইচ্ছা তথা কাজ। আড়াইটের সময় শিয়ালদহ ষ্টেশনে এসে হাজির তিনটের ট্রেণ পাওয়া যাবে। প্ল্যাটফর্ম্মে বন্ধুদের

সঙ্গে সাক্ষাৎ হোল—সকলে শনিবার বাড়ি ফিরছেন, অর্থাৎ পথে দাদার ওখানে হয়ে কখন বাড়ি ফিরবেন ঠিক্ নেই, হয়ত রবিবার সকালে একবার বুড়ি ছুঁয়ে আসবেন। বন্ধুদের হাতে ইলিশ মাছও নেই, আর গৃহিনীদের জন্য মাসিক পত্রিকাও নেই, তখন অবশ্য আমরা বই পড়তাম। ট্রেণ ছাড়তে জামা খুলে ফেললাম ও সেই সঙ্গে ট্রেণের দরজা। থিয়েটারের কথা চল্‌ল। সকলেই উৎসাহী। কোথা দিয়ে ব্যারাকপুর, টিটাগড়, শ্যামনগর ছেড়ে গেল বুঝতেই পারলাম না। কাঁকনাড়া আসবার পূর্ব্বে মিলের ধোঁয়া দেখতে পেলাম। জঙ্গলের পূব দিকে আমাদের গ্রাম—গ্রাম আমাদের উৎসন্ন গিয়েছে, যাওয়াই হয় না, না আছে সঙ্গী, না আছে স্মৃতি, আছে পড়ে একখানা বাড়ি, আগে কালী পূজোর সময় যাওয়া হোত; গত বৎসর ধূমধাম করে জ্যাঠামশাইএর খাতির রক্ষার জন্য বাবা কাকা সকলে মিলে মা-দুর্গাকে আনান, কিন্তু কোন আনন্দ পাইনি, হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম, আর গ্রামবাসীদের নীরব বৈপরীত্য। গ্রামে আবার মানুষে থাকে, যতদিন বাপজ্যাঠা আছেন ততদিন অমুক গ্রামে আমাদের বাড়ি বলা চলে, তারপর, তারপর গল্প লেখার উপকরণ সংগ্রহের জন্য গ্রামের সঙ্গে সম্পর্ক। কর্ত্তাদের গ্রামের প্রতি আকর্ষণ বোঝা যায়, সেটা তাঁদের জন্মস্থান, সেখানকার পুকুরে তাঁরা কলার ভেলা ভাসিয়ে সাঁতার শিখেছেন, যুগীর ছেলেদের সঙ্গে পৌষ মাসের রাতে তিন্‌টেয় উঠে খেজুররস চুরি করে খেয়েছেন—বাড়ির প্রত্যেক ঘরের সঙ্গে তাঁদের আন্তরিক সম্বন্ধ—এটায় অমুক জন্মেছিল, ওটায় অমুক মরেছিল, একটায় তক্তাপোষের তলায় তালের কোঁড় গজাত, অন্যটায় পুরানো তেঁতুল থাকত, এটা ভিয়েন ঘর, এটা পূজোর, এটা বাসর,—তাঁদের সঙ্গে গ্রামের গাছ-পালার নাড়ির টান থাকতে পারে—ঐ পুকুরের ধারের বুড়ো আমগাছটার মধুগুল্‌গুলি আমের তুলনা ছিল না, অন্য দিকের আমগাছে পিঁপড়ে হত বলে আমেরই নাম হল পিঁপড়ে-খাগী, ঐ তেঁতুল গাছের তলায় এক বুড়ো তেঁতুলে-বাগদী ছিল—সে ছিল মস্ত লাঠিয়াল, মাথায় ছিল তার একরাশ ফোলা চুল, কোমরে রঙ্গীন গামছা, হাতে থাকত ঢাল আর বল্লম, গ্রামের সে ছিল রক্ষক, তার জন্য গ্রামে কোন ডাকাতি হোত না, একবার গ্রামের চাটুয্যে কি গাঙ্গুলী

বাবুদের সেজ কি মেজ বাবুর মেয়ের বিয়ের রাতে বরযাত্রীরা কি অসভ্যতা করে, ঐ চিনিবাস এক একজনকে ঘাড় ধরে পাশের পানা পুকুরে ডোবায়—এ সব স্মৃতির মোহে কর্ত্তারাই আচ্ছন্ন হোতে পারেন, আমাদের মনে কোন সুরই প্রতিধ্বনিত হয় না। আমার জ্যাঠামশাই ঠিক করেছিলেন যে, তিনি পেন্‌শন নিয়ে গ্রামে বসে গ্রামের সেবা করবেন। তাঁর পল্লী-সেবার মূলে ছিল ভাবপ্রবণতা। কিন্তু পল্লী-উদ্ধারে আমার কোন প্রকার বিশ্বাস ছিল না—আমি জানতাম, কলেরই সংস্কার সম্ভব, জৈব-অনুষ্ঠানের চাই প্রাণ-সঞ্চার ; যে সমাজ মরেছে, গলে পচে গিয়েছে তাকে জীবন্ত করা দুঃসাধ্য। শবকে দাঁড় করানো যায়, কিন্তু তাকে প্রাণ দেওয়া যায় না।

গাড়ি ঘ্যাঁচ করে কাঁকনাড়ায় থামল। একটি ভদ্রলোক আমাদের প্রকোষ্ঠে উঠলেন। ছোট্ট-খাট্ট মানুষটি, গোঁফের চুল নিতান্ত পাৎলা। দেখেই চিনতে পারলাম, আমার ছেলে বয়েসের ড্রয়িং মাষ্টার মশাই, তাঁরই হাতে আমার হাতে খড়ি হয়। পুকুরধারে গিয়ে কল্‌মিলতার রূপ, কাঁঠাল গাছের পাতার গাঢ় সবুজ রং প্রথমে তাঁরই চোখ দিয়ে দেখি। লোকটি ভারি রসিক ছিলেন, আমাকে 'গুজরুটি এলাচ' বলে ডাকতেন মনে পড়ল। তাঁর মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকতে তিঁনি বলে্লেন, 'কই, চিনতে পারছি না ত ?' 'আমি ধূর্জ্জটি, গুজরুটি বলে ডাকতেন'। 'ওহো, তাইত হে, মস্ত বড় হয়ে গিয়েছ, কত ছেলেই হাত দিয়ে গেল, বাবা, আর মনে থাকে না।' আমার বাড়ির খবর নেবার পর জিজ্ঞাসা করলেন, 'আর ছবি টবি আঁক ?' 'আজ্ঞে না, এখন দেখি'। 'ও জিনিষ বাবা কেবল দেখে হয় না, একটু অভ্যাসও রেখ।' 'আপনি এখন ?' 'হুগলী নর্ম্মাল স্কুলে।' 'তাই না কি ? তাহলে আমার জ্যাঠামশাইকে চেনেন ?' 'কে ?' নাম বলতে তিনি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠিলেন—'আহা, এমন লোক হয়না, যেমন পণ্ডিত তেমনি নিরহঙ্কার, যেমনি কড়া, তেমনি নরম'। মনটা আমার খুশী হয়ে গেল, সকলে পরের মুখে আমার জ্যাঠামশাইএর সুখ্যাতি শুনলে ব'লে—বন্ধুরা সব মামার বাড়ির দেশস্থ। ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কোথায় যাচ্ছ ?' 'এই হালিসহরে—আমার দাদাকে দেখতে'। 'হালিসহর—সেত আমাদেরই ওপারে।' একজন বন্ধু বলে উঠলেন, 'ঠিক্ বলেছেন, হুগলী হালিসহরেরই ওপারে।

একটু কোণে। হালিসহরের ছেলেরা নৌকা করে রোজ হুগলী কলেজে যায়।' 'দেখুন, মাষ্টার মশাই, আপনার সঙ্গে জ্যাঠামশাইএর দেখা হবে ?' 'হবে! পাশের বাড়ি!' 'তাহলে ভালই হল, বলবেন জ্যাঠামশাইকে যে আজই, না হয় কালই ভোরবেলা আমি নৌকা করে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাব। যাবই যাব। আমি তাঁকে দেখতেই বেরিয়েছি, হালিসহরটা ঘুরে যাব। এইখানে নামতে হবে বুঝি ? হুগলীর পুলটা আমার বড় ভাল লাগে দেখতে।' ভদ্রলোক নৈহাটি নেমে গেলেন। সিগারেট ধরালাম।

কেন যে মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল প্রতিজ্ঞাটা বুঝতেই পারলাম না। তাঁর সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা আমার মনের কোন কোণে, আমার গণ্ডের কোন ক্ষরণে ছিল না। তাঁকে দেখবার কোন লোভ মনে ওঠেনি। তিনি অতিশয় গম্ভীর প্রকৃতির লোক ছিলেন—যাকে বলে রাশভারি। তাঁকে ভয়ের সঙ্গে শ্রদ্ধা করতাম। কখনও তাঁর কাছে ধম্‌কানি খাইনি। তাঁর ভারি চিবুক ও পাৎলা ঠোঁট, অল্পকথা ও অগাধ জ্ঞানের ফাঁকে ফাঁকে স্নেহ ও মাধুর্য্য উঁকি দিত—এই কথাই শুনে এসেছি। যাঁরা তাঁকে চিনতেন তাঁরা বলতেন যে তিনি অতিশয় ভাবপ্রবণ ও খাম্‌খেয়ালী। আমি তার কোন প্রমাণ পাইনি। তবু যে কেন ড্রয়িং মাষ্টারমহাশয়ের কাছে কথা দিলাম যে জ্যাঠামশাইকে দেখতে যাব, তাঁকে এই খবর পৌঁছে দিতে অনুরোধ করলাম, ভেবে পেলাম না। এখন মনে হয় যা তাই লিখছি। তিনি ছিলেন নিঃসন্তান, এবং ভাইপো ভাইঝিদের তিনি অত্যন্ত ভালবাসতেন, আমরা বড় হয়ে তাঁর কাছে যাবার, তাঁর কাছে থাকবার সময় পেতাম না। তিনি ভাবতেন যে, আমরা তাঁকে অবহেলা করছি—সেই জন্য শুনেছি প্রায়ই অভিমানভরে চিঠি লিখতেন। হয়ত তাই মনে মনে অপরাধী ছিলাম ও ক্ষতিপূরণ হিসেবে হঠাৎ বলে ফেলি। কিংবা হয়ত, মিথ্যা কথাই কয়েছিলাম। এই অকারণ, অনিমিত্তক কাজই একমাত্র স্বাভাবিক কাজ, ভাল-মন্দের অতীত, অতএব যদি মিথ্যাও বলে থাকি তাহলে লজ্জিত নই। আঁদ্রে জিদের gratuitous act-এর মতবাদে অনেকটা সত্য নিহিত আছে।

হালিসহরের ষ্টেশন এল। প্রতিজ্ঞার কথা ভুলে গেলাম। দীর্ঘপথ

বন্ধুদের সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে প্রাণে ফূর্ত্তি এল। একবার যেন মনে হয়েছিল আজ রাত্রেই হুগলী যাব বলিনি ত! কিন্তু পরে স্মরণ হল কাল সকালে নৌকা পেলে হুগলী যাব বলেছি।

পথে ডেলি প্যাসেঞ্জারদের মুখ থেকে একটা কুখবর শুনে মনটা খারাপ হয়ে গেল। শুনলাম আমার ও দাদার এক বিশেষ বন্ধুর বৌদির বড় বেশী অসুখ—কোলকাতা থেকে ডাক্তার আনতে গিয়েছে বরাবর মোটরেই আসবে। আশা কম। এই বন্ধুটি দাদার সব চেয়ে আপন ছিল। দাদা যেন তাদের বাড়িরই ছেলে—দাদার ভাই বলে আমারও খাতির। এই অসুস্থা মহিলাটি দাদাকে ছেলের মতন স্নেহ করতেন, দাদাও বৌদি বলত, আমিও বলতাম। দাদাকে ডেকে পাঠিয়ে কেবল শ্যামা-সঙ্গীত, রামপ্রসাদী শুনতেন। আমিও একবার ধ্রুপদ গাই। খবরটা পেয়ে ভয় হল বুঝি দাদা বৌদির রোগশয্যার পার্শ্বেই থাকবে সারারাত—আমি গল্প করতে পাব না। পরে এই ভেবে সান্ত্বনা পেলাম যে, হালিসহরে এমন লোক নেই যে দাদাকে সারারাত জাগিয়ে কষ্ট দেবে। সে যাই হোক্, থিয়েটারের গল্প করতে করতে, গান শুনতে শুনতে, গাইতে গাইতে দীর্ঘ দুই মাইল পথ অতিক্রম করলাম। যখন বাড়ি পৌঁছলাম তখন প্রায় পাঁচটা। দাদা দেখে খুব খুশী হল। বৃদ্ধা দিদিমা—রাঙ্গামা বলতাম তাঁকে—জিজ্ঞাসা করলেন, 'হাঁরে, তোর মা-বাবাকে বলে এসেছিস ত ?' 'না। বল্‌লে কখনও ছেড়ে দেয় এই ম্যালেরিয়ার সময়! না বলেই চলে এসেছি।' 'তাহলে মশারির মধ্যে শুবি, আর কুইনিনের বড়ি খাবি ভোর হলে।' 'আর চা ?' 'সে সারাদিন রাতই চলবে—আজ শনিবার—সব ছেলেরা আসবে।' 'তারা এসে গিয়েছে।' 'পরের ট্রেণে আরো আসবে—যাইগে জল চড়াইগে—না হলে তোর দাদা রাগ করবে।' দাদা কখনও কারুর ওপর রাগ করত না, তবু রাঙ্গামা ভয়ে কাঁটা হয়ে থাকত। কিসের ভয়! রাঙ্গামা সব খুয়িয়েছে। ঐ প্রকাণ্ড বাড়ির কোলাহল থেমে গিয়েছে, ফূর্ত্তি সব ফুরিয়েছে—বাকি কেবল দাদা, তার বন্ধুবর্গ, সর্ব্বদাই শঙ্কা হোত বেচারির এও বুঝি যাবে। রাঙ্গামাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'বৌদির নাকি বড় অসুখ ?' 'শুনেছি বটে, কোলকাতা থেকে নাকি ডাক্তার আনতে গিয়েছে—তুই রাতে কি খাবি ?'

রাঙ্গামা মৃত্যুকে এতই এড়িয়ে চলতেন যে, পরের অসুখের কথা নিয়ে ঘোঁট করতে পারতেন না।

ওপরে গেলাম। পূবমুখো প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড চার-পাঁচখানা ঘর—দক্ষিণদিকের ঘরগুলো সব বন্ধই থাকত—ওধারে পর্য্যন্ত কেউ যেত না। বড় পূবমুখো ঘরের একখানাই দাদা ব্যবহার করত, সেইখানেই অন্যদিন আড্ডা, খাওয়া, শোওয়া, পড়া সবই। শনিবার-রবিবার বন্ধুদের জন্য অন্য দুটি ঘর খোলা হোত। আজও তাই, দুটি ঘরেই আলো জ্বলছে, কিন্তু কোলকাতা থেকে আসার জন্যই হোক্, আর ঘরগুলো অতবড় বলেই হোক্, সব যেন অন্ধকার ঠেকছিল। দাদার ঘরের কোলে পূবদিকে লম্বা ছাত বেরিয়েছে—অন্য ঘরের কোলে ছাতবিহীন প্রশস্ত বারাণ্ডা—ওধারে অব্যবহৃত ঘরগুলি। বাড়িটা ইংরেজী শায়িত ⊓ ধরণের। বড় ছাতের ওধারে—প্রায় একশ হাত দূরে দোতলার পায়খানা। ঘরের কোলে কোলে সন্ধ্যার সময় শনিবারে একটা করে হিঙ্ক্‌সের লণ্ঠন থাকত—তাতেও অত বড় বাড়িতে আলো হোত না। অবশ্য ছাতে ও নীচে যাবার দরকারও হোত না খাবার সময় ছাড়া। এবং একলাও এই বাড়িতে রাতভিতে বেড়াতে পেতাম না—কোন না কোন বন্ধু সঙ্গেই থাকত। তারা সহুরে ছেলে বলে ঠাট্টা করতেও ছাড়ত না। আমার যে ওপর তলায় ভয় করত তা নয়, তবু দক্ষিণদিকের ঘরের দিকে চাইতে কেমন গাটা ছম্ ছম্ করত, ওধারে ছোট মামা ও মামী মারা যাবার পর থেকেই ঘরে চাবিতালা লাগানো—আর কোলের বারাণ্ডা থেকে তেতলা যাবার সিঁড়ির কাছেও কি রকম দ্রুত হাঁটতাম। তেতলায় অন্য এক মামা থাকতেন—সে ঘরও বন্ধ। অবশ্য অতদূরের পায়খানাও রাতভিতে কেউ ব্যবহার করে না। অতএব, ভয় পাবার কোন ফুরসৎ পেতাম না।

সে সন্ধ্যায় কি কথোপকথন হয়েছিল আমার কিছুই মনে নেই, প্রত্যেকেই নিজের বক্তব্য বলে যাচ্ছিলাম। জীবনের সেই সময়টা এত নিজের বক্তব্য ছিল যে, দুঃখ হয় কেন তখন বাংলা ভাষাকে ঘৃণা করতাম। দেশের জন্য তখন দরদ হয়নি বোধহয়, তখনও মহাত্মাজী আসরে নামেন নি। তবে সে সন্ধ্যায় কি কি কাজ করেছিলাম মনে আছে। চার-পাঁচ কাপ

চা, প্রায় এক টিন সিগরেট, গোটা চার-পাঁচ বর্ম্মা চুরুট সে রাত্রে ১০টার মধ্যেই নিঃশেষ করি। তারপর, স্ত্রৈণরা বাড়ি গেল, অবিবাহিতেরা খেয়ে এল, এগারটার সময়। ঘুম কাতুরেরা শুতে গেল সাড়ে এগারটায়। তখন স্বুরু হল দাদার সঙ্গে আমার গল্প। সে কেবল বইএর কথা,—যতদিন দেখা হয়নি ততদিনে কে কি বই পড়েছে। রাত সাড়ে বারটায় দাদা মাটিতে পাটি পেতে, দরজা-জানলা বন্ধ করে শুয়ে পড়ল, আমি পালঙ্কের ওপর। ঘরে আলো জ্বলতে লাগল জোরে। পুরানো ঘড়িতে ঢং করে একটা বাজল। দু'জনেরই চোখে ঘুম নেই—দাদা বলে উঠল, 'ঠিক্ একটা বাজল—একটু এক অক্ষরের নেশা করলে হয়,' আমি বল্‌লাম, 'না, দু অক্ষরের, কোকো কর।' দাদা তড়াং করে লাফিয়ে উঠে ষ্টোভ্ জ্বাললে—জল গরম হল—দু পেয়ালা কোকো দু'জনের জন্য তৈরী হল, খাবার পর দাদা হুকুম করলে, 'এইবার ঘুমুতে চেষ্টা কর।' তখন বোধ হয় একটা বেজে পনের মিনিট। দাদা হিঙ্ক্‌সের লণ্ঠনটির বাতি কমিয়ে দিলে—আলোর তেজ কমে আসছে বিছানা থেকে লক্ষ্য করছিলাম। ঘরের ভেতর বড় গুমোট গরম হচ্ছিল, পায়ের কাছে জানলা খোলবার অনুমতি চাইলাম, দাদা বল্‌লে, 'ওধারে গাছপালা, কলাবাগান—ভারি মশা আসবে ঘরের মধ্যে—মাথার দিকে ছাতের দরজা খুলে দে।' আমি উঠে ছোট্ট লোহার খিড়কিটা খুলে দরজার এক বাল্লা ফাঁক না করতে করতেই 'দাদাগো' বলে মাটিতে পড়ে গেলাম। বাল্লাটা ঝণাৎ করে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে খিড়কিটাও গেল বন্ধ হয়ে।

তারপর কি যেন হয়ে গেল। আমি গোঁ গোঁ করে দাদাকে জড়িয়ে ধরে বলছিলাম, 'দাদা গো, যেও না।' আলো গেল নিবে। অনেক কষ্টে আমার বাহুপাশ থেকে উদ্ধার হয়ে দাদা চুপি চুপি, ব্যাকুলকণ্ঠে প্রশ্ন করতে লাগল, 'কি দেখেছিস্?' 'একজন মানুষ—চোর, দরজার পাশে, দরজায় প্রায় মুখ ঠেকিয়ে, গালের পাশে হাত রেখে আমাদের কথা শুনছে।' 'ভয় কি? দরজা বন্ধ আছে, ও চোর'। 'না দাদা যেও না, সেদিনকার মত খুন হবে।' ব্যাপারটা এই—গত সপ্তাহে হালিসহরের বাজারে একজন দোকানী খুন হয়েছে, সন্ধ্যায় শুনেছিলাম—বেচারি রাত

কত্ত বুঝতে না পেরে দুটোর সময় দোকানে এসেছে তামাক খেতে, চোর তখন তারই দোকানে সিঁধ দিচ্ছিল, হঠাৎ দোকানীকে দেখে সিঁদের কাটি মাথায় বসিয়ে দেয়, এবং দোকানীর তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়। 'আচ্ছা, যাচ্ছি না, তুই আমাকে ছাড়্, কলসী থেকে তোর মাথায় জল দিই।' দাদা মাথায় জল ঢাললে। হঠাৎ মনে হল, ছাতে গুম্ গুম্ আওয়াজ হচ্ছে, যেন লোক হেটে বেড়াচ্ছে। দাদা হঠাৎ বলে উঠল, 'ওরে পাশের ঘরে দরজা খুলে ওরা সব ঘুমুচ্ছে, ওদের মেরে রেখে যাবে—জাগিয়ে দিই গে চল্'। 'দাদা, চেঁচাও এখান থেকে'। 'না, কেলেঙ্কারি করে লাভ নেই।' দাদার কথা শুনে মনটায় জোর পেলাম—'আচ্ছা চল, কিন্তু এক কাজ করা যাক্, তোমার ঐ কুড়ি পাওয়ারের চশমা খোল, ও থাকাও যা, না থাকাও তাই, থাকলে লাঠি লেগে ভেঙ্গে চোখে ঢুকবে; আর এক কাজ করা যাক্, কাপড় বাঁধ মাথায়, খুব উঁচু পাগড়ীর মতন করে, মাথা ফাটাতে পারবে না।' তাই হল, দাদা চশমা খুলে ফেল্লে, দুজনের মাথায় পাগড়ী চড়ল। তারপর এক একটি বেতের ছড়ি নিয়ে দরজার দিকে অগ্রসর হলাম, দাদা আগে, আমি পিছে। খুব আস্তে, নীরবে লোহার খিড়কি খোলা হল,—দরজা ফাঁক করা হল, সামনে কাউকে দেখা গেল না, পাছে পাশ থেকে ডাণ্ডা চালায় বলে ছড়ি দুটো আগিয়ে দিলাম, ঘরের ভেতর দরজার পাশে অপেক্ষা করলাম—কাকস্য পরিবেদনা! বুকে সাহস এনে দুই ভাইএ ছাতে বেরিয়ে পড়লাম।

ছাত ভিজে, পায়ের তলা ছ্যাঁক করে উঠল—তাড়াতাড়ি পাশের ঘরের দিকে ছুটলাম। গিয়ে দেখি বন্ধুরা নির্ব্বিঘ্নে ঘুমোচ্ছে। তাদের গা ঠেলতেই তারা ভীতুর মতন অত্যন্ত কোলাহল করে উঠল—'চোর চোর'। 'চুপ, আমরা, আমরা চোর নই, তবে চোর এসেছে, ছাতে বেড়াচ্ছে'। তড়াং করে সকলে লাফিয়ে উঠে আলো খুঁজতে লাগল—দেয়াশালাই হাৎড়ে পাওয়া গেল না—দরজার পাশে একটা লাঠি ছিল, সেইটা হাতে করে দীনবন্ধু বেরিয়ে এল—সঙ্গে সঙ্গে বাকী সকলে অর্থাৎ জন আষ্টেক।

পাড়াগেঁয়ে অন্ধকার, কিন্তু থম্‌থম্ করছে না, একটা ঘোলাটে আলো আকাশের এককোণে, গাছগুলোর সীমানাই দেখা যাচ্ছে, ডালপালা

বোঝা যাচ্ছে না, কেউ দাঁড়িয়ে আছে কালো ছাতা মাথায় দিয়ে, কেউ হেলে পড়ছে পুকুরের ধারে, কোথাও যেন অবকাশ নেই, একটা নারকোল গাছ দলছাড়া, ভীষণ লম্বা, অতিশয় রোগা, একেবারে বাঁকা, পাতাগুলো ডাইনী বুড়ির চুলের মতন পাৎলা ও এলোমেলো; বাতাস হিমাক্ত, গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হয়েছে কখন টের পাইনি। ছোট্ট নখের মতন চাঁদ আবডাল থেকে বেরিয়ে এল, মরা রূপোর রং মেখে, বড় মলিন, বালবিধবা, থান পরা, সাড়ির পাড়টাও কালো নয়।

আমার মাথা ছিল ভিজে, হিমে গা শির্ শির্ করছিল। ঘরের ভেতরে যাবার ইচ্ছা হচ্ছিল—পারছিলাম না। সকলে মিলে ছাত খুঁজতে আরম্ভ করলাম—কোথাও কিচ্ছু নেই। দক্ষিণ দিকের ঘরে তালা বন্ধ, গিয়ে কি হবে? যদি চোর থাকে ঐ ধারে, ত থাক, কারুর ক্ষতি করছে না ত! সন্দেহ হল, যদি তেতলার সিঁড়িতে ঘাপ্‌টি মেরে লুকিয়ে থাকে। দীনবন্ধু যেতে চাইলে—কিন্তু আমি বাধা দিলাম, যদি চোর থাকে তাহলে সে থাকবে ওপরের ধাপে, আমরা থাকব নীচের ধাপে, এবং সমতলে চার-পাঁচজনে না হয় একজনের সঙ্গে লড়া যায়, তাকে ঘায়েল করা যায়, কিন্তু ভিন্ন ক্ষেত্রে মারপিঠ চলে না—চোর এখন মরীয়া, ওপরের ধাপ থেকে সে প্রাণ দিয়ে আত্মরক্ষা করবে, আমরা থাকব নীচের ধাপে—এ অবস্থায় সেই আমাদের ঘায়েল করবে—রাজপুতানা ও গ্রীস দেশের ইতিহাসে এ রকম দৃষ্টান্ত আছে—তার চেয়ে দেখা যাক্ কোন লোক ওপরে at all গিয়েছে কিনা—প্রমাণ পাওয়া যাবে পায়ের দাগে কারণ ছাত ভিজে আর তেতলার সিঁড়ি সিমেণ্ট করা নয়, তাতে ঝাঁট পড়ে না, ধূলো জমে আছে—ভিজে পায় ধূলোর ওপর দাগ পড়বেই। আমার উপদেশ সকলেই গ্রাহ্য করলে। 'দেয়াশালাই আন দাদা—আর যদি পার সিগারেটের টিনটা।' দাদা তাই নিয়ে এল। দেয়াশালাই জ্বেলে ঘাড় নীচু করে দেখলাম কোথাও ধূলির বিক্ষেপ পর্য্যন্ত হয়নি—চিরন্তনতার ঐশ্বর্য্যে আত্মতৃপ্ত, স্তূপীকৃত। বাধ্য হয়ে সিগারেট ধরালাম—সকলেই ধরালে।

অনেক কষ্টের পর, অনেক সংযমের পর সিগারেট খেয়েছি—সিকিম যাবার পথে রেডল্যাম্প খেয়েছি, বন্যাপ্রপীড়িতের উদ্ধার করতে গিয়ে চাষার

ঘরে রেলওয়ে খেয়েছি, মৃত্যু শয্যার পাশে সারারাত অপেক্ষা করে ভোরের দিকে বিড়ি টেনেছি, শ্রাদ্ধশেষে ছুটে গিয়ে কালী সিগারেট খেয়েছি, ব্রাহ্ম-সমাজে উপাসনা শোনার পর ট্রামে চাপা পড়া ভ্রূক্ষেপ না করে ওপারের দোকান থেকে সিগারেট কিনে দড়ির আগুনে ধরিয়েছি, কিন্তু অত আরাম, অমন উপকার কখনও হয়নি। মাথা সাফ্ হয়ে গেল, একা আমার নয়, সকলের। শরীর গেল হাল্‌কা হয়ে, একজন হেসে বল্‌লেন, 'এই চা ও সিগারেট খেয়ে তোর মাথা গুলিয়ে গিয়েছিল।' 'চা খাইনি, সিগারেট খাইনি শোবার সময়, কোকো খাই।' বন্ধু হোমিওপ্যাথী জানতেন, বল্‌লেন, 'কোকো কারুর খাদ্য কারুর বিষ, ওকে আমাদের শাস্ত্রে idiosyncrasy বলে, যেমন ধর কলা—কেউ একবার মুখে দিলে, কিংবা গন্ধ শুঁকেই ন্যাকার করবে, কেউ আবার পুড়িয়েও খাবে।' 'তোমার পাড়াগেঁয়ে রসিকতা রাখ; দাদা চল ঘরে যাই।'

হঠাৎ গুম্ গুম্ শব্দ হল গম্ভীর, যেন মাটির বুক থেকে ফেটে বেরুতে চাইছে, পারছে না—আমি দাদার হাত জোরে ধরলাম। 'ওকি!' সকলে চুপ হয়ে গেল। দাদা বল্‌লে, 'ওটা হাজি নগরের পাম্পের আওয়াজ, আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে নল নিয়ে গিয়েছে, গত সপ্তাহ থেকে জল আসছে রাস্তার কলে—রাতে পাম্প হয়—তারই আওয়াজ।' আশ্বস্ত হলাম। 'চল্ শুবি চ'।' গুম গুম্ শব্দটা ভারি ভাল লাগল—যেন পরিচিত, আমার বহু পরিচিত নিকট আত্মীয়—যান্ত্রিক সভ্যতার নিদর্শন, সভ্যসমাজের সঙ্কেত—যেখানে জলের কল সেখানে ভয় নেই, যেখানকার রাতে গ্যাসের আলো জ্বলে সেখানকার বাড়িতে চোরের উপদ্রব নেই—যন্ত্রের আওয়াজ অমানুষিক নয়। একটা নতুন সিগারেট ধরালাম।

ধাতস্থ হলাম, কিন্তু মুহূর্ত্তের জন্য। দক্ষিণ দিক থেকে, গ্রামের অন্য পল্লী থেকে একটা বুকফাটা কান্না ভেসে এল। একজনের কান্না নয়, একাধিকের ব্যাকুল চীৎকার, যেন কিছু হারিয়েছে, কে যেন প্রিয়জনকে কেড়ে নিয়ে যাচ্ছে, আত্মীয়েরা ছাড়তে চাইছে না—কান্নার হুটোপাটি স্পষ্ট আওয়াজ নয়, কোন বিনিয়ে বিনিয়ে কথা নয়, কেবল অসংযত গোলমাল মাত্র। আমরা আড়ষ্ট হয়ে শুনতে লাগলাম। কারা কাঁদছে, কোথায়

কাঁদছে জানবার স্পৃহা ছিল না—শব্দ কানে এসে আঘাত করছিল মাত্র। একজন বন্ধু হঠাৎ বলে উঠল, 'হয়েছে! বৌদি মারা গেল।' এই কথাটি শোনবামাত্র আমার সমগ্র ভাসমান ধারা একটি সূত্রের ধারে গ্রথিত হয়ে গেল। কত শীঘ্র যে এই গ্রন্থী বাঁধ্‌ল তার হিসাব কোন ক্রোনোমিটারে ধরা পড়ে না। শুষ্ক কণ্ঠে দীনবন্ধু জিজ্ঞাসা করলে, 'কি রকম চেহারা দেখেছিস? পুরুষের না স্ত্রীলোকের?' 'মনে নেই, মুখটা যেন হাসি হাসি, গায়ে একটা যেন সাদা চাদর ঢাকা, গালের পাশে হাত রাখা।' 'মেয়েরা যেমন রাখে!' 'হাঁ।' দাদা একটু ধমকে উঠল, 'তবে যে বল্‌লি লুকিয়ে শুনছে?' দীনবন্ধু আমার হয়ে জবাব দিলে, 'মেয়েরাই আড়ি পাতে'। 'তোর মাথা! এত রাত্রে মেয়ে আসবে আড়ি পাৎতে!' 'দাদা তুমি বোঝ না; বৌদি মারা যাবার আগে তোমার সঙ্গে দেখা করে গেল। তোমাকে ছেলের মতন, —ও দাদা, তাই গো তাই, এইবার বুঝেছি—বৌদি এসেছিল'। তার পর আর মনে নেই—যখন জ্ঞান হল, তখন মিট্‌ মিট্‌ করে চেয়ে দেখি আমি ঘরের মধ্যে পালঙ্কের ওপর শুয়ে, হিঙ্ক্‌সের লণ্ঠন জ্বলছে জোরে, ঘরের মধ্যে ভিড়, ষ্টোভ জ্বলছে। 'দাদা, চা খাব।' 'না, চা আর খেয়ো না।' 'তোমরা খাবে না কি?' 'না।' 'তবে জল চড়েছে কেন?' তাদের নীরবতা দেখে বুঝলাম, আমার পায়ে মোজা, গায়ে চাদর দেখে বুঝলাম, আমার হাত পা গরম করবার জন্যই জল গরম করা হচ্ছে। লজ্জায় উঠে বসলাম।

'চল যাই'। 'কোথায়?' 'বৌদির বাড়ী'।

'এখন নয়, সকাল হলে যাওয়া যাবে। এত শীঘ্র হয় না, খাটের যোগাড় করতে হবে ত?' 'তাহলে, গান গাও।' 'এখন নয়'। 'আচ্ছা, দাদা, একবার লোক পাঠালে হয় না?' 'কে যাবে'। 'তাও বটে'।

বন্ধুরা বল্‌লে, 'ঘুমো, ঘুমো বাতাস করছি'। 'না ঘুম অসম্ভব'।

তাদের মুখে অস্বাভাবিক রকমের গাম্ভীর্য্য দেখে অস্বস্তি হচ্ছিল। কেন তাঁরা নীরব রয়েছেন? ভয়ে? কার জন্য ভয়? অতিপ্রাকৃতের? না, আমার জন্য? আমার জীবনের কোন প্রকার আশঙ্কা আছে না কি? যদি মরতেই হয়, দরজা-জানালা বন্ধ করে, ঘুপ্‌সি ঘরের মধ্যে মরব না। বুকের মধ্যে কষ্ট হতে লাগল—লেপ ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে উঠে বসলাম—'দরজা-জানালা

খুলে দাও।' 'না, তোর ঠাণ্ডা লাগবে, হাওয়া করছি'। দু'জনে মিলে জোরে জোরে মাথায় বাতাস করতে লাগল, একজন ওরিয়েণ্টাল বাম কপালে ও রগে ঘসে দিলে। একটু সুস্থ হলাম। 'আচ্ছা, তোমার কি বিশ্বাস?' 'তোকে জেম্‌সের সাইকলজি পড়ে শোনাচ্ছি।' আলমারি থেকে মোটা বই বার করে দাদা আমাকে delusion, illusion, ও hallucination-এর বর্ণনা ও ব্যাখ্যা পড়ে শুনিয়ে যেতে লাগলেন। দৃষ্টান্তগুলি অত্যন্ত জীবন্ত, একটা বাক্য আমার এখনও মনে পড়ে—only the object is not there। 'স্থূল শরীরে না থাক, সূক্ষ্ম শরীরে ত থাকতে পারে? নচেৎ আমার চোখের স্নায়ুতে কেন প্রতিক্রিয়া হল—কোন্ বস্তু আমার চোখে আঘাত করলে?' দাদা অনেক বোঝাতে চেষ্টা করলে—পারলে না। তখন আমি বল্‌লাম, 'দাদা, ও সব্ বিলেতী ব্যাখ্যা ছাড়, প্লাঞ্চেট আছে তোমার, তাই আন।'

অনিচ্ছা সত্ত্বেও দাদা প্ল্যাঞ্চেটটা আলমারি থেকে বার করলে। তার ধারে গোল হয়ে তিনজন বসল—আজ তাদের একজনও জীবিত নেই। আলো কমিয়ে দেওয়া হল। দেওয়ালে বঙ্কিমের এক ছবি ছিল, শুনেছি নিজে নাকি তিনি আমার দাদামশাইকে দিয়েছিলেন। অদ্ভুত সুপুরুষ, পাৎলা ঠোঁট, চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ, চিবুক দৃঢ়, জ্যাঠামশাইএর মতন মুখের কাঠামো। যাঁরা বৈঠকে ছিলেন তাঁরা এই ছবির দিকে অনেকক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে চোখ বুজলেন। একেবারে চুপ চাপ, একজনের পিঠে মশা বসেছিল, পিঠ বেঁকিয়ে মশাকে স্থানচ্যুত করতে চেষ্টা করলেন, পারলেন না, হাত তুলে পিঠে চাপড় মারতে বৈঠকে গেল ভেঙ্গে। একজন বল্‌লে, 'তার চেয়ে প্ল্যাঞ্চেটের তলায় কাগজ রাখ, আর কোণে পেন্সিল গুঁজে দাও। আমার অনুরোধে তাই রাখা হল। আবার সব চুপ চাপ। বিছানা থেকে তাদের কার্য্যকলাপ স্থির দৃষ্টিতে দেখছিলাম। খানিক পরে বৈঠকীদের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখলাম—একজন গুরু গম্ভীর স্বরে বল্লেন, 'নমস্কার, যদি এসে থাকেন, তাহলে বাঁ পা-টা একবার তুলুন।' ধীরে ধীরে প্লাঞ্চেটের একটি কোণ উঠল নামল। আমি খাট থেকে নেমে পড়লাম।

তারপর প্রশ্নোত্তর চল্‌ল। সব মনে নেই—গোটা কয়েক মজার

কথা মনে আছে। তখন মজা লেগেছিল, এখন তার গভীর তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করেছি। অবশ্য উত্তরগুলি হাঁ ও না-র মধ্যেই আবদ্ধ ছিল, এবং উত্তর দিচ্ছিলেন তিনি প্ল্যাঞ্চেটের একটি পায়া ঠুকে—যেমন সার্কাসের অঙ্কশাস্ত্রবিদ ঘোড়া করে। বুদ্ধির সহিত উত্তরগুলি আদায় করছিলাম—সওয়াল জবাবের ক্ষমতা দাদা, দীনবন্ধু ও আমার রক্তে প্রবহমাণ। জেরার উত্তরগুলি কমলাকান্তের মতন মনে হচ্ছিল।

'সুখে আছেন ?'—না, এখন বুঝি বাংলা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে।

'জন্মাবেন ?'—না, এখন ভাবি, না জন্মানোই ভাল।

'কোন বইটা ভাল আপনার ?'

অনেক কষ্টে বার করলাম—কমলাকান্ত।

'আর কোনটা ?'—উত্তর পাইনি।

সত্যকারের সমালোচক।

'ভূদেব বাবু ওখানে আছেন ?'

'না' খুব জোরে দুটি পায়া উঠেছিল।

আমরা মর্ম্মাহত হই। স্কুল মাষ্টারের লেখা ইনস্পেকটার অফ্ স্কুলের জীবনী পড়ে ভূদেবের ওপর আমাদের ভক্তি ছিল অগাধ। ভূদেব বাবু বোধ হয়, বঙ্কিমের ওপর তলার, ঊর্দ্ধতম স্বর্গের অধিবাসী।

'মেয়েরা কেউ লিখতে পারে ?'

উত্তর পাইনি। ভদ্রলোক!

'ভূতে বিশ্বাস করেন ?'

'করি'।

'আজ ধূর্জ্জটি কাকে দেখেছিল ?'

প্ল্যাঞ্চেটটা প্লেগাক্রান্ত ছুঁচোর মতন কাগজের ওপর ঘুরতে লাগল। পেন্সিলটা কাগজের ওপর দাগ কেটে চলেছে—হিজি বিজি কত কি! তারপর সব চঞ্চলতা থেমে গেল। নীচে নেমে আলোটা তেজ করে কাগজের ওপর অক্ষর পড়তে চেষ্টা করলাম। সব গোল গোল অক্ষর কোনটা বৃত্তাকার, কোনটা ডিম্বাকার, কোনটা পরবলয়, কোনটা অতিপরবলয়,

কোনটা অসীম পথের নির্দ্দেশ। মাথা নীচু করে অনেকক্ষণ দেখছিলাম—কতক্ষণ মনে নেই—ধীরে ধীরে একটি অক্ষর ফুটে উঠল—ইংরেজী D, ডি—আর একটি P,—কাগজের কোণে পাশে পাশে দুটি ফলার আকার—পরিষ্কার M—সব টানা হাতের।

কাগজ ফেলে বিছানায় এলাম। পরিষ্কার ইঙ্গিত, স্পষ্টতর কিছু হতে পারে না। আমারই নাম—ধূর্জ্জটির ডি, প্রসাদের পি, মুখার্জ্জির এম্। যাকে দেখেছি সে আমারই প্রেতাত্মা! আমার দেহ ছেড়ে আত্মা আমার চলে গিয়েছে, আমার অজ্ঞাতে। পড়ে আছে আমার দেহ, পঞ্চভূতের সমাবেশ মাত্র, অভ্যাসের বশে কাজ করে যাচ্ছি মাত্র, ঘড়ির দম ফুরাবার পরও যেমন কাঁটা ঘোরে। এই দেহটা জড়, আত্মা ছেড়ে দিয়েছে অনেক আগে, দেওয়ালের ঘড়ি চলছে, জানলার সার্শিতে হিঙ্কসের ছায়া পড়েছে, একটা মাথা দেখা গেল—এটা দীনবন্ধুর—সব ছায়াবাজি, শরীরটা নিতান্ত হালকা—জীবনেরই ওজন আছে, জীবন গেলে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি কার ওপর কাজ করবে? কোন আত্মীয়ের মুখ মনে পড়ছে না ত? এই জন্যই প্রেমে পড়তে চাইতাম, মরবার পূর্ব্বে তার মুখ যেন মনে পড়ে। ব্যর্থতায় মুখটা শুকিয়ে গেল, জল চাইলাম—জল খেলাম শুয়ে শুয়ে। যেকালে আমার আত্মাই আমাকে ত্যাগ করেছে তখন আর বাঁচবার কোন প্রয়োজন নেই। হাত পা শক্ত করে চিৎ হয়ে শুয়ে রইলাম—নিঃশ্বাস প্রশ্বাস কমে এল, দু'হাতের আঙ্গুল বদ্ধ করে বুকের ওপর রাখলাম। বুকে হাত রেখে ঘুমুলে ভয়ঙ্কর স্বপ্ন হয় মনে করে হাত দুটো মুড়ে গালের পাশে রাখলাম। গায়ের ওপর চাদর ঢাকা দিলাম। যেন মরা টিক্‌টিকি চিৎ হয়ে শুয়ে আছে, শাদা পেট বার করে। কপালের ওপর একটা মশা বসেছিল—এক থাপ্পড়ে মেরে ফেল্‌লাম—ম্যালেরিয়া হলে আর রক্ষা নেই—বাড়িতে বকুনি খাব, হালি-সহর থেকে বিষ নিয়ে গিয়ে মা-বাবাকে ভোগানো! আবার হাতটা গালের পাশে রেখে নিষ্পলক নেত্রে প্রতীক্ষা করতে লাগলাম। বিদ্যুৎ বেগে দরজার ওপাশে ছাতের মূর্ত্তিটা চোখের সামনে ভেসে এল। আমারই চেহারা আমি দেখেছি। 'দাদা, মাথা ঘুরছে'—আবার জল

মাথায় চোখে আছড়ানো—আর জোরে জোরে পাখার হাওয়া। অতি সহজেই মাথা সাফ্ হয়ে গেল। ধীরে ধীরে চোখ খুললাম। বন্ধুরা সব মাটিতে বসে আছে, মুখে সিগারেট, ঘরটা ধোঁয়ায় ভর্ত্তি, ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে ওপরে উঠিতে চেষ্টা করছে, পারছে না—মিট্‌মিট্ করে আলো জ্বলছে। পুরাতন লণ্ঠন—মাতামহের আমলকার—পেট মোটা, শেকল পরা, সামান্য অপরিচ্ছন্ন—যেন জমিদার বাড়ির গৃহিণী, মুখে মেছেতা পড়েছে—এককালে রং ছিল—আর কল ভাল, কখনও বিগড়োয় না—আজকালকার মেয়েদের মতন, নতুন ফ্যান্‌সী আলোর মতন। অন্তরের শিখা সাদা নয়, একটু হলদে রংএর, পলতের জন্য শিখার রূপ ইংরেজী ছড়ানো ডবলইয়ু, ঢেউ খেলানো, থুৎনী চাপা কিশোরীর মুখের মতন। কোন্ কিশোরীর কোথায় যেন দেখেছি এই শিখার রূপ—দেখেনি, পড়েছি এর বর্ণনা। কোন বইএ? কোন কবিতায়, কোন ছবিতে? মনেই এল না, কেবল দেখতেই লাগলাম।

ধীরে ধীরে সেই হিঙ্ক্‌সের লণ্ঠনের শিখা থেকে একটা মুখ উঠে পড়ল। অদ্ভুত তার ভঙ্গী, আরো অদ্ভুত তার হাসি। সে মুণ্ড কেবল নড়ছে, বাঁ থেকে ডাইনে, ডাইনে থেকে বাঁয়ে, প্রথমে আস্তে, ক্রমে জোরে জোরে, মধ্যে মধ্যে লাফিয়ে উঠছে—আর হাসছে। জাপানী পুতুলের ঘাড়নাড়া বুড়োর প্রতিকৃতির মতন—গোঁফ নেই। অতি পরিচিত মনে হল—অথচ কার মুখ কিছুতেই নির্দ্দেশ করতে পারলাম না। মুণ্ডটা বড় হতে লাগল, হাসিটা আকর্ণ বিস্তৃত হল, চোখ পিট্‌পিট্ করা থেকে ড্যাব্‌ড্যাবে চাইতে সুরু করলে। চেঁচিয়ে উঠে বল্‌লাম, 'ঐ দ্যাখ, আলোর ভিতর কে হাসছে।' প্রথমে দীনবন্ধু বল্‌লে 'হাঁরে, ঐ যে'...তারপর জগাই 'ঐ যে', মাধাই 'ঐ যে'...সকলে 'ওরে ঐ যেরে!' হুটাপুটি করে উঠতে গিয়ে পা লেগে লণ্ঠন গেল উল্‌টে ও নিবে। তারপর দুপ্‌দাপ্ অস্ফুট চীৎকার—কি যে হল তার বর্ণনা করতে পারি না।

আমাদের মধ্যে যার মাথা সর্ব্বপ্রথমে ঠাণ্ডা হয়ে কাজ করতে আরম্ভ করে সে এই বৎসরের জানুয়ারি মাসে যদি মজঃফরপুরে

উপস্থিত থাকত তাহলে সহরের অত ক্ষতি হোত না নিশ্চয়। তার মৃত্যুতে আমাদের পোড়া দেশ একজন সত্যকারের নেতা খুইয়েছে। সেই হাৎড়ে হাৎড়ে জানালা খুলে দিলে।

হাব্‌লা মেয়ে অপ্রস্তুতে পড়লে যেমন নিরর্থক হাসি হাসে, চোখে জল এসে তারা যেমন তার উজ্জ্বল হয়, শরৎ প্রারম্ভের উষায় আমি সেই নির্ব্বোধ অথচ দুষ্টুমিমাখানো হাসি লক্ষ্য করলাম। এই উষা নিশ্চয়ই ঋগ্‌বেদের বর্ণনার জন্মদাত্রী ছিল না। এমন নির্জীব, এমন আশা-বিরহিত, সঙ্কেত-শূন্য, এমন নিরানন্দময় প্রত্যূষ কখনও দেখিনি। পূবের দরজা খোলা হল—ও দিকটা ফর্সা হয়েছে—গ্রামের গাছগুলো মাথা থেকে অন্ধকারে ছাতা নামিয়েছে—আবছা আবছা তাদের বাহ্য রেখা দেখা যাচ্ছে—ডাইনী-বুড়ী নারকেল গাছটা থেকে একটা পাখী ডাকতে ডাকতে উড়ে গেল—ভূত ছাড়ল যেন। আমি উঠে বসলাম। কর্ম্মপ্রবৃত্তি জাগ্রত হল। সকলে শবদেহ ঘাটে নিয়ে যেতে প্রস্তুত হলাম।

তখনও পথঘাট পরিষ্কার চোখে পড়ে না। আমরা জন আষ্টেক শুধু পায়ে গ্রামের আঁকা-বাঁকা রাস্তা দিয়ে চলেছি—আমার ও দাদার কাঁধে গামছা।দীনবন্ধু অন্য সকলকে বল্‌লে, 'তোরা বাড়ী গিয়ে চা টা বেশ পেটভরে খেয়ে আয়, এ ঘাটে হবে না বুঝলি ত; ভরা নদী, সব ডুবে গিয়েছে কোনার ঘাটে যেতে হবে—ফিরতে দেরী হবে'। হাঁটতে হাঁটতে বৌদির বাড়ী হাজির হলাম। ঠিক বাড়িতে নয়, বাড়ীর বাগানের বাঁশের বেড়ার ধারে। সব চুপ্‌চাপ, কান্না থেমে গিয়েছে—কত আর কাঁদবে! কাঁদবার আর কি আছে! শাশুড়ী ছিল না, ননদ ছিল না, যে অনুতাপে কাঁদবে, জা ছিল না যে আনন্দ ঢাকতে কাঁদবে, ছোট মেয়ে ছিল না যে অপ্রস্তুতে পড়ে কাঁদবে—বাড়িতে এমন কেউ ছিল না যার কর্ত্তব্য ছিল কাঁদা—বৌদিকে যে সকলেই ভালবাসত, সকলের মধ্যে আর কে! স্বামী, লক্ষ্মণের মতন দেওর, আর একটি ছেলে—পঞ্চম শ্রেণীতে আটকে আছে দু' বছর—কিন্তু সৎ ছেলে, মাতৃভক্ত। অন্য আত্মীয়-স্বজন বলতে তাঁর দেওরের বন্ধুরা—বিশেষতঃ দাদা, দীনবন্ধু, এবং আমিও, দাদার দৌলতে। মাসকয়েক পূর্ব্বে তাঁর কাছে বাগানের আম খেয়েছি, তাঁর হাতের গোটা মুড়ি মেখে খেয়েছি, তাঁর হাতের খুঞ্চেপোষ

বোনার সুখ্যাতি করে ইমন কল্যাণের একখানা পাকা ধামার, ঠায় তেওরা নয়—শুনিয়েছি। বেচারি! বাংলা গানই ভালবাসত। অমন মধুর স্বভাব, অমন মিঠে গলার আওয়াজ, অমন স্নেহশীল হৃদয় বিরল। বৌদির কথা মনে পড়তে আমার চোখ জ্বালা করতে লাগল, কান্না চাপতে গলা ব্যথা করতে লাগল, চিন্তার দ্বারা ভাবপ্রবণতা জয় করতে রগ্ টিপ্ টিপ্ করতে লাগল। সেই ভোরের ছায়াময় অন্ধকারে আমরা জন আষ্টেক যুবক অপেক্ষা করতে লাগলাম। দাদা একা বাগানে প্রবেশ করলে। খানিক পরে চাপা গলায় কথোপকথন শুনতে পেলাম—'কি রে! এত ভোরে!' 'তুই কখন এলি কোলকাতা থেকে ?' 'ডাক্তারের সঙ্গে।' 'ডাক্তার চলে গিয়েছে ?' 'হাঁ, থাকবার প্রয়োজন হল না। আসবার আগেই।' 'তুই ছাত থেকে নেবে আয়।' বন্ধু খালি গায়ে নেমে এল। আমাদের এই অবস্থায় দেখে তার আশ্চর্য্য হওয়া অন্যায় হয়নি। আমি জিজ্ঞাসা করলাম—'কি হয়েছিল ?' 'মেয়ে। সেটাও গিয়েছে, দাদার কপাল ভাল, এই বুড়ো বয়সে মেয়ে বেঁচে উঠলে আর রক্ষা থাকত না।' বন্ধুর চিত্তস্থৈর্য্য দেখে আমার বড় ভাল লাগল। 'যা বলেছিস! দাদা ভাগ্যবান—ভাগ্যবানেরই—' 'বুড়ো বয়সের মেয়ে মরে।' 'তুই বাংলা জানিস না—ভাগ্যবানের স্ত্রী মরে।' 'না ভাই ঐ টুকু রক্ষে, বৌদি অনেক কষ্টে বেঁচে উঠেছে, এখন ঘুমুচ্ছে—অনেক দিন পরে প্রসব হলে ঐ রকম কস্ট হয়, ডাক্তার বলছিল। 'কি ভাগ্যি, ডাক্তার আসবার আগেই মেয়েটা জন্মায়। তোদের আজ সবই সৌভাগ্য! তবে কাঁদছিলি কেন ? তোরা কি রাজপুত যে মেয়ে জন্মালে কাঁদিস ? তোরা না বাঙ্গালী ? তোদের ভগবদ্‌ভক্তি কোথায় গেল ?'

সকলের মুখে হাসি এল। বন্ধু সমেত দাদার বাড়ি ফিরে এলাম। ভাল করে চা খাওয়া গেল—অত ভোরে দুধ আসে নি, লেবু দিয়েই খেলাম। দাদা কুইনিনের পিল্ দিতে চাইলে—রাজি হলাম না।

মাথায় আগুন জ্বলছিল—বারণ করা সত্ত্বেও গঙ্গায় স্নান করে এলাম। ভাত খেয়ে ঘুমুলাম। ঘুম থেকে উঠলাম জ্বর শুদ্ধ। সন্ধ্যার সময় শুনলাম ১০৪ হয়েছে। সাইকেল করে নৈহাটি থেকে বরফ আনতে লোক গেল। রাতে মাথায় বরফ দেওয়া হচ্ছিল। বেঘোরে জ্বর এল। জ্বরের সময় দাদার

সেবা, বন্ধুদের শঙ্কা ছাড়া আমার দুটি কথা মনে আছে। ছেলে বেলায় পাড়াগাঁয়ে থাকতাম, প্রথম বর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে জ্বর আসত, হুঁস হারাতাম একটি স্বপ্ন দেখে—দিবাস্বপ্নই বোধ হয়। একজন মহাকায় সুবর্ণময় পুরুষ পূর্ব্বদিক থেকে আকাশ ব্যাপে পশ্চিম দিকে মাত্র তিন ধাপে এগিয়ে চলেছেন, এক ধাপ যেন আমার বুকে—হাতে থাকত তাঁর একটা গোলক—সূর্য্যের মতন। কোলকাতায় এসে ম্যালেরিয়ার হাত থেকে পরিত্রাণ পাই। অনেক দিন ঐ বিরাট পুরুষের দর্শনলাভ হয়নি—সে দিন হল। এবার তাঁর মুখ দেখতে পেলাম—সেই মুখ আমারই মুখ। সেই হাসি যেটি হিঙ্কসের লণ্ঠনের মধ্যে দেখেছিলাম। দ্বিতীয় কথা যা মনে পড়ে সেটি হল এই—আমার দেহ যেন চাদর ঢাকা—একটি গানের কলি ভেসে আসছিল কানে—বিষয় মদ খেয়ে আশার চাদরে ঢাকা, কত কাল রবে বল ? বাকি কথা স্মরণ হচ্ছিল না ; কত কাল রবে বল—পদটি পুনরাবৃত্ত হচ্ছিল, সেই সঙ্গে মন টিপ্পনী কাটছিল—'কাল ফুরিয়েছে, এই ত দেহটা পড়ে রয়েছে—আমি ভাসছি খানিকটা ওপরে, দেহটার নাভিকুণ্ডল থেকে লাল পদ্ম উঠেছে, তার ওপর বেশ আরাম করে বসে আছি, অথচ দেহের সঙ্গে যোগ নেই। ওপর থেকে আমার মুখটা দেখতে পাচ্ছিলাম—দরজার পাশে ছাতে যে মুখ দেখেছিলাম সেটা সুনিশ্চিত আমারই—নিজেকে দেখে ভয় পাওয়া ! হাসি পেল। আমিও হাসছি ওপর থেকে, তারই প্রতিচ্ছবি পড়ছে নীচের দেহের মুখে···তাহলে সম্বন্ধ ছিন্ন হয়নি। আমার সত্যকার মুখের আলো প্রতিক্ষেপ করার শক্তি এখনও এই নীচের মুখের রয়েছে ! তার পর হঠাৎ নীচের দেহ থেকে একটা হাত—বাঁ হাত কি ডান হাত ঠিক্ বুঝতে পারি নি—ওপরে এগিয়ে এল। ওপরকার দেহের ডান হাত বজ্রমুষ্টিতে ধরে বল্লে, ইংরাজীতে বল্লে, আমার ডাক নাম নিয়ে—Why don't you see I am dying ?

দিন তিনেক জ্বরের ধমক ছিল। বৃহস্পতিবার জ্বর কমে। গরুর গাড়িতে বিচিলি পেতে, তার ওপর বিছানা পেতে বন্ধুদের সঙ্গে ষ্টেশনে এলাম, তারাই কোলকাতার বাড়ীতে পৌঁছে দিলে—দরজার গোড়া পর্য্যন্ত। আরো সপ্তাহ খানেকের ওপর জ্বরের মেয়াদ ছিল। বাড়ীর গুরুজন খুবই

বিরক্ত হয়েছিলেন। শনিবার রাত্রের ঘটনা কাউকে বলিনি, তবে সেটা মনের মধ্যে কালো প্রশ্নের চিহ্ন এঁকে দিয়েছিল, অনেক চেষ্টাতেও তাকে মুছে ফেলতে পারিনি।

* * *

সেদিন সুক্ত, পলতার বড়া ও কাঁচকলার ঝোল দিয়ে পথ্য করছি। সবে মাত্র খেতে বসেছি, এমন সময় বাবা নীচে থেকে আমাকে ডেকে বল্‌লেন, 'শীগ্‌গির নেমে এস—মেজদা গলির মোড়ে গাড়িতে বসে আছেন—বড় অসুখ—চাকরদের সঙ্গে করে তাঁকে তুলে নিয়ে এস।' তাড়াতাড়ি নেমে গেলাম। জ্যাঠামশাইএর পিঠে মস্ত ফোঁড়া হয়েছে, উঠতে পারছেন না, ধরাধরি করে ওপরে নিয়ে এলাম। জ্যাঠাইমা জ্যাঠামশাইএর পিঠে তেল মাখাতে গিয়ে একটা ব্রণ খুঁটে দেন—বাইবেলের সরষে বীজের মতন সেই ব্রণ এখন মহীরুহে পরিণত হয়েছে। ডাক্তার এল, বৈদ্য এল, হোমিওপ্যাথ এল, চাঁদসীর ক্ষতচিকিৎসক এল—চেরা, ফোঁড়া, দাওয়াই, মালিশ প্রলেপ, ঝাড় ফুক, বর্ত্তমানের উচ্চশিক্ষিত বাড়ীতে যা যা চিকিৎসা হয়—সবই হল। কিন্তু জ্যাঠামশাইএর প্রাণপ্রদীপ নিবে আসছিল।

সেদিন ছিল শনিবার। সকালের দিকে একটু যেন আশা হল, দুপুরে ভালই রইলেন, বিকেলে তাঁর পাশে বসে রইলাম সন্ধ্যার ঝোঁকে অবসর পাব বলে। অবসরের প্রয়োজন ছিল। পূজা আগতপ্রায়, কলেজের থিয়েটার হবে তার দু-তিন দিন পরে—মিনার্ভা ষ্টেজ ভাড়া নেওয়া হয়েছে—মহলা চলছে, চন্দ্রগুপ্তের, গোড়ায় গলদের। আমার ছোট পার্ট ছিল বটে, কিন্তু অন্য সব গুরুভার আমার। সেই ধান্‌ধায় একবার না বেরুলে নয়। সন্ধ্যার সময় স্নান করে নিলাম, ওপরের ঘরে গিয়ে চুল আঁচড়াচ্ছি—তখন চুল ছিল এবং সে চুল ঘন, কৃষ্ণবর্ণ ও তরঙ্গায়িত, এমন সময় বাবা আস্তে আস্তে ডেকে বল্‌লেন, 'একবার তুমি ছাখ ত নাড়িটা, যেন কেমন মনে হচ্ছে, মেজদার গতিক ভাল নয়।' বিপদের সময় বাবা আমাকে বন্ধুর মতন ব্যবহার করতেন, আমার নানান গুণ আবিষ্কার করতেন, ন্যয়, নাড়ি-জ্ঞান পর্য্যন্ত। তাড়াতাড়ি চুল আঁচড়ানো রেখে—জ্যাঠামশাই সিঁথি কাটা

ভালবাসতেন না—তাঁর ঘরে প্রবেশ করলাম। তাঁর বিছানার পাশে দাঁড়াতেই তাঁর ঠাণ্ডা হাত দিয়ে আমার হাতটা জোরে ধরে বল্‌লেন, 'Why don't you see I am dying ?' 'Oh, no you are going to live,' বল্‌লাম বটে, কিন্তু হাতের ও পায়ের শীতলতা, নাড়ির বিচ্ছিন্ন গতি দেখে বুঝলাম সুবিধে নয়। পাশে বসলাম, আমার যে হাতটা তিনি ধরেছিলেন সেটা যেন অতিরিক্ত ঠাণ্ডায় পুড়ে যাচ্ছে। শুনেছিলাম—সেই আমার প্রথম মৃত্যু শয্যায় উপস্থিতি, তারপর অনেক দেখেছি, শুনেছিলাম যে মৃত্যুর পূর্ব্বে মুখে মৃত্যুর ছায়া পড়ে, কোন ছায়া চোখে পড়ল না। মাটিতে জ্যাঠাইমা ঘুমিয়ে পড়েছেন, সন্ধ্যাবেলাতেই, নিকট আত্মীয়ের ঐ সময়কার ঘুম বড়ই অকল্যাণকর শুনেছিলাম। ঘড়িতে তখন ৮টা বেজেছে—ছেলেরা অপেক্ষা করছে, আজ আর কোন কাজ হবে না—নলিনাক্ষের পার্টে বড় বেশী কথা নেই, মাত্র গেটা কয়েক ইংরেজী বুক্‌নী আছে, বইএতে বেশী নেই, আমার ইচ্ছায় ঢোকানো হয়েছে, জ্যাঠামশাইএর ইংরেজী উচ্চারণ চমৎকার—হঠাৎ মনে পড়ল যেন ঐ ইংরেজী কথাটি আমার পূর্ব্বেকার শোনা, কে বলেছে কিছুতেই স্মরণ করতে পারলাম না। জ্যাঠামশাই চিৎ হয়ে শুতে চাইছিলেন, পিঠে অত বড় কার্‌বাঙ্কল্‌, ব্যথা কোথায় গেল ? অশুভ লক্ষণ, শুনেছিলাম, মৃত্যুর পূর্ব্বে ব্যথা চলে যায়, মানুষে চিৎ হয়ে শোয়। অনেক কষ্টে জ্যাটামশাইকে আমাতে আর অন্য একজনেতে চিৎ করে শোয়ানো গেল—বড় দেরী হল, একবার কলেজ থেকে ঘুরে আসতেই হবে—'আমি আসছি নীচে থেকে' বলে নীচে গেলাম। 'বাবা, কার্ব্বোটা দিন এই বেলা।' 'সেটা মৃগনাভির সঙ্গে কোন্ বোকা রেখেছে।' 'না না, সেটা যেন না দেওয়া হয়, আমি এখনি কিং কোম্পানী থেকে ছুটে নিয়ে আসছি, ওপরে যান।' এই বলে বেরিয়ে পড়লাম।

কলেজে এলাম ; সাধারণের কাজ হাতে নিয়েছি যখন তখন না যাওয়া অন্যায়। গিয়ে সকলকে বল্‌লাম, 'ওরে, বাড়িতে বড় বিপদ, জ্যাঠামশাই বোধ হয় আজই চল্‌লেন, খালি পায়ে কি করে ষ্টেজে নামব ? যে পার্ট দিয়েছিস, তাতে ত বিলাতী পোষাক ছাড়া উপায় নেই।' 'সব মাটি, সে হয় না।' 'হয় না কিরে। হিন্দুর ছেলে, দায়ভাগের বাবা, এক কলমের খোঁচায়

বাবা ত্যজ্যপুত্তুর করবেন।' তারা বিশ্বাস করতে চাইলে না যে আজই বিপদ ঘটবে। যেন বিপদের হাত থেকে আমাকে রক্ষা করতে জনকয়েক কর্ম্মী আমার সঙ্গে এল। 'খাট নিয়ে যাই চ।' তারা অত তাড়াতাড়ি খাট কিনতে রাজি হল না—পকেটে টাকা আছে বল্‌লাম—তবু রাজি হল না। 'তোরা খেয়েছিস?' 'এখন খাব কিরে? এই ত' ন'টা।' 'তাহলে কিছু খেয়ে নে।' একটা হোটেলে কিছু মুরগীর কাটলেট খেয়ে নেওয়া গেল। 'দাঁড়া, কার্ব্বো কিনে নিয়ে যাই।' পাঁচ পয়সার কার্ব্বো কিনে সদলবলে বাড়ি ফিরিলাম। তখনও মারা যাননি, তবে যাচ্ছেন, ওপরের ঘরের সব দরজা জানালা খোলা, বাড়ির সব আলো জ্বলছে, ঘরের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখেই বাইরে থেকে বুঝলাম। আধঘণ্টার মধ্যেই মারা গেলেন। 'দেখলি ত? খাট আনলেই হোত!' 'তা কি করে জানব বল্? তোর যা তাড়াতাড়ি করা অভ্যাস! একেবারে গোড়ায় গলদ! শেষ রক্ষা হবে কি করে!' 'তোরা ভারি স্বার্থপর! এখন খাট নিয়ে আয় তোরা—সঙ্গে যেতে হবে তোদের—ভাগ্যিস্ পেটখালি নেই।'

রাত সাড়ে এগারটা নাগাদ বেরিয়ে পড়লাম। আমাকে মুখাগ্নি করতে হবে, কারণ জ্যাঠামশাই ছিলেন অপুত্রক। নিমতলায় যখন পৌঁছলাম তখন একটা বাজতে পাঁচ মিনিট, গুরুজনের মধ্যে ছিলেন পিসেমশাই, তিনি মেডিক্যাল সার্টিফিকেট দাখিল করতে অফিসে গেলেন—সিগারেটের তৃষ্ণা পেল। খাটের পাশে বসে আছি—ধরাবার সাহস হল না। একটা থামের আড়ালে গিয়ে খেয়ে আবার এলাম। মনে খুব দুঃখ আসছিল না, লক্ষ্য করে লজ্জিত হচ্ছিলাম, অথচ আমাকেই মুখাগ্নি করতে হবে। বিশ্রী লাগছিল, অসোয়াস্তি ধরল, উঠে পড়লাম। ঠিক্, উঠবার সময় জ্যাঠামশাইএর চেহারাটা এই প্রথম নজরে পড়ল। একটা সাদা সিল্‌কের চাদর ঢাকা, ভেতর থেকে পা দুটো উঁচু হয়ে রয়েছে, হাত দুটো বেরিয়ে রয়েছে, এই হাতটা দিয়ে আমাকে ধরেছিলেন, অন্য হাতটা বেঁকিয়ে দিলাম। খাটের বাইরে ঝুলছিল, তখনও শক্ত হয়নি। হাতটা ঠিক্ গালের পাশে রইল, মুখে হাসি—এ যে সেই! নিশ্চয়ই সেই! সেই হালিসহরের ছাতের মূর্ত্তি—ঘাটের ঘড়িতে শ'একটা—সেই সময় পর্য্যন্ত! ছুটে শব

ছেড়ে চলে এলাম লোকালয়ে, যেখানে বন্ধুরা বসেছিল। পারলাম না মুখাগ্নি করতে, শেষ কাজ করতে, কর্ত্তব্য করতে। কোথাকার এক আদিম প্রবৃত্তি আমার সমগ্র দেহ ও মনকে এক নিমেষে অপটু করে দিলে। ট্যাক্‌সী চড়ে লুকিয়ে পালিয়ে এলাম, ভয়ে।

বাবা জিজ্ঞাসা করলেন 'এরি মধ্যে ?' 'পারলাম না, মুখাগ্নি করা আমার কর্ম্ম নয়।' 'সে হয় না, ফিরে যাও।' 'পারব না বাবা, মাপ করবেন— আমি পারব না, পারব না, ওমা, ছাখনা আমি পারছি না।' জ্যাঠাইমা এগিয়ে এসে বল্‌লেন, 'ও ছেলে মানুষ, ও কখনও পারে ! আমিই তাঁর শেষ কর্ত্তব্য করব, ও কাজ আমারই।' বাড়ির পুরাতন ভৃত্য সেই ট্যাক্‌সী করে জ্যাঠাইমাকে নিয়ে গেল। আমি ঘরের মধ্যে মুড়ি দিয়ে শুয়ে রইলাম, মা পাশে বসে মাথায় হাত বুলোতে লাগল। তখন লজ্জা পর্য্যন্ত হয়নি। এখন ভীষণ লজ্জা হয়, আর সেই সঙ্গে শ্রদ্ধা আসে জ্যাঠাইমার ওপর, তাঁদের বয়সী সমগ্র স্ত্রীলোকদের ওপর—তাঁদের দৃঢ়চিত্ততার জন্য, শ্রদ্ধা বাড়ে যখন দেখি আজকালকার মেয়েদের ব্যবহার।

* * * *

দুদিন পরের কথা। সন্ধ্যার সময় একলা ঘরে শুয়ে আছি— থিয়েটার করব না, দেখতেও যাবনা ঠিক্ করেছি—জ্যাঠাইমা আমাকে বাতাস করছেন। যতটা দুঃখ হবে ভেবেছিলাম তার চেয়ে বেশী দুঃখ বুকের মধ্যে জমে উঠেছিল। জ্যাঠাইমা বল্‌লেন, 'বাড়ি বসে কি করবি ? দুদিন ঘরের বাইরে পা মাড়াসনি, যা ঘুরে আয়, লক্ষ্মী বাবা, শরীর খারাপ করতে নেই, তুই, তোরা বেঁচে থাকলে আমার সব রইল।' আমি আরো মাথা গুঁজলাম। গায়ে হাত বোলাতে লাগলেন। 'না জ্যাঠাইমা, আমি আজ থিয়েটার দেখতে যাব না।' 'না বাবা তুই যা, তাড়াতাড়ি চলে আসিস, তোর বাবা টের পাবে না।' 'জ্যাঠাইমা তুমি আমাকে এত ভালবাস ?' 'উঁনি তোকে কত ভালবাসতেন তা কি জানতিস বাবা ? এই মাসখানেক আগে তুই হালিসহর যাচ্ছিলি— পথে ড্রয়িং মাষ্টারের সঙ্গে বুঝি তোর দেখা হয়, তিনি এসে সন্ধ্যাবেলা খবর দিলেন যে তুই না কি সন্ধ্যার সময় নৌকা করে হুগলী আসছিস। রাত ন'টা বাজল, দশটা বাজল, খেলেন না, উনুন জ্বলতে লাগল, তুই এলে গরম

লুচি খাবি—এগারটা বাজল—কি ছট্‌ফটানি—ছাতে ঘুরতে লাগলেন। আমি বল্‌লাম 'ওগো শোও'। জানতিস ত মানুষকে, একবার গোঁ ধরলে আর ছাড়ত না—সমস্ত রাত ছাতে পায়চারি করে বেড়াতে লাগলেন—এক মিনিট ঘুমোননি, সকালে বল্‌লেন, 'ও আর আসবে না, ছেলেমানুষ ভুলে গিয়েছে!' তোকে বড় ভালবাসত রে! তোরই কাছে এসে গেলেন। অসুখ করে পর্য্যন্ত বলতে সুরু করলেন তোর কাছে নিয়ে চল। তুই আর কাঁদিস নি বাবা, তাঁর আত্মার কষ্ট হবে তোর কান্না শুনে। তুই যা ঘুরে আয়।'

নলিনাক্ষের পার্ট অন্যে করেছিল। শুনলাম ভাল হয়নি। তাতে আমার কোন ক্ষোভ হয়নি—তখন একটি প্রশ্নে আমার চিত্তকে বিক্ষুব্ধ করছিল—সেই শনিবার রাত শ'একটার সময় যার মূর্ত্তি দেখেছিলাম, সে মূর্ত্তি কার? জ্যাঠামশাই তখনও জীবিত ছিলেন, তবে কি আত্মা তীব্র আকাঙ্ক্ষার বশে মৃত্যুর পূর্ব্বে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে? সেই একমাস পূর্ব্বকার রাতে Why don't you see I am dying শুনেছিলাম কার কণ্ঠে?

এখনও সে প্রশ্নের জবাব পাইনি।

ধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
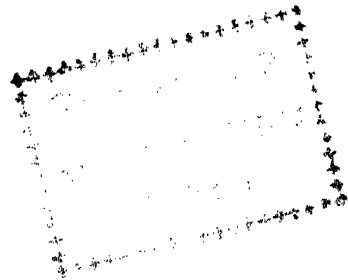
বুদ্ধদেবের 'নাস্তিকতা'

৫

আমরা দেখিয়াছি, বুদ্ধদেবের মতে যিনি জীবন্মুক্ত অর্হৎ, দেহান্তে তিনি 'পরিনির্ব্বাণ' লাভ করেন। ঐ নির্ব্বাণের নাম 'অনুপাধিশেষ' নির্ব্বাণ। প্রশ্ন উঠিতে পারে, যিনি 'নির্ব্বাণী', যখন কাল পূর্ণ হইলে তাঁহার সেই অন্তিম দেহের পাত হয়, তখন কি সমস্তেরই অবসান হয়? অর্থাৎ নির্ব্বাণ কি নাস্তিত্ব? দীপনির্ব্বাণের মতন, সে অবস্থায় কি সমস্তই নিবিয়া যায়? মানুষের এই নিয়তিই যদি বুদ্ধদেবের অভিপ্রেত হয়, তবে ত' তাঁহাকে নাস্তিক বলা আদৌ অসঙ্গত নয়। অতএব নির্ব্বাণ সম্পর্কে বুদ্ধদেবের অভিমত একটু নিবিড় ভাবে আলোচনা করা যাক।

প্রথমতঃ লক্ষ্য করুন যে, বুদ্ধদেবের প্রচারিত নির্ব্বাণতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম না করিয়া, তাঁহার সমসাময়িক ব্যক্তিদের কেহ কেহ তাঁহাকে নাস্তিত্ববাদী বলিত বলিয়া তিনি নিজে স্পষ্ট বাক্যে ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন—

এবং বিমুত্তচিত্তং খো ভিক্খবে! ভিক্খুং সেন্দা দেবা সব্রহ্মকা স-প্রজাপতিকা অন্বেসং নাধিগচ্ছন্তি ইদং নিস্সিতং তথাগতস্স বিঞ্ঞাণং তি। তং কিস্স হেতু? দিট্ঠে বাহং ভিক্খবে! ধম্মে তথাগতং অননুবেজ্জোতি বদামি। এবং বাদিনং খো মং ভিক্খবে! এবং অভ্যায়িং একে সমণব্রাহ্মণা—অসতা তুচ্ছা মুসা অভূতেন অব্-ভাচিক্খন্তি (impeach)—'বেনসিকো সমণো গোতমো সতো সত্তন উচ্ছেদং বিনাসং বিভবং (nullification) পঞ্ঞাপেতি তি'। যথা বাহং ভিক্খবে ন, যথা চাহং ন বদামি, তথা মং তে ভান্তো সমণব্রাহ্মণা অসতা তুচ্ছা মুসা অভূতেন অব্ভাচিক্খন্তি।
—মজ্ঝিমনিকায়, ২২ সুত্ত

'হে ভিক্ষুগণ! যে ভিক্ষু এইরূপ বিমুক্তচিত্ত—ইন্দ্র, ব্রহ্মা, প্রজাপতি বা অন্য দেবতা—কেহই সেই তথাগতের বিজ্ঞানের (Consciousness-এর) নিশ্রয় (বা প্রতিষ্ঠার) অন্বেষণ পান না। কেন? যেহেতু (আমি বলি) সেই তথাগত এখানে এবং এখনিই (here and now) অননুবেদ্য (untraceable)। ভিক্ষুগণ! এইরূপ বলার জন্য, এইরূপ শিক্ষা দিবার জন্য, কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ অসত্য-ভাবে, তুচ্ছভাবে, অভূতভাবে (wrongly, erroneously, falsely, untruly) আমার বিরুদ্ধে এইরূপ অভিযোগ করেন যে, 'এই শ্রমণ গৌতম বৈনাশিক, ইনি সৎ বস্তুর উচ্ছেদ বিনাশ বিভব প্রচার করেন।' আমি যাহা নই, আমি যাহা বলি না—হে ভিক্ষুগণ! এই সকল ভান্ত (good) শ্রমণ ব্রাহ্মণেরা অসত্যভাবে, তুচ্ছভাবে, মিথ্যাভাবে, অভূতভাবে আমাকে সেইরূপ অভিযোগ করেন।'

ইহার পরও কি বুদ্ধদেবকে বৈনাশিক (নাস্তিত্ববাদী) বলিব ? কিন্তু অসাধুবাদের অন্ত নাই—

যথা স্ত্রীণাং তথা বাচাং সাধুত্বে দুর্জ্জনো জনঃ—(ভবভূতি)।

বুদ্ধদেবের মরণান্তেও তাঁহার ঐ বৈনাশিক অপবাদ ঘুচে নাই। সঞ্‌যুক্ত-নিকায়ের তৃতীয় পরিচ্ছেদে দেখা যায়, বুদ্ধদেবের সাক্ষাৎ শিষ্য যমকের মনেও এই সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল যে, বুদ্ধদেবের মতে ক্ষীণাসব (মৃদিত-কষায়) ভিক্ষু দেহান্তে উচ্ছিন্ন হন, বিনষ্ট হন, মরণের পর নির্ব্বাণীর নাস্তিত্ব (annihilation) হয়—

এবং খো হং আবুসো ভগবতা ধম্মং দেসিতং আজানামি। যথা খীণাসবো ভিক্‌খু কায়স্‌স ভেদা উচ্ছিজ্জতি বিনস্‌সতি ন হোতি পরং মরণা তি।

ইহার প্রতিবাদ করিয়া অন্যান্য ভিক্ষুরা বলিলেন—

মা আবুসো যমক! এবং অবচ, মা ভগবন্তং অব্ভাচিক্‌খি (traduce)। ন হি সাধু ভগবতো অব্ভাক্খানং। ন হি ভগবতা এবং বদেয্য খীণাসবো ভিক্‌খু কায়স্‌স ভেদা উচ্ছিজ্জতি বিনস্‌সতি ন হোতি পরং মরণা তি।

'হে আবুস (মান্য) যমক! এরূপ বলিও না। ভগবান্ (বুদ্ধদেবের) অভ্যাখ্যান (traduce) করিও না। ভগবানের অভ্যাখ্যান শোভন নহে। ভগবান্ কখনো বলেন নাই যে, ক্ষীণাসব ভিক্ষু দেহান্তে উচ্ছিন্ন হন, বিনষ্ট হন, মরণের পর তাঁহার নাস্তিত্ব হয়।'

ইহাতেও যখন যমকের সন্দেহ ভঞ্জন হইল না, তখন ভিক্ষুরা তাঁহাকে ভিক্ষু-প্রধান সারিপুত্রের কাছে লইয়া গেলেন। সারিপুত্র অমোঘ বাক্যে বুদ্ধদেবের মতের ব্যাখ্যান করিলেন। তখন যমকের সংশয় ছিন্ন হইল। তিনি কৃতজ্ঞচিত্তে বলিলেন—

অহু খো মে তং আবুসো সারিপুত্ত! পুবে অবিদ্দাসুনো পাপকং দিট্‌ঠিগতং; ইদং চ পঞ্‌ঞাসমেতো সারিপুত্তস্‌স ধম্মদেসনং সুত্বা, তং চেব পাপকং দিট্‌ঠি গতং পতুনং ধম্মো চ মে অভিসমেতো তি।

'মান্যবর সারিপুত্র! অজ্ঞতানিবন্ধন আমি পূর্ব্বে ঐ ভ্রান্ত মত (পাপক দৃষ্টি) পোষণ করিতাম। কিন্তু অদ্য আপনার প্রজ্ঞাসম্মত ধর্ম্মদেশনা শুনিয়া আমার সে ভ্রান্ত মত তিরোহিত হইয়াছে এবং আমি প্রকৃত ধর্ম্ম (Doctrine) জ্ঞাত হইয়াছি।'

নির্ব্বাণ-দশা

বুদ্ধদেব নিজের নির্ব্বাণদশার পরিচয় দিতে গিয়া বলিয়াছেন—

I have in this life entered Nirvana, while the life of Gautama has been extinguished. Self (অর্থাৎ Personality) has

disappeared and Truth has taken its abode in me. (এই Truth= উপনিষদের 'অথ সত্যম্ অস্তি' —কেন, ২।১৩)

তিব্বতীয় মোক্ষশাস্ত্র হইতে সংকলিত 'অনাদ নাদ' (Voice of the Silence) গ্রন্থে আমরা এ কথার প্রতিধ্বনি শুনিয়াছি।

And now the Self is lost in the Self, thyself unto Thyself, merged in that Self, from which thou first didst radiate.

Where is thy individuality, Lanoo ! Where the Lanoo himself ? It is the spark lost in the fire, the drop within the ocean, the everpresent ray become the All and the eternal radiance *

অতএব আমরা যাহাকে জীবভাব বলি, মোক্ষদশায় তাহার অভাব হয়—আমাদের ব্যক্তিত্বের (Individuality বা Personalityর) বিলোপ ঘটে, আমাদের পৃথক্‌বাহিনী চিত্তনদী নামরূপ হারাইয়া নির্ব্বাণ-সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়—উপনিষদে যাহাকে সলিল একো দ্রষ্টা অদ্বৈতো ভবতি (বৃহ, ৪।৩।৩২) বলিয়াছেন। কিন্তু তাই বলিয়া নির্ব্বাণ নাস্তিত্ব নয়। আমরা দেখিয়াছি, ঐ ব্যক্তিত্ব অস্থায়ী মায়িক মুখস মাত্র—আমাদের শাশ্বত সত্তা নহে।

Personality, in all its elements, is something alien to our true essence. From this alien thing we only need to free ourselves (Grimm p. 196). His individuality, the basis of all works, he has seen to be an illusion (Ibid p. 346).

অস্তি-নাস্তির অতীত

সেই জন্য বুদ্ধদেব বলিতেন, পরিনির্ব্বাণ অস্তি-নাস্তির অতীত অবস্থা।

To reach Nirvana is to pass beyond humanity and to gain a level of peace and bliss, far above earthly comprehension.—Man, Visible and Invisible. এক কথায় 'Nirvana is the land of silence and non-being. (The Voice of the Silence.)

* এ প্রসঙ্গে শ্রীমৎ কৃষ্ণমূর্ত্তি মোক্ষের আস্বাদন পাইয়া তাহার যে আভাস দিয়াছেন, তাহা আমাদের প্রণিধান-যোগ্য।

Liberation is not annihilation * * Liberation is not negative. On the contrary, it is positive. It is not entering into a mere void and there losing yourself * * It is true *there is no separate self* but there is the Self of all.—By What Authority, p 37.

যিনি পরিনির্ব্বাণী, তিনি বলিতে পারেন—

নাহং কচনি, কস্সচি কিংচন, তস্মিং ন চ মম কচনি কিম্মিং চি কিংচন নত্থি—মজ্ঝিমনিকায় II, ২৬৩

'I am not anywhere whatsoever, to any one whatsoever, in anything whatsoever ; neither is anything whatsoever mine, anywhere whatsoever, in anything whatsoever'

অর্থাৎ তিনি 'is nowhere and everywhere.'

কিন্তু—

If any teach, Nirvana is to cease, say unto such they lie.
If any teach Nirvana is to live, say unto such they err.
Not knowing this,
Nor what light shines beyond their broken lamps,
Nor lifeless, limitless bliss.—Light of Asia, Book viii

He goes
Into Nirvana. He is one with Life
Yet lives not. He is blest, ceasing to be.
* * Seeking nothing, he gains all,
Foregoing self, the Universe grows 'I'.—Ibid.

এ সম্পর্কে বুদ্ধদেবের নিজ মুখের বাণী এই ঃ—

অত্থং গতস্স, (নির্ব্বাণ প্রাপ্তের) পমাণং (ইয়ত্তা) নত্থি।* কারণ, নির্ব্বাণ 'অনাখ্যাত' বস্তু (ধম্মপদ, পিয়বগ্গো ১০)। অতএব

Measure not with words
The immeasurable, nor sink the plumb of thought
Into the fathomless ! Who asks doth err,
Who answers errs. Say naught.—Light of Asia

কারণ 'Nirvana is the land of silence and non-being.' (The Voice of the Silence)। অতএব এ ক্ষেত্রে,—তুষ্ণীমেব বরং—Silence is golden.

‡ অত্থং গতস্স ন পমাণং অত্থি যেন নং বজ্জু তং তস্স নত্থি। সব্বেসু ধম্মেসু সমূহতেসু সমূহতা বাদপথাপি সব্বে—সুত্তনিপাত, ৫ অধ্যায়।

For the vanished one (অস্তং গতস্য), there is no measure (প্রমাণং নাস্তি)—that whereby he might be designated no longer exists.

সংযুত্তনিকায়ে দেখি, বুদ্ধদেবের পরিনির্ব্বাণের পর প্রশ্ন উঠিয়াছিল—হোতি তথাগতো পরং মরণা—দেহান্তের পর তথাগত আছেন কি ?

উত্তর—'অব্যাকতং খো এতং ভগবতা—ভগবান্ (বুদ্ধদেব) ইহা প্রকাশ করেন নাই।' তবে কি 'ন হোতি তথাগতো পরং মরণা—দেহান্তের পর তথাগত নাই ?' উত্তর—অব্যাকতং খো এতং ভবগতা—ভগবান (বুদ্ধদেব) ইহাও প্রকাশ করেন নাই। কেন করেন নাই ? কারণ, 'তথাগতো গম্ভীরো অপ্‌পমেয়ো দুপ্‌পরিযোগাহো সেয্‌যুথাপি মহাসমুদ্দো'—যিনি তথাগত (পরিনির্ব্বাণপ্রাপ্ত), তিনি গম্ভীর, অপ্রমেয়, দুষ্প্রতিগ্রহ যেমন মহাসমুদ্র—'He is indefinable, inscrutable, immeasurable like the great ocean'। সেই প্রাচীন উপমা—

> যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রে
> অস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়—মুণ্ডক, ৩।২।৮

'যেমন নদী বহমান হইয়া সমুদ্রে অস্তমিত হয়, তাহার আর নামরূপ থাকে না—তেমনি।'

সেইজন্য গ্রিম্ বলিয়াছেন—The totally extinguished Delivered One is nowhere and everywhere (p. 359.)

নির্ব্বাণ অকথ্য

নির্ব্বাণ যখন অস্তি-নাস্তির অতীত অবস্থা, তখন তৎসম্বন্ধে কোন মত (view) প্রকাশ করিতে যাওয়া ধৃষ্টতা নয় কি ? বুদ্ধদেব আনন্দকে এই কথাই বলিয়াছেন—

> এবং বিমুত্তচিত্তং খো আনন্দ ! ভিক্‌খুং যো এবং বদেয্য 'হোতি তথাগতো পরং মরণা' ইতি ইতিস্‌স দিট্‌ঠি হি তদ্ অকত্তং। 'ন হোতি তথাগতো পরং মরণা' ইতি ইতিস্‌স দিট্‌ঠি হি তদ্ অকত্তং। 'নেব হোতি ন ন হোতি তথাগতো পরং মরণা' ইতি ইতিস্‌স দিট্‌ঠিতি তদ্ অকত্তং—দীঘনিকায়, ১৫

'হে আনন্দ ! বিমুক্তচিত্ত ভিক্ষুকে যদি কেহ বলে 'দেহান্তে তথাগত থাকেন'—উহা দৃষ্টি (view) মাত্র—অকথ্য (unbecoming) ; যদি কেহ বলে 'দেহান্তে তথাগত থাকেন না' উহাও দৃষ্টিমাত্র—অকথ্য ; পুনশ্চ যদি কেহ বলে—'দেহান্তে তথাগত থাকেনও না, না থাকেনও না—উহাও দৃষ্টিমাত্র, অকথ্য।

অধ্যাপক গ্রিম যথার্থই বলিয়াছেন—

Here, then, we find ourselves confronted by a kind of existence that in our sense is no longer existence ; we have

arrived at the portals of the unrecognisable, the transcendental * * Therefore no conception and consequently no word fits it (p. 178). Because no kind of cognition penetrates to the I, nothing whatsoever, absolutely nothing, can be told about it ; the rest is—silence (p. 502).

কিন্তু নির্ব্বাণ অতর্ক্য, অবর্ণ্য, অকথ্য, অচিন্ত্য হইলেও—নির্ব্বাণে ব্যক্তিত্বের বিলোপ, জীবভাবের অভাব ঘটিলেও, এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, নির্ব্বাণ নাস্তিত্ব নহে—পাশ্চাত্যেরা যাহাকে abyss of absolute annihilation বলিয়াছেন—নির্ব্বাণ নিশ্চয়ই তাহা নহে। নির্ব্বাণ-দশায়, 'our dew drop slips into the shoreless sea' বটে, কিন্তু 'is not lost therin' *

অভাব ও ভাব-নির্দ্দেশ

নির্ব্বাণ অবর্ণ্য অকথ্য অচিন্ত্য বলিয়া উহার পরিচয় দিতে বুদ্ধদেব অনেক স্থলে 'নেতি নেতি' অপবাদ-ন্যায়ের (negative description এর) আশ্রয় লইয়াছেন। নির্ব্বাণ সেই অবস্থা—

'where there is neither birth nor sickness, nor becoming old, nor dying, nor woe, sorrow, suffering, grief and despair.'

পুনশ্চ নির্ব্বাণ—

is 'the incomparable security, the birthless, the free from growth and decay and disease, the deathless, the sorrowless, the stainless' (সুত্তনিপাত, v 228)

কিন্তু তাহা হইলেও, সর্ব্বত্র নির্ব্বাণ-বর্ণনায় অভাব-নির্দ্দেশ (negative বা privative attributes) প্রযুক্ত হয় নাই—সময়ে সময়ে বুদ্ধদেব ভাব-বিশেষণেরও প্রয়োগ করিয়াছেন।

নির্ব্বাণ 'ভূমানন্দ'

অঙ্গুত্তর-নিকায়ে একাধিক বার উক্ত হইয়াছে—Bliss is Nibbana, Bliss is Nibbana ! ইহা সারিপুত্রের মুখের কথা। বুদ্ধদেবের নিজের

* C. W. Leadbeater's How Theosophy Came to Me, p. 16. সেইজন্য অধ্যাপক গ্রীম্ এই নাস্তিত্ববাদকে 'the nonsense of absolute Nihilism' বলিয়াছেন (The Doctrine of the Buddha, p 162.)

বাণী আরও উদাত্ত। তিনি বলিয়াছেন, মুক্তপুরুষ পীতিসুখং অধিগচ্ছতি, অঞ্ঞং এঞং চা ততো সন্ততরং (মজ্ঝিমনিকায়) অর্থাৎ নির্ব্বাণ সুখমাত্র নহে, উহা সুখোত্তর দশা—উপনিষদ্ যাহাকে আনন্দং নন্দনাতীতম্ বলিয়াছেন। অন্যত্র বুদ্ধদেব পোট্ঠপাদকে বলিতেছেন—

Rather will all that I have mentioned happen, and then only joy, pleasure, quietude, earnest reflection, complete consciousness and bliss ensue.—দীঘনিকায়।

এই আনন্দ যে 'ভূমানন্দ'—পরমসুখ * (highest bliss), ধম্মপদে তাহার বিস্পষ্ট উল্লেখ আছে—

নিব্বাণং পরমং সুখং—সুখবগ্গো ৮
সংপস্সং বিপুলং সুখং—পকিণ্ণকবগ্গো ১
অমানুসী রতী হোতি সম্মা ধম্মংবিপস্সতো—ভিক্খুবগ্গো, ১৪
ততো পামোজ্জ বহুলো দুক্খস্সন্তং করিস্সতি—ঐ, ১৭

নির্ব্বাণ পরাশান্তি

নির্ব্বাণ শুধু পরম আনন্দ নহে, নির্ব্বাণ পরাশান্তি—

'that peace that passes understanding', 'an inward peace that can never be shaken, a joy that can never be ruffled (Rhys Davids, p. 166).—গীতায় শ্রীকৃষ্ণ যাহাকে 'শান্তিং নির্ব্বাণপরমাম্' বলিয়াছেন।

অধিগচ্ছে পদং সন্তং সঙ্খারূপসমং সুখং—ভিক্খুবগ্গো, ২২।

নির্ব্বাণের এই পরাশান্তি লক্ষ্য করিয়া বৌদ্ধ ত্রিপটকে ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে—

'Blissful tranquility,' 'stainless bliss of eternal peace' 'absolute peace', 'eternal peace', 'eternal stillness', 'the great peace' (The Doctrine of the Buddha, pp. 350 & 356). এতং সন্তং এতং পণিতং যদিদং সব্বসঙ্খার-সমথে সব্বুপাধিপটিনিস্সগ্গো তন্হক্খায়ো বিরাগো নিব্বাণং তি—মজ্ঝিমনিকায়। অর্থাৎ this is the peaceful, this is the

* এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক রাইস ডেভিডস্ যাহা বলিয়াছেন, তাহা আমাদের প্রণিধানযোগ্য—One might fill pages with the awestruck and ecstatic praise lavished in the writings of the early Buddhists upon the glorious bliss and peace of the mental condition it (Nirvana) involved. They had endless lovenames for it.—Lectures on Buddhism pp, 150, 151.

exalted : the coming to rest of all organic processes, the becoming free from all *upadhis*, the drying up of thirst, the unattractiveness, Niroda, Nibbana.

নির্ব্বাণী 'অস্তংগত'

যিনি পরিনির্ব্বাণী অর্থাৎ যে জীবন্মুক্ত পুরুষ দেহসত্ত্বে নির্ব্বাণ লাভ করিয়া দেহের বিগমে পরিনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন, বুদ্ধদেব তাঁহাকে 'অস্তংগত' বলিলেন—অত্থং গতস্‌স ন পমাণং অত্থি—যিনি 'অস্তগত' তাঁহার ইয়ত্তা হয় না। অস্তংগত—এ বিশেষণের অর্থ কি ?

Those acquainted with the older Sanskrit literature will see at once that in the Pali word (অত্থং গতস্‌স) is hidden the ancient well-known compound word, already found in the Vedas, 'অস্তংগত', the root meaning of which is "gone home."—Grimm.

বস্তুতঃ বৈদিক যুগে 'অস্ত'-শব্দ গৃহ-অর্থে প্রযুক্ত হইত। নিম্নোদ্ধৃত বৈদিক মন্ত্রের প্রতি দৃষ্টি করিলে এ বিষয়ে সন্দেহ থাকে না।

ঋণাবা বিভ্যদ্ ধনমিচ্ছমানো
অন্যেষাম্ অস্তম্ উপনক্তমেতি—ঋগ্‌বেদ, ১০।৩৪।১০

'ঋণের ভয়ে ভীত ব্যক্তি ধন ইচ্ছা করিয়া রাত্রে অপরের অস্তে (গৃহে) প্রবেশ করে।'

বেদভাষ্যকর্ত্তা সায়নও 'অস্তে'র অর্থ করিয়াছেন—গৃহ, ধাম। ঋগ্‌বেদের ঋষি জীবকে আহ্বান করিয়া একস্থলে বলিয়াছেন—হিত্বা অবদ্যং পুনরস্তম্ এহি—১০।১৪।৮—'হে জীব! অবদ্য (অঞ্জন, stain) পরিহার করিয়া আবার অস্তে ফিরিয়া এস'—অর্থাৎ মলা মলিনতা ধৌত করিয়া শুভ্র স্বচ্ছ, 'নিরবদ্য-নিরঞ্জন' হইয়া স্বধামে প্রত্যাবর্ত্তন কর। অতএব অস্তংগত=স্বধাম-প্রাপ্ত।

পরিনির্ব্বাণীর চরমে কি গতি হয় ? ইহার উত্তরে বুদ্ধদেব বলিয়াছেন—

He reaches that realm, our own proper realm (প্রকৃত স্বধাম) 'where there is neither birth nor sickness nor becoming old nor dying nor woe, sorrow, grief and dispair (The Doctrine of the Buddha, p. 197)—যাজ্ঞবল্ক্যের ভাষায়—য অশনায়াপিপাসে শোকং মোহং জরাং মৃত্যুম্ অত্যেতি (বৃহ, ৩।৫।১) 'তিনি ক্ষুধাতৃষ্ণা, শোকমোহ, জরামৃত্যুর অতীত হন—'where neither birth is nor growing old nor dying, neither originating nor perishing.—অঙ্গুত্তরনিকায় II p. 47.

অন্যত্র বুদ্ধদেব পরিনির্ব্বাণীকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—তে পতিপত্তা অমতং (অমৃতং) বিগয্‌য লব্ধা মুধা নিব্বাণং ভুঞ্জমানা (সূত্তনিপাত), অর্থাৎ পরিনির্ব্বাণী is submerged in the deathless (অমৃত)।

ইহার ভাষ্য করিয়া অধ্যাপক গ্রীম বলিতেছেন—

Neither this deathless Nirvana is thus my 'I'; it is rather home in which I am sub- merged (The Doctrine of the Buddha, p. 519). যিনি পরিনির্ব্বাণী, তিনি reposes in the boundlessness and infinitude of his own highest essence. * * This his inscrutable essence, the Saint (the Perfected One) enters, to it he withdraws, in it he rests (Ibid, pp. 359,196).

নির্ব্বাণ স্বরূপে স্থিতি

ইহাকেই বেদান্তের ভাষায় 'স্বরূপে স্থিতি' বলা হয়। বৈদান্তিক বলেন, মুক্তি কি ? মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ। কারণ, ব্যুত্থানদশায় জীব বৃত্তি-সারূপ্য (identification) করিয়া, নিজের প্রকৃত রূপ বিস্মৃত হইয়া, নিজকে পাপীতাপী সুখী দুঃখী মনে করে—বৃত্তিসারূপ্যম্‌ ইতরত্র (যোগসূত্র, ১।৩)। যখন জীব যোগ-সিদ্ধ হয়, তখন সমাধিতে বৃত্তিনিরোধের ফলে সে স্বরূপে অবস্থান করে—তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপে অবস্থানম্‌ (যোগসূত্র, ১।২)। সমাধি অবস্থায় ঐ স্বরূপে স্থিতি অস্থায়ী—কারণ, 'যোগো হি প্রভবাপ্যয়ৌ'—উহার উৎপত্তি বিনাশ আছে। কিন্তু মোক্ষ বা পরিনির্ব্বাণ সেই অবস্থা (condition)—যাহাতে ঐ স্বরূপে সমাপত্তি সুস্থিত, স্থায়ী ও অচ্যুত হয় (becomes fixed, established and permanent)। সেইজন্যই বুদ্ধদেব নির্ব্বাণকে 'অচ্যুত স্থান' বলিয়াছেন এবং যাজ্ঞবল্ক্য ইহাকে পরমা গতি ও পরম সম্পদ্‌ বলিয়াছেন।

তে যন্তি অচ্চুতং ঠানং যত্থ গন্ত্বা ন সোচরে—ক্রোধবর্গ ৫
এষাস্য পরমাগতিঃ এষাস্য পরমা সম্পৎ—বৃহ, ৪।৩।৩২

ছান্দোগ্য উপনিষদেও ঐ স্বরূপে সমাপত্তিকেই জীবের চরম লক্ষ্য (highest goal) বলা হইয়াছে—

এষ সম্প্রসাদঃ অস্মাৎ শরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিঃ উপসম্পদ্য স্বেন রূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে—ছান্দোগ্য, ৮।৩।৪

ঐ 'সম্প্রসন্ন' জীব এই শরীর হইতে উত্থিত হইয়া পরম জ্যোতিঃ উপসন্ন হইয়া স্ব-রূপে স্থিত হন।'

এই স্ব-রূপে স্থিত হওয়াই 'অস্তং গত' হওয়া—পরিনির্ব্বাণী ঐরূপ 'অস্তং গত'।

নির্ব্বাণ অমৃতত্ব-সিদ্ধি

বুদ্ধদেব আরও বলিলেন, যিনি পরিনির্ব্বাণী তিনি 'অমতং বিগয্‌য লদ্ধা মুধা নিব্বাণং' 'is submerged in the Deathless'.

এই যে অমৃতত্ব-সিদ্ধি, সমস্ত সাধনার ইহাই চরম লক্ষ্য। ঋগ্‌বেদে মানুষকে 'অমৃতের পুত্র' বলা হইয়াছে—শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ। মানুষ যখন অমৃতের পুত্র, তখন অমৃতত্ব (hunger for Immortality) তাহার নিত্য আকাঙ্ক্ষার বস্তু—অমৃতত্ব ভিন্ন অন্য কিছুতে তাহার স্বস্তি বোধ হয় না। তাহার চিরন্তন প্রার্থনা—মৃত্যোঃ মা অমৃতং গময় (বৃহ, ১।৩।২৮)। তাই ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ী মানবের প্রতিভূ হইয়া বলিয়াছিলেন—

যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাম্—বৃহ, ৪।৫।৪

অমৃতত্ব = Deathlessness, পুনর্মৃত্যু ও পুনর্জন্ম-বারণ, অজর অমর অক্ষর হইয়া অজিত অক্ষিত অমিতভাবে স্বরূপে স্থিতি। উপনিষদ্-যুগে বৈদিক ঋষিরা এই অমৃতত্ব-সিদ্ধির উপায় আবিষ্কারে সমস্ত প্রযত্নের প্রয়োগ করিয়াছিলেন এবং সাধন সমরে বিজয়ী হইয়া উদাত্ত স্বরে ঘোষণা করিয়াছিলেন—

তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়—শুক্ল যজুর্বেদ, ৩১।১৮
জ্ঞাত্বা তং মৃত্যুমত্যেতি নান্যঃ পন্থা বিমুক্তয়ে—কৈবল্য, ৯

মাভৈঃ, এতদিনে অমৃতের সন্ধান পাইয়াছি—আজ 'জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিত্ত ভাবনাহীন'—কে অমৃতত্বপিয়াসী, অগ্রসর হও!

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত—কঠ, ৩।১৪

বুঝিয়া লও—যে তদ্ বিদুঃ অমৃতাস্তে ভবন্তি (বৃহ, ৪।৪।১৪), ব্রহ্মসংস্থঃ অমৃতত্বমতি (ছান্দোগ্য, ২।২৩।১)।

যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদিশ্রিতাঃ।
অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবতি অত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে ॥—বৃহ, ৪।৪।৭

বুদ্ধদেবও অমৃতত্বের সেই প্রাচীন বার্ত্তা বহন করিয়া পরিনির্ব্বাণীর পরিচয় দিয়া আবার ঘোষণা করিলেন—

তে পতিপত্তা অমতং বিগয্য লদ্ধা মুধা নিব্বাণং ভুঞ্জমানা।

মোক্ষ 'নির্ব্বাণ' কেন ?

প্রশ্ন হইতে পারে, বুদ্ধদেব মোক্ষকে 'নির্ব্বাণ' বলিলেন কেন ? এ প্রশ্নের উত্তর আমরা তাঁহার নিজ মুখেই প্রাপ্ত হই।

সেয্যথাপি ভিক্খবে ! তেলং চ পটিচ্চ বট্টিং চ পটিচ্চ তেলপ্পদিপো ঝায়েয্য, তত্র পুরিসো ন কালেন কালং তেলং আসিঞ্চেয্য ন বট্টিং চ উপসংহরেয্য। এবং হি সো ভিক্খবে ! তেলপ্পদিপো পুরিমন চ উপাদানস্স পরিযাদানা অঞ্ঞস্সচ অনুপাহারো অনাহারো নিব্বায়েয্য। এবং এব খো ভিক্খবে ! সঞ্ঞোজনীয়েসু ধম্মেসু আদীনবানুগস্সিনো বিহরতো তন্হা নিরুজ্ঝতি, তন্হানিরোধা উপাদান নিরোধোপি। এবং এতস্স কেবলস্স দুক্খখন্ধস্স নিরোধো হোতি।*—সংযুক্ত-নিকায়।

* সেয্যথাপি ভিক্খু ! তেলং চ পটিচ্চ. বট্টিং চ পটিচ্চ তেলপ্পদীপো ঝায়তি, তস্স এব তেলস্স চ বট্টিয়া পরিযাদানা অঞ্ঞস্স চ অনুপহারা অনাহারো নিব্বায়তি—মজ্ঝিমনিকায়, ১৪০ সুত্ত।

বুদ্ধদেব অন্যত্র বলিয়াছেন—I teach the annihilation of craving, the annihilation of hatred, the annihilation of delusion,

সব্ব রাগদোসমোহনিহিতনিংনীতকসাবো—মজ্ঝিমনিকায়, III.

'The delivered one is entirely free from greed, hate and delusion.'

'Nibbana, Nibanna, so they say, friend Sariputta. Now what means Nibbana ? That which is the vanishing of desire, the vanishing of hate, the vanishing of delusion—that, friend, is called Nibbana'—সংযুক্তনিকায় IV. অর্থাৎ রাগ, দ্বেষ ও মোহ—ইহাদের নির্ব্বাণই নির্ব্বাণ—নির্ব্বাণ নাস্তিত্ব নহে। Nirvana is the dying out of the three fires of লোভ, দ্বেষ and মোহ—of desire, hatred and illusion.—What is Buddhism ? p 60.

অধ্যাপক রিস ডেভিডস্‌ও এ কথার সমর্থন করেন। This epithet is Nirvana, 'the going out', that is to say the going out in the heart of the three fires of lust, ill will and dullness.—Lectures on Buddhism. p. 151.

All that is extinguished is the flaring flame of thirst (তন্হা) to remain in contact with the world. (Grimm, p 339)

যিনি মুক্ত, যিনি নির্ব্বাণী, তিনি বুদ্ধদেবের কথায় প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতে পারেন—

অহু পুব্বে লোভো তদ্ অহু অকুসলং ; সো এতরহি নত্থি, ইচ্চে তং কুসলং। অহু পুব্বে দোসো তদ্ অহু অকুসলং ; সো এতরহি নত্থি, ইচ্চে তং কুসলং। অহু পুব্বে মোহো তদ্ অহু অকুসলং ; সো এতরহি নত্থি, ইচ্চে তং কুসলং—অঙ্গুত্তরনিকায়, I

'একদিন লোভ ছিল—উহা অকুশল (অভদ্র) ; এখন তাহা নাই; অতএব ভদ্রস্থ হইয়াছি। একদিন দ্বেষ ছিল—উহা অকুশল (অভদ্র) ; এখন তাহা নাই; অতএব ভদ্রস্থ হইয়াছি। একদিন মোহ ছিল—উহা অকুশল (অভদ্র) ; এখন তাহা নাই—অতএব ভদ্রস্থ হইয়াছি।'

'হে ভিক্ষুগণ! তৈল ও বর্ত্তি সংযোগে প্রজ্বলিত প্রদীপে যদি কেহ আর তৈল ও বর্ত্তি যোগ না করে তবে সেই প্রদীপ যেমন উপাদানের অভাবে নির্ব্বাপিত হয়, সেইরূপ যিনি সমস্ত সংযোজনের (fetters of existence) অস্থিরত্ব উপলব্ধি করিয়া অনাহারে বিহরণ করেন, তাঁহার তৃষ্ণা নিরুদ্ধ হয়, তৃষ্ণা-নিরোধে উপাদান নিরুদ্ধ হয় এবং দুঃখের নিদান পঞ্চস্কন্ধের নিরোধ হয়।'

অন্যত্র বুদ্ধদেব বলিয়াছেন—

Just as of the fire, which flames up under the strokes of the smith's hammer, it cannot be said as to whither it has gone after it is extinguished, so just as little can be discovered the abode of the truly-delivered Ones, who have crossed over the stream of the bounds of the senses, have reached the unshakeable bliss. *

এ প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব অন্যত্র বলিয়াছেন—

এবমেব খো মহারাজ! ভিক্খু যথা ইণং যথা রোগং যথা বন্ধনাগারং যথা দাসব্যং যথা কন্তরদ্ধানমগ্‌গ ইমে পঞ্চ নীবারণে অপ্‌পহীনে অত্তং সমনুপস্‌সতি, সেয়্‌যথাপি মহারাজ! যথা আনণ্যং যথা আরোগ্যং যথা বন্ধনামোক্খং যথা ভুজিনং যথা খেমন্ত-ভূমিং এবমেব খো মহারাজ! ইমে পঞ্চ নীবারণে পহীণে অত্তং সমনুপস্‌সতি—দীঘনিকায় II.

'Even thus, O King, as a debt, as an illness, as imprisonment, as thraldom, as a desert-journey, does the monk regard these five impediments, while as yet they are not banished within him. But like a cancelled debt, like recovery from illness, like release from prison, like being a freed man, like safe soil—even so does the monk regard the banishing of these five impediments from within him.'

ইহার সহিত ছান্দোগ্য-উপনিষদের নিম্নোক্তি তুলনীয়—

তস্মাৎ বা এতং সেতুং তীর্ত্বা অন্ধ সন্ অনন্ধো ভবতি, বিদ্ধ সন্ অবিদ্ধো ভবতি উপতাপী সন্ অনুপতাপী ভবতি—৮।৪।১-২

'যিনি এই সেতু উত্তীর্ণ হন, তিনি যেন অন্ধ ছিলেন চক্ষুষ্মান্ হন, ক্ষত ছিলেন অক্ষত হন, রোগী ছিলেন অরোগী হন।'

যে বুদ্ধদেব নির্ব্বাণকে অ-কৃত, অমৃত পদ এবং অচ্যুত স্থান বলিলেন,

* অভিজ্ঞ পাঠক এই উপমার মধ্যে ছান্দোগ্য উপনিষদের ৮।১২।২ মন্ত্রের প্রতিধ্বনি পাইবেন—অশরীরো বায়ুঃ অভ্রং বিদ্যুৎ স্তনয়িৎনুঃ অশরীরাণি এতানি। তদ্ যথা এতানি অমুষ্মাদ্ আকাশাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরূপসংপদ্য স্বেন রূপেণ অভিনিষ্পদ্যন্তে, এবমেবৈষ সংপ্রসাদঃ অস্মাৎ শরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরূপ-সংপদ্য স্বেন রূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে। (অভ্র=মেঘ, স্তনয়িৎনু=বজ্র)

যাঁহার মতে নির্ব্বাণ সুগতি, উত্তমার্থ (Summum Bonum, Supremest Good) অনুত্তর যোগক্ষেম, পরমার্থ-সার (Highest Reality)—যিনি নির্ব্বাণীর ভূমানন্দ (Blissful Tranquility and Stainless Bliss —মজ্ঝিমনিকায়) লক্ষ্য করিয়া মুক্ত পুরুষের বর্ণনায় বলিয়াছেন—

তে পত্তিপত্তা অমতং বিগয্য লদ্ধা মুধানিব্বাণং ভুঞ্জমানা—সুত্তনিপাত, ৫

In this realm of reality, as in the deathless (অমৃত)—the Delivered Ones are submerged.

— তাঁহাকে নাস্তিত্ববাদী বলার ভিত্তি আছে কি ? *

বুদ্ধদেবের শূন্যবাদ

শেষ কথা। বুদ্ধদেব কি ঈশ্বর মানিতেন ? যদি না মানিতেন তবে তাঁহাকে 'নাস্তিক' বলা অসঙ্গত নয়। বস্তুতঃ 'বুদ্ধদেব নিরীশ্বরবাদী ছিলেন' তাঁহার নাস্তিকতা-প্রসঙ্গে ইহাই চরম ও পরম অপবাদ। ঈশ্বর সম্বন্ধে বুদ্ধদেবের প্রকৃত মতামত (attitude) কি ছিল ?

আমরা দেখিয়াছি, বুদ্ধদেব এক অজাত অভূত অকৃত অসংখত (unborn, uncreate, unbecome, unevolved) নিত্য শাশ্বত সত্তার বিদ্যমানতা স্বীকার করিতেন—যে সত্তার অস্তিত্বের উপর এই জাত, ভূত, কৃত, সংখত বিশ্বের অস্তিত্ব (the springing out of what is born, has become, is created and evolved) নির্ভর করিতেছে।

অত্থি ভিক্‌খবে ! অজাতং অব্‌ভূতং অকতং অসংখতং। নো চে তং ভিক্‌খবে ! অভবিস্‌সং অজাতং অব্‌ভূতং অকতং অসংখতং, ন ইদ্‌ জাতস্‌স ভূতস্‌স কতস্‌স সংখতস্‌স নিস্‌সরণং পঞ্‌ঞায়েথ। যস্‌মা চ খো ভিক্‌খবে ! অত্থি অজাতং অব্‌ভূতং অকতং

---

* বৌদ্ধগ্রন্থে দেখা যায় নির্ব্বাণ সম্বন্ধে এই সকল বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে—'The unshakeable' 'the immoveable', 'eternal stillness', 'the true' 'the other shore', 'the subtle,' 'the invisible', 'the free from illness', 'the eternal'. 'the incognisible,' 'the peaceful', 'the deathless', 'the sublime', 'the joyful,' 'the secure,' 'the wonderful,' 'the free from affliction,' '*dhamma* free from oppresion', 'the free from suffering', 'the free from incitement' 'the pure', 'the free from wishes', 'the island' 'the refuge' 'the shelter'. —Grimm's Doctrine of the Buddha, p 519.

পটিসম্ভিদা-মগ্‌গের প্রথম খণ্ডে নির্ব্বাণের ১৪টি এবং ঐ গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে নির্ব্বাণের ৪০টি বিশেষণ আছে—নিত্য, ধ্রুব, ত্রাণ, শরণ, লয়ন, সুখ, পরমার্থসার, অভয়. অবিভব, অচল, অজাত, অজর, অমৃত, অশোক, অনিমিত্ত. অপরিণামধর্ম্মা ইত্যাদি। অন্যত্র নির্ব্বাণকে অচ্যুতস্থান (ধম্মপদ, ২২৫) অচ্যুতপদ (থেরি ৯৭) শান্তপদ (ধম্ম, ৩৬৮) বিরজ, (থের ২২৭) ও পরমসুখ (ধম্ম ১০৪, ২০৩) বলা হইয়াছে।

অসংখতং, তস্সা জাতস্স ভূতস্স কতস্স সংখতস্স নিস্সরণং পঞ্ঞায়েতি ভি—উদান, ৮।১

এই বিশ্বাতিগ সত্তার পরিচয় দিতে গিয়া বুদ্ধদেব বলিয়াছেন, ঐ সত্তা অজ্ঞেয়, অমেয়, অবাচ্য, অনির্দ্দেশ্য। কেন? যে হেতু ঐ সত্তা ক্ষিতি নয়, অপ্‌ নয়, তেজঃ নয়, মরুৎ নয়, ব্যোম নয়, বিজ্ঞান নয়,—ঐ সত্তা সৎ নয়, অসৎ নয়, কিঞ্চন নয়, অকিঞ্চন নয়, ইহলোক নয়, পরলোক নয়—চন্দ্র সূর্য্য কোন কিছু নয়। যে হেতু ঐ সত্তার গতি নাই আগতি নাই, স্থিতি নাই চ্যুতি নাই, উৎপত্তি নাই, বিনাশ নাই। ঐ সত্তা অপ্রবৃত্ত, অনাধার, অনারম্ভ—উহাই দুঃখস্য অন্তঃ।

অত্থি ভিক্‌খবে! তদ্‌ আয়তনং যত্থ ন য়েব পঠিবী, ন আপো, ন তেজো, ন বায়ো, ন আকাশানং আয়তনং, ন বিঞ্ঞানানং আয়তনং, ন অকিঞ্চন্নায়তনং, ন নেব সন্না নাসন্নায়তনং, নায়ং লোকো ন পরলোকো উভো চন্দিমা সুরিয়ো। তদ্‌ অহং ভিক্‌খবে! ন এব আগতিং বেদামি ন গতিং ন থিতিং ন চুতিং ন উপপাতিং। অপ্‌পতিট্‌ঠং অপ্‌পবত্তং অনারম্ভনং এব তং। এস এব অন্তো দুক্‌খস্সেতি—উদান ৮।৩

এই অদ্ভুত, আজব, অনিমিত্ত, অলৌকিক সত্তাকে বুদ্ধদেব 'শূন্য' বলিয়াছেন:

সুঞ্ঞতো অনিমিত্তো চ বিমোক্‌খো যস্স গোচরো—ধম্মপদ।

বুদ্ধদেব শিষ্য সুভূতিকে বলিয়াছিলেন—'গম্ভীরম্‌' ইতি সুভূতে! শূন্যতায়া এতদ্‌ অধিবচনম্‌—শূন্যতার নাম 'গম্ভীর'—শূন্যতায়া এতদ্‌ অধিবচনং যদ্‌ অপ্রমেয়মিতি—শূন্যতার নাম 'অপ্রমেয়'—অর্থাৎ শূন্য সেই পদার্থ, যাহা গম্ভীর, দুরবগাহ, অগাধ, অমেয়, অজ্ঞেয়, অবাচ্য, অতর্ক্য, অনির্ব্বচনীয়—উপনিষদের ভাষায়, যাহার 'লাগ' না পাইয়া বাক্যমন হটিয়া আসে—

যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ তৈত্তি, ২।৪

Measure not with words
The Immeasurable × ×
Who asks doth err,
Who answers errs, say naught,—Light of Asia.

ইহা উপনিষদের সেই প্রাচীন কথা—শ্রীশঙ্করাচার্য্য যাহার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন—বাস্কলিনা চ বাধ্বঃ পৃষ্টঃ সন্‌ অবচনেনৈব ব্রহ্ম প্রোবাচ। কারণ, তিনি 'অশব্দ'—অশব্দে নিধনম্‌ এতি (মৈত্রায়ণী, ৬।২২)। কেন

অশব্দ ? যেহেতু তিনি অগ্রাহ্যম্ অলক্ষণং অচিন্ত্যম্ অব্যপদেশ্যম্ (মাণ্ডূক্য, ৭)। সেই জন্য শূন্যতাসিদ্ধ পরিনির্ব্বাণীর বর্ণনায় বুদ্ধদেব বলিয়াছেন—তথাগতো গম্ভীরো অপ্পমেয়ো দুপ্পরিয়োগোহো সেয্যথাপি মহাসমুদ্দো—He is indefinable, inscrutable, immeasurable like the great ocean—তিনি গম্ভীর অপ্রমেয় দুষ্প্রাতিগ্রহ—যেমন মহাসমুদ্র।

তবে কি বুদ্ধদেবের শূন্য Nihilum—নাস্তি ? কখনই নয়। * তাঁহার নিজ মুখের কথা এই—'যে চ সুভূতে ! শূন্যা, অক্ষয়া অপি তে'—'হে সুভূতি ! শূন্য ও অক্ষয় একই বস্তু'। অক্ষয় কি ? যাহার ক্ষয় নাই ব্যয় নাই অপচয় নাই উপচয় নাই—যাহা অজর অমর অক্ষর—যাহা 'অজাতং অব্ভূতং অকতং অসংখতং'।

শূন্য ও ব্রহ্ম

এক কথায় শূন্য উপনিষদের নেতি নেতি ব্রহ্ম—অথাত আদেশঃ নেতি নেতি (বৃহ, ২।৩।৬)—তিনি সৎও নহেন, অসৎও নহেন—সদসদ্ভ্যাম্ অনির্ব্বাচ্যং—ন সৎ নচাসৎ (শ্বেত, ৪।১৮)। যিনি লক্ষণের অতীত, মননের অতীত, বচনের অতীত—অন্যত্র ধর্ম্মাৎ অন্যত্রাধর্ম্মাৎ, অন্যত্রাস্মাৎ কৃতাকৃতাৎ (কঠ, ২।১৪ 'ধর্ম্ম হইতে ভিন্ন, অধর্ম্ম হইতে অন্য ; কৃত হইতে ব্যতিরিক্ত, অকৃত হইতে বিভিন্ন'—এক কথায় 'সর্ব্বকার্য্যধর্ম্ম-বিলক্ষণ' (শঙ্কর)—তিনি 'শূন্য' বই আর কি ? স এষ নেতি নেতি আত্মা—বৃহ, ৪।২।৪

সেইজন্য যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহার পরিচয়ে বলিয়াছেন—

অস্থূলম্ অনণু অহ্রস্বম্ অদীর্ঘম্ অলোহিতম্ অস্নেহম্ অচ্ছায়ম্ অতমঃ অবায়ু অনাকাশম্ অসঙ্গম্ অরসম্ অগন্ধম্ অচক্ষুষ্কম্ অশ্রোত্রম্ অবাক্ অমনঃ অতেজস্কম্ অপ্রাণম্ অমুখম্ অনন্তরম্ অবাহ্যম্—বৃহ, ৩।৮।৮

* এ প্রসঙ্গে বৌদ্ধবিদ্যাবিশারদ মহামহোপাধ্যায় ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণের উক্তি প্রণিধানযোগ্য। 'শূন্য প্রত্যক্ষ হইলে যুষ্মদ্ ও অস্মদের ভেদ তিরোহিত হইবে, সুখ ও দুঃখ উভয়ই বিলয় প্রাপ্ত হইবে, হ্রস্ব ও দীর্ঘ অভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। এখানে অস্তিও নাই, নাস্তিও নাই। এখানে উৎপত্তি ও বিনাশ, ক্ষণিকত্ব ও নিত্যত্ব, একত্ব ও নানাত্ব, আগমন ও নির্গমন—এই সকল আপাতবিরুদ্ধ ধর্ম্ম পরস্পরবিরোধ ত্যাগ করিয়া অবস্থিত আছে। এখানে ভাব ও অভাবের সমন্বয় * * * এই পদার্থটি (শূন্য) বাস্তবিকপক্ষে অবাচ্য, অনিদর্শন, অপ্রতিষ্ঠ, অনাভাস, অনিকেত ও অবিজ্ঞপ্তিক। বুদ্ধদেব এই পদার্থের বর্ণনা করিতে অসমর্থ হইয়া বলিয়াছেন—অনক্ষরস্য ধর্ম্মস্য শ্রুতিঃ কা দেশনা চ কা ? আর বেদ যে পদার্থের সম্বন্ধে বলিয়াছেন—যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ—সেই পদার্থ শূন্য ভিন্ন আর কিছুই নহে।'—শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু সম্পাদিত ধর্ম্মপদের দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা।

'তিনি স্থূল নহেন, সূক্ষ্ম নহেন, হ্রস্ব নহেন, দীর্ঘ নহেন; তিনি লোহিত নহেন, স্নেহ নহেন, ছায়া নহেন, তমঃ নহেন, বায়ু নহেন, আকাশ নহেন; তিনি রস নহেন, শব্দ নহেন, গন্ধ নহেন, চক্ষুঃ নহেন, শ্রোত্র নহেন, সঙ্গ নহেন, বাক্য নহেন, মনঃ নহেন, তেজঃ নহেন, প্রাণ নহেন, মুখ নহেন, মাত্রা নহেন, অন্তর নহেন, বাহির নহেন।'

সার কথা এই, সবিশেষ দৃষ্টিতে দেখিলে যিনি পূর্ণ (Plenum)— পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদম্,—নির্ব্বিশেষ দৃষ্টিতে তিনি শূন্য, মহাশূন্য (Vacuum)। সেই জন্য শ্রীশঙ্করাচার্য্যের নামে প্রচলিত 'সর্ব্ব-বেদান্ত-সংগ্রহে' উক্ত হইয়াছে—যৎ শূন্যবাদিনাং শূন্যং ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদাং চ যৎ। অতএব বেদান্তের নিগদিত যিনি ব্রহ্ম, বুদ্ধদেবের পরিভাষায় তিনিই শূন্য। শূন্য শব্দ দ্বারা যখন ব্রহ্মই তাঁহার লক্ষ্য, তখন তাঁহার সম্বন্ধে 'নাস্তিক' শব্দের প্রয়োগ একবারেই অযুক্ত।

বুদ্ধদেবের ঈশ্বরবাদ

আর এক কথা। 'ব্রহ্মজাল' সূত্রের প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, বুদ্ধদেব সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বর মানিতেন। ঐ ঈশ্বরের স্বরূপ কি? 'তিনি ব্রহ্মা, মহাব্রহ্মা, অভিভূ, অনভিভূত, সব্বদস্সী (সর্ব্বদর্শী), বসবত্তি (বশবর্ত্তী), ইস্সর (ঈশ্বর), কত্তা (কর্ত্তা), নির্ম্মাতা, সেঠ্ঠ (শ্রেষ্ঠ), সঞ্জিতা (বিধাতা ?), বসী (বশী) (বশী সর্ব্বস্য লোকস্য স্থাবরস্য চরস্য চ—উপনিষদ্) এবং পিতা ভূতভব্যানাম্'।* প্রাচীন বৈদিক সাহিত্যে যাঁহাকে 'হিরণ্যগর্ভ' বলা হইয়াছে, বেদান্তে যাঁহাকে 'জন্য ঈশ্বর' বলা হয়, যিনি মহাপ্রলয়ে তুরীয় ব্রহ্ম কর্ত্তৃক গ্রসিত হন—ঈশ্বরগ্রাসাৎ তুরীয়স্তুরীয় (নৃসিংহতাপনী)— বুদ্ধদেবের ঈশ্বর-বর্ণনা অনেকটা তাহার অনুরূপ। এই প্রসঙ্গে অভিজ্ঞ পাঠকের ঋগ্‌বেদের ঋষির উদাত্ত সূক্ত স্মরণে আসিবে—

হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে
　　ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ।
স দাধার পৃথিবীম্ উত দ্যাং
　　কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম॥

* প্রবাসীতে শ্রীমহেশচন্দ্র ঘোষ

বৈদান্তিক বলেন, ঐ ঈশ্বর মায়া-নাম্নী কাম-ধেনুর বৎস—মায়াখ্যায়াঃ কামধেনোর্বৎসৌ জীবেশ্বরাবুভৌ—উনিও জীবের ন্যায় উপাধি-কল্পিত। *

ঈশ্বরত্বস্তু জীবত্বম্ উপাধিদ্বয়কল্পিতম্—পঞ্চদশী

সেই জন্যই বুদ্ধদেব বলিয়াছেন, মহাব্রহ্মাও অশাশ্বতকে শাশ্বত মনে করেন।

সাংখ্যসূত্রকার 'প্রমাণাভাবে নিত্য ঈশ্বর অসিদ্ধ—ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ (১৷৯২)' বলিয়া আরম্ভ করিয়া অবশেষে যে সর্ব্ববিৎ সর্ব্বকর্ত্তা 'জন্য' ঈশ্বর স্বীকার করিয়াছেন—স হি সর্ব্ববিৎ সর্ব্বকর্ত্তা, ঈদৃশেশ্বর-সিদ্ধিঃ সিদ্ধা (৩৷৫৬-৭ সূত্র)—যিনি পূর্ব্বকল্পের 'প্রকৃতি-লীন' পুরুষ, বর্ত্তমান কল্পে সর্ব্ববিৎ সর্ব্বকর্ত্তা আদি-পুরুষরূপে আবির্ভূত হন—সে ঈশ্বর বুদ্ধদেবের উপদিষ্ট ঈশ্বরের অনুরূপ। এ ঈশ্বর 'জন্য' ঈশ্বর—ইনি কল্পান্তে মহাপ্রলয়ের সময় প্রকৃতিলীন হন—আবার কল্পারম্ভে সৃষ্টির সময় সমুদিত হন—কিন্তু যিনি বেদান্তের নির্গুণ ব্রহ্ম—বুদ্ধদেবের 'শূন্য'—তিনি 'জন্য' নন, তাঁহার উদয় ব্যয় নাই—তিনি নিত্য সত্য সনাতন।

নোদেতি নাস্তমায়াতি সংবিদ্ এষা স্বয়ংপ্রভা—পঞ্চদশী

যে চ সুভূতে! শূন্যা অ-ক্ষয়া অপি তে।

উপসংহার

এখন বোধ হয় সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, বুদ্ধদেবের নামে নাস্তিকতার যে সমস্ত অপবাদ প্রচলিত আছে, তাহা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর, তাহার কোন দৃঢ় ভিত্তি নাই—তাহা একেবারেই অমূলক। আমরা আদর্শ-নাস্তিক চার্ব্বাকের মতবাদ আলোচনা উপলক্ষ্যে দেখিয়াছিলাম, চার্ব্বাক একাধারে জড়বাদী, উচ্ছেদবাদী, দৃষ্টবাদী (Positivist), সংশয়বাদী, হেতু-বাদী, প্রেয়ঃবাদী (Hedonist), দেহবাদী, অনাত্মবাদী এবং ইহসর্ব্বস্ববাদী। চার্ব্বাকের বৈনাশিক দৃষ্টিতে পাপপুণ্য নাই, ধর্ম্মাধর্ম্ম নাই, স্বর্গ নরক নাই, পরলোক নাই, পুনর্জ্জন্ম নাই, ঋষি নাই, দেবতা নাই, ঈশ্বর নাই, মোক্ষ-

* The Lord as creator, as Lord or Iswara, depends upon the limiting conditions or the *upadhis* of name and form and these, even in the Lord, are represented as products of Nescience (মায়া).—Max Muller's Indian Philosophy, p 207.

নির্ব্বাণ নাই। বুদ্ধদেবের মতের বিস্তৃত আলোচনা দ্বারা আমরা অবগত হইয়াছি, তাঁহার অভিমত প্রত্যেক বিষয়ে চার্ব্বাক মতের বিপরীত। অতএব চার্ব্বাক যদি আদর্শ নাস্তিক হয়, তবে বুদ্ধদেব আদর্শ আস্তিক। তাঁহার দেশনাকে লক্ষ্য করিয়া একজন অভিজ্ঞ পাশ্চাত্য লেখক বলিয়াছেন—It is the statement of the Norm of all Existence। ইহাই তথাগত বুদ্ধদেবের উপদিষ্ট 'ধর্ম্ম'। This Doctrine is penetrated by one taste—the taste of salvation (Majjhima Nikaya, I, p. 140)। সেই জন্য বৌদ্ধেরা তাঁহাকে 'The Exalted One, the Accomplished One, the Supremely Awakened One'—এক কথায় 'the Greatest among gods and men' বলেন—

যস্স জিতং নাবজীয়তি, জিতমস্স নো যাতি কোচি লোকে—ধম্মপদ, বুদ্ধবগ্গ।

সেই 'ধর্ম্মারাম', 'ধর্ম্মরত', নির্বৃত, কৃতকৃত্য, নিষ্প্রপঞ্চ, তীর্ণশোক, অকুতোভয়, সম্যক্-সম্বুদ্ধ বুদ্ধদেবকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করিয়া এই আলোচনার উপসংহার করি।

নমো নমোস্তু তে সহস্রকৃত্বঃ
পুনশ্চ ভূয়োপি নমো নমস্তে।
নমো তস্স ভগবতো অরহতো সম্মা সম্বুদ্ধস্স × × বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি,
দুতিয়ম্পি বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি—ততিয়ম্পি বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি॥

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত
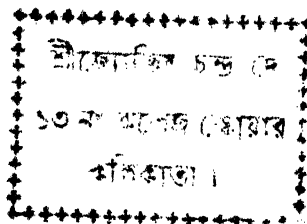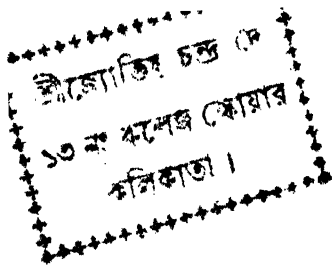
পুরানো কথা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

এবার আমাকে একটু অপ্রিয় প্রসঙ্গ নিয়ে গল্প আরম্ভ করতে হচ্ছে। তরুণ বয়সে আমার অপ্রিয় সত্য বলার বাতিক ছিল কি না, তা এখন মনে নেই। তবে, আজকাল মোটের উপর মন-জোগান মিষ্ট কথাই বলে থাকি—তা সত্যই হোক, বা অসত্যই হোক। আর, এই যে পুরানো কথা লিখছি, এও ত সেরেফ পাঠকের মনোরঞ্জনের জন্য। এর ভেতর নজীর-প্রমাণাদি আদালৎ-সুলভ পদার্থ কতটুকুই বা আছে! তবু, সত্যটাকে একেবারে ছেঁটে ফেলে দেওয়াও ত চলে না! তাই এই কৈফিয়তের অবতারণা।

আমাদের ভারতখণ্ডে একদিন দুই জাতি ছিল—শ্বেতকায় আর্য্য ও কৃষ্ণকায় অনার্য্য। আজও ভারতবাসীকে মোটামুটি এই দুই ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে। এই যে বর্ণসমস্যা, এ নানা অনর্থের মূল! প্রাচীন-কালে অনেক অনর্থ ঘটিয়েছে, আজও ঘটাচ্ছে। কতদিনে এ সমস্যার সমাধান হবে, কে জানে! তবে, একদিকে যেমন কৃষ্ণভক্ত গোরা দু-দশটা দেখা দিয়েছে, অন্যদিকে তেমনই গৌরভক্ত কৃষ্ণেরও অভাব নেই। আমার আশা যে, একদিন এই দুই দল ভক্তের দ্বারাই এই অভাগা দেশের উদ্ধার-সাধন ঘটবে।

কিন্তু ইতিমধ্যে বর্ণবিপর্য্যয়ের দরুণ মানুষকে অনেক রকম গোলযোগে পড়তে হচ্ছে। উপায় নেই। আমাকেও আর পাঁচজনের মতন একটু আধটু অসুবিধা পোহাতে হয়েছে বই কি! সেগুলো সব সাশ্রুনয়নে বর্ণনা করে কোন লাভ নেই। তবে দুচারটে না বললেও নয়। কেন না, সংসারে পাঁচটা জিনিস দেখতে দেখতেই ত মানুষের চোখ খোলে! অবশ্য যারা চিরদিন নবজাত খোকাটির মতন একান্ত নির্ভরশীল স্তন্যপায়ী জীব হয়ে থাকতে চায়, তাদের কথা স্বতন্ত্র।

আমাদের কালে বিলেতে এক সমিতি স্থাপিত হয়েছিল—তার নাম N. I. A.। মিস্ মেনিং বলে এক ভালমানুষ মেমসাহেব এই সমিতির অধিনেত্রী ছিলেন। আর, ভারত-ফেরত ইংরেজ, ও বিলেত-প্রবাসী ভারতীয়, অনেকগুলি ছিলেন এর পাণ্ডা। এঁরা মাঝে মাঝে Soire'e বা সান্ধ্য চায়ের বৈঠক বসিয়ে আমাদের ছাত্রমণ্ডলীকে নিমন্ত্রণ করতেন। কু-লোকে আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছিল যে এই বৈঠকে বড় বড় সাহেব-মেমেরা এসে খুব জোরে জোরে ছাত্র বেচারাদের পিঠ চাপড়ান। আমি তাই ভয়ে ঐ সমিতির কাছে ঘেঁষি নেই। পিঠে হাত বুলান অনেক বরদাস্ত করেছি বটে, কিন্তু পিঠ চাপড়ান জিনিসটাকে চিরদিনই বড় ডরাই। তারপর দেখুন, গেছি বিলেত দেশে, সাহেব মেম দেখার ত আর কসুর ছিল না! সে জন্য মিস্ মেনিং-এর আঁচল কেন ধরব বলুন!

এ ত গেল বিলেতের কথা। কিন্তু আহমদাবাদে চাকরী করতে এসে দেখি, এখানেও কমিশনার-গিন্নী এক N. I. A. খাড়া করেছেন। প্রমাদ গণলাম। বিলেতে স্বাধীন ছিলাম, যা খুশী করেছি। কিন্তু এখানে মাইনে-খোর চাকর বই ত নয়! কি করা যায়? কাকেই বা জিজ্ঞাসাবাদ করি? আপন মনে অনেক গবেষণা করে সিদ্ধান্ত করলাম যে, সরকার বাহাদুর ও কমিশনার সাহেব দুটো আলাদা পদার্থ—আমি মাইনে খাই সরকারের, কমিশনারের ত নয়—দরকার পড়ে ত সাহেবকে এই প্রভেদটা বুঝিয়ে দেব। কিন্তু আমার সাহেবের মেজাজ যে রুশিয়ার জারেরও বাড়া, তা তখন ভুলে গেছি। ফলও ভুগতে হল।

প্রথম বছরখানেক বছর দেড়েক বেশ কেটে গেল। দুর্ভিক্ষের হাড়ভাঙ্গা খাটুনির মাঝে কারোই এসব ছোট জিনিসের দিকে নজর দেবার সময় ছিল না। কিন্তু তার পরে, একদিন হঠাৎ এক পত্র পেলাম N. I. A-এর মুনশী মহাশয়ের কাছ থেকে। পত্রের মজকুর—It is expected that the following gentlemen have sympathy with the objects of this Association. They should send in their subscriptions to the Secretary before the end of the month—আমাদের ধারণা যে N. I. A-এর উদ্দেশ্যের

সহিত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের সহানুভূতি আছে, তাঁহারা যেন এই মাসের মধ্যেই অনুগ্রহপূর্ব্বক তাঁহাদের দেয় চাঁদা মুনশী সাহেবের নিকট পাঠাইয়া দেন। নীচে সহি খুদ কমিশনার সাহেবের। নামগুলির মধ্যে প্রথম নামই আমার। পরোয়ানা ত এসে হাজির! এখন কর্ত্তব্য কি? উপায় নেই, সাহেবকে বোঝাতে হবে যে তিনি ও সরকার বাহাদুর দুটো পৃথক্ পদার্থ। মুনশী মহাশয় গুরুজন স্থানীয় বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, আমাকে স্নেহ করতেন। কিন্তু তিনি আমার দুঃখ বুঝবেন না। তাঁকে পত্র লিখতে হল—মহাশয়, আমার কোন সহানুভূতি নাই আপনাদের উদ্দেশ্য বা কার্য্যকলাপের সহিত। আমাকে ক্ষমা করিবেন।

এ পত্র না লিখলেই হ'ত ভাল। কিন্তু পাঁচ রকম কারণে আমার সে সময়ে বৈতসী বৃত্তি অবলম্বন সম্ভবপর ছিল না। সব কথা ত লিখতে পারি না। তবে কারণটা ওরই মধ্যে একটু পরিষ্কার করে বলি।

একবার বড় মেমসাহেবের নিতান্ত ধরাধরিতে আমাদের বাড়ীর এঁরা সমিতির এক পার্টিতে গেছলেন। মেমসাহেব এঁদিকে আদর যত্ন যথেষ্ট করেছিলেন। কৌচে নিজের পাশে নিয়ে প্রায় সারাক্ষণ বসেছিলেন। কিন্তু তাঁর এই সৌজন্যে কোন ফল হয় নেই। কেন না, এঁরা সেখানে বৈঠকের মোটামুটি যা ব্যবস্থা দেখে এলেন, তাতে ভবিষ্যতে আর এঁদের কোন N. I. A-এর পার্টিতে যাবার আদবে সম্ভাবনা রইল না। আমি যে বর্ণনা শুনলাম, তা কতকটা এই রকম—শাহীবাগের বড় হল-ঘরের একটা দিকে মেমসাহেবরা, অন্য দিকটায় দেশী মহিলারা, পরস্পর মুখোমুখি করে বসে আছেন। তাঁদের মধ্যে কোন কথাবার্ত্তা, গল্পগুজব, চলছে না। সকলেই নীরব, সকলেই আড়ষ্ট। বড় মেম এক একবার যেই নেটীব লাইনের কাছে যাচ্ছেন, কি অমনই আট দশ জন মহিলা একসঙ্গে লাফিয়ে উঠে তাঁর সংবর্দ্ধনা করছেন। এঁরা এই সব কাণ্ড দেখে সেখানে মিনিট পনের কুড়ির বেশী টিকতে পারেন নেই।

আর এক ব্যাপার ঘটেছিল, সেটাও বলি। পল্টনের দুই একজন ছোকরা অফিসারের সঙ্গে আমার বেশ ভাব ছিল। মাঝে মাঝে তাদের

সঙ্গে ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে বেরোতাম, শিকারেও এক আধবার গেছলাম। একদিন এদের একজন—বেশ ছেলেটি, এখন নাম ভুলে গেছি—আমাকে জিজ্ঞাসা করলে, "I say does your Memsaheb go to Mrs. L's Native Ladies' shows too?—ওহে, তোমার মেমসাহেবও কি L-গিন্নীর নেটীব মহিলা প্রদর্শনীতে যান?"

আমি না বলাতে ছোকরা মহাখুশী হয়ে বললে, "That's right, my dear fellow"। N. I. A-এর ইংরেজ মহলে প্রচলিত নামটা শুনে আমার মনে অনেকটা সমাধান বোধ হল। ভাগ্যিস্, ঐ সমিতিতে আমাদের যাওয়া আসা নেই! থাকলে এই সরল প্রকৃতি ভদ্রলোকের ছেলে বন্ধুটিকে কি বলতাম? সে যে আমাকেও তার নিজের মতই ভদ্রলোক মনে করত!

যাক, আমি সেক্রেটারী সাহেবকে তাঁর পত্রের উত্তর দেওয়ার পরদিন কমিশনার বাহাদুরের এক চিঠি পেলাম, "যত শীঘ্র সম্ভব, আমার সহিত দেখা করিবে। জরুরী কাজ।"

যথা সময় হুজুরে হাজির হলাম। সাহেব মুখ গম্ভীর করে বললেন, "তোমার চিঠি পড়ে আমরা (বোধ হয়, গৌরবে বহুবচন!) বড় দুঃখিত হয়েছি। N. I. A-এর উদ্দেশ্য তোমার অনুমত নয়, এ কথার মানে কি? ইংরেজ ও নেটীবের মধ্যে সদ্ভাব থাকে এ তোমার ইচ্ছা নয়।"

আমি সবিনয়ে উত্তর দিলাম, "আজ্ঞে, সদ্ভাব থাকাতে আমার কোন আপত্তি ত হতে পারে না। তবে উভয় পক্ষের সম্মান যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে ব্যবস্থাটা এই রকম হওয়া উচিত।"

"তুমি কি বলতে চাও যে, আমি আমার অতিথিদের সম্মান রাখতে জানি না!"

"আমি জাতীয় সম্মানের কথা বলছি, মহাশয়, ব্যক্তিগত ইজ্জতের কথা নয়।"

এই রকম ভাবে কিছুক্ষণ কথা কাটাকাটি হওয়ার পর আমি আমার বন্ধু সেই লেফটেনাণ্টটি যা বলেছিল, সেই কথা সাহেবকে জানালাম। তিনি খুব জোরে হেসে উঠলেন, "ওঃ পলটনের অফিসার! তুমি কি ওদের কথা

গ্রাহ্য কর না কি? ওরা ত এদেশে চৌকীদারী করতে আসে। রাজ্য চালাই তুমি আমি।"

আমি রাজ্য চালাই, এ কথা শুনেও খুশী হতে পারলাম না। "রথ ভাবে আমি দেব, পথ ভাবে আমি, মূর্ত্তি ভাবে আমি দেব, হাসে অন্তর্য্যামী।"

তারপর, N. I. A-এর পার্টির যে বর্ণনা আমি শুনেছিলাম তাও সাহেবের কাছে নিবেদন করলাম, অবশ্য সটীক বর্ণনা। সাহেব একটুক্ষণ গম্ভীর হয়ে থেকে হঠাৎ আমাকে ভয় দেখালেন এই বলে, "তুমি জান, লেডী N, তোমার এই সব কথা শুনলে অত্যন্ত বিরক্ত হবেন!"

কেউ ভয় দেখালে আমার বুদ্ধিটা যেন চট্ করে খুলে যায়। খুব বিনয় করে সাহেবকে বললাম, "এত কথায় কাজ কি মশায়। আমি যা যা বলেছি সেজন্য মাপ চাইছি। আমি সামান্য কর্ম্মচারী, আপনি আমার কমিশনার। একখানা হুকুম লিখে দেন, আমি কালই N. I. A-এর চাঁদার টাকা পাঠিয়ে দেব।"

আমার উত্তর শুনে কর্ত্তা আরও চটে গেলেন। বললেন, "তুমি কি আমার সঙ্গে ঠাট্টা-তামাসা করছ? এ সব বিষয়ে কি সরকারী হুকুম দেওয়া যায়!"

আমাকে একটু ন্যাকা সাজতে হল। উত্তর দিলাম, "আপনি লাট-মেম সাহেবের নাম করলেন বলেই হুকুমের কথা আমার মনে হল। মাপ করবেন। আমাকে অনুমতি দেন ত আমি এখন উঠি। কাছারীর বেলা হয়ে এল।"

L-সাহেব নির্ব্বিকার মুখে বললেন, "হাঁ, উঠতে পার। আর, দেখ, তোমার মহকুমায় যে যে জায়গায় নলকূপ বসান হচ্ছে, সে জায়গাগুলো সব একবার ঘুরে দেখে এস। কালই বেরিয়ে পড়। আমি তোমার কলেক্টরকে বলব। এই বৃষ্টিতে তাঁবুতে থাকতে একটু কষ্ট হবে, তার আর উপায় কি?"

আমি "যে আজ্ঞে" বলে উঠে পড়লাম। নমস্কার করে বেরিয়ে যাচ্ছি, এমন সময়ে কর্ত্তা আবার ডাক দিলেন। অমায়িক হাসি হেসে বললেন, "দেখ, Dutt! যদি আসছে হপ্তায় N. I. A-এর পার্টিতে

উপস্থিত থাকতে চাও, তাহলে না হয় এখনই মফস্বল গিয়ে কাজ নেই। দু-চার হপ্তা বাদে যেও।"

আমি এক লহমা ইতস্ততঃ করলাম। যাঁরা বর্ষায় তাঁবুতে ঘুরেছেন, তাঁরাই বুঝবেন, কেন। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে উত্তর দিলাম, "না, স্যার দেরী করে কাজ নেই। আপনার অনুমতি হয় কালই বেরিয়ে যাই। নলকূপগুলো নিজের চোখে দেখে আসি।"

পাঠককে বোঝাতে পারলাম কিনা জানি না, যে এই কথা কাটাকাটির মধ্যে কোন পক্ষেই ভদ্রতার বা সৌজন্যের এতটুকু ত্রুটী হয় নেই। ভদ্রলোকে ভদ্রলোকে দ্বন্দ্বযুদ্ধের কোন নিয়মই সাহেব ভাঙ্গেন নেই। আমিও সমস্ত সময়টা প্রায় জোড় হাত করেছিলাম। তথাপি মাসখানেক পরে বদলীর হুকুম পেলাম। বোম্বাই এলাকার একেবারে দক্ষিণের এক জেলায়! যাবার আগে কমিশনার সাহেবকে বিদায় নমস্কার করতে গেলাম। তিনি আমার মতন একজন চটপটে বুদ্ধিমান্ কর্ম্মচারীকে হারাচ্ছেন বলে অনেক দুঃখপ্রকাশ করলেন। আমিও দুই-এক ফোঁটা অশ্রুজল ফেলে থাকব, মনে নেই। তবে একটা কথা এখানে বলা দরকার। আমার ঠিক সেই সময়ে অত দূরে যাওয়ার নানারকম সাংসারিক অসুবিধা ছিল। কর্ত্তা সে সব কথাই জানতেন, ঠিক পাশের জেলায় একটা জায়গা খালী ছিল, সেটা আমাকে দিতে পারতেন। তা না করে, সেখানে পাঠালেন একজন অবিবাহিত ইংরেজ ছোকরাকে, আর আমাকে ঠেলে দিলেন চব্বিশ ঘণ্টার রেলের পথ। একেই বলে কার্য্যকারণপরম্পরা। তবে হিঁদুর ছেলে, ভুলি নেই যে "কর্ম্মণ্যে বাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।"

আমার প্রথম কমিশনার সাহেবকে কোন রকমে খাটো করতে আমি চাই না। তিনি উঁচুদরের কাজের লোক ছিলেন। তাঁর চরিত্র ছিল উদার, আমির জনোচিত। তবে ভদ্রলোক একেবারে সেকেলে হাকীম ছিলেন। পাঠক, হাসবেন না, আমি এখন বৃদ্ধ হলেও তখন অতিমাত্রায় একেলে ছিলাম। অল্পবিস্তর সংঘর্ষ অনিবার্য্য। তবে সে সংঘর্ষ মানুষে মানুষে নয়, সেকালে ও একালে। আর হয় ত দুটো জাতের দুরকমের complex-এর মধ্যে। আহমদাবাদের সবাই এই লীলী সাহেবের কথায়

উঠতেন বসতেন। সাহেব হয় ত আমাকে তাঁর রাজ্যে misfit বেখাপ্পা মনো করলেন।

সেকালের আহমদাবাদ এক আজব শহর ছিল। চারিদিকে কেবল এক খেয়াল—টাকা, টাকা, টাকা! রাষ্ট্রনীতি বলে যে পদার্থটা সারা ভারতকে চঞ্চল করে তুলেছিল, এখানে তার কোন বালাই ছিল না। সমাজের মাথার মণি যে শেঠিয়ারা, Mill-owners, তাঁরাও ছিলেন (শেঠ লালভাইয়ের ভাষায়) "সরকার বাহাদুরের টাকার থলী। মেহেরবান কমিশনার সাহেব মরজী মত হাত ঢোকাচ্ছেন, আর টাকা বের করছেন।" এ হেন স্থানে এসে মানবচরিত্রের বিশেষ একটা দিক দেখবার আমার খুব সুযোগ হল। আমাদের হিন্দুসমাজকে মোটামুটি বোধ হয়, চার ভাগ করা যায়—দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণ-প্রধান, আর্য্যাবর্ত্ত ক্ষত্রিয়-প্রধান, বঙ্গদেশ শূদ্র-প্রধান, আর গুজরাত বৈশ্য-প্রধান। বৈশ্যধর্ম্মকে কুবের-পূজা বললে, আশা করি, কেউ রাগ করবেন না। আজ আমার বাঙ্গলা দেশকে এই ধর্ম্মে দীক্ষিত করবার এত আয়োজন হচ্ছে বলে ভয় হয়।

যাক্‌গে আমি সেকালের কথাই বলি। সবে আহমদাবাদে এসেছি, খুদে হাকীম হয়ে। আমার বাঙ্গলার সুমুখেই থাকতেন এক সম্ভ্রান্ত পারসী শেঠ—নাম নওরোজী উকীল। কিছুদিন আগে এই শেঠজী কমিশনার সাহেবের হাতে এক লাখ টাকা দিয়েছিলেন, শহরে এক চোখের হাসপাতাল খোলবার জন্য। সেই হাসপাতালের ভিত্তি স্থাপন উপলক্ষে মহা ধূমধামের ব্যবস্থা হয়েছিল। নওরোজী শেঠ সরকারী বে-সরকারী সকলকেই নিমন্ত্রণ করেছিলেন। আর পাঁচজনের মত আমিও একখানা কার্ড পেয়েছিলাম। তবে যাব কি যাব না, করছিলাম। কিন্তু শেঠজী নিজে এসে এমন করে ধরলেন যে, না গিয়ে উপায় রইল না। গেলাম উৎসবের আসরে। এক প্রকাণ্ড সামিয়ানা খাটানো হয়েছে। তার এক দিকে, ঠিক মাঝখানটায় মঞ্চের উপর কমিশনার-দম্পতির জন্য সিংহাসনের মতন ব্যবস্থা। মাথার উপর জরি-মখমলের চাঁদোয়া। মঞ্চের ডাইনে সাহেব মেমেদের জন্য গ্যালারী, বাঁয়ে পদস্থ নেটীবদের স্থান। সামিয়ানার দ্বিতীয় ধারটা নেটীব মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত। তৃতীয় ধারে এক সারি

বেঞ্চ পাতা—সাধারণ নেটীবরা কেউ তাইতে বসবেন কেউ বা পেছনে দাঁড়াবেন। আমি বসি কোথায়? শেঠজী ত আদর অভ্যর্থনা করে আমাকে নিয়ে গিয়ে তুললেন সাহেব পাড়ায়। সমবেত সাহেবেরাও "হ্যালো!" ইত্যাদি নানারকম আনন্দসূচক ধ্বনি তুলে স্বাগত করলেন। উঠে গিয়ে বসলেই চুকে যেত হাঙ্গাম। কিন্তু তাহলে আর misfit বলেছে কাকে! জাতীয় গৌরব বলে যে ভূতুড়ে ব্যাপারটা উঠেছে তাই নিয়েই ত যত গোল! আস্তে আস্তে গিয়ে নেটীব পাড়ায় বসলাম। কাছাকাছি যে সব ভদ্রলোকেরা বসেছিলেন তাঁরা "আহা, আহা, করেন কি, ওদিকে গিয়ে বসুন" ইত্যাদি উপদেশ দিতে লাগলেন। এমন সময়ে বড় সাহেব ও তাঁর মহিষী এসে পড়লেন। সঙ্গে আসা-সোঁটা-ধারী চোপদারবর্গ। ব্যাণ্ড বেজে উঠল, "Rule Britannia!" আমরা সবাই দাঁড়িয়ে উঠে রাজপ্রতিনিধির সংবর্দ্ধনা করলাম। কেউ কেউ মনের আবেগে একটা কি রকম অস্ফুট হ্রেষারব তুললেন। সেটাতে আর আমি যোগ দিতে পারলাম না।

যথাসময় কার্য্যক্রম সুরু হল। Taylor বলে এক বৃদ্ধ পাদরী সাহেব দাঁড়িয়ে উঠে যিশুর নাম স্মরণ করে এক প্রার্থনা করলেন। আবার সবাই দাঁড়িয়ে উঠল। এবার আমি বসেই রইলাম। আহমদাবাদের মত জৈন-বৈষ্ণবের শহরে এক পারসী শ্রেষ্ঠীর টাকায় হাসপাতাল তোলা হচ্ছে, এখানে যিশুর নাম কেন! ভগবান্ যিশুকে হয়ত আমি অনেক সাহেবের চেয়ে বেশী ভক্তি করি। তখনও করতাম; কিন্তু কেমন মনে হল যে, এই উৎসবে জবরদস্তী করে খ্রীষ্টানী ব্যবস্থা করা হয়েছে আমাদিকে খাটো করার মতলবে। দাঁড়িয়ে উঠতে পারলাম না। বসেছিলাম বড় সাহেবের কাছেই। তিনি বার দুই কটমট করে তাকালেন, হয়ত আমাকে অসভ্য বেয়াদব ভেবে বিরক্ত হলেন। কিন্তু উপায় কি?

প্রার্থনার পর ভিত্তিস্থাপন করার জন্য সাহেব উঠলেন। একটা হৈচৈ হল। সেই সুযোগে আমি সটকে বেরিয়ে বাড়ী পালালাম। শেঠজী উৎকৃষ্ট জলযোগের আয়োজন করেছিলেন। সেটা আর আমার অদৃষ্টে জুটল না।

ব্যাপারটা অকিঞ্চিৎকর। আমাকে কর্ত্তাদের কাছে বকুনি খেতে হয় নেই। কিন্তু শহরের ভদ্রমণ্ডলীর মধ্যে একটু চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছিল বই কি, কেন না পরে আট-দশদিন পর্য্যন্ত আমাকে নিন্দাবাদ ও স্তুতিবাদ দুই শুনতে হয়েছিল। আমি ত তখন ছেলে মানুষ, এই একটু notoriety (কুখ্যাতি) বেশ ভালই লেগেছিল।

১৯০৮ সালে আমি দ্বিতীয়বার আহ্‌মদাবাদে চাকরী করতে যাই। কিন্তু তখন আবহাওয়া একেবারে অন্য রকম হয়ে গেছে। গুজরাত তখন ধীরে ধীরে গান্ধীজীর জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। রাজনীতি ক্ষেত্রে কি ভাল, কি মন্দ, তা আমি বুঝি না। সরকারী মানুষের বোঝার কথাও নয়। তবে আট বছর পরের আহমদাবাদের সঙ্গে সামাজিক হিসাবে আমার বেশ বনেছিল।

এইবার পল্টনের লোকেদের সম্বন্ধে দুটো একটা গল্প বলব। বাক্-বিতণ্ডার কথা কিছু নয়। সামান্য ব্যাপার। তবু এর থেকেও আমার শিক্ষা যথেষ্ট হয়েছিল। তখনকার দিনে আহমদাবাদ ক্যাম্পে সদা-সর্ব্বদা গোটা-দুই পল্টন থাকত। আমাদের আমলা মহলের প্রথা এই ছিল যে, কেউ নূতন লোক এলে সে অফিসারদের mess-এ একটা কার্ড ছেড়ে আসত, আর তার এই সৌজন্যের বদলে রেজিমেণ্টের বড় কর্ত্তা তাকে mess-এর মেম্বর করে নিতেন। আমার অদৃষ্টে গাল বাড়িয়ে চড় খাওয়া ছিল। তাই আমার এক সাহেব মুরুব্বির পরামর্শে তোপখানার মেস-এ টিকিট রেখে এলাম। অফিসার-রা কিন্তু আমাকে মেস্-এর মেম্বর করলেন না। আমার ইংরেজ বন্ধুরাই সুবিধা পেয়ে এই বিষয় নিয়ে আমাকে বেশ একটু রগড়ালেন। তাঁদের একজন এই বলে খুব দরদ দেখালেন, "পল্টনের লোকগুলো বড় অসভ্য গোঁয়ার। তোমাকে ইচ্ছা করে অপমান করলে।"

কথাটা কিন্তু একেবারে মিথ্যা। পল্টনের লোকেরা অন্য সাহেবদের চেয়ে ঢের বেশী Gentleman—জাতে নয়, স্বভাবে। আমাদের মহারাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণ এই কথা বরাবর বলতেন। তাঁর চেয়ে বেশী আর সাহেব-সুবোকে কে দেখেছে! আমি নিজেও এর ব্যতিক্রম কোন দিন দেখি নেই। এই আহমদাবাদ তোপখানার বড় কর্ত্তা মেজর D-ই সৌজন্যে উদারতায়

কারও চেয়ে খাটো ছিলেন না। আমাকে Mess-এ নিলেন না বটে, কিন্তু অন্য সকলের আগে সপরিবারে আমাদের বাড়ী call (দেখা-শুনো) করে গেলেন। পল্টনের ছোকরারা সাদাসিধে খোলাখুলি আমুদে মানুষ ছিল। আগেই বলেছি দুই-একজনের সঙ্গে আমার খুব বনে গেছল। অবশ্য একবার আক্কেল-সেলামীর পর আমি আর কোন mess-এ কখনও কার্ড রাখতে যাই নেই। কিন্তু সেজন্য আমার মনে কোন ক্ষোভ নেই। এ সব ব্যাপারে মান অভিমান করাই বৃথা। কোন রকমে নিজের মান ইজ্জৎ বাঁচিয়ে চলতে পারলেই হল। এর বেশী করার কারও সাধ্য নেই। তখনও ছিল না, আজও নেই।

D. সাহেবের একটা গল্প বলার লোভ সংবরণ করতে পারছি না। বেশ মজার গল্প। পাঠক বুঝবেন যে, সরকারী চাকরীতে Departmental-বিদ্বেষ জাতি-বিদ্বেষের চেয়ে বড় কম যায় না! একবার আমি দুর্ভিক্ষের কাজে প্রান্তীজ বলে এক স্থানে গেছি। সন্ধ্যাবেলায় পৌঁছে ডাক বাঙ্গলায় যাওয়া মাত্র আমার বয় দুখানা চিঠি আমার হাতে দিয়ে বললে, "ব্যাটারীর মেজর সাহেব এই বাঙ্গলায় ছিলেন। আজ সকালবেলা চলে গেছেন। কাল আপনার জন্য তিনিই সব ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন, আমাকে কিছু করতে দেন নেই। আমাদের জিনিস-পত্র ষ্টেশন থেকে আজ সকালবেলা আনিয়েছি।"

চিঠি দুখানা খুললাম। দুটোই মেজর D. লিখেছেন। একটা আগের দিন ডাক বাঙ্গলাতেই লেখা। আর অন্যটা সেইদিন সকাল-বেলা রেলওয়ে ষ্টেশনে লেখা। প্রথম খানার মজকুর, "কাপ্তান C. ও আমি দুজনেই সারাদিন শিকার করে বড় শ্রান্ত হয়ে পড়েছি। শুতে চললাম। অপরাধ নিও না। তোমার শোবার ব্যবস্থা সব ঠিক আছে। আমার বয় গরম সুরুয়া ও ঠাণ্ডা শিকারের মাংস তোমার জন্য তৈরী রেখেছে। সকালবেলা দেখা হবে।"

দ্বিতীয় চিঠিখানাতে লেখা ছিল—"আমরা চললাম। তোমার সঙ্গে দেখা হল না। সেজন্য বড় দুঃখিত। আজ একটা বড় বদ ঘটনা ঘটেছে এই ষ্টেশনেই। তোমার একজন পুলিস সেপাই আমাকে অপমান করেছে।

প্রভুভক্তি খুব উত্তম জিনিস, একথা আমি মানি। কিন্তু আমার প্রাপ্য সম্মানে আমাকে বঞ্চিত করলে আমি তা বরদাস্ত করব কেন? তোমার সেপাইকে এটা, আশা করি, বুঝিয়ে দেবে।"

বয়কে জিজ্ঞাসা করলাম, "কি হয়েছিল রে ষ্টেশনে?"

সে বললে, "সাহেব, আমাদের কোন কসুর নেই। আমাদের মালের জন্য খানতিনেক গরুর গাড়ী ধরা হয়েছিল। মেজর সাহেবের দুজন গোরা এসে সেই গাড়ী নিয়ে টানাটানি করতে লাগল। মহম্মদ খাঁ সেপাই কিছুতেই গাড়ী ছাড়লে না। বললে, তোমরা অন্য গাড়ী ধর গিয়ে। গোরারা বিড়বিড় করতে করতে চলে গেল। কিন্তু খানিক পরে মেজর সাহেব ষ্টেশনে এসে মহম্মদকে ডেকে পাঠিয়ে খুব গালাগালি করলেন। সেও একটু চোখা চোখা কথায় জবাব দিলে। সাহেব চটে তাকে এক ধাক্কা মেরে বললেন, নিকল যাও উল্লু! আমি তোমার সাহেবের কাছে রিপোর্ট করব। মহম্মদ এইটুকু বলেছিল বটে—সাহেব, তুমি আমার গায় হাত দিও না, আমি অন্য অফিসারের সেপাই।"

পরদিন মহম্মদ ও অন্যান্য চাকর-বাকরদের জিজ্ঞেস-পড়া করে বুঝলাম যে, বয় আমাকে সত্যি কথাই বলেছিল। ষ্টেশন মাষ্টার বাবুও একই কথা বললেন। মহম্মদ কিছু দোষ করেছে বলে ত মনে হল না! তবু তাকে একটু ধমকে দিয়ে বললাম, "তুই সাহেব-সুবোর সঙ্গে বে-আদবী করিস্, এত বড় তোর স্পর্দ্ধা!" সে অম্লান বদনে উত্তর দিলে, "হুজুর, আমি তোমার নোকর, মেজর সাহেবের ত নই। তুমি যা সাজা দেবে, দাও।"

D.-কে চিঠি লিখলাম, "সেপাই মহম্মদ খাঁকে খুব ধমকে দিয়েছি। পুলিস সাহেবের কাছে তোমার চিঠিখানা পাঠিয়েছি। তিনি যে রকম ভাল বুঝবেন, করবেন। আমি এই ব্যাপারে যথার্থ বড় ক্ষুণ্ণ হয়েছি।"

পুলিস সাহেবের পত্র এল দিন দুই পরে, "মহম্মদ খাঁ সেপাইকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিও।সে বাহাদুর লোক। কিছু বকশিস দেব। পল্টনের লোকগুলো বড় বাড়াবাড়ি করে তুলেছে।" এই পুলিস সাহেবও ইংরেজ, D-ও ইংরেজ। অথচ মহম্মদ খাঁ সত্যিই টাকা পাঁচেক বকশিস পেলে!

D-র কাছ থেকেও উত্তর পেলাম, "তুমি সেপাইকে ধমকে দিয়েছ, এই যথেষ্ট। পুলিস সুপারিন্‌টেণ্ডেন্টের কাছ থেকে কোন প্রতিবিধানের আশা আমি করি না। তাকে কেন আমার চিঠিখানা পাঠাতে গেলে?"

এ গল্পের উপর কোন টীকা অনাবশ্যক।

যাক্, এ সব অপ্রিয় গল্প ঢের বলা হয়েছে। এখন আমাদের ক্যাম্প-জীবনের দু-চার কথা বলি। হয়ত সকলেরই ভাল লাগবে। বোম্বাই এলাকায় প্রান্ত বা মহকুমা হাকীমদের বছরে মোট সাত মাস ঘুরে বেড়াতে হয়। দেওয়ানী হয়ে গেলেই তাঁরা বেরিয়ে পড়েন, আর মে মাসের শেষে সদরে ফেরেন। মাঝে এক বড়দিনের ছুটী। তখনও বেশীর ভাগ লোক বাড়ী ফেরে না। কোথাও না কোথাও বড় সাহেবদের শিকার ক্যাম্পে নিমন্ত্রণ জুটে যায়। এই সাত মাস একেবারে পুরোদস্তুর বেদে-জীবন যাপন করতে হয়। গড়পড়তা পাঁচ দিন করে এক এক জায়গায় ডেরা থাকে। পাঁচ দিনের দিন আবার সাজ সাজ রব। এক এক মহকুমাতে মোটামুটি তিনটে তালুকা বা তহশীল। প্রত্যেক তহশীলে খাজনা-খানা আছে, থানা আছে, ডাক্তার খানা আছে। অনেক তহশীলে আবার মুনসেফ কাছারী আছে। তহশীলের সদরে সাত আট-দিন কাটাতে হয়, কারণ সেখানে নানা রকম খুচরো কাজ থাকে। তবে প্রান্ত হাকীমের নিত্য কর্ম্ম মানে গ্রাম পরিদর্শন। এক এক প্রান্তে প্রায় নয়শো গ্রাম থাকে। তিন বছরে সব গ্রামগুলো একবার করে দেখে আসা চাই। গ্রাম দেখে আসা মানে কি, সেটা আমার পাঠকদিকে বুঝিয়ে বলছি।

পাঠক, বোধ হয়, জানেন যে ওদেশে জমীদার নেই। চাষীরা সরকারের রাইয়ৎ। তারা সোজাসুজি খাজনা দেয় সরকারের হাতে। তাই ছোট বড় সকল হাকীমেরই প্রধান কাজ হচ্ছে খাজনা আদায়।

এই খাজনা আদায়ের জন্য গাঁয়ে গাঁয়ে পটেল তলাটী নিযুক্ত আছে। এরা আগেকার দিনে নগদ মাইনে পেত না। বংশ পরম্পরায় চাকরান জমী উপভোগ করত। এই পটেলকে সবচেয়ে ছোট্ট হাকীম বলা যেতে পারে। তলাটী হচ্ছেন তাঁর দেওয়ানজী। তাঁর লেখাপড়ার কাজ করে দেন, হিসেব-পত্র রাখেন। তলাটীকে অনেকগুলো খাতাপত্র রাখতে হয়।

তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে ledger, যাকে বলে খাতাবহি। এই ledger-এ প্রত্যেক রাইয়তের নামে এক-একটা আলাদা খাতা আছে। খাজনা বাবৎ যা কিছু আদায় হয়, তা তলাটী তৎক্ষণাৎ দাখিল করে প্রথম এই খাতায়, তারপর, রাইয়তের নিজের কাছে থাকে যে রসীদ বই, তাইতে। আমাদের প্রধান কাজ ছিল কুল-রুজুয়াৎ, অর্থাৎ গ্রামে হঠাৎ উপস্থিত হয়ে হাঁক ডাক করে বিশ-পঁচিশজন রাইয়ৎ জমা করে তাদের প্রত্যেককে প্রথমে মুখে-মুখে জিজ্ঞাসা করা, "এ বছর কত উস্থল দিয়েছিস্?"—তারপর রসীদ-বই আর খাতাবহি মিলিয়ে দেখা টাকাটা ঠিক জমা হয়েছে কি না।

গুজরাতে দেখেছিলাম খাজনার সঙ্গে সঙ্গে টাকা-পিছু এক পাই গ্রামখরচ ফণ্ড বলে আদায় করা হত। এই ফণ্ডেরও একটা রীতিমত হিসেব রাখত পটেল তলাটী। তবে সে হিসেব ত আর আমাদের সামনে উপস্থিত হত না! প্রথম প্রথম আমি জিনিসটা বুঝতাম না। ছোট জাতের, কি বুড়োহাবড়া কোন চাষাকে হয়ত আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "কি রে কত উস্থল দিয়েছিস্?" সে উত্তর দিলে, "পাঁচ টাকা পাঁচ আনা পাঁচ পাই।" পাঁচ টাকা ত, বুঝলাম, খাজনা। পাঁচ আনা লোকাল ফণ্ড সেস্, তাও বুঝলাম। কিন্তু পাঁচ পাইটা কি হল? খাতায় রসিদে ত জমা রয়েছে মোট পাঁচ টাকা, পাঁচ আনা! পটেলকে জিজ্ঞাসা করায় সে হেসে জবাব দিলে, "আনাড়ী চাষা কি না ওরা! ঐরকমই কথা কয়, সাহেব!" তারপর হয়ত লোকটার দিকে ফিরে চোখ রাঙ্গিয়ে বললে, "**সরকারকে কত** দিয়েছিস্, ঠিক ঠিক বল্।" তখন সে থতমত খেয়ে উত্তর দিলে, "**সরকারকে** দিয়েছি পাঁচ টাকা পাঁচ আনা। পাঁচ পাইটা ধামা-চাপা পড়ে গেল। এই রকম বারকতক হল।

একদিন এক গাঁয়ে চাউড়ীতে (পটেলের কাছারী বাড়ী) রাত্রি-বাস করছি। নন্দীভৃঙ্গী কেউ সঙ্গে নেই। খাওয়া দাওয়ার পর পাটিদার চাষীরা সব গড়গড়া নিয়ে এসে চারদিকে বসেছে। বিলেতের, বোম্বাই শহরের, বাঙ্গলা দেশের কত কথাই জিজ্ঞেস করছে! যখন খুব আসর জমেছে, আমি হঠাৎ আমার পাঁচ পাইয়ের সমস্যার কথা পাড়লাম। বললাম, "আজ আমাকে বলতেই হবে এ ব্যাপারটা কি। গাঁয়ে

গাঁয়ে তোমরা সব এত বুদ্ধিমান বিচক্ষণ পাটিদার থাকতে তলাটী এই রকম করে গরীবগুরবো রাইয়ৎকে ঠকিয়ে পয়সা খাবে !"

আগেই বলেছি পাটিদার জাতটা একটু হাঁদা। আমি বুদ্ধিমান বিচক্ষণ বলায় ওরা ভারী খুশী হয়ে গেল। আর, তখন রাত বারোটাও বেজে গেছে। মনের কথা খুলে কওয়ার ঐ ত সময়! পটেল সব ফাঁস করে দিলে গ্রাম খরচ ফণ্ডের কথা। পাই পাই করে যে টাকাটা পটেল তলাটী জমা করে, সেটা খরচ হয়ে যায় গ্রামের অতিথিদের সেবায়। অতিথি কে? না, সাধুসন্ত, কথক-কীর্ত্তনীয়া, সেপাই-পাহারাওয়ালা, ও সব শেষ হাকীম ও হাকীমের পার্শ্বচরবৃন্দ। অতি সঙ্কোচে জিজ্ঞাসা করলাম, "আমাকে যে আজ খাওয়ালে, সে কি গ্রাম খরচ ফণ্ড থেকে?"

পটেল হেসে বললে, "না সাহেব, তোমার ভয় নেই। আমার ঘরে যা খুদ-কুঁড়ো ছিল, তাই তোমাকে খাইয়েছি। দু আনার বেশী খরচ হয় নেই।"

আমরা ক্যাম্পে যা খেতাম দেতাম তার দাম বরাবর ধরে দিয়েছি, এ কথা আপনাদিকে হলপ পড়ে বলতে পারি। তবে দাম দিতাম তালুকা কাছারীর নিরিখ অনুসারে। নিরিখের ভাউ আর সত্যিকার বাজার দর, এ দুয়ের মধ্যে যে তফাৎ, সেটা সব বড় গাঁয়ে গ্রাম খরচ ফণ্ড হতে পূরিয়ে দেওয়া হত। নন্দীভৃঙ্গীরা কতটুকু কে দাম দিতেন, তা আমি জানি না। আমি নিজেও কি দরে কি কিনতাম তা এখন সব মনে নেই। তবে ছোট পাঁঠা কি ভেড়ার জন্য একটি টাকার বেশী কখনও দেই নেই। সেই জানোয়ারের ছালটা আবার চাকররা পরে আনা ছয়েকে বেচত। কাজেই বুঝতে পারছেন যে গণ্ডা দশেকে একটা পাঁঠার ছাল বাদে সমস্ত দেহটা পাওয়া যেত। দুর্মূল্য বলা যায় কি? আমি বিবেকের তাড়নায় আমার বড় সাহেবকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, নিদেন দুটো টাকা দিতে পারি কি না। তিনি একটু মনের আবেগেই জবাব দিয়েছিলেন, বেশ মনে আছে, "বাজার দর বেগড়াবার কোন অধিকার তোমার নেই।"

আমি তাই বাজার দর বেগড়াবার কোন চেষ্টাই করি নেই। অন্য রকমে গ্রামের লোকের কিছু সাহায্য যদি করতে পারতাম, ত করতাম। সঙ্গে কিছু কিছু কাপড় চোপড় কম্বল ইত্যাদি থাকত। বাড়ীর এঁরা গরীব দুঃখী দেখে দুই-একখানা দিতেন, ঔষধপত্রও বিতরণ করতেন। তবে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করছি যে, যা দিতাম তার চেয়ে অনেক বেশী নিতাম। জজ হয়েও ক্যাম্প করেছি। তবে তখন আর কোন ল্যাঠা ছিল না। আর পাঁচ জনের মত বাজারে নগদ দাম দিয়ে রসদ কিনতে হত। যেটুকু দিতে পারতাম সেটা দেওয়াই হত, কারও কিছু নিতে হত না।

কোন তালুকায় ক্যাম্প গেলেই সেখানকার কাছারী হতে দুজন চাপরাসী সাহেবের রসদ সংগ্রহের কাজে মোতায়েন হত। এ বেচারাদের বড় দুর্দ্দশা কেন না অনেক দেবতাকে তুষ্ট রাখতে হত। সাহেব মেমসাহেব ত আছেনই। তার উপর আবার সেরেস্তাদার রাও সাহেব, বটলার সাহেব, মেস্ত্রী সাহেব (cook), গারদের নায়েক সাহেব, এদের প্রত্যেকের ফরমায়েশ খাটতে হত। সময় সময় এমনও দেখেছি যে, ক্যাম্পের রজক মহা তম্বি করছে যে তার একটা পুকুর চাই, নইলে হুজুরদের কাপড় ধোবে কোথায়!

তবে এরা জাতে চাপরাসী, আপন সুবিধাও একটু আধটু করে নিত বই কি! বেশী বাড়াবাড়ি করলে ধরা পড়ত, নইলে নির্ব্বিবাদে নিজের তথা অন্যের কাজ বাজাত। একটা গল্প বলি উদাহরণ-স্বরূপ। একদিন সকালবেলায় ঘুরতে ঘুরতে পাহাড়ের উপর এক ক্ষুদ্র গ্রামে গিয়ে পৌঁছলাম, গাঁয়ের চারদিকে উঁচু দেওয়াল, চার কোণে বুরুজ, একেবারে রীতিমত ছোট্ট কেল্লাটি। পাহাড়ের গায়ে সবুজ ঘাসের উপর অজস্র মহিষ, ভেড়া, ছাগল চরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু কাছাকাছি কোথাও ক্ষেত-খামারের চিহ্ন দেখলাম না। বুঝলাম এটা ভরোয়াড়দের গ্রাম। এই ভরোয়াড়রা বংশপরম্পরায় মেষপালক। পশুর পাল রাখা আর কম্বল বোনা, এই এদের দুই ধান্দা। চাষ-বাস করা এদের আসে না। লম্বা চওড়া জোয়ান, হাতে লম্বা লাঠি, কাঁধে মোটা কম্বল, ইয়া বেরালের মত গোঁফ, এরা দেখ্‌তে বাস্তবিক সুপুরুষ। গাঁয়ের ফটকে পৌঁছতেই ছেলে ছোকরার দল দৌড়ে এল। আমি

ফটকের কড়ায় ঘোড়ার লাগাম বেঁধে, এগিয়ে গিয়ে চাউড়ীর দাওয়ায় বসলাম। এক ভরোয়াড়ীন বুড়ী কোথা থেকে দৌড়ে এসে আমার পা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল। কোন রকমে তাকে চুপ করিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "কি হয়েছে, বাই ? আমাকে বুঝিয়ে বল্।"

সে আমাকে পাল্টা প্রশ্ন করলে, "তুমি কোন্ সাহেব, বাবা ? প্রান্ত সাহেব ? আচ্ছা, বাবা তুমি কি দুধওয়ালী ছাগলের মাংস খেতে ভালবাস ?"

আমাকে কবুল করতে হল যে, কি রকম ছাগলের কি রকমের মাংস হয় সে বিষয়ে আমি একেবারে অজ্ঞ। বুড়ী ফের আমাকে জিজ্ঞাসা করলে, "তাহলে তোমার সিপাই এসে আমার বড় পাঁঠীটাকে ধরলে কেন ?"

এমন সময় পটেল ইত্যাদি মাতব্বররা এসে পড়ল। তারা বুড়ীকে তাড়া দিলে, "যা যা সাহেবকে বিরক্ত করিস্ না। একটা ছোট বাচ্চা ত নিয়ে গেল সেপাইটা। তার জন্য একটা টাকা পাব। আবার কত চাই।"

বুড়ী কি সহজে ছাড়বার পাত্র! ফের আমার পায়ে মাথা কুড়তে লাগল, "এক টাকা করে দিয়ে তোমার যত ইচ্ছা পাঁঠা নিয়ে যাও, সাহেব বাবা। আমি আপত্তি করব কেন ? আমি কি নিমকহারাম মানুষ! কিন্তু আমার পাঁচটা টাকা কেড়ে নিয়ে গেল যে তোমার সিপাইটা!"

তখন ধীরে ধীরে জেরা করে যা বুঝলাম তা এই যে, চাপরাসীটা আগের দিন বদমায়েশী করে বুড়ীর এক বড় দুধওয়ালী পাঁঠী ধরে। তারপর বুড়ী হাতে পায়ে ধরাতে পাঁচ টাকা ঘুষ নিয়ে সেটাকে ছেড়ে দিয়ে এক ছোট বাচ্চা নিয়ে যায়। লোকটার খুব বুদ্ধি বটে! কিন্তু এইরকম করলে আমার যে রাক্ষস বলে খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে! দেখলাম গাঁয়ের পটেল মাতব্বররা এ বিষয়ের কিছু জানে না। ক্যাম্পে ফিরলাম। রসুল সাহেব চাপরাসীর কাছ থেকে পাঁচটা টাকা বের করতে বিশেষ কষ্ট হল না। তবে তাকে শাস্তি দিতে পারলাম না। কেবলই মনে হতে লাগল, আমিই বা কিসের এত সাধু পুরুষ! পাঠক মনে রাখবেন আমি তখন একেবারে ছেলেমানুষ। মনোবৃত্তি গুলোর উপর কড়া পড়ে যায় নেই।

শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত
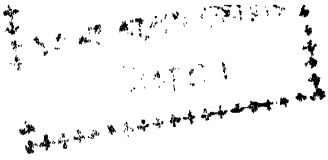
ছিন্নপত্র

কল্যাণীয়েষু

* * * সাহিত্যের প্রাণধারা বয় ভাষার নাড়ীতে, তাকে নাড়া দিলে মূল রচনার হৃৎস্পন্দন বন্ধ হয়ে যায়। এ রকম সাহিত্যে বিষয়বস্তুটা নিশ্চেষ্ট হয়ে পড়ে, যদি তার সজীবতা না থাকে। এবারে আমারই পুরোনো তর্জ্জমা ঘাঁটতে গিয়ে একথা বারবার মনে হয়েছে। তুমি বোধ হয় জানো বাছুর ম'রে গেলে তার অভাবে গাভী যখন দুধ দিতে চায় না তখন মরা বাছুরের চামড়াটা ছাড়িয়ে নিয়ে তার মধ্যে খড় ভর্ত্তি ক'রে একটা কৃত্রিম মূর্ত্তি তৈরী করা হয়, তারি গন্ধে এবং চেহারার সাদৃশ্যে গাভীর স্তনে দুগ্ধ ক্ষরণ হোতে থাকে। তর্জ্জমা সেই রকম মরা বাছুরের মূর্ত্তি—তার আহ্বান নেই ছলনা আছে। এ নিয়ে আমার মনে লজ্জা ও অনুতাপ জন্মায়। সাহিত্যে আমি যা কাজ করেছি তা যদি ক্ষণিক ও প্রাদেশিক না হয়, তবে যার গরজ সে যখন হোক্ আমার ভাষাতেই তার পরিচয় লাভ করবে। পরিচয়ের অন্য কোনো পন্থা নেই। যথাপথে পরিচয়ের যদি বিলম্ব ঘটে তবে যে বঞ্চিত হয় তারই ক্ষতি, রচয়িতার তাতে কোনো দায়িত্ব নেই।

প্রত্যেক বড়ো সাহিত্যে দিন ও রাত্রির মতো পর্য্যায়ক্রমে প্রসারণ ও সঙ্কোচনের দশা ঘটে, মিল্টনের পর ড্রাইডেন পোপের আবির্ভাব হয়। আমরা প্রথম যখন ইংরেজি সাহিত্যের সংস্রবে আসি তখন সেটা ছিল ওদের প্রসারণের যুগ। য়ুরোপে ফরাসীবিপ্লব মানুষের চিত্তকে যে নাড়া দিয়েছিল সে ছিল বেড়া-ভাঙবার নাড়া। এইজন্যে দেখতে দেখতে তখন সাহিত্যের আতিথেয়তা প্রকাশ পেয়েছিল বিশ্বজনীনরূপে। সে যেন রস-সৃষ্টির সার্ব্বজনিক যজ্ঞ। তারমধ্যে সকল দেশেরই আগন্তুক অবাধে আনন্দভোগের অধিকার পায়। আমাদের সৌভাগ্য এই যে, ঠিক সেই সময়েই য়ুরোপের আহ্বান আমাদের কানে এসে পৌঁছল—তার মধ্যে ছিল সর্ব্বমানবের মুক্তির বাণী। আমাদের তো সাড়া দিতে দেরি হয়নি। সেই আনন্দে আমাদেরও মনে নবসৃষ্টির প্রেরণা এল। সেই প্রেরণা আমাদেরও

জাগ্রত মনকে পথ নির্দ্দেশ করলে বিশ্বের দিকে। সহজেই মনে এই বিশ্বাস দৃঢ় হয়েছিল যে, কেবল বিজ্ঞান নয় সাহিত্যসম্পদও আপন উদ্ভব-স্থানকে অতিক্রম ক'রে সকল দেশ ও সকল কালের দিকে বিস্তারিত হয়; তার দাক্ষিণ্য যদি সীমাবদ্ধ হয় যদি তাতে আতিথ্যধর্ম্ম না থাকে তবে স্বদেশের লোকের পক্ষে সে যতই উপভোগ্য হোক্ না কেন সে দরিদ্র। আমরা নিশ্চিত জানি যে, যে ইংরেজি সাহিত্যকে আমরা পেয়েছি সে দরিদ্র নয়, তার সম্পত্তি স্বাজাতিক লোহার সিন্ধুকে দলিলবদ্ধ হয়ে নেই।

একদা ফরাসীবিপ্লবকে যাঁরা ক্রমে ক্রমে আগিয়ে নিয়ে এসেছিলেন, তাঁরা ছিলেন বৈশ্বমানবিক আদর্শের প্রতি বিশ্বাসপরায়ণ। ধর্ম্মই হোক্ রাজশক্তিই হোক্ যা কিছু ক্ষমতালুব্ধ, যা কিছু ছিল মানুষের মুক্তির অন্তরায় তারই বিরুদ্ধে ছিল তাঁদের অভিযান; সেই বিশ্বকল্যাণ-ইচ্ছার আবহাওয়ায় জেগে উঠেছিল যে সাহিত্য সে মহৎ, সে মুক্তদ্বার সাহিত্য, সকল দেশ সকল কালের মানুষের জন্য সে এনেছিল আলো, এনেছিল আশা। ইতিমধ্যে বিজ্ঞানের সাহায্যে য়ুরোপের বিষয়বুদ্ধি বৈশ্যযুগের অবতারণা করলে। স্বজাতির ও পরজাতির মর্ম্মস্থল বিদীর্ণ ক'রে ধনস্রোত নানা প্রণালী দিয়ে য়ুরোপের নবোদ্ভূত ধনিকমণ্ডলীর মধ্যে সঞ্চারিত হোতে লাগল। বিষয়বুদ্ধি সর্ব্বত্র সর্ব্ববিভাগেই ভেদবুদ্ধি, তা ঈর্ষ্যাপরায়ণ। স্বার্থসাধনার বাহন যারা তাদেরই ঈর্ষ্যা, তাদেরই ভেদনীতি অনেকদিন থেকেই য়ুরোপের অন্তরে অন্তরে গুম্‌রে উঠছিল, সেই বৈনাশিক শক্তি হঠাৎ সকল বাধা বিদীর্ণ ক'রে আগ্নেয়স্রাবে য়ুরোপকে ভাসিয়ে দিলে। এই যুদ্ধের মূলে ছিল সমাজধ্বংসকারী রিপু, উদার মনুষ্যত্বের প্রতি অবিশ্বাস। সেইজন্যে এই যুদ্ধের যে দান তা দানবের দান, তার বিষ কিছুতেই মরতে চায় না, তা শান্তি আনলে না।

তারপর থেকে য়ুরোপের চিত্ত কঠোরভাবে সঙ্কুচিত হয়ে আস্‌ছে—প্রত্যেক দেশই আপন দরজার আগলের সংখ্যা বাড়াতে ব্যাপৃত। পরস্পরের বিরুদ্ধে যে সংশয় যে নিষেধ প্রবল হয়ে উঠ্‌ছে তার চেয়ে অসভ্যতার লক্ষণ আমি তো আর কিছু দেখিনে। রাষ্ট্রতন্ত্রে একদিন আমরা য়ুরোপকে জনসাধারণের মুক্তিসাধনার তপোভূমি ব'লেই জানতুম—অকস্মাৎ দেখতে

পাই সমস্ত যাচ্চে বিপর্য্যস্ত হয়ে। সেখানে দেশে দেশে জনসাধারণের কণ্ঠে ও হাতে পায়ে শিকল দৃঢ় হয়ে উঠ্‌ছে, হিংস্রতায় যাদের কোনো কুণ্ঠা নেই তারাই রাষ্ট্রনেতা। এর মূলে আছে ভীরুতা, যে-ভীরুতা বিষয়-বুদ্ধির। ভয়, পাছে ধনের প্রতিযোগিতায় বাধা পড়ে, পাছে অর্থভাণ্ডারে এমন ছিদ্র দেখা দেয় যার মধ্য দিয়ে ক্ষতির দুর্গ্রহ আপন প্রবেশপথ প্রশস্ত করতে পারে। এইজন্যে বড়ো বড়ো শক্তিমান পাহারাওয়ালাদের কাছে দেশের লোক আপন স্বাধীনতা আপন আত্মসম্মান বিকিয়ে দিতে প্রস্তুত আছে। এমন কী, স্বজাতির চিরাগত সংস্কৃতিকে খর্ব্ব হোতে দেখেও শাসনতন্ত্রের বর্ব্বরতাকে শিরোধার্য্য ক'রে নিয়েছে। বৈশ্যযুগের এই ভীরুতায় মানুষের আভিজাত্য নষ্ট ক'রে দেয়। তার ইতরতার লক্ষণ নির্লজ্জভাবে প্রকাশ পেতে থাকে।

পণ্যহাটের তীর্থযাত্রী অর্থলুব্ধ য়ুরোপ এই যে আপন মনুষ্যত্বের খর্ব্বতা মাথা হেঁট ক'রে স্বীকার করছে, আত্মরক্ষার উপায়রূপে নির্ম্মাণ করছে আপন কারাগার, এর প্রভাব কি ক্রমে ক্রমে তার সাহিত্যকে অধিকার করছে না? ইংরেজি সাহিত্যে একদা আমরা বিদেশীরা যে নিঃসঙ্কোচ আমন্ত্রণ পেয়েছিলুম আজ কি তা আর আছে? এ কথা বলা বাহুল্য প্রত্যেক দেশের সাহিত্য মুখ্যভাবে আপন পাঠকদের জন্য, কিন্তু তার মধ্যে সেই স্বাভাবিক দাক্ষিণ্য আমরা প্রত্যাশা করি যাতে সে দূর নিকটের সকল অতিথিকেই আসন জোগাতে পারে। যে সাহিত্যে সেই আসন প্রসারিত সেই সাহিত্যই মহৎ সাহিত্য, সকল কালেরই মানুষ সেই সাহিত্যের স্থায়িত্বকে সুনিশ্চিত ক'রে তোলে, তার প্রতিষ্ঠাভিত্তি সর্ব্ব-মানবের চিত্তক্ষেত্রে।

আমাদের সমসাময়িক বিদেশী সাহিত্যকে নিশ্চিত প্রত্যয়ের সঙ্গে বিচার করা নিরাপদ নয়। আধুনিক ইংরেজি সাহিত্য সম্বন্ধে আমি যেটুকু অনুভব করি সে আমার সীমাবদ্ধ অভিজ্ঞতা থেকে, তার অনেকখানিই হয়তো অজ্ঞতা। এ সাহিত্যের অনেক অংশের সাহিত্যিক মূল্য হয়তো যথেষ্ট আছে, কালে কালে তার যাচাই হোতে থাকবে। আমি যা বল্‌তে পারি তা আমারি ব্যক্তিগত বোধশক্তির সীমানা থেকে। আমি বিদেশীর

তরফ থেকে বল্‌ছি,—অথবা তা-ও নয়—একজনমাত্র বিদেশী কবির তরফ থেকে বল্‌ছি—আধুনিক ইংরেজি কাব্য-সাহিত্যে আমার প্রবেশাধিকার অত্যন্ত বাধাগ্রস্ত। আমার এ কথার যদি কোনো ব্যাপক মূল্য থাকে তবে এই প্রমাণ হবে যে এই সাহিত্যের অন্য নানা গুণ থাক্‌তে পারে, কিন্তু একটা গুণের অভাব আছে যাকে বলা যায় সার্ব্বভৌমিকতা, যাতে ক'রে বিদেশ থেকে আমিও এ'কে অকুণ্ঠিতচিত্তে মেনে নিতে পারি। ইংরেজের প্রাকৃতন সাহিত্যকে তো আনন্দের সঙ্গে মেনে নিয়েছি, তার থেকে কেবল যে রস পেয়েছি তা নয়, জীবনের যাত্রাপথে আলো পেয়েছি। তার প্রভাব আজও তো মন থেকে দূর হয়নি। আজ দ্বাররুদ্ধ য়ুরোপের দুর্গমতা অনুভব করছি আধুনিক ইংরেজি সাহিত্যে। তার কঠোরতা আমার কাছে অনুদার ব'লে ঠেকে, বিদ্রূপপরায়ণ বিশ্বাসহীনতার কঠিন জমিতে তার উৎপত্তি, তার মধ্যে এমন উদ্বৃত্ত দেখা যাচ্চে না, ঘরের বাইরে যার অকৃপণ আহ্বান। এ সাহিত্য বিশ্ব থেকে আপন হৃদয় প্রত্যাহরণ ক'রে নিয়েছে, এর কাছে এমন বাণী পাইনে যা শুনে মনে করতে পারি যেন আমারি বাণী পাওয়া গেল চিরকালীন দৈববাণীরূপে। দুই একটি ব্যতিক্রম যে নেই তা বল্‌লে অন্যায় হবে।

আমাদের দেশের তরুণদের মধ্যে কাউকে কাউকে দেখেছি যাঁরা আধুনিক ইংরেজি কাব্য কেবল যে বোঝেন তা নয় সম্ভোগও করেন। তাঁরা আমার চেয়ে আধুনিক কালের অধিকতর নিকটবর্ত্তী বলেই য়ুরোপের আধুনিক সাহিত্য হয়তো তাঁদের কাছে দূরবর্ত্তী নয়। সেইজন্য তাঁদের সাক্ষ্যকে আমি মূল্যবান্ বলেই শ্রদ্ধা করি। কেবল একটা সংশয় মন থেকে যায় না। নূতন যখন পূর্ব্ববর্ত্তী পুরাতনকে উদ্ধতভাবে উপেক্ষা ও প্রতিবাদ করে তখন দুঃসাহসিক তরুণের মন তাকে যে বাহবা দেয় সকল সময়ে তার মধ্যে নিত্যসত্যের প্রামাণিকতা মেলে না। নূতনের বিদ্রোহ অনেক সময়ে একটা স্পর্দ্ধা মাত্র। আমি এই বলি, বিজ্ঞানে মানুষের কাছে প্রাকৃতিক সত্য আপন নূতন নূতন জ্ঞানের ভিত্তি অবারিত করে, কিন্তু মানুষের আনন্দলোক যুগে যুগে আপন সীমানা বিস্তার করতে পারে কিন্তু ভিত্তি বদল করে না। যে সৌন্দর্য্য যে প্রেম যে মহত্ত্বে মানুষ

চিরদিন স্বভাবতই উদ্বোধিত হয়েছে তার তো বয়সের সীমা নেই, কোনো আইনষ্টাইন এসে তাকে তো অপ্রতিপন্ন করতে পারে না, বল্‌তে পারে না বসন্তের পুষ্পোচ্ছ্বাসে যার অকৃত্রিম আনন্দ সে সেকেলে ফিলিষ্টাইন। যদি কোন বিশেষ যুগের মানুষ এমন সৃষ্টিছাড়া কথা বলতে পারে, যদি সুন্দরকে বিদ্রূপ করতে তার ওষ্ঠাধর কুটিল হয়ে ওঠে, যদি পূজনীয়কে অপমানিত করতে তার উৎসাহ উগ্র হোতে থাকে তা হোলে বলতেই হবে এই মনোভাব চিরন্তন মানবস্বভাবের বিরুদ্ধ। সাহিত্য সর্ব্বদেশে এই কথাই প্রমাণ ক'রে আসছে যে, মানুষের আনন্দনিকেতন চিরপুরাতন। কালিদাসের মেঘদূতে মানুষ আপন চিরপুরাতন বিরহবেদনারই স্বাদ পেয়ে আনন্দিত। সেই চিরপুরাতনের চিরনূতনত্ব বহন করছে মানুষের সাহিত্য, মানুষের শিল্পকলা। এইজন্যেই মানুষের সাহিত্য, মানুষের শিল্পকলা সর্ব্ব-মানবের। তাই বারেবারে এই কথা আমার মনে হয়েছে বর্ত্তমান ইংরেজি কাব্য উদ্ধতভাবে নূতন, পুরাতনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহীভাবে নূতন; যে-তরুণের মন কালাপাহাড়ি সে এর নব্যতার মদিররসে মত্ত, কিন্তু এই নব্যতাই এর ক্ষণিকতার লক্ষণ। যে-নবীনতাকে অভ্যর্থনা করে বলতে পারিনে—

> জনম অবধি হম রূপ নেহারিনু নয়ন না তিরপিত ভেল,
> লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু তবু হিয় জুড়ন না গেল—

তাকে যেন সত্যই নূতন ব'লে ভ্রম না করি, সে আপন সদ্য জন্মমুহূর্ত্তেই আপন জরা সঙ্গে নিয়েই এসেছে, তার আয়ুঃস্থানে যে শনি সে যত উজ্জ্বলই হোক তবু সে শনিই বটে। * * *

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীযুক্ত অমিয় চন্দ্র চক্রবর্ত্তীকে লিখিত

দুই দিক

শীতকালের রোদ—দুপুরে একটু কড়া হয়েই উঠেছে। পার্কের ঢাকা দেওয়া সব বেঞ্চিগুলোই অধিকার করেছে লোকে। লম্বা হয়ে শুয়ে ঘুম দিচ্ছে,—কোনটায় বা দুজন।

বেঁটে, কালো, মোটাসোটা লোকটি গলদ্‌ঘর্ম্ম হয়ে অবশেষে তারই একটায় বসে পড়লেন, একজনের পায়ের কাছে। শুয়ে যে ছিল তার মুখ দেখা যাচ্ছিল না। কোমরে একটা মলিন সবুজ রংয়ের শাল জড়ান। আঁচ্‌লার দিকটা দেখলে মনে হয়, হয়তো বা একদিন দামী ছিল। পরণে হাতকাটা সার্ট, আর সরুপেড়ে ধুতি। লোকটি হাতের ভেতর মুখ গুঁজে ঘুমোচ্ছিল। আঙ্গুলের ফাঁকে দেখা যাচ্ছিল রুক্ষ বাবরী চুল।

কাণা ছেলের নাম চিরকালই আর পদ্মলোচন হয় না। বেঁটে মোটা লোকটির নাম গদাধর দাস—পরিচয় দেবার সময় বলেন শ্রীগদাধরচন্দ্র দাস। চন্দ্রের সঙ্গে সাদৃশ্য যদি কিছুমাত্র থাকে তবে সে মুখমণ্ডলে। আর 'শ্রী'টা আধুনিকদের মতে নিতান্তই বাড়াবাড়ি।

অল্প পরিসর স্থানে গদাধরবাবু কোনরকমে নিজেকে ধরিয়ে নিয়ে গলাবন্ধ কোটের বোতামগুলো খুলতে সুরু করলেন। কাঁধ থেকে অধুনা-ধূসর রংয়ের র‍্যাপারখানা নিয়ে সযত্নে ভাঁজ করে ঠ্যাসনে দেবার কাঠখানায় ঝুলিয়ে রাখলেন। বেশভূষা কিছু অপরিচ্ছন্ন হ'লেও পারিপাট্যের অভাব ছিল না। জুতোজোড়া দুরকম চামড়ার। গদাধরবাবু বলেন—হাল ফ্যাসানের জুতো দুরঙা চামড়ারই হয়ে থাকে। তাঁর ডিজাইনটা কেবল নতুন রকম। আরেকটু আরাম করে বসবার আশায় জুতো খুলে আসন পিঁড়ি হয়ে বসতে গেলেন।

গদাধরবাবুর গড়নে অন্ততঃ পরিধির দিকে ভগবান কোনও কার্পণ্য করেননি। আরাম করে বসতে গিয়ে হাঁটুটা লাগল নিদ্রিত ব্যক্তির পায়ে। আচম্‌কা ধাক্কা খেয়ে লোকটি তাড়াতাড়ি উঠে বস্‌ল। গদাধরবাবুকে দেখে একটু হেসে বল্লে, "গায়ে পা লাগল বুঝি? মাপ করবেন।"

গদাধর উত্তর করলেন "না, দোষ আমারই। আপনার ঘুমটা আচম্‌কা ভেঙে দিলাম, কিছু মনে করবেন না।"

"ঘুমিয়েছি অনেকক্ষণ, আপনি বরং চান তো একটু গড়িয়ে নিন।" লোকটির বয়স বেশী নয়। আজকালকার যুবকরা অপরিচিত লোকদের সঙ্গে ভদ্রতা করে কথা বলে এ কথা গদাধরের জানা ছিল না। একটু খুসী হয়েই বল্লেন, "কিছু দরকার নেই, এইত বেশ আরাম করে বসেছি।"

গদাধরবাবু আরাম করে বসাতেই বেঞ্চির আধখানা গেল। বাকীটুকুতে যুবকটি পা তুলে, আধশোওয়া হয়ে রইল।

কিছুক্ষণ দুজনেই চুপচাপ। এই অবসরে দুজনেই দুজনকে ভাল করে পর্য্যবেক্ষণ করে নিলেন। যুবকটি সুশ্রী, রং উজ্জ্বল শ্যাম। ছিপ-ছিপে গড়ন। কেশ, বেশ, অযত্ন-সজ্জিত। একটু পরে যুবকটি হঠাৎ সোজা হয়ে বসে সার্টের পকেটগুলো হাতড়ে গদাধরের দিকে চেয়ে আবার একটু হেসে বল্লে, "একটা সিগারেট দিতে পারেন? আমার গুলো সব ফুরিয়ে গেছে।" গদাধরের কোনরকম পান দোষই নেই, সে কথা জানালেন। তারপর একটু হতাশ সুরেই বল্লেন, "যে দিনকাল পড়েছে মশায়, ভাত খাবারই পয়সা জোটে না, তা নেশা করা।" যুবকের সহানুভূতিসূচক দৃষ্টি দেকে আর থাকতে পারলেন না। জীবনের দুঃখের কাহিনী আদ্যোপান্ত বলতে সুরু করে দিলেন।

অবস্থা কোনও কালেই খুব সচ্ছল ছিল না। ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে ভাগ্যক্রমে মার্চ্চেণ্ট অফিসে কেরাণীগিরিতে ভর্ত্তি হয়েছিলেন। এতদিনে আশীটাকা মাইনে হয়েছিল। হঠাৎ 'ডিপ্রেশন', 'রিট্রেঞ্চমেণ্ট' ইত্যাদি অজুহাতে চাকরী থেকে বরখাস্ত করেছে। কাজে কাজেই সহরের বাস উঠাতে হয়েছে। শালার অবস্থা ভাল, সে বোনের কষ্ট দেখে আশ্রয় দিতে চাইল। গদাধর উপায়ান্তর না দেখে স্ত্রীপুত্রকে সেখানে রেখে এসেছেন, নিজে আর কোন্ লজ্জায় সেখানে থাকেন। কলকাতায় চাকরী চাইলেও বা পাওয়া যেতে পারে কিন্তু মাইনে পাওয়া যায় না। অগত্যা এক বাড়ীতে আহার ও দাওয়ায় একখানা ভাঙা তক্তপোষ, এই চুক্তিতে বাজার সরকারের কাজ পেয়েছেন।

এত কথা বলে গদাধর একটু হাঁপিয়ে পড়েছিলেন। খানিক জিরিয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বল্লেন, "নিজের বলতে একটি পয়সা নেই মশায় অথচ খাটুনী কিছু কম নয়। খেয়ে মনে করলুম একটু বিশ্রাম করব, তার জো নেই। আজ দাওয়াটায় চাকরদের জুয়োর আড্ডা বসেছে; ঘুমোয় কার সাধ্য!" বলে' উত্তরের অপেক্ষায় যুবকের মুখের দিকে চাইলেন।

"তা' যা বলেছেন মশাই, দিনকাল যা পড়েছে তাতে প্রতিদিন একবেলা আহার জোটাই দায়।"

সায় পেয়ে গদাধরের দুঃখ যেন কিছু লাঘব হ'ল। বল্লেন "এতক্ষণ তো নিজের কথাই বল্লাম—মশায়ের নামটি জিজ্ঞাসা করতে পারি?"

"স্বচ্ছন্দে! আমার নাম শচীনাথ রায় চৌধুরী।"

"নিবাস?"

"আপাততঃ এই পার্কে। দিনক্ষণ বুঝে স্থান পরিবর্ত্তন করি।"

এরূপ অপ্রত্যাশিত উত্তরে গদাধরবাবু হতভম্ব হয়ে রইলেন। খানিক পরে আবার জিজ্ঞাসা করলেন, "কাজকর্ম্ম কিছু করা হয় কি?"

"তা একটু আধটু করা হয় বৈকি।"

"কোনও আপিস টাপিসে, না ব্যবসা ট্যাবসা আছে?"

"ব্যবসাই বলতে হবে, তবে আপিস যেতে হয় না।"

"ইনসিওরেন্সের দালাল বুঝি?"

"আজ্ঞে, না।"

গদাধরবাবু আর জিজ্ঞাসা করতে সাহস পেলেন না। যুবকটি নিজেই বল্লে, "আচ্ছা, এবার তাহ'লে ওঠা যাক্; এখনও খাওয়া হয়নি —চেষ্টা দেখি গে। আবার দেখা হবে।" বলে বেঞ্চ থেকে উঠে দ্রুতপদে অন্তর্হিত হ'ল। গদাধরবাবু কিয়ৎকাল চুপ করে থেকে বল্লেন "অদ্ভুত লোক!" তারপর উঠে বাড়ীমুখো রওনা হলেন।

দুদিন বাদে সেই পার্কেই সন্ধ্যাবেলা একটা বেঞ্চিতে আবার দেখা হ'ল দুজনের। এবারে যুবকটির হাতে ছিল একটা সিগারেট। তার ধোঁয়া ছাড়ার রকম দেখে মনে হ'ল যেন স্বর্গসুখ অনুভব করছে,— চেহারা যদিও আগেকার মতই উস্কোখুস্কো।

"ভালো আছেন ?" বলে গদাধর গিয়ে বসলেন তার পাশে।

"আছি, এই পর্য্যন্ত জানি, ভাল কি মন্দ ভেবে দেখবার সময় পাইনি।"

কিছুক্ষণ বর্ত্তমান অন্নসমস্যা সম্বন্ধে আলোচনাতে কাট্‌ল। যুবক বল্লে, "দিন কাল খারাপ সন্দেহ নেই, তবু বুদ্ধি খাটিয়ে চলতে পারলে অভাবের হাত থেকে কিছুটা বাঁচা যায়।"

বেঞ্চির সামনে দিয়ে অনেক লোক পাইচারী করছে। হঠাৎ কে বলে উঠ্‌ল, "গদাধরবাবু না ?"

"হ্যাঁ আমিই" বলে গদাধর উঠে দাঁড়িয়ে বক্তার মুখ দেখবার চেষ্টা করলেন।

"চিন্‌তে পারছেন না, আমি হরিপদ। আপনার সঙ্গে একটু জরুরী কথা ছিল। আসুন না, বেড়াতে বেড়াতে একটু নিরিবিলিতে কথা বলা যাবে।"

গদাধর দ্বিরুক্তি না করে, আগন্তুকের সঙ্গ নিলেন।

মার্চ্চেণ্ট অফিসে তাঁর টুলের পাশেই ছিল হরিপদর টুল। লোকে বল্‌ত হরিপদর যেরকম বুদ্ধি তাতে শীঘ্রই চেয়ারে প্রমোশন পাবে। ভবিষ্যদ্বাণী সফল হয়েছিল কিনা গদাধরের তা' দেখবার সুযোগ হয়নি।

গদাধর প্রায় আধঘণ্টা পরে ফিরে এসে দেখলেন শচীনাথ তখনও বেঞ্চে আড়ভাবে আসীন। তাঁকে দেখেই বলে উঠ্‌ল, "এত উত্তেজিত হবার মত কি হ'ল ?"

"উত্তেজিত ? তা' একটু উত্তেজিত হয়েছি বই কি—এরকম অবস্থায় পড়লে কে না হয় ?" বলে গদাধর হাঁপাতে লাগলেন।

"ব্যাপারটা কি জানতে পারি ?"

"আরে মশায়, আমাকে বলে কিনা জোচ্চুরি করতে! ওই যে লোকটি আমাকে ডেকে নিয়ে গেল, আপিসে আমার পাশেই বস্‌ত। ছোকরার বুদ্ধিসুদ্ধি আছে কিন্তু মনে যে এমন কুমৎলব তা' কে জানে। আমাকে বলে কিনা মিথ্যে কথা বলতে! আপিসের কতগুলো বদমায়েস মিলে

ক্যাশিয়ার ভূপতিবাবুর নাম জাল করে কিছু টাকা মারবার চেষ্টায় আছে। তাছাড়া ভূপতিবাবুর চাকরী গেলে হরিপদ হয়ত সে কাজটাও পেতে পারে। আমাকে বলে কিনা নগদ কয়েক শ টাকা পাওয়া যাবে, তাছাড়া আপিসে 'ভেকেন্সি' তো হবেই, তখন পুরোনো লোকই ওরা বেশী পছন্দ করবে।"

গদাধরবাবুর কথার প্রথম দিকটা শচীনাথ যেন একটু অন্যমনস্ক হয়েই শুনছিল, শেষের দিকে উঠে বস্‌ল। কথার শেষে সাগ্রহে জিজ্ঞেস করল, "তা এতে রাগ করবার কি আছে?—কত টাকা দিতে চেয়েছিল ওরা?"

গদাধরবাবুর কিছুক্ষণ বাক্যস্ফূর্ত্তি হ'ল না। এরকম লোকের প্রতি যে একটুও সহানুভূতি দেখিয়েছিলেন কি করে, ভেবে পেলেন না। কষ্টে বল্লেন, "মশায়কে ভদ্রলোক বলেই মনে করেছিলাম।"

কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে শচীনাথ বল্লে, "দেখুন, আমি আর্টিষ্ট।—জীবনটা আমার কাছে আর্ট। ছবিকে ভালো করে আঁকতে হ'লে তার সব জায়গায় সমান রং দিলে চলে না। কোথাও বেশী উজ্জ্বল, কোথাও ফিকে —'লাইট্ এণ্ড শেড্' আর কি। আপনাদের ভাষায় ভাল আর মন্দ। একটু ভেবে দেখলেই বুঝবেন ওসব পুরোনো 'থিওরী' আজকাল উল্‌টে গেছে। 'ময়্যাল আউটলুক্ চেঞ্জ' করছে। এই যে সই জাল করার কথা বল্লেন এর মধ্যেও আর্ট আছে। সমস্ত কাজটা সুসম্পন্ন করতে আইডিয়া দরকার, ডিজাইন দরকার। আমার সাহায্য যদি প্রয়োজন মনে করেন, বলতে দ্বিধা করবেন না। অনেকদিন আগে আমি একবার চেকে বাবার নাম সই করেছিলাম। অবশ্য বাবা টের পাওয়াতে টাকাটা আর পেলাম না। কিন্তু সইটা এত ভাল হয়েছিল, যে ব্যাঙ্কের লোকেরাও ধরতে পারেনি।" অতীত সাফল্যের স্মৃতিতে শচীর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌ল।

গদাধরবাবু এতক্ষণ ঈষৎ ব্যাদিত মুখে যুবকের কথা শুনছিলেন, যদিও সবটা বুঝছিলেন বলে মনে হচ্ছিল না। শেষে গলা যথাসম্ভব গম্ভীর করে বল্লেন, "থিওরী ফিওরী বুঝি না, এইটুকু জানি যে বরং দোরে দোরে ভিক্ষে করে খাব তবু জোচ্চুরি করতে পারব না।"

শচীনাথ কিছুক্ষণ কৌতুকপূর্ণ বিস্ময়ে গদাধরের দিকে চেয়ে রইল। "নিজেই বলছিলেন টাকাকড়ির অভাবে কষ্ট পাচ্ছেন—কাজকর্ম্ম নেই।

সুযোগকে যদি পায়ে ঠেলেন তো সে আর দ্বিতীয়বার আসে না। শুধু একটা মতের জন্যে এরকম করলেন! আমার ভাগ্যে এরকম একটা কিছু জোটে না!"

গদাধরবাবু সেখানে আর তিলমাত্র অপেক্ষা করলেন না। কিছুদিনের মত পার্কে আসাও বন্ধ করলেন। মাঝে মাঝে যে যুবকের কথা মনে না হ'ত এমন নয়। দুঃখও হ'ত—প্রথম প্রথম যুবকটিকে লেগেছিল ভালো, সে যে এমন হবে তা ভাবতেও পারেননি। ক'দিন পরে আবার পার্কে নিয়মিত সান্ধ্যভ্রমণ সুরু করলেন। একদিন হঠাৎ পরিচিত স্বর এল কানে "এই যে কেমন আছেন? অনেকদিন এদিকে আসেননি যে?" কাছে গিয়ে দেখেন শচীনাথ এবং পাশে একজন মধ্যবয়সী ভদ্রলোক। গদাধর আসতেই তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং শচীকে বললেন, "ভালো করে ভেবে দেখো বাবা, সম্পত্তিটা হেলায় হারাবে? আমি কর্ত্তাকে বলে আরও একদিন সময় চেয়ে নিয়েছি, কালকে আবার আসব, ওরকম খামখেয়ালী হ'লে কি চলে।"

শচীনাথ বিরক্তকণ্ঠে উত্তর করলে, "আপনাকে আর কষ্ট করে আসতে হবে না, কাকাবাবু! না, তো বলে দিয়েইছি, আমার আর মত বদলাবে না।" ভদ্রলোক বিনাবাক্যে চলে গেলেন।

গদাধর কিছু বুঝতে না পেরে শচীর পাশে বসলেন আস্তে আস্তে। রাস্তার গ্যাসের আলো এসে পড়েছে যুবকের মুখে। চেহারাটা যেন আজ একটু বেশী রুক্ষ দেখাচ্ছে। জিজ্ঞেস করলেন, "অসুখ বিসুখ করেছে নাকি? শরীরটা যেন খারাপ ঠেক্‌ছে?"

শচী বল্লে, "না, তেমন বিশেষ কিছু না। দু তিনদিন খাওয়া জোটেনি বল্লেই হয়, তাতেই বোধ হয় ওরকম দেখাচ্ছে। তার ওপর লোকে অনর্থক বিরক্ত করে।"

খাওয়া হয়নি শুনে গদাধরের মনটা আর্দ্র হয়ে উঠ্‌ল। বল্লেন, "কিছু মনে করবেন না শচীবাবু, ওই যে ভদ্রলোকটি এখানে বসে ছিলেন, আমি আসতেই চলে গেলেন, তিনি যেন টাকাকড়ির কথা বল্লেন বলেই মনে হ'ল?"

শচী বল্লে, "বলবেন না মশাই, উনি আমার আছে এক অন্যায় প্রস্তাব এনেছিলেন। রাজী হইনি বলেই তো আমার এই দুর্দ্দশা।"

গদাধরবাবুর মনে যুগপৎ আনন্দ ও অনুশোচনার উদ্রেক হ'ল। লোকটিকে তাহ'লে যত খারাপ মনে করেছিলেন তা' তো নয়। তবু সেদিনের ঘটনা সম্পূর্ণ ভুলতে পারেননি বলে বল্লেন, "সেদিন আমি অনর্থক উত্তেজিত হয়েছি বলেছিলেন। এখন নিজেই বুঝতে পারছেন তো অন্যায় কাজে মনে কিরকম গ্লানি আনে।

"আরে মশাই, আমার ব্যাপারটা ওরকমই নয়। সে প্রস্তাবনার চেয়ে এটা অনেক বেশী গুরুতর।"

অকল্প্য পাপের আশঙ্কায় গদাধরের মুখবর্ণ ঘনতর হয়ে উঠ্‌ল; কৌতূহলও অদম্য। ফিস্ ফিস্ করে বল্লেন, "পুলিশে খবর দিলেন না কেন ?"

যুবক ভগ্নস্বরে উত্তর দিল, "পুলিশে কিছু করতে পারবে না।"

গদাধর আর থাকতে পারলেন না। "মশায় কি হয়েছে বলুন না। খুন-খারাপি না কি ? আমার তো ভাবতেই গা কিরকম করছে।"

"তার চেয়েও খারাপ" বলে শচী ঘন ঘন চুলের ভেতর আঙ্গুল চালাতে লাগল।

তারপর গদাধরের দিকে চেয়ে বল্লে, "ব্যাপার বলি, শুনুন; ২৪পরগণার জমীদার গৌরীকান্ত রায় চৌধুরীর নাম শুনে থাক্‌বেন, আমি তাঁর বড় ছেলে। আমি যখন ছোট, তখনই বাবা তাঁর পুরোনো বন্ধু জমীদার পশুপতিবাবুর মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে দেবেন, প্রতিশ্রুতি দেন। ছেলেবেলা থেকেই আমার আর্টের দিকে ঝোঁক। এই আর্টিষ্টিক টেম্পারা-মেণ্টের জন্যেই আজ আমার এই দশা। ওঁদের সঙ্গে ঠিক খাপ খাইয়ে চলতে পারি নে। ওই যে ভদ্রলোকটিকে দেখলেন উনি হচ্ছেন আমার বাবার পুরোনো কর্ম্মচারী। ছোট থেকে দেখছি তাই কাকা ডাকি। ওঁকে দিয়ে বাবা বলে পাঠিয়েছেন যে, যদি পশুপতিবাবুর মেয়েকে বিয়ে করি তবেই সম্পত্তির আশা করতে পারব।"

গদাধর বল্লেন "এ তো অতি উত্তম কথা। সদ্বংশের মেয়ে, তাছাড়া

আপনার বিয়ের বয়সও হয়েছে—এতে মনোমালিন্যের কি হ'ল ?" শচীনাথ বল্লে, "বিয়েতে আমার অমত।"

"কেন ?"

"মেয়ে পছন্দ নয়। নিজেই দেখুন না, বুঝবেন কেন।" বলে পকেট থেকে একটা ফটো বার করে গদাধরকে দিল। গদাধর খানিক্ষণ দেখে বল্লেন, "আমি মশায় আগেকার কালের লোক, এখনকার দিনের প্রেম ফ্রেম বুঝি না ; তা না হ'লে এতো খাসা মেয়ে দেখছি।"

"খাসা মেয়ে ?"

"হ্যাঁ।"

"একে আপনি খাসা মেয়ে বলেন ? নাকটা দেখেছেন ?"

"কেন, নাকে কি হল ?"

"কি হ'ল কি! ওইতেই তো সব পণ্ড হ'ল! কিরকম খাঁদা দেখছেন না ?"

"খুব টিকোল নয় বটে, কিন্তু তাই বলে ওইটুকুর জন্যে সম্পত্তি খোয়াবেন ?"

"ওইটুকু ?"

"তাছাড়া কি! এদিকে যে জীবনধারণ করা অসম্ভব হয়ে উঠল।"

"চুলোয় যাক্ জীবনধারণ! না খেতে পেয়ে মরি সেও ভাল, তবু নাকবুঁচিকে বিয়ে করতে পারব না।" এই বলে শচী উঠে হন হন্ করে চলে গেল।

গদাধর হতভম্ববৎ কিয়ৎকাল বসে রইলেন। তারপর অস্ফুটস্বরে বল্লেন, "কি কাণ্ড।" বাড়ীর পথে ভাবতে ভাবতে চল্লেন যে তাঁর জীবনে যদি এই রকম সুযোগ আস্‌ত !

সুমন্ত্র মহলানবিশ

কবিতাগুচ্ছ

ক্ষণিক

চৈত্রের রাতে যে মাধবী মঞ্জরী
ঝ'রে গেল, তারে কেন লও সাজি ভ'রি ?
সে শুধিছে তার ধূলার চরম দেনা,
আজ বাদে কাল যাবেনা তো তারে চেনা।
মরু পথে যেতে পিপাসার সম্বল
গাগরি হইতে চলকিয়া পড়ে জল,
সে জলে বালুতে ফল কি ফলাতে পারো,
সে জলে কি তাপ মিটিবে কখনো কারো ?
যাহা দেওয়া নহে, যাহা শুধু অপচয়
তারে নিতে গেলে নেওয়া অনর্থ হয়।
ক্ষতির ধনেরে ক্ষয় হতে দেওয়া ভালো,
কুড়াতে কুড়াতে শুকায়ে সে হয় কালো।
হায় গো, ভাগ্য, ক্ষণিক করুণাভরে
যে হাসি যে ভাষা ছড়ায়েছ অনাদরে,
বক্ষে তাহারে সঞ্চয় করে রাখি,
ধূলা ছাড়া তার কিছুই রয়না বাকি।
নিমেষে নিমেষে ফুরায় যাহার দিন
চিরকাল কেন বহিব তাহার ঋণ ?
যাহা ভুলিবার তাহা নহে তুলিবার,
স্বপ্নের ফুলে কে গাঁথে গলার হার!
প্রতিপলকের নানা দেনা-পাওনায়
চলতি মেঘের রঙ্ বুলাইয়া যায়
জীবনের স্রোতে ; চল-তরঙ্গতলে
ছায়ার লেখন আঁকিয়া মুছিয়া চলে
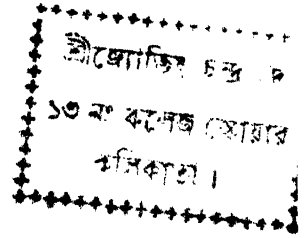
শিল্পের মায়া,—নির্ম্মম তার তুলি
আপনার ধন আপনি সে যায় ভুলি'।
বিস্মৃতি-পটে চিরবিচিত্র ছবি
লিখিয়া চলেছে ছায়া-আলোকের কবি।
হাসি-কান্নার নিত্য ভাসান খেলা
বহিয়া চলেছে বিধাতার অবহেলা।
নহে সে কৃপণ, রাখিতে যতন নাই,
খেলাপথে তার বিঘ্ন জমে না তাই।
মানো সেই লীলা, যাহা যায় যাহা আসে
পথ ছাড়ো তারে অকাতরে অনায়াসে।
আছে তবু নাই, তাই নাহি তার ভার,
ছেড়ে যেতে হবে, তাই তো মূল্য তার।
স্বর্গ হইতে যে সুধা নিত্য ঝরে
সে শুধু পথের, নহে সে ঘরের তরে।
তুমি ভরি লবে ক্ষণিকের অঞ্জলি,
স্রোতের প্রবাহ চিরদিন যাবে চলি'॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মানস সরোবর

হেমন্তের সান্দ্রঘন মধুরিমা ধরে তরুরাজি,
পঙ্কহীন বনবীথি আজি।
উপলবন্ধুর স্তব্ধ সরসীর পরিপূর্ণ বুকে
আশ্বিন-গোধূলিচ্ছায়া নীলাম্বর হেরিতেছে সুখে।
সে দীঘির কালোজলে শুভ্রপক্ষ মেলি'
হংসদল করে জলকেলি।

উনবিংশ হেমন্তের আনাগোনা শেষ হ'ল যবে,
সহসা হেরিনু কলরবে
ঝাপটি ঝঞ্ঝার পক্ষ ছত্রভঙ্গে বক্রপথ ধরি'
উড়ে গেল ঊর্দ্ধপানে হংসদল ছিন্নভিন্ন করি'
বলাকার চক্ররেখা ; ইন্দুলেখা প্রায়
নভো নীলে তা'রা ভেসে যায়।

সে অমল কুন্দকান্তি হংসযূথ হেরিতাম সুখে,
বড় ব্যথা বাজে আজি বুকে।
গোধূলিতে সরস্তীরে শুনিলাম প্রথম যখন
কলঘণ্টাধ্বনি সম তাহাদের পক্ষ বিধুনন,
লঘু পদভরে হ'ল গতি মৃদুতর,
সকলি লভিল রূপান্তর।

এখনো ভাসিয়া চলে হিমজলে ক্ষেপণীনিপুণ
শ্রান্তিহীন মরাল-মিথুন।
অথবা উড়িয়া যায় শূন্যপানে যুগলে যুগলে,
তরুণ হৃদয়গুলি পড়ে নাই জরার কবলে।
ভাবোন্মাদ জয়োল্লাস যেথা তারা যায়
তাহাদেরি সাথে সাথে ধায়।

আজি এ নিথর জলে তাহারা চলেছে ভেসে ভেসে
কুহুক-মধুর নিরুদ্দেশে।
কোন্ সরসীর তটে কিম্বা কোন্ পুষ্করিণী পারে
কুলায় বাঁধিবে তা'রা কাশগুল্মে রহস্য বিথারে,
দেখিবে অপর জনে, আমি শুধু জাগি'
হেরিব কি তাহারা বিবাগী ?

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

Yeats-এর Wild Swans at Coole হইতে।

তিনটি কবিতা

একদিন তুমি যাবে ভুলে,
প্রাণ তব উঠেছিল দুলে,
শরতের কোনও মধুরাতে
উছল, মদির জোছনাতে,—
চারিভিতে গাঢ় নীরবতা,
এলায়ে শিথিল দেহলতা
খোলা চুলে তুমি ছিলে শুয়ে,
আধেক তনুটী তব ছুঁয়ে
জোছনা আবেশে হল থির,
রোধ করি' পুলক অধীর।
সে রাতে কহনি মোরে কথা,
তবু প্রিয়া যেই নীরবতা
ফুটেছিল তব আঁখিপাতে
আশ্বিনের বিভল সে রাতে,
জীবনের শেষ পলে প্রিয়া
ওঠে যেন সে বাণী ধ্বনিয়া।
দিনান্তের পথশেষে যবে
আজিকার স্মৃতি শুধু রবে,
তোমারে বেসেছি কিনা ভাল
এ প্রশ্নের কূট তর্কজালও,
সে দিন খুলিতে হবে, জানি,
বিশীর্ণ ললাটে কর হানি' ;
বহুদূরে সে ম্লান গোধূলি—
আজিকে কেমনে বল ভুলি
ব্যথার কাঁপনে থর থর
পরাণে পুলক জর জর ?

নিম্নে শত শিকড়ের বিচিত্র প্রয়াস,—
তার ইতিহাস শুধু মূক মাটি জানে ;
ঊর্দ্ধে শত শাখা মেলি অধীর উল্লাস,
শ্যামল পল্লবে পুষ্পে,—তরুর এ দানে
স্পর্দ্ধিত গর্ব্বের নাহি লেশ,—এই তার
সফল আনন্দব্রত ; দিয়াছে আশ্রয়
বিহঙ্গমে, পেল গান ; দিল ফলভার।
স্নেহভরে, পেল বীজে জীবন অক্ষয়।
যেদিন সমাপ্ত হবে শতগ্রন্থিময়
বিড়ম্বিত শিকড়ের মর্ম্ম ইতিকথা,
কীটদষ্ট, রসহীন শেষ পরিচয়
নিভৃতে নিবিয়া যাবে,—অন্ধ নীরবতা
বিসর্পি' উঠিবে বিশ্বে ; শাখার যা দান
তখনও স্মরণপথে ছড়াবে কল্যাণ।
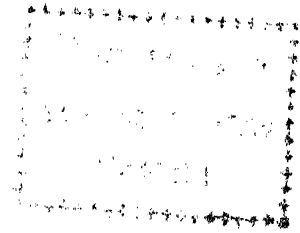
বেশী নয় শুধু দুটী বাহু দয়িতার,—
দেহবল্লরীর উদ্ভিন্ন শাখার সম
সাবলীল, পরশ-হরষ, মনোরম,—
তৃপ্তি শুধু মুগ্ধ নয়নের ; ভাষা তার
অর্থহীন কাকলীর অতি লঘুভার
বর্ণোজ্জ্বল প্রবঞ্চনাপাশে, অনুপম
বাহু দুটী ঘেরি' যেই বিস্ময় পরম,
তাহারে বাঁধিতে পারে ? ব্যথাহত কামনার

রূপরেখা আলিম্পন ইন্দ্রিয় প্রাঙ্গণে ;
রেখার বিন্যাস শুধু করিতে কি পারে
কোনও কবি ? ধ্বনিজালে রূপ পড়ে ধরা ?
অরূপ, নীরব মায়া, মনের অঙ্গনে
নিত্য যার ভাঙ্গাগড়া, বাঁধিবে তাহারে
চয়ন করিয়া শব্দ মিঠে, গালভরা ?

শ্রীদিলীপকুমার সান্যাল

প্রাচীর-পত্র

তিন রাস্তার প্রয়াগ যেখানে, যেখানে আলোর তুবড়ি জ্বলে,
উচ্চ প্রাচীর আর যেথা তারা, নামাবলী গায়ে গর্ব্ব করে—
নানা রঙে আঁকা তারা বহুরূপী, বিচিত্র তার নামের ঝুলি :
জুতা, প্রসাধন, নেতা, অভিনেতা, সভা ও ওষুধ করেছে ভীড়—
ট্রামে, রিক্সায়, গাড়ীতে, মোটরে দুপুর বিকাল মানুষ চলে,
কেহ চেয়ে পাঠ করে নাকো, কেহ সিনেমা-তারিখ আবার পড়ে,
রঙীন ছবিকে হয়তো বৃদ্ধ দেখে নেয় চোখে চশমা তুলি'
হেলা-অনাদরে রোদে পুড়ে' ফিকে জলে বিবর্ণ খেয়েছে চির্।

রাতে নাই ঘুম, কেহ না দেখিতে কারু অর্দ্ধেক পড়েছে ঢাকা—
কারু গলে দোলে আলোর মালিকা, আঁধারে আধেক অদেখা কেউ,
মোরে দেখো, মোরে দেখো সবে চায় মোর গায়ে রঙ্ বরং ভালো—
বিক্রি না-হওয়া জিনিষ দাঁড়ায়ে, শহরের পথে ভিক্ষা মাগে।
বেহালা পাচন, ভীমনাগ আর 'রেডিও', 'টু-লেট' কালীতে মাখা—
আঁটা খুলে গেছে, কারু বা আঁচল দোলাইয়া দেয় বাতাস ঢেউ,
ধোঁয়া কালী ভেদি' পথিক-দৃষ্টি করুণা মাগিয়া হইল কালো—
পথেতে জুতার ধূলি মুছিবারে কারুর ছিন্ন শরীর লাগে।

শ্রীসুশীলকুমার ঘোষ

শিখণ্ডীর গান

দেবুতাঁৎ

সভার মাঝে বহুলোকের ভিড়ে
তোমার মুখ ভাসিল মোর চোখে।
একটি কথা কহিলে তুমি ধীরে
সভার মাঝে বহুলোকের ভিড়ে।
একটু হাসি পাণ্ডু মুখটিরে
কী রূপ দিলো অনুপম এ লোকে!
সভার মাঝে বহুলোকের ভিড়ে
তোমার মুখ ভাসিল মোর চোখে।

ডিমের মতো, পাণ্ডু তব মুখে
কি কথা পাই? নাই বা হলো ভাষা।
হঠাৎ মন কি জানি কিবা সুখে
ডিমের মতো পাণ্ডু তব মুখে
কাহারে পেয়ে নিরালা কোনো nook-এ
তোমারে চাহে—এ নহে ভালোবাসা।

কহিলে তুমি—কহিলে তুমি কি যে!
আবহাওয়া নিয়ে ভাবনাহীন কথা—
দিনটা আজ নরম মেঘে ভিজে
কহিলে তুমি, কহিলে তুমি কি যে!
এই তো কথা, ভাসায়ে দিই নিজে
আবেশবশে, কথায় মাদকতা!

সে রেশ কাণে এখনো বাসা বেঁধে
সে মুখ চোখে এখনো ভেসে যায়।
মিসেস্ রায়! কি গোল গেলো বেধে!
সে রেশ কাণে এখনো বাসা বেঁধে

তাই তো চেয়েছিলুম এক জেদে—
অবোধ ভেবে গেলে যে চলে হায় !

তাকিয়ে দেখা—এই কি দোষ মোর ?
শিল্প শুধু, শিল্প শুধু দায়ী।
শিল্পভাবে—মুখ কি দুখে ভোর
তাকিয়ে দেখা—এই কি দোষ মোর ?
মুখের ছাঁচ বতিচেল্লি ঘোর।
প্রেমে পতন ছাড়া কি কিছু নাইই ?

কামারাদেরি

শীতের হাওয়ায় থরথর প্রিয় তনু ও কাঁপে !
শালটা আমার শালীনতা পেলো তোমার গায়ে।
মোটারের খোপে শীতের বাতাস—সে কার শাপে !
শীতের হাওয়ায় থরথর প্রিয় তনু ও কাঁপে।
—তুমি যে কাঁপবে—তোমার এ কথা খুসিতে ছাপে।
তাই আধাআধি দোঁহে জড়ালুম সন্ধ্যাছায়ে।

প্রকৃতির ছায়ে বনভোজন

যদিচ মামুলি—তবুও ট্রেনে
মিলব উভয়ে—কি বলো তুমি ?
মা-কে তো ভোলাবে বুলাকে এনে ?
যদিচ মামুলি—তবুও ট্রেনে
বুলার টিকিট আমিই টেনে
বসব উভয়ে—কি বলো, সুমি ?

কথকতা

ভস্মঅপমানশয্যা ছেড়ে, পুষ্পধনু !
দিকে দিকে ঘুরে বেড়াও ডন্‌জুয়ানের বেশে !
গন্ধমাদন এনে দিলে বৃথায় কে সে হনু ?
হে অতনু, তনুবিহীন বেড়াও দেশে দেশে !

ডন্‌জুয়ান্‌ও গিয়েছে মরে' হলো অনেকদিন
ঊর্দ্ধবাহু সেকালের সে তপস্বীদের সাথে।
মরেছে বটে—স্বর্গ তথা নরকও নারীহীন
(শাস্ত্র বলে) ডনের নেই শান্তি আত্মাতে।

ডনের প্রেত শরীরহীন ঘুরে বেড়ায় আজো
ড্রয়িংরুমে—হে অতনু !　বীরতনুতে সাজো।

এট্যাক্‌সিয়া

বাসো নাকো ভালো ? নাই বা বাস্‌লে, অলকাবসু,
তোমার চোখের ধূসর চাওয়ায়, স্বল্প কেশে,
তোমার তুষারে সন্ধ্যার মেঘ ছিটানো রঙে
তোমার দীর্ঘ সুঠাম শরীরে, পাৎলা ঠোঁটে
লালের আমেজে, শাড়ী জড়ানোর নতুন ঢঙে,
তোমার শাণিত মুখের ভাষায়, সাবেকী ভীরু
হৃদয়ের ভয়ে, গতশতকের স্বাধীনভাবে

—সবেতে তোমার—মানি, শেরি, মানি—মুগ্ধই হই।
কিন্তু আমি যে শ্রান্ত বড়োই, ক্লান্ত বড়ো,
কার্নিভাল্‌ এ জীবনে আমার পায় আজ ঘুম।

মন যে আমার জীবনের ট্রেণে দূরের দিকে,
দেয়ালিভ্রান্ত হাঁ করে' দাঁড়াবো, সময় কোথা ?
সে শিখা অথবা শাব্‌লিমেশানো দেয়ালি প্রেমে
সে খেলারই শুধু ছদ্মবেশ এ, তোমার শিখা
এ ফুলঝুরির স্তুতি করি, তার সময় কোথা ?

জীবনের পীচে পাই নাকো স্বাদ, প্রেমে অবসাদ
তোমায় স্তুতির, পাশে পাশে সদা ঘুরিবার মন
হারায়েছি কবে ? কিশোর বয়স কেটেছে যবে ?
সময় ও মন প্রেম করিবার নাই আর হায় ।
ভালোবাসোনাকো ? নাই বা বাস্‌লে, অলকাবসু,
সেকালের শেরি, বেচারি বোঝো না কামারাদেরি ।

রিফ্লেক্‌স্‌

ভয়চকিতা হরিণী হোয়ো নাকো
মনের কথা বল্‌লে পরে আমি ।
মামুলি ঢং ক্ষণেক ভুলে' থাকো,
ভয়চকিতা হরিণী হোয়ো নাকো,
মিনতি করি, কথা আমার রাখো,
আলাপ করো, নাই হলুম স্বামী ।

কথকতা

প্লেটো তো পড়েছি, তবু
বুঝিনি কো সুরেশের—
মানস জীবন ।
সে কি খুঁজে খুঁজে ফেরে
এ সহরে
খোঁপার ছায়ায়

কেশগুণ্ঠ কাণে কাণে
চুড়ির নিক্কণে
অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহে, হাতে হাত ভিড়ে
ডায়োটাইমা ? সক্রেটিস্ খুঁজেছে যেমন ?
কি বলেন বার্টাণ্ড্ রাসেল ?
মার্কিণী বেন্ লিন্‌সে বা ?

ছিল দুই কবি, দুই (যতদূর জানি
প্রকাশ্যে) কুমার—
ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ আর কোলরিজ্
তাদেরে বাঁচালো, পথ দেখালো যেজন
অষ্টাদশ শতকের ক্লেদসিক্ত বুদোয়ার্, বিপ্লবের
দাবদাহ থেকে,
জাগ্রত নয়ন, মন প্রজ্ঞাসুকুমার,
নাম তার—
শ্লেগেল্ হেগেল্ নয়
ডরথিই নাম জানি তার।
ডরথি যে নেই এই লিলি রমা অলকার ভিড়ে
গ্রামোফোন সঙ্গীতের ইন্দ্রজালে বিচিত্র সন্ধ্যায়
গোধূলিমায়ায় মুগ্ধ মোটারের সিটে,
চুম্বনতাড়নাকম্প্রবায়ু সিনেমায়
মেলে নাকো ডায়োটাইমা, তার কিছু আছে কি প্রমাণ ?

অফিস্ প্রহরে স্তব্ধ বিজন দুপুরে
নিরালা সোফায় তার লোটায় না রঙীন আঁচল
একথা বলা কি যায় গীতা ছুঁয়ে জোরে ?

তাই
যদি সুরেশের মন ভিদালের মতো সদা ঘোরে
আধুনিক ভিদালের দীপ্তিহীন কাব্যহারা একাধিক নিষ্ঠার পিছনে
আধুনিক বাঙালী সহরে—
সুরেশের অবসরক্ষয়ের ধরণ
তাই,
সুরেশের মানস জীবন।

হৃদয়স্বসা

তোমার মিতালি মিলাও, গ্রহেরা করুক গান
হ্যারিয়েট্ নও, তুমি প্রাণশিখা, হে এমিলিয়া।
মিলাও মিলাও অম্লজান ও বাষ্পজান
তোমার মিতালি মিলাও গ্রহেরা করুক্ গান
ক্ষতবিশ্বেরে করুক শান্তিসলিল দান
ধনীশ্রমিকের সমস্যাদাহ এ মরমিয়া
মিতালি মিলাক্, অণুরা ধরুক ঐক্যতান
হ্যারিয়েট্ নও, তুমি প্রাণশিখা, হে এমিলিয়া।

কথকতা

ওরে যাত্রী, গেছে কেটে যাক্ কেটে পুরাতন রাত্রি।
কারণ
যে প্রাচীরে উঠেছিলো হেলেন সে প্রাচীর তো ধূলিসাৎ
কোন্‌কালে ধূলায় ধূলায়। অরফিউস্ ফিরে গেছে বাঁচা গেছে
গীতশূন্য বৈতরণীতীরে পুনরায়। পেনেলোপি লুপ্ত হলো
কবেকার ভূগোলের কোন্ ইথাকায়।
সেকালের প্রেমগাথা জীবন মরণে গাঁথা মত্ত ঝঞ্ঝা-রাশি।
দুর্গম তাদের যাত্রা সংক্ষেপ জানে না, মাত্রা মানে না,
তাদের হাসি মৃদু নয়, বর্ব্বরের হাসি।

ব্রূনহিল্ডের স্বেচ্ছাচিতা বয়ে' আনে অলকায় অন্তিম গোধূলি।
ভালহালায় লেগে গেলো কল্কিজ্বালাদাবদাহ ব্রূন্‌হিল্ডের বিরিক্ত অঙ্গুলি।
সর্ব্বভুকে শেষ হলো বেশ হলো সীগ্‌ফ্রীডের দেবদেবীগুলি।
সেকালের প্রেমগাথা রক্তাক্ত সন্ধ্যায় গাঁথা চিত্ত ঝঞ্ঝারাশি।
ফ্রান্‌চেস্‌কার আর্ত্তনাদ বিধাতাকে ধন্যবাদ! আজকাল হয়ে গেছে বাসি।
কারণ
সেকালের চিত্তঝঞ্ঝা সেকালের স্থূলপেশীস্নায়ুরই পোষাতো আমার
জেনেছি শাঁস অন্তসার। ও অসার ভয়াবহ আলোড়ন বাইরের খোসা তো।
পালোয়ানি ছেড়ে তাই মৃজাপুরী ধূলোকাদা স্যানিটারি বাথরুমে ধুয়ে,
—হাত পা ভাঙেনা, ঘরে ভদ্রগোপনও বটে, ধূলোটুকু উড়ে যায় ফুঁয়ে—
গোবরগুহকে ছেড়ে স্যাণ্ডোকে ধরি তাই, প্রগতিকে জানাই প্রণাম।
গোয়টে বলেছে নাকি মানবতা লাভে সেরা শর্টকাট্‌ হৃদয়ের স্যাণ্ডো ব্যায়াম।

অথবা শোনো—
মানুষ যে পশু প্রমাণ তার
আহার তার।
মুখব্যাদান, দন্তবিকাশ, চর্ব্বণ, ঠোঁটে হাতে মাখামাখি
অজীর্ণতা
ইত্যাদি সব কী দারুণ রূঢ় বর্ব্বরতা!
জীন্‌স্‌, স্টোপ্‌স্‌, লর্ড্‌ রাসেল্‌, হাকিম লিন্‌সে, কুয়ে!
ধন্য হয়েছে বিজ্ঞান আজ আমাদের কাল!
জীবযাত্রার যুগ কেটে গেছে
তোমাদের এক মিলিত ফুঁয়ে।
গ্লুকোজ্‌ রয়েছে নব্য সুষ্ঠু নিরাপদ ভোজ—
সুরেশ শোষণ করে তাই রোজ?

পঞ্চশরে দগ্ধ করে' করেছ একি সন্ন্যাসী
বিশ্বময় চলেছে তার ভোজ
মরমিয়া সুগন্ধ তার বাতাসে উঠে নিঃশ্বাসি'
সুরেশ শুধু খায় দেখি গ্লুকোজ্ !

তৃতীয় অঙ্ক

শোনো কাছে শোনো। কাণে কাণে কথা বলি
শ্রাবণদিনের ঘন সন্ধ্যার মেঘ।
দিনগুলি যায় ক্লান্তিতে উচ্ছলি'
শোনো কাছে শোনো, কাণে কাণে কথা বলি
হৃদয় যে হলো মেঘজগতের গলি
সে মেঘ কি নেবে, তব সখা সে আবেগ ?

শ্রীবিষ্ণু দে
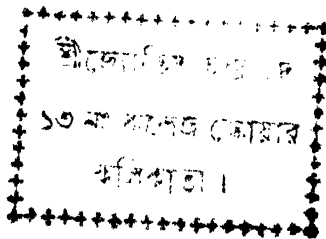
পুস্তক-পরিচয়

Encyclopaedia of Sexual Knowledge—By Drs. A. Willy, A Costler and others Edited. By Norman Haire. (Francis Aldor)

প্রথম বয়সে প্রকৃতিদেবী যে সমস্ত প্রাণী সৃষ্টি করেছিলেন তাদের স্ত্রীপুরুষভেদ ছিল না। তারা বংশবিস্তার করত আপনাকে বিভক্ত করে। দেখা গেল বংশ-বিস্তারের পক্ষে এই উপায় সুষ্ঠু হলেও বংশোন্নয়নের পক্ষে সুষ্ঠুতর উপায় আবশ্যক। তখন তিনি যে সকল প্রাণী সৃষ্টি করলেন তাদের এক-একজন দ্বিখণ্ডিত না হয়ে দুই-দুইজন সঙ্গত হলো। আর সেই সঙ্গম থেকে এলো তৃতীয়জন। যে দুইজন মিলে তৃতীয়কে জন্ম দিল তাদের একজনের কাজ হলো গর্ভাধান, অন্যজনের গর্ভধারণ। গর্ভাধান অপেক্ষাকৃত সহজ। তাই পুংপ্রাণী বোধ করল অপেক্ষাকৃত মুক্ত। সে পরীক্ষা করল, আবিষ্কার করল, উদ্যোগী হলো। তার অভিজ্ঞতা, তার পুরুষকার তার সন্তানে সঞ্চারিত হতে হতে বংশলক্ষণ গেল বদলে। বিবর্ত্তন একদিন মানববংশের পত্তন করল।

এক কথায় সেক্‌স্ হচ্ছে সেই যন্ত্র যা একজনকে করে গর্ভাধানক্ষম, অপরকে গর্ভধারণক্ষম। যন্ত্রটি সমগ্র শরীরের ভিতরে ও বাইরে এমন সুদৃঢ়ভাবে গ্রথিত যে, একখানা হাত কিংবা একখানা পা যেমন পরিচ্ছিন্ন সেক্‌স্ তেমন নয়। তার এত দিকে এত শাখাপ্রশাখা যে, তাকে একটি বিশেষ স্থানে নিবদ্ধ ভাবলে ভুল হয়। কেশ, স্তন, জঘন, কণ্ঠস্বর ইত্যাদি যা কিছু একজনকে স্ত্রী বলে ও অন্যকে পুং বলে চিনিয়ে দেয় তা সেক্‌সের অন্তর্গত। সেইজন্যে ইংরাজি সেক্‌স্ শব্দের পরিভাষা খুঁজে পাইনে। আর যাই হোক "যোনি" নয়।

সেক্‌সের উদ্দেশ্য তাহলে একাধারে বংশবিস্তার তথা বংশোন্নয়ন। কিন্তু তাই যদি সব হতো তবে প্রতিবারের মৈথুনে পুংমনুষ্যের উরস হতে ছাব্বিশ কোটি শুক্র-কীট নির্গত হতো না। নারীর গর্ভধারণক্ষমতার সীমা আছে। সারা জীবনে একটি নারী খুব বেশী করে ধরলেও যমজ ইত্যাদি মিলিয়ে একশোটি সন্তানের মা হতে পারে। অথচ সারা জীবনে একটি পুরুষের উরস থেকে খুব কম করে ধরলেও ছাব্বিশ হাজার কোটি শুক্রকীট চালান যায়। আমদানি ও রপ্তানির এই যে ঘোরতর অসামঞ্জস্য, এই যে এক দিকে একশো, অন্যদিকে ছাব্বিশ হাজার কোটি এর কি কোনো জবাবদিহি নেই?

ছাব্বিশ কোটি শুক্রকীটের অস্তিত্ব সাধারণ মানুষের অজ্ঞাত। কিন্তু সাধারণ মানুষ বেশ বোঝে যে শুক্রই পুরুষের তেজ। এর অতি সামান্য পরিমাণ ব্যয় করলে প্রকৃতির কার্য্যসিদ্ধি, অর্থাৎ বংশরক্ষা, হতে পারে। তবে কেন প্রকৃতি অপরিমিত স্ত্রীসম্ভোগের প্রবর্ত্তনা দেয়, কেন দেয় দুর্ব্বার কামপ্রেরণা, তৃপ্তি যার নেই? যা প্রতি রাত্রে নূতন, যা বছরে কি দু বছরে মাত্র একটিবার সফল?

আর্য্য ঋষিরা শুক্রব্যয়ের একটা রুটিন তৈরি করেছিলেন। পঁচিশ বছর বয়স না হলে ব্রহ্মচর্য্য ভঙ্গ করতেন না, পঞ্চাশ বছর বয়স হলে গার্হস্থ্য শেষ। ভোগের সময় বলে নির্দ্দিষ্ট পঁচিশ বছরের মধ্যে কত যে নিষেধ নিপাতন, কত যে অননুমোদিত বার ব্রত তিথি প্রহর, পাঁজিতে এখনো তার তালিকা থাকে।

কিন্তু তাতে করে প্রকৃতির কাছে জবাবদিহি পাওয়া গেল না। তাতে কতকটা আত্মরক্ষা হলো, কিন্তু জিজ্ঞাসার হলো না নিরসন। তাই প্রকৃতির উপর জাত হলো তীব্রতম অভিমান। বৌদ্ধদের "থেরী গাথা" যাঁরা পাঠ করেছেন তাঁরা লক্ষ্য করেছেন মৈথুনের প্রতি কি অপরিসীম বিরাগ, বংশরক্ষার প্রতি কি নির্ম্মম ঔদাসীন্য। স্বামীসন্তান ত্যাগ করে কি অপার মুক্তি বোধ। "থেরী গাথা" নারীদের রচনা। পুরুষদের রচনাতে বোধ করি অধিকতর আশ্বস্তি প্রকাশিত হয়েছিল। কেননা সম্ভোগে নারীর তেমন ক্ষয় নেই পুরুষের যেমন। নারীর ক্ষয় গর্ভধারণে। তা নিয়ে অভিমান করার কিছু নেই, জিজ্ঞাসার কিছু নেই। নারী জানে যে, প্রকৃতি তাকে সেই উদ্দেশ্যে নারী করেছে। পুরুষ কিন্তু বুঝতে পারে না প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্ভোগে কেন তার মতি! বুঝতে না পারায় মতিকে মনে করে কুমতি, প্রবৃত্তিকে মনে করে পাপপ্রবৃত্তি।

বৌদ্ধদের অভিমান ক্রিশ্চানদের চিত্তে বর্ত্তায়। তারাও গোড়ার দিকে বংশ-রক্ষার আবশ্যক দেখল না। তাদের ধারণা ছিল The Kingdom of Heaven is at hand, স্বর্গরাজ্য এই এলো বলে, কি হবে পুত্রপৌত্র। স্বর্গরাজ্যের যতই দেরি হতে লাগল বাবাজিরা গৃহী শিষ্যদের ততই ছাড় দিতে থাকলেন। বল্লেন, "বেশ। তোমরা ক্ষুদ্র জীব। কর তোমরা তোমাদের জৈব ক্রিয়া সম্পাদন। তবে ভুলে যেও না, বাপধনরা, যে কাজটা পাপ। পাপেই তোমাদের উৎপত্তি। গর্ভধারণ ভালো জিনিষ। কিন্তু তার মহত্ব লোপ হলো যদি মৈথুনের দ্বারা তা সাধিত হলো। ইমাকুলেট্ কন্‌সেপ্‌শন্‌ই পুণ্য। কুমারসম্ভবের ইতর প্রক্রিয়া পাপ।"

এক দিকে যেমন অভিমানমূলক প্রকৃতিবিরুদ্ধতা সংসারত্যাগীদের দ্বারা প্রচারিত হলো অপর দিকে তেমনি আত্মরক্ষামূলক প্রকৃতিবিপর্য্যয় সম্ভোগবাদীদের দ্বারা আবিষ্কৃত হলো। নরনারীর সম্পর্কের নিবিড় মাধুর্য্য যারা একবার আস্বাদন করেছে তারা চেয়েছে তাকে চিরন্তন করতে। তারা চেয়েছে অনন্তযৌবন, অম্লান রূপ। তারা বলেছে, "নায়কনায়িকার নিত্য লীলা লোকোত্তর, মরণোত্তর। রতিবিহীন লীলাবিলাস কল্পনা করা যায় না। অথচ প্রাকৃত রতি নরনারী উভয়ের পক্ষে ক্ষয়কারক। পুরুষের অন্তর্হিত হয় তেজ। আর নারীর যদি সন্তান হয় তবে রূপ-লাবণ্য অবশিষ্ট থাকে না, স্ত্রীরোগে তার সম্ভোগ্যতা হানি হয়। অতএব চাই অপ্রাকৃত রতি। তার মানে মৈথুনকালে শুক্রধারণ।"

জগতের ইতিহাসে এ একটা বিপ্লব। নরম্যান হেয়ার নাকি একটি বক্তৃতায় ঘোষণা করেছিলেন যে, কণ্ট্রাসেপ্‌শন্ এ যুগের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার। কিন্তু এই আবিষ্কারের দ্বারা অক্ষয় যৌবনের সুরাহা হয়নি। যদি কোনো সুবিধা হয়ে থাকে তা নারীর। এদেশে সহজিয়াদের পদ্ধতি, ওদেশে Carezza পদ্ধতি, লোহাকে সোনা করার আলকেমি। সম্ভব হোক বা না হোক, সম্ভব বলে বহু লোক বিশ্বাস করে এসেছে, আজো করে।

বিপ্লব কেন বল্লুম তা বিশদ করি। নারীর উপর দার্শনিকদের বিদ্বেষ সেই সোক্রেটিসের যুগ থেকে গড়িয়ে আসছে। এঁরা পুরুষের সঙ্গে পুরুষের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের পক্ষপাতী। তাতে নেই সন্তানচিন্তা, তা বিশুদ্ধ আনন্দ। বেশ্যার সঙ্গে যে সম্পর্ক তাতেও সন্তানচিন্তা থাকে না বটে, কিন্তু তাতে বংশরক্ষার গন্ধ থাকে, সম্ভাব্যতা থাকে। নারীর সঙ্গে বংশরক্ষাকে দার্শনিকরা এমন অবিচ্ছেদ্য জ্ঞান করেছেন যে, নারীকেই বর্জ্জনীয় মনে করেছেন। "A married philosopher is ridiculous" নীটশের উপর আরোপিত এই উক্তির পশ্চাতে বৈরাগী মনোভাব নেই, বৈরাগ্য-সাধনে মুক্তি দার্শনিকের নয়। এর পশ্চাতে আছে প্লেটোনিক প্রেম, যাতে প্রিয়জনকে নিকটবর্ত্তী হতে দেয় না, দূরে দূরে রাখে। যদি না সে প্রিয়জন হয়ে থাকে সমজাতীয়, অর্থাৎ পুরুষের বেলায় পুরুষ।

এই বিপ্লবের ফলে নারীর মর্য্যাদা বৃদ্ধি পেলো। নারী হলো বান্ধবী, সঙ্গিনী, নায়িকা। সে যে প্রজনার্থং মহাভাগা, তার সঙ্গে যে পুরুষের সন্তানঘটিত ব্যবসায়, পুরুষের মনে এমনতর সন্দেহ রইল না। তাদের সম্পর্ক এক তৃতীয় মানদণ্ডে পরিমিত হলো না। নরনারী পরস্পরকে নূতন করে আবিষ্কার করল। ভারতবর্ষে রচিত হলো শ্রীমদ্‌ভাগবত, বৈষ্ণবপদাবলী। ইউরোপে ত্রুবাদুর-গীতিকা, বিভিন্ন রোমান্স-চক্র। পারস্যে সুফী কবিতা, ওমর খৈয়ম। স্মরতরসের উপর একটা দর্শন পর্য্যন্ত খাড়া হয়ে গেল। কোথাও এই দর্শন অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও অশরীরী। কোথাও তেমনি স্থূল ও নির্ল্লজ্জ। কোথাও বস্তুর মাত্রা বেশী। কোথাও ভাবের। কিন্তু সর্ব্বত্র এই একই বাণী। নরনারীর মিলন, জীবাত্মা পরমাত্মার মিলন, আপনাতে আপনি অবসিত। তার সাথে বংশরক্ষার সম্বন্ধ নেই, নেই তাতে পাপের গন্ধ। সেটা একটা means নয়, একটা end।

আধুনিক যুগে আমরা যত উপন্যাস পড়ি তাদের অধিকাংশই মিলনান্ত। নায়কনায়িকার মিলনের বাধা অপসারিত হলো, এইবার তাদের বিয়ে। অথবা নায়কনায়িকা অবশেষে প্রেমে পড়ল, এইবার তাদের সুখনীড় রচিত হবে। বংশরক্ষার ইঙ্গিত কুত্রাপি লক্ষিত হয় না। তাতে রসভঙ্গ হয়। উপন্যাসের জগতে সন্তানসন্ততি নেই। আছে চিরন্তন নর আর চিরন্তনী নারী।

তা বলে কোনো ঔপন্যাসিক সজ্ঞানে অপ্রাকৃত রতির জয়গান করেন না। তা করা সাহিত্যে অশোভন। তবু চণ্ডীদাসের রাগাত্মিক পদাবলী মনোযোগসহকারে অধ্যয়ন করলে সে জিনিষ হেঁয়ালী থাকে না। সাপের মুখেতে ভেকেরে নাচানো তখন আমাদের মুখে হাসি ফোটায়। সহজ সাধনার সঙ্কেত এইখানে। সহজিয়া গ্রন্থে সাঙ্কেতিক ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে সমাজরক্ষীদের চোখে ধূলো দিতে। ও ছাড়া উপায় ছিল না। আমাদের পাব্লিক পলিসী হচ্ছে "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা।" সহজিয়ারা চেয়েছিলেন পুত্রকে বাদ দিয়ে নারী। এবং সেই নারীতে ও সেই নারীর সঙ্গে অক্ষয় যৌবন। Carezzaর ইতিহাস আমার জানা নেই। অনুমান হয় ত্রুবাদুর যুগেই এর আবিষ্কার। ত্রুবাদুর যুগ সহজিয়া যুগের সমকালীন। ইতিহাসে এ যুগের মূল্য, এ যুগ শিভ্যাল্‌রির যুগ। নারীসম্ভ্রমের যুগ। প্লেটোনিক প্রেমে নারীর প্রতি সম্ভ্রম ছিল না, কেননা নারীর যেখানে নারীত্ব সে দিক দিয়ে প্লেটোনিক প্রেম যেত না। প্লেটোনিক প্রেম স্ত্রীপুরুষ-বিভেদহীন ব্যক্তিত্ব-অভিমুখ।

আধুনিক যুগের বিজ্ঞানসিদ্ধ ভাবুকদের অভিমত এই যে ইন্দ্রিয়জ আনন্দ পাপ নয়, এর সঙ্গে বংশরক্ষার দায়িত্ব অবশ্যসংলিপ্ত নয়, মানবের অন্তরে সম্ভোগবাসনা ও সন্তানবাসনা পরিচ্ছিন্ন ভাবে বিদ্যমান, যখন যেটির চরিতার্থতার ইচ্ছা হবে তখন সেটির চরিতার্থতা ঘটতে পারে। শুক্রের স্বাভাবিক নির্গম রোধ করা স্বাস্থ্যের পক্ষে ভয়ঙ্কর। অথচ শুক্রের নিম্নগতি নিবারণ না করলে যে সামর্থ্য ক্ষয় হবেই এমন কোনো ভয় নেই। শুক্র সম্বন্ধে সদ্ব্যবস্থা হচ্ছে সংযত ব্যয়, এর ফলে যদি সন্তান হবার আশঙ্কা থাকে তবে তার প্রতিষেধক কন্ট্রাসেপ্শনের বহুতর প্রণালী। আর যদি যৌবন অপগত হয় তবে যৌবন ফিরে পাওয়া অপারেশন-সাধ্য। উভয়ের বিবরণ আছে আমাদের আলোচ্য গ্রন্থে।

আলোচ্য গ্রন্থের নামকরণ করা যেতে পারে নব কামশাস্ত্র। লেখকগণ বিশেষজ্ঞ। এঁরা নরনারীর প্রাকৃত রতিরই পক্ষপাতী। সেই রতি যাতে সর্ব্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ হয় তার জন্য এঁরা দেশবিদেশের কামশাস্ত্র তুলনা করে তাদের অভ্যন্তরে যা বিজ্ঞানসম্মত তাই সঙ্কলন করেছেন। আমাদের "কামসূত্র" ও "অনঙ্গরাগ" বাদ যায়নি। দুই পক্ষের এক পক্ষ যদি সম্ভোগের জন্য প্রস্তুত বা ইচ্ছুক না থাকে তবে কেমন করে তাকে প্রস্তুত বা ইচ্ছুক করে নিতে হয় এবিষয়ে প্রাচীনরা যা লিপিবদ্ধ করে গেছেন তাই একরকম মানবের চরম বিজ্ঞতা। একদা আমার হাতে একখানি প্রাচীন পটের বই পড়েছিল, তাতে ছিল ৬৪ "বন্ধ" বা শৃঙ্গারকালীন সংস্থান। লেখকেরা আমাদের শাস্ত্র থেকে কয়েকটি "বন্ধ" বাছাই করেছেন, প্রধানত জন্ম-নিয়ন্ত্রণের প্রতি দৃষ্টি রেখে। প্রাচীন অঙ্গরাগ ও উদ্দীপক ঔষধাদিও আলোচনার বিষয়ীভূত হয়েছে। বিভিন্ন দেশের মূঢ়তা ও বিজ্ঞতা বিজ্ঞানের নিকষে পরীক্ষিত হয়েছে।

নব কামশাস্ত্রের এইখানেই শেষ নয়। নব কামশাস্ত্র অনন্তপার। তাকে এই বিষ্ণুশর্ম্মারা সাধারণ পাঠকের গ্রহণোপযোগী আকার দিয়েছেন। পুরুষের অঙ্গ ও নারীর অঙ্গ সম্বন্ধে শরীরবিজ্ঞানে যা থাকে তাও রয়েছে এতে। তারপর নরনারীর বিভিন্ন বয়সে অঙ্গের যে সকল পরিবর্ত্তন হয়, বয়ঃসন্ধি, নারীর মাসিক গতি, নারীর অস্তগোধূলি (menopause) ইত্যাদিও আধুনিক কামশাস্ত্রের অন্তর্গত।

বংশরক্ষার দিকটাও ভুলে যাবার নয়। ধাত্রীবিদ্যার এলাকায় যেসব তথ্যের বাস তারাও নব কামশাস্ত্রের প্রজা।

নরনারী ভোগক্ষম হবার পূর্ব্বে তাদের মধ্যে ভোগেচ্ছা জাত হয়ে থাকে। এর পরিপূর্ত্তি হয় আত্মমৈথুনে। ইতর প্রাণীদের মধ্যে এই অভ্যাস লক্ষিত হয়। প্রাচীন গ্রীকদের মধ্যে এর বহুল প্রচলন ছিল। কিন্তু বহুলতর প্রচলন হয় মধ্যযুগের খ্রীষ্টীয় জগতে। আধুনিক ইউরোপেও এই অভ্যাস অতি ব্যাপক। এ সম্বন্ধে সাধারণের যে ভীতি তা নরম্যান হেয়ারের মতে অলীক। "Masturbation is a normal phenomenon which appears in the vast majority of healthy children, as well as in young adults who are, for one reason or another, unable to obtain the normal satisfaction of this sexual appetite.

মৈথুন যদিও নরনারীর স্বাভাবিক লক্ষ্য তবু এই লক্ষ্যের বিকার একটি সুপরিচিত

সত্য। নব কামশাস্ত্রে মৈথুনের বিকৃতি বিকল্প কেন ও কেমন করে ঘটে তার আলোচনা অবান্তর নয়। এর প্রতীকার চিকিৎসাসাধ্য। এত লোক যে সিনেমা দেখতে যায় তার মূলে রয়েছে অনাবৃত বা ক্ষীণাবৃত স্ত্রী-অঙ্গ দর্শন। চুম্বন, আলিঙ্গন, এমন কি মৈথুনও, কোনো কোনো স্থলে দেখানো হয়। দর্শনেই অনেকের তৃপ্তি। আবার কেউ কেউ তৃপ্তি পায় দর্শন করিয়ে। এই সব আপদ ইউরোপের বড় বড় পার্কে ও বালিকা বিদ্যালয়ের আনাচে কানাচে বেড়ায়। Masochism ও Sadism এই পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। ছাত্রদের প্রহার করা যে মৈথুনের বিকার তা আমাদের মাষ্টার মশাইদের জানা দরকার।

নর যদিও নারীর স্বাভাবিক ভোগ্য ও নারী যদিও নরের তবু ভোগ্যের বিকারও আর একটি সুপরিচিত সত্য। নব কামশাস্ত্র একে পরিহার করতে পারে না। এও প্রতিবিধানযোগ্য। হোমোসেক্সুয়ালিটি সেই প্রাচীন গ্রীস থেকে চলে আসছে। ইতর প্রাণীদের ভিতর এর অস্তিত্ব উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কত বড় বড় দার্শনিক, কবি ও চিত্রকর যে হোমোসেক্সুয়াল তার লেখাজোখা নেই। এ সম্বন্ধে এক শ্রেণীর বিশেষজ্ঞের মত এটা জন্মগত। এর প্রতি প্রবণতা নিয়ে অনেকে ভূমিষ্ঠ হয়। অন্যান্যদের মতে এটা আকস্মিক ও এর অন্ত আছে। কতক লোক আছে তারা শিশুসম্ভোগী, কেউ কেউ শবসম্ভোগী। কারুর কারুর আবার বুড়ো বর বা বুড়ী বৌ পছন্দ। এমনও লোক আছে যাদের দুনিয়ায় কারুকে ভালো লাগে না, আপনাকে ছাড়া। এরা নার্সিষ্ট। প্রাচীন কাল থেকে এক প্রকার মানুষ আছে যারা মানুষের চেয়ে পশু-পাখীর পক্ষপাতী। এদের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নয়। অল্প হলে পুরাণে এত বার এদের উল্লেখ থাকত কেন ?

সবচেয়ে মজার লোক হচ্ছে তারা যারা প্রাণীলোকের বাইরে থেকে ভোগ্য আহরণ করে। এদের ভোগ্যকে বলা হয় "Fetich"। ফেটিশ যে কত রকম তার সুমারি নেই। এক ভদ্রলোক রাস্তায় ঘুরে ঘুরে দেখতেন কার জুতো সব চেয়ে ময়লা। তাকে ঘরে ডেকে এনে তার জুতো চিবোতেন, তাতে তাঁর উত্তেজনার পরাকাষ্ঠা ঘটত। আর এক ভদ্রলোক লুকিয়ে মেয়েদের পোষাকের ক্যাটালগ থেকে ছবি কেটে কেটে রাখতেন। মাঝে মাঝে তাই বুকে চেপে ধরলে তিনি মৈথুনের ফললাভ করতেন। ইনি একজন পাদ্রী এবং স্বামীহিসাবে বিশ্বস্ত।

নব কামশাস্ত্রে বেশ্যাবৃত্তিরও স্থান আছে। যারা বেশ্যা হয় তাদের অনেকে যে স্বভাবদোষে হয় তার সন্দেহ নেই। তাদের স্বভাব বহুস্থলে তাদের শরীর গঠনের ত্রুটি থেকে আগত। নরম্যান হেয়ার চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখাতে চান যে আধুনিক সমাজে পুংবেশ্যার আবির্ভাব হয়েছে। এর থেকে প্রমাণ হয় বেশ্যাবৃত্তির আদি উৎস স্বভাবদোষ বা শরীরবিন্যাস নয়, সামাজিক চাহিদা। তার মানে সমাজ চায় যে বেশ্যার দ্বারা সমাজের পুরুষদের (ইদানী পুংবেশ্যার দ্বারা সমাজের নারীদের) একটা অভাব মোচন হোক। সে অভাবটা কিসের? এক কথায় উত্তর দেওয়া কঠিন। কেবল অবিবাহিতরা যদি বেশ্যাগমন করত তবে বলতে পারা যেত মৈথুনের সুযোগের অভাব। কিন্তু বিবাহিতরাও যায়। কেবল প্রবাসীরা যদি বাসায় খেয়ে অন্যত্র রাত কাটাত তবে বলা চলত, সঙ্গে স্ত্রী নেই, সুতরাং। কিন্তু স্থানীয় অধিবাসীরাও যায়। বল্লে চুকে যায় যে যাদের স্বভাব খারাপ তারা সতী স্ত্রীকে অবহেলা করে গোল্লায় যাবেই ত, না গেলে

আমরা নভেল লিখিব কি নিয়ে? কিন্তু ইতিহাসে লিখছে অনেক ভালো ভালো লোকেরও এ দুর্মতি হতো। এবং হয়।

বেশ্যা শব্দের উৎপত্তিগত অর্থ সাধারণের ভোগ্যা, পাব্লিক উওম্যান। সমাজ যখন প্রাইভেট প্রপার্টির ভিত্তির উপর ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠিত হয় তখন নারীরও দুই ভাগ হয়। এক ভাগ প্রাইভেট, বিবাহের দ্বারা তাদের দখল স্বত্ব সাব্যস্ত হয়। আর এক ভাগ পাব্লিক। তারা সমাজের এজমালি সম্পত্তি, তাতে বারোয়ারির অধিকার, তারা বারবনিতা। জমি যেমন প্রত্যেকের নিজের নিজের, আর রাস্তাগুলি সাধারণের ব্যবহার্য্য, কুলাঙ্গনা ও বারাঙ্গনা তেমনি। প্রাচীন কালের মহাপুরুষরা বেশ্যালয়ে আসর জমাতেন, বেশ্যার কাছে সহবৎ শিখতেন, বেশ্যার পরামর্শ নিয়ে রাজ্য চালাতেন। কোনো দেশের পুরাণে বেশ্যার সঙ্গে নরকের সংস্রব নেই, বরং আছে মন্দিরের সংস্রব, স্বর্গের সংস্রব। নরকের উপমা এলো মধ্যযুগে, সন্নাসীর মস্তিষ্ক থেকে।

রূপের সঙ্গে রূপেয়ার সম্পর্ক বেশ্যার বেলা যেমন খাটে, বধূর বেলায়ও তেমনি। এই গ্রন্থের লেখকরা সেইজন্য বেশ্যাবৃত্তির সংজ্ঞা নিরূপণকালে বেশ্যার সঙ্গে টাকার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক স্বীকার করেননি। সমাজের প্রত্যেক স্তরে বিবাহও একটা বেচাকেনা, কোথাও সাক্ষাৎ ভাবে, কোথাও তলে তলে। বাড়ী করতে যেমন খরচ আছে, গাড়ী করতেও তেমনি।

আসল কথা হচ্ছে এই যে, মানুষ বৈচিত্র্য চায়। আর বিকারের প্রতিও অনেকের নেশা। যারা সুন্দরী স্ত্রী ফেলে বেশ্যার কাছে যায় তারা হয়ত চায় রুচির বদল, হয়ত চায় এমন সব খেয়ালের চরিতার্থতা ভদ্র মেয়ে যার জোগান দিতে পারে না। কেউ গান শুনতে, কেউ নাচ দেখতে, কেউ মাতলামি করতে, কেউ রকমারি "বন্ধ"-ধন্দের সমাধান করতে যায়। কারুর কারুর খেয়াল এমন বীভৎস যে উল্লেখ করতে লজ্জা করে। যদিও আমার এই প্রবন্ধে লজ্জাশীলতার আদর্শ রক্ষিত হয়নি।

বেশ্যার বিলোপ নেই। পরন্তু পুংবেশ্যার সূত্রপাত হয়েছে। একালের নারীরও ত খেয়াল আছে, আর আছে খেয়াল মেটাবার স্বাধীনতা। দারিদ্র্যের অস্তিত্ব যত কাল থাকবে বেশ্যা ততকাল থাকবে। কিন্তু দারিদ্র্য ত আপেক্ষিক। যার লাখ টাকা আছে সেও ক্রোড়পতির তুলনায় দরিদ্র। সাম্যবাদের দেশে বেশ্যাবৃত্তি রহিত হয়েছে দেখে আশা হয় সাম্যবাদ ব্যাপক হলে বেশ্যাবৃত্তি সংকীর্ণ হবে। কিন্তু সাম্যবাদের দেশেও খেয়ালী মানুষ অনেক থাকবে, তাদের খেয়াল একদিন চরিতার্থতার আয়োজন করে নেবেই। যদি ভাবীকালের চিকিৎসকরা এই সকল লোককে আরোগ্য করতে পারেন, যদি শিক্ষকরা এদের খেয়ালের খতিয়ান করে সেই অনুসারে শিক্ষার ব্যবস্থা করেন, যদি বিবাহ ও বিবাহচ্ছেদ প্রত্যেক ব্যক্তির রুচির ও রীতির দাবী মানে তবেই ভরসা করা যেতে পারে যে এই অবমানুষিক বৃত্তি, যা পশুদের মধ্যেও নেই, ক্রমে অপগত হবে। আপাতত বেশ্যাবৃত্তির দ্বারা সমাজের একটি উপকার হচ্ছে, sex education-এর অন্য স্কুল নেই।

সমাজের উপর বেশ্যার প্রতিশোধ যৌন ব্যাধি। এই ব্যাধিগুলি অতি প্রাচীনকাল হতে বিদ্যমান। বেশ্যাদের কাছ থেকে স্বামীরা এগুলি আমদানি

করে সতীদের উপহার দেন, পুত্রকন্যারা সেজন্য কৃতজ্ঞ থাকে। ইউরোপের কোনো কোনো দেশে বেশ্যাদের সরকারী ডাক্তার দিয়ে পরীক্ষা করানো হয়। কিন্তু সে পরীক্ষা নমো নমো করে দায় সারা গোছের। যৌন ব্যাধি দমন আধুনিক চিকিৎসাবিদ্যার অসাধ্য নয়। গবেষণার ফলে দুঃসাধ্যও নয়। কিন্তু উটপাখীর সঙ্গে মানুষের এ বিষয়ে কিছু সাদৃশ্য আছে। যা অনিষ্টকর তার সম্বন্ধে মানুষ স্বেচ্ছায় অন্ধ সাজতে চায়। "চুপ চুপ" নীতি বিশেষ করে যৌন ব্যাধির বেলায় সমাজের পরম হিতৈষীদেরকেও বোবা বানায়। সমাজ-রক্ষীদের দুর্ব্বুদ্ধিও সামান্য নয়। ব্যাধির ভয় যদি না থাকে তবে সবাই যে বেশ্যাগামী হবে। অতএব থাক ব্যাধি। হোক পতিব্রতা অসহায়া পত্নীর, হোক নিরীহ নিষ্পাপ শিশুর। ঠাকুর চাকর ধোপা নাপিত ময়রা মুদী গাড়োয়ান কণ্ডাক্‌টার সহযাত্রী সহভোজীর দ্বারা সংক্রামিত হোক সমাজের সর্ব্বস্তরে, সমাজ-রক্ষীদেরও শরীরে। তবে হয়ত চেতনা হবে।

"চুপ চুপ" নীতির তিরোভাব না হলে মানবের ভাগ্যে সুখ নেই। প্রকৃতি যে অমৃত আমাদের হাতে তুলে দিয়েছে অজ্ঞতায়, অসংযমে ও সামাজিক অব্যবস্থায় তাকে আমরা গরল করে তুলেছি। তার মধ্যে এনেছি পাপ, এনেছি রোগ, এনেছি বিকৃতি। সবচেয়ে ক্ষোভের কথা, এনেছি "চুপ চুপ" নীতির জুজু। যতদিন না sex সংক্রান্ত জ্ঞান মানসাঙ্কের মত সরল ও বর্ণপরিচয়ের মত সুলভ হবে ততদিন অধিকাংশ মানুষ নিরক্ষর চাষার মত নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকবে।
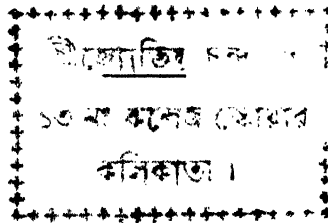
লীলাময় রায়

Chinese Testament—By S. Tretiakov (Gollancz).

প্রাচীন চীনের সহিত প্রাচীন ভারতের ভাবগত ঐক্য বিশ্ববিদিত। আধুনিক চীনের সহিত আধুনিক ভারতের অবস্থাগত আনুরূপ্যও কম লক্ষ্যযোগ্য নহে। প্রাচ্য ভূখণ্ডের এই দুইটি মহাদেশ—ইহাদের আয়তন যেরূপ বৃহৎ, জনসংখ্যাও সেরূপ বিপুল; ঐতিহ্য-সম্পদে ইহারা সভ্য জগতের শীর্ষস্থানীয়; বাহুবল ও অর্থবলেও ইহাদের কীর্ত্তি একদিন দেশবিশ্রুত ছিল। অথচ নিয়তির পরিহাস এমনই অকরুণ, যে আজ ইহাদের দুঃখের তুলনা নাই। উভয়েই আজ দুর্ব্বল, শক্তিমান বিদেশীর স্বেচ্ছাচারিতার অবারিত লীলাভূমি। ইহা ঠিক, কাগজে-কলমে চীনের আছে রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতা, ভারতের যা নাই। তবুও, শরৎচন্দ্রের এ উক্তি অক্ষরে অক্ষরে সত্য যে, বর্ত্তমানে ভারতের সমদুঃখী যদি কেহ থাকে তবে তাহা চীন দেশ।

সমদুঃখী প্রতিবাসীদের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন স্থাপিত হওয়া স্বাভাবিক ও বাঞ্ছনীয়। কিন্তু আমাদের দৃষ্টি আজ পশ্চিমাভিসারী, তাই পূর্ব্বদেশীয় এই বন্ধুটিকে

আমরা সম্যক্ প্রকারে বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। জাপানকে যে আজ আমরা ভুলিতে পারি না তাহার কারণ ভৌগলিক অবস্থান সত্ত্বেও সে পুরাদস্তুর পশ্চিমী—তাহার ব্যবসা-বাণিজ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহে, কর্ম্মকুশলতায়, ও প্রাচ্য জাতির সহিত তাহার সঘৃণ সানুকম্প ব্যবহারে। কিন্তু চীন একান্তই প্রাচ্য বলিয়া তাহার প্রতি উদাসীন হইতে আমাদের বাধে না।

চীন সম্বন্ধে আমাদের কোন আগ্রহ নাই—ইহা অবশ্যই অত্যুক্তি। সুন-ইয়াৎ-সেন্-এর জীবন ও মৃত্যুর রোমাঞ্চকর কাহিনী আমাদের শ্রদ্ধা অর্জ্জন করে, কুয়োমিন্টাং-এর উত্থান পতনের নাগরদোলায় আমাদের কৌতূহল জাগৃত হয়, চ্যাং-ৎসো-লিন্, চিয়াং-কাই-সেক্, উ-পে-ফু, য়ুয়ান-শি-কাই ইত্যাদি অপরিচিত নামধারী ব্যক্তিসমূহের রাজনৈতিক মিলন-বিরোধের গতি নিরূপণ করিতে গিয়া আমরা বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়ি। কিন্তু সাময়িক সংবাদপত্র হইতে উপচিত এই সমস্ত টুকরা টুকরা ঘটনা গাঁথিয়া চীন সম্বন্ধে কোন বাস্তব ধারণায় উপনীত হওয়া আমাদের পক্ষে অসম্ভব। তাহার প্রধান কারণ, আপাততঃ চৈনিক পরিশীলনের সহিত আমাদের মনের যোগসূত্র ছিন্নপ্রায়, আর পরিশীলীয় ও ঐতিহাসিক পটভূমিকার সহিত পরিচয় না থাকিলে কোন দেশের ঘটনাবলীর বিভিন্নমুখী ইঙ্গিত বিদেশীর নিকট পরিস্ফুট হয় না। খুব কম বাঙালীই চীন দেশ চোখে দেখিয়াছেন, এদেশে বসিয়া শিক্ষিত ও উন্নতমন চীনবাসীর সংস্পর্শ আমরা পাই কৈ। কাজেই চীন সম্বন্ধীয় বই পড়া জ্ঞান অন্তস্তরে পৌঁছিবার পথে অনাগ্রহের বাধা পায়। আমাদের পক্ষে চীনা বন্ধু থাকা সম্ভব হইলে এ বাধা অনেকটা লঘু হইত।

"চাইনিজ টেষ্টামেণ্ট" এমন একখানি বই যাহার যোগে এই বাঞ্ছিত বন্ধুত্বের আস্বাদ অপ্রত্যাশিত পরিমাণে পাওয়া সম্ভব। ইহা বর্ত্তমান চৈনিক অগ্রগতির পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস নহে, ইহা একটিমাত্র চীনা যুবকের পঁচিশ বছরের জীবন কাহিনী। তান্-শি-হুয়ার জন্ম হইয়াছিল ১৯০১ সালে দরিদ্র অথচ সম্ভ্রান্ত বংশে। শিশুকালে তাহার পিতার সান্নিধ্য সে খুব কমই পাইত, কারণ তিনি তখন থাকিতেন জাপানে উচ্চশিক্ষার শক্তি অর্জ্জন করিতে, যে শক্তি তিনি পরে দেশের কাজে লাগাইতে চান সুন্-ইয়াৎ-সেন্-এর নেতৃত্বে। বিদ্রোহ-পূর্ব্ব যুগে চীনদেশের সাধারণ জীবন-যাত্রার ও সেই সঙ্গে শিশু লালনের একটি তথ্যবহুল অপরূপ চিত্র আমরা পাই তান্-এর বাল্য স্মৃতিতে। কয়েক বৎসর পরে পিতা জাপান হইতে ফিরিলেন। সুন্-ইয়াৎ-সেন-বিদ্রোহ আত্মপ্রকাশ করিল, তাহার প্রথম প্রসারের সহিত তান-সংসারের প্রভাব বাড়িয়া চলিল। পরে য়ুয়ান-শি-কাই-এর বিশ্বাসঘাতকতার ফলে বিদ্রোহ ভাঙ্গিয়া গেলে তান এর পিতা পলাতক অবস্থায় আত্মরক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন ও তান-পরিবারের দুর্দ্দশার অন্ত রহিল না। এরূপ ওঠা-পড়ার ভোগ-উপভোগ এ পরিবারের ভাগ্যে অনেকবারই জুটিয়াছে। বয়োবৃদ্ধির সহিত তান-এর শিক্ষাব্যবস্থা, মাতৃবিয়োগ, কৈশোর-প্রেম, মাতৃসমা বিমাতার আগমন, অনিচ্ছাকৃত বিবাহ, কন্যাজন্ম, পত্নীত্যাগ, পিতার অমতে পেকিং বিশ্ববিদ্যালয়ে আগমন, তথাকার ছাত্রজীবন, ছাত্রাবস্থায় রাজনৈতিক আন্দোলন পরিচালন ও তাহার ফলে লাঞ্ছনার বিবরণ পড়িতে পড়িতে আমরা তান-কে এত অন্তরঙ্গভাবে জানিতে পারি যে, তাহাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিতে মন উন্মুখ হইয়া উঠে। আর প্রসঙ্গতঃ পাই—যাহা পরাধীন জাতির স্বাধীনতা-সমরে

অনিবার্য্য সঙ্গী—মহত্ত্ব ও হীনতার, স্বার্থপরতা ও ত্যাগশীলতার পরস্পর-বিজড়িত অবস্থান : আর পাই আদর্শের সংঘাত,—পূর্ব্বপুরুষের সহিত উত্তরপুরুষের বিভিন্নতা। একটি দৃশ্য এখানে সবিস্তারে উদ্ধৃত করিতেছি। তান বলিতেছে :—

My father was hidden far away, in a fortified castle protected by hillocks and walls. A path to the gates went over a stone ridge. One man could have successfully defended the castle. People had to walk in a single file over the ridge. Bullets could pick them all off easily.

My father's room was small. He wore a white peasant-blouse with buttons down the side.

I said : "Hello, father."

He answered : "Hello, father, you are also a father now, Shih-hua."

I looked at him bewildered. He was smiling, almost joking. I knew from his letters that he had forgiven me Peking, but still I expected to be rebuked. No. Nothing. He asked me how difficult the examinations were. How did I like to live in the University ? Was it warm in the dormitory ? How big was the library ? How learned the professors ?

"About the professors I don't know, they are out on strike."

He spoke slowly, and I listened to his words as one listens to a teacher.

"Although you have a strike at present, see to it, Shih-hua, that you don't stop studying on that account. Study is the first thing. Studying is like rowing against a current, once you stop rowing you are carried down stream. Accumulate knowledge, Shih-hua ! Accumulate knowledge. I have sat here under a stranger's roof, and speculated for many a month trying to find out what was wrong with our revolutionary movement. We did not have enough knowledge. We did not think the Manchus would give up so easily. We were preparing ourselves for a long fight. We valued science less than the ability to make bombs and to handle rifles. We worked as soldiers and as wreckers, but when the time to build came we were crushed. I had many comrades who were studying politics, economics, and law, but they evidently

did not study them diligently enough. They still don't know what kind of government we should have. The revolution passed. The skilful politicians still hold in their hands the key posts in the bureaucratic machines. They have kicked out the unskilful revolutionaries. If yo u want to rule in future, my son, you must study every science, not only its theory but also its practice."

"Our professor, Li Tao chao, organised a society for the study of Marxism at the University. Marx says that power should belong to those who produce, to the workers. Marx says that power expresses the domination of a class. Marx says that the political system cannot be changed without changing economic relations. For that reason we began by educating the coolies in Peking."

"I don't know about your Marx. But what you say sounds reasonable. I never thought that suffrage for coolies and peasants could help them to improve their lives while they were still economically dependent on their masters. How can a tenant vote against his landlord? He would lose his credit. As long as our peasants depend on pawn-shops, on buyers and landlords, no matter how many votes they have, the masters will always win."

"But," I cried indignantly, "that is what we, the revolutionaries, exist for—to teach the poor how to use their rights."

"I don't know, Shih-hua. Perhaps things are different now. In our time you could count all the revolutionaries on your fingers. They were very few, and they were mainly students studying abroad. It is very good to have a circle for propaganda, but even revolutionary peasants need leaders, and only you, the students, can be their leraders. Who else will help peasants and coolies to build their governments; who will explain to them the three principles of Sun Yat-sen —Nationalism, Democracy, Socialism?

I did not argue. It was difficult for me to argue with my father. He had thought over these matters more than I. I was pleased with my father, and a little proud of this conversation of two revolutionaries—two fathers. I approached the most ticklish point of our conversation—I wanted to

know father's attitude to the subject I have chosen to study.

"I have selected the Russian section of the philological faculty."

"The Russian section? Good, Shih-hua. The Russians are revolutionary people. When I was a student in Japan, the Japanese had a war with Russia and won the war. It was a stupid war. The Russian people answered the defeat with a revolution. It was a fine revolution. Strikes! Peasants burnt the estates of their landlords; workers built trenches in the cities. We, the Chinese revolutionaries, were happy over every victory of the Russian people. Study hard in the Russian section. Perhaps you will be able to go to that country and finish your education there."

"Only if I go there will I be able to grasp their literature fully."

At the word "literature" father made a grimace. "Isn't there something more essential than literature? All right, you can study poetry and write stories if you want to so much. But couldn't you at the same time become an engineer, a chemist, a mechanic, or a lawyer?"

"It is difficult to combine the two, but, if you insist I study some practical profession also, I will do it. Perhaps, law, perhaps, military science, I can't tell yet."

I changed the topic of conversation. I asked, "Are you out of danger? Perhaps it would be wiser to go to a new place? What are you going to do in the future?"

"The same as I did in the past," laughed my father. The Kuomintang of Szechuan is underground at present. People come over to see me at times, I keep in touch. I encourage some, and remind others that we won't stay underground for ever. I wish I could go and see Sun Yat-sen. I haven't seen the old man for so long. But it is difficult: we have no money, and the war surrounds us."

And he looked at me with eyes that had grown much more gentle. The grey hair was now clearly noticeable in his beard and in his moustache.

পিতার একটি কামনা পূর্ণ হইয়াছিল, তার শিক্ষা সমাপনার্থ মস্কো পর্যান্ত

আসিতে পারিয়াছিল। কিন্তু ত্রেতিয়াকভ-এর সহিত তাহার আলাপের সূত্রপাত পেকিঙ-এই। ত্রেতিয়াকভ ছিলেন রুশভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক, তাঁহার বারোটি ছাত্রের মধ্যে তান একজন। শিক্ষক-ছাত্রের সম্বন্ধ ক্রমে সুনিবিড় বন্ধুত্বে পরিণত হইল। ছাত্রের ব্যক্তিত্বে আকৃষ্ট হইয়া শিক্ষক তাহার জীবনকাহিনী শুনিতে চাহিলেন। প্রতিদিন চার-ছয় ঘণ্টা ধরিয়া ছয়মাস ছাত্র সে কাহিনী বলিয়া গেল, শিক্ষক তাহা প্রশ্ন করিতে করিতে শুনিতে লাগিলেন—কখনো রোমান ক্যাথলিক গুরুর মতো, কখনো পরীক্ষাপ্রাণ বিচারকের মতো, কখনো সহৃদয় সহচরের মতো, আবার কখনো বিশ্লেষণশীল মনোবৈজ্ঞানিকের মতো। ফলে সৃষ্ট হইল এই এককতম পুস্তক—ত্রেতিয়াকভ লিখিত তান শি-হুয়ার আত্মজীবনচরিত। বইটি আদ্যন্ত তান-এর উত্তম পুরুষ একবচনেই লিখিত—মাত্র দু-তিনটি পরিচ্ছেদ ত্রেতিয়াকভ স্বনামে সংযোগ করিয়াছেন। সোনার পাথরবাটি চরম অলীকতার উদাহরণ হইতে পারে, কিন্তু সাহিত্য যে প্রকৃতিকৃতনিয়ম-রহিত তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত এই অপরের রচিত আত্মজীবনচরিতটি। বাংলাদেশে অনেক ধীমান্ ছাত্র অনেক বিদেশী শিক্ষকের সংস্পর্শে আসিয়াছে, কোন ক্ষেত্রেই এরূপ নিবিড়তার উদ্ভব হইয়াছিল বলিয়া আমার জানা নাই।

আর একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার। ত্রেতিয়াকভ কম্যুনিষ্ট, তান-শি-হুয়া কম্যুনিষ্ট নয়। বাপের কুয়োমিণ্টাং-প্রীতি উত্তরাধিকার-সূত্রে তাহার উপর বর্ত্তাইয়াছিল। দলপতিগণের দুর্ব্যবহারে বিশ্বাসভঙ্গে বহুবার সে অত্যন্ত উত্তপ্ত হইয়াছে, তবু দল একেবারে সে কখনও ছাড়ে নাই। কম্যানিষ্ট সাহিত্যিকগণের বিরুদ্ধে একটি প্রধান অভিযোগ যে তাহারা একান্তভাবে প্রচার-সর্ব্বস্ব। হইতে পারে একথা সত্য; কিন্তু "চাইনিজ টেষ্টামেণ্ট"-এ এমন একটি লাইনও নাই যাহাতে ত্রেতিয়াকভ-এর প্রচারস্পৃহা অযথা প্রকাশ পাইয়াছে। একটি বিভিন্ন জাতিকে সম্পূর্ণরূপে বুঝিবার এমন মর্ম্মগ্রাহী প্রচেষ্টা বিশ্বসাহিত্যে কটা আছে জানি না। ত্রেতিয়াকভ লিখিত পরিশিষ্টাংশটি এখানে তুলিয়া না দিলে তাঁহার প্রতি অবিচার করা হয়।

One day Tan Shih-hua failed to visit me. A week passed and he did not appear. It became clear he had left.

Telling me the last chapters of his life, he had often said :

"Chang Kai-shek betrayed the Revolution. But I know a man who will never betray either Moscow or the Revolution—this man is Wang Ching-wei, I believe in him. I believe in him as I do in my father. If somebody told me that my father had betrayed the cause, I would not have enough strength to renounce him. I would have to go and see him myself to make sure that it was true".

Wang Ching-wei betrayed the Revolution sixty days after the departure of Tan Shih-hua.

Two years have passed since Tan Shih-hua left Moscow. He plunged into China and disappeared. My letters to him have remained unanswered. I do not know what he is doing.

Perhaps he is editing literary pamphlets, perhaps he works as a clerk of Feng, or teaches in Szechuan. Or perhaps, after looking closely into the split face of the Kuomintang, he has become a communist, and like his father, who once wandered from village to village with his insurgent army, continues to carry a guerilla warfare around the populous villages of Hunan and Tsien-hsi. Or perhaps he has fallen into the hangman's hands, and his head, with its sparse black hair and quiet eyes is peering through the bamboo-bars of a prison cage in some market-place deep in the interior of China.

বাংলা নিবন্ধে এরূপ সুদীর্ঘ ইংরাজী উদ্ধৃতি অমার্জ্জনীয় অসঙ্গতি, সন্দেহ নাই, কিন্তু আমার অক্ষম অনুবাদ দিয়া গ্রন্থটির অমর্য্যাদা করিতে আমি অসম্মত। অথচ আমার একান্ত ইচ্ছা বইটির উপযুক্ত বঙ্গানুবাদ হয়। মূল রুশ হইতে করাই প্রশস্ত, তবে এরূপ প্রবৃত্তিবান্ রুশবিদ্ বাঙালী কেহ আছেন কিনা সন্দেহস্থল। অভাবপক্ষে ইংরাজী হইতে অনুবাদ ভিন্ন গত্যন্তর দেখি নাই।

এখন বাংলাদেশে অনেক ইংরাজীশিক্ষিত প্রকাশক আছেন যাহারা বাংলা সাহিত্যের উন্নতিকল্পে সচেষ্ট। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কি বইখানির অনুবাদের ব্যবস্থা করিতে পারেন না যাহাতে মানবিকতার আদর্শপরায়ণ বাঙালীযুবকের ও চীনাযুবকের মানসিক দূরত্ব অপেক্ষাকৃত নিকট হইয়া আসে?

শ্রীনীরেন্দ্রনাথ রায়

Characters & Commentraries—By Lytton Strachey (Chatto & Windus)

Message of Asia—By Paul Cohen Portheim (Duckworth)

সাহিত্যই হোক আর দর্শনই হোক, তার সমালোচনা করতে গেলেই প্রতিপদে আত্ম-কেন্দ্রিক মুস্কিলের কথাই বেশী ক'রে মনে পড়ে। বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদী যাই বলুন না কেন, বস্তুর স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করে নিলেও তার স্বরূপের বর্ণনায় জ্ঞানতন্ত্রবাদকে সম্পূর্ণ এড়িয়ে যাওয়া শক্ত—একেবারে সম্ভব কিনা সে কথা সন্দেহের বিষয়। এ স্বাতন্ত্র্যবাদের সঙ্গে সাহিত্যের বাস্তবতা বা ভাববাদের কোন প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ নেই, তাই সাহিত্যের বাস্তববাদী বা realist দর্শনের হিসেবে জ্ঞানতন্ত্রবাদী বা idealist হলেও আশ্চর্য্য হবার খুব বেশী কিছু নেই। তবে একথা অবশ্যস্বীকার্য্য যে, প্রত্যেকের দার্শনিক মনোবৃত্তি তার জীবনের সমস্ত অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রকেই রঞ্জিত করতে বাধ্য—বিশ্বদৃষ্টি নামের সার্থকতাও এইখানে। সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য একথাও স্বীকার করতে হবে যে, এই বিশ্বদৃষ্টি কোনকালেই সম্পূর্ণভাবে জ্ঞানগত ব্যাপার নয়—এমন কি প্রধানত জ্ঞানগত কিনা তা নিয়েও সন্দেহ উঠ্‌তে পারে। একজন সুপ্রসিদ্ধ

দার্শনিক তো তাই দার্শনের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, আমরা প্রবৃত্তির বশে চিন্তা না করেই যা বিশ্বাস করি, বুদ্ধি দিয়ে তার স্বপক্ষে যুক্তি আবিষ্কারের নামই দর্শনচিন্তা।

দর্শনের উদ্দেশ্যই হ'ল বিশ্বাসকে জ্ঞানে পরিণত করা, নিষ্ঠার পরিবর্ত্তে প্রমাণের ভিত্তিতে জগৎ-সৃষ্টিকে বুঝবার চেষ্টা। সেই দর্শনের বেলায়ও যদি বুদ্ধির প্রাধান্য অপ্রতিহত না হয়, তবে সাহিত্য বা অভিজ্ঞতার অন্য কোন ক্ষেত্রে যে তা হবে না সে কথা সহজেই বোঝা যায়। এই জন্যই সাহিত্যিক বা শিল্পীর সৌন্দর্য্যতত্ত্ব ও সৌন্দর্য্যপ্রকাশের মধ্যে এত পার্থক্য। একথা কেবলমাত্র সাহিত্যিক বা দার্শনিকের পক্ষেই সত্য নয়, সাধারণ পাঠক বা সমালোচকের বেলায়ও এ সত্য সমানভাবে প্রযোজ্য। তাই এদিক থেকে বিচার করতে গেলে শেষ পর্য্যন্ত সমালোচনার কোন প্রতিমান আছে কিনা, সে বিষয়েই সন্দেহ লাগে—সমস্ত সমালোচনাই সমালোচকের ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়ার রূপভেদ হ'য়ে দাঁড়ায়।

(Lytton Strachey) লীটন ষ্ট্রেচি-র রচনা পড়তে গিয়ে এই কথাই বারবার মনে পড়ে। প্রথমেই বলে রাখা ভাল যে, আমি ষ্ট্রেচি-র রচনার ভক্ত নই। তাঁর লেখায় অনেক সময়ে প্রসাদগুণ আছে, অনেক সময় অস্পষ্ট সত্য সুস্পষ্ট প্রকাশ পেয়েছে, তাঁর রচনায় গভীর পাণ্ডিত্য এবং শিল্পীসুলভ সাধনার পরিচয় পাওয়া যায়—এ সমস্ত কথাই সত্য। কিন্তু গুণ থাকলেই যে কারো লেখা প্রিয় হয়ে ওঠে, এমন কথা মনে করলে ভুল হবে। মিডল্‌টন্ মারীর রচনায় সময় সময় যে সত্য সত্যই অন্তর্দৃষ্টির আভাস রয়েছে, একথা অস্বীকার করাও আমার পক্ষে যেমন অসম্ভব, অন্যপক্ষে তাঁর রচনা যে আমার কাছে বহু স্থলেই বিরক্তিজনক, সে কথা না বলেও পারিনে। তাঁর রচনায়, মানস গঠনে এমন কি লেখন-ভঙ্গিতেও নিজের সহজ শ্রেষ্ঠত্ববোধ এমন সুস্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে, যে তাকে অশ্লীলতা বল্লেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না।

ষ্ট্রেচি-র রচনায়ও এই শ্রেষ্ঠত্ববোধ অতিরিক্ত জাগ্রত ব'লে আমার ধারণা। ভিক্টোরীয় যুগের অবসানে ভিক্টোরীয় মনোবৃত্তিকে উপহাস করা স্বাভাবিক—তখন মনে হয় যে, এই পরিহাসের মাত্রাই পূর্ব্বযুগের তুলনায় আমাদের শ্রেষ্ঠত্বের পরিমাপ। এই যুগধর্ম্মের প্রকাশ যার মধ্যে যত বেশী, সে যুগের কাছে তার আদরও তত বেশী, কিন্তু সেই আদরই তার প্রতিষ্ঠার সাময়িকতারও লক্ষণ। প্রত্যেক মানুষের চিত্তই যুগধর্ম্মকে কম বেশী প্রকাশ করে, কিন্তু যুগের মহত্তম সন্তানেরা কেবলমাত্র যুগধর্ম্মী নন—যুগধর্ম্মকে অতিক্রম করেই তাঁদের মহত্ত্ব। ভিক্টোরীয় যুগের নিষ্প্রশ্ন আত্ম-বিশ্বাসের প্রতীক হিসাবে তাই টেনিসন্ জীবিতকালে যে আদর পেয়েছিলেন, যুগাবসানে তাঁর অনাদরের মাত্রাও সেই পরিমাণে। ষ্ট্রেচিও একদিন ভিক্টোরীয় মনোবৃত্তিকে উপহাস করে যে সহজ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন, প্রথম প্রতিক্রিয়ার অবসানে আজ সেই প্রতিষ্ঠাও তাই কমে এসেছে।

ভিক্টোরীয় যুগের যে মামুলী ছবি ষ্ট্রেচি এবং তাঁর সমকালীনবর্ত্তীদের মনে রূপ ধরেছিল, আজ আমরা জানতে সুরু করেছি যে সে ছবি সে যুগের চিত্র নয়, ব্যঙ্গচিত্র (caricature)। সেই সঙ্গে ষ্ট্রেচি-র পরিহাস-আক্রমণও আমাদের কাছে আজ হাস্যাস্পদ হয়েই দাঁড়িয়েছে। এক হব্‌স্ ছাড়া বোধ হয় আর কোন ইংরেজই

নিউম্যানের মতন নির্ম্মম যৌক্তিকতার পরিচয় দিতে পারেননি,—সেই নিউম্যানই স্ট্রেচি-র মতে ভাব এবং ভাবালুতায় ভরা "creature of emotion and sentiment",—সুযোগ এবং সুবিধা পেলে হয়তো কোনদিন গ্রে-র (Gray) সমকক্ষ হলেও হ'তে পারতেন ! !

বিজ্ঞানে বিরুদ্ধধর্ম্মীদের মধ্যে যে সম্বন্ধ তার নাম আকর্ষণ, স্বধর্ম্মীদের বেলায় কিন্তু তা' বিকর্ষণ হয়েই দাঁড়ায়। জড়পদার্থের সম্বন্ধের এই যে সাধারণ নিয়ম মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধেও তা' অনেকস্থলেই প্রযোজ্য। প্রকৃতির পরিহাসও সেইখানে। তাই ষ্ট্রেচি-র ভিক্টোরীয় যুগের প্রতি যে বিতৃষ্ণা এবং অশ্রদ্ধা, তারও মূল কারণ বোধ হয় এই যে, তাঁর নিজের মনও বাস্তবিক পক্ষে ভিক্টোরীয়। সাহিত্যের ক্ষেত্রে এ রকম ঘটনার সংস্থান বারে বারেই পাওয়া যায়। সাহিত্যের আদর্শবাদের সঙ্গে বাস্তববাদের তাই সত্যিকার কোন বিরোধ নেই, বিরোধ বাধে এক আদর্শবাদের সঙ্গে অন্য আদর্শবাদের। বাংলাসাহিত্যে অধুনা যে ধারার পরিচয় সময় সময় পাওয়া যায়, তাকে অনেকে বাস্তববাদ বলেন বটে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাও রোমান্টিক। জীবনের বিলাসের রোমান্টিকতার বদলে সেখানে শুধু দুর্ভিক্ষের রোমান্টিকতা। বাস্তববাদের পক্ষে উভয়েই একদেশদর্শী এবং সেইজন্যই অবাস্তব।

আলোচ্য গ্রন্থে বিলেতের লিবারেল বা উদারনৈতিক দলের সম্বন্ধে স্ট্রেচির মনোভাব একটি প্রবন্ধে খানিকটা প্রকাশ পেয়েছে। যেহেতু ভিক্টোরীয় যুগের রাজনীতি প্রধানত উদারনৈতিক, উদারনৈতিক মত তাই স্ট্রেচি-র কাছে অগ্রাহ্য। কিন্তু একটু বিশ্লেষণ করে দেখলেই স্ট্রেচি-র নিজের মনোভাব যে মুখ্যত উদারনৈতিক, সে বিষয়ে বেশী সন্দেহ থাকে না। যুদ্ধ-পরবর্ত্তী যুগের রাজনীতির যে ধারা, তার সঙ্গে তুলনায় স্ট্রেচি-র সঙ্গে ভিক্টোরীয়দের যে প্রভেদ সে প্রভেদ অতি তুচ্ছ, লক্ষ্যণীয় নয় বল্লেই চলে। মত প্রকাশের স্বাধীনতায় বিশ্বাস এবং মানবসভ্যতার অনিবার্য্য প্রগতিতে আস্থা, এ দুইটি বিশ্বাসকে উদারনৈতিক মতবাদের মূলমন্ত্র বলা চলে। স্ট্রেচির অন্তরেও সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ আছে ব'লে মনে হয় না। তাঁর ভিক্টোরীয়-যুগবিতৃষ্ণার মধ্যেও তাই সে যুগের সঙ্গে তাঁর ধর্ম্মসাম্য প্রতিপদেই ফুটে উঠেছে।

কোহেন পোটহাইম হেগেলীয় মতবাদী, এবং হেগেলপন্থী বলেই উদারনৈতিক। স্ট্রেচি-র মধ্যে যে মতবাদ গৌণ এবং অপ্রকাশ, পোটহাইমের রচনায় তাই মুখর হয়ে উঠেছে। হেগেলীয় মতবাদে দ্বন্দ্ব সন্ধির পূর্ব্বাভাস মাত্র, এবং সমন্বয় বা সন্ধিই একমাত্র সত্য। সমন্বয়ের বিভিন্ন যে অঙ্গ, সেই অঙ্গগুলিকে স্বাধিকারে সত্য মনে করাতেই যত গোলমালের সৃষ্টি। তারা স্বাধীন ও স্বতন্ত্র নয়, বৃহত্তর সত্যের পরিবেশে কেবলমাত্র বোধগম্য বিচ্ছিন্নতা, সে কথা স্বীকার করলেই আমাদের কাছে বিশ্বের সত্য উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে, আমরা জানব যে সৃষ্টির রঙ্গমঞ্চে দ্বন্দ্ব এবং বিরোধের যে লীলা, সে কেবল অভিনয় মাত্র, তার মধ্যে সত্যের কোন সত্তা নেই। একথা স্বীকার করলেই উদারনীতির পক্ষে যথেষ্ট, কিন্তু হেগেলীয়বাদে উদারনীতির পক্ষে এর চেয়েও বড় সমর্থন রয়েছে। সমন্বয়ে যে সমস্ত অঙ্গের মিলন, তারা যে কেবলমাত্র সন্ধিনির্ভর এবং স্বাধিকারবঞ্চিত, তা নয়—সন্ধির সম্ভাবনাও তাদের প্রত্যেকেরই স্বভাবের মধ্যে নিহিত। কোন অঙ্গকে যদি কেবলমাত্র বিচ্ছিন্ন না জেনে আমরা স্বতন্ত্র এবং স্বাধীন মনে করি, তবে সেই অঙ্গের পরিণতির ফলেই তার প্রতিদ্বন্দ্বীর আবির্ভাব

অবশ্যম্ভাবী, এবং দ্বন্দ্বী ও প্রতিদ্বন্দ্বী একবার সম্মুখীন হ'লে তাদের সন্ধি এবং মিলন অনিবার্য্য। হেগেলীয়বাদের যে কোন প্রত্যয় নিয়ে বিচার করলেই একথা প্রমাণিত হবে। তাই অস্তিকেই (Being) যদি আমরা চরম সত্য মনে করি তবে সমগ্র সৃষ্টিকে প্রকাশ করবার চেষ্টায় তা নির্গুণ হ'তে বাধ্য। লক্ষণ এবং গুণের পার্থক্যেই বিষয়ের সঙ্গে বিষয়ের প্রভেদ, তাই সমস্ত বিষয়কে প্রকাশ করতে চাইলে সমস্ত লক্ষণই বর্জ্জন করতে হবে, রইবে শুধু নির্ব্বিকল্প অস্তিত্ব। ব্রহ্মকেও হয়তো তাই নির্গুণ বলা হয়ে থাকে—কিন্তু এই সমস্ত গুণলক্ষণসম্বন্ধবঞ্চিত ব্রহ্মের সঙ্গে নাস্তির (Not-being) প্রভেদ কোথায়? তাই অস্তি এবং নাস্তি দুই-ই একদেশদর্শী—তাদের সমন্বয়েই সত্যের স্বরূপ। তাকে প্রকাশ করতে অস্তি এবং নাস্তি দুই-ই অপারগ, তার প্রকাশ সংঘটনে (Becoming)।

এই অতিক্ষুদ্র বিবরণে হয়তো হেগেলের প্রতি অবিচারই করা হয়, কিন্তু তাঁর মতবর্ত্তীদের কাছে তাঁর শিক্ষার মোটামুটি এ রকম পরিচয়ই পাওয়া যায়। রাজনীতির ক্ষেত্রে এ মতবাদের ফলে উদারনীতি অবশ্যম্ভাবী, কারণ যতই সংঘর্ষ বা দ্বন্দ্ব বাধুক না কেন, সে সমস্ত দ্বন্দ্ববিরোধই আপাতদৃষ্ট, আপনার স্বভাবের প্রেরণায় তারা সমন্বয় খুঁজে পেতে বাধ্য। বিবর্ত্তনে বিশ্বাস হেগেলীয়বাদকে দৃঢ়তরভাবে প্রতিষ্ঠিত করে দেয়—তখন মনে হয় যে, কালপ্রবাহে পৃথিবীর সমস্ত অন্যায় অবিচার, সমস্ত বৈচিত্র্য ও বিরোধের নিরাকরণ হবেই।

প্রথম দৃষ্টিতে রাজনৈতিক আদর্শহিসাবে উদারনীতির তুলনা নেই, কিন্তু স্বভাবতই মনে সন্দেহ জাগে। আমাদের কারবার কি বাস্তবের সঙ্গে, না কেবলমাত্র স্বপ্নবিলাসেই আমাদের বিশ্বছবি গড়ে উঠছে? পোর্টহাইম যে ভাবে বিশ্বের সমস্ত সমস্যার সমাধান করতে চেয়েছেন, তা করতে পারলে তো ভালোই হ'ত, কিন্তু সত্যি কি আমরা তা' করতে পারি? তাঁর বক্তব্যের মধ্যে যে অনেকখানি সত্য রয়েছে, তা' অস্বীকার করাও অসম্ভব, কিন্তু তাই কি সত্যের সম্পূর্ণরূপ? এসিয়াবাসী এবং বিশেষ ক'রে ভারতীয় ব'লে তাঁর বক্তব্য গ্রহণ করতে পারলে আত্মপ্রসাদও লাভ করা যেতো, কিন্তু অপরোক্ষানুভূতি এবং বুদ্ধির যে বিচ্ছেদের উপর তাঁর বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত সে বিচ্ছেদ কি মানা চলে? হেগেলীয়বাদের সঙ্গে বুদ্ধি এবং অপরোক্ষানুভূতির—ব্যবচ্ছেদের—সম্বন্ধই বা কি? মানুষের অনিবার্য্য প্রগতিতে এই যে অকম্পিত বিশ্বাস, সে বিশ্বাসের মূলে যুক্তির চেয়ে নিষ্ঠারই কি প্রভাব বেশী নয়? আধুনিক জগতে উদারনীতির যে অনাদর, এই সহজ বিশ্বাসের আতিশয্যেই কি তার কারণ মেলেনা?

হুমায়ুন কবির

The Education of Shakespeare—By G. A. Plimpton. (Oxford)

A Companion to Shakespeare Studies—Edited by H. Granville Barker & G. B. Harrison. (Cambridge)

একদা এক অখ্যাত দিবসে সহস্র সহযাত্রীর মতন জন্ শেক্সপিয়ারের পুত্র গৃহ ছেড়ে লণ্ডন যাত্রা করেছিলো ; তারা সব মরে গিয়ে বিলুপ্ত হয়ে গেলো, সে বেঁচে রইলো বিশাল জগতের কৌতূহলাক্রান্ত দৃষ্টির কেন্দ্র হয়ে। তার তিমিরাচ্ছন্ন জীবনের প্রতি পলক জিজ্ঞাসার সামগ্রী হয়ে গেলো। যত সমালোচনা রচনা হোলো, কোনো কবির ভাগ্যে কোনো দিন তেমন হয়নি, তবু তার শেষ পাওয়া গেলো না। হীরের খণ্ড যেমন প্রতি আলোকণাকে বন্দী ক'রে জ্যোতিষ্মান হয়ে ওঠে, তেমনি সে রচনা সমালোচনার প্রতিফলিত প্রতিভায় প্রতিভাত হয়ে উঠছে।

সমালোচকেরা বহুদিন ধরে শেক্সপিয়রকে তন্ন তন্ন করে আবিষ্কার করেছেন। মরণোন্মুখ গ্রীন্ সেই যে 'পরপুচ্ছধারী নির্লজ্জ কাকের' প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে গিয়েছিলো, সেদিন থেকে আরম্ভ ক'রে সেই কাক যখন স্বর্গের পাখী হ'য়ে আকাশে উড়লো সেদিনও মানুষের প্রশ্নপূর্ণ দৃষ্টি তাকে অনুসরণ করেছে। তার অজ্ঞাত জীবন গবেষণার বিষয় হয়ে গেলো, ইতিহাসে যে উপকরণ পাওয়া গেল না, অনুমান তা' পূরণ করে দিলো। তার প্রতি শব্দের টীকা হয়েছে, প্রতি চরিত্রের আদর্শ জানা গেছে। কত Bradley, Moulton স্বনামধন্য হয়ে গেলো, তবু সে কারু আয়ত্বের মধ্যেই এলো না। তাই আজও এ বৃথা প্রয়াস।

কিন্তু আজকের সমালোচনার একটা বৈশিষ্ট্য আছে। এ রামধনু বিশ্লেষণ করবার ব্যর্থ প্রয়াস নয়। এর পদ্ধতি ভিন্নরূপ। এ কীটের মতন বিদীর্ণ ক'রে প্রবেশপথ চায় না, এ আলোকের মতন সর্ব্বাঙ্গ উদ্ভাসিত করতে চায়। এতোটুকু অভিজ্ঞতালাভ হয়েছে যে কবিতার পদার্থ ভেঙ্গে কবিকে চেনা কঠিন, কিন্তু পারিপার্শ্বিক ও সমসাময়িক দিয়ে কবির পরিচয় কতকটা উপলব্ধি হয়। উল্লিখিত গ্রন্থদ্বয় এই অভিজ্ঞতায় অধিষ্ঠিত।

মানুষের মন পারাবিন্দুর মতন চঞ্চল। তার উপকরণ বোঝা দুঃসাধ্য, কিন্তু তার ক্রমবিকাশ ও পরিবর্দ্ধন কারণ-জনিত। শেক্সপিয়ারের প্রতিভা নিকৃষ্ট গৃহস্থের কক্ষে কেমন করে মুকুলিত হয়েছিলো জানি না, কিন্তু যে বাতাস তাকে ষ্ট্র্যাটফর্ডের গ্র্যামারস্কুলের ক্ষুদ্র কক্ষে প্রস্ফুটিত করেছিলো সেই বাতাসই সেখান থেকে আরম্ভ ক'রে লণ্ডনের রঙ্গমঞ্চের ঘনসন্নিবিষ্ট লোকাসনবেষ্টিত শুষ্ক-পল্লব-বিস্তৃত অল্পপরিসর ভূমিতে পর্য্যন্ত আমোদিত হয়েছিলো।

শিক্ষার সেই প্রভাতে ষ্ট্র্যাটফর্ডের বিদ্যালয় থেকে বালক শেক্সপিয়ার কোনো রত্ন সঞ্চয় করেছিলো কি না যা দিয়ে সে অমর হয়ে গেলো, এ কথা বলা যায় না। এইটুকু মাত্র নির্ণয় করা যায়, আরও শতাধিক বিশেষত্ববিহীন বিদ্যার্থীর সঙ্গে তার কিশোর মনের পুষ্টির জন্য কি সামগ্রী আহৃত হয়েছিলো। Plimpton তাঁর পুস্তকে অবিস্তারিত ভাবে তার একটা অনুমান ক'রে দিয়েছেন। বইখানা বিশেষজ্ঞের

নিমিত্ত গবেষণামূলক তত্ত্ব নয়, অরসিকের হাতে এর প্রাসঙ্গিক মূল্যও নেই। তবে শিক্ষার ও সাহিত্যের ইতিহাসের দিক দিয়ে এর প্রয়োজন আছে এবং শেক্সপিয়ারের পাঠকের কাছে এর আদর হবে।

ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর বিদ্যালয়ে কি কি বই পড়ানো হোতো, কি রকম শিক্ষক নিযুক্ত হোতো এবং কি ভাবে ও কি উদ্দেশ্যে পড়ানো হোতো তার একটি সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় এই বই থেকে। এ সবের মধ্যে নতুন কথা অনেক আছে। তখন যে ইংরাজি ভাষাকে তাচ্ছিল্য করা হোতো এবং ল্যাটিন গ্রীকই প্রাধান্য পেতো একথা সকলেই জানেন, কিন্তু তখনও যে স্ত্রী শিক্ষা, শরীর চর্চ্চা, চরিত্রবিশেষে শিক্ষাবৈশিষ্ট্য ইত্যাদি সমস্যা নিয়ে লোকে মাথা ঘামাতো এ কথা হয়ত অনেকেই জানেন না। বাস্তবিক বর্ত্তমান বাংলা দেশের অনেক সমস্যারই উল্লেখ আছে এলিজাবেথীয় ইংল্যাণ্ড বিষয়ক এই পুস্তকে।

Plimpton তাঁর নিজের পাঠাগারের পুরাতন লিপিগুলি থেকে নানা উদাহরণ উদ্ধৃত ক'রে, Ascham Mulcaster প্রমুখ তখনকার প্রধান শিক্ষকদের মত থেকে দেখিয়েছেন যে, ভাষা, বিজ্ঞান, সাহিত্য, দর্শন, লিপিগঠন দিয়েই শিক্ষা সমাপ্ত হোতো না। ব্যবহারনীতি, অস্ত্রবিদ্যা ইত্যাদির প্রয়োজনও অনুভূত হোতো।

শিক্ষার প্রণালী সম্বন্ধেও Plimpton কিছু কিছু আভাস দিয়েছেন। Ascham বল্‌তেন ছাত্রকে স্নেহদ্বারা বশ কোরবে, আবার Sir William Peter বল্‌তেন একমাত্র বেত্রদ্বারাই ছাত্রকে বশ কোরবে।

তখন বালিকা বিদ্যালয় ছিলো না, অথচ মেয়েদের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ হোতো। গৃহে শিক্ষক দ্বারা এ শিক্ষা সম্পন্ন হোতো। এ বিষয়ে একজন সুবিবেচক গাম্ভীর্য্য সহকারে বলছেন, মেয়েদের ছেলেদের বিদ্যালয়ে দেওয়া বাঞ্ছনীয় নয়, সেটা একটা নূতনত্ব ব'লে। গৃহে শিক্ষয়িত্রী রাখাই ভালো, শিক্ষয়িত্রীর অভাবে বিদ্বান, বিচক্ষণ, স্থির, পরিণতবয়স্ক, সুশ্রী-পত্নী-বিশিষ্ট শিক্ষকেও চল্‌তে পারে।

মোটের উপর এরকম একটি বইয়ের বাস্তবিক অভাব ছিলো, কেবল শেক্সপিয়ার পাঠকের জন্য নয়, ঐতিহাসিকেরও। এমন সহজ, সরস, সুস্পষ্ট ও সংক্ষিপ্ত ভাবে যে এ অভাব পূর্ণ হবে তার আশাও ছিল অল্প। কারণ এটা হোলো মনস্তত্ত্বের যুগ; মনস্তত্ত্ব বাদ দিয়ে কেবল বিষয়তত্ত্ব পেয়ে বড় স্বস্তি বোধ হোলো।

অপর বইখানার অত সহজ সমালোচনা হয় না, কারণ এ ঠিক সমালোচনার জিনিষই নয়। একে একটা গোটা শেক্সপিয়ার সাহিত্য বলা চলে। বইটির পরিকল্পনাই বিশাল, রচনাও তদনুযায়ী বিশালায়তন। চতুর্দ্দশজন বিখ্যাত লেখক বিভিন্ন প্রবন্ধে শেক্সপিয়ারের জীবনের, আবেষ্টনের, কীর্ত্তির ও তৎসংলগ্ন সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে প্রয়াস করেছেন। কিন্তু তথাপি বইটি অসংলগ্ন রচনার সঙ্কলন না হ'য়ে একখানা সম্পূর্ণ গ্রন্থের সদৃশই হয়েছে। তার কারণ শেক্সপিয়ারের মতন একজন লেখকের সম্পূর্ণভাবে সমালোচনা করতে গেলে, একজন ছেড়ে বহু বিশেষজ্ঞের কাজ হয়ে পড়ে। Pollard, Bonamy Dobree. T. S. Eliot, কেউই একাকী এমন পূর্ণাবয়ব রচনা সমাপ্ত করতে পারতেন না, কিন্তু প্রত্যেকে নিজের নিজের বিভাগ থেকে বিস্তর উপকরণ আহরণ ক'রে গ্রন্থখানার পুষ্টিসাধন করেছেন। এ বই সাধারণের নিমিত্ত নয়, শেক্সপিয়ারের পাঠকের কাছে এর আদর। এর মধ্যে নতুন

তত্ত্ব কম আছে, কিন্তু শেক্সপিয়ারের জীবন, সাহিত্য ও আবেষ্টনের মধ্যে একটা সূক্ষ্ম অব্যক্ত সম্বন্ধ স্থাপিত হয়ে গেছে।

ষ্ট্র্যাটফর্ডের সেই অজ্ঞাত পরিবারের সন্তান তার "Small Greek and less Latin" নিয়ে কবে হ্যামলেটের সমস্যার সহজ উত্তর দিয়ে চলে গেছে, তবু আজও এতো মসিক্ষয়।

লীলা মজুমদার
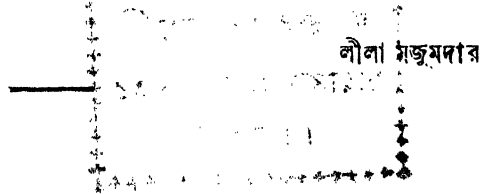
Adam's Ancestors—By L. S. B. Leakey (Methuen).

নৃতত্ত্ব সম্বন্ধে আজকাল প্রায়ই মাসিক পত্রিকা ও অন্যান্য কাগজে প্রবন্ধ দেখ্‌তে পাওয়া যায়, কিন্তু সাধারণের নৃতত্ত্বের জ্ঞান অল্প থাকার দরুণ অনেকেই সেগুলির গুরুত্ব বুঝতে পারেন না। টাইলার, ম্যারেট প্রভৃতি নৃতত্ত্ববিদগণ সাধারণের অবগতির জন্য কয়েকখানি বই লিখেছেন, কিন্তু কোনখানিতেই নৃতত্ত্বের টেক্‌নিক্ (technique) সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করা হয়নি। লীকিই বোধ হয় প্রথম এ বিষয়টি সাধারণকে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন এবং এ বিষয়ে তাঁর উদ্যম যে সফল হয়েছে তাতে কোনই সন্দেহ নেই। এই বইখানি যে শুধু সাধারণেই পাঠ ক'রে উপকৃত হবেন তা নয়, বৈজ্ঞানিক ও ছাত্রেরা এই বইটিতে এমন অনেক তথ্যের সন্ধান পাবেন যা প্রায় অন্য কোন বইতেই এরূপ বিশদভাবে পাওয়া যায় না।

লীকি আফ্রিকায় কেনিয়া কলোনীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁর বাল্য-জীবন সেইস্থানেই কাটে। অল্প বয়সে তাঁর আফ্রিকার নানাজাতীয় পাখীর সম্বন্ধে গবেষণা করবার খুব ইচ্ছা জন্মে, কিন্তু একটি অপ্রত্যাশিত ঘটনা তাঁর জীবনের মোড় ফিরিয়ে দেয়। যখন তাঁর বয়স তের তখন এক জ্ঞাতি ভাই (cousin) তাঁকে ইংলণ্ড থেকে একখানি বই (Days Before History—H. R. Hall) পাঠান—বড়দিনের উপহার স্বরূপ। এই বইখানিতে প্রস্তর যুগ সম্বন্ধে কয়েকটি সরল গল্প ছিল। এই গল্পগুলিই তাঁর জীবনে নৃতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রথম প্রেরণা এনে দেয় এবং আজ তিনি নিজেই আফ্রিকায় প্রস্তর যুগের মানুষ আবিষ্কার ক'রে সর্ব্বজনবিদিত হয়েছেন।

আজকালকার কাগজে প্রাগৈতিহাসিক যুগের আবিষ্কার সম্বন্ধে প্রায়ই উল্লেখ থাকে ; অনেক স্থলেই আবিষ্কার হয় মাত্র কয়েক খণ্ড পাথর ও কয়েকটি প্রস্তরীভূত অস্থি ; এর উপর নির্ভর করে বৈজ্ঞানিকগণ অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে উপনীত হন। কাজেই এই সিদ্ধান্তগুলিকে সাধারণে যদি আজগুবি বলে মনে করেন তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এগুলির বয়স বৈজ্ঞানিক প্রণালীর দ্বারা নির্দ্ধারিত করা হয়।

নৃতত্ত্ববিদগণ তাঁদের কাজের সুবিধার জন্য প্রাগৈতিহাসিক যুগকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করেছেন। তাদের মধ্যে সকলের চেয়ে প্রাচীন যুগ—প্রস্তর যুগ।

এই যুগটি প্রায় একলক্ষ বৎসর পূর্ব্বে এই পৃথিবীতে ছিল, যদিও সে সময় পৃথিবীর মহাদেশগুলি একরকমভাবে সাজান ছিল না। এই যুগে পাথরের এবং অল্প পরিমাণে হাড়ের ছাড়া অন্য কোন জিনিষের অস্ত্র কিংবা যন্ত্রের ব্যবহার জানা ছিল না বলেই এই যুগের নাম প্রস্তর যুগ। একে আবার তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে—পুরাতন প্রস্তর যুগ, মধ্য প্রস্তর যুগ ও নূতন প্রস্তর যুগ। প্রত্যেক যুগের পাথরের অস্ত্রের মধ্যে একটি বৈশিষ্ট্য আছে এবং এর দ্বারাই বিভিন্ন যুগ ভাগ করা হয়েছে।

পুরাতন প্রস্তর যুগেই প্রথম নুড়ি থেকে মানুষের ব্যবহারোপযোগী অস্ত্রশস্ত্র তৈরি করা আরম্ভ হয়। এই যুগের অস্ত্র ও যন্ত্রগুলি সাধারণতঃ আকারে একটু বড় এবং একটি নুড়ি থেকেই টুক্‌রো বার ক'রে নিয়ে তৈরি করা হ'ত। কাজেই যখন কোন প্রাচীন নুড়ি পাওয়া যায় তখন দেখ্‌তে হবে যে, সেগুলির আকার মানুষের দ্বারা নিরূপিত হয়েছিল কি না। এটি বোঝ্‌বার জন্য কয়েকটি বৈজ্ঞানিক প্রণালী আছে, যেমন বাল্‌ব অব্‌ পার্‌কাশান্‌ (Bulb of Percussion) এর চিহ্ন পাওয়া যায় কিনা এবং ছোট ছোট টুক্‌রো বের ক'রে নিয়ে ব্যবহারোপ-যোগী কোন গড়নের করা হ'য়েছে কিনা। অনেক সময় হয়ত প্রস্তর যুগের মানব এগুলিকে খানিকটা তৈরি করবার পর ব্যবহারোপযোগী না হওয়ার দরুণ ত্যাগ করেছে। তখন সেগুলি প্রকৃত কোন গড়নের হয় না কিন্তু তার মধ্যে মানুষের হাতে গড়ার চিহ্ন আছে এ বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। বাল্‌ব অব্‌ পার্‌কাশান্‌ বোঝাবার জন্য লীকির বইতে কতকগুলি সুন্দর রেখাচিত্র দেওয়া আছে, সেগুলি থেকে ঐ জিনিষটি খুব সহজেই বুঝ্‌তে পারা যায়।

বড় পাথর থেকে টুক্‌রো তুলে নেওয়ার বিশেষ প্রণালীর দ্বারা সমস্ত প্রস্তর যুগকে ভাগ করা হয়েছে। পুরাতন প্রস্তর যুগে বড় টুক্‌রো বার ক'রে নিয়ে একটি নুড়িকে একটি অস্ত্র বা যন্ত্রে পরিণত করা হ'ত। এগুলির কয়েকটি বিশেষ গড়ন ছিল এবং বৈজ্ঞানিকগণ এগুলির নাম দিয়েছেন বুরার, স্ক্রেপার, পয়েণ্টস্‌ ইত্যাদি। পুরাতন প্রস্তর যুগ যখন মধ্য প্রস্তর যুগে এসে পৌছল তখন এই সমস্ত পাথরের কার্য্যে অনেক উন্নতি দেখা যেতে লাগল এবং নানারকম ছোট অস্ত্র ও যন্ত্র তৈরি হ'তে লাগল। পরিশেষে নূতন প্রস্তর যুগে আমরা অনেক রকম সুগঠিত পাথরের অস্ত্রশস্ত্র দেখ্‌তে পাই।

মানুষের তৈরি যে কোন একটি পাথর পেলেই আমরা তাকে প্রস্তর যুগের জিনিষ ব'লে মেনে নিতে পারি না। কোন মানুষের হাতে-গড়া অস্ত্র পেলেও আমাদের সেটিকে পরীক্ষা করবার জন্য কতকগুলি বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কাজ করতে হবে। প্রথম পাথরটির বর্ণবৈচিত্র্য (patination) দেখ্‌তে হবে, তারপর পাথরটিকে মাটির কত স্তর নীচে পাওয়া গিয়েছে এবং সঙ্গে অন্য কোন পাথরের জিনিষ কিংবা কোন জীবজন্তুর হাড় পাওয়া গিয়েছে কিনা এবং সেই জায়গাটির বিস্তৃত বিবরণ জানা দরকার। এই সবগুলির বিস্তৃত বিবরণ পাওয়ার পর নৃতত্ত্ববিদগণ এই জিনিষটি কোন যুগে ব্যবহৃত হয়েছিল তা বলে দিতে পারেন। কিন্তু যদি কেবল কয়েকটি মানুষের হাতে-গড়া পাথর পাওয়া যায় এবং অন্য কোন সাক্ষ্য বিদ্যমান না থাকে তাহ'লে তার কোন ঠিকানা করা সম্ভব হয় না।

অনেকের সন্দেহ হয় যে কি ক'রে পাথরের অস্ত্র বা যন্ত্র দিয়ে প্রস্তর যুগের মানুষ তার সমস্ত কাজ চালাত। এইখানে লীকির নিজের অভিজ্ঞতার কয়েকটি লাইন তুলে দিলে পাঠকদের আর বোধ হয় এ বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকবে না, "In Africa I myself have on one occasion taken a single Aurignacian backed-blade which was rather less than two inches in length, and which had lain buried in a cave deposit for something over 25,000 years, and with it I *have skinned* and *cut up* a Thompson's gazelle (which is about the size of a goat) in just under twenty minutes". (পৃঃ ৮১)।

এ ছাড়া প্রস্তর যুগের মানুষ তার সামান্য যন্ত্রপাতি নিয়ে পাহাড় গাত্রে এমন অদ্ভুত চিত্র এঁকে গেছে যা এখনও আমাদের কাছে অমূল্য সম্পদ বলে গণ্য হচ্ছে।

প্রস্তর যুগে যে মানুষের বাস ছিল সে বিষয়ে এখন আর কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু তাদের আকৃতি কিরূপ ছিল এই নিয়ে এখন পর্য্যন্ত অনেক আলোচনা চলেছে। এইসব মানুষের আকৃতি সম্বন্ধে খুব বেশী সাক্ষ্য এখন পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নি; যদিও অনেকগুলি প্রস্তর যুগের মানুষের খুলি এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয়েছে তবুও এ বিষয়ে বিশেষ কোন সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছান যায় নি, কারণ কতকগুলি খুলি নৃতত্ত্ববিদগণের বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে খুঁড়ে বের করা হয় নি এবং কোন যুগের নির্দ্ধারণ করবার জন্য যে সমস্ত তথ্যের দরকার তাহা না পাওয়ার দরুণ এগুলি সম্বন্ধে সঠিক কিছু বলা শক্ত। যেগুলি নৃতত্ত্ববিদগণ নিজেরা মাটির ভিতর থেকে উদ্ধার করেছেন সেগুলিকে কয়েকটি টাইপে (type) ভাগ ক'রেছেন। এদের মধ্যে সকলের চেয়ে যেটিকে পুরাতন ব'লে মেনে নেওয়া হয় সেটিকে জাভা দ্বীপে ত্রিনিল নামক স্থানে মাটির নীচে থেকে অন্যান্য জন্তুর হাড়ের সঙ্গে পাওয়া যায়। এটিকে নৃতত্ত্ববিদরা পিথেকানথ্রোপাস্ ইরেক্‌টাস বা সোজা আধা-মানুষ নামে অভিহিত করেন। এই মানুষটির সমস্ত দেহ পাওয়া যায় নি, কেবল মাথার খুলি এবং একটি উরুর অস্থি ও দুইটি দাঁত পাওয়া যায়। এর অনেক বিষয়ে মানবাকৃতি বাঁদরের সঙ্গে সাদৃশ থাকার দরুণ একে আধামানুষ বলা হয়।

হোমো সেপিয়নস্ (Homo Sapiens) ও প্রাগৈতিহাসিক মানুষের মধ্যে কয়েকটি বিশেষ পার্থক্য আছে। এইখানে হোমো সেপিয়নস্-এর মাথার খুলির কয়েকটি বিশেষত্ব উল্লেখ করছি, কারণ এইগুলির দ্বারাই সাধারণতঃ পার্থক্যের বিচার করা হয়। প্রথম, চোখের উপরে কপালের নীচের দিকে লম্বা ভাবে যে হাড় আছে তাকে সুপ্রা-অরবিটেল রিজ (supra-orbital ridge) বলে। এই হাড়টি চারিটি টুক্‌রা দ্বারা গঠিত এবং এক-একদিকে দুইটি টুক্‌রা আছে, এইরূপ গঠিত অস্থি কেবল হোমো সেপিয়নস্‌দের মধ্যেই পাওয়া যায়। দ্বিতীয়, নাকের পাশে ও চোখের নীচে যে ঢালু জায়গা আছে তাকে কেনাইন্ ফসা (Canine Fossa) বলা হয়, এটিও হোমো সেপিয়নস্‌দের বিশেষত্ব। তৃতীয় কানের ছিদ্রের নীচের দিকে যে হাড়টি থাকে তার নাম টিম্‌প্যানিক্ প্লেট্ (Tympanic Plate), এটি হোমো সেপিয়নস্‌দের মধ্যে একটি বিশেষ কোণে অবস্থিত। উল্লিখিত বিশেষত্বের দ্বারা হোমো সেপিয়নস্ ও

অন্যান্য মানুষের বিভাগ করা হয়, কিন্তু হোমো সেপিয়নস্ ছাড়া আরও কয়েকটি বিভিন্ন জাতির মানুষের খোঁজ আমরা পাই। প্রস্তর যুগের মানুষের মধ্যে কয়েকটি জাতি-বিভাগ করা হয়েছে, এগুলির মধ্যে নিয়েন্ডারথ্যাল্ জাতির সম্বন্ধেই অনেক কিছু আবিষ্কার হ'য়েছে এবং প্রাগৈতিহাসিক যুগে যে এই জাতির লোক বাস ক'রত এ বিষয়ে এখন আর নৃতত্ত্ববিদগণের মধ্যে কোন মতভেদ নেই; কিন্তু অন্যান্য প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষের জাতি সম্বন্ধে এখনও খুব বেশী সাক্ষ্য না পাওয়ার দরুণ সেগুলি সম্বন্ধে সঠিক কিছু বলা যায় না।

অনেকের মনেই এই প্রশ্ন জাগে যে, এই সমস্ত মানুষের কঙ্কালকে প্রাগৈতিহাসিক যুগের বলা হয় কেন? তার কারণ এইগুলো যে সমস্ত গহ্বর কিংবা মাটির নীচে থেকে পাওয়া গিয়েছে সেখানে প্রাগৈতিহাসিক যুগের সংস্কৃতির যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। এই কঙ্কালগুলির সঙ্গে একই স্তরে হয়ত কতকগুলি এমন জন্তুর হাড় পাওয়া গিয়েছে যারা কেবল সেই যুগেই বাস করত, কিংবা কতকগুলি পাথরের অস্ত্র কিংবা অন্য কোন নিদর্শন যা থেকে নৃতত্ত্ববিদগণ মানুষের বয়স নির্দ্ধারিত ক'রতে সমর্থ হ'য়েছেন।

এইরূপে বিবিধ বৈজ্ঞানিক প্রণালীর দ্বারা আজ নৃতত্ত্ববিদগণ মানবের বহু পুরাতন ইতিহাস উদ্ধার করবার চেষ্টা করছেন। লীকি নিজে বহু চেষ্টার পর আফ্রিকায় একটি প্রস্তর যুগের মানুষের খুলি ও একটি চোয়াল আবিষ্কার করেছেন। তাঁর এই আবিষ্কারের একটু বিশেষত্ব আছে, কারণ তিনি এই বিষয়ের বিশেষজ্ঞ এবং নৃতত্ত্বের দিক থেকে যে সমস্ত তথ্যের দরকার তা তিনি খুব সূক্ষ্মভাবে আহরণ করেছেন এবং আশা করা যায় তাঁর এই আবিষ্কারের আলোচনা আফ্রিকার প্রস্তর যুগের উপর নূতন আলোক পাত করবে।

বইটি খুব সহজভাবে এবং যথাসম্ভব বৈজ্ঞানিক পরিভাষা বাদ দিয়ে লেখা। সেইজন্য মনে হয় যে, এই বইটি সাধারণের নিকট বিশেষ ভাবে সমাদৃত হবে।

শ্রীজ্যোৎস্নাকান্ত বসু

The Well of Days—*By* Ivan Bunin. Translated from the Russian by Gleb Struve and Hamish Miles (Hogarth Press).

রাশিয়ান্ ভাষায় লেখা ঈভান্ বুনিনের এই বিখ্যাত উপন্যাসটির নাম *Arsenieva Istoki Dney*—আর্সেনিভ বংশের জীবনকথা বা বিগত দিবসের কূপ। মাতৃভাষায় বুনিন্ কবিতা, কথাসাহিত্য ও উপন্যাস বিস্তর লিখেছেন, কিন্তু রাজনৈতিক কারণে অর্থাৎ সোভিয়েট্‌বিদ্বেষী হিসাবে তিনি ফ্রান্সে দেশান্তরিত হয়ে বাস করেন। বনেদী বংশে তাঁর জন্ম, ছেলেবেলায় জীবন কাটে পৈত্রিক প্রজাদের সঙ্গে, শিক্ষাদীক্ষা হয় মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ে। পিতার নিকট গ্রন্থাগারের মধ্যে নানা ভাষার সাহিত্যের

সঙ্গে তাঁর গূঢ় পরিচয় হয়। Wanderlust-এর তাড়নায় তিনি নানাদেশ ভ্রমণ করেন। কর্ম্মসূত্রে পুল্‌টাভায় অবস্থানকালে তিনি রাশিয়ার দ্রষ্টা টলষ্টয়ের সঙ্গে পরিচিত হন। আবার তিনি বেরিয়ে পড়েন দেশে দেশে ভবঘুরের মত। সেথ্‌সাদীর ভাষার অনুকরণে তিনি বলেন—

'চলে যাব দূর দেশে দেখে যাব ধরণী,
হৃদয়ের ছাপ লবে সুদূরের সরণী।'

নানাদেশের আবহাওয়া, আচার ব্যবহার ও কৌতুকপূর্ণ কাহিনীতে তাঁর সব লেখা পরিপূর্ণ। তাঁর লেখায় গল্পাংশের গঠনশিল্প নেই বটে, কিন্তু অতিরঞ্জন বর্জ্জিত বাস্তবতার রঙে রচনাগুলি এক অপূর্ব্ব নিবিড়তা লাভ করেছে। বুনিন্‌ Realism-এর ভক্ত পূজারী। বাস্তবদর্শনের ফলে লব্ধ এক বিচিত্র অভিজ্ঞতায় তাঁর লেখা সমৃদ্ধ।

আলোচ্য উপন্যাসটি এক সুবৃহৎ আত্মকাহিনী। নায়কের শিশুকাল হতে যৌবনের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত এই দীর্ঘ আত্মচরিতে বর্ণিত হয়েছে। *Slavonic Review* পত্রিকায় লেখা হয়েছে :

"It is really a story of the formation of a man's personality from his early childhood to his youth, till he is about seventeen years old, a story told with a singleness of purpose and outlook, and reflecting the author's personality."

এই উক্তি সর্ব্বাংশে সত্য; গল্পের চরিত্রগুলির নাম বদলে দিলে বইখানিকে লেখকেরই আত্মজীবনী হিসাবে গ্রহণ করতে পারা যায়।

উপন্যাস-কথিত ঘটনার কাল—গত শতাব্দীর শেষাংশ। তখন Czar-এর প্রবল ক্ষমতা ও শাসনশক্তি রাশিয়ার চারিদিকে প্রকট।

আলেক্‌সির জীবনের যেটুকু ছবি এই দীর্ঘায়তন উপন্যাসে দেওয়া হয়েছে, তাতে অদ্ভুত বা কৌতুকময় কিছুই নেই। মধ্য এশিয়ার এক জমীদারবংশে তার জন্ম, ডন্‌ নদের উত্তরে তাদের সম্পত্তি, পাড়াগাঁয়ের আবহাওয়ার মধ্যে এই অনুভূতিপরায়ণ ছেলেটির প্রাথমিক শিক্ষা। তাই সর্ব্বপ্রথম শহর ও জেলখানার 'কীনাশ-কঠিন' মূর্ত্তি দেখে এর মনে যে-ভাবের উদয় হয়, তার বিস্তৃত বর্ণনা উপন্যাসের মধ্যে আছে। মাতার শীতল বুকের তলায় সে মোহাবিষ্ট হয়ে থাকে। এই অপূর্ব্ব মাতৃস্নেহের উল্লেখ করে আলেক্‌সি বলছে : "Everything and everybody we love is a torment, albeit a sweet and joyful torment"। বুটের পালিশ্‌ দেখে ছেলেটির কী অনাবিল আনন্দ! আস্তাবলের তেজীয়ান্‌ ঘোড়া দেখে তার মন চলে যায় জীবশক্তির প্রতীক এই চতুষ্পদের দিকে। জুয়া খেলে তার বাবা সব টাকা উড়িয়েছে, তাই তার মনে বড় কষ্ট। আবাদের একটি রাখাল ছেলের আকস্মিক মৃত্যুতে মরণের যথার্থ স্বরূপের সঙ্গে তার প্রথম পরিচয় হলো। কঠিন পীড়ার সঙ্গেও তার পরিচয় অতি শৈশবে। ছোট ছোট জাগতিক অভিজ্ঞতা ছেলেটির চোখে যেন নবজগতের আবিষ্কারের মত বোধ হতে লাগল।

স্কুলের শিক্ষা এই গ্রাম্য ছেলেটির কাছে প্রথম বেশ ভালই লেগেছিল, কিন্তু শীঘ্রই এ মোহ দূর হল। ক্লাসে যারা একটু বয়স্ক ও অকালপক্ক, তাদের কলুষ

আলেক্‌সিকে স্পর্শ করতে পারেনি বটে, কিন্তু পাপজগতের অস্তিত্বের প্রতি তার মন বেশ সজাগ হয়ে উঠল। "By that time I had already begun to take an interest in people"। ক্রমে বস্তুজগতের প্রতি তার শিশুসুলভ কৌতূহল কমে গেল—যৌনজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে মানবচরিত্র জানবার চেষ্টা তার বেড়ে চল্‌ল। আলেক্‌সির জ্যেষ্ঠ ভাই কলেজে পড়বার সময় চরিত্র-সম্পৎ নষ্ট করলে। এক ব্যাপারে সে পুলিশের হাতে ধরা পড়ল। এই খবর নিয়ে যে দুতটি আসছিল, সে মারা গেল এক বৃক্ষপতনে। সেই ভয়াবহ ঘটনাটি লেখক অপূর্ব্ব বাস্তব করে এঁকেছেন।

এই সময় আলেক্‌সির প্রাণের চেতনা অজস্র পুষ্পসম্ভারের মত বিকশিত হয়ে উঠল। ফুলগাছে ফুলফোটার সঙ্গে লেখক এর তুলনা করেছেন। এই বর্ণনাটি বড় চমৎকার—

"Astonishing is the spring burgeoning of a tree. And how astonishing it is when the spring is harmonious, happy. Then that invisible process which is incessantly going on within it, shows itself, becomes manifest in a particularly marvellous way. Looking at the tree one morning you are struck by the abundance of buds that have covered it during the night. And after a certain time the buds suddenly burst forth......and the black pattern of the twigs is at once strewn with countless bright green flecks. Then the first cloud comes over, the first thunder roars, the first warm shower comes rushing down and again a miracle happens: the tree has already become so dark, so splendid in comparison with its bare tracery of yesterday, has spread out its wide glossy greenery so thick and far, stands in such beauty and strength of young firm foliage, that you simply cannot believe your eyes......".

একজনের ভাগ্য আর একজনের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত করে; আলেক্‌সির ভাগ্যও তার পরিবারস্থ আর সকলের ভাগ্যকে প্রভাবিত করল। বাপের ইচ্ছা সত্বেও আলেক্‌সি আর স্কুলে গেল না। এতদিন তার চরিত্রে মায়ের প্রভাব ছিল, এখন তার পরিবর্ত্তে ফুটে উঠল বাপের প্রভাব—তার বাপের উচ্ছল প্রাণশক্তি, সাময়িক ঘটনার বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রাম, তাঁর অধ্যবসায়, তাঁর উচ্ছ্বাসপ্রবণতা। বাটুরিণোর আবাদে যে স্বচ্ছন্দ জীবন, তা একটানা নদীর মতই প্রশান্ত। কিন্তু এই নিবিড় প্রশান্তির ভিতর দিয়েই একটি অনুভূতিসম্পন্ন প্রাণের বিকাশ। রাশিয়ার দারুণ শীতে করকাপাত ও আনন্দহীন জীবনযাত্রা,—এতে কী বৈচিত্র্য আছে? তরুণ জীবনের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ—বিকশিতযৌবনা নারীর সান্নিধ্য। আলেক্‌সির অন্ধকারময় জীবনে গভীর আনন্দের স্বর্ণদ্যুতি ফুটে উঠেছিল Annchen-এর সঙ্গলাভে। একটি তরুণীর কোমল, চিক্কণ, কবোষ্ণ হস্তের পেলব স্পর্শে তার জীবনটি কয়েকদিনের জন্য মধুর করে তুলেছিল সন্ধ্যার রঙীন আকাশের মত।

আলেক্‌সির আত্মীয় পিসারেভের মৃত্যু হল। কর্ম্মবাদী হিন্দুর মত সে জীবনের সমস্ত রহস্য সমাধান করতে চেষ্টা করল। মৃত্যুর অমোঘ আহ্বানে আলেক্‌সির মনে মৃত্যুঞ্জয়ের কথা মনে পড়ল:

"The Lord reigneth; He is apparelled with majesty; the Lord is apparelled. He has girded himself with strength."

উপন্যাসের তৃতীয়াংশের গোড়ায় পিসারেভের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার বিশদ বর্ণনা। ছোট ছোট কথার জরীর-কাজ-করা বাক্যাংশগুলি মনকে অভিভূত করে ফেলে, অথচ গল্পাংশ মোটেই অগ্রসর হয় না। হিন্দী বা উর্দ্দু গানের প্রথম চরণের মত,—খেয়াল-গাইয়েরা যেমন একটা পংক্তিকে নানা সুরের রকম-ফেরের মধ্য দিয়ে অন্তরার দিকে টেনে নিয়ে যায়। এই অধ্যয়ন-লিপ্সু ষোড়শবর্ষীয় কিশোর তখন জীবনের অনেকখানি অংশ সর্ব্বাঙ্গীণভাবে দেখতে পেয়েছে, যেটা সকলের ভাগ্যে সহজে হয় না। প্রকাণ্ড জমীদারীর বাগানে ঋতুর বিচিত্র উদয়ে তার প্রকৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়েছে; গ্রন্থাগারের বিপুল গ্রন্থস্তূপের মধ্যে বসে সে এখন কবিযশঃপ্রার্থী হয়ে উঠেছে। প্রভাতে মধ্যাহ্নে সন্ধ্যায় সে প্রকৃতির বিচিত্ররূপ দেখেছে নয়ন ভরে। এই সময় আলেক্‌সি আর একটি তরুণীর প্রকৃতি আসক্ত হলো মনে মনে, তার নাম লিজা বিবিকভ্‌। "Poetry, daydreams, nature"-এর ভক্ত আলেক্‌সি এই প্রেম-ঘটিত ব্যাপারে কয়েকদিনের জন্য মুহ্যমান হয়ে রইল। কাবারডিংকা-নামক ঘোড়ায় চড়ে হেমন্তের রাত্রে আলেক্‌সির শহরে যাত্রা ও বাটুরিণোর জমীদারী ত্যাগের সঙ্কল্প। তার ভাই নিকোলাস্‌ একটি জমি কিনে সেখানে এক তরুণী দাসী নিয়ে বাস করতে লাগল। আলেক্‌সির সৌন্দর্য্যপিপাসু নয়ন এই তরুণীর রূপে একটু বিহ্বল হয়ে পড়ল। সতেরো বছরের কিশোর কুড়ি বছরের তরুণীকে একদিন নির্জ্জনে আলিঙ্গনবদ্ধ করেছিল। তরুণীটির স্বামী ফিরে এলে নিকোলাসের সদ্‌যুক্তিতে আলেক্‌সির মন আবার অন্য পথে ঘুরল।

উপন্যাসের চতুর্থাংশে দেখতে পাই, এই আর্সেনিভ পরিবারের তিনটি ছেলে তিনদিকে বেরিয়ে পড়েছে। নিকোলাস্‌ ত পূর্ব্বেই অন্য জমিতে সস্ত্রীক বসবাস করছে, জর্জ্জও তার অনুসরণ করতে প্রস্তুত, আলেক্‌সিও বেরিয়ে যাবার পথ খুঁজছে। একখানি মাসিকপত্রে কাজ পাবার আশায় আলেক্‌সি খার্‌কভের পথে বেরিয়ে পড়ল। এক বেদের দল তার ভাগ্যপরীক্ষা করে। তরুণবয়স্কা এক বেদেনীর উল্লেখ করে সে বলচে—

"She looked, of course, very motley in her bright red and yellow rags, and all the time she faintly swung her hips, telling me the usual silly stuff, throwing away the kerchief from her small jet-black head and tormenting me not only by her hips, by the dreamy sweetness of her lips and eyes, but also by her antiquity, redolent of distant lands......"

জীবনের বিশ্লেষণ করে আলেক্‌সি লিখছে: "দিবস ও রাত্রি, শ্রম ও বিশ্রাম, মিলন ও কথন, আনন্দ ও কদর্য্যতা—যাকে আমরা বলি 'ঘটনার সমবায়'—এই সব নিয়ে মানব জীবন। মনের উপর কতকগুলি রেখাপাত, ছবি ও প্রতিচ্ছবি—এদের সংমিশ্রণেই জীবন। এই জীবনপ্রবাহ অবিরাম ধারায় বয়ে চলেছে। অসংলগ্ন ভাব ও চিন্তাজাল, ভূত ঘটনার অসংবদ্ধ স্মৃতি ও ভবিষ্যকালের অসম্পূর্ণ আকাঙ্ক্ষা—এদের একত্র মিলনেই আমাদের জীবন গঠিত।"

আরকভ্‌-জীবনের জটিলতার ভিতর আলেক্‌সি আপনাকে মুক্ত করে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। সাহিত্যচর্চ্চা, অর্থাভাব ও লোকচরিত্রজ্ঞানের ভিতর দিয়ে জীবনের অভিজ্ঞতা তার নানাভাবে সঞ্চিত হতে লাগল। তারপর ছেলেটি চলে গেল সুদূর

দক্ষিণে—ক্রাইমিয়ায়, নাম গোপন করে। অভাবের দারুণ যন্ত্রণা তখন তাকে মরীয়া করে তুলেছে, অথবা নাম করবার অদম্য পিপাসা তাকে পেয়ে বসেছে। ক্রাইমিয়া হতে সিবাসটাপোল্—বিলাস-লাস্যময় দক্ষিণের দেশে। ম্লান ও ধূসর আকাশে গরমের আমেজ, কিন্তু তাতেও যেন দক্ষিণের তাজা শিহরণ। বালাক্লাভা ছাড়িয়ে একেবারে সমুদ্রতীর। পথহারা পথিক সেই মাটির সীমান্তদেশে তিমিরঘন নিশীথে একাকী অপেক্ষমাণ; সম্মুখে গন্ধাঢ্য কুহেলিকার ও হিমশীতল তরঙ্গের নিবিড় প্রক্ষেপ; তরঙ্গের গুরুগর্জ্জন কখনো থামে, কখনো বাড়ে,—যেন গভীর গহনবনের হাহা-শ্বাসের আকৃতি······সেই রসাতল ও বিভাবরী, যেন এক অস্থির ও অন্ধ মানবের যাতনাময় জীবন জরায়ুর মধ্যে জ্ঞানহীন অথচ বিদ্রোহীর মত কালযাপন করছে।

এইখানে এসে আলেক্‌সি খবর পেলে তার বাবা বাটুরিণোর কিছু সম্পত্তি বিক্রয় করে তাকে কিছু টাকা পাঠিয়েছেন। সে দেশে দেশে ছুটে চলল—ঝড়ের মত, কিয়েভ্ থেকে কুর্স্ক্, কুর্স্ক্ থেকে পিউটিব্‌ল্। কিন্তু হঠাৎ তার বাড়ী ফেরবার ইচ্ছা হওয়ায় যাত্রাভঙ্গ করতে হল। পথে খবরের কাগজটির অফিস দেখার কৌতূহল হওয়ায় আলেক্‌সি একবার সেখানে গেল। সম্পাদিকা এক তরুণী সুন্দরী। তাঁর এক সম্পর্কীয়া ভগ্নী লাইকার রূপে সে মুগ্ধ হল। রাশিয়ার এক Grand Duke-এর মৃত্যুবর্ণনা দিয়ে আত্মকাহিনীটি শেষ হয়েছে।

বুনিনের লেখার স্বচ্ছন্দগতি ও বাস্তববাদ আমাদের মুগ্ধ করেছে। গল্পের কোন বিশিষ্ট ধারা না থাকায় যথেচ্ছজাত সহজ সুন্দর কমনীয় কুসুমের মত লেখকের জীবন শৈশব হতে কৈশোরে, কৈশোর হতে যৌবনে স্তরে স্তরে ফুটে উঠবার অবকাশ পেয়েছে। ঠাকুরমার বিবাহ-বাসরে ব্যবহৃত ও যত্নরক্ষিত রাঙ্গা চেলীর মঞ্জুষা থেকে যে গন্ধের মৃদু নিঃশ্বাস প্রবাহিত হয়, এই উপন্যাসে কথিত এক বিস্মৃত যুগের কাহিনীর ভিতর দিয়ে অতীতের সেইরূপ একটা ঘনীভূত সুরভি নিঃসারিত হচ্ছে। সে যুগ আর নেই, সে ঘটনার আর পুনরভিনয় হবে না, কিন্তু তবুও সে-যুগের প্রাণস্পন্দন এই বর্ত্তমান যুগের নরনারীর বুকের তালে তালে বেজে চলেছে আদিমতা ও স্বাভাবিকতার শক্তি নিয়ে।
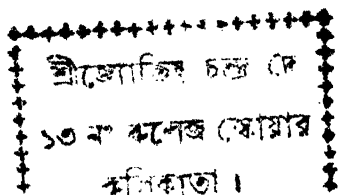
শ্রীমোহিনীমোহন মুখোপাধ্যায়

Eastward from Paris—By Edouard Heriot (Gollancz).

আমাদের দেশে যাঁরা সংবাদপত্র পড়েন তাঁদের কাছে লেখকের নাম অবিদিত নয়। এড্‌ওয়ার্ড হেরিও তিন তিন বার ফরাসী দেশের প্রধান মন্ত্রী হয়েছেন, এবং বেঁচে থাকলে আরো অনেকবার হয়ত হবেন। য়ুরোপে শান্তিস্থাপনকার্য্যে তাঁর দান ব্রিঁয়ার অপেক্ষা কম নয়। এই পুস্তকখানিকে য়ুরোপে শান্তিস্থাপনের একটি প্রাণপণ চেষ্টা হিসেবে দেখলে লেখকের ওপর ন্যায় বিচার করা হবে।

গত দু বৎসরে য়ুরোপে এমন একটি কাণ্ড ঘটেছে যাতে বিভিন্ন দেশের নেতৃবৃন্দ শান্তিরক্ষার জন্য রীতিমত চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। ঘটনাটি হচ্ছে নাৎসীদের শক্তিবিস্তার অর্থাৎ জার্ম্মানীর সামরিক মনোভাব। ফ্রান্স ও জার্ম্মানীর মধ্যে মৌখিক ভদ্রতা রাখা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। তাই আজ ফ্রান্স বন্ধু খুঁজতে ব্যস্ত। ভার্সেই সন্ধির পরে মধ্য য়ুরোপে যে সব নতুন রাজ্য তৈরী হয়, সেগুলি এতদিন ফ্রান্সের তত্ত্বাবধানে বর্দ্ধিত হয়েছে। কিন্তু সে সব দেশেও ভীষণ গোলমাল চলছে—সেখানকার minorities গুলি জাতিতে ও কৃষ্টিতে জার্ম্মান এবং প্রতিপত্তিশালী। তাদের জার্ম্মানীর জার্ম্মানদের সঙ্গে সহানুভূতি থাকা নিতান্তই স্বাভাবিক। এতএব ফ্রান্সের নতুন মিত্র চাই। কে এই মিত্র হবে? এতদিন রাশিয়া ছিল অচ্যুতের দলে। আজ তাদের রাজ্যতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত, তাদেরকে আর বিপ্লববাদী কম্যুনিষ্ট বলা চলে না, তাদের আছে লোকসংখ্যা, সৈন্যবল, তাদের উৎপাদন-শক্তি, চাহিদা, আমদানী-রপ্তানীর হার ক্রমবর্দ্ধমান। অন্যধারে রাশিয়া বুঝেছে যে নাৎসী আন্দোলন মুখ্যত, কম্যুনিজমেরই বিপক্ষে, রাশিয়া দেখছে যে পূর্বদিকে জাপান তার ক্ষমতা বিস্তার করছে, সাইবিরিয়ার দরজায় তাঁবু গেড়েছে। এমন অবস্থায় পড়লে সবারই মত বদলায়। ফ্রান্সের সঙ্গে রশিয়ার ভাব হওয়া চাই। এবং সেই সঙ্গে সন্ধিস্থাপন করা চাই বুলগেরিয়া ও তুর্কীর সঙ্গে—যেন ১৯১৪ সনের ভুলের পুনরাবৃত্তি না হয়।

পূর্ব্বোক্ত উদ্দেশ্য সাধন করবার জন্য হেরিও সাহেব দেশ ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। বুলগেরিয়া ও আঙ্গোরার রাজ্যতন্ত্রের অত সুখ্যাতি এবং রাশিয়ান রাজ্যতন্ত্রের অমন ভদ্র সমালোচনা মিত্রতা স্থাপনেরই ইচ্ছা-প্রসূত। হেরিও সাহেব যে দেশেই যাচ্ছেন সেই দেশেই লক্ষ্য করছেন ক'জন ফরাসী শিক্ষক আছে, ফরাসী সভ্যতার প্রতি সেই দেশবাসীর শ্রদ্ধা অটুট আছে কি না। ফরাসী পণ্যের আমদানীর হ্রাসবৃদ্ধির প্রতি তাঁর শ্যেন দৃষ্টি। যদি কোথাও দেখছেন যে ফরাসীর প্রভাব কমছে অমনি সঙ্গে সঙ্গে প্রভাব-বৃদ্ধির উপায় বলে দিচ্ছেন। যে সব সদ্গুণের সাহায্যে ফরাসী দেশের প্রধান মন্ত্রিত্ব তিনবার অর্জ্জন করা যায় তাদের চিহ্ন এই বইখানির প্রত্যেক ছত্রে বর্ত্তমান।

রাশিয়া সম্বন্ধে তাঁর মতামত নিতান্তই মজার। ছুরীর ওপর অতটা মিছরী মাখানো ফরাসী লেখকের দ্বারাই সম্ভব। মিষ্ট আবরণটি চেঁচে ফেলা যাক্। পড়ে থাকে একটি পাঁচমুখো ছুরী—তার প্রত্যেক ফলকটি চক্‌চকে। প্রথম ফলক—আর্থিক সমতা রাশিয়ায় নেই; দ্বিতীয় ফলক—আর্থিক বিভাগ ব্যক্তিগত ক্ষমতার ওপর নির্ভর করছে—needs-এর ওপর নয়। তৃতীয় ফলক—রাশিয়ার দেশাত্মবোধ থাকতেও পারে, না থাকতেও পারে—কিন্তু আজকালকার রাজ্যশাসন-পদ্ধতি সাধারণ সোভিয়েটতন্ত্রের অন্তর্গত বিভিন্ন জাতির জাতীয়তা-বোধের যথেষ্ট প্রশ্রয় দেয়—এবং সব দেশই কম্যুনিষ্ট হোক্—এক ছাঁচে ঢালাই হোক্ চায় না। চতুর্থ ফলক—রাশিয়া নিতান্তই শান্তিপ্রিয়—গায়ে পড়ে কারুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে চায় না—কিন্তু আক্রমণকারীকে শিক্ষা দিতে সদাই উত্তমরূপে প্রস্তুত। পঞ্চম ফলক—প্রতি মুহূর্ত্তে রাশিয়া তার ইতিহাসের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাচ্ছে—অর্থাৎ ইতিহাসের পরম্পরা ক্ষুন্ন করে নতুন কিছু করছি এই বিপ্লবী মনোভাব আজ আর সে দেশে কারুর মধ্যে নেই। পঞ্চবার্ষিক প্ল্যান খুবই সফল হয়েছে—কিন্তু সব বিষয়ে নয়—যেখানে হয়নি সেখানে ফরাসীদের সাহায্য নিলে

খুব শীঘ্র সফল হবে। মোদ্দা কথা এই—ষ্ট্যালিনের আশীর্ব্বাদে আজ রাশিয়া তার কম্যুনিজমের প্রায় সব প্রধান সর্ত্তগুলিই পরিত্যাগ করেছে, অতএব ফ্রান্সের সঙ্গে রাশিয়ার মৈত্রীস্থাপন এইসময় মোটেই অসম্ভব নয়।

পরিচয়ের পাঠক কিন্তু রসগ্রাহী, তাই মিছরীর সন্ধান দিচ্ছি। মিছরীর এমন রূপ সাধারণতঃ চোখে দেখা যায় না। হেরিওর পাণ্ডিত্য, এবং তার চেয়েও তার পাণ্ডিত্য বহন আমাকে মুগ্ধ করেছে। Archaeology-তে তিনি নিজে বিশেষজ্ঞ, আনাটোলিয়ার ভগ্নস্তূপের ইতিহাসও তিনি জানেন। তাঁর সঙ্গে দেশ ভ্রমণ একটি চমৎকার ইতিহাসের শিক্ষা। রাশিয়া, ল্যাটভিয়ার পুরাতন গির্জ্জায় প্রবেশ করেই রাশিয়ান উপাসকের সংখ্যা (বা রে কম্যুনিজমের অধার্ম্মিকতা !) গোণবার পরেই তার চোখে পড়ে রঙ্গীন কাচ ও দেব দেবীর মূর্ত্তি ও আইকন। কেবল কি তাই ? সমুদ্র ও আকাশের কত রকমের রং, কোন স্থানের কোন রকমের পাখী, বুলগেরিয়ার কত রকমের গোলাপ, কিছুই তাঁর চোখ এড়ায় না। এমন সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি খুব কম সাহিত্যিকের থাকে। হেরিওর লেখা এই জন্যই অত Concrete। তিনি কেবল মাত্র পলিটিসিয়ান নন্, তিনি জীবন ও প্রকৃতি উভয়কেই ভাল করে চেনেন ও জানেন।

আমাদের দেশের কয়েকজন নেতা অমন ভ্রমণ বৃত্তান্ত লিখিতে পারেন ? ভারতের কৃষ্টিপ্রসারে যে সব প্রচারক বিদেশে যান তাঁদের মধ্যে কজনই বা সেই দেশের ফল ফুল, লতাপাতা, পাখী, আকাশের রং চেনেন ? সে দেশের জীবন ও ইতিহাস সম্বন্ধেও তাঁদের অজ্ঞতা পাহাড়প্রমাণ। কেন এমন হয় জানতে বড় ইচ্ছা করে। বিদেশী ভাষার ওপর আংশিকভাবে দোষ চাপানো চলতে পারে—কিন্তু আমাদেরও দোষ নেই কি ? জগতের তৃতীয়নেত্র ফোটাতে গিয়ে আমরা হয়েছি কানা। হয়ত বা, সমপদস্থ হলে পরস্পরের দোষগুণ যেমন পরিষ্কারভাবে ধরা পড়ে তেমনি অন্তত, Dominion Status পেলেও ভিন্ দেশের নৈসর্গিক দৃশ্য সম্বন্ধে চক্ষুষ্মাণ হব। ইতিমধ্যে কিন্তু আমরা যে তিমিরে সেই তিমিরে। এই ধরণের বই পড়লে দুঃখের সঙ্গে হিংসা হয়।

ধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

History of Political Thought—Rammohan to Dayanand—Vol. 1, Bengal—By Prof. Bimanbehari Majumdar. (Calcutta University).

আলোচ্য পুস্তকখানি মোটামুটি উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালী ভাবুকমণ্ডলীর রাষ্ট্রনীতিক ভাবনার ইতিহাস। তবে গ্রন্থকার সুরেন্দ্রনাথপ্রমুখ কংগ্রেস-নেতৃগণের মতামতের বিচার ইহাতে করেন নাই। হয়ত পরবর্ত্তী কোন খণ্ডে করিবেন। পুস্তক আরম্ভ হইয়াছে রাজা রামমোহনের যুগ হইতে, কেন না মজুমদার মহাশয়ের মতে তিনিই রাষ্ট্রনীতি-ক্ষেত্রে ভারতের আদিগুরু। রামমোহন যে একজন জগৎ-বিশ্রুত ভাবুক

ছিলেন, এ কথা সর্ব্ববাদিসম্মত। তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা কেবল ব্রাহ্মধর্ম্মস্থাপনার্থ পর্য্যবসিত হয় নাই। তাঁহার সমসাময়িক দেশবাসীর চিন্তা তিনি নানা মুখে চালিত করিয়াছিলেন। এ সবই সত্য। কিন্তু, "It is not unlikely that when the nature of political thought of the Raja comes to be correctly appreciated, there may be a movement in modern India to go back to the ideal of the Raja" এ কথার সমর্থন আমরা করিতে পারিলাম না। ভারত এই এক শতাব্দীতে বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে। পুনরাবর্ত্তনের আর কোন কারণ নাই।

আলোচ্য গ্রন্থখানি আট পরিচ্ছেদে বিভক্ত। পরিচ্ছেদগুলির নাম করিলে মোটামুটি বোঝা যাইবে গ্রন্থকার ভারতের রাষ্ট্রনীতিক চিন্তার ধারাকে কি চক্ষে দেখিয়াছেন। পরিচ্ছেদ বিভাগ এইরূপ—(১) রাজা রামমোহনের রাষ্ট্রনীতিক ভাবনা। (২) দার্শনিক ভাবুকমণ্ডলী। (৩) রাজা রামমোহনের political শিষ্যবর্গ। (৪) লিবারেল-পন্থিগণ। (৫) লিবারেল-পন্থার বিরুদ্ধবাদিগণ। (৬) শিশিরকুমারের রাষ্ট্রনীতিক চিন্তা। (৭) রাষ্ট্রনীতি ও মুসলমান সম্প্রদায়। (৮) বঙ্কিমচন্দ্রের রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা।

মুখবন্ধে মজুমদার মহাশয় রাষ্ট্রনীতি কথাটার অর্থ দিয়াছেন। সে অর্থ আমরা সম্যক্‌রূপে গ্রহণ করিতে পারিলাম না। আমাদের মনে হয় যে, গ্রন্থকার রাষ্ট্রনীতি, রাষ্ট্রব্যবস্থা ও গণতন্ত্র এই তিনটী পদার্থকে স্বতন্ত্রভাবে দেখিতে পারেন নাই। রাষ্ট্র-ব্যবস্থা মাত্রই গণতন্ত্র নহে, হওয়ার প্রয়োজনও নাই। কিন্তু রাষ্ট্রনীতি বলিলে সর্ব্ব-প্রকার রাষ্ট্র-ব্যবস্থা সম্বন্ধে বিচার ও আলোচনা বুঝায়। সমগ্র মানবজাতির political চিন্তার ধারা পর্য্যালোচনা করিতে হইলে, অতীতকালে যুগে যুগে, দেশে দেশে, যে সকল ক্ষুদ্র বৃহৎ রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টা হইয়া গিয়াছে, তাহার কোনটীকেই অবহেলা করিলে চলিবে না। এই সমুদয় প্রচেষ্টা নানাজাতীয় ও নানাপ্রকারের। একদিকে যেমন যবন ঋষি Aristotle ক্ষুদ্র নগর-রাষ্ট্রের ব্যবস্থা সম্বন্ধে কি জল্পনা কল্পনা করিয়া গিয়াছেন তাহা প্রণিধানযোগ্য, অন্যদিকে তেমনই, সমগ্র খৃষ্টীয় সম্প্রদায়ের একীকরণ উদ্দেশ্যে রাজচক্রবর্ত্তী Holy Roman Emperor-এর পরিকল্পনা, বা অখণ্ড মুসলমান সম্প্রদায়ের পরিচালনার জন্য খেলাফৎ প্রতিষ্ঠা, বা হিন্দু ইহুদী শিখগণের ধর্ম্মমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থা, এ সমস্তই আমাদের অনুধাবনের বিষয় হওয়া উচিত। এই সকল কথা মজুমদার মহাশয়ের মত বিচক্ষণ লেখকের গ্রন্থারম্ভে আলোচনা করা কর্ত্তব্য ছিল। গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় শুদ্ধ ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালীর রাষ্ট্রীয় ভাবনা, এ কথা বলিলে আমার আপত্তির খণ্ডন হয় না। কেন না, যে মৃত্তিকায় বীজ প্রোথিত হয়, তাহার গুণাগুণের বিচার না করিয়া, বৃক্ষের জন্মকথা বলিতে গেলে, সে কথা লোকের চক্ষে অসম্পূর্ণই প্রতীয়মান হইবে। তথা, বীজেরও গুণাগুণ বিচার করিতে হইবে। আমাদের রাষ্ট্রনীতির বীজ না কি আসিয়াছিল বিলাত হইতে! কি বীজ পাঠাইয়া-ছিলেন সাহেবেরা? ইংলণ্ডের রাষ্ট্রব্যবস্থা ত তথাকথিত গণতন্ত্র মাত্র! রাষ্ট্রীয় চিন্তাক্ষেত্রে গোঁজামিল বই কিছু নয়! হয়ত বিলাতখণ্ডে একদিন ইহার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু আজ সকলেই বুঝিয়াছে যে, ঐরূপ পার্লামেণ্টদ্বারা শাসন রাষ্ট্রব্যবস্থার একমাত্র, বা প্রকৃষ্টতম, পন্থা নহে। জগতের জাতিসমূহ আজ আর রাষ্ট্রনীতিক প্রেরণার জন্য ইংলণ্ডের মুখাপেক্ষী নহেন। একদিন অতিমাত্রায় মুখাপেক্ষী ছিলেন।

আমাদের গত শতাব্দীর ভাবুকেরাও সেইরূপ চাতকের মত উর্দ্ধমুখে ইংলণ্ডের পানে চাহিয়া বসিয়াছিলেন। তবে তাঁহারা শুধু প্রেরণার জন্য চাহেন নাই, ভিক্ষার জন্য, অনুগ্রহের জন্যও চাহিয়াছিলেন। তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন, বিলাত হইতে ভিক্ষালব্ধ ধন আনিয়া ভারতে মহাজাতি সংঘটন করিবেন! কিন্তু তাহা ত হয় না, কোথাও হয় নাই কোন দিন।

এ দেশের মাটিতে কি রস ছিল তাহা সুপণ্ডিত গ্রন্থকারের আগে দেখানো উচিত ছিল। ভারতের প্রাচীন রাষ্ট্রনীতিক আদর্শের অল্পবিস্তর বিচার করা উচিত ছিল। তাহা না করিয়া তিনি একেবারে উনবিংশ শতকের অর্দ্ধ-ইংরেজীভাবাপন্ন বাঙ্গালী ভাবুকমণ্ডলীকে আসরে নামাইয়াছেন। এই ভাবুকমণ্ডলী আমাদের আদরের ও গৌরবের বস্তু হইলেও এ কথা স্বীকার করিতে হইবে যে, তাঁহারা মুখ্যতঃ ইংলণ্ডের রাষ্ট্রনীতিক ভাবনার প্রতিধ্বনি তুলিয়াছিলেন মাত্র। আমি সকলের কথা বলিতেছি না। তবে তাঁহাদের অনেকেরই সাধনার প্রধান লক্ষ্য এই ছিল যে, কি উপায়ে তাঁহারা আপন জাতি বা শ্রেণীকে ইংরেজের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিবেন, গৌর আমলা-তন্ত্রের স্থানে কৃষ্ণবর্ণ আমলাতন্ত্র বসাইবেন। তখনকার দিনে ইংলণ্ডের শাসক-সম্প্রদায় ছিল Country Squires বা পল্লীগ্রামের ভূস্বামিমণ্ডলী। ইঁহারাই ইটন্ ও অক্সফোর্ডে শিক্ষা-দীক্ষা প্রাপ্ত হইয়া পার্লামেণ্টে বসিয়া গণতন্ত্রের অভিনয় করিতেন। আমাদের উনবিংশ শতকের নবজাত intelligentsia-রও তাই ধারণা হইয়াছিল যে, এদেশেরও ভাগ্যনিয়ন্তা হইবেন ইংরেজীনবীশ সম্প্রদায়। এই ধারণা হইতে অশেষ অনর্থ উৎপন্ন হইয়াছে। আজও আমরা এ মোহ কাটাইয়া উঠিতে পারি নাই। সেই জন্য আমাদের মনে হয় যে মজুমদার মহাশয় যদি পুস্তকারম্ভে ভারতের নিজস্ব প্রাচীন রাষ্ট্রনীতিক প্রতিভার আলোচনা বিশদভাবে করিতেন তাহা হইলে আমরা বুঝিতাম যে, রামমোহন, রাজনারায়ণ ও বঙ্কিমচন্দ্রের রাষ্ট্রনীতিক প্রতিভার যথার্থ মূল কোথায়।

আর এক কথা আছে। গ্রন্থকার যে ভারতের সাত শতাব্দীর ইতিহাসকে পরাধীনতার যুগ বলিয়া অবজ্ঞাভরে একপার্শ্বে সরাইয়া দিয়াছেন, ইহাও আমাদের মতে অবিবেচনার কার্য্য হইয়াছে। ইংলণ্ডের রাষ্ট্রনীতির ক্রমবিকাশ পর্য্যালোচনা করিতে বসিয়া কি নর্ম্মান যুগের ইতিহাসকে উড়াইয়া দেওয়া চলে? মুসলমান নৃপতিগণের মধ্যে আকবর বাদশাহ, বঙ্গের হোসেন শাহ ও জগদ্‌গুরু আখ্যাপ্রাপ্ত ইব্রাহিম আদিল শাহের ন্যায় প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষও ছিলেন। তাঁহাদিগকে ত চেঙ্গীস আটীলার সহিত এক পর্য্যায়ভুক্ত বলিয়া ফেলিয়া দেওয়া চলে না। দিলে ইতিহাসের অবমাননা হয়। মোগল পাঠান ভূপতিগণ ত সাহেব সিবিলীয়ানদিগের মত পেনশন লইয়া স্বদেশে ফিরিয়া যাইবেন বলিয়া ভারতে আসেন নাই! তাঁহাদের রাজত্বকালকে কোনক্রমেই পরাধীনতার যুগ বলা যায় না। সুতরাং সে যুগে রাষ্ট্র-ব্যবস্থা সম্বন্ধে ভাল মন্দ যাহা কিছু নূতন প্রচেষ্টা হইয়াছে তাহাও আমাদের সর্ব্বথা বিবেচ্য। ভারতের political thought বলিতে যাহা বুঝায় তাহার আলোচনা করিতে গিয়া আইন-ই-আকবরীকে বাদ দিলে চলিবে কেন? হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সম্বন্ধে উৎসাহ যদি আমাদের জ্ঞাতব্য বিষয় হয়, ত তোডরমলের রাজস্ব বন্দোবস্ত নিশ্চয়ই আমাদের বিবেচ্য।

ইংরেজ রাজত্বের ফলে ভারতের চিন্তাক্ষেত্রে রাষ্ট্রনীতির নবীন আদর্শ অঙ্কুরিত হইয়াছে, ইহা নিঃসন্দেহ সত্য। কিন্তু সহস্র সহস্র বৎসরের culture-এর (কৃষ্টির) ফলে সেই ক্ষেত্র কিরূপ প্রস্তুত ছিল, তাহারই উপর নির্ভর করিতেছে অঙ্কুরের ভবিষ্যৎ। ঊনবিংশ শতাব্দীর কোন্ ভাবুক ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে ভারতের দুইজন প্রতিনিধি বসাইবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন, কোন্ ভাবুক ভারতে ইংরেজ উপনিবেশ স্থাপনের পক্ষপাতী ছিলেন, কোন্ ভাবুক বোর্ড অফ্ রেবিনিউ-এ একজন পাঁচ হাজার টাকা বেতনের ভারতীয় মেম্বর নিয়োগ প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাহার তালিকা কি আজ বিশেষ কোন কাজে লাগিবে? নবীন রাষ্ট্রীয় আদর্শ অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইবে, না আমাদের রাষ্ট্রীয় জীবন একদিন ফল ফুলে শোভিত বিশাল মহীরুহে পরিণত হইবে, তাহা কি নির্ভর করিতেছে এই সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড খণ্ড ভাবনা বা প্রচেষ্টার উপর? এ প্রচেষ্টাসমূহ কতদূর কৃত্রিম, কতদূর স্বাভাবিক, কতদূর অনুকরণস্পৃহা-প্রসূত, কতদূর স্বাধীন চিন্তাপ্রণোদিত তাহা সুধিজনের বিবেচ্য।

আমাদের দীর্ঘ জাতীয় জীবনে নানা প্রকারের রাষ্ট্রনীতি গড়িয়া উঠিয়াছিল। নানা জাতির নানা যুগের প্রয়োজন অনুসারে সেই নীতি রূপান্তর পরিগ্রহও করিয়াছিল। কিন্তু ভোট (vote) পদার্থটাকে কোন দিন দেবতার বেদীতে প্রতিষ্ঠিত করা হয় নাই। আজ যে আমরা ভোটের দৌরাত্ম্যে অস্থির হইয়াছি, ইহার জন্যে দায়ী কে? আমাদের প্রাচীনেরা, না ঊনবিংশ শতাব্দীর নব-ইংরেজী-বিদ্যাভিমানী ভাবুকমণ্ডলী? মজুমদার মহাশয় আমাদের প্রাচীন চিন্তার ধারাকে পুস্তকে স্থান দিলে ভাল করিতেন। সমস্ত পাশ্চাত্য জগৎ যদি বলিতে পারিল, Back to Aristotle, যদি স্বয়ং রামমোহন ধর্ম্মবিষয়ে Back to the Upanishads বলিতে পারিলেন, তাহা হইলে আমরাই বা কেন ঊনবিংশ শতাব্দীর চিন্তাকে ভিত্তি করিয়া আমাদের রাষ্ট্রীয় জীবন গড়িয়া তুলিব? উত্তর ভারতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৌদ্ধ রাষ্ট্রগুলিতে গণতন্ত্র কতদূর পূর্ণতা লাভ করিয়াছিল তাহা সকলেই জানেন। এই গণতন্ত্রের সহিত গ্রীক নগর-রাষ্ট্রের অনেক প্রভেদ ছিল বটে। কিন্তু তাই বলিয়া তাহাদিগকে ত উপেক্ষা করা চলে না। তেমনই দক্ষিণের চোলরাষ্ট্রে যে নিয়ন্ত্রিত রাজতন্ত্র প্রচলিত ছিল, তাহার সহিত যাঁহারই পরিচয় আছে তিনিই জানেন যে, আজও এই চোল constitution (রাষ্ট্রব্যবস্থা) হইতে আমাদের অনেক শিখিবার আছে। এই প্রাচীন constitution-কে ভিত্তি করিয়াই আচার্য্য ব্রজেন্দ্র শীল মহাশয় বর্ত্তমান মহীশুরের constitution ধারাবদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু এই সমস্ত বিশিষ্ট রাজ্য-ব্যবস্থার কথা ছাড়িয়া দিলেও, হিন্দু ভারতের সাধারণ রাজতন্ত্র রাষ্ট্র হইতে বর্ত্তমান কালে আমরা অনেক কিছু শিখিতে পারি। পাশ্চাত্য লেখকগণ oriental despot (প্রাচ্যের স্বেচ্ছাচারী নৃপতি) সম্বন্ধে ত অনেক কথাই লিখিয়াছেন ও লিখিতেছেন। কিন্তু প্রাচীন হিন্দুরাজাকে কোন ক্রমেই যথেচ্ছাচারী নৃপতি বলা যায় না। কেন না, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত যে ক্ষত্রিয় নৃপতিগণ আপনাদিগকে ঋষিবৃন্দের আজ্ঞাকারী ভৃত্য বলিয়া জানিতেন। সঙ্কটকালে রাজা ঋষির আশ্রমে যাইয়া তাঁহার আদেশ জানিয়া আসিতেন। কখন কখন বা ঋষি স্বয়ং রাজসভায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে আপন আদেশই বলুন, বা ধর্ম্মের আদেশই বলুন, বা দেবতার আদেশই বলুন, জ্ঞাপন করিয়া যাইতেন। মহাভারতাদি গ্রন্থে ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আছে। কোন

রাজারই ঋষিমহারাজের আদেশ অমান্য করিবার সাহস ছিল না। কেন না, তিনি জানিতেন যে, এই আদেশের পশ্চাতে যে শুধু দেবাজ্ঞা আছে তাহা নহে, লোকমতও আছে। দশরথ বা রামচন্দ্র বশিষ্ঠদেবের আজ্ঞা অবহেলা করিলে মহর্ষি প্রজাপুঞ্জকে বলিতে পারিতেন—এই নৃপতি দেবতার শত্রু, ধর্ম্মের শত্রু, তোমরা ইহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া অন্য কাহাকেও সিংহাসনে অধিষ্ঠিত কর, আমি তোমাদিগের সহায় আছি। মনুসংহিতাতে প্রজার এই অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। ইংরেজরা প্রথম চার্ল্‌স-এর কি শাস্তিবিধান করিয়াছিল, তাহা এ দেশে শিখাইবার প্রয়োজন নাই। প্রাচীন ভারতের কোন রাজার কি এমত সাহস ছিল যে তাঁহার নিন্দাকারী ঋষিকে রাজদ্রোহী বলিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করেন! ইংলণ্ডের দ্বিতীয় হেনরী ত বেকেট-কে বধ করাইয়াছিলেন, অষ্টম হেনরী উল্‌সীকে কারারুদ্ধ করিয়াছিলেন, জন্‌ও এই ব্যাপারই করিতেন যদি না পোপ্-এর দূতের পশ্চাতে প্রবল প্রতাপ ফরাসী নরপতি দণ্ডায়মান থাকিতেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালী ভাবুকমণ্ডলী অল্পবিস্তর সকলেই ইংলণ্ডের অন্ধস্তাবক ছিলেন। এ দেশের ইংরেজ আমাদিগকে দূরে দূরে রাখে, গালিগালাজ দেয়, মারধর করে, এই কথা ইংলণ্ডের সাহেবদিগের চরণে জানাইলেই আমাদের সকল দুঃখ ঘুচিবে—এই ছিল মোটামুটি তাঁহাদের political thought। এই thought হইতেই উদ্ভূত হইয়াছিল আমাদের এদেশে কংগ্রেস, বিলেতের Parliamentary Committee, ইণ্ডিয়া সংবাদপত্র ইত্যাদি তাঁহাদের সকল প্রচেষ্টা। অবশ্য যেমন ধর্ম্ম সম্বন্ধে, তেমনই সমাজ সম্বন্ধে, তেমনই অর্থনীতি সম্বন্ধে, তেমনই রাষ্ট্র সম্বন্ধে খুব লম্বা চওড়া কথা তাঁহারা কহিতেন, কিন্তু সে সমস্তই চর্ব্বিত চর্ব্বণ। মজুমদার মহাশয় দুই-চারিটা উদাহরণ দিয়া দেখাইয়াছেন যে, ইঁহাদের কেহ কেহ বিলাতের মনীষীদের পূর্ব্বেই রাষ্ট্রনীতির বা দর্শনশাস্ত্রের এক-আধটা সত্য আবিষ্কার করিয়াছিলেন। কিন্তু exceptio probat regulem। এক-আধজন এক-আধবার কি বলিয়াছিলেন তাহার দ্বারা কিছু প্রমাণ হয় না। পার্লামেণ্ট মারফতে দেশশাসন, অবাধ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, ভোটদ্বারা সর্ব্ববিষয় নিষ্পত্তি ইত্যাদি তোতাবুলি শুনিতে শুনিতে বাল্যে আমাদের কান ঝালাপালা হইয়া গিয়াছিল। পার্লামেণ্টে বসিয়া রাজ্য চালাইবে কাহারা? না, politically minded people, যাহারা অর্দ্ধ বা পূর্ণ বিলাতী পোষাকে সজ্জিত হইয়া ইংরেজীতে বক্তৃতা করিতে পারিবে! গ্রামবাসী নিরক্ষর মজুর কৃষকদিগকে কোনরূপ রাষ্ট্রীয় অধিকার দেওয়া ইঁহারা প্রয়োজনীয় মনে করিতেন না, যদিচ তর্কচ্ছলে কত বড় বড় কথাই বলিতেন! যে গ্রাম পঞ্চায়ৎকে অনেক অভিজ্ঞ ইংরেজ “perfect little village republics”—পূর্ণ-গণতন্ত্র আখ্যা দিয়া গিয়াছেন, ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালী ভাবুক, কেহ তাহার কোন সন্ধানই করেন নাই! কেন না, তাঁহার মতে politically minded ইংরেজী শিক্ষিত ভদ্রলোকেরা এই মূর্খ নাবালকদের চিরন্তন guardian (প্রতিপালক)। দরিদ্র রাইয়তের সুখ-দুঃখের কথা কেহ ভাবেন নাই, তাহা সত্য নহে। কেন না, জমীদার ও প্রজার সম্বন্ধ লইয়া ইঁহাদের মধ্যে অনেক বাদানুবাদ, অনেক তর্কবিতর্ক হইয়াছিল। সেইরূপ, ধনী-দরিদ্র-নির্ব্বিচারে ভারতবাসীমাত্রকেই লেখাপড়া শেখানো হউক, এ প্রার্থনাও অনেকে করিয়াছিলেন। তবে, দীনদরিদ্রের যথার্থ সেবা ইঁহাদের কল্পনার বহির্ভূত ছিল। ইঁহারা আপনাদিগকে কৃষক শ্রমজীবি-

দিগের মুরুব্বী ও গুরুমহাশয়রূপে দেখিতেন। আভিজাত্যের দম্ভ ও তদপেক্ষাও মারাত্মক বুদ্ধিবিত্তার দেমাক ইঁহাদিগের মনপ্রাণ ভরপূর করিয়া রাখিয়াছিল। "অতিদর্পে হতালঙ্কা অভিমানে চ কৌরবাঃ", কথাটা ইঁহাদের স্মরণ ছিল না।

পরবর্ত্তী যুগে যখন স্বামীজীর ও মহাত্মা গান্ধীর আদেশে দেশের ইংরেজী শিক্ষিত তরুণমণ্ডলী পল্লীগ্রামে যাইয়া উপস্থিত হইল, তখন তাহারা প্রথম বুঝিল যে, শিক্ষকের উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া উপদেশ দিলে সে উপদেশ গ্রামবাসীর হৃদয় পর্য্যন্ত পৌঁছে না। নিজেকে দরিদ্রাদপি দরিদ্র গ্রামবাসীর সহিত মিলাইয়া দিতে না পারিলে সকল প্রচেষ্টাই বৃথা।

গ্রন্থকার একস্থানে (p. 9) foot-note-এ মহাত্মাজীর উল্লেখ করিয়াছেন। "মিষ্টার" গান্ধী আজ জাতিভেদ সম্বন্ধে যাহা বলিতেছেন, রাজা রামমোহন না কি এক শতাব্দী পূর্ব্বে তাহা বলিয়া গিয়াছেন! এ কথা ধ্রুব সত্য। কিন্তু গান্ধীজীকে মহাত্মা আখ্যা দিলে কি পুণ্যশ্লোক রাজা রামমোহনের মহত্ত্ব কোন অংশে খর্ব্ব হইত! আর যদি মহাত্মা গান্ধীর নামই করিলেন ত এ কথাও স্বীকার করিলে দোষ হইত না যে, তিনি তাঁহার রাষ্ট্রীয় আদর্শ দরিদ্রের কুটীরে লইয়া ফিরিতেছেন। Political thought যেদিন বৈঠক ও পুস্তকালয় ছাড়িয়া মাঠে-ঘাটে বাহির হইল, আমাদের জাতীয় জীবনে সে এক স্মরণীয় দিবস।

মজুমদার মহাশয়ের স্পষ্ট বলা উচিত ছিল যে, গত শতাব্দীর বাঙ্গালী ভাবুক-মণ্ডলী অসাধারণ বুদ্ধিমান হইলেও স্বপ্নলোকচারী ছিলেন, বাস্তব জীবনের সহিত তাঁদের ভাবনার সম্বন্ধ খুব বেশী ছিল না। তাঁহারা অতীতের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া নূতনের সহিত সম্বন্ধ পাতাইতেছিলেন এবং সেই নূতনের নেশায় মশগুল ছিলেন। ভূদেব বঙ্কিমের মত দেশাভিমানী মহাপুরুষও হিন্দুর চিন্তাকে, হিন্দুর ধর্ম্মকে, হিন্দুর আচার ব্যবহারকে, একটা পাশ্চাত্য খোলস না পরাইয়া সাহেব মহলে বাহির করিতে লজ্জা পাইতেন। হাস্যরসিক অমৃতবাবু একবার ঠাট্টা করিয়া লিখিয়াছিলেন, "সাহেব কেষ্ট, সাহেব বিষ্ণু, বম্ ভোলানাথ বিলিতী"। এ ঠাট্টার যে একেবারে প্রয়োজন ছিল না, তাহা ত বলা যায় না! গিরীশ বসুকে গ্যারিক্, বঙ্কিমচন্দ্রকে স্কট, মাইকেলকে মিল্টন্, রবীন্দ্রনাথকে শেলী আখ্যা না দিলে যাঁহাদিগের সন্তোষ হইত না তাঁহাদের political thought-কে নব ভারতের শৈশবলীলার বেশী বলিতে আমাদের সঙ্কোচ বোধ হয়। বন্দেমাতরং-এর ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রই না একবার ব্রিটিশ রাজত্বের স্তুতিবাদ করিতে গিয়া বলিয়াছিলেন—আর্য্যযুগে ত আর শূদ্র দ্বারিকানাথ মিত্র ন্যায়াধীশ হইতে পারিতেন না! সত্যই কি পারিতেন না? রাধাসুত কর্ণকে ক্ষত্রিয় বানাইতে ত দুর্য্যোধনের ক্ষণমাত্রও বিলম্ব হয় নাই! দ্বারিকানাথকে না হয় রাজন্যপদে উন্নীত করিয়া তাহার পর জজিয়তী দেওয়া যাইত!

নূতনের মোহে অন্ধ না হইলে ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, রামচন্দ্র প্রাচীন ধর্ম্মরাজ্যের অধিপতি ছিলেন বলিয়াই শুদ্ধ প্রজারঞ্জনের নিমিত্ত প্রাণের অধিক প্রিয়তমা ভার্য্যাকে বনবাসে পাঠাইয়াছিলেন। প্রবল পরাক্রান্ত কোশলরাজেরও লোকমত অগ্রাহ্য করিবার উপায় ছিল না। ইচ্ছা থাকিলেও সাহস বা শক্তি ছিল না। ইংলণ্ডের অষ্টম হেনরী যে বার বার পত্নী ত্যাগ ও পত্নীবধ করিয়াছিলেন সে প্রজারঞ্জনের নিমিত্ত নয়।

তারপর রামচন্দ্রের শূদ্রক বধের কথা বিচার করা যাউক। রামচন্দ্র ত সঙ্কীর্ণচেতা 'কুণো বেরাল' ছিলেন না। তিনি চণ্ডালের সহিত মিতালী করিয়াছিলেন, বানর বীর মহাপণ্ডিত হনুমানকে বন্ধু ও পার্শ্বচররূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, রক্ষরাজ রাবণের নিকট রাজধর্ম্ম শিখিতে গিয়াছিলেন, একজন শূদ্র তপশ্চর্য্যা করিতেছে শুনিয়া তাঁহার ক্রোধে আত্মহারা হইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু তিনি অযোধ্যায় constitutional king, ধর্ম্মের দাস, ধর্ম্মের আদেশে শূদ্র তপস্বীর মস্তকচ্ছেদন করিলেন। সীতাবর্জ্জন ও শূদ্রক্ বধকে কি স্বেচ্ছাচারী রাজার খেয়াল বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে? না ইহাকে রাজধর্ম্মপালনের নিদর্শন বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে? পাঠক চিন্তা করিয়া দেখিবেন, আমরা বলি যে, এই ছিল হিন্দুর নিয়ন্ত্রিত রাজতন্ত্র, ইহার দিকে নজর না দিয়া আমাদের গত শতাব্দীর শিক্ষাগুরুবৃন্দ স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি অবিচার করিয়াছিলেন। শুধু অবিচার নয়, দেশবাসীকে কিছুকালের জন্য বিপথে চালিত করিয়াছিলেন। আজও তাহার জের মিটে নাই।

আমি এত কথা লিখিলাম এই আশায় যে, মজুমদার মহাশয় পরবর্ত্তী সংস্করণে, প্রস্তাবনাতে বা পরিশিষ্টে প্রাচীন ভারতের রাষ্ট্রীয় ভাবনা ও প্রচেষ্টা, মুসলমান নরপতিগণের সারা ভারতে এক রাষ্ট্র স্থাপনের কল্পনা ও চেষ্টা, শিবাজী ছত্রপতির হিন্দু স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠার আয়োজন, তথা সেকালের পল্লীস্বরাজের যথার্থ স্বরূপ, এই সমস্ত বিষয়ের অল্পবিস্তর আলোচনা করিবেন। তাঁহার ন্যায় সুপণ্ডিত ভাবুক সহজেই প্রাচীনের সহিত আধুনিকের যোগসূত্র কোথায়, তাহার নির্দ্দেশ করিতে পারিবেন। নহিলে, ভিত্তিহীন ইমারৎ, মূলবিহীন বৃক্ষকাণ্ড, ইহাদের বর্ণনা করিবার বিশেষ সার্থকতা কোথায়!

আলোচ্য পুস্তকখানি আমরা অতীব যত্ন সহকারে পাঠ করিয়াছি, পাঠ করিয়া ঊনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গীয় ভাবুকদের সম্বন্ধে অনেক নূতন কথা শিখিয়াছি, গ্রন্থখানি গভীর পাণ্ডিত্যের ও একাগ্র পরিশ্রমের নিদর্শনে পূর্ণ। ভাষা ও লিখনভঙ্গীও চমৎকার। মজুমদার মহাশয় দেশপ্রেমিক। তাঁহার লেখার ছত্রে ছত্রে দেশপ্রেম ও স্বজাতি-গৌরব স্পষ্ট প্রতীয়মান। সেই জন্যই আমরা তাঁহার আসল দেশ ও আসল দেশবাসীর তরফে দাঁড়াইয়া দুই-এক কথা বলিতে সাহস করিয়াছি।

একটি বিষয়ের উল্লেখ করিতে ভুলিয়া গিয়াছি। ঐতিহাসিক ম্যালিসন সাহেব বলিয়া গিয়াছেন যে, সিপাহী যুদ্ধের সময়ে কলিকাতার ইংরেজী শিক্ষিত বাবুরা গোপনে তর্কবিতর্ক করিতেছিলেন যে, তাঁহাদের মধ্যে কে যুদ্ধাবসানে দিল্লীর Chancellor of the Exchequer হইবেন। জঙ্গী লাট রবার্টস্‌ও লিখিয়া গিয়াছেন যে ঐ সময়ে কলিকাতার বাঙ্গালীরা কেহ কেহ চন্দননগরের ফরাসীদের সহিত পত্রব্যবহার করিতেছিলেন। লাট সাহেবের কাছে এই পত্রব্যবহারের না কি অকাট্য প্রমাণ ছিল! গ্রন্থকার কি বলিতে পারেন যে, এই বাঙ্গালী বাবুরা কে ছিলেন? তাঁহাদের political thought-এর স্বরূপ সম্বন্ধে ত কোন সন্দেহই নাই।

শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত

Gerald, A Portrait—By Daphne du Maurier (Gollancz)

ইদনীন্তন দেখতে পাই নিছক অর্থ উপার্জ্জনের অতিরিক্ত কোন আদর্শের প্রেরণা থাকায় বিলাতি জীবনচরিত অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তৃপ্তিদায়ক হয়। ভাষাকে প্রাঞ্জল ও সাবলীল রেখে আখ্যান-বস্তুটিকে ঘটনার সহিত সংস্পৃষ্ট রাখলেই রচনা প্রাণবন্ত হয় এবং সে জীবন যতই অকিঞ্চিৎকর হোক না কেন, বর্ত্তমান যুগের সমস্যাকীর্ণ সংসারযাত্রা তাতে বিচিত্রতার আলোড়ন এনে রচনা সরস করে।

আলোচ্য বইখানি একখানি জীবনস্মৃতি। কন্যার রচিত পিতার জীবন-কাহিনী। এতে নাটকীয় প্রেম কাহিনী একটিও নেই, ঘটনার বৈচিত্র্যেরও অভাব, অথচ সাহিত্যসৃষ্টি হয়েছে হৃদয়গ্রাহী।

স্যার জীরাল্ড ডুমোরিয়েরর সবাক চিত্র উদ্ভবের অনতিকাল পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইংলণ্ডের রঙ্গজগতের একছত্র অধিপতি ছিলেন বল্লে অত্যুক্তি করা হয় না। বিখ্যাত নট-নটী গুয়েন নেয়ার্স, অড্রি কার্টেন, গ্ল্যাডিস্ কুপার, টালুলা ব্যাঙ্কহেড, গ্রেসি ফিল্ডস্ তাঁরই প্রযোজনা ও শিল্পনেতৃত্বে অভিনয়রীতি শিক্ষা করেন। কিন্তু, এরই মধ্যে তাঁর নাম বিস্মৃতির মসীলিপ্ত গহ্বরে তলিয়ে চলেছে। আজ চিত্রছায়ার আক্রমণে পাদদীপের প্রভামণ্ডল নিষ্প্রভ, তা ছাড়া সাধারণ নাট্যামোদীর শিল্পরুচি পরিবর্ত্তনশীল, স্মরণ-শক্তিও ক্ষীয়মাণ। কবে কোন বিশেষ রজনীতে জীরাল্ডের নাট্যপ্রতিভার ওজোময়ী বিকাশ হয়েছিল, কবে কি ভাবে তাঁর অঙ্গলীলা দর্শকদের মন্ত্রমুগ্ধ করেছিল, সে সব স্মৃতি প্রগতির ভাঙ্গা-গড়ার অন্তরালে অকিঞ্চিৎকর বিক্ষোভ মাত্র হয়ে থাকবে, সেই ভয়ে আবেগময় দোষগুণসম্পন্ন চিরন্তন জীবনরহস্যের আশ্রয়ে তার পুনঃ প্রকাশ হলো।

লেখিকা তাঁর আখ্যায়িকাটি আরম্ভ করেছেন সাবেকি আমলের স্থৈর্য্যে ধৈর্য্যে ভরা পিতামহ কিকির যৌবন সময় হতে। তিনি ছিলেন চিত্রকর, হুইস্‌লারের সহচর। তাঁর সহধর্ম্মিণী পেম ছিলেন রূপবতী এবং সে যুগের রীতি অনুযায়ী তাঁদের দাম্পত্য জীবনের গোড়া পত্তন হয়েছিল নীরব অনাড়ম্বর প্রশান্তির ভিতর দিয়ে। বন্ধুভাগ্য ছিল শুভ, তাই সাহিত্যচর্চ্চায়, সঙ্গীতে, হাসির কল্লোলে ক্ষুদ্র সংসার সর্ব্বদা মুখরিত হয়ে থাকতো। তার পর পুত্র-কন্যার আগমনে জীবনের বিস্তৃতি ছড়িয়ে পড়লো অধিকতর বৈচিত্র্যময় হয়ে। বয়স ও সংসার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে যখন নিবিড় একাত্মতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেই সময় পঞ্চম ও সর্ব্ব কনিষ্ঠ শিশু জীরাল্ড ভূমিষ্ঠ হয়। তখনকার সে জীবন ছিল মধুময়। প্রবর্দ্ধমান ছেলে-মেয়েদের সদা সজাগ কৌতূহল, ঐশ্বর্য্যময় প্রকৃতির বিচিত্র বিকাশ, আকাশকুসুম, কৌতুক-কলহের উচ্ছল প্রবাহ জীবনকে নিত্য নূতন ভাবে সৌন্দর্য্যমণ্ডিত করেছে। এমন সময় বৃদ্ধ কিকি চিত্রাঙ্কন ছেড়ে 'পিটারইবেট্‌সন্' ও 'ট্রিলবী' নামক দুইখানি উপন্যাস রচনা করে বিশ্ববিখ্যাত হয়ে পড়লেন।

জীরাল্ডের স্বাধীন জীবন আরম্ভ হয় একবিংশ বৎসর বয়স্কালে যখন তিনি একটি ভ্রাম্যমাণ নাট্যসম্প্রদায়ে যোগদান করেন। কতকটা পিতার খাতিরে এবং কতক আপন গুণে দলের মধ্যে বিশেষ স্থান করে নিতে তাঁর বিলম্ব হয়নি। তার পরে দ্বাদশ বৎসর ব্যাপী ঐকান্তিক মার্জ্জন ও সাধনের ফলে দেশের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অভিনেতা বলে খ্যাত হয়ে পড়েন।

জীরাল্ড জীবনীর এইটুকু সংক্ষিপ্ত-সার দিয়ে বইখানির সমালোচনা আরম্ভ করবো।

লেখিকা ইতিবৃত্তে তিনটি বংশপরম্পরার অবতারণা করেছেন পরস্পরের বিসংবাদিত্ব স্পষ্ট করে দেখাবার উদ্দেশ্যে। এই বিসংবাদ যে কত নিবিড়, কত করুণ এরই অভিব্যক্তি হচ্ছে বইখানির মধ্যে সাহিত্যের আকর এবং অলঙ্কার হচ্ছে আশে-পাশের ঘটনাপুঞ্জের ঘাতপ্রতিঘাত, নাট্যালোচনা, ছোট ছোট পারিপার্শ্বিক জীবনচিত্র।

এখন বিচার্য্য যে এই অলঙ্কারসজ্জা কতখানি সৌন্দর্য্য সৃজন করেছে।

জীবনস্মৃতি রচনায় ঘটনার বিন্যাসে সত্যের ব্যত্যয় দোষাবহ হয় না, কারণ কোন স্মৃতিই মানব মনে প্রথাসিদ্ধভাবে চিত্রাপিত হয়ে থাকে না। সময়ের ক্ষেপে অতিরঞ্জন ত ঘটেই অধিকন্তু মাতৃস্নেহের আতিশয্যে একের কথা অন্যের নামে প্রচারিত হয় এ অভিজ্ঞতা আমাদের প্রত্যেকেরই আছে। পিতা-মহের যৌবন সময়ের কথা এবং পিতার বাল্যকাহিনী লেখিকার পিতামহীর নিকট প্রাপ্ত। লেখিকা ঔপন্যাসিক এবং পাঠকের চিত্তরঞ্জনে সিদ্ধহস্ত তাই সে সব গল্পের মধ্যে যথেচ্ছ বাছাই করে মনোরম ভাবে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করেছেন। কিন্তু পরবর্ত্তীকালের ঘটনাবিন্যাসে লেখিকার ঝোঁক যখনই নাটকীয় সুরে উঠেছে, তখনই রসোৎপাদনের ব্যাঘাত ঘটেছে। উদাহরণ স্বরূপ বলতে পারি যে, ভগ্নীপতির মৃত্যুতে কোন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি কখনও ক্রোধান্ধ হয়ে নাটকীয় ভঙ্গীতে ভগবানের উপর অনাস্থা প্রচার করে না। আর একস্থানে বর্ণিত হয়েছে যে, জীরাল্ড পিতামাতার মৃত্যুর পর বাল্যস্মৃতি বিজড়িত গ্রামে যখন প্রত্যাগমন করেন তখন আত্মীয়-স্বজনের অশরীরী প্রেতাত্মারা তাঁর জীবন দুর্ব্বহ করে তোলে—অবশেষে পরলোকপ্রাপ্ত সহোদরের অশ্বাসবাণী পেয়ে নাকি তাঁর উদ্‌ভ্রান্ত চিত্ত শান্ত হয়। অবশ্য অনেকের জীবনে এমন সব অলৌকিক ঘটনা ঘটে যার কোন দিশা পাওয়া যায় না, কিন্তু এ ক্ষেত্রে লেখিকার সাহিত্যের খাতিরে লিপি সংযম করা উচিত ছিল, কারণ জীবন-ইতিবৃত্তের পাঠক স্বভাবতই সন্দিগ্ধচিত্ত এবং কল্পনা প্রসারণের ইষৎ আভাষ পেলেই অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে।

জীরাল্ড চরিত্রের ক্রমপরিণতির সুসম্বদ্ধ বর্ণনা দেওয়া সম্ভব হয়েছে তাঁর মাতার সযত্ন-সঞ্চিত পত্র-খণ্ডগুলির সাহায্যে। ভ্রাম্যমাণ-জীবনের ভাসা ভাসা প্রতিবিম্বগুলি যত বিচিত্র বার্ত্তা বহন করে এনেছে সেগুলিকে নিপুণ হস্তে সঞ্চয়ন করে লেখিকা কাহিনীর পারম্পর্য্য বজায় রেখেছেন। কিন্তু এতে ঘটনার দিক দিয়ে যেমন সঠিক সমাচার পাওয়া গেছে, অন্তরের গভীরতম প্রদেশের তেমনি হদিস হারিয়েছে। কারণ ভিক্টোরিয়ান আদর্শে অনুপ্রাণিত মাতার অন্তরঙ্গ সহমর্ম্মিতা জীরাল্ড কখনও আশা করেননি এবং সেজন্য তাঁর অন্তস্থলের মর্ম্মদ্বার চিররুদ্ধ থেকে গেছে যা লেখিকাও উদ্‌ঘাটন করতে কৃতকার্য্য হননি।

যে সকল চরিত্রের দ্বারা জীরাল্ডের জীবন পল্লবিত করা হয়েছে তার মধ্যে ভ্রাতা-ভগ্নীত্রয়, স্ত্রী, গ্ল্যাডিস্ কুপার এবং ভায়োলা ট্রি বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। শেষোক্ত দুইজন বান্ধবী। কথিত হয়েছে যে, এ বন্ধুত্বে কোন অবৈধ প্রণয়ের সম্বন্ধ ছিল না। দাম্পত্য জীবনেও কোন সমস্যার ছায়াপাত পড়েছিল

বলে বর্ণিত হয়নি—অথচ একাধারে সুন্দরী স্ত্রী, অপরিমিত ঐশ্বর্য্য ও দেশব্যাপী যশের অধিকারী হয়ে জীরাল্ড যখন সৌভাগ্যের সর্ব্বোচ্চ শিখরে সমাসীন অকস্মাৎ হৃদয়-জোড়া নৈরাশ্য এবং গ্লানির অবসাদ তাঁর জীবন দুর্ব্বহ করে তুললে। দেশ-ভ্রমণেও শান্তি পাওয়া গেল না। মানসিক বিকারের রৌদ্র-ছায়া আসতো যেত অকারণে। কত আনন্দময় উৎসবের আবহাওয়া দৈবাৎ বারিপাতে বা আকাশে বাতাসে ঈষৎ উত্তেজনায় ঘোর তিমিরাচ্ছন্ন কালরাত্রিতে পরিণত হতো। ডিনার টেবিলের অনন্ত বাক্যস্রোত ও অট্টহাস্য সহসা স্তব্ধ হয়ে যেত মনের গভীরতম প্রদেশের কোন এক দুর্জ্ঞেয় বেদনাতে।

কারণ নির্ণয়ের চেষ্টায় লেখিকা বলেছেন যে স্বতঃস্ফূর্ত্ত যৌবনের প্রবাহ মন্দীভূত হয়ে এলে মানসিক অবস্থার বিকার ঘটতে বাধা—অর্থাৎ হৃদয়োত্থিত সুখ-দুঃখের যে দ্যোতনা শৈশব ও যৌবন-কালে ওতপ্রোত ভাবে মিশে থাকে বার্দ্ধক্যে তার বিসংবাদ ঘটে। সেই কারণেই নাকি কিকি জীরাল্ডের শৈশবাবস্থায় তাকে প্রায়ই বলতেন, "রসো বাবা, চাল্লিশ পার হও তারপর দেখবো তোমার এ উদ্দামতা কোথায় থাকে।"

আমার মনে হয় লেখিকা পিতার অবচেতনাস্থিত বেদনার নিদান প্রচার করবেন না বলে উপরিউক্ত অস্পষ্ট কারণ দেখিয়ে পাশ কাটাতে চেষ্টা করেছেন। বোধ করি কোন শ্রদ্ধাপ্রবণ কন্যাই পিতার যথার্থ ইতিবৃত্ত জগতের হাটে উজাড় করতে পারে না—অবশ্য বর্ত্তমান ক্ষেত্রে ন্যায়ের বিচারে এ অনুমান অহেতুক হবে।

জীরাল্ডের শেষ জীবনের অন্তিম ট্র্যাজেডী হচ্ছে তাঁর কন্যাদের সহিত আন্তরিক বিরোধ। সংসারে ক্রমশঃ অনাবশ্যক হয়ে যাবার মত শোচনীয় পরিণাম কোনও উপমায় পাওয়া যায় না। প্রগতির প্রবহমাণ গতিতে গা ভাসিয়ে নবীনের দলেরা যখন এগিয়ে চলেছে তিনি তাদের পরিত্যক্ত ভূমিতে সরীসৃপের মত বুকে হেটে চলেছেন। অনাহূত অতিথির মত উপেক্ষিত হয়ে অভিমানের প্লাবনে হৃদয় উদ্বেলিত হয়েছে,—অথচ কন্যাদের, বিশেষ করে ডাফনের নৈতিক স্বৈরাচারে বার বার মর্ম্মাহত হয়ে রিক্ত নির্ঘোষে আপন যুগের নৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করেছেন।

দু-এক স্থানে বংশাভিজাত্যের শ্লাঘা প্রকাশ পেয়েছে কিন্তু অমার্জ্জনীয় ভাবে নয়। বিস্মিত হয়েছি লেখিকার নিজের সম্বন্ধে বিনয় দেখে—আদ্যন্ত বইখানিতে নিজের কথা কদাচিৎ বলেছেন তাও যখন কথায় কথায় অপরিহার্য্যের মত এসে পড়েছে। তাঁর ঐকান্তিক বিশিষ্টতা হচ্ছে পিতার প্রতি অপরিমেয় শ্রদ্ধা এবং গভীর অনুকম্পা। অথচ চরিত্রের বিশ্লেষণ করেছেন নির্ম্মমভাবে। পিতার অন্তরপ্রকৃতির বৈষম্যকে প্রচ্ছন্নভাবে বিদ্রূপ করেছেন, এবং নাট্যজগতের অতিমানুষটিকে সাহিত্যের হাটে সাধারণ ও নগণ্য ভাবে প্রকাশ করতে কুণ্ঠিত হননি।

জীবনের সব কথা বিশ্লেষণের দ্বারা নির্ণয় করা যায় না। মানবমনের রহস্য অসীম এবং সেখানকার সূক্ষ্মতম তন্তুও বিবর্ত্তনশীল—লেখিকা বোধ করি সেই জন্যেই জীরাল্ডের আভ্যন্তরীণ সঙ্গতির মূল্য নির্ণয় করতে চেষ্টা

করেননি—তিনি চেয়েছেন প্রগতির মধ্যে একটি মাত্র জীবনের মধ্যে দিয়ে বিগত প্রায় যুগের জীবন্ত প্রতিভূ দেখাতে। হয়ত তিনি এতে কৃতকার্য্য হননি, হয়ত বা হয়েছেন কিন্তু সাহিত্যসৃষ্টি যে তৃপ্তিদায়ক হয়েছে এতে আমার কোন সন্দেহই নেই।

শ্রীশ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ

ব্যোমকেশের কাহিনী—শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়; পি, সি, সরকার এণ্ড কোং।
প্রবাসী বাঙালী—শ্রীঅবনীনাথ রায়; পি, সি, সরকার এণ্ড কোং।
মানসী—শ্রীমতী আশালতা দেবী; পি, সি, সরকার এণ্ড কোং।
যাত্রাবদল—শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়; পি, সি, সরকার এণ্ড কোং।

শরদিন্দুবাবুর ডিটেকটিভ গল্পের অভিনবত্বের দাবী বড় স্বল্প নয়; "ব্যোমকেশের কাহিনীতেও" তাঁর লেখার উৎকর্ষ বজায় রেখেছেন। পঁচিশ ত্রিশ বছর আগে উল্লেখযোগ্য ডিটেক্টিভ উপন্যাস ছিল পাঁচকড়ি দের উপন্যাসগুলি ও "দারোগার দপ্তর"। পাঁচকড়ি বাবুর বর্ণনাচাতুর্য্যে ও চমকপ্রদ লেখার কৌশলে মুগ্ধ হন নি এমন পাঠক সেকালে ছিল বিরল; অপরপক্ষে দারোগার দপ্তরের প্রধান appeal ছিল এই যে তার গল্পগুলি সত্য ঘটনা থেকে সংগৃহীত। আর এক সিরিজের ডিটেকটিভ উপন্যাস পাঠকমণ্ডলীর ভিতর খুব আদরলাভ করেছে,—সে দীনেন্দ্রকুমার রায়ের, যদিও সেগুলি বিলেতী উপন্যাসের সরাসরি অনুবাদ। এই তিন সিরিজের ডিটেকটিভ উপন্যাস একসময়ে বাংলায় খুব আদরণীয় হলেও এদের প্রভাব প্রায় লুপ্ত হতে বসেছে ও তাদের স্থান দখল করতে পারে এমন উপন্যাসের ইদানিং আবির্ভাব হয়নি, যদিও অনেক ডিটেকটিভ উপন্যাস নিত্যনূতন রচিত হচ্চে। বোধ হয় এর কারণ Conan Doyle-এর Sherlock Holmes সিরিজের গল্প সমজদার পাঠকবর্গের রসাস্বাদ ও রুচি একেবারে বদলে দিয়েছে। একথা সর্ব্ববাদিসম্মত যে Conan Doyle-এর ডিটেকটিভ গল্প নূতন সৃষ্টি। এর বৈশিষ্ট্য হল ঘটনার চমৎকারিত্বে নয় বিশ্লেষণের চমৎকারিত্বে। এ সিরিজের গল্পের প্রকৃত নায়ক চোর হত্যাকারীরা নয়, নায়ক ডিটেকটিভ স্বয়ং। একটু আশ্চর্য্যের কথা যে বাংলা ডিটেকটিভ গল্প রচনায় এ প্রণালী এতদিন অনুসৃত হয় নি। এ প্রণালী অনুসরণে প্রথম যশলাভের কৃতিত্ব শরদিন্দুবাবুর যোগ্যরূপেই প্রাপ্য; অধিকন্তু তাঁর ভাষা সুন্দর ও বাহুল্যবর্জ্জিত। তাঁর প্রধান কৃতিত্ব এই, গল্প সাজানোর প্রণালী Sherlock Holmes থেকে গৃহীত হলেও গল্পের চরিত্র ঘটনা বা সমাবেশ এতটুকুও তা থেকে গৃহীত নয়, সেগুলি এমন সুসিদ্ধ যে কৃত্রিমতা আছে বলে কখনও পাঠকের মনে উদয় হয় না। রোমাঞ্চকর গল্প রচনায় এ নিশ্চয়ই খুব বড় কৃতিত্ব। আলোচ্য বইটিতে দুটিমাত্র গল্প আছে, "চোরাবালি" ও "অর্থমনর্থম্"। প্রথমটিতে শিকারের গল্প ও

শব্দভেদী টিপের কাহিনী বেশ উপভোগ্য। উভয় গল্পেরই জটিল চরিত্রগুলি জাজ্বল্যমান হয়েছে। ব্যোমকেশ ও তার বন্ধু, Sherlock Holmes ও Watsonএর মত বাংলা ডিটেকটিভ উপন্যাসে স্থায়িত্বলাভ করবে আশা করা অন্যায় হবে না।

অবনীবাবুর সদ্যপ্রকাশিত প্রবাসী বাঙালী বইখানিতে যে প্রবাসী বাঙালীদের চরিত্র চিত্রাঙ্কন করেছেন তা এতই স্বল্প ও অকিঞ্চিৎকর যে বইখানির উদ্দেশ্য ও সফলতা সম্বন্ধে দ্বিধা বোধ করলে পাঠককে দোষ দেওয়া অন্যায় হবে। দিল্লী, আগ্রা, মীরাট প্রভৃতি নিয়ে বইটির ৭টি অধ্যায়, তার ৪টি হোল ভ্রমণবৃত্তান্ত ও প্রকৃতি বর্ণনা, ১টির অর্দ্ধেক বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের বিবরণ, বাকি ক'টিতে যেটুকু চরিত্র চিত্রণ আছে তার সম্বন্ধে লেখকের মুখবন্ধ এই—"এ লেখার মূল geographical বা topographical নয়,...এর যদি কোন মূল্য থাকে তবে সে হচ্ছে literary"। ভ্রমণকাহিনী ও প্রকৃতি বর্ণনা লিখেও topographical নয় কেন বোঝা গেল না, কিন্তু অবনীবাবুর লেখার literary মূল্য যে যথেষ্ট সে সম্বন্ধে তর্কের অবকাশ নেই; বাস্তবিক বইখানির যদি কোন মূল্য থাকে ত সে তার অতি সুন্দর মনোরম ভাষায়। যাঁরা গ্রন্থ রচনায় লেখকের মনে রেখাপাতের জন্য দায়ী তাঁদের character sketch-এর কথা তিনি উল্লেখ করেছেন,—এ কথা নিশ্চিত যে এঁদের অনেকেরই চরিত্রে আকৃষ্ট হবার বস্তু আছে, কিন্তু লেখক তা তাঁর লেখায় ফোটাবার যে প্রয়াস করেছেন তা গড়পড়তায় এক আধ পৃষ্ঠা স্থান মাত্র দখল করেছে। ফলে পাঠকের মনে ব্যক্তিগত চিত্র জাগরিত না হয়ে জাগরিত হয় মোটামুটী এক শ্রেণীর গড়পড়তা প্রবাসী বাঙালীর চিত্র ও তা এই যে তারা অপেক্ষাকৃত দরদী ও অমায়িক, কিন্তু শুধু এই যদি প্রবাসী বাঙালীর পরিচয় হয় তাতে খুব উৎফুল্ল হবার বা আকৃষ্ট হবার বিশেষ কিছু নেই কেননা প্রবাসী বাঙালী অনেকেই ছিলেন এবং এখনও আছেন এর চেয়ে কৃতি, এর চেয়ে মহান, এর চেয়ে বিশালহৃদয়। বোধ হয় গ্রন্থকার সে শ্রেণীর কারুর খবর রাখেন না। অবশ্য গ্রন্থকারের নির্দ্দেশ অনুসারে এ শ্রেণীর প্রবাসীদের কথা আনয়ন করা নিতান্ত প্রয়োজনীয় না হতে পারে কেন না তিনি মূল্য চেয়েছেন শুধু তাঁর লেখার literary গুণের। কিন্তু প্রশ্ন হবে এ ধরণের বইতে সে মূল্য আসলে কোথায় নিহিত থাকে?—যেখানে লেখক subjectএর মন ও প্রাণের নিকট সংস্পর্শ-লাভ করেন ও লেখায় তা ফুটিয়ে তুলতে পারেন। প্রথম অধ্যায়ে দিল্লীর বিবরণে ও দ্বিতীয় অধ্যায়ের কিয়দংশে অবনীবাবু এই সংস্পর্শের চিত্রাঙ্কনের প্রয়াস করেছিলেন ও তাতে প্রবাসী বাঙালীদের সঙ্গে এদেশবাসীর আত্মীয়তার যোগসূত্র স্থাপন হবে। কিন্তু অনতিদূরেই তাঁর এ প্রয়াস বিরামলাভ করে তাঁর পরিচিত বাঙালীর ফর্দ্দ দেওয়ার ব্যাপারে বিলুপ্ত হয়েছে। একটা অত্যন্ত পরিতাপের কথা যে বইটির শেষে ৬ পৃষ্ঠার এক উপসংহার লিখে লেখক এদেশী বাঙালীর প্রতি অযাচিত রূঢ় নিন্দা বর্ষণ করেছেন। প্রবাসী বাঙালী নানা কারণে ব্যক্তিত্ব বিকাশের সুযোগ ও অবসর পেয়ে এসেছেন ও এদেশী বাঙালীর শ্রদ্ধা ও গুণগ্রাহিতা লাভ করেছেন কিন্তু প্রবাসী বাঙালীর গুণগানের জন্য এদেশী বাঙালীর নিন্দা কাপুরুষতার লক্ষণ। নিন্দনীয় বাঙালী এদেশেও যেমন প্রবাসেও তেমনি।

প্রথিতযশা লেখিকা শ্রীমতী আশালতা দেবীর উপন্যাস প্রকাশিত হচ্ছে দ্রুত, কিন্তু বৈশিষ্ট্যহীন নূতন উপন্যাস মানসীও বৈশিষ্ট্যবঞ্চিত, কিন্তু একথা হয়ত বলা চলে

যে তাঁর পূর্ব্বেকার উপন্যাসগুলির চেয়ে এটি ভাল। গ্রন্থকর্ত্রী এখনও মামুলীর হাত এড়াতে পারেন নি, কি ভাষায় কি ষ্টাইলে, কি গল্পগ্রন্থনে। তাঁর লেখার প্রধান দুর্ব্বলতা হল যে তাঁর লেখা ধার করা। যতদিন না তিনি আপন স্বকীয়তার প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন ততদিন তাঁর লেখা শুধু এক "খাসা জিনিষের" পর্য্যায়ের মধ্যেই আবদ্ধ থাকবে। মানসীর নায়ক নায়িকা ও তাঁদের আত্মীয়রা লেখিকার পূর্ব্বেকার উপন্যাস-গুলির চরিত্র থেকে বিভিন্ন নয়; বিদ্যা, বিত্ত, নানা পারদর্শিতা ও আধুনিকতায় তাঁরা ভরাট; এক কথায় পুরা বৈষয়িক ও বিশেষণে বোঝাই। কিন্তু লেখিকা বেচারীদের কোন সুচারু অবসর দেন নি। মনস্তাত্ত্বিকতার আবরণ একটা আছে কিন্তু সে বড় কিছু নয়, তা ছাড়া ভ্রম হয় নায়িকাতে ও নায়কে লেখিকার নিজেরই যৌবন স্বপ্ন মিশে আছে। তাঁর অন্যান্য বই পড়া চরিত্র ও কল্পনার সঙ্গেও তা সমগ্রতা নিতে পারেন নি।

"যাত্রাবদল" বিভূতিবাবুর হাতের একটি অপূর্ব্ব গল্পগ্রন্থরূপে পরিগণিত হবে নিশ্চয়। এর গল্পগুলিতে গল্পরচনার যে স্তরে তিনি পৌঁছেছেন তাকে ছাড়িয়ে তাঁর আরও উর্দ্ধস্তরে যাওয়া সম্ভব কি না তা আপাততঃ ধারণা করা শক্ত। পল্লীচিত্র রচনায় বিভূতিবাবুর দক্ষতা অনন্যসাধারণ; তাঁর পূর্ব্বেকার রচনা শিশুমন ও উদ্ভিদ জগতের প্রাণের সাড়ায় স্পন্দিত হয়েছিল। যাত্রাবদলে ব্যাপকতর পল্লীজীবন বাক্‌লাভ করেছে। এ সব গল্প বাংলাসাহিত্যে আপন আসন স্থায়ী করবার প্রয়াসে উদ্যত। ক্ষণেক এখানে দাঁড়িয়ে পিছনের দিকে ফিরে তাকাবার অবসর পাওয়া যায়—সেই সুরু থেকে যখন রবীন্দ্রনাথের লেখনীতে প্রথম বাংলার পল্লী ও বাংলাদেশের স্নিগ্ধতা, শ্যামলতা ও রম্যতা গল্পসাহিত্যে নবজাগরণ লাভ করল,—তারপর শরচ্চন্দ্রের প্রতিভায় যখন বাংলাদেশ আপন নির্য্যাতনে নিষ্পীড়িত প্রথম মুখ খুলে প্রতিবাদ ও বিদ্রোহের ঝঙ্কার নির্ঘোষিত করল! বিভূতিবাবুর গল্প আজ অন্য সুরে স্মরণীয় রেশ তুলে বলছে ব্যর্থ, অকৃতিময়, মূল্যহীন, দরিদ্র পল্লী-জীবন আজও দরদী ও কবির কাছে সুধাভাণ্ডরূপেই বিরাজ করছে। প্রথম গল্পে ভণ্ডুলমামার বাড়ী যেমন ব্যর্থ ভণ্ডুলমামা নিজেও তেমনি ব্যর্থ। কিন্তু তবু যেন এই বাড়ী বিশাল অরণ্যের গ্রাসে লুপ্ত হবার জন্যই "অনন্তকাল অনন্তযুগ ধরে তৈরী হয়" ও তারই মায়ায় ভণ্ডুলমামা ঠিক তারই মত জীবনজীর্ণ হয়ে "উদ্দেশ্যহীন, অর্থহীন, কায়াহীন রূপে" গল্পের মধ্যে সঞ্জীবিত হয়ে বিরাজ করেন। বিভূতিবাবুর একটা favourite theme হচ্ছে পল্লীবালকের বিদেশযাত্রায় উন্নতিলাভ ও তারপর একদিন স্বগ্রামে ফিরে এসে ব্যর্থজীবনের সম্মুখীন হওয়া—"...বিদেশযাত্রা, ব্যবসাতে উন্নতি, বিবাহ,—তার মনে হোল, যাকে সে এতদিন সাফল্য ভেবে আত্মপ্রসাদলাভ করে এসেছে, জীবনে আসলে তার মূল্য কি ;...কিন্তু এখন নূতন পথ ধরে চলবার মত সময়ও নেই বয়সও নেই। সাফল্যের আলেয়া তাকে ব্যর্থতার যে পথে পথ ভুলিয়ে নিয়ে চলেছে—সেই পথই তার পথ"। সব গল্পের চরিত্রই প্রাণের কোন নিবিড় আকর্ষণে স্বীয় কক্ষপথে আবর্ত্তিত, এদিকে নিয়তির বিক্ষেপও তাদের উদ্বাস্ত না করে ছাড়েনি। শেষের গল্প যাত্রাবদল—যার নামে বইটির নামকরণ ও যা বোধ হয় শ্রেষ্ঠতার দাবীতে ভণ্ডুলমামার বাড়ীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে, এ হল এক ট্রেণযাত্রীর হঠাৎ নৈহাটী ষ্টেশনে স্ত্রীবিয়োগের ও ষ্টেশনে নেমে সেইখানেই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদনের কাহিনী। এর টিকিটবাবু ও নেশাখোর শশ্মানযাত্রীদের প্রতি গ্রন্থকারের লেখনীর মৃদু কোমল স্পর্শ

বাংলা গল্পসাহিত্যে দুর্লভ। তেমনি অভ্রান্ত নিপুণতায় তিনি এরই সঙ্গে গেঁথেছেন এই অভাগিনী পল্লীবধূটির অকালমৃত্যুর জন্য একটি দীর্ঘশ্বাস—"মনে হোল ও এখানে কেন? এই জ্যোৎস্নাপ্লাবিত গঙ্গার উদ্দাম তরঙ্গভঙ্গ, এই হিমবর্ষী, নক্ষত্রবিরল বিরাট আকাশ, অমঙ্গলময়ী মহানিশার মৃত্যু অভিযান—জীবনের নানা ছোটখাটো সাধ যাদের মেটেনি, এ রুদ্র আহ্বান তাদের বেলা আর কিছুদিন স্থগিত রাখলে বিশ্বকর্ম্মার কাজের কি ক্ষতিটা হোত"? বিভূতিবাবুর বিশেষণ বর্জ্জিত নাতি-অলঙ্কার-বহুল ভাষা অতীব উপভোগ্য; আর এক উপভোগ্য ও চিত্তাকর্ষক বস্তু এই যে বিদেশের, পথের, ষ্টেশনের বা গ্রামের যে সব বর্ণনা ও প্রকৃতি তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন তা অকৃত্রিম ও যথাযথ। সকল গল্পের কথা বলা হল না, ভবঘুরে ও জন্মাবধি চৌর্য্যপ্রকৃতিময় বৈদ্যনাথ এবং ডানপিটে গল্পের সতীশে এমন জিনিষ আছে যা শুধু বাংলা পল্লীর নয়, যা সারা মানবের। যাঁরা বাংলা পল্লীর সাক্ষাৎপরিচয় লাভ করেন নি তাঁরা এ বইটি পড়ে যেমন অনুপম মাধুর্য্যে মুগ্ধ হবেন যাঁরা পরিচিত তাঁরা তেমনি চিনতে পারবেন যে বিভূতিবাবুর লেখা পল্লীজীবন থেকেই সরলভাবে গৃহীত, কোন আধুনিক মনস্তত্ত্ব বা বিশ্লেষণের ছাঁকনীতে ছাঁকা হয়ে নয়,—এ কথাও উল্লেখযোগ্য যে সে পল্লীজীবন বর্ত্তমান পল্লীজীবন,—যার সীমান্ত শহরের সীমান্তে ও শহরের কালচারে মিশে যাচ্ছে।

গিরিজাপতি ভট্টাচার্য্য

Moscow Dialogues—By Julius F. Hecker. (Chapman and Hall).

Towards the Understanding of Karl Marx—By Sidney Hook. (Victor Gollancz).

What Marx Really Meant—By G. D. H. Cole. (Victor Gollancz).

Aspects of Dialectical Materialism—By H. Levy, John Macmurray, Ralph Fox, R. Page Arnot, J. D. Bernal and E. F. Carritt. (Watts & Co.).

The State of the Soviet Union—By Joseph Stalin (International Publishers).

মার্ক্সের মতবাদের প্রকৃত বৈশিষ্ট্য এবং দার্শনিক ভিত্তি সম্বন্ধে সম্যক আলোচনা ইংরাজি ভাষায় বিরল। মার্ক্স্‌ এঙ্গেল্‌স্‌ ও লেনিনের সকল লেখার কিংবা জার্ম্মান ও রুষ লেখকদের রচিত তাঁদের মতের সমস্ত ব্যাখ্যাগুলির ইংরাজি অনুবাদ নেই। পোষ্টগেট ল্যাস্কি, লিণ্ডসে, জোড্‌, ডব্‌, ষ্ট্রেচি প্রভৃতির বিখ্যাত বইগুলিতে মার্ক্সের আর্থিক ও রাষ্ট্রীয় মতামতের বিস্তৃত বিবরণ থাকলেও তাঁর বিশেষত্ব ও দার্শনিক দৃষ্টির যথেষ্ট পরিচয়

পাওয়া যায় না। কিন্তু দু'বছরের মধ্যে, মস্কো, নিউইয়র্ক ও অক্স্‌ফোর্ড্‌ বিদ্যাপীঠের তিন-জন অধ্যাপকের তিনখানি গ্রন্থ ইংরাজি সাহিত্যের এই অভাব অনেকাংশে মোচন করেছে উপরের তালিকার চতুর্থ পুস্তকটি প্রথম তিনখানির পাদটীকা হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে—এটি লণ্ডন ও অক্স্‌ফোর্ডের কয়েকজন শিক্ষক এবং অন্যান্য বিশেষজ্ঞের প্রবন্ধ-সমষ্টি। শেষ বইখানি সম্পূর্ণ পৃথক গোত্রের—রুষদেশীয় সাম্যবাদিদলের সপ্তদশ মহাসভায় পঠিত বিবরণী মাত্র এতে প্রকাশিত হয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে মার্ক্সের মতামত কি ছিল, তাঁর দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীর স্বরূপ কি এবং আধুনিক বিজ্ঞানবুদ্ধির সঙ্গে তার সামঞ্জস্য হয় কি না—উপরের বইগুলির সমালোচনা করতে হ'লে প্রধানতঃ এই তিন বিষয়ে কিছু লেখা উচিত।

কার্ল্‌ মার্ক্স্‌ ও তাঁর সারাজীবনের সহকর্ম্মী এঙ্গেল্‌স্‌ তাঁদের বিরাট গ্রন্থাবলীর কোনও এক জায়গায় নিজমতের সম্পূর্ণ সংক্ষিপ্তসার লিপিবদ্ধ করে যাননি। সাময়িক নানা সমস্যার আলোচনা বা আর্থিক ও দার্শনিক তত্ত্বের জটিল তর্কবিতর্কে তাঁদের অধিকাংশ লেখা ভারাক্রান্ত। এই জন্য তাঁদের যথার্থ মত সম্বন্ধে মতভেদ অনেকদিন থেকেই দেখা দিয়েছে। বের্ণষ্টাইন্‌ ও কাউট্‌স্কি ও লেনিন্‌ এবং ট্রট্‌স্কি ও ষ্টালিনের তর্কযুদ্ধ এই মতানৈক্যের ইতিহাসে সবচেয়ে স্মরণীয় ঘটনা। বর্ত্তমান শতাব্দীর পর পর প্রথম তিন দশকে এই সঙ্ঘর্ষ তিনটির উৎপত্তি হয়। সোশ্যালিজ্‌মের প্রধান প্রবর্ত্তককে বুঝবার চেষ্টার বিচিত্র ইতিহাস অধ্যাপক হুক্‌ তাঁর বইখানির প্রথমার্দ্ধে বর্ণনা করেছেন—সমগ্র প্রথম ভাগটির তিনি নাম দিয়াছেন—"মার্ক্সের সন্ধান।"

মার্ক্স্‌ একাধারে পণ্ডিত ও বিপ্লবনেতা ছিলেন। তিনি ঐতিহাসিক প্রগতি বা পরিবর্ত্তনের লক্ষ্য ও দিক নির্ণয় করিতে গিয়ে এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে, ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে শ্রমিক-বিদ্রোহ প্রবলতর হ'তে হ'তে শ্রেণীভেদের উচ্ছেদসাধন হবে। বুদ্ধি দিয়ে তিনি যে মতবাদ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন, তাঁর হৃদয় আগে থাকতেই তার সম্পূর্ণ সমর্থন করতে প্রস্তুত হয়েছিল; সেইজন্য শ্রমিক-আন্দোলন সুনির্দ্দিষ্ট ও সুগঠিত করার উদ্দেশ্যে সারাজীবন তিনি অনেক পরিশ্রম করেছিলেন। সুতরাং মার্ক্সের মধ্যে একসঙ্গে আমরা দু'টি দিক দেখতে পাই—ভবিষ্যতে শ্রেণীবর্জ্জিত সমাজ গড়ে উঠবে এ সম্বন্ধে দৃঢ় বিশ্বাস এবং ধনতন্ত্র ধ্বংসের জন্য চেষ্টা। তাঁর মৃত্যুর পূর্ব্বেই তাঁর স্বদেশের শ্রমিকসম্প্রদায় বিশাল সোশ্যাল্‌ ডেমোক্র্যাট্‌ দলে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে নিজেদের মার্ক্সীয় বলে ঘোষণা করে। কিন্তু জার্ম্মান্‌ সোশ্যাল্‌ ডেমোক্র্যাটেরা নিজেদের খাঁটি মার্ক্সপন্থী ভেবে গর্ব্ব অনুভব করলেও গুরুর বাণীর সমগ্র রূপটি তাদের মনে প্রকাশিত হয়নি। ধনতন্ত্রের পরিণতি সোশ্যালিজ্‌মে, মার্ক্সের এই বিশ্বাস তাদের মজ্জাগত হয়ে পড়ে কিন্তু তাঁর বিপ্লবচেষ্টার সাধনা এদের মধ্যে ক্ষীণ হ'তে ক্ষীণতর হচ্ছিল। নূতন সমাজের প্রতিষ্ঠা মানুষের চেষ্টার অপেক্ষা না রেখে আপনা থেকেই যথাসময়ে সম্পন্ন হবে—এইরকম একটা বিশ্বাস এদের মধ্যে দেখা যেত। কিন্তু যখন বের্ণ্‌ষ্টাইন্‌ সোশ্যাল্‌ ডেমোক্র্যাট্‌দের ধীরগতি শান্তিপ্রিয় কর্ম্মপদ্ধতির সঙ্গে মার্ক্সের বিপ্লবোদ্দীপক উপদেশের কোন সামঞ্জস্য নেই দেখে সাহস করে' ঘোষণা করলেন যে, মার্ক্সের বুঝবার ভুল হয়েছিল, বিনা বিপ্লবে সমাজে শ্রেণীভেদ আপনা থেকে ধীরে ধীরে লোপ পাবে, এবং ধনিক-আমলে শ্রমিকদের অবস্থা ক্রমশঃ অবনত হচ্ছে এ কথা ঠিক নয়—তখন তাঁর সেই "সংশোধন" গোঁড়া মার্ক্সীয়দের বিরাগভাজন হ'ল,

কেননা ততদিনে তারা বিপ্লবের বাঁধাবুলিতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল। তখন কাউট্স্কির নেতৃত্বে তারা বের্ণষ্টাইনের অনুচরদের দল থেকে বহিষ্কৃতপ্রায় করে। অন্যদিকে ফ্রান্সে শ্রমিক-সঙ্ঘগুলি দৈনন্দিন পলিটিক্স্-চর্চ্চার গণ্ডিতে আবদ্ধ রাষ্ট্রীয় শ্রমিকদলের সংস্পর্শ ত্যাগ করে সিণ্ডিক্যালিষ্ট্ আন্দোলন আরম্ভ করল। তাদের প্রধান প্রচারক সরেল্ সোশ্যাল্ ডেমোক্র্যাট্দের মার্ক্সের প্রতি নিষ্ঠাকে "মৃত, গলিত ও অন্তঃসারশূন্য" বলে' উপহাস করে' দেখবার চেষ্টা করলেন যে আসলে মার্ক্স্ সিণ্ডিক্যালিষ্ট্দের মতনই পলিটিক্স্ বর্জ্জন ও শুধু ধর্ম্মঘটরূপ অস্ত্রের সাহায্যে বিপ্লবসাধনের পক্ষপাতী ছিলেন। নানা বিপরীত ব্যাখ্যার আবর্ত্তের মাঝখানে অবশেষে জার্ম্মানিতে রোজা লুক্সেম্বুর্গ্ এবং রাশিয়ায় লেনিন্, মার্ক্স্ ও এঙ্গেল্স্-এর সমস্ত লেখা আয়ত্ত ও মন্থন করে' আদিতত্ত্বের পুনরাবিষ্কার করলেন। লেনিনের মতে কাউট্স্কি বিপ্লব সম্বন্ধে মার্ক্সের প্রধান বক্তব্যই বুঝতে পারেননি; অন্যদিকে কাউট্স্কি বলেন যে, লেনিন্ মার্ক্স্বাদের ব্যাখ্যায় শ্রমিকশ্রেণীর একাধিপত্যের প্রয়োজনীয়তাকে অযথা প্রাধান্য দিয়েছেন। কিন্তু একথা এখন স্বীকার করতেই হবে যে, লেনিন্-প্রচারিত আধুনিক কমিউনিজ্ম্ বা সাম্যবাদ সর্ব্বত্র মার্ক্সের অভিপ্রেত পন্থার যথার্থ অনুসরণ রূপে গৃহীত হচ্ছে। লেনিনের মতামত নিয়ে আবার ট্রট্স্কি ও ষ্টালিনের যে মতদ্বৈধ চল্ছে সে সম্বন্ধে এখানে কিছু বল্বার প্রয়োজন নেই, কেননা আমাদের আলোচ্য বইগুলি সে বিষয়ে প্রায় নীরব।

ইয়োরোপের এ যুগের ইতিহাসে এইভাবে একই উৎস থেকে সোশ্যাল্ ডিমোক্র্যাসি ও কমিউনিজ্ম্ এই দুই স্বতন্ত্র চিন্তাধারার উদ্ভব হ'ল। উভয়েরই লক্ষ্য এক—সে উদ্দেশ্য শ্রেণীবর্জ্জিত সমাজ সংগঠন। এদের পার্থক্য প্রধানতঃ সাধনার উপায়ে। তফাৎটা পরিষ্কার হয় যখন আমরা মনে রাখি যে সোশ্যাল্ ডিমোক্র্যাট্দের বিশিষ্ট বিশ্বাস এই যে—আজকের সমাজ ধীরে ধীরে নূতন সমাজে রূপান্তরিত হবে, বক্তৃতা ও প্রচারের সাহায্যে দেশের অধিকাংশকে সোশ্যালিষ্ট করে' তোলাই পরিবর্ত্তন-সাধনের প্রকৃষ্ট ও সহজতম প্রণালী, সুতরাং বিপ্লব সশস্ত্র হবার প্রয়োজন নেই এবং শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে শত্রুদের স্বাধীনতাহরণ ও তাদের প্রতি অত্যাচার গর্হিত এবং অনাবশ্যক। এ পন্থার সঙ্গে সাম্যবাদের বিস্তর অমিল, কিন্তু সাম্যবাদ যে মার্ক্সের প্রকৃত মতামত থেকে অভিন্ন এ কথা এত বাদানুবাদের পর জোর করে' বলা চলে। অথচ এতদিন পরে আবার অধ্যাপক কোল্ মার্ক্সের নূতন ব্যাখ্যা প্রচারে উদ্যত হয়েছেন। তাঁর মতে মার্ক্স্-নির্দ্দিষ্ট বিশ্লেষণ-প্রণালী ও দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যেই প্রতিপন্ন হয় যে, সাম্যবাদের স্থির-সিদ্ধান্তগুলি আধুনিক জগতে অনেক ক্ষেত্রে অপ্রযোজ্য—অর্থাৎ মার্ক্সের শিষ্যেরা গুরুর মনোভাবের বৈশিষ্ট্য বজায় না রেখে শুধু তাঁর কয়েকটি সাময়িক উপদেশ মন্ত্রের মতন আওড়ে চলেছে, ফলে আসল মার্ক্স্কে তারা বুঝতেই পারেনি। কোলের প্রধান প্রতিপাদ্য এই বলা যেতে পারে যে,—সত্তর বছর আগে মার্ক্স্ যে-পন্থা নির্দ্দেশ করেছিলেন আজ অন্য অবস্থায় তা' আংশিক অচল হওয়া স্বাভাবিক; তিনি নিজে আজ বেঁচে থাকলে অন্য কথা লিখ্তেন বলে' কোলের বিশ্বাস অর্থাৎ এখন কোলের মতন সাম্যবাদের চেয়ে সোশ্যাল্ ডিমোক্র্যাসির দিকে তাঁর বেশী ঝোঁক দেখা যেত। মার্ক্স এখন বেঁচে থাকলে কি করতেন এ নিয়ে গবেষণা নিরর্থক। তাঁর মতবাদ

ভ্রান্ত একথা বলা যেতে পারে, কিন্তু তাঁর মতামতের বিকৃত ব্যাখ্যা করা সঙ্গত নয়। সোশ্যাল্ ডিমোক্র্যাসি ও সাম্যবাদ এই দুটি চিন্তাধারার মধ্যে কোনটি যে মার্ক্সের প্রকৃত উত্তরাধিকারী, সে তর্কের জের এখনও চল্‌লেও তার মীমাংসা হয়ে গেছে। লেনিন্ স্থলবিশেষে মার্ক্সের সময়োপযোগী সংস্কারের চেষ্টা করেছিলেন অবশ্য, কিন্তু কোন আমূল সংশোধনের প্রয়োজন তিনি দেখেননি। মার্ক্সের বিপ্লবপদ্ধতি মানব-ইতিহাসে সমগ্র ধনিকযুগের পক্ষে সমান প্রযোজ্য, এক-আধ শতাব্দীতে তার বিশেষ পরিবর্ত্তন সম্ভব নয়—এ বিশ্বাস সাম্যবাদীদের মজ্জাগত। কোল্ প্রমুখ লেখকদের মার্ক্সকে ভদ্র respectable রূপ দেবার চেষ্টা করা বৃথা।

মার্ক্সের প্রকৃত মতের কঠোর রূপ সম্বন্ধে ভুল ধারণা নিরাকরণের জন্য এখানে সাম্যবাদের প্রধান সিদ্ধান্তগুলি আবৃত্তি করা যেতে পারে। এর থেকে মার্ক্সবাদ ও সমাজ-সংস্কারের অন্য নানাবিধ আদর্শের পার্থক্য স্পষ্টতর হবে। (১) মানবসমাজ বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত। দুই শ্রেণীর মধ্যে সীমারেখা সুস্পষ্ট না হ'লেও তাদের পৃথক অস্তিত্ব নিঃসন্দেহ। শ্রেণীগত স্বার্থের মধ্যে সঙ্ঘাত অনিবার্য্য ও সেই সঙ্ঘর্ষই ইতিহাসের পটভূমিকা। (২) ধনতন্ত্রের যুগে ধনিক ও মজুর শ্রেণী প্রধান প্রতিপক্ষ-রূপে দেখা দিয়েছে—অন্য যে কোন শ্রেণী মূল শ্রেণী দু'টির পার্শ্বচর মাত্র। শ্রমিকের পারিশ্রমিকের চেয়ে তার উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য অনেক বেশী অথচ এই অতিরিক্ত সম্পদ—ধনোৎপাদন সমাজের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফল হওয়া সত্ত্বেও—সমগ্র সমাজের আয়ত্তে না এসে ধনিকবিশেষ বা ধনিকশ্রেণীর করতলগত হয়। এই ব্যবস্থাকে মার্ক্স্ "শোষণ" আখ্যা দিয়াছেন। (৩) যে কোন ষ্টেট্ বা রাষ্ট্র শ্রেণীবিশেষের স্বার্থরক্ষার উপায় মাত্র। যেখানে শ্রেণীভেদ আছে সে দেশ বা জাতির স্বার্থ শুধু কল্পনার কথা—এমন কি ডেমোক্র্যাটিক্ ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রও আসলে ধনিক প্রভুত্ব বজায় রাখার যন্ত্র। (৪) শ্রেণী সঙ্ঘর্ষ-নিষ্পত্তির একমাত্র উপায় শ্রেণীবর্জ্জিত সমাজ গঠন—তার প্রথম সোপান শ্রমিকদের সশস্ত্র বিদ্রোহ। বিপ্লব সম্ভব ও সার্থক করে' তোলাই শ্রমিক-শ্রেণীর প্রতিভূ সাম্যবাদিদলের সাধনা। (৫) বিপ্লবের অব্যবহিত পরেই নূতন সমাজ স্থাপিত হবে না—তার জন্য বহুদিনের পরিশ্রম চাই। সেই যুগসন্ধির সময় শ্রমিক-শ্রেণীর একাধিপত্য প্রয়োজন—তখন গণতান্ত্রিক বিধিব্যবস্থা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, স্বাধীনতা ইত্যাদি আদর্শের মায়া ছাড়তে হবে। (৬) কিন্তু এই একাধিপত্যের ব্যবস্থা চিরস্থায়ী নয়। ক্রমে ক্রমে শ্রেণীভেদের উচ্ছেদ হবে, তখন ষ্টেটের নিষ্পেষণযন্ত্রের আর কোন কাজ থাকবে না। শ্রেণীভেদ ও রাষ্ট্রের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে নৈরাজ্যবাদের ঈপ্সিত পূর্ণ সাম্যতন্ত্রের আবির্ভাব হবে। তখন বাকী সকলে যথাশক্তি সমাজের সেবা করবে এবং সমাজও প্রত্যেকের প্রয়োজনানুরূপ অভাব মেটাতে পারবে।

উপরিউক্ত ছয়টি সূত্র থেকে এরকম সিদ্ধান্ত করা অন্যায় হবে না যে, মার্ক্সের মতসমষ্টি ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ, শ্রমিকশ্রেণীর অভিজ্ঞতা ও আশা ভরসা এবং তর্কাতীত বিশ্বাসের সংমিশ্রণ। সোশ্যাল্ ডেমোক্র্যাটদের মনের গঠন অন্যরূপ। তারা শ্রেণী-সঙ্ঘর্ষ ও শোষণের অস্তিত্ব স্বীকার করে বটে কিন্তু ষ্টেটের স্বরূপ ও ভবিষ্যৎ অবসান এবং সশস্ত্র বিপ্লব ও শ্রমিকশ্রেণীর অধিনায়কত্বের আবশ্যকতা ইত্যাদি মতগুলি সম্পূর্ণ গ্রহণ করে না। তাই বের্ণষ্টাইন্ মার্ক্সকে সংস্কার করতে চেয়েছিলেন, কাউটস্কি তাঁকে বুঝতে পারেননি, মিডল্টন্ মারে সাম্যবাদ প্রসঙ্গে আধ্যাত্মিকতার অবতারণা

করলেন, আর কোল্ গত ত্রিশ বছরের এত আলোচনার পরও প্রকৃতপক্ষে বের্ণষ্টাইনের পুনরাবৃত্তি করতে প্রবৃত্ত হয়েছেন। সাম্যবাদী ও সোশ্যাল্ ডেমোক্র্যাট্ এই দুই ধরণের মনের পরস্পরের সঙ্গে মিল অসম্ভব বলেই মনে হচ্ছে। অথচ সোশ্যাল্ ডেমোক্র্যাট্দের মার্ক্সকে ত্যাগ করবার মতন সাহস আজ পর্য্যন্ত হল না। এতে করে' শুধু ভুল বোঝারই অবশ্য প্রশ্রয় দেওয়া হয়।

কোল্ বোঝাতে চেষ্টা করেছেন যে সাম্যবাদের সিদ্ধান্তগুলির আংশিক সংশোধন কিছু ভয়ানক ব্যাপার নয়, তাতে মার্ক্সের আসল কৃতিত্ব খর্ব্ব হওয়া দূরে থাক স্পষ্টতর হয়ে উঠবে। মার্ক্সের বৈশিষ্ট্য নাকি তাঁর উপরি-উক্ত মতগুলিতে নয়—সে বিশেষত্ব তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী ও বিশ্লেষণপ্রণালীতে। হুক্ মার্ক্সের কোন বিশেষ মত খণ্ডন না করলেও প্রকারান্তরে এই কথাই বলেছেন। হেকারের বইখানি সাম্যবাদী দর্শনের বিশদ পরিচয়। আমাদের চতুর্থ বইখানির সমস্তটাই এই দর্শনের নানামুখী ব্যাখ্যা। সকলেই একবিষয়ে একমত—মার্ক্সকে বুঝতে হ'লে তাঁর দার্শনিক বিশ্বাস পর্য্যন্ত তলিয়ে দেখতে হবে, তাঁর সকল উপদেশের মূল এখানে। ইংরাজিতে এই প্রথম এ-কথা এত বিস্তারিতভাবে আলোচিত হ'ল। হেকারের পঞ্চম থেকে পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে, হুকের দ্বিতীয় ভাগের প্রথমার্দ্ধে, কোলের প্রথম ও শেষ অধ্যায়ে এবং লেভি-প্রমুখ লেখকের প্রবন্ধাবলীতে মার্ক্সতত্ত্বের মূলোদ্ঘাটনের যে চেষ্টা হয়েছে তা' সহিষ্ণু পাঠকের দৃষ্টি নিশ্চয়ই আকর্ষণ করবে। কিন্তু জটিল বিষয়বস্তুটি আমার কাছে ঠিক সুস্পষ্ট না হওয়ায় নিম্নলিখিত বিবরণ বোধগম্য হবে কিনা সন্দেহ হয়। তবু এ চেষ্টা বাদ দিলে বইগুলির সমালোচনা নিতান্তই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। আশা করি দর্শনাভিজ্ঞ পাঠকেরা আমার এই অনধিকার-চর্চ্চা ক্ষমা করবেন।

মার্ক্সবাদের ভিত্তি কি এই প্রশ্নের উত্তরে পরস্পর-সংশ্লিষ্ট দু'টি বিষয় নির্দ্দেশ করা হয়—Dialectical Materialism এবং Historical Materialism। জড়দর্শনের মধ্যে আদর্শবাদী হেগেলের ডায়ালেক্টিক্ যুক্তিপ্রণালী প্রয়োগ ও ইতিহাসের বাস্তব ব্যাখ্যা—এই প্রয়াস দু'টি মার্ক্সের চিন্তাধারাতে তার যথার্থ অভিনবত্ব এনে দিয়েছে।

আবহমান কাল থেকে দার্শনিকদের দুই মূল দলে ভাগ করা হয়েছে—আদর্শবাদী ও জড়বাদী। ফয়রবাক্-প্রসঙ্গে এঙ্গেল্স্ এই দুই মতের পার্থক্য নিম্নোক্তভাবে দেখিয়েছেন। প্রথম দলের বিশ্বাস যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মূল উৎস আত্মা অথবা বিদেহী জ্ঞান, দৃশ্যমান জগতের সকল কিছুই আসলে তারই ছায়া ও রূপান্তর মাত্র। অপর দলের মতে জড়বস্তুই অস্তিত্বের আদিকথা—চিন্তাশক্তির উদ্ভব জগতের ইতিহাসের একটি অধ্যায় মাত্র—জড় জগতের প্রকৃতরূপ আমাদের চোখে ধরা না পড়লেও জড়ই বাস্তব ধ্রুব সত্য। জড়বাদীদের বিশ্বাস যে, দেহবিশেষের আধারের বাইরে বুদ্ধি বা জ্ঞানের কোন অস্তিত্ব থাকতে পারে না। শুধু এই অর্থেই মার্ক্সকে জড়বাদী বলা হয়। তাঁর দর্শনের সঙ্গে আধুনিক রিয়ালিজ্মকে কেউ কেউ এক পর্য্যায়ে ফেলেছেন। রাসেলের মতে তাঁর বিশ্বাসের সঙ্গে জন্ ডিউয়ির দর্শনের আশ্চর্য্য মিল আছে।

মার্ক্স্-পূর্ব্ব যুগে ইয়োরোপীয় আদর্শবাদ হেগেলের মধ্যে পূর্ণ পরিণতি লাভ করে—অন্যদিকে নিউটনীয় বিজ্ঞান ও অষ্টাদশ শতকের যুক্তিবাদের প্রভাবে জড়দর্শন ইংল্যাণ্ড্ ও ফ্রান্সে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। হেগেলের বিশেষত্ব সম্বন্ধে একথা বলা হয় যে,

তাঁর পূর্ব্ববর্ত্তী আদর্শবাদী ও জড়বাদী সাধারণতঃ সকল দার্শনিকই বিশ্বজগৎকে স্থিতিশীল রূপে বিশ্লেষণ করে' সার সত্যের সন্ধান করেছিলেন ; কিন্তু হেগেলের মতে সমগ্র বিশ্ব সতত পরিবর্ত্তিত হয়ে চলেছে। এই বিবর্ত্তনের মূলসূত্রেই হেগেল্ প্রবর্ত্তিত ডায়ালেক্‌টিক্স্। গ্রীক ও মধ্যযুগের ডায়ালেক্‌টিক্ বা বাদানুবাদ-পদ্ধতি থেকে এর জন্ম হ'লেও হেগেলের পন্থার স্বাতন্ত্র্য উল্লেখযোগ্য। হেগেল্ জগতের কোন কিছুকেই স্থিতিসার ভাবা ভ্রান্তি মনে করতেন—তাঁর মতে সমস্ত সৃষ্টি-সংসার ক্রমাগত রূপান্তরিত হচ্ছে। দৃশ্যমান জগতের অন্তরালে সারসত্য অবশ্য পরমাত্মার আইডিয়ারূপে বিরাজ করছে, কিন্তু সে সত্যও ক্রমপ্রকাশ্য। ক্রমবিকাশের একটি বিশেষ ধারা হেগেল্ নির্দ্দেশ করেন—প্রথমে একটি আইডিয়া আবির্ভূত হয়ে রূপগ্রহণ করে, তারপর তার বিরোধী আইডিয়া ভিন্নমূর্ত্তিতে প্রকাশিত হয়, এই thesis এবং antithesis-এর সঙ্ঘাতের ফলে সামঞ্জস্য বা synthesis-এর সৃষ্টি। পরবর্ত্তীযুগে আবার এই সমন্বয় থিসিসের স্থান নেবে—তার থেকে আবার নূতন সঙ্ঘাত ও নূতন সামঞ্জস্যের উদয়। এইভাবে জগতের ইতিহাসে প্রতি পর্য্যায়ে পরমাত্মা ক্রমে ক্রমে স্বপ্রকাশ হয়ে নিজের পূর্ণতা উপলব্ধি করছেন। বিশ্বের বিবর্ত্তনের মধ্যে আদর্শের এই লীলা হেগেল্-দর্শনের এক প্রধান বৈশিষ্ট্য।

ফয়র্‌বাকের প্রভাবে মার্ক্স্ ও এঙ্গেল্স্ তাঁহাদের আদিগুরু হেগেলের আদর্শ-বাদের মোহ কাটিয়ে জড়বাদ গ্রহণ করলেন। কিন্তু পুরাতন জড়বাদ তাঁদের কাছে নিতান্ত যান্ত্রিক মনে হয়েছিল—তার মধ্যে ঐতিহাসিক পরিবর্ত্তন অর্থাৎ নূতন কিছুর উদ্ভবের সঙ্গত ব্যাখ্যা তাঁরা খুঁজে পেলেন না। এইজন্য হেগেলীয় ডায়ালেক্‌টিক্সের সাহায্য নিয়ে তাঁরা জড়বাদকে এক নূতন রূপ দিলেন। তাঁদের দর্শনেও বিশ্বসংসার নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল ও চলন্ত গণ্য হ'য়ে থিসিস্, অ্যান্টিথিসিস্ ও সিন্‌থিসিসের পর্য্যায়ভুক্ত হ'ল। শুধু হেগেল্ যেখানে পরমমনের আইডিয়ার ক্রমবিকাশ ও ঘাতপ্রতিঘাত দেখেছিলেন, মার্ক্স্ সেখানে প্রকৃত বস্তুর অস্তিত্ব ও প্রভাব স্বীকার করলেন। কিন্তু মার্ক্সের বস্তু শুধু জড়পদার্থ নয়, তার মধ্যে মানুষের মনের ক্রিয়ারও যথাযোগ্য স্থান আছে—এমন কি তিনি বল্‌তেন যে, আমাদের পারিপার্শ্বিক কোন কিছুকে জানার অর্থই হ'ল তার কিছু পরিবর্ত্তন হওয়া। মার্ক্স্ কিন্তু আদর্শবাদের বিদেহী জ্ঞান ও আইডিয়ার অস্তিত্ব অস্বীকার করতেন। জড়শক্তি অথবা জীবের প্রচেষ্টার উদ্ভব, প্রতিঘাত ও সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে বিবর্ত্তনের গতি চলেছে—এই ধারণার উপর সমগ্র মার্ক্স্-দর্শন নির্ভর করছে।

সাম্যবাদকে নূতন কোন ধর্ম্ম বলে' অভিহিত করলে ডায়ালেক্‌টিক্স্‌কে সেই ধর্ম্মের দুজ্ঞেয় গূঢ়রহস্য বলা যেতে পারে। কিন্তু ডায়ালেক্‌টিক্ সম্বন্ধে আমাদের মনোভাব যাই হোক না কেন, মার্ক্সের সিদ্ধান্তসমুদয়ের উপর এই দৃষ্টিভঙ্গীর প্রভাব দেখতে পাওয়া কিছু শক্ত নয়। ডায়ালেক্‌টিকের মূলতত্ত্বের অন্তর্গত কয়েকটি বিশ্বাসের উদাহরণ দেখলেই একথা বোঝা যাবে। নিতান্ত সহজ ভাষায় এগুলি প্রকাশের পথে অনেক বাধা আছে, কেননা অধ্যাপক লেভি তাঁর প্রবন্ধে সুন্দরভাবে দেখিয়েছেন যে, ডায়ালেক্‌টিক্সের প্রচলিত ভাষা বৈজ্ঞানিক, নৈয়ায়িক বা সাধারণ লোকের কাছে অনেকস্থলেই দুর্বোধ্য। ডায়ালেক্‌টিক্ সম্বন্ধে এঙ্গেল্স্-এর যে তিনটি বিখ্যাত নিয়ম আছে কিংবা এ বিষয়ে লেনিনের বক্তব্যকে "লেবার মান্থলি"তে যে

ষোলটি সূত্রবদ্ধ করা হয়েছিল সেগুলির বিরুদ্ধে আপত্তি খুবই স্বাভাবিক। তবু ডায়ালেক্‌টিক্সের নানা অঙ্গকে নিম্নলিখিত রূপ দেওয়া সম্ভব। (১) জগতের সব কিছুই পরিবর্ত্তিত হ'য়ে চলেছে—এই বিবর্ত্তন মানুষের আর্থিক বিধিব্যবস্থা, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান, এমন কি তার মনের ধারণা বা আইডিয়ার রাজ্যেও লক্ষিত হয়। গতির বেগ অবশ্য সবক্ষেত্রে সমান হ'তে পারে না, কিন্তু বিশ্লেষক ব্যাপক দৃষ্টির কাছে চিরস্থিরতা থাকে না। (২) পরিবর্ত্তনের বীজ বস্তুর মধ্যে অন্তর্নিহিত—এই হ'ল প্রাকৃতিক নিয়ম। এই গতির বেগ বস্তুর মধ্যস্থিত পরস্পর-বিরোধী শক্তির সঙ্ঘর্ষের ফল মাত্র। কিন্তু বিবর্ত্তন আকস্মিক, লক্ষ্যহীন, এলোমেলো ভাবে হয় না। জড়পদার্থ, জীবন বা মানুষের সৃষ্ট প্রতিষ্ঠানের স্বাভাবিক গঠনই এমন যে, ইভলিউশনের একটা বিশেষ ঝোঁক বা লক্ষ্য থাকতে বাধ্য। পুরাতন জড়বাদীদের জগতের যান্ত্রিক ব্যাখ্যা—যাতে করে' নূতন কিছুর উৎপত্তি সহজে বোঝান যায় না—মার্ক্স্ এইজন্য গ্রহণ করতে পারেননি। (৩) বিবর্ত্তন-প্রণালীর সবক্ষেত্রেই একটা বিশিষ্ট রূপ আছে—প্রথমে বস্তুবিশেষের উদ্ভব, পরে তার বিরোধী শক্তির সঙ্গে সঙ্ঘাত, অবশেষে সমন্বয়। সেই সামঞ্জস্য থেকে আবার নূতন পরিবর্ত্তন-ধারার সূত্রপাত। (৪) সঙ্ঘাতের নিয়মানুসারে একই সময়ে পরস্পরবিরোধী বস্তু বা শক্তির একত্র অবস্থান এবং পরস্পরের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হওয়া সম্ভব কিন্তু পরিণামে সেই একত্র অবস্থান ভেঙ্গে পড়তে বাধ্য। সুতরাং বিরোধই ক্রমপ্রকাশের পথ দিয়ে সামঞ্জস্যে পৌঁছে দেবার উপায়। শ্রেণীসঙ্ঘর্ষ দিয়ে শ্রেণীভেদের অবসানের ধারণা এই বিশ্বাসের অনুবর্ত্তী। (৫) পরিবর্ত্তন বা প্রগতির ধারা বৃত্তাকার কিংবা সরলরেখা নয়—spiral এর মতন রূপ এর পক্ষে স্বাভাবিক। অর্থাৎ প্রতিপদে আমরা যে উন্নতির সোপান অধিরোহণ করে' চলেছি একথা ঠিক নয়; আবার যেখান থেকে পরিবর্ত্তনের সূত্রপাত, পরিণামে সিন্‌থেসিসের সময় আমরা ঠিক সেইখানটিতে ফিরে আসি না। (৬) বিবর্ত্তনের বেগ সব সময় সমান নয়—তার ছন্দ কখনও দ্রুতগতি কখনো বা মৃদুমন্দ। ইভলিউশন্ কিন্তু অবিচ্ছিন্ন স্রোতের নয়—স্তর থেকে স্তরান্তরে যাবার সময় leap কিংবা break ঘটা স্বাভাবিক। সিন্‌থিসিস্ ঠিক দুই বিরোধী বস্তুর মিলন বা compromise নয়—তার মধ্যে সর্ব্বদা অতিরিক্ত কোন গুণ অর্থাৎ qualityর আবির্ভাব থাকে। এইভাবে মার্ক্স্ স্থির করেন যে, বিপ্লব ইতিহাসের অপরিহার্য্য অঙ্গ।

মার্ক্সীয় দর্শনের গোড়ার দ্বিতীয় কথাটি হ'ল ইতিহাসের বাস্তব ব্যাখ্যা। ডায়ালেক্‌টিক্সের সাহায্যে মানুষের ইতিহাস-চর্চ্চা করতে গিয়ে মার্ক্স তার একটা বিশেষ রূপ দেখতে পেলেন—ইতিপূর্ব্বে সাম্যবাদের যে সিদ্ধান্তগুলির উল্লেখ করা হয়েছে, তাদের জন্ম নব বস্তুবাদের এই ঐতিহাসিক প্রয়োগের মধ্যে। হুকের এগার থেকে তের অধ্যায়ে এবং কোলের তৃতীয় পরিচ্ছেদে ইতিহাসের বাস্তব ব্যাখ্যা বোঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে। মার্ক্স্ সম্বন্ধে ইংরাজি আরও অনেক বইএ এ সম্বন্ধে আলোচনা পাওয়া যাবে। এই মত নিম্নলিখিত ভাবে বোঝানো যেতে পারে।

অনেকের মনে হয় যে, মানুষের ইতিহাস সম্পূর্ণ দৈবাতের ব্যাপার—আজ পর্য্যন্ত যা কিছু ঘটেছে সবই অন্যভাবে ঘটতে পারত। আসলে খুব কম লোকেরই কিন্তু সত্যি সত্যি এ বিশ্বাস আছে, কারণ এ ধারণা সত্য হ'লে স্বীকার করতে হয় যে, যে কোন মুহূর্ত্তে কোন বিশেষ ঘটনা ঘটার পথে কোন বাধা নেই। ঐতিহাসিকেরা

এতদূর পর্য্যন্ত যেতে পারেন না—কেননা তাহ'লে ইতিহাসচর্চ্চা কেবলমাত্র পরস্পর বিচ্ছিন্ন ফ্যাক্টের সংগ্রহ হ'য়ে দাঁড়ায়, তাতে বোঝার চেষ্টা স্থান পায় না, আর সকল ঘটনাই তুল্যমূল্য হয়ে পড়ে। কার্য্যতঃ ইতিহাসের একটা ধারা ও ঐক্য সকলেই মনে মনে স্বীকার করেন। আদর্শবাদীরা সে ঐক্য খোঁজেন ভগবানের ইচ্ছায় কিংবা মানুষের কোন বিশেষ মনোভাব, চিন্তাধারা বা প্রচেষ্টার মধ্যে। প্রথমটি সত্য হ'লে মানুষের আর বোঝার প্রয়াস ও মাথা ঘামাবার সার্থকতা থাকে না। দ্বিতীয় ধারণার বিরুদ্ধে আপত্তি উঠতে পারে যে ঐতিহাসিক পরিবর্ত্তন মানুষের ইচ্ছা ও মনোবৃত্তির সম্পূর্ণ অনুগামী একথা বিশ্বাস করা শক্ত। প্রতি যুগে মানুষের অসংখ্য ইচ্ছা ও বিভিন্ন চেষ্টার মধ্যে কোন কোনটি জয়যুক্ত ও অপরগুলি নিষ্ফল হয় কেন এ প্রশ্নও জিজ্ঞাস্য। কোন বিশেষ ধারণা যে সব যুগেই আবির্ভূত হয় না অথবা হ'লেও প্রচলিত হয় না, এর থেকে মনে হওয়া সম্ভব যে আইডিয়ার পিছনেও অন্য বস্তুর প্রভাব রয়েছে। জড়বাদীরা সেইজন্য ইতিহাসে আরও ব্যাপক কোন নির্দ্দেশকের সন্ধান করেন। তাঁদের মধ্যে আবার অনেকে আর্থিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য, জাতীয় স্বভাব, ভৌগলিক সংস্থান, আবহাওয়া, খাদ্যের পরিমাণ ও প্রকারভেদ, যন্ত্রের উন্নতি ইত্যাদি কোনও একটির মধ্যে ইতিহাসের মূল খুঁজেছেন। এগুলির যথাযথ মূল্য আছে কিন্তু ইতিহাসের ধারা এদের কোন একটি দিয়ে সম্পূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না। তাছাড়া এসব আগের মতন অপরিবর্ত্তিত থাকা সত্ত্বেও সামাজিক পরিবর্ত্তন হবার দৃষ্টান্ত বিরল নয়। উপরি-উক্ত সংকীর্ণ জড়বাদ অনেকক্ষেত্রে মানুষের জ্ঞান ও উদ্যমকে আমলের মধ্যেই আনে না—একে ইতিহাসের যান্ত্রিক ব্যাখ্যা নাম দেওয়া যেতে পারে। এইভাবে তর্ক করতে করতে মার্ক্স্-পন্থিগণ শেষ পর্য্যন্ত ইতিহাসের মূলসূত্র খোঁজেন ধনোৎপাদন-ব্যাপারে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধের মধ্যে। সেই সম্বন্ধ সমাজে ভিন্ন ভিন্ন স্তর অথবা শ্রেণীর রূপ গ্রহণ করে—সাম্যবাদ অনুসারে তাদের ঘাতপ্রতিঘাত ও বিকাশ ইতিহাসে পরিবর্ত্তনের প্রেরণা। যে কোনও যুগে ধনোৎপাদন-রত বিভিন্ন শ্রেণীর পারস্পরিক সম্বন্ধের উপর সে যুগের প্রতিষ্ঠান-সমূহ বিধি-ব্যবস্থা, আইন-কানুন, ধারণা-সমষ্টি, এমন কি পরিশীলন-সম্পদ পর্য্যন্ত গড়ে উঠে। মার্ক্স্ এ কথা বলেননি যে, ইতিহাসের মধ্যে এই সম্বন্ধ ছাড়া আর কিছুই নেই আর এইটিই একমাত্র সত্য। তিনি শুধু শ্রেণীর সম্বন্ধকে ইতিহাসের মূলসূত্র অথবা সমাজ-মন্দিরের ভিত্তিরূপে কল্পনা করেছিলেন—তার চারিদিকে ও উপরে নানা বৈচিত্র্যের প্রকাশকে তিনি অস্বীকার করেননি। কিন্তু ধনোৎপাদন-রত শ্রেণীদের ডায়ালেক্‌টিকের নিয়মানুগত সম্বন্ধ-বিপর্য্যয়ই ইতিহাসের বাস্তব ব্যাখ্যার গোড়ার কথা। হুকের বইখানিতে ১১৬ থেকে ১২৪ পৃষ্ঠায় পাঠক এর একটি পরিষ্কার বিবরণ পাবেন।

এই মতের বিচার করতে হ'লে যে সব প্রশ্ন স্বতঃই মনে আসে তার আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। হুকের বইএ ১২৫ থেকে ১৬০ পৃষ্ঠায় এ সম্বন্ধে অনেক কথা আছে। ইতিহাস সম্বন্ধে মার্ক্স্ যে বস্তুবাদ প্রচার করেছিলেন তার অর্থ এই নয় যে, শুধু ধনোৎপাদন-প্রণালী বা টেক্‌নিকের প্রকৃতির উপর সমাজের বৈশিষ্ট্য নির্ভর করছে—তাহ'লে আজ আমেরিকার যুক্তরাজ্য এবং সোভিয়েট রাশিয়ার মধ্যে কোন দুস্তর পার্থক্য থাকত না। আসলে টেক্‌নিক্

সম্পূর্ণভাবে মানুষের বুদ্ধির সৃষ্টি; মার্ক্সের বস্তুবাদ তার চাইতে অধিক ব্যাপক হবার দাবী করে। মার্ক্স্ এমন কথাও বলেননি যে প্রত্যেক লোক আসলে সর্ব্বদা স্বার্থবুদ্ধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে আর জীবনে আদর্শের কোন যথার্থ মূল্য নেই। তাঁর বক্তব্য এই মাত্র যে, শ্রেণীস্বার্থের উপর শ্রেণীর পৃথক অস্তিত্ব নির্ভর করছে সুতরাং শ্রেণী থাকলেই তার স্বতন্ত্র স্বার্থ থাকবে আর তাদের সঙ্ঘাতও উপস্থিত হবে। আদর্শ সব সময়েই অল্পবিস্তর চোখে পড়ে, কিন্তু কোনও একটি যুগে শুধু সেই যুগোপযোগী আদর্শই প্রবল হয় বলে' সেই সাফল্যের কারণ তিনি তাঁর ঐতিহাসিক ব্যাখ্যায় নির্দ্দেশ করতে চেয়েছিলেন। হুক্ আরও বলেছেন যে মার্ক্সের মতে ইতিহাস কেবল শ্রেণী-সঙ্ঘর্ষের বিবরণ মাত্র নয়। নানা বিভিন্ন উপাদানের সংমিশ্রণে ইতিহাসের মূর্ত্তি রূপ পরিগ্রহণ করে, কিন্তু ব্যাপকভাবে দেখতে গেলে শ্রেণী সম্বন্ধই ইতিহাসের কাঠামো বলে, মনে হয়। এর পর হুক্ দেখাবার চেষ্টা করেছেন যে মার্ক্স্ ইতিহাসে মহাপুরুষের প্রভাব ও আকস্মিক ঘটনার উপদ্রব একেবারে অস্বীকার করেননি। নেপোলিয়ানের জন্ম না হ'লে কিংবা তাঁর অকাল-মৃত্যু ঘটলে ইয়োরোপের সে যুগের ইতিহাস ঠিক সেভাবেই চল্‌ত অথবা অন্য কোন লোক নেপোলিয়ানের স্থান নিয়ে ঠিক তাঁর মতন আচরণ করে যেত, এ কথা ভাবার কোন হেতু নেই। ভবিষ্যতের খুঁটিনাটি পর্য্যন্ত যদি এভাবে আগে থাকতে নির্দ্ধারিত থাকত তাহ'লে সমস্ত ইতিহাস এক অলৌকিক রহস্যে পরিণত হ'ত। কিন্তু ইয়োরোপের ইতিহাসে পর পর দাসত্বের যুগ, ফিউডাল্ সমাজ, ধনতন্ত্রের আগমন, প্রথমে তার পুষ্টি-সাধন ও পরে ক্ষয়োন্মুখ অবস্থা, তার আত্মরক্ষার জন্য ফাসিষ্ট-আন্দোলন—মার্ক্স্‌পন্থীদের কাছে এ সমস্ত আকস্মিক নয়, এবং এগুলি পরিবর্ত্তনের একটি বিশেষ ধারা নির্দ্দেশ করে। তাদের বিশ্বাস যে, শ্রেণী সম্বন্ধের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন সামাজিক ব্যবস্থা রূপান্তরিত হয়ে চলেছে। সোশ্যালিজ্‌মের প্রতিষ্ঠা অবশ্যম্ভাবী সাম্যবাদীদের এই বিশ্বাসের মানে এ নয় যে এ সম্পর্কে মানুষের চেষ্টার কোন প্রয়োজন কি মূল্য নেই—এ বিশ্বাস প্রাকৃতিক নিয়ম বা গণিত-শাস্ত্রের সিদ্ধান্তের সমশ্রেণীর সত্য নয়। কিন্তু সাম্যবাদ এ কথা বলে যে, সোশ্যালিজ্‌ম্ স্থাপিত না হ'লে প্রাচীন সভ্যতাগুলির মতন বর্ত্তমান সভ্যতাও ধ্বংস হবে এবং নূতন যে সভ্যতার উদয় হবে তার মধ্যেও শ্রমিক-সমস্যা কিছুদিনের ভিতর মাথা তুলতে বাধ্য। অতএব শেষ পর্য্যন্ত এ সমস্যা সমাধানের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার কোন উপায় নেই হুকের এই শেষ বক্তব্য।

মার্ক্সের জড়বাদ ও ঐতিহাসিক ব্যাখ্যার যে বিবরণ উপরে দেওয়া হ'ল সেটা প্রধানতঃ হুকের লেখার অনুযায়ী। গোঁড়া সাম্যবাদীদের এর সকল কথা সম্পূর্ণ মনের মতন হবে কিনা সন্দেহ। হুক্ দু'এক জায়গায় এঙ্গেল্‌স্ ও লেনিনের পর্য্যন্ত মার্ক্সকে বুঝবার ভুল হয়েছিল বলেছেন এবং তিনি ট্রট্‌স্কির প্রভাবান্বিত বলে অভিযোগ শোনা গেছে। কিন্তু তবু মার্ক্স্ সম্বন্ধে এত জ্ঞান ইংরাজি অপর কোন লেখকের মধ্যে এখন পর্য্যন্ত দেখা যায়নি।

এই প্রসঙ্গ শেষ করবার আগে আমার কয়েকটি বক্তব্য আছে। আমার মনে হয় বিজ্ঞানসম্মত থিওরি হিসাবে বিচার করতে গেলে এইখানেই সাম্যবাদের প্রকৃত

দুর্ব্বলতা। (১) জগৎসংসারের পরিবর্ত্তন ডায়ালেক্‌টিকের নিয়মানুসারে হচ্ছে হেগেলের এ বিশ্বাসের অকাট্য প্রমাণ কি? অনেক স্থলে বিশ্লেষণের ফলে এই রূপটি লক্ষিত হ'লেও, সে ব্যাখ্যা বিশ্লেষকের নিজস্ব কল্পনা হ'তে পারে। (২) ডায়ালেক্‌টিকের সূত্র স্থলবিশেষে ধরা পড়লেও সর্ব্বত্র প্রযুজ্য না হওয়া অসম্ভব নয়; এবং এই অনুমান ঠিক হ'লে বিজ্ঞানবুদ্ধি দ্বারা মার্ক্‌স্‌তত্ত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করা দুরূহ হয়ে ওঠে। তখন শেষ পর্য্যন্ত মার্ক্‌স্‌পন্থীকেও অগত্যা বিশ্বাসের আশ্রয় নিতে হয়। (৩) ডায়ালেক্‌টিকের নির্দ্দিষ্ট রূপ থেকে সর্ব্বত্র বিপ্লবের অবশ্যম্ভাবিতা অনুমান করে' নেওয়ার মধ্যে যুক্তির ফাঁক রয়েছে। সঙ্ঘাত থেকে সমন্বয় ধীরে ধীরে সম্পন্ন হবার পথে যুক্তিসঙ্গত বাধা কোথায়? ফিউডাল্ সমাজ থেকে ধনতন্ত্রে পৌছতে সর্ব্বত্র ত বিপ্লবের প্রয়োজন হয়নি। অথচ বিশ্বব্যাপী বিপ্লবের ধারণাই হ'ল সাম্যবাদের প্রাণ। (৪) ইতিহাসের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে সমস্যা এই যে, শ্রেণীসম্বন্ধের পরিবর্ত্তনের কারণ কি এ প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক এবং ডায়ালেক্‌টিকের রহস্য সেই কারণ বলে' উক্ত হ'লে আমাদের বুদ্ধি তৃপ্তি পায় না। তা ছাড়া কোল্ ঠিকই দেখিয়েছেন যে বিভিন্ন জাতি ও সভ্যতার উত্থান-পতনের সঙ্গে শ্রেণীসম্বন্ধের পরিবর্ত্তনের কোন যোগ খুঁজে পাওয়া অনেক স্থলে কষ্টসাধ্য, অথচ এই সব ব্যাপারই ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য কথা বলে' গণ্য হয়। একথাও বলা যেতে পারে যে, ভবিষ্যদ্বাণী শেষ পর্য্যন্ত বিশ্বাসের উপরই নির্ভর করে, বুদ্ধির উপর না। (৫) হুক্ উপরি-উক্ত আপত্তি সম্বন্ধে সজাগ আছেন বলেই চারিদিক বাঁচিয়ে ইতিহাসের বাস্তব ব্যাখ্যার মার্জ্জিত রূপ দাঁড় করিয়েছেন কিন্তু ফলে তার আর কোন বিশেষ সার্থকতা থাকে কিনা সন্দেহ। অর্থাৎ সচরাচর ইতিহাস বলতে আমরা যা' বুঝি তার অধিকাংশের পক্ষেই আর এ ব্যাখার কোন অর্থ থাকে না। (৬) মার্ক্‌স্‌দর্শন আয়ত্ত করা ও মার্ক্‌স্‌-নির্দ্দিষ্ট পন্থার অনুসরণ—এ দুয়ের মধ্যে আঙ্গাঙ্গি যোগের কথা বিস্তর শোনা যায়, কিন্তু সে যোগ ঠিক কোনখানে? মার্ক্‌স্‌ ও এঙ্গেল্‌স্‌-এর চিন্তার প্রকাশ বুঝতে হ'লে তাঁদের দর্শনের অনুশীলনের অবশ্য প্রয়োজন—কিন্তু সে বিষয়ে অর্ব্বাচীন থেকে মার্ক্‌স্‌পন্থী হওয়া সম্ভব না অসম্ভব? মার্ক্সের মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে হেকার্ বা হুক্ পরীক্ষক হ'লে বুকারিনের মতন বিখ্যাত সাম্যবাদীও পরীক্ষায় ফেল হতেন—অথচ এঁদের দুজনকেই বের্ণাল্ বুর্জোয়া বলে' তাঁর প্রবন্ধে উড়িয়ে দিয়েছেন। হুক্ তাঁর সপ্তদশ অধ্যায়ে লিখ্‌ছেন যে, প্রকৃত মার্ক্সীয়ের চিহ্ন দর্শনে অধিকার নয়, ষ্টেট্ সম্বন্ধে মার্ক্সের মতগ্রহণই তার স্থির নিদর্শন। এ কথা সত্য হ'লে ডায়ালেক্‌টিক্-সম্বলিত জড়বাদ ও ইতিহাসের বাস্তব ব্যাখ্যার স্থান সংকীর্ণ হ'য়ে আসে না কি? হেকার্ কিন্তু বলেন যে, যার দর্শনজ্ঞান মার্ক্সের অনুরূপ নয় সে প্রকৃত সাম্যবাদী হ'তেই পারবে না। তবে কি লিব্‌নেক্‌ট্, ট্রট্‌স্কি প্রভৃতি বিখ্যাত নেতারা সাম্যবাদী ছিলেন না? এত মতান্তরের ভিতর নিশ্চিত সত্য কোথায়?

মোট কথা যুক্তিতর্কের সাহায্যে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে মার্ক্‌স্‌বাদকে নিছক বুদ্ধির রাজ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব বলে' আমার মনে হয় না। সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ বিজ্ঞানসম্মত পন্থা বলে' প্রচলিত সাম্যবাদের যে একটা অভিমান ছিল তার গোড়াপত্তন কাঁচা। সাম্যবাদ যে যুক্তিসর্ব্বস্ব নয়, মার্ক্সের দর্শন ও কর্ম্মপদ্ধতি যে একটা নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌছবার সাধনা মাত্র, হুক্ একথা স্বীকার করেছেন। কিন্তু তিনি একথাও বলেছেন যে বিজ্ঞানবুদ্ধি দিয়ে মার্ক্সের মতকে অপ্রমাণ করা চলে না। বস্তুতঃ মার্ক্সের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্যই হ'ল এই বিশ্বাস যে ইতিহাস, অর্থশাস্ত্র, সমাজবিজ্ঞান ও দর্শন

কখনও সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ হ'তে পারে না। অতএব এ সকল ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের স্থান কোথায়? ফয়রবাক্-প্রসঙ্গে মার্ক্স নিজেই লিখে গিয়েছেন যে, জগৎকে বোঝা নয়, তাকে পরিবর্ত্তিত করাই হ'ল দর্শনের আসল কাজ। এইখানেই মার্ক্সের সঙ্গে অন্য সকলের মূলগত প্রভেদ।

আলোচ্য বইগুলি সম্বন্ধে কয়েকটি কথার উল্লেখ করে' আমি এবার এই সুদীর্ঘ সমালোচনা শেষ করব। কোলের বইখানির নামকরণ ঠিক হয়নি। তিনি মার্ক্সের প্রকৃত তাৎপর্য্য বোঝাবার চেয়ে তাঁকে সংস্কার করে' নিয়ে নিজ বিশ্বাসের সমর্থক রূপে দাঁড় করাবার চেষ্টা বেশী করেছেন। সেইজন্য শুধু এ বই পড়লে মার্ক্স সম্বন্ধে পাঠকের মনে ভুল ধারণার উৎপত্তি হওয়া সম্ভব। কোলের মতন পণ্ডিতের পক্ষে এটা শোভন হয়নি। তবুও যাঁরা ইংল্যাণ্ডে সোশ্যালিষ্ট্-চিন্তার ক্রমবিকাশের সঙ্গে পরিচিত তাঁরা এই বইখানিতে সাম্যবাদের প্রভাব দেখে বিস্মিত হবেন। ইংল্যাণ্ডে সোশ্যালিষ্ট্-আন্দোলন মার্ক্সকে বর্জ্জন করেই গড়ে উঠেছিল—সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির ফেবিয়ান্ রূপটি ইংরাজদের নিজস্ব ভাব, বার্ণার্ড শ' এর প্রধান পুরোহিত। সেই জন্য আজ কোলের মতন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ইংরাজ-সোশ্যালিষ্টের লেখার পাতায় পাতায় মার্ক্সের প্রভাব আশ্চর্য্যের কথা। এ ছাড়াও কোলের বইখানির তিনটি অংশ পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। চতুর্থ পরিচ্ছেদের শেষের দিকে তিনি আমাদের যুগে নিম্নস্তরের নূতন বুর্জোয়া শ্রেণীর উদ্ভব ও তার সঙ্গে দেশে দেশে ফাসিজ্‌মের অভ্যুদয়ের সম্পর্ক বিচার করেছেন। সপ্তম অধ্যায়ে মার্ক্সের আর্থিক মতামতের যে ব্যাখ্যা আছে তার প্রকাশের ধরণ আমার কাছে অভিনব মনে হ'ল। ২০১ থেকে ২০৬ পৃষ্ঠায় কোল্ লিখেছেন যে, গণতান্ত্রিক দেশে সোশ্যালিষ্ট্ বিপ্লব আইনসঙ্গত ভাবে আরম্ভ হওয়া সম্ভব—মুসোলীনি ও হিটলারের উদাহরণ হয়ত সোশ্যালিষ্ট্দের কাজে লাগবে।

এই সমালোচনায় হুকের লেখার কথা এতবার উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাঁর বইখানির আর স্বতন্ত্র পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। ইংরাজ দার্শনিক ম্যাক্‌মারের ভূমিকা-সম্বলিত "মস্কো ডায়ালগ্‌স্"ও নিশ্চয় ইতিপূর্ব্বেই পাঠক-সমাজে সুপরিচিত হয়ে পড়েছে। বইখানি কথোপকথনের ছলে লেখা—একদল আমেরিকান পর্য্যটকের সঙ্গে মস্কো নগরীতে সক্রাটভ্ নামক রুষ দার্শনিকের কুড়িবার আলোচনার কথা এতে বিবৃত হয়েছে। কুড়ির মধ্যে এগার বৈঠকেই বিষয়বস্তু ছিল সাম্যবাদের দর্শন। শেষ পাঁচ অধ্যায়ে ধর্ম্ম, ন্যায়ান্যায়বোধ, আর্ট, শিক্ষাপ্রণালী ও বিশ্ববিপ্লবের কথা আছে। দ্বিতীয় থেকে চতুর্থ পরিচ্ছেদ পর্য্যন্ত রুষদেশে দর্শনালোচনায় বিপ্লবচিন্তার একটি ধারাবাহিক ইতিহাস চিত্রিত হয়েছে—স্লাভ্‌মিত্র, পাশ্চাত্যপন্থী, নারোদনিক, ক্যাডেট, এসার, মেন্‌শেভিক্, বল্‌শেভিক্ প্রভৃতি দলের চিন্তাধারার জন্ম এবং বিকাশ এতে স্পষ্ট বোঝা যাবে। হেকারের লেখা সম্বন্ধে দু-একটি মন্তব্য বোধহয় এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। প্রথমতঃ ধর্ম্ম বিষয়ে তাঁর মতামত গোঁড়া সাম্যবাদীদের থেকে উদারতর মনে হ'ল। দ্বিতীয়তঃ কথোপকথনের এক এক স্থানে অস্বাভাবিকতা এসে গেছে—আমেরিকান্‌দের মধ্যে অনেকগুলির মতামতের কোন সামঞ্জস্য আমাদের মনে ছাপ রাখে না আর রোটারিয়ান্‌টিকে ত গর্দ্দভরূপেই চিত্রিত করা হয়েছে; এতে লেখকের প্রকাশভঙ্গীর দুর্ব্বলতাই চোখে পড়ে। কিন্তু মার্ক্সদর্শনের উৎপত্তির ইতিহাস—

স্পাইনোজা, হেগেল্, ফয়রবাক্ ও অন্যান্য দার্শনিকের কাছে মার্ক্সের ঋণের পরিমাণ—ইত্যাদি আলোচনা সুখপাঠ্য ও শিক্ষাপ্রদ হয়েছে। হেকার্ দেখিয়েছেন যে, মার্ক্সের দর্শনে জড়বাদ ও আদর্শবাদ (ডায়ালেক্‌টিকের মধ্য দিয়ে) উভয়েরই ছাপ বিদ্যমান অথচ প্রচলিত উভয় পন্থা থেকে তা' স্বতন্ত্র; মার্ক্সীয় দর্শনকে এইজন্য এক সঙ্গে দুই শত্রুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করতে হয়। রুষবিপ্লবের পরও এই দার্শনিক সংগ্রাম চলেছে। সমসাময়িক সাম্যবাদী দর্শনকে একদিকে বুকারিনের যান্ত্রিক জড়বাদ, অন্যদিকে ডেবোরিনের "মেন্‌শেভিকি আদর্শবাদ"-এর প্রতি ঝোঁকের সংস্পর্শ সযত্নে পরিহার করে' মধ্যপন্থায় অগ্রসর হ'তে হচ্ছে। আশ্চর্য্যের কথা এই যে, রাজনীতির ক্ষেত্রেও সাম্যবাদিদলকে গত কয়েক বৎসর অনুরূপ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে হয়েছে—একদিকে টম্‌স্কি প্রভৃতির অতিরিক্ত সাবধানতা অন্যদিকে ট্রট্‌স্কির অধীর অগ্রসরনীতি এই উভয় সঙ্কট থেকে আত্মরক্ষাই এখন বল্‌শেভিক্‌দের প্রধান কাম্য। থিওরি ও প্র্যাক্‌টিসের এত গভীর যোগ ইতিহাসে দুর্লভ।

এই প্রসঙ্গে ষ্টালিনের বইখানির উল্লেখ করা যেতে পারে। তাঁর তৃতীয় ও শেষ অধ্যায়টি সাম্যবাদিদলের আভ্যন্তরিক অবস্থার বিশ্লেষণ এবং উপরি-উক্ত উভয় সঙ্কটের সঙ্গে যুদ্ধের বিবরণ। তাছাড়াও সোভিয়েট্ রাশিয়ার ঠিক আজকের অবস্থা বুঝবার পক্ষে বইখানি কাজে লাগে। এতে লেনিনীয় দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে নানা বিষয়ের আলোচনা আছে—ধনতন্ত্রের বর্ত্তমান দুর্যোগ, রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে নানা দেশের নানা সমস্যা, রাশিয়ার সঙ্গে বহির্জগতের সম্বন্ধ, রাশিয়ার মধ্যে কলকারখানা ও কৃষিকার্য্যের উন্নতি, শ্রমিকদের দুরবস্থার প্রতীকার ইত্যাদি। বল্‌শেভিকদের প্রধান কর্ত্তব্যগুলিও এতে নির্দ্দেশ করা হয়েছে। সরল ভাষায় সাম্যবাদের সিদ্ধান্ত পুনরাবৃত্তি করতে ষ্টালিন সিদ্ধহস্ত। তাঁর বক্তৃতা দেবার অসামান্য ক্ষমতার পরিচয়ও পাঠক এই বইখানিতে পাবেন। সাম্যবাদীদের অদ্বিতীয় নেতা এখন তিনিই। তবুও মার্ক্স্ ও লেনিনের ব্যাখ্যায় তাঁর যে ভুল হয়নি একথা জোর করে' কে বলতে পারে? যাঁরা ট্রট্‌স্কিলিখিত রুষবিপ্লবকাহিনীর পরিশিষ্টগুলি পড়েছেন তাঁদের মনে একটা সন্দেহের ছায়া থেকেই গেছে।

লেভি, ম্যাক্‌মারে প্রভৃতি ডায়ালেক্‌টিক্ ও জড়বাদের বিভিন্ন অঙ্গ নিয়ে আলোচনা করেছেন; ইংরাজ পাঠক-সমাজে সম্প্রতি যে এ বিষয়ে বিশেষ কৌতূহল দেখা গেছে তাঁদের বইখানি তার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। ডায়ালেক্‌টিক্-সম্বলিত জড়বাদকে বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য ও অর্থনীতির দিক থেকে বইখানিতে দেখাবার চেষ্টা করা হয়েছে, কিন্তু তার থেকে বেশী পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে শেষের কয়েকটি প্রবন্ধ। তাতে বের্ণাল্-লিখিত মার্ক্সদর্শনের পরিচয়, অধ্যাপক ক্যারিটের প্রশ্নাবলী ও বের্ণালের প্রত্যুত্তর প্রকাশিত হয়েছে। হেকার ও হুকের গ্রন্থ যাঁদের পরিচিত তাঁদের কাছে এই প্রবন্ধগুলির মূল্য আছে—কেননা ছোটখাট প্রশ্নের মীমাংসা এদের মধ্যে পাওয়া যায়। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে বইখানি লেখা হয়েছিল তা' সফল হয়েছে বলা যায় না, কেননা সাধারণ পাঠকের এর সাহায্যে মার্ক্সদর্শন সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ হবে কিনা বিশেষ সন্দেহ।

শ্রীসুশোভন সরকার

সাগরিকা—শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। রামেশ্বর এণ্ড কোং, চন্দননগর।

ঐন্দ্রজালিকের লেখক সুরেশবাবু ছিলেন রূপকথার শিল্পী। তাঁর লেখা পড়লে মনে হ'ত যেন গল্প শুনছি। গল্প বলা ও লেখার মধ্যে অনেকখানি পার্থক্য আছে। প্রথমটিতে সমগ্র মানুষ আত্মপ্রকাশ করে। দ্বিতীয়টিতে শিল্পীর স্বরূপ ধরা যায়। কিন্তু কোনো প্রেরণাকে লিপিবদ্ধ করতে গেলে স্বতই একটি ছেদ পড়ে,—কল্পনা সংযত হয়। এক্ষেত্রে সংযমকে সঙ্কোচ ভাবা ভুল। সুরেশবাবুর লেখার মধ্যে পূর্ব্বে যে উদ্বেলতা ছিল, সেটি কথকের অভিনয়-কুশলতা, তার সর্ব্বাঙ্গীণ মুখরতা; এই প্রকার প্রাচুর্য্যে শ্রোতার মন কল্পলোকে ভেসে যেত। সুরেশবাবুর লেখনী যে পুরাতন যাদু হারায়নি, তার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন এই বইয়ের "রঙ্গনা" গল্পটি। বিস্মৃত ভারতের উৎসব রজনীর একটি পৃষ্ঠা এই গল্পে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে।

ঠাকুমার দল অভিনয় করতেন কিনা জানি না, কিন্তু রূপলোকের চাবির গোছা তাঁদের আঁচলে সর্ব্বদাই বাঁধা থাকত। তাঁরা যে অতি সুন্দর রূপকথা বলতেন, তাতে কোনো দার্শনিক তত্ত্ব থাকত না, অন্ততঃ থাকলে শিশুর দল বুঝতে পারত না। সুরেশবাবুর 'সাগরিকা' পড়লে মনে হয় যেন প্রত্যেক গল্পের শেষে গভীর উপদেশ এবং চিত্তের উৎকর্ষ-সাধক জ্ঞানের কথা নিহিত আছে। সেগুলি নিশ্চয়ই বহু মূল্যবান। কিন্তু অনেক মূল্যবান অলঙ্কার সম্পৎসূচক হলেও বহু স্থলে দেহের সৌন্দর্য্য কমিয়ে দেয়। মহোৎসবে মূল্যবান সাজসজ্জার সার্থকতা আছে, কেননা সেখানে ঝলমল করানই উদ্দেশ্য। কিন্তু হীরা-পান্নার গহনা ও বেনারসী কাপড় পরে অনাড়ম্বর সাজার কোনো অর্থ নেই। রূপকথা সরল বলেই মনোহারী। 'সাগরিকা'য় জাঁক-জমকেরই প্রাধান্য। ঐন্দ্রজালিকের চিত্তাকর্ষক উপাদান সবই এখানে আছে, কিন্তু রাজপুত্রের পরিবর্ত্তে যে দার্শনিক অবতীর্ণ হলেন তাতে কি যাদুমন্ত্র সফল হলো! রূপজগতে আমরা সবাই সাবালক হলেও শিশু, কিন্তু পরিশেষে বঞ্চিত হলে ক্ষুণ্ণ হই।

শ্রীছায়া দেবী

নীট্‌শের বাণী—শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত, রামেশ্বর এণ্ড কোং, চন্দননগর।

৪৭ পৃষ্ঠার ছোট্ট বই। কিন্তু সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। বাঁধান চমৎকার, ছাপা চমৎকার, লেখা চমৎকার। প্রথম আঠার পাতায় নীট্‌শে সম্বন্ধে একটি উৎকৃষ্ট ভূমিকা। এই অংশটুকুর ইংরেজী অনুবাদ বাঞ্ছনীয়। আমার কেবল দুটি ছোট আপত্তি আছে—(১) নলিনীবাবু লিখছেন (পৃঃ ৫)—"কিন্তু হিন্দুর ভগবান বিরাট প্রেমময় সর্ব্বসহ। জগৎ যদি না চায় তবুও তিনি জগৎকে চাহিতেছেন, জগৎ না জানিয়া তাঁহারই পূর্ণ উপলব্ধির দিকে ছুটিয়াছে।" এই 'কিন্তু'র সার্থকতা য়িহুদীর জিহোবার তুলনায় পূর্ণ হলেও হিন্দুর বেলায় আংশিক। সকল হিন্দু, এমন কি সকল বৈষ্ণবও মানেন না যে, ভগবান 'জগৎকে চাহিতেছেন।' একেশ্বরবাদী য়িহুদীর সঙ্গে একমাত্র বৈদান্তি-

কেরই তুলনা চলে—বৈদান্তিকের ব্রহ্ম কোন কিছুই চান না—বোধ হয় একবার চেয়েছিলেন বহু হতে, সেই থেকেই নিস্পৃহ। (২) "নীটশের পাশ্চাত্যসুলভ অশুদ্ধ রাজসিক প্রকৃতি এই সব সত্যগুলিকে বিকৃত করিয়া প্রতিফলিত করিয়াছে।"—পৃঃ ১৮। কিন্তু নীট্‌শের 'পাশ্চাত্যসুলভ অশুদ্ধ রাজসিক প্রকৃতি' ভিন্ন তাঁর কলম জোরে চলত না। নলিনীবাবু ৪ পৃষ্ঠাতেই লিখেছেন যে, নীট্‌শের লেখায় বিস্তর অসামঞ্জস্য, বালসুলভ চাপল্য, কত অবান্তর উচ্ছ্বাস মিশে আছে, এবং তার মধ্যে দিয়েই তাঁর বাণী ফুটে উঠেছে। আমিও তাই মানি। তবু 'পাশ্চাত্যসুলভ রাজসিকতা' কেন? এ কি ১৯০৫ সালের ছাপ? এ ছাড়া, বইখানি আমার অত্যন্ত ভাল লেগেছে। সাঁচ্চা মুক্তো, ভাগ্যিস্ দাম লেখা নেই!

ধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

দেবীকিশোরী—শ্রীমনোজ বসু। পি, সি, সরকার, এণ্ড কোং।

মনোজবাবুর লেখা সকলেরই ভাল লাগে, কারণ তাঁর ভাষা ভাল এবং বিষয়-নির্ব্বাচনে বিশেষত্ব আছে। দেবীকিশোরীর প্রত্যেক গল্পেই তাঁর বিশেষত্ব ফুটে উঠেছে। সেটি হল এই।

আমাদের দৈনন্দিন জীবন অতীব প্রাকৃত। কিন্তু মধ্যে মধ্যে কোথা থেকে তার উপর অতিপ্রাকৃতের ছায়াপাত হয়। এই প্রাকৃত ও অতিপ্রাকৃতের আলোছায়া সাহিত্যে প্রতিফলিত করানই মনোজবাবুর নিজত্ব। তিনি ভূতের গল্প লেখেন বলছি না। তিনি আমাদের দিনানুদৈনিক জীবনেরই ছবি আঁকেন, তাঁর প্রায় সব গল্পেরই উপাদান সাধারণ মানুষেরই ভাবসম্পদ,—যেমন দেবীকিশোরী ও স্বপ্নের খোকায় মাতৃস্নেহ, আলেয়ায় মেয়েদের বাপের বাড়ির উপর গভীর টান, এবং রায়রায়ানের দেউল ভিন্ন অন্য গল্পে স্বামী-স্ত্রীর প্রেম। কিন্তু প্রত্যেক গল্পেরই আকর্ষণ অ-মানুষিক, অ-পার্থিব, এবং অ-লৌকিক। একেবারে একধারে আমাদের পরিচিত মনোভাবের আবেগ, অন্যধারে অ-লৌকিকের আকর্ষণী-শক্তি—এই দুইএর বিরোধ মনোজবাবু যে ধরণের গল্প লেখেন সেই ধরণের গল্পের আগ্রহকে পাঠকের মনে উদ্দীপ্ত করে, জাগ্রত রাখে। কিন্তু নিতান্ত পরিচিত মনোভাবের শক্তি অতি-পরিচয়ের জন্যই কম হয়ে যায়, সেইজন্য আগ্রহও ক্ষুণ্ন হয়, কারণ বিরোধের তীব্রতা আর থাকে না। এখন যদি অভ্যাসকে নতুন রূপ দেওয়া যায়, কিংবা ভাববৃত্তির আদিমত্ব বজায় রাখা যায়, তবেই আগ্রহ নতুন জীবন লাভ করে। বিরোধকে বাঁচিয়ে রাখাই মূলকথা। মনোজবাবুর কোন কোন গল্পের ঘটনাবলীর মধ্যে ভাবপ্রবৃত্তির জোর নেই। নতুন রূপ যেখানে দিতে গিয়েছেন সেইখানেই তিনি কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

অন্যদিক থেকে তাঁর টেক্‌নিক আলোচনা করলেও ঐ একই সিদ্ধান্তে আসি।

সাধারণতঃ লেখকেরা দুই উপায়ে অদ্ভুতভাব ফুটিয়ে তোলেন। পার্থিব এবং অ-পার্থিবকে দুটি ভিন্ন স্তর দেখিয়ে অপার্থিব স্তর থেকে পার্থিবের উপর তির্য্যগ্‌গতিতে আলোফেলা এক উপায়। অন্য উপায় হল একই স্তরে আলোছায়ার সমাবেশ দেখান। মনোজবাবু দ্বিতীয় পদ্ধতি অবলম্বন করে থাকেন। শেষোক্ত পদ্ধতিতে ঘটনাবলীর উপযোগিতা দেখানই কৃতিত্ব। মনোজবাবুর কৃতিত্ব সব গল্পে সমান নয়। যে সব চিত্র তিনি আঁকেন তার মধ্যে সবগুলি এই অদ্ভুত ভাবের সঙ্গে খাপ খায়না। স্বামী-স্ত্রীর নিতান্ত সাধারণ প্রেম ঐ ধরণের। সেইজন্য একাধিক স্থানে ঐ প্রকার প্রেমের পরিপ্রেক্ষিতে অ-পার্থিবের আগমন আকস্মিক মনে হয়, যেভাব প্রথম পদ্ধতির অবলম্বনে মনে হত না, কারণ আমাদের মন তখন আশ্চর্যান্বিত হবার জন্য প্রস্তুত থাকত। নিছক্ ভাবপ্রবণতার সঙ্গে অদ্ভুত রস মেশে না। মনোজবাবুর ভাব ঘন হলে স্বভাবিক ও অস্বাভাবিকের সীমান্তরেখা অতি সহজেই অতিক্রম করতে পারবেন। লালচুল ও স্বপ্নের খোকা ঠিক এই ঘনতার অভাবে ভাল গল্প হতে হতে থেমে গেল। অতিরিক্ত ভাবপ্রবণতা সবক্ষেত্রেই আর্টিষ্টের ভীষণ শত্রু, বিশেষতঃ এই অপার্থিবের ক্ষেত্রে। গোধূলি কি এতই রোম্যান্টিক? রায়রায়ানের দেউল গল্পটি অন্য ধরণের মনে হলেও তার দোষটি একই ধরণের।

তবু বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, মনোজবাবু গল্প লিখতে জানেন—তাঁর গল্পের আদি, মধ্য ও অন্ত আছে—তাঁর গল্প কেবল চিন্তাধারার স্রোত নয়। ভাবপ্রবণতা তাঁকে কমাতেই হবে, নচেৎ তাঁর গল্প লোকপ্রিয় হলেও সৎসাহিত্যের অন্তর্গত হবে না। তিনি সুনাম অর্জ্জন করেছেন, এইবার একটু সংযত হবার দিন এসেছে মনে হয়।

ধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

প্রকাশক—শ্রীসুরেশ চক্রবর্ত্তী, ৭নং আর, জি, কর রোড, কলিকাতা
রামকুমার মেশিন প্রেস, ১৬৩, মুক্তারাম বাবু ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীসুরেশ চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক মুদ্রিত।
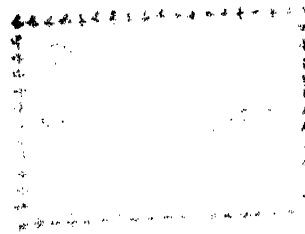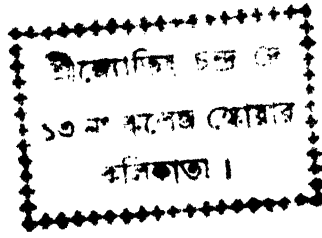
৪র্থ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা
বৈশাখ, ১৩৪২

ইমানুয়েল্ কাণ্ট্

দর্শনের সম্বন্ধে প্রায়ই একথা বলা হয় যে এতখানি উদ্যমের এত অপব্যয় বোধ হয় জ্ঞানরাজ্যের আর কোন প্রদেশেই ঘটে নাই। ইতিহাসের আদিযুগ হইতে মানুষ দর্শনের সমস্যা লইয়া ভাবিয়াছে, কত জ্ঞানী কত বুদ্ধ আপনার জীবন পণ করিয়া সৃষ্টির রহস্য উদ্ঘাটন করিতে চাহিয়াছেন, কিন্তু সমস্ত প্রয়াসকে ব্যঙ্গ করিয়া সৃষ্টির রহস্য চিরকাল রহস্যই রহিয়া গিয়াছে। অন্যান্য সমস্ত ক্ষেত্রেই মানুষের জ্ঞান প্রগতিশীল, নিত্যনব আবিষ্কারে বিশ্বের নূতন নূতন তত্ত্ব বুদ্ধির আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছে, সহস্র কর্ম্মীর সম্মিলিত সাধনা সেখানে একলক্ষ্য হইয়া সত্যের আপন সত্তা প্রকাশে উন্মুখ।

জ্ঞানের লক্ষণই এই যে জ্ঞান সার্ব্বজনীন ও সার্ব্বকালিক। স্থান-কাল-পাত্রভেদে তাই জ্ঞানের বিকার হয় না,—যাহা সত্য তাহা চিরকালের জন্য সকলের কাছেই সত্য। দর্শনের ক্ষেত্রে কিন্তু মনে হয় যে পদে পদে আমরা তাহার ব্যতিক্রম দেখি, একজন দার্শনিক যাহাকে সত্য মনে করিয়া অকুণ্ঠিত চিত্তে বিশ্বের সম্মুখে প্রচারিত করেন, অন্য দার্শনিকেরা ঠিক তাহাকেই ঠিক তেমনি অকুণ্ঠায় মিথ্যা বলিয়া অগ্রাহ্য করিতে চান। জ্ঞানের অন্যান্য ক্ষেত্রেও যে মতভেদ হয় না, তাহা নহে, কিন্তু সে সমস্ত ক্ষেত্রেই মতভেদের মীমাংসা সাধিত না হইলেও সম্ভবপর। উদাহরণস্বরূপ ইতিহাসের কথা বলা যায় যে কোন একটি বিশেষ ঘটনা সম্বন্ধে মতভেদ

যতই থাকুক না কেন, সে বিষয়ে সর্ব্ববাদিসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া একেবারে অসম্ভব নহে। যেখানে ইতিহাস দর্শনের সঙ্গে সমন্বয়ের ফলে তথ্য ছাড়িয়া তথ্যের মূল্যবিচারে প্রবৃত্ত হয়, ঘটনার ঐতিহাসিকতার বিচারের বদলে তাহার গুরুত্ব এবং তাৎপর্য্য বুঝিতে চেষ্টা করে, কেবলমাত্র সেই সমস্ত ক্ষেত্রেই ইতিহাসের মতভেদের কোন সমাধান অসম্ভব। কিন্তু সে সব ক্ষেত্রে ইতিহাস আর ইতিহাস থাকে না—তাহা দর্শন হইয়া দাঁড়ায়।

দর্শনের ক্ষেত্রে এরকম মতদ্বন্দ্বের কারণ সহজেই বোঝা যায়। জ্ঞানের প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রেই জ্ঞানের বিষয়[১] এবং প্রতিমানের[২] পার্থক্য লক্ষ্যণীয়, তাই প্রত্যেক বিষয়কেই প্রমাণ বা অপ্রমাণ করিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। দর্শনের ক্ষেত্রে এ পার্থক্যের কোন স্থান নাই, প্রমাণকেই দর্শন অনুসন্ধিৎসার বিষয়বস্তু বলিয়া গণ্য করে। চরম সত্যের সন্ধানেই দর্শনে এ পদ্ধতি অবলম্বিত, কিন্তু ফলে দর্শনের জ্ঞান সকল ক্ষেত্রেই ব্যক্তিগত স্বীকৃতি বা অস্বীকৃতির নামান্তর হইয়া দাঁড়ায়। এই জন্যই দার্শনিকের সঙ্গে দার্শনিকের মতভেদ, কিন্তু অন্যপক্ষে প্রত্যেক দার্শনিকই আপনার মতকে কেবলমাত্র মত না বলিয়া সত্যরূপে উপস্থাপিত করেন।

একদিকে দার্শনিকের সঙ্গে দার্শনিকের মতভেদ, বিভিন্ন মতের নৈরাজ্য এবং তাহার ফলে দর্শনের সার্থকতা সম্বন্ধে সন্দেহ। অন্যদিকে মানবচিত্তের অদম্য আগ্রহে দর্শনের উৎপত্তি, দর্শনের সমস্যা লইয়া মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির উৎকণ্ঠা। দর্শনকে যাহারা কেবলমাত্র বুদ্ধির বিলাস বলিয়া বর্জ্জন করিতে চায়, জনপ্রবাদের ভাষায় তাহাদিগকে বলিতে হয়, "কম্বলীতো নেহি ছোড়তি হয়।" দর্শনকে ছাড়িতে চাহিলেও দর্শন যে আমাদের ছাড়ে না।

মানুষের চিন্তাবৃত্তির এই উদ্যম এবং তাহার আপাতব্যর্থতার এই দৃশ্যও দর্শনেরই সমস্যা। পৃথিবীতে সব কিছুরই যদি কোন না কোন কারণ থাকে,—এবং কারণ আছে কি নাই সেকথাও দর্শনের বিবেচ্য,—তবে মানুষের চিত্তের এই অনুসন্ধিৎসারই বা কারণ কি? দর্শন যদি মানুষের আয়ত্তাতীত হয়, তবে দর্শন-রচনার প্রেরণাই বা রহিয়াছে কেন?

১। বিষয়=content. ২। প্রতিমান=criterion.

প্রতি যুগেই দার্শনিক এ প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করিয়াছেন, এবং সে উত্তর সে যুগের দর্শনের সাধনাকে অনুপ্রাণিত করিয়াছে। দর্শনে আজও যে যুগ চলিতেছে, তাহার প্রশ্ন এবং তাহার মীমাংসার মূলে রহিয়াছে কাণ্টের দর্শন। তিনি যে ভাবে এ সমস্যাকে উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তাহাই এ যুগের দার্শনিকদের বিশ্বদৃষ্টিকেও অনুরঞ্জিত করিয়াছে। আমাদের মত কাণ্টবাদী বা কাণ্টবিরোধী হইতে পারে, কিন্তু কাণ্টকে অস্বীকার করিতে চাহিলেও সেই কাণ্টেরই ভাষা ব্যবহার না করিয়া তাই আমাদের আর কোনও উপায় নাই।

১

কাণ্টের সম্বন্ধে এককালে আমাদের ধারণা ছিল যে শুষ্কচিত্ত রস-জ্ঞানহীন এক বৃদ্ধ অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনায় দীর্ঘজীবন যাপন করিয়া প্রৌঢ় বয়সে যে গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাহাই তাঁহার একমাত্র পরিচয়। তাই কাণ্টের এক জীবনীকারের মতে 'কাণ্টের জীবনও ছিল না, কোন ইতিহাসও ছিল না, কাজেই তাঁহার জীবনের ইতিহাস লেখা সম্ভব নয়। কলের পুতুলের মতন নিয়মিতভাবে প্রৌঢ়ের দিন কাটিত। তাঁহার অবিবাহিত জীবনে কোনদিন রূপরসগন্ধের স্পর্শও লাগে নাই। নিদ্রাভঙ্গের পরে প্রাতঃকৃত্য সমাপন ও কফিপান, ছাত্রদের অধ্যাপনা ও মধ্যাহ্ন-ভোজন, সায়াহ্ন-ভ্রমণ এবং গৃহে ফিরিয়া অধ্যয়ন ও রচনা,—সমস্তই ঘড়ির কাঁটার মতন নিয়মিতভাবে তিনি সম্পন্ন করিতেন। তাই ধূসর-বেশ কাণ্টের মূর্ত্তি দেখিয়া নগরবাসীরা সময় নির্দ্ধারণ করিত, জানিত যে তাঁহার জীবনে মুহূর্ত্তেরও ব্যতিক্রম কেহ কোনদিন লক্ষ্য করে নাই।'

এ ধারণার মূলে যে অনেকখানি সত্য রহিয়াছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। তাঁহার যে রচনার সঙ্গে আমাদের পরিচয় নিবিড়, তাহার মধ্যে তাঁহার মনুষ্যধর্ম্মের পরিচয় প্রবল নহে, সত্যসন্ধানের প্রখর আগ্রহে যুক্তিতর্কের নির্ম্মম পরাবর্ত্তন ছাড়া অন্য কিছুরই সেখানে স্থান নাই। সে আলোচনাকে তাই জীবন হইতে বড় বেশী বিচ্ছিন্ন মনে হইতে পারে, এবং মানুষটিকেও আমরা কেবলমাত্র নিরাবেগ যুক্তিযন্ত্র মনে করিতে পারি,

কিন্তু কাণ্টের জীবনেরও অন্যদিক ছিল, তাঁহাকে বুঝিতে হইলে সেদিককেও অগ্রাহ্য করা চলে না।

বিলিয়ার্ড এবং তাস খেলিয়া কাণ্ট ছাত্রজীবনের খরচের অংশ জোগাইতেন শুনিলে তাই আশ্চর্য্য লাগে। নিজে মিতাহারী হইলেও তাঁহার মধ্যাহ্ন ভোজনের মজলিসে সামাজিক জীবনের যে প্রবাহ বহিত, তাহা দেখিয়া তাঁহার শুভানুধ্যায়ী বন্ধুদের প্রায়ই মনে হইত যে জনসঙ্গ যাঁহার এত প্রিয়, তাঁহার পক্ষে দর্শন রচনা হয়তো সম্ভবপর হইয়া উঠিবে না। তখনকার দিনে পরিচিতেরা তাঁহাকে তাই সুধী অপেক্ষা সুপ্রিয় বলিয়াই জানিত, ছাত্রেরা মুক্ত কণ্ঠে বলিত যে দার্শনিক কাণ্ট কেবলমাত্র দুর্ব্বোধ্য নহে, অবোধ্যও বটে, কিন্তু শিক্ষক কাণ্টের তুলনা মেলে না। লিণ্ডসে[১] তাঁহার নূতন গ্রন্থে কাণ্টের জীবনের এই দিকটি প্রকাশিত করিয়া সেই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে প্রৌঢ় বয়সে কাণ্ট হয়তো আমাদের কল্পনারচিত রসহীন যুক্তিসর্ব্বস্ব শুষ্কচিত্ত দার্শনিক মাত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার দর্শনের মর্ম্মকথা জানিতে হইলে আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে এ ছবি কাণ্টের জীবনের শেষ বয়সের ছবি, দর্শনের সাধনা সম্পন্ন করিয়া খ্যাতিলাভের পরে তাঁহার যে জীবন, ইহাতে কেবল তাহাই প্রকাশিত হইতেছে। যে কাণ্ট দর্শন রচনা করিতেছিলেন, তাঁহাকে জানিতে হইলে আমাদের এই প্রচলিত ধারণার পরিবর্ত্তে যে মূর্ত্তির কথা ভাবিতে হইবে, সে ছবি যুবক কাণ্টের, ফোরলেণ্ডারের[২] ভাষায় সে কাণ্ট ছিলেন রসিক পুরুষ[৩]; তাঁহার দর্শনের ব্যাপকতা বুঝিতে হইলে, তাঁহার জীবনের প্রসারের কথাও স্মরণ রাখা আবশ্যক।

কেহ হয়তো জিজ্ঞাসা করিবেন যে কাণ্ট রসিক পুরুষ ছিলেন না রসজ্ঞানহীন যুক্তিযন্ত্র ছিলেন, তাহা জানিয়া আমাদের লাভ কি? তাঁহার দর্শনের প্রকাশ তো তাঁহার রচনায়ই রহিয়াছে, তাহার পরিচয় জানিলেই আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ, তাঁহার চরিত্রবিচারে আমাদের প্রয়োজন কি? এ কথার উত্তরে বলিতে হয় যে দর্শন ব্যক্তিবিশেষের অভিজ্ঞতাসঞ্জাত বলিয়া

১। Kant by A. D. Lindsay (Benn), ২। Immanuel Kant: Der Mann und Das Werk—Vorlander. ৩। der galante Magister.

যতই ব্যক্তিনিরপেক্ষ হইতে চাহুক না কেন, কোনকালেই সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্ব-নিরপেক্ষ হইতে পারে না। ব্যক্তিনিরপেক্ষ বলিয়া সত্যের সার্ব্বজনীনতার আভাস দর্শনে আমরা পাই, কিন্তু ব্যক্তিত্বকে সম্পূর্ণ অতিক্রম করিতে পারে না বলিয়া সে সার্ব্বিকতা আপেক্ষিক। সে সম্বন্ধে আরো বলা চলে যে ব্যাপকতাই দর্শনের প্রাণ, অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্যের সংশ্লেষণেই তাহার বৈশিষ্ট্য। তাই যাহার জীবনের অভিজ্ঞতা যত গভীর, দর্শনের প্রয়োজনীয়তাও তাহার পক্ষে তত তীব্র, এবং দর্শন-রচনার অবকাশ ও সম্ভাবনাও তাহার জীবনে তত অধিক। নিরুদ্ধ বা বঞ্চিত জীবনে দর্শন বিকাশ লাভ করে না—জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার সামঞ্জস্যসাধনই দর্শন। তাই দর্শনের অন্য নাম বিশ্বদৃষ্টি, এবং বিশ্বদৃষ্টি বলিয়াই ব্যক্তি হইতে ব্যক্তিবিশেষে তাহা বিভিন্ন হইতে বাধ্য। কাণ্টের ভাষায় তাই বলিতে হয় দর্শন বলিয়া কিছুই নাই, দর্শন তাই কেহ কাহাকেও শিখাইতেও পারে না, দার্শনিক মনোবৃত্তি এক চিত্ত হইতে অন্য চিত্তে সংক্রামিত হয় মাত্র। দর্শনের সত্যের এই আপেক্ষিকতা স্বীকার করিলেই দার্শনিকের মনোবৃত্তি আমাদের কাছে তাঁহার দর্শন অপেক্ষাও অধিক মূল্যবান বলিয়া প্রতিভাত হয়, কারণ সেই মনোবৃত্তির বিচার করিয়া আমরা তাঁহার দর্শনের যৌক্তিকতা বা প্রয়োজনীয়তার বিচার করিতে পারি। ফলে দার্শনিক কি বলিয়াছেন, তাহার তুলনায় কেন তিনি এমন কথা বলিলেন এই বিচারই আমাদের লক্ষ্য হইয়া দাঁড়ায়, এবং সে আলোচনায় মানবমনের কর্ম্মপদ্ধতি আমাদের জ্ঞান-গোচর হইয়া আমাদের নিজেদের বিশ্বদৃষ্টিকে সমৃদ্ধ করিয়া তোলে।

দার্শনিকের ব্যক্তিত্ববিচার তাই দর্শনের লক্ষ্যের বাহিরে নহে, বরং দর্শনের উপলব্ধির একটি প্রধান উপকরণ। কাণ্টের বেলায় দর্শনের এ সাধারণ নিয়মটি আরো বেশী করিয়া প্রযোজ্য, কারণ তাঁহার মানস-ইতিহাস এবং চরিত্রের সংগঠন না জানিলে তাঁহার দর্শনের যৌক্তিকতা বোঝাও অসম্ভব। তিনি যে দর্শনের অধ্যাপক এবং সে হিসাবে দর্শন-ব্যবসায়ী, এ কথা মনে না রাখিলে তাঁহার দর্শন-বিচারে আমাদের প্রতি পদে ভুল হওয়া অবশ্যম্ভাবী। তাঁহার দর্শনের অনভ্যস্ত রূপ এবং তাঁহার সমস্যা ও সমাধানের অদ্ভুত পরিকল্পনার কারণও এইখানেই মিলে, কারণ অতীত দর্শনের ইতিহাস

কাণ্টের দর্শন-জিজ্ঞাসাকে অনুরঞ্জিত করিয়াছিল বলিয়াই তাহা আপনার বিশিষ্ট গতি ও অভিমুখ পাইয়াছিল। হেগেল নিজের দর্শনের সম্পর্কে বলিয়াছিলেন যে দর্শনের ইতিহাসই দর্শন। কিন্তু এ কথা সমানভাবে কাণ্টের বেলাও প্রযোজ্য। দর্শনের বিভিন্ন মতের সঙ্গে তাঁহার নিবিড় পরিচয় ছিল বলিয়াই তাহাদের বিভিন্ন সাফল্য এবং ব্যর্থতাকে একত্রিত করিয়া জ্ঞানের নূতন সামঞ্জস্য সাধনার চেষ্টায় তাঁহার দর্শন। এই সামঞ্জস্য সাধনের প্রয়াসই তাঁহার দর্শনের মূলমন্ত্র এবং শতাব্দীর ইতিহাসের অভি-ব্যক্তির ফলে তাহা তাঁহার সম্মুখে যে সমস্যা উপস্থাপিত করিয়াছিল তাহার মর্ম্মকথাকে প্রকাশ করিয়া বলা যায়—একদিকে বিজ্ঞানের বিজয় অভিযান এবং তাহার ফলে সৃষ্টির সমস্ত রহস্যের যান্ত্রিক বিচরণে পৌর্ব্বাপর্য্যের অলঙ্ঘনীয় সূত্রের শৃঙ্খল, অন্যদিকে মানবাত্মার আত্মোপলব্ধি ও গৌরববোধে এই যান্ত্রিকতার সার্ব্বিকতাকে অস্বীকার। স্বভাবের নিয়মে যদি বিশ্ব সৃষ্টির সমস্ত কিছুকেই বোঝা যায়, তাহাদের সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করা যায়, তবে আত্মার স্বাধীনতা কই, মানুষের কর্ম্মফলের জন্য তাহার দায়িত্ববোধের অর্থ কি ?

২

উদ্দেশ্যবোধ[১] এবং যান্ত্রিকতার[২] এ সংঘর্ষকে সাধারণভাবে বিচার করিতে গেলে কোন সিদ্ধান্তই সম্ভব নহে বলিয়া কাণ্ট সে দ্বন্দ্বকে যুক্তির রাজ্যে সীমাবদ্ধ রাখিয়া ন্যায়ের একটি বিশেষ সমস্যার মধ্যে তাহার সমাধান খুঁজিয়াছেন। সে সমস্যাটিকে প্রকাশ করিয়া বলা চলে যে, যে বাক্য কেবলমাত্র বাক্যার্থকে প্রকাশ করে না, বরঞ্চ ধারণার সঙ্গে ধারণার সংযোজন সাধন করে, সেইরূপ বাক্যকে সার্ব্বভৌম[৩] মনে করিবার যুক্তিসঙ্গত কোন কারণ আছে কি ? প্রথম দৃষ্টিতে কাণ্টের সুবৃহৎ সমস্যা,—আত্মার স্বাধীনতার সঙ্গে বিশ্বব্যাপারের যান্ত্রিক বিবরণের দ্বন্দ্ব সমন্বয়,—এবং ন্যায়ের এই বিশিষ্ট প্রশ্ন,—বিশেষ এক প্রকার বাক্য ন্যায়সঙ্গত কি না,—এই দুইয়ের মধ্যে অসঙ্গতি বড় বেশী বলিয়া মনে হয়, কিন্তু একটু আলোচনা

১। উদ্দেশ্যবোধ=teleology, finality. ২। যান্ত্রিকতা=mechanism.
৩। সার্ব্বভৌম=universal.

করিলেই বোঝা যায় যে এ অসঙ্গতি কেবলমাত্র আপাতদৃষ্ট, বস্তুতঃ ন্যায়ের এই সমস্যার মধ্যে দর্শনের বৃহত্তর সমস্যাও নিহিত। সংযোজক সার্ব্বভৌম বাক্য[১] যুক্তিসঙ্গত কিনা, এই প্রশ্ন তুলিলেই কাণ্টপূর্ব্ববর্ত্তী দর্শনের দারিদ্র্য প্রকাশিত হইয়া পড়ে, কারণ বুদ্ধিবাদী বা অভিজ্ঞতাবাদী কোন দার্শনিকই আপনার মতে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া এরূপ বাক্যকে স্বীকার করিতে পারেন নাই।

সমস্যাটিকে সম্পূর্ণভাবে বুঝিতে হইলে ইয়োরোপীয় দর্শনের ইতিহাসের সঙ্গে খানিকটা পরিচয় থাকা দরকার। দর্শনসাধনার প্রারম্ভ হইতেই মানুষ লক্ষ্য করিয়াছে যে আমাদের জ্ঞানগোচর সমস্ত বস্তুরই দুইটি দিক আছে। অভিজ্ঞতায় আমরা প্রতিমুহূর্ত্তেই পরিবর্ত্তনের লীলা দেখিতে পাই, অন্যপক্ষে সে পরিবর্ত্তনের মধ্যেও স্থৈর্য্য না থাকিলে জ্ঞানলাভ অসম্ভব। ইন্দ্রিয় যে জগৎকে আমাদের সম্মুখে উদ্ভাসিত করে, তাহা বিশিষ্ট বস্তু-সমূহের সমষ্টি মাত্র। (ইন্দ্রিয় বস্তুকেও প্রকাশ করে কিনা, তাহা লইয়াও প্রশ্ন ওঠে।) বিশিষ্ট হিসাবে তাহারা বিচ্ছিন্ন এবং বিচ্ছিন্ন বলিয়া তাহাদিগকে কোন সাধারণ সূত্রে গাঁথিয়া প্রকাশ করা যায় না। অভিজ্ঞতা তাই নিত্য নূতন এবং প্রতিমুহূর্ত্তেই সঞ্জীবিত হইতেছে এবং তাহার ফলে ইন্দ্রিয়গোচর বিশ্বে জ্ঞান মুহূর্ত্তের মধ্যে সীমাবদ্ধ, উপস্থিত স্থানকালকে অতিক্রম করিবার নির্দ্দেশ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে নাই।

ইহাকেই যদি আমরা অভিজ্ঞতার সম্পূর্ণ বিবরণ মনে করি, তবে ন্যায়-সঙ্গত ভাবে অভিজ্ঞতারও আমরা কোন বিবরণই দিতে পারি না। যে সত্তা প্রতিমুহূর্ত্তের মধ্যে আবদ্ধ, সে যে কেবলমাত্র মুহূর্ত্তিক, সে কথাও সে জানিতে পারে না। তাহার সত্তা মুহূর্ত্তে প্রকাশিত হইয়া মুহূর্ত্তেই বিলুপ্ত হয়, মুহূর্ত্তের সঙ্গে মুহূর্ত্তকে গ্রথিত করিয়া স্থান-কালের কোন ধারণাই সে সত্তার সাধ্যায়ত্ত নহে। দ্বিতীয়ত, জ্ঞানের বিষয়কে বিষয় বলিয়া জানিতে হইলে তাহার বিশিষ্টতাকে অতিক্রম করিয়া তাহার সার্ব্বিক স্বভাবের উপলব্ধি আবশ্যক। ইন্দ্রিয় তাহা করিতে পারে না, তাই ইন্দ্রিয়গোচর বস্তুর মধ্যে

১। সংযোজক সার্ব্বভৌম বাক্য=Synthetic a priori judgment.

বুদ্ধি ইন্দ্রিয়াতীত প্রকৃতির সন্ধান না পাইলে আমাদের অভিজ্ঞতার কোন সম্ভাবনাই থাকিত না।

প্লেটোর দর্শনেও এ সমস্যা প্রকাশ পাইয়াছে, কিন্তু তিনি যে তাহার কোন সমাধান করিতে পারিয়াছেন, তাহা মনে হয় না। তাঁহার পূর্ব্বে কেহ দেখিয়াছেন অনিবার পরিবর্ত্তনের চাঞ্চল্য, কেহ দেখিয়াছেন নির্ব্বিকার প্রকৃতির অটুট স্থৈর্য্য। প্লেটোর কৃতিত্ব এই যে তিনি পরিবর্ত্তন এবং স্থায়িত্ব এ দুইয়েরই প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া তাহাদের সম্বন্ধের বিবরণ দিতে চাহিয়াছেন, বলিয়াছেন যে অভিজ্ঞতায় তাহারা যুক্ত, এবং এই সংযোগের ফলেই অভিজ্ঞতার উদ্ভব। এ সংযোগ কিন্তু প্লেটোর কাছে অবোধগম্য, এমন কি তাহা সাযুজ্য[1] না ঐক্য[2], সে সম্বন্ধে তাঁহার মতামত সুনির্দ্দিষ্ট নহে। এক পক্ষে বুদ্ধি[3] আমাদের কাছে ইন্দ্রিয়াতীত, নিত্য সার্ব্বিক রূপ-সমূহকে[4] প্রকাশ করে, বুদ্ধির এ অভিজ্ঞতার নাম জ্ঞান[5]। অন্যপক্ষে ইন্দ্রিয় আমাদের কাছে অনিত্য এবং বিশিষ্ট বস্তুবৈচিত্র্যপরিপূর্ণ পৃথিবীকে প্রকাশ করে, এক্ষেত্রে আমাদের যে অভিজ্ঞতা, তাহাকে জ্ঞান বলা চলে না; সে কেবলমাত্র অভিমত[6]। জীবনের প্রয়োজনে তাহাদের সার্থকতা আছে কিন্তু জ্ঞানের ন্যায়সঙ্গতির মধ্যে তাহাদের স্থান নাই। অথচ পৃথিবীর বস্তুসমূহ এই সমস্ত নিত্য ও সার্ব্বিক রূপসমূহের প্রতিকৃতি বা প্রতিবিম্ব। রূপের সঙ্গে বস্তুর সম্বন্ধ যে কি সে সম্বন্ধে প্লেটোর মতবৈচিত্র্য দেখিয়াই বোঝা যায় যে এ সমস্যার প্লেটো কোন সমাধান করিতে পারেন নাই, তাই কখনো তিনি বলিয়াছেন যে বস্তু রূপের প্রতিবিম্ব, কখনো বলিয়াছেন যে তাহাদের সম্বন্ধ কার্য্যকারণের সম্বন্ধ, কখনো বা বলিয়াছেন বস্তু রূপের প্রকৃতির অংশীদার।

প্লেটো এ সমস্যার কোন সমাধান করিতে পারেন নাই, কিন্তু তাঁহার বিবরণে যে দুইটি দিক ছিল, ইয়োরোপের পরবর্ত্তী দর্শনের ইতিহাস সেই দুই ধারার দ্বন্দ্বের ইতিহাস। ইন্দ্রিয়াতীত যে নিত্যরূপের পরিকল্পনা প্লেটো করিয়াছিলেন, তাহাকে অবলম্বন করিয়া দার্শনিকের পর দার্শনিক সৃষ্টির

১। সাযুজ্য = association. ২। ঐক্য = unity. ৩। বুদ্ধি = nous. ৪। রূপ = eidos.
৫। জ্ঞান = knowledge. ৬। অভিমত = opinion.

বুদ্ধিগত বিবরণ দিতে চাহিয়াছেন, বলিয়াছেন, ইন্দ্রিয় যে জগতের পরিচয় দেয়, তাহার ব্যবহারিক সত্তা থাকিলেও তাহার মধ্যে পারমার্থিক সত্য নাই। সেই জগতের সঙ্গে যে পরিচয়, সে পরিচয়ও তাই কেবলমাত্র অভিমত, আমাদের জ্ঞানের অপূর্ণতার সাক্ষ্য মাত্র। মানবজ্ঞানের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে দিনে দিনে তাহা রূপান্তরিত হইয়া সত্যের রূপ-উপলব্ধিতে পরিণত হইবে, জ্ঞানের সেই পূর্ণতার মধ্যে বিশেষের আর কোন বিশিষ্ট স্থান থাকিবে না। এক অনাদ্যন্ত স্বয়ংপ্রকাশ সত্যের বিভিন্ন রূপ বলিয়া জগৎপ্রপঞ্চকে আমরা জানিব, বুঝিব যে সৃষ্টিতে বিশিষ্টের যে বিচিত্র ঐশ্বর্য্য, তাহার মূলেও রহিয়াছে সেই রূপহীন নামহীন গুণহীন ব্রহ্ম।

প্লেটো বিশিষ্টের যে পরিচয়কে ইন্দ্রিয়গোচর বলিয়াছিলেন, তাহাকে অবলম্বন করিয়া বিরুদ্ধমতের দার্শনিকেরা কিন্তু বলিয়াছেন যে নিত্যরূপের জ্ঞানসাধনা বুদ্ধির পক্ষে পণ্ডশ্রম, নির্গুণ ব্রহ্মের পরিকল্পনা পরিকল্পনার অভাবেরই নামান্তর। প্রতিমুহূর্ত্তের সংবেদনায় যে বিশিষ্ট বস্তু প্রকাশিত হয়, তাহাই একমাত্র সত্য, তাহাকে লক্ষ্য করাই বিজ্ঞানের পদ্ধতি, তাহার মধ্যে নিয়মের শৃঙ্খল আবিষ্কার করিয়াই বিজ্ঞানের অভিযান। সম্বন্ধ ও লক্ষণ দিয়াই বস্তুর বৈশিষ্ট্য, কিন্তু সেই বৈশিষ্ট্যকে অস্বীকার করিবার সাধনায় সম্বন্ধ ও লক্ষণকে অতিক্রম করিয়া বস্তুর পারমার্থিক সত্তা খুঁজিলে পারমার্থিক অথবা ব্যবহারিক কোন সত্তারই সন্ধান মিলিবে না, বুদ্ধির এ দুঃসাহসের ফলে শূন্যতার সীমাশূন্য গহ্বরে অনুসন্ধিৎসার অনন্ত সমাধি অবশ্যম্ভাবী।

বুদ্ধিবাদীর দর্শনে তাই সংযোজনা বা সংশ্লেষণের স্থান নাই, তাঁহার চক্ষে জ্ঞানের প্রগতি বিশ্লেষণে। অভিজ্ঞতা নিরীক্ষা ও পরীক্ষার দ্বারা আমাদের কাছে যে সাযুজ্য প্রকাশিত করে, তাহা কেবলমাত্র আমাদের সীমাবদ্ধ বুদ্ধির অক্ষমতার পরিচায়ক। দর্শনের পূর্ণতায় এই বিশিষ্ট জ্ঞানের স্থান নাই, একটি মাত্র স্বতঃসিদ্ধ সাধারণ সূত্র হইতে বিশ্বের সমস্ত বৈচিত্র্যকে নিষ্কাশিত করিতে পারিলেই দর্শনের সাধনা সফল। তাই এই বৌদ্ধিক দর্শনে স্থানকালগত পার্থক্য লক্ষ্যণীয় নহে, স্থান ও কাল কেবলমাত্র অস্পষ্ট ধারণা বলিয়া বুদ্ধির বিজয় অভিযানে তাহাদের অস্পষ্টতা এবং দুর্বোধ্যতা

দূর হইয়া কালক্রমে তাহারা সেই স্বতঃসিদ্ধ সাধারণ সূত্রের অঙ্গীভূত ধারণারূপে প্রতিভাত হইবে। এক কথায়, এই বৌদ্ধিক দর্শনের ফলে সার্ব্বভৌমিকতার সাধনায় সমস্ত বৈশিষ্ট্য বিলুপ্ত হইয়া যাইতে বাধ্য, বিজ্ঞানে অনুভূতির যে অবদান, তাহা মানব ক্ষমতার অপূর্ণতাপ্রসূত বলিয়া কালক্রমে তাহার বিলয় অবশ্যম্ভাবী। কার্টেসিয়ান দর্শনেও এই পরিকল্পনার আভাস মেলে। সংবেদনা বিশিষ্ট এবং স্থানকালনির্দ্দিষ্ট বলিয়া বিজ্ঞানের সাধারণ জ্ঞানে বস্তু বিশেষের স্থানসংকুলান দুঃসাধ্য ব্যাপার, ক্ষণিকবাদ বা occasion-alism-এর পারলৌকিক রহস্যের মধ্য দিয়া তাই আমাদের জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তের সংবেদনাকে জ্ঞানগোচর করিয়া তুলিবার প্রয়াস। লাইবনিট্‌জের দর্শনে এই সমস্যা স্পষ্টতর হইয়া উঠিয়াছে। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন যে জ্ঞানের পূর্ণতায় সংযোজনার স্থান নাই, ঈশ্বরের কাছে তাই বিশ্বজগতের সমস্ত বস্তু ও ঘটনাই ন্যায়ের সঙ্গতিসূত্রে বদ্ধ। বিশ্লেষণই সেখানে সত্যের পরিচায়ক, তাই নিরীক্ষা বা পরীক্ষা কেবলমাত্র আমাদের পক্ষে প্রয়োজনীয়, পূর্ণজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাহারা প্রযোজ্য নহে।

বৈজ্ঞানিক কিন্তু একথা স্বীকার করিতে চাহেন নাই, বলিয়াছেন যে কেবলমাত্র বিশ্লেষণে আমাদের ধারণার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিভেদ প্রকাশিত হইতে পারে, কিন্তু বিজ্ঞানের জয়যাত্রার বিবরণ তাহাতে মেলে না। বিজ্ঞানে সাধারণ সূত্রের প্রাধান্য যতই থাকুক না কেন, বিশিষ্টের প্রতি নির্দ্দেশও অবশ্যম্ভাবী। ভবিষ্যদ্বাণী বিজ্ঞানের সাফল্যের একটি প্রধান লক্ষণ, এবং সাধারণ সূত্রের উপর তাহা যতই নির্ভর করুক না কেন, তাহার প্রয়োগ বিশেষের ক্ষেত্রে। এই বিশেষকে বর্জ্জন করিলে বিজ্ঞানের বিজয় অভিযানের অনেকখানিই বর্জ্জন করিতে হয়।

অভিজ্ঞতাবাদীরা তাই বিজ্ঞানের পক্ষ হইতে প্রশ্ন করিলেন যে বিশ্লেষণই যদি জ্ঞানের বাহন হয়, তবে বিশ্লেষণ করিবার বিষয় আসিল কোথা হইতে? বিশ্লেষণের ফলে তো আর বিশ্লেষণের বিষয়ের উদ্ভব হইতে পারে না, কাজেই বুদ্ধির গবেষণাকে আমরা যতদূরই প্রসারিত করিনা কেন, অবশেষে এমন একটি স্থলে পৌঁছিতে আমরা বাধ্য যেখানে বুদ্ধি দ্রষ্টা মাত্র, স্রষ্টা নহে। কাজেই অভিজ্ঞতার রূপ সম্বন্ধে আমাদের ধারণা যাহাই হউক না

কেন, অভিজ্ঞতাজাত জ্ঞানের বিষয়কে আমাদের স্বীকার করিতেই হইবে।

বস্তুতঃ তাহাই হইয়াছে, বুদ্ধিবাদীরাও বাধ্য হইয়া স্বীকার করিয়াছেন যে কোন একটি স্বতঃসিদ্ধ সাধারণ সূত্রের বিশ্লেষণেই জ্ঞানের বিকাশ। সেই সাধারণ সূত্রটি কিন্তু আমাদের সৃষ্ট বা কল্পনাপ্রসূত নহে, আমাদের পক্ষে তাহা দত্ত এবং সেই হিসাবে তাহা আমাদের অভিজ্ঞতার সামগ্রী। বুদ্ধিবাদীরা বিশ্বব্যাপারের বৈচিত্র্যের বিবরণ দিতে গিয়াও তাই পদে পদে মুস্কিলে পড়িয়াছেন। যদি কেবলমাত্র স্বতঃসিদ্ধটিই দত্ত হয়, তবে সে স্বতঃসিদ্ধের ঐক্যের মধ্যে সৃষ্টির বৈচিত্র্যের অবকাশ কোথায়? এই বৈচিত্র্য যদি মানবমনপ্রসূত হয়, তবে সেই কারণেই তাহা বিশ্বব্যাপারের প্রকৃত সত্য নহে। অন্যথায় তাহা স্বতঃসিদ্ধের মধ্যেই নিহিত ছিল, এবং ফলে স্বতঃসিদ্ধের ঐক্য কেবলমাত্র আপাতদৃষ্ট, বস্তুতঃ পৃথিবীর বৈচিত্র্য অভিজ্ঞতার ফলেই আমরা জানি। অভিজ্ঞতাবাদী তাই বলেন যে জ্ঞান অভিজ্ঞতার ফল। অভিজ্ঞতায় আমরা স্থানকালনির্দ্দিষ্ট বিশেষকেই জানি, এবং বিশেষের সঙ্গে বিশেষের সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়া তাহাদের স্বভাব জানিতে চেষ্টা করি। এই সাদৃশ্য লক্ষ্যও অভিজ্ঞতার অঙ্গ, তাই আমরা যাহাকে সাধারণ জ্ঞান বলি, তাহাও অভিজ্ঞতাসঞ্জাত, এবং অভিজ্ঞতাসঞ্জাত বলিয়া তাহার মধ্যে অনিবার্য্যতার কোন চিহ্ন নাই। বিজ্ঞানের সার্ব্বভৌমিক সত্যও তাই প্রকৃতপক্ষে সার্ব্বভৌমিক বা নিত্য নহে, আমাদের অভিজ্ঞতায় তাহাদের প্রকাশে কোন ব্যতিক্রম দেখি নাই বলিয়াই আমরা তাহাদের সাধারণ সত্য বলিয়া মানি। যদি কোনদিন কোন ব্যতিক্রমের পরিচয় পাই, তবে বিজ্ঞানের সূত্রও সেই সঙ্গে পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে।

এক হিসাবে এ বিবরণ যে বিজ্ঞানের প্রকৃত বিবরণ, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। নিত্য নূতন আবিষ্কারের ফলে আমাদের জ্ঞানের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানের সাধারণসূত্রও পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। স্থান-কাল-নিরপেক্ষ নিত্য সত্যের স্থান বিজ্ঞানে নাই। কিন্তু একথাও সত্য যে এ বিবরণে বিজ্ঞানের মর্ম্মকথা বাদ পড়িয়া যায়। বিজ্ঞানের কোন সূত্রকেই আমরা নিত্য সত্য বলিয়া না মানিতে পারি, কালে বিজ্ঞানের সূত্রের

পরিবর্ত্তন হয়, তাহাও সত্য, কিন্তু তবু বিজ্ঞান নিত্যতার যে দাবী করে, তাহাকেও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। যদি অভিজ্ঞতা কেবলমাত্র বিশেষেরই অভিজ্ঞতা হইত এবং বিজ্ঞানের সূত্র কেবলমাত্র বিশিষ্ট অভিজ্ঞতার সংক্ষিপ্ত সমষ্টি বা সাঙ্কেতিক প্রতিভাসমাত্র হইত, তবে বিজ্ঞানের বিচারে সত্য মিথ্যার প্রশ্নই উঠিত না। বিশিস্ট অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে বলা চলে যে তাহা তথ্য, তাহা ঘটে অথবা ঘটে না—কিন্তু তাহার সত্যাসত্যের কোন প্রশ্নই উঠে না। তাহাদের সমষ্টিও তথ্যের সমষ্টি, তাহাদের বেলায়ও সত্যাসত্যের প্রশ্ন তাই ঠিক সমান ভাবে অপ্রযোজ্য। কিন্তু বিজ্ঞানের সূত্র সত্য বলিয়া দাবী করে এবং সার্ব্বিকতা ও নিত্যতা না থাকিলে এ দাবীর কোন অর্থ-ই হয় না। নূতন তথ্যকে বুঝাইতে সূত্রের যে পরিবর্ত্তন, সেই পরিবর্ত্তনেই প্রমাণ হয় যে সূত্র কেবলমাত্র সাধারণ[1] নহে, সার্ব্বিকও[2] বটে। তাহা না হইলে সূত্রকে পরিবর্ত্তন করিবার কোন প্রয়োজন থাকিত না, বলিলেই হইত যে এতদিন আমরা অভিজ্ঞতায় এক রকম পাইয়াছি, এখন অন্য রকম পাইলাম। তাহা বলিলে কিন্তু বিজ্ঞানের অস্তিত্বকেই অস্বীকার করা হয়, কারণ তথ্যের সঙ্গে তথ্যের সম্বন্ধকে একত্রিত করার নাম বিজ্ঞান নয়, বিজ্ঞানের লক্ষ্য তথ্যের সঙ্গে তথ্যের সম্বন্ধকে বোধগম্য করা। যে ভবিষ্যদ্বাণী বিজ্ঞানের সাফল্যের একটি প্রধান লক্ষণ, বিজ্ঞানের সার্ব্বিকতায় বিশ্বাস না করিলে তাহার সম্ভাবনার কল্পনাও অর্থহীন হইয়া দাঁড়ায়।

ফলে বুদ্ধিবাদী এবং অভিজ্ঞতাবাদী, কেহই মানুষের জ্ঞান যে কি করিয়া সম্ভবপর, তাহার কোন বিবরণ দিতে পারেন না। মানুষের জ্ঞান ব্যক্তি-কেন্দ্রিক, ব্যক্তিত্বের সীমানাকে লঙ্ঘন করিয়া তাহা যে কেমন করিয়া সাধারণ সূত্রে উপনীত হয়, বুদ্ধিবাদ এবং অভিজ্ঞতাবাদ উভয়ের কাছে তাহা সমানভাবেই রহস্য। বুদ্ধিবাদ জ্ঞানের সার্ব্বিকতার বিবরণ দিতে গিয়া তাহাকে কেবলমাত্র শাব্দিক[3] করিয়া তোলে, কিন্তু যে নূতনত্ব জ্ঞানের অপরিহার্য্য অঙ্গ, তাহার কোন বিবরণ তাহাতে মিলে না। বুদ্ধিবাদের কাছে জ্ঞানের চরম সূত্র স্বতঃসিদ্ধ এবং সেই স্বতঃসিদ্ধের বিশ্লেষণের

১। সাধারণ=general. ২। সার্ব্বিক=universal. ৩। শাব্দিক=tautologous.

ফলে জ্ঞানের বিকাশ বলিয়া জ্ঞান সার্ব্বিক এবং স্বতঃসিদ্ধ, কিন্তু সে সার্ব্বভৌমিকতার মধ্যে বিশেষের কোন স্থান নাই। বিশেষ যে কেমন করিয়া সামান্যেরই বিশেষ এবং সেই কারণে সাধারণ সূত্রকে প্রকাশ করাই তাহার স্বভাব, বুদ্ধিবাদ তাহার বিষয়ে কিছুই বলিতে পারে না, এমনকি আমরা যে কেমন করিয়া বিশেষের কল্পনা করিতে পারি, সে কথাও অবোধগম্য থাকিয়া যায়। অভিজ্ঞতাবাদ বিশেষের জ্ঞানকেই কেন্দ্র করিয়া তোলে, কিন্তু সে বিশেষের মধ্যে সার্ব্বিকতা বা স্বতঃসিদ্ধতার কোন লক্ষণ নাই, তাই বিশেষকে অতিক্রম করিয়া আমাদের অভিজ্ঞতার যে রূপ, অভিজ্ঞতাবাদের কাছেও তাহা সমানভাবেই রহস্য।

৩

কাণ্ট বুদ্ধিবাদ এবং অভিজ্ঞতাবাদ, দুইয়েরই এ ব্যর্থতা উপলব্ধি করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার দর্শনের প্রথম প্রশ্ন—সংযোজক সার্ব্বভৌম বাক্য কি করিয়া সম্ভবপর? বুদ্ধিবাদের মতে সমস্ত বাক্যই সার্ব্বভৌম, কিন্তু তাহারা সংযোজক নহে, বিশ্লেষণলব্ধ বলিয়া শাব্দিক। অন্যপক্ষে অভিজ্ঞতাবাদের মতে সমস্ত বাক্যই সংযোজক, কিন্তু বিশেষের সঙ্গে বিশেষের সম্বন্ধের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া তাহারা সার্ব্বভৌম নহে, বাস্তব হইয়াও সে সম্বন্ধ অনিবার্য্য নহে।

কাণ্টপূর্ব্ববর্ত্তী দার্শনিকদের মধ্যে হিউম সে কথা বুঝিয়াছিলেন। তিনি দেখিয়াছিলেন যে, কার্য্যকারণবিধি বিশ্লেষণের উপর প্রতিষ্ঠিত না হইয়াও অনিবার্য্যতার দাবী করে। অভিজ্ঞতাবাদ সে দাবীকে স্বীকার করিতে পারে না, বলে যে এ দাবী বুদ্ধিগত নহে, আবেগের উপর তাহার প্রতিষ্ঠা। ফলে জ্ঞান আর বোধগম্য থাকে না, কেবলমাত্র আবেগের প্রতিক্রিয়া হইয়া দাঁড়ায়। আবেগ ব্যক্তিগত, কাজেই একজনের আবেগের সঙ্গে অন্যের আবেগের কোন অসঙ্গতি নাই, সংঘর্ষ বাধিলেও আবেগগুলির মতন সে সংঘর্ষও সমানভাবেই তথ্য মাত্র। তাহা হইলে স্বীকৃতি অস্বীকৃতির কোন কথাই ওঠে না, তাহাকে জ্ঞান বলাও ভাষার প্রতি অত্যাচার ভিন্ন আর কিছুই নহে।

কাণ্ট হিউমের প্রশ্ন ও আলোচনাকে স্বীকার করিয়াও তাঁহার মীমাংসাকে অস্বীকার করিয়াছেন। তিনি দেখিলেন যে, সংযোজক সার্ব্বভৌম বাক্য কেবলমাত্র কার্য্যকারণবিধিকেই প্রকাশ করে না, অভিজ্ঞতার সমস্ত ক্ষেত্রেই এই প্রকারের বাক্যের প্রসার। জ্ঞানকে সাধারণভাবে অস্বীকার করা স্ববিরোধী, কারণ সেই অস্বীকারই সে সমস্ত ক্ষেত্রে জ্ঞান হইয়া দাঁড়ায়। কাজেই কোন বিশেষ জ্ঞানকেই অস্বীকার করা চলে এবং তাহার জন্যও অন্য বিশেষ জ্ঞানের প্রয়োজন। প্রতি ক্ষেত্রেই আমাদের জ্ঞান অভিজ্ঞতায় সঞ্জাত হইলেও অভিজ্ঞতাকে অতিক্রম করিয়া যায়, তাই একপক্ষে অভিজ্ঞতাজাত বলিয়া তাহা যেমন সংযোজক, তেমনি অন্যপক্ষে অভিজ্ঞতাকে অতিক্রম করে বলিয়া তাহা সার্ব্বিক। গণিত ও পদার্থবিদ্যা লইয়া কাণ্ট বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন, কিন্তু সংযোজক সার্ব্বভৌম বাক্যের প্রয়োগ কোন বিশিষ্ট ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নহে, অভিজ্ঞতার সঙ্গেই তাহা সমপ্রসার।

সংযোজক সার্ব্বভৌম বাক্যের অস্তিত্বে সন্দেহও তাই অন্যায়, প্রতিমুহূর্ত্তের অভিজ্ঞতায়ই এই প্রকারের বাক্য প্রকাশিত হইতেছে। কিন্তু বুদ্ধিবাদে বা অভিজ্ঞতাবাদে এই প্রকারের বাক্যের সম্ভাবনাও নাই, সুতরাং আমাদের অভিজ্ঞতার বিবরণ হিসাবে দুই মতকেই বাতিল না করিয়া উপায় নাই। বস্তুতঃ বুদ্ধিবাদ এবং অভিজ্ঞতাবাদ একই কারণে আমাদের কাছে অগ্রাহ্য। তাহাদের উভয়ের পক্ষেই জ্ঞান প্রধানতঃ বিশ্লেষণের ফল, কেবলমাত্র জ্ঞানের বিষয়বস্তু লইয়া তাহাদের প্রভেদ। বুদ্ধিবাদের মতে একটি সর্ব্বব্যাপী স্বতঃসিদ্ধ আমরা সাক্ষাৎভাবে জানি, সমস্ত জ্ঞান সেই স্বতঃসিদ্ধেরই ক্রমশীল[১] বিশ্লেষণ। অভিজ্ঞতাবাদের মতে ইন্দ্রিয় যে লক্ষণমণ্ডলী প্রকাশ করে, জ্ঞান কেবলমাত্র সেই বেদনা-জগতের বিশ্লেষণ। বিশ্লেষণের বিষয়বস্তু বিভিন্ন হইলেও জ্ঞানের পদ্ধতি দুই ক্ষেত্রেই এক। দুই ক্ষেত্রেই মানুষের বুদ্ধি নিশ্চেষ্ট ভাবে বিষয়বস্তুকে গ্রহণ করে, ব্যক্তির চিত্তে জ্ঞান তাই দুই ক্ষেত্রেই ফলস্বরূপ, সক্রিয় চিত্তের সৃষ্টিপদ্ধতি নহে। বিশ্লেষণকে ক্রিয়া মনে করিলে দুই ক্ষেত্রেই বুদ্ধিকে ক্রিয়াশীল মনে করা যায়, কিন্তু বিষয়বস্তুর উপরে সমস্ত ঝোঁক পড়ায় কোন ক্ষেত্রেই তাহা হয় নাই।

১। ক্রমশীল = continuous.

বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়কে পৃথক করিয়া দেখিলে এরকম সিদ্ধান্ত অবশ্যম্ভাবী। জ্ঞানের বস্তুকে যদি আমরা বুদ্ধিলব্ধ মনে করি, তবে বোধগম্যতাকেই আমরা তাহার সত্তার প্রমাণ বলিয়া মনে করিতে বাধ্য। ফলে যাহা বোধগম্য, তাহাই সত্য, এবং তাহা হইলে ভ্রান্তির কোন বিবরণ দেওয়া অসম্ভব। অন্যথায় জ্ঞানের বিষয়বস্তুকে ইন্দ্রিয়জ মনে করিলে তাহার ইন্দ্রিয়গম্যতা দিয়াই আমরা তাহার সত্য প্রমাণ করিতে চাহি, এবং তাহা হইলেও ভ্রান্তির কোন সম্ভাবনা থাকে না। এক কথায় জ্ঞানের বিষয়বস্তুর দিকে লক্ষ্য রাখিয়া যদি আমরা এমন কোন লক্ষণ খুঁজি, যাহার ফলে সত্য ও মিথ্যা দৃষ্টিমাত্রই স্বকীয় মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইবে, তবে আমাদের চেষ্টা নিষ্ফল হইতে বাধ্য। কোন ক্ষেত্রেই কোন বিশেষ জ্ঞানই কেবলমাত্র আপনার অধিকারে সত্য নহে,—কেবলমাত্র স্বাধিকারে তাহাকে সত্য মনে করিলে দর্শন পরাবিদ্যাতে পরিণত হয়। তখন বিশেষ জ্ঞানের সঙ্গে বিশেষ জ্ঞানের সম্বন্ধের কথা ভুলিয়া আমরা জানিতে চাহি—কোন স্বয়ং-প্রকাশ লক্ষণের গুণে সত্য আপনাকে সত্য বলিয়া প্রকাশ করে। দর্শন তখন সত্তার লক্ষণবিচারে প্রবৃত্ত হয়, বস্তু এবং আত্মার পারমার্থিক সত্য, তাহাদের পরস্পরের সম্বন্ধ ও তাহার সম্ভাবনাই তখন দর্শনের লক্ষ্য।

কাণ্ট বুঝিয়াছিলেন যে, এ পথে দর্শনের সাফল্যের কোনই আশা নাই। সত্যের যদি স্বপ্রকাশ লক্ষণ থাকিত, তবে একবার যাহাকে সত্য বলিয়া জানা যায়, তাহা চিরদিনের মতনই সত্য থাকিতে বাধ্য। ভুল করিয়া মানুষ শেখে, মানুষের বুদ্ধির সাধনা অতীতের সহস্র ভ্রান্তিকে সত্যে রূপান্তরিত করে, বিজ্ঞানের প্রগতিতে নূতন নূতন তথ্য নিয়মের সূত্রে গ্রথিত হয়। তাই জ্ঞানের বিষয়বস্তুর লক্ষণ কি, সে প্রশ্ন না তুলিয়া কাণ্ট জিজ্ঞাসা করিলেন—জ্ঞানে প্রগতিকে সম্ভবপর করিতে হইলে অভিজ্ঞতাকে কেমন করিয়া বুঝিতে হইবে? বিশেষ জ্ঞানের সঙ্গে বিশেষ জ্ঞানের যে সঙ্গতি, সে সঙ্গতিকে বুঝিবারই বা উপায় কি? সংযোজক সার্ব্বভৌম বাক্যের সম্ভাবনায় কাণ্ট এ প্রশ্নের উত্তর পাইয়াছিলেন, কারণ এই প্রকারের বাক্য প্রত্যক্ষকে অতিক্রম করে বলিয়া তাহার সত্য কেবলমাত্র বিষয়বস্তুকে লক্ষ্য করিয়া জানিবার উপায় নাই, বর্ত্তমান অভিজ্ঞতার সঙ্গে অতীত অভিজ্ঞতার সামঞ্জস্য

যদি তাহাতে সাধিত হয়, ভবিষ্যতের অভিজ্ঞতার সম্ভাবনাকে যদি তাহা বিনষ্ট না করে, তবেই তাহাকে আমরা সত্য বলিয়া জানি। জ্ঞানের যাহা বিষয়, তাহাকে যদি বাস্তব এবং ভ্রান্তির বিষয়কে যদি অবাস্তব নাম দেওয়া যায়, তবে বলিতে হয় যে, পুরাতন দর্শনে বাস্তব এবং অবাস্তবের প্রভেদ ছিল প্রকৃতিগত। কিন্তু কাণ্টের মতে তাহাদের প্রকৃতিগত পার্থক্য যে কেবলমাত্র অজ্ঞেয় তাহা নহে, বাস্তব এবং অবাস্তবের যথার্থ পার্থক্যকে তাহা প্রকাশই করে না। তাঁহার মতে বাস্তব এবং অবাস্তবের প্রভেদ সম্বন্ধে, বিভিন্ন সম্বন্ধের যেখানে সঙ্গতি, তাহাকেই আমরা বলি বাস্তব এবং সম্বন্ধের অসঙ্গতি ঘটিলে তাহাকেই অবাস্তব বলি। জাগ্রত জীবনের অভিজ্ঞতায় বিভিন্ন সম্বন্ধের সঙ্গতি রক্ষা হয় বলিয়াই তাহা বাস্তব, স্বপ্নে তাহার অভাবের দরুণই স্বপ্ন অবাস্তব।

কাণ্টের আলোচনার ফলে তাই দর্শনের সমস্যা ও সমাধান—উভয়েরই রূপান্তর ঘটিয়াছে। বস্তু ও চিত্তের সত্তার আলোচনা তাঁহার সমস্যা নহে, তাঁহার মতে দর্শনের সমস্যা জ্ঞানগত। তাঁহার সমাধানেও তাই বিপ্লবকর পরিবর্ত্তনের পরিচয় মেলে, পারমার্থিক সত্য জ্ঞানের আয়ত্তে নাই, ব্যবহারিক সত্য প্রকাশ করিয়াই বুদ্ধিকে তৃপ্ত থাকিতে হয়।

কাণ্টের মতে সঙ্গতিই বাস্তবের লক্ষণ, তাই অভিজ্ঞতা সুসংবদ্ধ হইতে বাধ্য এবং অভিজ্ঞতার এই সঙ্গতিই জ্ঞানের ভিত্তি। বিভিন্ন অভিজ্ঞতার মধ্যে সঙ্গতি রহিয়াছে বলিয়াই সংযোজক সার্ব্বভৌম বাক্য সম্ভবপর এবং সেই সম্ভাবনার উপর বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত। সেই জন্যই আমাদের জ্ঞান অভিজ্ঞতার সীমানাকে অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে না। ঘটনার সঙ্গে সম্ভাবনার সম্বন্ধ স্থাপন করাই বুদ্ধির কাজ, কিন্তু অভিজ্ঞতার সঙ্গতি রক্ষা করিয়াই বুদ্ধি সম্ভাবনার বিচার করিতে পারে।

অভিজ্ঞতার সঙ্গতি বিচার করিতে গিয়া কাণ্ট ইন্দ্রিয় এবং বুদ্ধির কর্ম্ম-পদ্ধতির মধ্যে খানিকটা প্রভেদ স্বীকার করিয়াছেন। ইন্দ্রিয়গম্য এবং বুদ্ধিলব্ধ বিষয় যে বিভিন্ন নহে, সে বিষয়ে কাণ্টের কোন সন্দেহ নাই। তাহাদিগকে পৃথক করিবার ফলেই কাণ্ট-পূর্ব্ব দর্শন চালমাৎ হইবার উপক্রম হইয়াছিল, ইন্দ্রিয় এবং বুদ্ধির বিষয়ের ঐক্য নির্দ্দেশ করিয়া কাণ্ট দর্শনকে সে বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। তাহার ফলে কিন্তু ন্যায়ের

প্রকৃতিও বদলাইতে বাধ্য হইয়াছে, কাণ্টের আলোচনাই আধুনিক জ্ঞান-তান্ত্রিক ন্যায়ের ভিত্তি। ইন্দ্রিয় এবং বুদ্ধির বিষয়ের ঐক্যের ফলে কাণ্ট দেখিলেন যে, প্রত্যয়[1] এবং সংবেদনার[2] মধ্যে প্রভেদ থাকিলেও তাহারা পৃথক নহে, সংবেদনা না থাকিলে প্রত্যয় অর্থহীন, প্রত্যয় না থাকিলে সংবেদনা অজ্ঞেয়। বিভিন্ন সংবেদনার অস্তিত্বগত পার্থক্যকে অবহেলা করিয়া তাহাদের মধ্যে প্রকৃতিগত ঐক্য স্থাপনই প্রত্যয়ের কাজ, তাই ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াই বুদ্ধির বিকাশ। ইন্দ্রিয়াতীত বিষয় বুদ্ধির পক্ষেও সমানই অলভ্য।

অভিজ্ঞতায় ইন্দ্রিয়লব্ধ বিষয়মাত্রই দেশকালগত। তাই দেশ এবং কাল কাণ্টের মতে অভিজ্ঞতার সঙ্গতির প্রধান উপকরণ। দেশ এবং কালের ঐক্য না থাকিলে অভিজ্ঞতার সম্ভাবনা বিনষ্ট হয়, তাই দেশ এবং কালের ঐক্য বুদ্ধির পক্ষে অনতিক্রমণীয়। ব্যক্তির সমস্ত অভিজ্ঞতাই তাই দেশকাল-নির্দ্দিষ্ট, এবং ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সম্বন্ধও অভিজ্ঞতার বিষয়বস্তু বলিয়া এই দেশকাল কেবল ব্যক্তি বিশেষের প্রতি প্রযোজ্য নহে, সমস্ত বিশ্বসৃষ্টিরই দেশকাল এক। ফলে দেশ ও কাল কেবলমাত্র ঘটনার সঙ্গে ঘটনার সম্বন্ধের ফল নহে, বরঞ্চ এক অসীম ও অনন্ত দেশকালের কাঠামোর মধ্যেই অভিজ্ঞতা বিকশিত হইতেছে। দেশের বিভিন্ন অংশও দেশ, কালের বিভিন্ন অংশও কাল, তাই দেশকালের মধ্যে স্বভাবগত কোন বৈচিত্র্য নাই। তাই অভিজ্ঞতা বিষয়ের যে বৈচিত্র্য আমাদের কাছে প্রকাশ করে, তাহা দেশ-কালজাত নহে, সে বৈচিত্র্যের কারণ খুঁজিতে হইলে দেশ ও কালে যাহা প্রকাশিত হয়, তাহার বিচার আবশ্যক।

অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্য দেশকালজাত নহে বটে, কিন্তু দেশকালের-স্বভাববিরুদ্ধও হইতে পারে না। বুদ্ধি ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন করে (বৈচিত্র্য ব্যতীত সম্বন্ধ অর্থহীন), কাজেই দেশকালের স্বভাবকে ভিত্তি করিয়াই সে সমস্ত সম্বন্ধ। ফলে ইন্দ্রিয়লব্ধ বিষয়ের মধ্যে দেশকালের স্বভাবসঙ্গত ঐক্যস্থাপনই বুদ্ধির কাজ এবং বাক্যেই তাহার প্রকাশ। বাক্যের রূপবিচার করিয়া তাই আমরা দেশকালের ঐক্যে যে বৈচিত্র্য,

১। প্রত্যয় = concept. ২। সংবেদনা = sensation, presentation.

তাহা জানিতে পারি। সংযোজক সার্ব্বভৌম বাক্যের সম্ভাবনার ভিত্তিও এইখানে মেলে, কারণ দেশ ও কালের প্রকৃতিতে বৈচিত্র্য নাই বলিয়া অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্য দেশকালজাত নহে, তাহা আমরা দেখিয়াছি। সেই কথাই ঘুরাইয়া বলা চলে যে অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্য দেশকাল নিরপেক্ষ, এবং দেশকাল নিরপেক্ষ বলিয়াই তাহা সার্ব্বিক। পক্ষান্তরে বৈচিত্র্যবোধেই জ্ঞানের উদয় বলিয়া অভিজ্ঞতা সর্ব্বত্রই সংযোজক। সংশ্লেষণের পূর্ব্বে দেশকাল থাকিলেও তাহা আমাদের বুদ্ধি-গ্রাহ্য নহে, সংশ্লেষণেই অভিজ্ঞতার প্রারম্ভ। সার্ব্বিকতা ও সংযোজনা—এই দুইয়ের মিলনই তাই অভিজ্ঞতা।

বিষয়ী না থাকিলে সংশ্লেষণের কোন অর্থই হয় না। তাই অভিজ্ঞতার বিবরণে বিষয়ীকেও বাদ দেওয়া চলে না। ইন্দ্রিয় যে বিষয়কে প্রকাশ করে, তাহা দেশকালজ। কালজ হিসাবে তাহার প্রকাশ ক্রমশীল, কারণ মুহূর্ত্তিক অভিজ্ঞতাসমূহকে সংগঠন করিয়াই অভিজ্ঞতার পূর্ণতা। এই পূর্ণতাও কখনোই সম্পূর্ণ নহে, তাহাও ক্রমশঃ অভিজ্ঞতায় প্রকাশিত হইতেছে। এ বিবরণে দ্রষ্টব্য এই যে, অভিজ্ঞতা কালজহিসাবে ক্রমশীল, সুতরাং বিভিন্ন ক্রমের মধ্যে যদি একই বিষয়ী জাগ্রত না থাকে, তবে বিষয়গুলিকে ক্রমশীল বলিয়াও জানা যায় না। অতীত মুহূর্ত্তের অভিজ্ঞতা-পুঞ্জকে কল্পনায় সঞ্জীবিত করিয়া বর্ত্তমানের সঙ্গে তাহাদের সংগঠনের ফলেই অভিজ্ঞতার বিষয়বস্তু, সুতরাং জ্ঞান প্রতিপদে কল্পনার সহায়প্রার্থী। কল্পনা যখন দেশকালের ঐক্যসঙ্গত রূপ পায়, তখনই আমরা তাহাকে বলি জ্ঞান। তাহার জন্য যেমন একপক্ষে বিষয়ীর প্রয়োজন, অন্যপক্ষে বিষয় না হইলেও তাহার চলে না। বস্তুতঃ, বিষয়হীন বিষয়ীর পরিচয় অভিজ্ঞতায় মেলে না, কাজেই বিষয়ীকেও আমরা পারমার্থিক সত্তা বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। যতদূর অভিজ্ঞতার প্রসার, যতদূর পর্য্যন্ত বিভিন্ন বিষয় সংশ্লেষণের ফলে জ্ঞানগোচর, ঠিক সেই পর্য্যন্তই আমরা বিষয়ীর কথাও জানি। সৃষ্টির সমস্ত রহস্য যেমন অনন্ত-প্রকাশমান, বিষয়ীর সম্পূর্ণতা ও ঐক্যও তেমনি ক্রমপ্রকাশমান, সে প্রকাশের কোনদিন শেষ হইবে বলিয়া আমরা কল্পনাও করিতে পারি না।

কাণ্টের জ্ঞানতত্ত্বকে প্রকাশ করিয়া এখন বলা চলে যে, অভিজ্ঞতা

হইতে জ্ঞানের স্বরু। অভিজ্ঞতা জ্ঞানের বিষয়বস্তু, কিন্তু অভিজ্ঞতায় সন্দেহ-প্রকাশ স্ববিরোধী। অভিজ্ঞতায় আমরা জগতের বৈচিত্র্যের পরিচয় পাই, কিন্তু সমস্ত বৈচিত্র্যই দেশকালের মধ্যে সীমাবদ্ধ। তাই বিশেষের অনন্ত বৈচিত্র্যের মধ্যেও দেশকালের ধর্ম্ম প্রকাশিত, এবং সেইজন্যই আমরা অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিতে পারি। বিষয়ী বিভিন্ন বিষয়ের সংশ্লেষণ করিয়া একই কালে আপনাকে ও জগৎকে জানে। তাই তাহার জ্ঞানও দেশকালের মধ্যে সীমাবদ্ধ, তাহার বাহিরে বিষয় ও বিষয়ীর কী যে রূপ, তাহারা এক কি বিভিন্ন, এ সমস্ত প্রশ্নই বুদ্ধির সীমানার বাহিরে।

৪

বিষয় ও বিষয়ীকে অভিজ্ঞতার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিয়া কাণ্ট সংযোজক সার্ব্বভৌম বাক্যের সম্ভাব্যতা প্রমাণ করিয়াছেন, কিন্তু যান্ত্রিকতার সঙ্গে মানবাত্মার স্বাধীনতার যে সংঘর্ষ, তাহার কোন সন্তোষজনক বিবরণ ইহাতে মেলে না। বিষয়ীকে অভিজ্ঞতার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিলে বিষয়ী দেশকালজ হইয়া পড়িতে বাধ্য, এবং তাহা হইলে দেশকালের স্বভাবের যে ঐক্য, তাহা বিষয়ীর প্রতিও প্রযোজ্য। তাহা হইলে কিন্তু বিষয়ীর স্বাধীনতার কোন অর্থ থাকে না, কারণ বুদ্ধি দেশকালের স্বভাবসঙ্গত যে ঐক্য অভিজ্ঞতার মধ্যে খুঁজিয়া পায়, তাহার মধ্যে স্বাধীনতা বা আকস্মিকতার কোন অবকাশ নাই। অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্য দেশকালজ নহে বলিয়াই সে বৈচিত্র্যের উপলব্ধি কার্য্যকারণ সম্বন্ধের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা না হইলে পর্য্যয়ের সংবেদনা[1] এবং সংবেদনার পর্য্যয়ের[2] মধ্যে কোন পার্থক্য থাকিত না। ফলে অভিজ্ঞতায় যে বিষয়ী আত্মপ্রকাশ করে, সে বিষয়ীর বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে কার্য্যকারণ সম্বন্ধ রহিয়াছে, তাহার প্রত্যেক অবস্থাই পূর্ব্ব অবস্থার কার্য্যফল মাত্র, কিন্তু তাহা হইলে কর্ত্তব্য অথবা নৈতিক স্বাধীনতার কোন অর্থই থাকে না। স্বভাবের নিয়মে যাহা ঘটে, তাহা তথ্য, কাজেই তাহাকে ভালো অথবা মন্দ বলা সমান অর্থহীন, স্বভাবের নিয়মশৃঙ্খলে কর্ত্তব্যের কোন স্থান নাই।

১। পর্য্যয়ের সংবেদনা = perception of succession.

২। সংবেদনার পর্য্যয় = succession of perceptions.

বিষয়ীকে দেশকালাধীন ভাবিলে তাই বিষয়ীর স্বাধীনতাকেও অস্বীকার করা হয়।

মানুষের দায়িত্ববোধ রক্ষা করিতে গিয়া কাণ্ট তাই বলিয়াছেন, অভিজ্ঞতায় যে জগৎ আমাদের কাছে প্রকাশিত, তাহার সর্ব্বত্রই পৌর্ব্বাপর্য্যের অলঙ্ঘনীয় শৃঙ্খল, তাই বিষয় এবং বিষয়ী উভয়েই সেখানে কার্য্যকারণের সম্বন্ধাধীন, কিন্তু সে জগতের পারমার্থিক কোন সত্তা নাই বলিয়া তাহার শৃঙ্খলাও কেবলমাত্র ব্যবহারিক। অভিজ্ঞতার এ জগৎ যে কেবলমাত্র ব্যবহারিক তাহার স্বপক্ষে কাণ্ট অনেক যুক্তি দিয়াছেন—তাঁহার ক্রিটিক ডের রাইনেন ফেরনুনফ্‌ট্‌ অথবা "অমিশ্র বুদ্ধির বিচার[১]" এই প্রশ্ন লইয়াই রচিত—কিন্তু তাহার মধ্যে কেবলমাত্র দুইটি যুক্তি আমরা এখানে লক্ষ্য করিতে পারি। কল্পনানিয়ন্ত্রণ করিয়াই আমাদের জ্ঞান, কিন্তু অনিয়ন্ত্রিত কল্পনাও দেশকালজ। অনিয়ন্ত্রিত কল্পনাও কিন্তু অভিজ্ঞতার সামগ্রী, তাই দেশ ও কাল অভিজ্ঞতাকে অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে না। অভিজ্ঞতার সর্ব্বত্রই দেশকালের ব্যবহার, সমস্ত অভিজ্ঞতার আধার হিসাবে তাহাদের ব্যবহারিক সত্তা তাই নিঃসন্দেহ, কিন্তু অভিজ্ঞতার মধ্যে সীমাবদ্ধ বলিয়া তাহাদের পারমার্থিক সত্তা সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না। কিন্তু কাণ্ট তাহা বলিয়া ক্ষান্ত হন নাই, তিনি বলিয়াছেন তাহাদের স্বভাব স্ববিরোধী বলিয়া দেশকালের পারমার্থিক সত্তা নাই। দেশকালের কথা ভাবিলেই তাহাদিগকে অসীম অথচ সম্পূর্ণ ভাবিতে হয়, তাহাদের স্বভাবের দুইদিকের এই বিরোধই প্রমাণ করে যে, তাহারা পারমার্থিক নহে কেবলমাত্র ব্যবহারিক।

দ্বিতীয়ত, অনিয়ন্ত্রিত কল্পনাও দেশকালজ বলিয়া কেবলমাত্র দেশকাল দিয়া আমরা বাস্তব অবাস্তবের পার্থক্য বুঝিতে পারি না। তাহার জন্য কল্পনা ও প্রত্যক্ষের পার্থক্যবোধ প্রয়োজন, অথচ কেবলমাত্র বিষয়বিচারে তাহা সম্পন্ন হয় না। মাতাল যখন বলে, গোলাপী ইঁদুর রাস্তা ভরিয়া ছুটাছুটি করিতেছে, তখন অভিজ্ঞতা হিসাবে তাহা প্রত্যক্ষ না কল্পনা সে কথা বলিবার কোন উপায় নাই। গোলাপী ইঁদুর বাস্তব কি অবাস্তব তাহা

১। অমিশ্র বুদ্ধির বিচার = Critique of Pure Reason.

জানিবার একমাত্র উপায় অন্যান্য অভিজ্ঞতার সঙ্গে তাহার সম্বন্ধবিচার। আমাদের অভিজ্ঞতার যে নিত্য পরিবর্ত্তন, তাহার মধ্যে কোনগুলির জন্য বিষয়ী নিজে দায়ী, কোনগুলি বিষয়জ, তাহা স্থির না করিতে পারিলে কল্পনার সঙ্গে প্রত্যক্ষের পার্থক্যবোধ অসম্ভব। তাই সংবেদনার পর্য্যয় ও পর্য্যয়ের সংবেদনার প্রভেদ-বোধকেই বস্তু-বোধ বলা যাইতে পারে, এবং কার্য্যকারণ সম্বন্ধের উপর তাহা প্রতিষ্ঠিত। পক্ষান্তরে, সত্য মিথ্যাও এই পার্থক্যবোধের সঙ্গে জড়িত, কারণ বস্তুবোধ না থাকিলে কল্পনার সাযুজ্যের সঙ্গে জ্ঞানের প্রভেদও লক্ষ্য করা যায় না। ফলে বস্তুবোধ বুদ্ধির এ পার্থক্য-বোধের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং সেই জন্য অভিজ্ঞতার জগৎও বুদ্ধি-তান্ত্রিক বলিয়া ব্যবহারিক। তাহাতে কিন্তু জগতের পারমার্থিক সত্তার আমরা পরিচয় পাই না, কারণ আমাদের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান সমপ্রসার এবং সে অভিজ্ঞতার মূলে রহিয়াছে বুদ্ধির বস্তুবোধ।

অভিজ্ঞতার জগৎ ব্যবহারিক বলিয়া তাহার শৃঙ্খলাও কেবলমাত্র ব্যবহারিক। কর্ত্তব্য-বোধে আমরা প্রত্যেকেই জানি যে মানবাত্মার স্বাধীনতা কিন্তু কেবলমাত্র ব্যবহারিক নয়। বিজ্ঞান যাহাই বলুক না কেন, প্রকৃতির নিয়মকে লঙ্ঘন করিয়া আমরা আদর্শ রচনা করি। বিজ্ঞান আমাদের পর্য্যবেক্ষণকে প্রসারিত করে কিন্তু পৃথিবীর পারমার্থিক সত্তাকে প্রকাশ করিতে পারে না। সৃষ্টির সেই পারমার্থিক সত্য কর্ত্তব্যবোধে আমাদের কাছে উদ্ভাসিত হয়, কারণ কর্ত্তব্যবোধ ব্যক্তির প্রবৃত্তিজাত বা কল্পনাপ্রসূত নহে, তাহা ব্যক্তির মধ্যে বুদ্ধির স্বকীয় স্বভাবের আবির্ভাব।

এ সমাধানে কিন্তু সমস্যার সমাপ্তি হয় না। একপক্ষে জ্ঞানের বিষয়ী হিসাবে ব্যক্তি অভিজ্ঞতার অন্তর্ভুক্ত এবং সেই কারণে যান্ত্রিকতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ। অন্যপক্ষে কর্ম্মের অধিকারী হিসাবে ব্যক্তি সমস্ত অভিজ্ঞতাকে অতিক্রম করিয়া পারমার্থিক সত্যস্বরূপ। কিন্তু কর্ত্তব্যের রঙ্গভূমিও এই পৃথিবী, কাজেই ব্যক্তির পারমার্থিক সত্তা প্রতিমুহূর্ত্তেই ব্যবহারিক জগতে ক্রিয়াশীল। এই কার্য্যকারণ সম্বন্ধ স্বীকার করিলে পারমার্থিক ও ব্যবহারিকের মধ্যে পার্থক্য রক্ষাও অসম্ভব। সমস্যাকে অন্যভাবে দেখিলেও এই একই ফল। জ্ঞানের বিষয়ীকে ব্যবহারিক ও কর্ম্মের অধিকারীকে পারমার্থিক মনে করার

অর্থ এই যে জ্ঞানের জগতের সঙ্গে কর্ম্মের জগতের কোন সম্বন্ধ নাই। তাহার ফলে জ্ঞানহীন কর্ম্ম ও কর্ম্মহীন জ্ঞান উভয়ই সমান অর্থহীন হইয়া দাঁড়ায়।

এ সমস্যার সমাধান কাণ্ট সৌন্দর্য্যের মধ্যে পাইয়াছেন। সুন্দরের শৃঙ্খলা ও প্রতিসাম্য সহজেই চোখে পড়ে, কিন্তু সুন্দর কেবলমাত্র সুশৃঙ্খলই নয়, স্বাধীনও বটে। তাহার স্বকীয়তাই তাহার প্রাণ। সুন্দর প্রমাণ করে যে শৃঙ্খলা ও স্বাধীনতা পরস্পরবিরোধী নহে, তাই একপক্ষে সুন্দর বিজ্ঞানের আদর্শ, অন্যপক্ষে তাহা কর্ত্তব্যের প্রতীক। সুন্দরের মধ্যে বুদ্ধি পরিতৃপ্ত, অর্থাৎ বুদ্ধির যে অভিযান, সুন্দরের মধ্যে তাহা আপনার সিদ্ধি খুঁজিয়া পায়। তাই সুন্দরকে বোধগম্য বলিলে অন্যায় হয় না, কেবল স্মরণ রাখিতে হয় যে, সুন্দর আপনাকে প্রকাশ করে বলিয়া তাহার বোধগম্যতাও স্বকীয়। এই বোধগম্যতাকে উপলব্ধি করাই বুদ্ধির আদর্শ—জ্ঞান, কর্ম্ম ও সুন্দরের ক্ষেত্রে তাই বুদ্ধির সাধনা একনিষ্ঠ। সেইজন্যই কিন্তু তাহাকে আর বুদ্ধি বলা চলে না—তাহাকে বলিতে হয় প্রজ্ঞা[১]।

জ্ঞানের ক্ষেত্রে ব্যবহারিক ও পারমার্থিকের অর্থও তাহাতে পরিষ্কার হইয়া উঠে। জ্ঞানও এক প্রকারের কর্ম্ম এবং বোধগম্যতার সাধনায়ই তাহার আরম্ভ। কিন্তু জ্ঞান কোনকালেই সম্পূর্ণ নয়, কোনকালেই সম্পূর্ণ হইতে পারে না, তাই আমাদের অভিজ্ঞতাও কোনদিনই সম্পূর্ণরূপে বোধগম্য নহে। বুদ্ধির এ সীমাবদ্ধ জ্ঞান প্রজ্ঞার সম্পূর্ণতার আদর্শকে পরিতৃপ্ত করিতে পারে না, তাই সে আদর্শের তাড়নায় বুদ্ধি চিরদিনই অশান্ত। প্রজ্ঞার সম্পূর্ণতার আদর্শ পারমার্থিক, কারণ তাহা প্রজ্ঞার স্বভাবেরই প্রকাশ এবং তাহার সঙ্গে তুলনায় বুদ্ধিলব্ধ জ্ঞান ব্যবহারিক।

পক্ষান্তরে কর্ম্মের ক্ষেত্রেও জ্ঞান নহিলে চলে না, কিন্তু মানুষের জ্ঞান অসম্পূর্ণ। তাই কর্ম্ম সর্ব্বদাই জ্ঞানকে অতিক্রম করিয়া যায়, কিন্তু সে অভিযানও প্রজ্ঞার আদর্শের প্রয়োজনে। প্রজ্ঞার আদর্শ কিন্তু তাহার স্বকীয় স্বভাবেরই প্রকাশ, তাই কর্ম্ম যখন কর্ত্তব্যবোধপ্রণোদিত, তখন তাহা

১। প্রজ্ঞা = Reason.

পারমার্থিক সত্যকেই প্রকাশ করিতে চাহে, কিন্তু জ্ঞান অসম্পূর্ণ বলিয়া মানুষের কর্ম্ম ব্যবহারিকই থাকিয়া যায়।

জ্ঞান ও কর্ম্মের এ ঐক্য সাধনে কাণ্ট যান্ত্রিকতার সঙ্গে স্বাধীনতার সমন্বয় সাধন করিয়াছেন। জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয়েই প্রজ্ঞার স্বকীয় বোধগম্যতাকে প্রকাশ করিতে চাহে, অসম্পূর্ণ বলিয়া উভয়েই কেবলমাত্র আংশিকভাবে সফলকাম। সুন্দরের বোধগম্যতা প্রজ্ঞার স্বকীয় বোধগম্যতারই পূর্ব্বাভাস, তাই সুন্দরের মধ্যে বোধগম্যতার সন্ধান পাইয়া বুদ্ধি এবং ইচ্ছা উভয়েই উৎসাহিত। জ্ঞান ও কর্ম্মের সাধনার সফলতার আশ্বাস সুন্দরের মধ্যে নিহিত, তাই সুন্দরকে বলা হয় ইন্দ্রিয়ের মধ্যে ইন্দ্রিয়াতীতের আবির্ভাব।

হুমায়ুন কবির
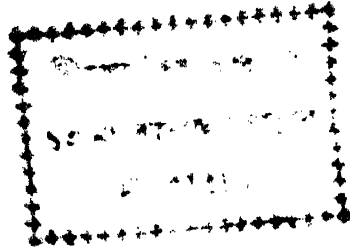
প্রাচীন ভারতে উৎসব ও ব্যসন*

নানাকারণে আমাদের জীবনসংগ্রাম কঠোর হইতে কঠোরতর হইতেছে, অন্নসমস্যা সমাধানের দুশ্চিন্তায় আমরা অবসন্ন। আনন্দের সরস উৎস একপ্রকার শুকাইয়া আসিয়াছে, উৎফুল্ল জীবনের উপভোগ আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। উৎসবের দিনগুলি যেন ক্রমেই সঙ্কুচিত হইয়া আসিতেছে। প্রাচীন যুগে যে কত উৎসব ছিল তাহার পরিচয় আমাদের পালি ও সংস্কৃত সাহিত্যে পাই, "বার মাসে তের পার্ব্বণের কথা" মনে হয়, আর ভাবি সেই সরস সজীব প্রাণের স্পন্দন কি আর আমরা অনুভব করিব না ?

শুভক্ষণ, শুভ মুহূর্ত্ত, শুভদিন দেখিয়া উৎসবের অনুষ্ঠান করা হইত, সেইজন্য উৎসবের নাম ছিল "ক্ষণ," পালিতে "ছণ", যেমন "অথ একদিবসম্ নগরে ছণম্ সজ্জয়িংসু" (জাতক নম্বর ৪২১), "তদা জম্বুদ্বীপে গিরগ্‌গ—সমজ্জসদিসম্ মহন্তম্ ছণম্ ঘোসয়িংসু—"(জাতক ৪৩৭), ইত্যাদি। পর্ব্বতের উপরিভাগে বৃহৎ উৎসব অনুষ্ঠিত হইত। আজকাল ইয়ুরোপের গিরি-সঙ্কুল দেশে গিরিশিরোভাগে উৎসব অনুষ্ঠানের সংবাদে আমরা বিমোহিত হই, আর দুঃখ করি সেই দেশের লোকেরা জীবনকে সত্যই উপভোগ করিতে জানে, আর আমাদের জীবন যেন অলস, শিথিল, রসচাঞ্চল্য-বিরহিত! কিন্তু আমাদেরও ওইরূপ উৎসব ছিল। "সমজ্জ" কথাতেই তাহার আভাস পাই। এই "সমজ্জে" উৎসবের মত্ততায় আমাদের রুধিরে বিদ্যুৎ-প্রবাহ বহিত, খাদ্য পানীয়ের প্রাচুর্য্যে আমাদের দৈহিক সম্ভোগের বিরাম ছিল না, মদিরা ও কবিতা, উভয়বিধ রসের উৎস উৎসরিত হইত, অনাগত ওমর খৈয়ামের স্বপ্নের আবেশ নয়নপক্ষ্মে বিরাজিত থাকিত। লতাপুষ্প-সজ্জিত বিপণি, সুরভিত বারুণী ও নানাবিধ রসনাতৃপ্তিকর মাংসে পরিপূর্ণ থাকিত, আধুনিক রেস্তোরাঁ বা ভোজনালয়. অপেক্ষা তাহার আকর্ষণী-শক্তি হয়তো কম ছিল না।

*এই প্রবন্ধের উপাদান মূলতঃ কয়েকখানি পালি গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত।

পালিতে 'সমজ্জ', সংস্কৃতে 'সমজ্যা', ইহার অর্থ, বহুজনের সমাবেশ। উৎসবে জনসঙ্ঘের সমাবেশ হইত। হরিবংশে দেখি শ্রীকৃষ্ণ বিল্বোদকেশ্বর-দেবের সম্মানার্থ এক সমাজের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, সেই উৎসবে শতশত প্রকারের অন্ন, ব্যঞ্জন ও মাংস পরিবেশিত হইয়াছিল। মহাভারতে দেখি পাণ্ডবগণের অস্ত্র-শিক্ষা সমাপ্ত হইলে দ্রোণাচার্য্য তাঁহাদের অস্ত্রচালন-নৈপুণ্য দেখাইতে চাহিলেন। তখন "অস্ত্র-শিক্ষা-দর্শন-বিধায়িনী রঙ্গভূমি নির্ম্মিত হইল, ...ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি চাতুর্ব্বণ্য লোক রাজকুমারদের অস্ত্রশিক্ষাদর্শনার্থী হইয়া রাজধানী হইতে দ্রুত গমনে তথায় আগমন করিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল মধ্যে রঙ্গভূমিতে প্রবেশার্থী বহুতর দর্শকবর্গের সমাগম হইল, তৎপরে বাদ্যকরেরা মৃদু-মধুর রবে বাদ্য করিয়া দর্শকমণ্ডলীর কৌতূহল উৎপাদন করিতে লাগিল। অভ্যাগত লোকের কোলাহলে সেই সমাজ-মন্দির উচ্ছলিত মহা সমুদ্রের ন্যায়—বারম্বার প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।" দ্রৌপদীর স্বয়ংবরে মহোৎসব হইয়াছিল, তথায় সূত, মাগধ, বৈতালিক, নট, নর্ত্তক ও নানাদেশীয় যোদ্ধবর্গ সমাগত হইয়া নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছিল। সংস্কৃত সাহিত্যে দেখা যাইতেছে যে এই সমাজে গীত, বাদ্য, নৃত্য, অভিনয়, মল্লযুদ্ধ ও অস্ত্র-নৈপুণ্য দর্শকবর্গের শ্রোত্র ও নয়নের এবং খাদ্য ও পানীয় তাহাদের রসনার তৃপ্তি সাধন করিত।

পালিসাহিত্যে দুইপ্রকার সমাজের উল্লেখ দেখি। একে মাংসের জন্য প্রাণিবধ হইত, অপরে হইত না। নির্দ্দোষ আমোদের বিষয় ছিল নৃত্য, গীত, বাদ্য, আখ্যানকথন, বেতাল (যন্ত্রবাদ্য), বাঁশবাজি, ইন্দ্রজাল দর্শন, দণ্ডযুদ্ধ, মুষ্টিযুদ্ধ, মল্লযুদ্ধ (কুস্তি), অস্ত্রযুদ্ধ, অভিনয় ইত্যাদি। দীঘনিকায়ে এইগুলির উল্লেখ আছে, তদ্ব্যতীত হস্তিযুদ্ধ, অশ্বযুদ্ধ, মহিষযুদ্ধ, ঋষভযুদ্ধ, অজাযুদ্ধ, মেণ্ডকযুদ্ধ, কুক্কুটযুদ্ধ, এবং বট্টকযুদ্ধের উল্লেখও দেখি। শেষোক্ত যুদ্ধগুলিকে কেহ নির্দ্দোষ বলিবেন, কেহ বলিবেন নির্দ্দয় ও দোষযুক্ত। গ্রীকগণের বিবরণ হইতে জানা যায় যে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্য এইরূপ পশুযুদ্ধ দেখিতে ভালবাসিতেন। ক্ষত্রিয় নৃপতিগণ এই প্রকার আমোদের পক্ষপাতী ছিলেন। কৌটিল্য তাঁহার অর্থশাস্ত্রে রাজাকে সমাজ, উৎসব, বিহার এবং দেবযাত্রা করিয়া প্রজার প্রীতিবর্দ্ধন

করিতে উপদেশ দিতেছেন। কলিঙ্গরাজ খারবেলের হাতীগুম্ফা অনুশাসন এবং গৌতমীপুত্র শাতকর্ণির নাসিকগুহার অনুশাসনে সমাজ ও উৎসব অনুষ্ঠানের উল্লেখ দেখা যায়। আর একবিধ সমাজে তীক্ষ্ণ সুরাপান, মাংসভোজন, দ্যূতক্রীড়া, প্রেম-আলাপন প্রভৃতি হইত। উচ্চ-পদস্থ রাজকর্ম্মচারিগণ এই উৎসবে যোগ দিতেন, তাহাদিগকে বিশিষ্ট আসন দেওয়া হইত। প্রতিবৎসর পাটলিপুত্রের উৎসবে দুই প্রকার 'সমাজ'ই অনুষ্ঠিত হইত। প্রথম প্রথম অশোক এই উৎসবের অনুমোদন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার অভিষেকের নবম বৎসরে কলিঙ্গের রুধিরাপ্লুত রণক্ষেত্রের মর্ম্মন্তুদ দৃশ্য তাঁহাকে জীবহিংসায় বিরত করিল। গির্ণার অনুশাসনে তিনি আজ্ঞা প্রচার করিলেন, "ইধ ন কিঞ্চি জীবম্ আরভিৎপা প্রজূহিতব্যম্ ন চ সমাজো কতব্যো, বহুকম্ হি দোসং সমাজম্ হি পসতি দেবানম্ প্রিয়ো প্রিয়দসি রাজা। অস্তিপিতু একচা সমাজা সাধুমতা দেবানম্ প্রিয়স প্রিয়দসিনো রাঞো"। যে সমাজে মাংসের জন্য প্রাণিহত্যা হইত না, তিনি তাহার অনুমোদন করিতেন, সম্ভবতঃ তিনি পশুযুদ্ধও বারণ করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত কাশীপ্রসাদ জয়সওয়ালের মতে 'একচা'র অর্থ 'একত্য,' অর্থাৎ 'একজনের'। মানুষে মানুষে, পশুতে পশুতে, মানুষে পশুতে যুদ্ধ হইত, তাহার অবসান হইত রক্তপাত বা মৃত্যুতে, করুণ-হৃদয় অশোক ইহা নিবারণ করিয়াছিলেন, কিন্তু যেখানে একজন মানুষ বা একটি পশু খেলা দেখাইত, তাহা নিবারণ করেন নাই। মনে হয় পরবর্ত্তী-কালে ভারতের ক্ষত্রিয়োচিত রাজগণ উৎসবে উভয়বিধ সমাজের অনুমোদন করিতেন। দশহরার দিন রাজপুতগণ ঘটা করিয়া মহিষ বধ করেন। মোগল সম্রাটগণ পশুযুদ্ধ দেখিতে ভালবাসিতেন। আর যে দেশে অহিংসার বালাই নাই, তথায় এই প্রকার উৎসব পূরাদমে চলে। বাইরণের Childe Harold-এ পড়ি স্পেনের ঋষভবধে নরনারীর আনন্দের সীমা থাকে না, ঋষভ-হন্তা মাটাডোরের রক্তমাখা ছুরিকা দেখিয়া তাহাদের রক্ত চঞ্চল হয়। শেক্ষপীরের নাটকে দেখি, "Bear baiting? That's meal and drink to me!" Bull baiting, Bear baiting, Cock fighting ইত্যাদি তখনকার লোকে পছন্দ করিত।

নক্ষত্র দেখিয়া উৎসব দিন নির্দ্ধারিত হইত বলিয়া উৎসবের অপর নাম ছিল 'নক্ষত্র', বা "নক্ষত্র-ক্রীড়া" (আরাম-দূসক ও ভেরীবাদ-জাতক)। বিমানবত্থু-অট্ঠকথাতে এই উৎসবদিনে রাজ-গৃহনগরের শোভা বর্ণিত হইয়াছে (বি. ব. অ., ১, ১৫):—"একদিন রাজ-গৃহনগরবাসিগণ ঘোষণা করিল, সপ্তাহকাল নক্ষত্রক্রীড়া হইবে। পথগুলি সুমার্জ্জিত হইল, তদুপরি বালুকা বিকীরিত হইল, পঞ্চবিধ লাজপুষ্প আস্তৃত হইল। প্রতি গৃহদ্বারে কদলী বৃক্ষ ও পূর্ণ ঘট স্থাপিত হইল, নানা বর্ণের পতাকা অনিলস্পর্শে হিল্লোলিত হইল। সকলেই রুচির বেশভূষা ও অলঙ্কারে ভূষিত হইল। সুশোভিত নগর যেন অমরাবতীর রূপ ধরিল। জনগণরঞ্জনের নিমিত্ত নৃপতি বিম্বিসার অনুচর পরিবৃত হইয়া ঐশ্বর্য্য ও মহিমার জ্যোতিঃতে সর্ব্বদিক ভাস্বর করিয়া নগর প্রদক্ষিণ করিলেন।" সুসীম জাতকেও এইরূপ বর্ণনা পাই। বাতমিগ জাতকে একটা করুণ দৃশ্য দেখিতে পাই — রাজগৃহে এই উৎসব দিনে এক অনুপস্থিত পুত্রের জনক-জননী রজত পেটিকা খুলিয়া দেখিতেছেন যে যে অলঙ্কার বেশভূষা তাঁহাদের পুত্র এই উৎসব দিনে পরিত, তাহাতে পেটিকা পূর্ণ, কিন্তু তাঁহাদের গৃহ শূন্য!

সুরা উৎসবের উল্লেখ পাওয়া যায় (সামি, পুব্বে ইমস্মিন্ কালে সুরা ছণো নাম হোতি)। কুম্ভজাতকে (নং ৫১২) পড়ি যে শ্রাবস্তীতে সুরা উৎসব ঘোষিত হইলে পঞ্চশত রমণী তাঁহাদের স্বামিগণের উৎসব ক্রীড়ার অবসানে তীক্ষ্ণ সুরা সংগ্রহ করিয়া বলিলেন, আমরাও উৎসব ক্রীড়া করিব, ইত্যাদি।

বিমানবত্থু অট্ঠকথার একস্থানে আছে যে রাজগৃহে সপ্তাহকাল-ব্যাপী উৎসবের সংবাদ ঘোষিত হইলে এক শ্রেষ্ঠী তাঁহার ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি নক্ষত্র-ক্রীড়া করিবে, না কাজ করিবে?" তাহাতে সে বলিল, "প্রভু, উৎসব ধনীর জন্য, আমার ঘরে কাল খাইবার যবাগূ তণ্ডুল নাই, 'নক্ষত্রে আমার কি প্রয়োজন (সামি, নক্খত্তং নাম সধনানং হোতি, মম পন গেহে স্বতিনায় যাগু-তণ্ডুলানি নত্থি, কিম্ মে নক্খত্তেন)"? কিন্তু অন্যত্র দেখি যে উৎসবের জন্য প্রয়োজন হয়

না দৌলত্, প্রয়োজন হয় দিল্! গঙ্গমাল জাতকে দেখি যে এক গরীব মজুর জল তুলিয়া (উদকভতিং কত্বা) অর্দ্ধমাসক অর্জ্জন করিয়াছিল, আর এক দুর্গতা নারী ভিক্ষা করিয়া অর্দ্ধমাসক সংগ্রহ করিয়াছিল, উৎসব-ক্ষেত্রে দুইজনের দেখা হইল, দুইজনের প্রাণের মিলে ধনের মিল হইল, এই একমাসক লইয়া তাহারা মাল্য, গন্ধ, পুষ্প, ও তীক্ষ্ণ সুরা কিনিতে চাহিল!

উৎসবে হস্তকৌশল, ভোজবাজি, সাপ-খেলানো দেখানো হইত, সস্ত্রীক নট নাচিয়া, ভেরীবাদক ভেরী বাজাইয়া, (শঙ্খবাদক শঙ্খ বাজাইয়া উৎসব-স্থানকে মাতাইয়া রাখিত। অহিগুণ্ডিক, ভেরীবাদক, শঙ্খধমন প্রভৃতি জাতক ও থেরীগাথায় (৫৩, সুজাতা) ইহার পরিচয় পাই।

জৈনকল্পসূত্রে তীর্থঙ্কর মহাবীরের জন্মদিনে কিরূপ উৎসব হইয়াছিল তাহার উল্লেখ আছে। মহাবীরের পিতা ক্ষত্রিয় সিদ্ধার্থ প্রভাতসময়ে নগর-রক্ষিগণকে বলিলেন, "হে দেবপ্রিয়গণ, আজ কুণ্ডপুরের সুদিন, অবিলম্বে বন্দিগণকে কারাগার হইতে মুক্ত কর, ওজন ও মাপ বাড়াইয়া দাও, সহর ও সহরতলীগুলিকে পরিষ্কৃত কর, জলসিঞ্চনে পথের ধূলা শমিত কর, যেখানে তিনটি বা চারিটি রাস্তা মিলিয়াছে সেই স্থানগুলি এবং চতুষ্ক ও সিঙ্ঘাটক-গুলিকে ধূলিবর্জ্জিত ও সুমার্জ্জিত কর, স্থানে স্থানে বেদী নির্ম্মাণ কর, বিবিধ-বর্ণের ধ্বজা পতাকা, এবং সুচিত্রিত চন্দ্রাতপ দ্বারা নগরকে সুশোভিত কর, ভিত্তি গাত্রে গোশীর্ষ, রক্তচন্দন এবং দর্দ্দরদ্বারা পঞ্চাঙ্গুলি (জর্ণাল অব বিহার ও উড়িষ্যা রিসার্চ সোসাইটীতে প্রকাশিত মল্লিখিত Impression of Five Fingers প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য) রচনা কর; তোরণনিম্নে ও দ্বারে দ্বারে মঙ্গল-কলস স্থাপন কর, সহস্র সহস্র স্তম্ভ নির্ম্মাণ কর, ফুল্লকুসুমদামে মাল্যরচনা করিয়া সর্ব্বত্র নগরকে শোভিত কর। নট, অভিনেতা, মল্লযোদ্ধা, মুষ্টি-যোদ্ধা, ভাণ্ড (ভাঁড়), গায়ক, আখ্যায়ক, বাজিকর, উৎসবে যোগদান করুক।" খুঁটির উপর দড়ি বাঁধিয়া তাহার উপর নৃত্য হইত, গানের সঙ্গে করতালি দিয়া তাল রাখা হইত, যাহারা এই কার্য্যে সুদক্ষ ছিল তাহাদের নাম ছিল তালাচার।

পালি সাহিত্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি উৎসবের উল্লেখ পাইয়াছি :—

সব্বরত্তিচারো, বা সব্বরত্তিবারো উৎসব—ধম্মপদ অত্থকথাতে ইহার একটি বর্ণনা আছে। "কার্ত্তিক মাসের পূর্ণিমা রাত্রে বৈশালী নগরী ধ্বজ-পতাকায় শোভিত হইল। সমস্ত রাত্রি উৎসব চলিল। বংশী, ভেরী, তূর্য্য ও নানাবিধ বাদ্যযন্ত্রের শব্দে নগরী ধ্বনিত হইতে লাগিল। বৈশালীর সাত সহস্র সাত শত সাত রাজা ও সম-সংখ্যক যুবরাজ (বৈশালী কিন্তু রাজ্য ছিল না, oligarchic republic ছিল) ও সেনাধ্যক্ষ উত্তম সজ্জায় সজ্জিত হইয়া উৎসবে যোগদান করিবার নিমিত্ত নগরে প্রবেশ করিলেন।" সংযুক্ত নিকায়েও (১. ৯.) ইহার উল্লেখ আছে।

জাতকে (১১৮, ১৪৭, ১৫০, ২৭৬, ও ৫২৭ নং) এক কত্তিকা উৎসবের বর্ণনা আছে—"অনন্তর নগরে কার্ত্তিকক্ষণের ঘোষণা হইল; কার্ত্তিক পূর্ণিমাতে সকলে নগর সাজাইল। সূর্য্য অস্ত যাইলে এবং পূর্ণচন্দ্র উদিত হইলে দেবনগরের মত অলঙ্কৃত নগরে সর্ব্বদিকে দীপ জ্বলিয়া উঠিল। তেজস্বী তুরগবাহিত রথে আরোহণ করিয়া, অমাত্যগণ-পরিবৃত, সর্ব্বালঙ্কার-প্রতিমণ্ডিত, যশোভূষিত রাজা নগর প্রদক্ষিণ করিলেন।"

ধম্মপদ অত্থকথাতে "সাধারণ উৎসব দিবসের" উল্লেখ পাই। এই দিনে সাকেতনগরের যে সকল পরিবার সাধারণতঃ ঘরের বাহির হন না, তাঁহারা অনুচরসঙ্গে গৃহ হইতে বহির্গত হন এবং নগ্ন হইয়া পদব্রজে নদীতীরে আসেন। অধিকন্তু এই দিনে অভিজাত কুলের যুবকগণ পথিপার্শ্বে দাঁড়াইয়া থাকেন, এবং সমতুল্য কুল ও বংশের সুন্দরী কুমারীকে দেখিলে তাহার শিরোদেশে কুসুমমাল্য নিক্ষেপ করেন।

সংযুক্ত নিকায়ে পড়ি (১. ৪. ২২৮) যে পঞ্চশালা নামক ব্রাহ্মণগ্রামে উচ্চবংশের কুমারীরা সুসজ্জিত বেশে এক স্থানে সমবেত হইতেন, যুবকগণও একত্র হইতেন এবং উভয়ের মধ্যে পুষ্প ও উপহার এবং উৎসব-পিষ্টকের বিনিময় হইত। Mrs. Rhys Davids তাঁহার Book of Kindred Sayings নামক সংযুক্ত নিকায়ের অনুবাদগ্রন্থে (P. T. S., Pt. I. p. 143 foot note-এ) বলেন—"The festival was a kind of St. Valentine's Day।" শালক্রীড়া বা শালবনে ক্রীড়া সম্ভবতঃ ইহার অনুরূপ উৎসব।

পূর্ব্বোক্ত উৎসবগুলিতে যুবকযুবতীর মিলন হইত, এবং যুবকগণ মনোমত কন্যা বাছিয়া লইয়া তাহাদিগকে বিবাহ করিত। এই প্রসঙ্গে আসামের বিহু উৎসব উল্লেখযোগ্য। অতি প্রাচীনকাল হইতে এই উৎসব চলিয়া আসিতেছে এবং আসামীগণ ইহাকে তাঁহাদের নিজস্ব ও অনন্যসাধারণ উৎসব বলিয়া মনে করেন। 'বিহু' সংস্কৃত বিষুবের আসামী রূপ। বিষুব অর্থাৎ মহাবিষুব সংক্রান্তিতে যখন এক বৎসর গত হইয়া নববর্ষের আরম্ভ হয়, তখন এই উৎসব হয়। ইহা একপ্রকার বসন্তোৎসব এবং এই উৎসবে যুবক তাহার জীবনসঙ্গিনী বাছিয়া লয়। মিঃ এন্, কে বরুয়া সম্প্রতি বিহু উৎসবের এক বর্ণনা দিয়াছেন। বিহুটুলিতে পুরুষগণ একদিকে এবং স্ত্রীলোকগণ অপর দিকে মুখোমুখি দাঁড়ায়। পুরুষগণ ঢোল বাজায়, স্ত্রীলোকগণ নৃত্য করে। গীতে যুবকযুবতীর অনুরাগ বর্দ্ধন করে, যুবকগণ নিজ নিজ সঙ্গিনী বাছিয়া লইয়া নৃত্য করে। যুবক এক কলি গাহিয়া অনুরাগ জ্ঞাপন করে, যুবতী আর কলি গাহিয়া তাহার অনুরূপ অনুরাগ বা বিরূপ বিরাগ জ্ঞাপন করে। মনের মিল হইলে নৃত্যের পর যুবকযুবতীর ভাবী সম্বন্ধ ঘোষণা করা হয় ও কিছুকাল পরে বিবাহ হয়। পূর্ব্বে গ্রামের লোকেরা বিহুটুলিতেই নিজ নিজ পত্নী বাছিয়া লইত। বরুয়া ভিনিসে প্রচলিত Feast of the Marys'-এর সহিত বিহু উৎসবের তুলনা করিয়াছেন। ভিনিসের রীতি অনুসারে বৎসরে একদিন স্থির করিয়া সেই দিনে বিবাহযোগ্যা কন্যাগণকে একত্র করা হইত, সেইখানে যুবক তাহার জীবন-সঙ্গিনী বাছিয়া লইত।

পালিসাহিত্যে আর একটি উৎসবের উল্লেখ আছে, তাহা বাল-নক্খত্ত বা মূর্খের উৎসব। শ্রাবস্তীতে এই উৎসব হইত। উৎসব-দিনে মূর্খ ব্যক্তিগণ সর্ব্বাঙ্গে ছাই ও গোবর মাখিয়া, সাতদিন ধরিয়া রাস্তায় রাস্তায় অশ্লীল ও 'চুয়াড়ি' কথা কহিয়া ফিরিত। এই সময়ে লোকে উচ্চনীচ-সম্পর্ক-জ্ঞান হারাইত; আত্মীয়, বন্ধু, জ্ঞাতি বা শ্রমণগণকে শ্রদ্ধা করিতনা, এমন কি লোকের বাড়ী গিয়া খেউড় কথা কহিয়া সকলকে অপমানিত করিত। যাহারা এই 'চুয়াড়ি' সহ্য করিতে পারিতনা, তাহারা নিজেদের আর্থিক সঙ্গতিমত এক আধটা কার্ষাপণ ফেলিয়া দিয়া তাহাদিগকে বিদায়

করিত। পয়সা পাইয়া তাহারা অন্যত্র যাইত। এই উৎসব-দিনগুলিতে সংযমের কোনও বালাই থাকিতনা। এমন কি ভদ্রমহিলাগণও এই মজাদার দৃশ্য দেখিবার লোভ সামলাইতে না পারিয়া গৃহের বাহিরে আসিতেন। ধম্মপদ-অত্থকথায় পড়ি—"এই উৎসবের সময়ে, যে ভদ্রপরিবারের কন্যাগণ কখনো বাহিরে আসেন না, তাঁহারা অনুচর সঙ্গে লইয়া পদব্রজে নদীতে স্নান করিতে যান। সেইজন্য ঐ দিনে সামাবতী পঞ্চশত অনুচরী সঙ্গে লইয়া একেবারে রাজপ্রাসাদের অঙ্গন অতিক্রম করিয়া নদীতে স্নান করিতে গেলেন।" এই সামাবতী মহাশ্রেষ্ঠী ঘোষকের কন্যা, ইহাকে দেখিয়া রাজা উদয়ন (উদেন) প্রেমে পড়েন।

এই "বালনক্ষত্রের" সহিত 'হোলি' বা 'ফাগুয়া' উৎসবের অশ্লীল দিকটার সাদৃশ্য আছে। হোলি উৎসব নববর্ষের উৎসব, পুরাতন বর্ষের মরণ ও নববর্ষের জীবন সঞ্চারকে আধার করিয়া এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। পাপ, গ্লানি, কলুষ-কালিমা মুমূর্ষু বৎসরের দ্যোতক, একজনের ঘাড়ে তাহা চাপাইয়া তাহাকে সাতদিন ধরিয়া যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে দিয়া অবশেষে হত্যা করা হইত। এই সময়ে রাজা যেন রাজকার্য্য হইতে অবসর লইতেন, আর এই কৃত্রিম রাজা দলবল লইয়া অশ্লীল গান গাহিয়া ও চুয়াড়ি করিয়া রাস্তায় রাস্তায় ফিরিত। অধ্যাপক ল্যাঙ্‌ডন্ প্রাগৈতিহাসিক সুমেরীয়গণের Sacae নামক এক উৎসবের উল্লেখ করিয়াছেন। এই উৎসব শরৎকালে হইত। শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার লিখিয়াছেন, "It was in autumn that the New Year Festival was celebrated by the Sumerians, when there was a carnival of the Lord of Misrule, and men and women were free to indulge in what may be said to be far from moral practices...during the five or six days of the festival a pseudo-king was set up ; he moved about on the streets with a merry retinue, defying all rules of social decorum and decency."

সুমেরীয়গণের বৎসর শরৎকালে আরম্ভ হইত। প্রাচীন ভারতেও

আমাদের বৎসর বর্ষাতে আরম্ভ হইত, তজ্জন্য বৎসরের অপর নাম বর্ষ। অন্য প্রবন্ধে দেখাইয়াছি যে এক এক সময়ে সকল ঋতুতেই বৎসর আরম্ভ হইত। দুর্গোৎসবও কোনও একটি নববর্ষের দ্যোতক। শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন যে মাসের মধ্যে আমি প্রথম, অর্থাৎ মার্গশীর্ষ, এই মাস হইতে নববর্ষ বা হায়ণ আরম্ভ হইত বলিয়া ইহার নাম অগ্রহায়ণ।

শ্রীযুক্ত মজুমদার বলিয়াছেন যে দুর্গাপূজার নবমীর দিনে বাঙ্গালার গ্রামে এক সময় অশ্লীল গান গাওয়া হইত। হোলি উৎসবে আমাদের হোলির রাজা আছে, আর এই 'অরাজক' রাজার কল্যাণে (প্রতাপে) শ্লীলতার বাঁধ থাকে না। বিহারে তো কথাই নাই। অশ্লীল গান, অঙ্গভঙ্গী ইত্যাদির কথা অনেকে জানেন। সব অন্যায়ই সেদিন সহ্য করিতে হয়, "আরে, হোলি হ্যায়" বলিলেই সব শুদ্ধ হইয়া গেল! ওরাঁওগণ হিন্দুদের নিকট হইতে ফাগুয়া উৎসব ধার করিয়া তাহাদের নিজস্ব খাড্ডি বা সারহুল উৎসবের সহিত মিলাইয়া দিয়াছে। সারহুল উৎসব হইতেছে শাল পুষ্পের উৎসব। বসন্তের আগমনে বনে বনে শালতরু পুষ্পিত হইয়া উঠে ; যুবক যুবতীর মনে মনে অনুরাগ পুষ্পিত হইয়া উঠে। ওরাঁওরা মনে করে সূর্য্যের সহিত পৃথিবীর এই সময় বিবাহ হয়। নৃত্যক্ষেত্রে স্ত্রীলোকগণের গায়ে জল দিলে তাহারা নৃত্য করে ও সঙ্গে সঙ্গে অশ্লীল গান গাহে ও ইতর ভাষায় গালাগালি করে। এই সময় যৌনযোগ অবাধ হইয়া পড়ে, পৃথিবীর উর্ব্বরতার জন্য ইহার প্রয়োজন। "The licentiousness permitted on this occasion is believed to stimulate the fertility of the earth।" কুৎসিত গালাগালিও বিঘ্ননাশক, এই প্রবন্ধে তাহার ব্যাখ্যা করা অসম্ভব।

ছত্রমঙ্গলদিবসে সমূহ নগর সজ্জিত হইয়া দেবনগরের মত দেখাইত। কৃষকগণ হলচালনে উৎসব করিত। গাভীর বৎস হইলেও উৎসব হইত।

নগরগণিকা—বিমানবত্থু অট্‌ঠকথায় রাজগৃহের গণিকা সিরিমার উল্লেখ আছে, তাঁহার দৈনিক 'ফী' ছিল সহস্রকার্ষাপণ (সিরিমা নাম গণিকা, দেবসিকম্ সহস্‌সম্ গণ্‌হন্তি)। বিম্বিসার ও অজাতশত্রুর রাজবৈদ্য জীবকের তিনি ভগ্নী ছিলেন। জীবক স্বয়ং গণিকাপুত্র ছিলেন। সিরিমা আটজন

ভিক্ষুকে অন্ন দিতেন (অট্ঠ সলাকাভত্তানি পট্ঠপেসি)। তিনি পীড়িত হইলেন, অল্পকালের মধ্যে তাঁহার মৃত্যু হইল। এক ভিক্ষু তাঁহার প্রেমে পড়িয়া শীর্ণ হইয়া পড়িতেছিলেন। বুদ্ধদেব এই প্রেমরোগের অদ্ভুত ঔষধ বিধান করিলেন। সুন্দর দেহের কি বীভৎস পরিণতি হয় তাহা দেখাইবার নিমিত্ত তিনি রাজাকে বলিয়া পাঠাইলেন, "সিরিমার দেহ জ্বালাইও না, শ্মশানে রাখিয়া দাও, কাক শৃগালে না খাইতে পারে তাহার ব্যবস্থা কর।" তাহার পর সেই স্ফীত, পূতিগন্ধময়, ক্রিমিকীট-পরিপূর্ণ দেহকে নীলামে চড়াইলেন, অর্দ্ধকার্যাপণ দিয়া, এমন কি বিনামূল্যেও, কেহ সেই দেহ কিনিল না, সে প্রেমক্লিন্ন বিরহী ভিক্ষুও নয়!

কুরুধম্ম ও বিধুরপণ্ডিত জাতক হইতে জানা যায় সে রাজসভায় একাদশ ব্যক্তির মধ্যে এবং রাজপ্রাসাদে, গণিকার স্থান ছিল। আর একটি জাতকে (নং ৪১৫) দেখি যে অমাত্য, ব্রাহ্মণ ও গৃহপতির সহিত গণিকাও রাজসভায় স্থান পাইতেন। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে বিধান আছে যে, রাজা রূপযৌবন ও শিল্প-সম্পন্না গণিকাকে বার্ষিক সহস্র কার্যাপণ দিয়া নিযুক্ত করিবেন। সরভঙ্গ জাতকে দেখি যে, রাজা গণিকাকে যথোচিত সম্মান দিতেন এবং প্রয়োজন হইলে তাঁহাকে স্থানচ্যুত করিতেন। গণিকাও প্রতিজ্ঞা পালন করিতেন। একটি জাতকে (নং ২৭৬) দেখি যে এক গণিকা এক ব্যক্তির নিকট সহস্র কার্যাপণ লইয়া তাঁহার জন্য তিন বৎসরকাল অনন্যভোগ্যা হইয়া অপেক্ষা করিয়াছিলেন, তিনি ফিরিয়া আসিলেন না, গণিকার আর্থিক অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়িল, তখন তিনি গণিকাধ্যক্ষের অনুমতি লইয়া নিজ ব্যবসায় অবলম্বন করিলেন।

অর্থশাস্ত্রে দেখি যে গণিকা স্নানাগার ও শয্যাগারের ভৃত্য, সম্বাহক ও মালিনীরূপে নিযুক্ত হইতেন এবং রাজাকে পুষ্প, গন্ধ, মাল্য প্রভৃতি দিতেন।

কণবের জাতকে দেখি যে গণিকা শ্যামা বারাণসীর রাজার অত্যন্ত প্রিয়পাত্রী ছিলেন। তিনি অপরূপ লাবণ্যময়ী ছিলেন। নগর-শোভিনী সুলসা একরাত্রির জন্য সহস্র কার্যাপণ লইতেন (জাতক নং ৪১৯, সহস্‌সেন রত্তিং গচ্ছতি)। গণিকার বৃত্তির কিয়দংশ রাজস্বরূপে গৃহীত হইত। মহাবগ্‌গে দেখি (৮. ১. ২. ৩) যে বৈশালীর সুন্দরী গণিকা অম্বপালীর

রূপলাবণ্য অন্যদেশের অর্থ আকর্ষণ করিয়া বৈশালীর সম্পদ বৃদ্ধি করিত। রাজগৃহের অর্থশোষণ নিবারণ করিবার নিমিত্ত নিগম-সভা নৃপতি বিম্বিসারকে সালাবতী কুমারীকে গণিকা করিতে বাধ্য করিলেন। (অথ খো রাজগাহকো নেগমো সালাবতীম্ কুমারীম্ গণিকম্ বুট্ঠাপেসি)।

থেরী গাথাতে অম্বপালী যে গাথা রচনা করিয়াছেন, তাহা মর্ম্মস্পর্শী, তাহার সাহিত্যিক সৌন্দর্য্যও অপূর্ব্ব। তিনি বুদ্ধদেব ও ভিক্ষুগণকে তাঁহার উদ্যান উপহার দেন। তিনি যত্ন করিয়া তাঁহাদিগকে খাওয়াইতেন। সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া তিনি সঙ্ঘে প্রবেশ করিয়া ভিক্ষুণী হন। গণিকাগণ ধর্ম্মের জন্য অনেক অর্থদান করিতেন। গ্রীক Hetaira (hetaera)-র (যথা Aspasia, Lais, Phryne ; যদিও Aspasia প্রকৃত প্রস্তাবে গণিকা ছিলেন না) সহিত তাহাদের তুলনা হইতে পারে। বাৎস্যায়ণের কামসূত্রে বারনারীর রূপ ও গুণের পরিচয় পাওয়া যায়। নয় শ্রেণীতে তাঁহারা বিভক্ত, গণিকা প্রথম শ্রেণীর। রাজা, অমাত্য, বিদ্বান, অভিজাতবর্গ ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ তাঁহাদের সঙ্গলিপ্সু ছিলেন। মৃচ্ছকটিকে দেখি যে উচ্চ ব্রাহ্মণ-বংশীয় কিন্তু দরিদ্র চারুদত্ত রূপগুণবতী বসন্তসেনাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। দশকুমার চরিতে দণ্ডী গণিকাগণের শিক্ষার আলোচনা করিয়াছেন। নৃত্য, গীত, বাদ্য, অভিনয়, চিত্রলিখন, কৃত্রিম পুষ্পরচনা, সুগন্ধি দ্রব্য প্রস্তুত করা ও মনোজ্ঞ বাক্‌কুশলতা তাঁহাদিগকে তো শিখিতেই হইত, অধিকন্তু ন্যায়, ব্যাকরণ, অল্প দর্শনশাস্ত্র তাঁহাদের অধ্যায়নের বিষয় ছিল। কলা ও শিল্প তাঁহাদের অবশ্য-শিক্ষনীয় ছিল। তাঁহারা ক্রীড়া-কুশলাও ছিলেন। সুবেশা, মনোজ্ঞা, বিদুষী, কমনীয়া, সুহাসিনী, বাক্‌চতুরা, চারুভাষিণী রূপযৌবনসম্পন্না কামিনীর সঙ্গ যে কাম্য হইবে, কিমত্রচিত্রং ? জৈনগ্রন্থ কথাকোষে দেখি যে, এক সুরসিক রাজার প্ররোচনায় মাগধিকা নাম্নী এক কিশোরী গণিকা কুলবালক নামক এক নিরীহ সন্ন্যাসীকে রূপ-জালে জড়াইয়া রাজ সমক্ষে উপনীত করিয়াছিলেন। রাজা কুণিক (কোণিক, অজাতশত্রু) এক বুদ্ধিমতী গণিকার সাহায্যে বৈশালী জয় করিয়াছিলেন। দামোদরগুপ্তের কুট্টনীমতম্, কল্যাণমল্লের অনঙ্গরঙ্গ, ক্ষেমেন্দ্রের সময়মাতৃকা প্রভৃতি গ্রন্থে গণিকা সম্বন্ধে অনেক সংবাদ পাওয়া যায়।

অট্‌ঠানজাতকে দেখি এক শ্রেষ্ঠিপুত্র এক গণিকাকে ভালবাসিত ও তাহাকে বহু অর্থ দিয়াছিল। কিন্তু একদিন যথাসময়ে এক সহস্র কার্ষাপণ আনিতে না পারায় হৃদয়হীনা গণিকা তাহাকে অর্দ্ধচন্দ্র দিয়া বিদায় করিয়াছিল। তক্করিয় জাতকে দেখি এক গণিকা এক শ্রেষ্ঠিপুত্রকে উলঙ্গ করিয়া পথে নিক্ষেপ করিয়াছিল।

গণিকাগণ পুত্রের আদর করিতনা, সদ্যোজাত পুত্রকে শ্মশানে বা আবর্জ্জনা-স্তূপে বিসর্জ্জন করিত। কুমারপেতবত্থুতে (পেতবত্থু-অট্‌ঠকথা, ৭, ৫) পাই—"সা চ নং জাতমত্তম্ এব দারকো তি ঞত্বা সুসানে ছড্‌ডাপেসি।" মহাবগ্‌গে (৮, ১৪) দেখি—"সালাবতী গণিকা…পুত্তম্ বিজায়ি… দাসীম্ আণাপেসি; ইমম্ দারকম্ সঙ্কারকূটে ছড্‌ডেহীতি।" বৈদ্যশ্রেষ্ঠ জীবক ও মহাশ্রেষ্ঠী ঘোষক গণিকাপুত্র ছিলেন।

বিমানবত্থু—অট্‌ঠকথায় দেখি (১, ১৫) যে এক নারী পঞ্চদশ-দিবসের জন্য পুণ্যব্রত (পুঞ্ঞ্‌ঞকমম) গ্রহণ করিয়াছিলেন। নিরুপদ্রবে পুণ্যকর্ম্ম সাধনের জন্য তিনি পিতার নিকট হইতে উপযুক্ত অর্থ সংগ্রহ করিয়া সেই অর্থে রাজগৃহের রূপবতী গণিকা সিরিমাকে গৃহে আনিয়া নিজস্থলাভিষিক্ত করিলেন।

শ্রীকালীপদ মিত্র

পুরানো কথা
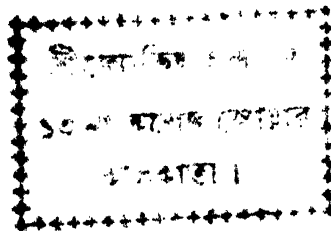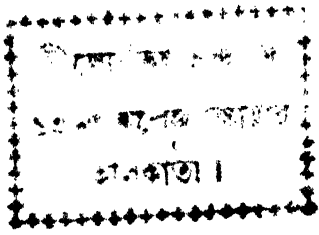
(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

জীবনযাত্রার আরম্ভে এই যে বছরে সাত মাস ঘর-সংসার মাথায় করে গাছতলায় গাছতলায় ঘুরে কাটালাম, এইটাই হল আমার Post graduate পাঠাভ্যাস। নইলে ও সব বালাই ত আর বিশ্ববিদ্যালয়ে হয় নেই!

মনের মতন কলেজ জুটল। বিশাল বিদ্যায়তন, শিক্ষক অগণন, শিক্ষাও শতমুখী। কত কি যে শিখলাম, তা বলে শেষ করা যায় না! তবে এইটুকু বলতে পারি যে, এতদিন জল্পনা-কল্পনা, বাদানুবাদ, তর্ক-বিতর্কের কুয়াসার মাঝে যে মূর্ত্তি আবছায়ার মত আসা-যাওয়া করছিল, সে মূর্ত্তি আজ দিব্যজ্যোতিঃ-মণ্ডিত হয়ে পরিপূর্ণ গৌরবে এসে দাঁড়াল আমার মনের পটে। আমি ধন্য হলাম। কার অদৃষ্টে কোথায় দেবীদর্শন লেখা থাকে, তার কি কিছু স্থিরতা আছে!

যাক্, ঠাকুর-দেবতার কথা নিয়ে জটলা করে কাজ নেই। আমার ক্যাম্প-জীবনের গল্প করি, শুনুন। ক্যাম্প বললেই হয়ত আপনাদের মনে আসবে গ্রাম থেকে বহুদূরে, নদীর কিনারে নিরালায়, আমবনের ঘনছায়ার মাঝে, ধবধবে সাদা সারিসারি তাম্বুর চিত্র। কিন্তু সে হল বড় বড় সাহেব-সুবোর ডেরার ছবি। আমাদের তাম্বুগুলো একে ত ছিল বেশীর ভাগ Second-hand (পুরানো), তায় আবার বার কতক তোলা ফেলার পরে তাদের সর্ব্বাঙ্গে ধূলোকাদার ছাপ পড়ে যেত। তাদিকে দুগ্ধফেননিভ কি রজতশুভ্র বলার কোন উপায় ছিল না। তারপর, ছায়াবীথি-তলে তাম্বু খাটান, তাও প্রথম বছর-দুই বড় একটা হয়ে উঠত না। ছাপ্পান্ন সংবতের অনাবৃষ্টির ফলে অধিকাংশ গাছের পাতা সব শুকিয়ে ঝরে পড়েছিল। দু-তিনটা বর্ষাকাল লাগাল গাছগুলোর পূর্ব্বশ্রী ফিরে আসতে। দু-চার বার নদীর ধারে ডেরা করেছি বটে, তবে পাঁচ ছয় দিন অন্তর নূতন নূতন নদী আর কোথায় পাব ঐ পাথর বালির দেশে! ওরই মধ্যে একটু

ছায়া আছে এই রকম দেখে তাম্বু তুলতে হত। তাও আবার সব সময় হয়ে উঠত না পানীয় জলের হাঙ্গামে। কাছাকাছি গোটা দুই ভাল কুয়ো আছে দেখে তবে মামলৎদার (Sub-deputy) সাহেব ক্যাম্পের জায়গা পছন্দ করে দিতেন। নইলে অতগুলো মানুষ ঘোড়ার জল আসবে কোথা থেকে! সুতরাং সব সময় গ্রাম থেকে বহুদূরে নিরালায় বাসও সম্ভব হত না। কখন কখন সারারাত গ্রামের কুকুরগুলোর কোরাস্ শুনতাম। মেজাজটা আপনা হতেই সকাল নাগাদ হাকিম-জনোচিত হয়ে উঠত।

ক্যাম্পের ভেতরের ব্যবস্থার কথা বলি শুনুন। এক পাশে আমাদের নিজের বসবাসের দুটো বড় তাম্বু থাকত। অন্য পাশে, প্রায় একশো কদম তফাতে, আমার কাছারী ও আমলাদের দপ্তরের জন্য দুটো মাঝারি গোছের তাম্বু খাটান হত। মাঝখানের জায়গাটায় থাকত চাকর-বাকরদের ছোট ছোট পালগুলো, কানাত-ঘেরা রান্নার স্থান, আর গাড়ী ঘোড়া। এই এতগুলো তাম্বু, সমস্তই জোগাতে হত আমাকে। সেই বাবতে সরকারের কাছ থেকে tentage বলে মাসে এগার টাকা কয়েক আনা পেতাম। পট্টাবাসের বহর ত শুনলেন, কিন্তু যতদূর সম্ভব সময়টা কাটিত বাহিরে গাছতলায়, কি বড় জোর তাম্বুর বারান্দায়। চাকর বাকর ত সব পড়ে থাকত খোলা হাওয়াতে। খুব শীত না পড়লে পালের ভেতর কেউ ঢুকত না। আর আমার al fresco হেঁশেলে পাঁউরুটী কেক্ থেকে আরম্ভ করে সব জিনিসই রান্না হত। অতিথি-অভ্যাগত কেউ থাকলে আবার আমার পাচক ফরাসী ভাষায় menu লিখে টেবিলে লাগিয়ে দিত। কিন্তু খাওয়াটা হত হয়ত গাছতলায়!

এ সব হিসেব দিচ্ছি fair weather-এর—অর্থাৎ যখন দেবতা পরিষ্কার। কিন্তু মাঝে মাঝে ঝড়-তুফান বৃষ্টিবাদলও ত হত! আকাশে মেঘ উঠলেই সামাল সামাল রব উঠত। চাকর-বাকরেরা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কাঠের mallet (মুগুর) নিয়ে তাম্বুর খুঁটোগুলোর মাথায় ঠকাঠক্ ঠুকতে লেগে যেত। যদি তেমন তেমন দেখত, ত বড় বড় সওয়াই রশির ডগাগুলো সমস্ত গাছের গুঁড়িতে জড়িয়ে বেঁধে ফেলত। প্রত্যেক তাম্বুর চারধারে ছোট-খাটো একটা পরিখা খুঁড়ে মাটিটা ঢালু করে দিত কানাতের

গোড়ায়। সময় থাকতে এই সব ব্যবস্থা করে ফেলতে পারলে ভেতরে বৃষ্টির জল একটুও ঢুকতে পারত না। ঝড়-তুফানে আমার তাম্বু কখনও সত্যিসত্যি ভূমিসাৎ হয় নেই, তবে সময়ে সময়ে এমন হয়েছে যে ভেতরে হাওয়া ঢুকে তাম্বুর থামগুলোকে এমন নাচাতে সুরু করেছে যে আমরা ভয়ে বাহিরে পালিয়ে গেছি। এ রকম সময়ে সব চেয়ে হুসিয়ার থাকতে হত বাতিগুলোকে নিয়ে। খড়-পাতা মেজে, তার উপর একটা বাতি উল্‌টে পড়লেই ত লঙ্কা-কাণ্ড! তখনকার দিনে বিজলীর টর্চ্চ্‌ ছিল না। থাকলে ঝড়-বৃষ্টিতে আমাদের বড় সুবিধা হত।

বৃষ্টি-বাদলকে বরং বাগান যেত, কিন্তু সবচেয়ে বিপদ হত বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসের কাঠ-ফাটা রৌদ্রে। আগেই বলেছি আহমদাবাদে দুভিক্ষের বছর গাছের পাতা সব ঝরে পড়ে গেছল। কাজেই তাম্বুর মাথার উপর ছায়া বড় একটা পাওয়া যেত না। তারপর বালির দেশ, এগারটা বাজতে না বাজতে লু ছুটত। বেলা একটা থেকে তিনটে অবধি তাম্বুর ভেতরটা দারুণ তেতে উঠত। অথচ ঐটাই ছিল বিশ্রামের সময়। কি করা যায়, খস-খস কি জওয়াসার (camel thoran-এর) টাটি ভিজিয়ে ভিজিয়ে রেখে তাপটা একটু সহনীয় করে নেওয়া হত। দিবানিদ্রা একটা ব্যসন, তা আমি মানি। কিন্তু আমার কোন উপায় ছিল না। আমার সহুরে পাঠক-মণ্ডলী হয়ত ভাবছেন, "ওঃ, এর নাম তুমি চাকরি করতে! সারা বিকেলটা ঘুম!" কিন্তু আমার নিবেদনটা একটু শুনে নিন্। তার পর, ইচ্ছা হয় রাগ করবেন। আমি রোজ (রবিবার ছাড়া) সকাল বেলা সাড়ে পাঁচটার সময় ঘোড়া কি উটের পিঠে বেরিয়ে পড়তাম। গড়-পরতা দুটো গ্রাম দেখে, কিছুক্ষণ বা শিকারের ধান্দায় ঘুরে, ডেরায় ফিরতাম বারোটার কাছাকাছি। একটু ঠাণ্ডা হয়ে স্নান ভোজনাদি শেষ করতে একটা বেজে যেত। তার পরে যদি খানিকক্ষণ বিশ্রাম না করতাম, তা হলে বিকেল বেলায় কাছারীতে কলম পেষার কাজ, কি মোকদ্দমা মামলার কাজ, সব গুলিয়ে যেত। সেও ত আপনাদেরই কাজ, ভাল করে না করলে আপনারাই নারাজ হতেন। তাই বলছিলাম, একটা থেকে তিনটে ছুটি না নিয়ে উপায় ছিল না।

একবার কিন্তু এই দিবানিদ্রা দিতে গিয়ে ভারী জব্দ হয়েছিলাম। সেদিন বেজায় গরম ছিল—তাপ ১১৬° ডিগ্রীরও বেশী। আমার ক্যাম্পে ফিরতে অনেক বেলা হয়ে গেছল। মোকদ্দমা-মামলা কিছু হাতে ছিল না। শুধু গোটা কয়েক ইন্‌কম্ টেক্সর আপিল ছিল। তা সেগুলোর ত মা বাপ নেই—পুরোপুরি কাজির বিচার—বেশী সময় নিত না। তাই দেরী করে আপিসে বসব বলে দিয়ে খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়লাম। ক্যাম্পটা ছিল বিশ্রী জায়গায়। চারিদিকে ক্রোশের পর ক্রোশ নোনা মাটির ময়দান ধু-ধু করছে। গাঁয়ের কাছাকাছি তিনটে আধমরা নিমগাছের মাঝে আমার জন্য একটা বড় তাম্বু কোন রকমে খাটান হয়েছিল। মাঠের উপর দিয়ে হু-হু করে লু বইছে। ভিজে টাটির কাছে মাথা রেখে শুয়েছি। কতক্ষণ ঘুমিয়েছি জানি না। হঠাৎ জেগে উঠলাম। মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা। গলার উপর, বুকের উপর কে যেন দুমণ পাথরের বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে। চেয়ে দেখি মাথার কাছের টাটিটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে, আর তার ভেতর দিয়ে ঝলকে ঝলকে আগুনের মত গরম হাওয়া ঢুকছে। পাশে একখানা তোয়ালে পরেছিল, সেইটে তাড়াতাড়ি টব্-এ ডুবিয়ে নিয়ে মাথায় জড়িয়ে আবার শুয়ে পড়লাম। কপালের জোরে মাথায় বুদ্ধিটা এল, তাই কয়েক মিনিটে সামলে গেলাম। নইলে আপনাদিগকে পুরানো কথা শোনাবার সৌভাগ্য হত না। যে চাকরটার উপর টাটিতে জল দেওয়ার ভার ছিল সে বেচারা ঘুমিয়ে পড়েছিল। তার সেই রাত্রে খুব জোরে জ্বর এল, কিন্তু সেও বেঁচে গেল শেষ পর্য্যন্ত।

ক্যাম্প জীবনে অসুখ-বিসুখ, বিপদ-আপদ, শোক-তাপ, সবই পোহাতে হয়েছিল। সে ত মানুষকে সর্ব্বত্রই পোহাতে হয়। ইংরেজিতে একটা কথা আছে—All in the day's work—ও সবই নিত্য কর্ম্মের অঙ্গ। কিন্তু এই গাছতলায় বাসের মধ্যে যে মজা আছে, যে রস আছে, তা রাজপ্রাসাদেও নেই। আপনারা সবাই ত picnic, (বনভোজন) করতে যান, কেঁউ কেউ শিকার উপলক্ষেও বাহিরে গেছেন, তাতে কত মজা, তা সকলেই জানেন। কিন্তু দিনের পর দিন কাঁথার ঘরে বাস, দিনের পর দিন বনভোজন, দিনের পর দিন শিকার, এ আনন্দের তুলনা নেই।

ছেলেবেলায় আমরা সবাই রোদে বৃষ্টিতে হুটোপাটি করে বেড়াতে ভালবাসি। তখন কেউ ঘরে বসে থাকতে বললে রাগ হয়। কিন্তু একটু বয়স হলেই কি যেন হয়ে যায়! আর কেউ হাত পা নাড়তে চাই না। তখন জন দশেকে জটলা করা তক্তাপোশে বসে জীবনের একটা বড় জিনিস হয়ে দাঁড়ায়। এটা কেন হয় আমাদের? সাহেবদের ত হয় না! এভারেষ্ট-অভিযান ইত্যাদি বড় কথা না হয় ছেড়ে দিচ্ছি। কিন্তু জ্যৈষ্ঠ মাসের রৌদ্রেও বারাকপুর পার্কে দেখতে পাই সারাদিন সাহেব মেমেরা গল্‌ফ্‌ খেলে বেড়াচ্ছে। বোধ হয়, আমরা প্রাচীন সাত্ত্বিক জাত বলে নিশ্চল নিষ্ক্রিয় ভাবটা বড় ভালবাসি। কিন্তু এ সত্ত্বগুণের মাঝে খাবি খাওয়ার কি শেষ নেই? হেমচন্দ্র ত অনেক কাল আগে লিখেছিলেন—যাও সিন্ধুনীরে ভূধর শিখরে, গগনের গ্রহ তন্ন তন্ন করে, বায়ু উল্কাপাত বজ্রশিখা ধরে, ইত্যাদি ইত্যাদি। কই, আজও ত কোন ফল হল না! আমি politics-এর কথা বলছি না—যাক্‌ গে, এ সব বড় ব্যাপারের গবেষণা করে কাজ নেই, নিজের গল্পই বলি।

আমাদের এই দীর্ঘ বনপ্রবাস যদি শুধু অশ্বারোহণ ও মৃগয়াতেই কাটত, তাহলে এত মজা লাগত না, দুদিনে অরুচি ধরে যেত। কিন্তু এর সঙ্গে যে কাজ মেশান ছিল, সেই কাজটাই যে romance-এ ভরা! সত্যি কিছু করতে পারি আর নাই পারি, মনে ত হত যে গরীব-দুঃখীর সেবা করছি প্রবলের অত্যাচার থেকে দুর্ব্বলকে রক্ষা করছি। এ আদর্শের জন্য মানুষ ত চিরদিনই কত দুঃখ কষ্ট সহ্য করে এসেছে! অবশ্য আমি এ কথা বলছি না যে আমাদিকে কোন যথার্থ কষ্ট সহ্য করতে হত। বরং মনিবের আদেশ ও ব্যবস্থা ছিল যে আমরা কতকটা আমীরী চালে ঘুরে বেড়াই। কারও এই চাল সম্বন্ধে ত্রুটী হলে আমাদের কালে কমিশনার ডেকে কান মলে দিতেন। আমার নিজের গোলযোগ একটু অন্য রকমের ছিল। চাল ছোট হওয়ার কোন সম্ভাবনা ছিল না। সে রকম শিক্ষা দুজনার কেউই ছোট বেলায় পাই নেই। ফলে, মাইনে যা পেতাম, তাতে খরচ কুলাত না। অনেক দিন পর্য্যন্ত বাড়ী থেকে নানা প্রকার সাহায্য নিতে হত।

উপরে কমিশনার কান মলে দেওয়ার কথা যে বলেছি, কথাটা খুব সত্য। কমিশনারদের প্রধান কাজই ছিল জেলায় জেলায় ঘুরে দেখা মেজিষ্ট্রেট সাহেবদের চাল বজায় আছে কি না। তবে তাঁরা যে কেবল গুরুমহাশয়-গিরি করতেন, তা নয়। সকল রকমের বাচ্চা সিবিলীয়ানদের মুরুব্বী ছিলেন। কারও ঘোড়া নেই ঘোড়া জোগাচ্ছেন, কারও বাসন-কোসন কেনা হয় নেই বাসন ধার দিচ্ছেন, এ কত বার দেখেছি। লীলী সাহেবের গল্প গেল বারে অনেক শুনেছেন। এই সাহেব সপ্তাহে সপ্তাহে যে প্রকাণ্ড বড় খানা দিতেন, তা আজকালকার এই ফোপর দালালীর দিনে বড় একটা দেখা যায় না। কমের কম, সাত কোর্স খানা ও সাত রকম মদ দিতেন। আমার আর এক কমিশনার ছিলেন কেনেডী সাহেব। তিনি লীলীর চেয়েও সেকেলে মানুষ ছিলেন। দিল্লীকে বলতেন—ডেল্-হাই, কানপুরকে বলতেন—ক-অ-ন্-পোরী। সে ভদ্রলোকের বাড়ী খানা খেতে গেলে, গুড্ বাই বলবার সময় চার পাঁচটা হাবানা চুরুট,—"নিয়ে যাও, গোটা কয়েক নিয়ে যাও!" বলে পকেটে গুঁজে দিতেন। চুরুট-গুলো আজকের দিনে অন্ততঃ পাঁচ টাকা করে দাম হবে।

কেনেডীদের একটা গল্প বলি। আমি তখন কোলাবা জেলায়। কি জরুরী কাজের জন্য কলেক্টর সদরে ডেকেছিলেন। কাজ শেষ করে নিজের ক্যাম্পে ফিরছি। ধরমতরী ষ্টেশনে জাহাজে উঠে দেখি, কমিশনার দম্পতি বসে রয়েছেন। তাঁরা বোম্বাই যাচ্ছেন। বৃদ্ধা কেনেডী গিন্নী তৎক্ষণাৎ আমার স্ত্রীকে নিজের আঁচলে বেঁধে নিয়ে বসলেন, আর ঠায় দুটি ঘণ্টা নানা রকম সদুপদেশ দিলেন, "দেখ, তুমি কখন তোমার স্বামীকে ফেলে পাহাড়ে পালাবে না। আজকালকার মেয়েদের ঐ এক বাতিক হয়েছে—গরম, গরম। কোথায় গরম! তোমার স্বামীই যদি ঐ হাওয়াতে আট-দশ ঘণ্টা খাটতে পারে, ত তুমি ঘর বন্ধ করে পাখার নীচে পড়ে থাকতে পার না! তোমার কর্ত্তব্য হচ্ছে, ঘর দোরের ব্যবস্থা ঠিক রাখবে, লোকটা যাতে পেট ভরে পোষ্টাই খাবারটা খেতে পায় সেইটে দেখবে।" আপনারা হাসবেন না। সে যুগের মেমসাহেবরা সত্যি এই রকম বুদ্ধিহীন বেরসিক ছিলেন। অজ—বুর্জোয়া! সে যাক্, কেনেডী মেমের কিন্তু

যেমন কথা তেমনি কাজ। দুপুরবেলা টিফিন-টুকরী খুলে স্বামীকে তথা আমাদিকে দিব্যি উপাদেয় টিফিন খাওয়ালেন। সাহেব তাঁর চির অভ্যাস মত গোটা কয়েক চুরুট গুঁজে দিলেন আমার পকেটে। আমাদের নামবার কথা ছিল করঞ্জা বন্দরে। কিন্তু সেখানে যখন পৌঁছলাম, দেখা গেল যে সমুদ্র বেশ গরম, জাহাজ থেকে lighter নৌকায় নামা একটু কঠিন। মেমসাহেব আমার স্ত্রীর মুখের পানে চেয়ে কি বুঝলেন জানি না, কিন্তু তৎক্ষণাৎ স্বামীকে বললেন, "বব্! এই ঢেউয়ের মাঝে এদের এখানে নেমে কাজ নেই। মেয়েটির লেগে-টেগে যাবে।"

সাহেব একটু হেসে উত্তর দিলেন, "অল্ রাইট, ডিয়ার!" তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন, "দেখ, তুমি এই জাহাজেই বোম্বাই চল। কাল সকালে তোমার ক্যাম্পে যেও।"

আমার ভারী ফূর্ত্তি হল, কিন্তু খুব নম্রভাবে বললাম, "কিন্তু, মশায়, তাহলে আমার জেলার বাহিরে রাত্রিবাস হবে যে! আমার মেজিষ্ট্রেট সাহেবের অনুমতি নেওয়ার ত সময় নেই, তিনি বড় বিরক্ত হবেন।"

কেনেডী জোরে আমার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললেন, "আমি তোমার মেজিষ্ট্রেটকে লিখব এখন যে আমার অনুমতি নিয়ে তুমি বোম্বাই যাচ্ছ।"

বোম্বাইয়ে মেমসাহেব তাঁর নিজের গাড়ী করে আমাদিকে হোটেলে পৌঁছে দিলেন, খুব আনন্দে বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে সন্ধ্যাটা কাটালাম। আশ্রিত-বৎসল না হলে বড় সাহেব কিসের!

আশ্রিতবাৎসল্যের আর একটা গল্প বল্ব? ব্যাপারটা কিন্তু বে-আইনী। তা হোক্ গে, এখন ত আর চাকরী যাওয়ার ভয় নেই! একবার বড়দিনের ছুটীতে আমি কলকাতায় এসেছি। চাকর-বাকর মাল-পত্র সব আহমদাবাদ সদরে রেখে এসেছি। দোসরা জানুয়ারী ফিরে ক্যাম্পে যাওয়ার কথা। কোন কারণে (ঠিক অনিবার্য্য কারণ বলা যায় না) কলকাতায় একদিন আটকে পড়লাম। কিন্তু দোসরা না ফিরলে নানা গোলযোগ। বড় দিনের ছুটীর সঙ্গে কিছু casual leave জুড়ে দেওয়া যায় না, জমীদারী সেরেস্তায় ছাড়া! আমার কর্ত্তাকে তার করলাম, "আটকে পড়েছি। ছুটীর একটা ব্যবস্থা করবেন।" তেসরা তারিখে সকালবেলায় আহমদাবাদ

ষ্টেশনে গাড়ী পৌঁছবামাত্র এক পত্র পেলাম, "এখানে নেমো না। সোজা চলে যাও সাণন্দ ষ্টেশনে। তোমার ক্যাম্প পয়লা তারিখে সেইখানে পাঠিয়েছি।" চলে গেলাম সাণন্দ। ক্যাম্পে পৌঁছে শুনলাম বড় সাহেব আমার সেরেস্তাদারকে হুকুম করে দিয়েছেন যে, দোসরা জানুয়ারী থেকে যেন সব কাগজ-পত্রে আপিসের ঠিকানা সাণন্দ ক্যাম্প দেখান হয়। এক গোয়ালের গরু ত! হলই বা একটা সাদা, একটা কালো!

আমার সেরেস্তাদার কাগজ-পত্রে কি ভাষায় সাহেবের অনুপস্থিতি না ব্যক্ত করে সাণন্দে ক্যাম্পের অবস্থান দেখালেন, তা এখন ভুলে গেছি। তবে এঁরা এক এক সময়ে আশ্চর্য্য-রকমের শব্দ-যোজনা করতেন! একবার আমি ঘোড়া থেকে বড় জোর পড়া পড়েছিলাম। দিন পাঁচ সাত বিছানায় শুয়ে থাকতে হয়েছিল। যেদিন নানা রকম পটী-টটী মেরে প্রথম আপিসে উপস্থিত হলাম, সেরেস্তাদার রাও সাহেব একখানা কাগজ সহি করবার জন্য আমার সম্মুখে রাখলেন। পড়ে দেখলাম কাগজখানা একটা চালু ফৌজদারী মোকদ্দমার রোজনামা। যে তারিখে আমি ঘোড়া থেকে পড়ে গেছলাম, সেই তারিখে এক endorsement (মন্তব্য) রয়েছে—"On this date a crisis occurred. The Honourable Court fell over a horse. Postponed sine die."

আমি গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করলাম, "এটা আমাকে সই করতে হবে! আচ্ছা মশায়, fell over a horse, লিখলেন কেন?"

রাও সাহেব অম্লানবদনে উত্তর দিলেন, "হুজুর ঘোড়াসুদ্ধ পড়েছিলেন কিনা, তাই fell over লিখলাম।"

আমি ইংরেজী অব্যয়গুলোকে বড় ডরাই। চুপ করে গেলাম। আমার অশ্বকোবিদ বলে খ্যাতি বিংশ শতাব্দীর মহাভারতে লিপিবদ্ধ হয়ে গেল, যদিচ ভাষাটা আর্ষপ্রয়োগ।

যখন ঘোড়ার কথাই উঠল, আপনাদের সঙ্গে আমার "সুলতান"-এর পরিচয় করে দিই। সুলতানের পৃষ্ঠে চড়েই আমার হাকীমী জীবনে প্রথম প্রবেশ ঘটেছিল। আপনারা ধৈর্য্য ধরে ওর গল্পটা শুনবেন।

বিলেত থেকে জাত-হাকীম হয়ে এসেছি ভেবে আমার আত্মীয়-

স্বজন আমাকে এক দামী ওয়েলার ঘোড়া কিনে দেবার জোগাড় করেছিলেন। কলকাতায় আমি পৌঁছতেই এক সুন্দর সুঠাম ওয়েলার কব্ এল আমার জন্য আড়গড়া থেকে। ঘোড়াটি দেখে আমার ভারী আনন্দ হল। কিন্তু পিঠে চড়বামাত্র বুঝলাম যে, এ এক আনকোরা তাজা জানোয়ার, ভাল করে ব্রেক করাই হয় নেই। আমাকে নিয়ে কলকাতার রাস্তায় ও গড়ের মাঠে নানা প্রকার তাণ্ডব-নৃত্য নেচে শেষ বজ্জাতী করে এক গাছের গুঁড়িতে ঢুঁ মেরে আমার পা দুখানা ভেঙ্গে দেবার যথাসাধ্য চেষ্টা করলে। কোনক্রমে হাড়গোড়গুলো রক্ষা করলাম। সে-যাত্রা ওয়েলার ঘোড়া আমার অদৃষ্টে জুটল না। আহমদাবাদ পৌঁছে একটা কম দামী ঘোড়ার সন্ধান করতে লাগলাম। পাঠকের মনে আছে ত, গুজরাতে তখন ভীষণ দুর্ভিক্ষ! তাই আশা ছিল সস্তায় একটা ভাল country-bred (দেশী) ঘোড়া পাব।

একদিন সকাল বেলা দুজন রাজপুত এক কাঠিয়াবাড়ী ঘোড়া নিয়ে উপস্থিত হল। তারা বললে, "সাহেব, তুমি সওয়ারীর জন্য ভাল ঘোড়া খুঁজছ শুনলাম। এ আমাদের আপন ঘরজাও ঘোড়ো (গৃহজাত অশ্ব)। এর বাপ-মা দুই খাঁটি কাঠিয়াবাড়ী জানোয়ার। আমীর লোকের সওয়ারীর উপযুক্ত ঘোড়া, সাহেব!"

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "তাহলে তোমরা একে বেচছ কেন?"

দুজনের মধ্যে যে বড় সে ভারী গলায় উত্তর দিলে, "সাধ করে বেচ্ছি না, হুজুর। দুকাল পড়ায় তিনটে জানোয়ারকে খেতে দিতে পারছি না। তাই এর মা আর ছোট বোনকে ঘরে রেখে একে সহরে বেচতে এসেছি।" বেচারাদের চোখ ছল্‌ছল্ করে এল।

ঘোড়াটিকে বেশ করে দেখলাম। সর্ব্বাঙ্গসুন্দর! নিখুঁত গড়ন, ঘোর বাদামী রঙ, কপালে সাদা টিকা, লম্বা কোঁকড়া কোঁকড়া কেশর, লেজ পায়ের ক্ষুর অবধি লুটিয়ে পড়েছে। কিন্তু সব চেয়ে চমৎকার চোখ দুটি, ঠিক যেন হরিণীর নয়ন! আমার এক বিশেষজ্ঞ বন্ধু এসে নানা রকম পরীক্ষা করে রায় দিলেন, কোন আয়েব নেই। একশো টাকায় সওদা হয়ে গেল। মালিক দুজন কিন্তু তখনই চলে গেল না। অনুমতি নিয়ে সারাদিন আস্তাবলে বসে রইল ঘোড়ার কাছে। সন্ধ্যাবেলা তার

গলা জড়িয়ে কত কাঁদলে, কানে কানে কত কি বললে, কত চুমু খেলে, তারপর চোখ মুছতে মুছতে চলে গেল। যাবার সময় আমাকে বলে গেল, "ওকে যত্ন-আত্তি কোরো, সাহেব। কখন বেইমানি করবে না।" বেইমানি কোন দিন করে নেই সুলতান। রাজপুতের ঘরের ঘোড়া, রাজপুতের মতনই ইমানদার ছিল।

তবে সে মনিব ছাড়া আর কারও ধার ধারত না। একদিন সহিস বিনা অনুমতিতে জিন কষে পিঠে চড়েছিল বলে তাকে প্রায় প্রাণে মেরে ফেলেছিল। পেছনের পায়ে দাঁড়িয়ে উঠে দড়াম করে এমন পড়ল যে লোকটা আর একটু হলে পিষে মরত। আর একদিন আমার এক বন্ধু জবরদস্তি করে লাফিয়ে সুলতানের পিঠে চড়লেন। চড়বামাত্র সুলতান এক লাফ মেরে ছুটল পাগলের মত কম্পাউণ্ডে এক ইঁদারা ছিল তার দিকে। বন্ধু অসাধারণ সওয়ার ছিলেন, তাই লাফিয়ে পড়ে নিজে বেঁচে গেলেন, ঘোড়াকেও বাঁচালেন।

কিন্তু আমি 'সুলতান' বলে ডেকে কাছে গেলেই বড় বড় চোখ করে আমার দিকে একবার তাকিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকত। আমি বেশ করে বসে ইশারা করা পর্য্যন্ত এক পা নড়ত না। আস্তাবলে আপন ঠানে দাঁড়িয়ে থাকত শান্ত হরিণ-ছানাটির মতন। আমার স্ত্রী ভেতরে গিয়ে কখন বা cosmetic দিয়ে তার তেড়ী কেটে দিতেন, কখন বা চুল বিনিয়ে দিতেন। চুপটি করে গলা বাড়িয়ে দিত।

ঘোড়াটা বাজনা শুনতে বড় ভালবাসত। ক্যাম্পের পলটন ব্যাণ্ড বাজিয়ে কাওয়াজ করতে বেরোলে আমি সময় সময় ওকে নিয়ে যেতাম। এমন সুন্দর ঘাড় বাঁকিয়ে নাচত ব্যাণ্ডের তালে তালে যে সবাই মোহিত হয়ে দেখত।

এক বড় মজার খেলা ছিল ওর। পথে যেতে যেতে কালো হরিণ দেখলেই তাকে তাড়া করে যেত। প্রথমটা আমি ঠিক ধরতে পারতাম না, কুকুরের মত হরিণকে তাড়া করে কেন! তারপর ক্রমশঃ আন্দাজ করলাম যে ওর আগের মনিবরা হয়ত অশ্বপৃষ্ঠে বল্লম নিয়ে হরিণ শিকার করতেন। একদিন আমিও পিস্তল হাতে নিয়ে সুলতানকে ছোটালাম

এক কৃষ্ণসারের পেছনে। চমৎকার ছুটল। বোঝাই গেল যে সুলতান ও খেলাতে অভ্যস্ত। এর পরে আরও অনেকবার ঐ রকম ছুটেছি। শক্ত জমীর উপর হরিণ সহজেই বেরিয়ে যেত, কিন্তু নরম কি ভিজে মাটিতে পালাতে পারত না। দুচারবার গুলি ছুঁড়তেও পেয়েছিলাম, কিন্তু নিজের নিশানার দোষে কখন হরিণ ফেলতে পারি নেই।

সুলতানের দুষ্টু বুদ্ধি অনেক রকমের ছিল। হয়ত গ্রামের মাঝখানে ঘোড়া থামিয়ে লোকজনের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কইছি। হঠাৎ এক লাফ দিয়ে পেছনের পায়ের উপর দাঁড়িয়ে উঠল। "এই! কি করছিস্" ? বলতেই লক্ষ্মী ছেলেটির মত আবার চুপ করে দাঁড়াল। কখন হয়ত হঠাৎ অতর্কিতে একটা লোকের পাগড়ী দাঁতে ধরে তুলে নিলে, সে লোকটা হাঁউ-মাউ করে চেঁচিয়ে উঠল। আমি "সুলতান!" বলে ধমকে উঠতেই আবার পাগড়ীটা তার মাথার উপরেই ফেলে দিলে। সকলে হো হো করে হেসে উঠল। বেশ বুঝতে পারত যে তার খেলাটা সকলের ভাল লাগছে।

আশ্চর্য্য খাটতে পারত ঘোড়াটা। আমার মত ভারী লোককে নিয়ে অবাধে দশ কোশ পথ ছুটত। রোদ বৃষ্টিকে দৃক্‌পাত করত না। বালির উপর, কাদার উপর, কি সুন্দর দৌড়ত, কখন একটি বার পা হড়কায় নেই।

আমি আহমদাবাদ থেকে বদলী হওয়ার কিছু দিন আগে বেচারার গায়ে জোরে বরসাতী ঘা বেরোল। ও ঘা কখন সারে না। শীতকালে একটু কমে, বর্ষার দিনে আবার বাড়ে। সবাই বললে যে, ও আর মফস্বলের খাটুনি খাটতে পারবে না। কি করি, বড়োদার এক ধনী সরদারের কাছে সুলতানকে বেচে বিজাপুর চলে গেলাম। ভাবলাম, ভালই হল, যত্নে থাকবে। পাহাড়ে-দেশে নিয়ে এলে হয়ত আরও বেশী কষ্ট পেত। কিন্তু ভুলতে তাকে পারি নেই। এর পরে আমার আরও দু-তিনটা ভাল সওয়ারীর ঘোড়া হয়েছিল কিন্তু তারা কেউ আমাদের এমন আপনার জন হয় নেই।

দুর্ভিক্ষের সময়ের কাজ শুধু একটা ঘোড়ায় হত না। তাই এক

উটও রেখেছিলাম। হাতী ঘোড়া চড়ার অভ্যাস ছেলেবেলা থেকেই ছিল। কিন্তু কুব্জপৃষ্ঠ-ন্যুব্জদেহ উষ্ট্রের সঙ্গে প্রথম পরিচয় আহমদাবাদে, প্রথম পরিচয়ে খুব সুখী হয়েছিলাম তা বলতে পারি না। বরং গায়ের ব্যথা মরতে সাত দিন লেগেছিল। আমি ভেবেছিলাম প্রকাণ্ড জিনের উপর বসে, রেকাবে পা দিয়ে দিব্যি আরামে উঠে চড়ব। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে দেখলাম, আরাম দূরে থাক সামান্য একটু সোয়াস্তিও পাওয়া যায় না। প্রথম ত প্রত্যেক হাড়ের জোড় ক্রমাগত ঝাঁকানি খায়। তার পর, হঠাৎ অতর্কিতে নীচে হতে কত রকম ধাক্কাধুক্কি যে সর্ব্বশরীরে লাগে, তা অবর্ণনীয়। কেন যে বারবার পড়ে যাই নেই, সেটা আজও বুঝতে পারি না। একবার এক গোরা চাকরী সূত্রে মিসর দেশে গেছল। সে যখন আপন গ্রামে ফিরে এল, সবাই তাকে জিজ্ঞাসা করলে লাগল, "কি হে, উট-সওয়ারী কি রকম হল ?" লোকটা ত প্রথমে জবাবই দেয় না। শেষ একদিন বিরক্ত হয়ে বললে, "Cup and Ball খেলা দেখেছ ? ছোট ছেলেরা যে বাটির ভেতর একটা বল্ রেখে তাকে নাচায় ? কতকটা সেই রকম। তবে এ ক্ষেত্রে বল্‌টা লাফিয়ে উঠে সব সময় বাটির ভেতরই পড়ে না।" বর্ণনাটা গোরা-জনোচিত হলেও কতকটা ঠিক। অথচ মজা দেখুন। মাস দুয়েকের মধ্যে আমি চলন্ত উটের উপর বসে সব কাজই করতে শিখলাম। পিপাসা পেলে সোডার বোতল খুলে খেতাম। পকেট-বইতে নোট লিখতাম। বন্দুক চালিয়ে sand-grouse মারতাম। এই পক্ষীকে গুজরাতে 'বটের' বলে। বটের শিকার বেশ মজার। আপনা-দিকে বলি কি রকম। এ পাখী বাঙ্গালাদেশে বোধ হয় নেই। অবশ্য, বিকানীরে যে বড় (Imperial) Sand-grouse-এর শিকার হয়, যেখানে কি বছর হাজার হাজার পাখী মারা পড়ে, তার কথা আমি কিছুই জানি না। আমি কখন এক সঙ্গে দু-দশটার বেশী দেখি নেই। উত্তর গুজরাতের মরু প্রান্তরের মধ্য দিয়ে উটে চড়ে যেতে যেতে লোকালয় থেকে বহুদূরে আমরা এই পাখী দেখতে পেতাম। বালির ভেতর ছোট ছোট বাটির মতন গর্ত্ত করে তাইতে চুপটি মেরে বসে রোদ পোহাত। তফাৎ থেকে মনে হত যেন কতগুলো মাটির কি গোবরের তাল পড়ে আছে। কিন্তু

তাদের কাছে যাওয়া বিষম মুস্কিল ছিল। মনে একটুকু সন্দেহ হয়েছে, কি মুহূর্ত্ত মধ্যে উড়ে একেবারে মাইল খানেক পথ পালাবে। এদের শিকার করার একমাত্র উপায়, উটের বেগ একটু না কমিয়ে সমানে চারিদিকে চক্কর দেওয়া আর চক্কর দিতে দিতে আস্তে আস্তে অন্তরটা কমিয়ে যাওয়া। তার পর, যেই পাখী বন্দুকের পাল্লার ভেতর এল, কি তৎক্ষণাৎ বন্দুক তুলে দুটো নলই আওয়াজ করা, একটা বাসা-পাখী লক্ষ্য করে আর দ্বিতীয়টা ওড়ার উপর। এই রকমে গোটা তিনেক Sand-grouse পর্য্যন্ত একসঙ্গে ফেলা যায়। কিন্তু এজন্য উটটা খুব ভাল শিক্ষিত হওয়া চাই।

পাঠক যেন মনে না করেন যে উট আস্তে আস্তে চলে। ভাল সওয়ারীর সাণ্ড্‌ণী ঘণ্টায় আট মাইল স্বচ্ছন্দে যেতে পারে। আর যখন ভয় পায় কি ভড়কায়, তখন দশ বারো মাইল পর্য্যন্ত দৌড়ায়। আপনারা জানেন ত যে উটের রাশ মানে নাকের নথের সঙ্গে বাঁধা একটা রশি। রশি উটেরই লোম দিয়ে তৈরী, বেশ মজবুত। তবে কখন কখন এ রাশও ছিঁড়ে যায়। আমার একবার গেছল। উটটা যখন ব্যাপার বুঝতে পারলে তখন ঊর্দ্ধশ্বাসে একদিকে ছুটল। গাছের ডালে লেগে আমার টুপি, আমার সারথীর পাগড়ী, জিনে-ঝোলান চামড়ার থলি (holster), সব উড়ে গেল। উটের অঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হল। শেষ, মাইল দুয়েক পাগলের মত দৌড়ে শ্রান্ত হয়ে এক গ্রামের কাছে এসে আপনা হতে ধপ করে বসে পড়ল। উটগুলো স্বভাবতঃ দুর্দ্দান্ত নয়। হাতীর মতনই পোষ মানে। মুখের হুকুম শোনে। তবে পোষা জন্তুরও সময়ে সময়ে স্কন্ধে ভূত চাপে ত!

একবার আমার উট আমাকে Sunstroke-এর হাত থেকে কি রকম রক্ষা করেছিল, শুনুন। দুপুর রোদে এক প্রান্তরের মধ্য দিয়ে চলেছি। সারা সকালটা দুর্ভিক্ষের ক্যাম্পে ক্যাম্পে ফিরে বড় শ্রান্ত হয়ে পড়েছি। কেবল, ভাবছি কখন আমার ডেরাতে ফিরব। হঠাৎ কেমন মাথা ঘুরতে লাগল। ভয় হল এইবার উট থেকে পড়ে যাব। একবার যদি ছায়াতে দুদণ্ড বসতে পেতাম ত ঠিক হয়ে যেত, কিন্তু গাছপালা

ঘরবাড়ী কাছে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। কি উপায়? আমার সারথিকে বললাম, "ওরে! আমার মাথা কেমন করছে। একটু কোথাও ছায়ায় নিয়ে চল।" সে উত্তর দিলে, "ছায়া এখানে কোথায় পাব, হুজুর! তবে এক কাজ করতে পারি। আমার সাণ্ড্‌নীকে দাঁড় করাই। আপনি তার ছায়াতে শুয়ে থাকুন।" এই বলে জিন-ঢাকা সতরঞ্চিটা মাটিতে বিছিয়ে আমাকে তার উপর শোয়ালে। শুইয়ে তারপর তার উটকে এমন ভাবে দাঁড় করালে যে আমার সর্ব্বাঙ্গে ছায়া পড়ে। এই রকম দাঁড়িয়ে রইল আধঘণ্টা আমার বাহন। সোডাওয়াটার দিয়ে বেশ করে মাথা মুখ ধুয়ে একটু জিরিয়ে সুস্থ হয়ে বাড়ী ফিরলাম। প্রাণটা বেঁচে গেল।

শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত
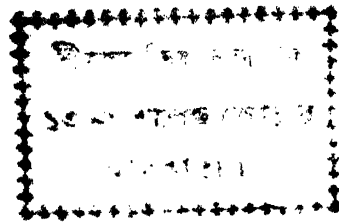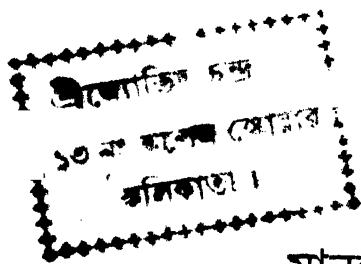
মানবের নিয়তি

আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে না দেখিয়া আধিভৌতিক ভাবে দেখিলে (অর্থাৎ Physically ও Physiologically) মানুষকে এতই অকিঞ্চন মনে হয় যে, তাহার নিয়তি (Destiny) লইয়া আলোচনা একটা পণ্ডশ্রম বোধ হইতে পারে। বস্তুতঃ মানুষ সৃষ্টিসাগরের একটা নগণ্য বুদ্‌বুদ (a mere bubble in the ocean of life), বন্ধুরা মেদিনীর একটা তুচ্ছ চূর্ণমুষ্টি (only a handful of dust)। তাহার নিয়তি লইয়া এত বহ্বারম্ভ কেন ?

পৃথিবীর তুলনায় মানুষ কতটুকু ? পৃথিবীর পরিধি ২৫০০০ মাইল—তাহার তুলনায় চৌদ্দ পোয়া মানুষ কি ছার! সেইজন্য, মানুষের কাছে পৃথিবীর নাম 'পৃথ্বী' (বিপুলা, vast, gigantic)। কিন্তু এই পৃথিবী সৌরমণ্ডলের একটি ক্ষুদ্র গ্রহ মাত্র—সূর্য্যকে কেন্দ্র করিয়া যে সকল গ্রহ-উপগ্রহ আবর্ত্তিত হইতেছে তাহাদের অন্যতম—মুখ্যতম নয়—a mere point in space। কারণ, সৌরমণ্ডল ত' একটি নয়—অগণ্য। Each star is a sun and the centre of a solar system—প্রত্যেক তারা এক একটি সূর্য্য এবং এক এক সৌরমণ্ডলের কেন্দ্রস্থ। স্যার জেম্‌স্ জিন্‌স্ (Sir James Jeans) বলেন, অন্ততঃ ১০০০০ কোটি ঐরূপ তারা-সূর্য্য আছে। স্যার আর্থার এডিংটনের (Sir Arthur Eddington) গণনা আরও বিস্ময়কর। তিনি বলেন, আমাদের সৌর-মণ্ডল যে Galaxy-র (ছায়াপথের) অন্তর্গত, ঐ ছায়াপথে এক লক্ষ কোটি তারা আছে, আর বিশ্বে ঐরূপ এক লক্ষ-নিযুত Galaxy আছে! উপনিষদের সেই প্রাচীন কথা—

> অস্য ব্রহ্মাণ্ডস্য সমন্ততঃ এতাদৃশানি অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডানি সাবরণানি জ্বলন্তি।

অর্থাৎ,

> সংখ্যা চেদ্ রজসামস্তি বিশ্বানাং ন কদাচন।

'বরং সমুদ্রের সৈকতকণার সংখ্যা করা যায় কিন্তু ব্রহ্মাণ্ড অগণ্য!'—

'worlds are scattered, like dust in the abysses of space.' সেইজন্য প্রাচীনেরা বলিতেন—

কোটিকোট্যযুতানীশে চাণ্ডানি কথিতানি বৈ।
× × যথা তরঙ্গা জলধৌ তথেমাঃ সৃষ্টয়ঃ পরে।

'সাগর লহরী-সমানা' কোটি কোটির অযুত অযুত ব্রহ্মাণ্ড-বুদ্‌বুদ সৃষ্টি-সমুদ্রে উত্থিত ও পতিত হইতেছে।'

মানুষের তুলনায় এই বিপুল সৃষ্টি-সৈকতের বালুকণা পৃথিবী পৃথ্বী বটে—কিন্তু সূর্য্যের তুলনায়? পৃথিবীর পরিধি মাত্র ২৫০০০ মাইল, সূর্য্যের ৮০০০০০ মাইল—কিন্তু এমন সব প্রকাণ্ড তারা আছে যাহারা সূর্য্যের চেয়ে ১০ লক্ষ গুণ বড়—a class of giant stars, a million times bigger than the sun (Lodge)। তাহাদের তুলনায় মানুষ কি গণনার মধ্যে আসিতে পারে?

আর গুরুত্বের দিক্ দিয়া যদি দেখি, তবে মানুষ আরও নগণ্য হইয়া পড়ে। প্রমাণ-মানুষের ওজন দুই মণ, আড়াই মণ। পৃথিবীর? ৬এর পৃষ্ঠে ৫৬৭টা শূন্য মণ। সূর্য্যের গুরুত্ব (weight) পৃথিবীর ৩৩২০০০ গুণ। আবার অ্যাণ্ড্রোমিডা-নক্ষত্রে যে নীহারিকা দৃষ্ট হয়, তাহার গুরুত্ব সূর্য্যের চেয়ে ৪৫০ কোটি গুণ!

The great nebula in Andromeda weighs 4500 million times the weight of the sun.

আবার কতটা স্থান জুড়িয়া বিশ্ব বিস্তৃত আছে যদি একবার ভাবিয়া দেখা যায়, তবে সৃষ্টির বিশালতার তুলনায় মানুষের ক্ষুদ্রতা মনে করিয়া লজ্জায় অধোবদন হইতে হয়। আমরা জানি পৃথিবী থেকে সূর্য্যের দূরত্ব ৯২ কোটি মাইল। সেণ্টুরি তারার দূরত্ব ২৫ লক্ষ কোটি মাইল। কিন্তু এমন সব তারা আছে যাহাদের তুলনায় সেণ্টুরি নেহাত নিকটে। ঐ সব তারা থেকে পৃথিবীতে আলোক পঁহুছিতে ১৪ কোটি বৎসর লাগে, অথচ আলোকের গতি প্রতি সেকেণ্ডে ১৮৬০০০ মাইল। অর্থাৎ ঐ সকল তারার দূরত্ব ৮ কোটির উপর ১৩টা শূন্য মাইল!

Hubble has found that the most remote objects visible in the biggest telescope on earth are so distant that light

travelling 186000 miles a second, takes about 140 million years to come from them to us (Jeans).

তবেই দেখা গেল

'the solar system, vast as it may appear to us, is nothing but an insensible point'

—আমাদের এই বিরাট্‌-বিশাল সৌরমণ্ডল সুবিশাল বিশ্বের তুলনায় একটা বিন্দুমাত্র — আর মানুষ ঐ বিন্দুর বিন্দুর বিন্দুর বিন্দু অর্থাৎ Pointএর Pointএর Pointএর Point—এতটা ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র যে অণুবীক্ষণেরও দুর্লক্ষ্য !

আর এক কথা। প্রাণি-জগতে মানুষ নবাগত জীব—একেবারে আভিজাত্যহীন—'He is the parvenu of creation !' কেন ? ভূতত্ত্ব-বিদেরা বলেন পৃথিবীর বয়স ৪০ কোটি বৎসর—ঐ কালের মধ্যে কতবিধ প্রাণীর উদ্ভব ও বিলয় ঘটিল—অবশেষে মানুষ সৃষ্টির রঙ্গমঞ্চে দর্শন দিলেন—মাত্র ৬০ লক্ষ বর্ষ আগে !

We had to wait for 400 million years for the appearance of the human race upon this planet. (Lodge)

Man appeared on this globe only 6 million years ago.
(Keith)

So he is the most modern of mammals.

শুধু তাই নয়—স্যার অলিভার লজের ভাষায়, মানুষ is immature, ugly like an embryo (ভ্রূণের মত কুৎসিত), unfinished, incomplete, imperfect—full of sin and every kind of abomination অর্থাৎ সে হীন, দীন, মলিন, কু-লীন এবং সর্ব্ববিধ পাপতাপ দুঃখ-দৈন্যে জর্জ্জরিত। তাহাকে লক্ষ্য করিয়া একজন পরিহাস-রসিক ঠিক্‌ই বলিয়াছেন—Men are only tigers in trousers and apes in aprons—তাহার আবার নিয়তি লইয়া মাথা ব্যথা ! তাহার তুচ্ছতা সম্পর্কে কবির নিম্নোক্তিই শেষ কথা নয় কি ?

Raving politics, never at rest
As this poor earth's pale history runs,
What is it all but a trouble of ants
In the gleam of a million million suns ?

অথচ এই মানুষের প্রসঙ্গেই বাইবেল বলিয়াছেন—Lord ! What is man that Thou art mindful of him ? মহাকবি শেক্‌সপিয়র হ্যামলেটের মুখ দিয়া বলিয়াছেন—

What a piece of work is a man ! How noble in reason, how infinite in faculty, in form and moving how express and admirable ! The beauty of the world—the paragon of animals.

এই মানুষকে লক্ষ্য করিয়াই শুকদেব ভাগবতে বলিয়াছেন—

স্থষ্ট্বা পুরাণি বিবিধান্যজয়াত্মশক্ত্যা
বৃক্ষান্ সরীসৃপ পশূন্ খগদংশমৎস্যান্ ।
তৈ তৈঃ অতুষ্টহৃদয়ো মনুজং বিধায়
ব্রহ্মাববোধধিষণং মুদমাপ দেবঃ ॥

অর্থাৎ ব্রহ্মণ্যদেব বহুবিধ পুর রচনা করিলেন—পাদপ কীট পতঙ্গ মৎস্য সরীসৃপ পশু বানর ইত্যাদি—পুরশ্চক্রে দ্বিপদঃ পুরশ্চতুষ্পদঃ (উপনিষদ্) —চতুষ্পদ দ্বিপদ কত কি—কিন্তু তাহাতে তিনি তুষ্ট হইলেন না—যতক্ষণ না মানুষ স্থষ্টি করিলেন ; যখন 'মনুজং বিধায়', তখন বলিলেন 'সুকৃতং—well done (পুরুষো বাব সুকৃতম্—ঐতরেয়-উপনিষদ্) ; তখন 'মুদমাপ দেবঃ'—তখনই তিনি তৃপ্তি অনুভব করিলেন। সেইজন্য চরিতামৃতকার বলিয়াছেন—

'কৃষ্ণের যতেক রূপ, সর্ব্বোত্তম নররূপ ।'

সেই Psalmist-এর কথা—'We are fearfully and wonderfully made.'

প্রাচীন গ্রীসেও এই ধরণের একটি প্রবচন ছিল—

'Wonders are many but nothing is more wonderful than Man.'

এ সকল উক্তির সার্থকতা কি ?

সার্থকতা এই যে, মানব অমৃতের পুত্র *—শৃণ্বন্তু সর্ব্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ (ঋগ্‌বেদ্), সেই তেজোময় অমৃতময় পুরুষের অংশকলা (They are Divine Fragments)—মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ

* They (men) are the sons of God.—Sir Oliver Lodge's Making of Man. পিতাসি নঃ (ঋগ বেদ)

সনাতনঃ (গীতা, ১৫।৭)—সেই অমৃতসিন্ধুর বিন্দু, সেই জ্বলিতাগ্নির কণা, সেই ব্রহ্মপাবকের স্ফুলিঙ্গ, সেই পরমাত্মার প্রতিচ্ছবি। সেইজন্য বাইবেল বলিয়াছেন—

God created man in His own image—in His own image He created man.

উপনিষদের উক্তি আরও উদাত্ত—

যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাদ্ বিস্ফুলিঙ্গাঃ
সহস্রশঃ প্রভবন্তে সরূপাঃ।
তথাক্ষরাৎ বিবিধাঃ সোম্য ! ভাবাঃ
প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপি যন্তি॥ —মুণ্ডক, ২।১।১

'যেমন সুদীপ্ত অগ্নি হইতে 'সরূপ' বিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, সেইরূপ সেই অক্ষর পুরুষ হইতে বিবিধ জীব বিসৃষ্ট হয় এবং অন্তিমে তাঁহাতেই বিলীন হয়।'

'সরূপ' স্ফুলিঙ্গ অর্থাৎ *Kindred* sparks—কারণ, আগ্নেহি বিস্ফুলিঙ্গঃ অগ্নিরেব (শঙ্কর)। অতএব যখন মানবের দীনতা হীনতার কথা মনে উত্থিত হইবে, তখন যেন মনে থাকে—Man is not man as yet (Browning)—সে এখনও স্ফুলিঙ্গমাত্র—কিন্তু একদিন অগ্নিতে সন্ধুক্ষিত হইবে—this spark will one day be fanned into flame.

They come forth, fragments of Itself, thrown out by the One life, sparks of the Eternal Flame, themselves to become Flames.—Annie Besant.

সেইজন্য স্যার অলিভার লজ 'Potential Divinity of Man'-এর উল্লেখ করিয়াছেন। সে আজ ভিখারীর বেশে পরদেশে প্রবাসী বটে—

'the soul is an exile from some other sphere, wearing for the moment, perhaps, a beggar's disguise' (Santayana)

—কিন্তু মনে থাকে যেন যে, মেষের দলে প্রবিষ্ট হইলেও সে আত্ম-বিস্মৃত সিংহশিশু— অনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ (শ্বেতাশ্বতর)—একদিন সে নিজের আভিজাত্য স্মরণ করিবে, নষ্টা স্মৃতি পুনঃপ্রাপ্ত হইবে—তখন ? স্মৃতিলম্ভে সর্ব্বগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষঃ এবং সে স্ব মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হইবে—মহিমানম্ ইতি বীতশোকঃ (উপনিষৎ)। অতএব মানবের তুচ্ছ বর্ত্তমান ছাড়িয়া তুঙ্গ ভবিষ্যৎ দেখিতে হইবে—তাহার মধ্যে যে সমস্ত সম্ভাবনা এখন

অব্যক্ত আছে, যে সমস্ত শক্তি প্রচ্ছন্ন আছে, তৎপ্রতি লক্ষ্য করিতে হইবে— কারণ, মানব বস্তুতঃই ব্রহ্মখণ্ড—'We are Gods in the making, Christs in the becoming, Logoi in gestation'.

সেইজন্য ঋষিরা মানুষকে এত সম্মান করিয়াছেন—ব্রহ্ম দাশাঃ ব্রহ্ম কিতবাঃ—God is in the slave, God is in the sinner * এবং সকলকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন—

মনসৈতানি ভূতানি প্রণমেদ্ বহুমানয়ন্
ঈশ্বরো জীবকলয়া প্রবিষ্টো ভগবান্ ইতি।—ভাগবত

'কাহাকেও অবজ্ঞা করিও না—সকলকে সম্ভ্রমের চক্ষে দেখ—সকলকে বহুমান সহকারে প্রণাম কর। কেননা ব্রহ্মণ্যদেব সকলের মধ্যেই প্রবিষ্ট আছেন।' তাঁহাদের দৃষ্টিতে সমস্ত দেহই ব্রহ্মপুর—তদ্ অস্মিন্ ব্রহ্মপুরে—সমস্ত শরীরই দেবালয়—(tabernacles of God)—দেহো দেবালয়ঃ প্রোক্তঃ।

Know ye not that you are the tabernacles of God and the Most High dwelleth in you. —St. Paul

মানুষ যদি ব্রহ্ম-খণ্ড হয়, যদি সেই তেজোময় অমৃতময় পুরুষের সন্তান হয়, তবে ত' সে দায়াধিকারসত্ত্বে পিতৃগুণে গুণবান্—

সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তঞ্চ ইত্যেহ ব্রহ্মলক্ষণম্—পঞ্চদশী

—তবে ত' যিনি 'অস্তি ভাতি প্রিয়', সেই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের যে সন্ধিনী সম্বিৎ ও হ্লাদিনী শক্তি, তাঁহার সেই প্রতাপ (Power), প্রজ্ঞা (Wisdom) এবং প্রেম (Love) মানুষের মধ্যেও অস্ফুটভাবে বিদ্যমান। অতএব মানুষ হীন মলিন কিসে? অবশ্য ব্রহ্মে ঐ প্রতাপ, প্রজ্ঞা ও প্রেম দেদীপ্যমান—পূর্ণভাবে বিকশিত এবং মনুষ্যে ঐ Life, Light ও Love অর্দ্ধবিকশিত। সেইজন্যই ত' বাদরায়ণ সূত্র করিয়াছেন—

অধিকন্তু ভেদনির্দ্দেশাৎ—ব্রহ্মসূত্র, ২।১।২২

যৎ সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বশক্তি ব্রহ্ম নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবং শারীরাদধিকম্ অন্যৎ তৎ
—শঙ্করভাষ্য

* অর্থাৎ Penetrate to the greatness of the humble—the divine spark in the clod.—John Buchan.

কিন্তু তথাপি তত্ত্বতঃ (essentially) জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন—সোহং, তত্ত্বমসি। অতএব জীবের নিয়তির আলোচনা নিরর্থক কিসে ?

আপত্তি উঠিবে, দেহাতিরিক্তে আত্মনি প্রমাণাভাবাৎ—দেহের অতিরিক্ত, মানুষের জীব বলিয়া কোন কিছু আবার আছে নাকি ? যাহাকে আমরা চৈতন্য বলি উহা ত' মস্তিষ্কের পরিস্পন্দ মাত্র (Vibration of braincells—chemical reaction of molecules)। চার্ব্বাকের মন্ত্রশিষ্য জড়বাদী বলেন :

As the liver secretes bile, so the brain secretes thought—অর্থাৎ যেমন যকৃৎ হইতে পিত্ত নিঃসরণ হয় সেইরূপ মস্তিষ্ক হইতে চিন্তার ক্ষরণ হয়।

অতএব জীব বলিয়াই যখন কোন কিছু নাই, তখন 'মাথা নাই তার মাথা ব্যাথা' করান কেন ? উত্তরে জড়বাদীকে স্মরণ করাইয়া দিই, Consciousness is the absolute world-enigma—সম্বিৎ বিশ্বের প্রধান প্রহেলিকা—এক নিঃশ্বাসে তাহার সমাধানের সাহস করিওনা। বিশ্রুত তাত্ত্বিক শোপেনহাওরের (Schopenhauer-এর) কথা একবার মনে কর — The supreme blasphemy is the denial of the *indestructible* essence within us—'অক্ষর আত্মতত্ত্বের প্রত্যাখ্যান একটা বিরাট্ বিয়াকুবি'। সেই যে অজর, অমর, অক্ষর আত্মতত্ত্ব, উহাই জীব—যাঁহার ক্ষয় ব্যয় উপচয় অপচয় নাই—

জীবাপেতং কিলেদং ম্রিয়তে ন জীবো ম্রিয়তে—ছান্দোগ্য

অজো নিত্যঃ শাশ্বতোয়ং পুরাণঃ—কঠ

নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোয়ং সনাতনঃ—গীতা

—For whom the hour shall never strike—the Deathless, the Eternal, the Immortal !

Ages pass away
And worlds grow old and go to wreck :
The soul alone endures.—Southey

অতএব জীবের নিয়তি (Destiny) আছে বৈকি। ঐ নিয়তি কি ? The soul of man is eternal and its future is the future of a thing whose splendour has no limit (The Idyll of the

White Lotus) অর্থাৎ অজর, অমর, অক্ষর জীবের যে ভবিষ্যৎ নিয়তি, তাহার যে ভাবী মহিমা-গরিমা, তাহা ইয়ত্তার অতীত।

কালের ক্রমের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যদি আমরা এই প্রসঙ্গের একবার অনুধ্যান করি তবে দেখিতে পাই যে, জীব-বীজ প্রকৃতির ক্ষেত্রে উপ্ত হইয়া, অঙ্কুরিত, মুকুলিত, বিটপিত হইয়া একদিন মহা মহীরুহে পরিণত হয়—

'He is sown in weakness in order to be raised to power'

—Bible

গীতার সেই প্রাচীন কথা

—মম যোনি র্মহদ্‌ব্রহ্ম তস্মিন্ বীজং দধাম্যহম্।

এ বীজ বপনের উদ্দেশ্য কি? ঐ বীজ হইতে কালে বিশাল বিটপী উত্থিত হইবে—

বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠতি একঃ—উপনিষৎ

ইহাকেই বলে বিবর্ত্তন স্রোতঃ—creative evolution—অধ্যাপক বার্গসঁর Elan Vital,

which 'by its internal push has carried life by more and more complex forms to higher and higher destinies.'

লক্ষ্য করিবেন, সৃষ্টির এই ব্যাপার যদৃচ্ছার খামখেয়াল নহে—বিশ্বের এই বিবর্ত্তনের মধ্যে 'one increasing purpose runs'—

'মনে হয় কোন এক নিগূঢ় নিয়তি—যুগ যুগান্তর ধরি খুঁজে পরিণতি'

—"a great collective movement carrying individuals to ends greater than themselves and unforeseeable by living men." ফলে,

মরে পিতা মরে পুত্র না মরে মানব
উন্নতির তিল-অর্দ্ধ না হয় লাঘব।

The Individual withers, the Race is more and more.

—Tennyson

অতএব—

'Evolution is God's plan for the universe, of which I am a part and I am proceeding towards a *goal* of unimaginable power

and glory—at a speed which depends wholly on my own efforts.'

এই বিষয় লক্ষ্য করিয়া John Hargrave বলিয়াছেন—

I believe in the nameless God * * I believe in the holy Catholic body of *mankind*, the resurrection of common sense and *Evolution Everlasting*.

বাস্তবিকই বিবর্ত্তনের বিপরিণাম অনন্ত, অতর্ক্য, অচিন্ত্য।

এই দীর্ঘ জীবনযাত্রার পথে পর্য্যটন করিয়া জীব অজ্ঞ হইতে সর্ব্বজ্ঞ হয়—ইহাকেই বলে "the long pilgrimage of the soul from Nescience to Omniscience."

এই বিবর্ত্তন পথের পর্ব্বগুলি কি ? what are the stages ? সুফি সাধক জালালুদ্দীন রুমি এই পর্ব্বগুলির সুন্দরভাবে নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

I died from the mineral and became a plant. I died from the plant and reappeared in an animal. I died from the animal and became a man. When did I grow less by dying ? —Masnavi.

স্থাবর থেকে পাদপ (গুল্ম, লতা, তরু, বিটপী, বৃক্ষ, মহীরুহ) তারপর পশু (কীট, পতঙ্গ, সরীসৃপ, পক্ষী, জন্তু, বানর)—শেষে মানুষ। বৃহৎ বিষ্ণুপুরাণে এই বিবর্ত্তন-ধারার সবিশেষ বিবরণ দৃষ্ট হয় :—

স্থাবরং বিংশতের্লক্ষং জলজং নবলক্ষকং
কূর্ম্মাশ্চ নবলক্ষঞ্চ দশলক্ষঞ্চ পক্ষিণঃ।
ত্রিশৎলক্ষং পশূণাঞ্চ চতুর্লক্ষঞ্চ বানরাঃ
ততো মনুষ্যতাং প্রাপ্য ততঃ কর্ম্মাণি কারয়েৎ।

বিবর্ত্তনের মূলসূত্র—অবিশেষাৎ বিশেষারম্ভঃ—অর্থাৎ অবিশেষ হইতে বিশেষ এবং বিশেষ হইতে সবিশেষ (from the homogeneous to the heterogeneous and from the heterogeneous to the more heterogeneous)। জীব বিবর্ত্তন-স্রোতে ভাসমান হইয়া প্রথম স্থাবর-জগতে (Inorganic worldএ) প্রবেশ করিয়া mineral kingdom-এ উপনীত হয়। স্থাবরের পর 'জঙ্গম-সৃষ্টি' (Organic world)। জঙ্গম জগতে জীব বিবর্ত্তনের নিঃশ্রেণীর (Ladder of Evolution-এর) ধাপে

ধাপে উঠিয়া জলজ, কূর্ম্ম, পক্ষী, পশু এবং বানর-যোনিতে লক্ষ লক্ষ বার ভ্রমণ করিবার পর মনুষ্য-যোনিতে প্রবেশ করে। কিন্তু মানবতাই কি বিবর্ত্তনের চরম লক্ষ্য? মানুষ অসভ্য, অর্দ্ধসভ্য, সভ্য অবস্থা অতিক্রম করিয়া সুসভ্যতায় উপনীত হয়—ইহাকেই বলে 'দ্বিজ' হওয়া—

এতেষু ভ্রমণং কৃত্বা দ্বিজত্বমুপজায়তে।

দ্বিজ = Twice born—'সংস্কৃত'—সংস্কারাৎ দ্বিজ উচ্যতে। যীশু-খৃষ্টও বলিয়াছেন—যদি স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিতে চাও তবে দ্বিজ হইতে হইবে—Unless you be born again, born from above—you cannot enter the Kingdom of Heaven. কিন্তু দ্বিজত্বই বিবর্ত্তনের চরম নহে। দ্বিজকে 'ব্রাহ্মণ' হইতে হইবে—

সর্ব্বযোনিং পরিত্যজ্য ব্রহ্মযোনিং ততোঽভ্যগাৎ —বৃহৎ বিষ্ণুপুরাণ

যজ্ঞ যেমন 'জগ্‌গি' নয়, ব্রাহ্মণও তেমন 'বামুন' নয়। ব্রহ্ম জানাতি ইতি ব্রাহ্মণঃ।

তস্মাৎ ব্রাহ্মণঃ পাণ্ডিত্যং নির্বিদ্য বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ * * স ব্রাহ্মণঃ কেন স্যাৎ? যেন স্যাৎ তেন ঈদৃশ এব—বৃহদারণ্যক

that is, by living as chance may determine অর্থাৎ—যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টঃ (গীতা)। সেইজন্য 'ব্রাহ্মণে'র সম্পর্কে বুদ্ধদেব বলিতেন—

সঙ্খারাণং খয়ং গত্বা অকতঞ্ঞূসি ব্রাহ্মণ—

—'ব্রাহ্মণ' তিনিই, যিনি অ-কৃতজ্ঞ—যিনি সেই অকৃত অমৃত অক্ষিত তত্ত্বকে জানেন। কিন্তু এখনও বিবর্ত্তনের চরম দূরস্থ।

এইবার সাধারণ বিবর্ত্তনের (normal evolution-এর) সমতল-ক্ষেত্র ছাড়িয়া জীবকে অ-সাধারণ বিবর্ত্তনের (Supernormal Evolution-এর) তুঙ্গ ভূমিতে আরোহণ করিতে হইবে—তাহাকে অতিমানব—Superman—Angel হইতে হইবে।

Next time I shall die from the man that I may grow the wings of the Angel.—Mansavi

—দেবো ভূত্বা দেবান্ অপ্যেতি—উপনিষদ্

তারপর তাহাকে স্বরাট্, বিরাট্, অতিরাট্ হইতে হইবে।

আপ্নোতি স্বারাজ্যং—মনসঃ পতিং—তস্য সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি—সঙ্কল্পাদ্ এবাস্য পিতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তে—সর্ব্বে দেবা অস্মৈ বলিম্ আবহন্তি।—উপনিষদ্

অতএব চ অনন্যাধিপতিঃ—ব্রহ্মসূত্র

'তিনি স্বরাট্ হন, মনস্পতি হন—সমস্ত লোকে তাঁহার কামচার (ইচ্ছাগতি) হয়—তাঁহার সঙ্কল্পমাত্রে পিতৃগণ উত্থিত হন, দেবগণ তাঁহাকে বলি বহন করেন—এক কথায়, তিনি অনন্যাধিপতি (একরাট্) হন।'

বিবর্ত্তন-সিদ্ধ এইরূপ পুরুষকে লক্ষ্য করিয়া বৃহদারণ্যক বলিয়াছেন—

আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধঃ। ** যৎ পূর্ব্বোঽস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ সর্ব্বান্ পাপ্মান ঔষৎ তস্মাৎ পুরুষঃ—বৃহ ১।৪।১

'আদিতে আত্মা 'পুরুষ'রূপ ছিলেন। তাঁহাকে 'পুরুষ' বলে কেন? পুরা ঔষৎ = পুরুষ।'

—'যেহেতু তিনিই প্রথম হইয়া অন্য সকলের পূর্ব্বে সমস্ত পাপ দহন করিয়াছিলেন।'

ইহার ভাষ্যে শ্রীশঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন,—

স চ প্রজাপতি রতিক্রান্তজন্মনি সম্যক্ কর্ম্মজ্ঞানভাবনানুষ্ঠানৈঃ সাধকাবস্থায়াং যদ্ যস্মাৎ কর্ম্মজ্ঞানভাবনানুষ্ঠানৈঃ প্রজাপতিত্বং প্রতিপিৎসূনাং পূর্ব্বঃ প্রথমঃ সন্ অস্মাৎ প্রজাপতিত্ব-প্রতিপিৎসুসমুদয়াৎ সর্ব্বস্মাৎ আদৌ ঔষৎ অদহৎ। কিম্? আসঙ্গাজ্ঞান-লক্ষণান্ সর্ব্বান্ পাপ্মনঃ প্রজাপতিত্ব-প্রতিবন্ধক-কারণভূতান্।

'সেই প্রজাপতি পূর্ব্বজন্মে সাধকাবস্থায় কর্ম্মজ্ঞানধ্যানাদির সাধনা দ্বারা—যেহেতু প্রজাপতিত্ব-লাভেচ্ছু অন্যান্য সাধকদিগকে অতিক্রম করিয়া প্রথম হইয়াছিলেন এবং সর্ব্ব প্রথমেই প্রজাপতিত্বের প্রতিবন্ধকভূত আসক্তি অজ্ঞান প্রভৃতি সমস্ত পাপ দহন করিয়াছিলেন, সেইজন্য তাহাকে 'পুরুষ' বলে।

পুরা=প্রথমে, উষ্ = দহন।'*

এ কথার তাৎপর্য্য এই যে, পূর্ব্বকল্পের যে সকল সাধকোত্তমেরা সাধনপথে ভূয়ঃ অগ্রসর হইয়া মোক্ষের অধিকারী হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে যিনি সর্ব্বোত্তম, তিনি কল্পান্তে ব্রহ্মে বিলীন হন। সাংখ্যেরা এইরূপ পুরুষকে 'প্রকৃতিলীন' বলেন। যখন আবার কল্পের আরম্ভ হয়,

* পুরাণে লিখিত আছে, আগামী কল্পে আঞ্জনেয় এই ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মা হইবেন। অর্থাৎ ব্রহ্মা is 'result of evolution'। তিনি জন্য ঈশ্বর—নিত্য-সিদ্ধ নহেন।

যখন প্রলয়ের অবসানে আবার সৃষ্টির উদয় হয়, তখন সেই 'সর্ব্ববিৎ সর্ব্বকর্ত্তা' পুরুষ কোন ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বরত্বের অধিকার বহন করিবার জন্য মহেশ্বর কর্ত্তৃক নিয়োজিত হইয়া প্রজাপতিরূপে আবির্ভূত হন। অর্থাৎ যিনি এক কল্পের প্রজাপতি, তিনি অন্য কল্পের সিদ্ধজীব।*

বলা বাহুল্য—ব্রহ্মাণ্ড যখন অগণ্য, তখন ব্রহ্মাণ্ডাধিকারী প্রজাপতিও অসংখ্য।

যথা তরঙ্গা জলধৌ তথেমাঃ সৃষ্টয়ঃ পরে।
উৎপত্যোৎপত্য লীয়ন্তে রজাংসীব মহানিলে॥

'যেমন সমুদ্রে অসংখ্য ঊর্ম্মি, যেমন আকাশে অগণ্য ধূলিকণা, সেইরূপ মহেশ্বরের বক্ষে অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড।' যিনি মহেশ্বর, ঈশ্বরের ঈশ্বর (তম্ ঈশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরম্), তিনি এক ও অদ্বিতীয়, কিন্তু ঐ সকল প্রজাপতি, যাঁহারা 'জন্য' ঈশ্বর, তাঁহারা সংখ্যাতীত—এবং প্রত্যেকে ত্রিমূর্ত্তি (Trinity)—তিনেই এক, একেই তিন।

অসংখ্যাতাশ্চ রুদ্রাখ্যা অসংখ্যাতাঃ পিতামহাঃ।
অসংখ্যাতা হরয়শ্চ এক এব মহেশ্বরঃ॥—লিঙ্গ পুরাণ

'রুদ্র সংখ্যাতীত, ব্রহ্মা সংখ্যাতীত, বিষ্ণু সংখ্যাতীত—কিন্তু মহেশ্বর (যিনি নিত্যঈশ্বর) তিনি এক ও অদ্বিতীয়।'

এ সম্বন্ধে দেবী ভাগবত এইরূপ লিখিয়াছেন,

সংখ্যা চেৎ রজসামস্তি বিশ্বানাং ন কদাচন।
ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদীনাং তথা সংখ্যা ন বিদ্যতে।
প্রতিবিশ্বেষু সন্ত্যেব ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদয়ঃ॥—৯।৩।৭-৮

'বরং ধূলিকণার সংখ্যা করা যাইতে পারে, কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডের সংখ্যা কখনও করা যায়না। প্রতিব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব বিরাজিত রহিয়াছেন। তাঁহাদের সংখ্যা গণনাতীত।'

ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতিগণ যে সিদ্ধ সাধক, সাধনার পারগত জীব, যোগবাসিষ্ট এ কথার অনুমোদন করিয়াছেন,

Learn life's old secret—
Peace is still
Eternal gain of those
Who do his will.—F. H. Aldhouse

পৌরুষেণৈব যত্নেন সহসাম্ভোরুহাস্পদং।
কশ্চিদেব চিদুল্লাসো ব্রহ্মতাম্ অধিগচ্ছতি॥
সারেণ পুরুষার্থেন স্বেনৈব গরুড়ধ্বজঃ।
কশ্চিদেব পুমান্ এব পুরুষোত্তমতাং গতঃ॥
পৌরুষেণৈব যত্নেন ললনাবলিতাকৃতিঃ।
শরীরী কশ্চিদ্ এবেহ গতশ্চন্দ্রার্দ্ধচূড়তাম্॥

—যোগবাসিষ্ঠ, মুমুক্ষু ৪।১৪-৬

'কোন পুরুষ প্রযত্নদ্বারা পৌরুষ অবলম্বন করিয়া পদ্মযোনি ব্রহ্মার পদবী লাভ করিয়াছেন, কোন পুরুষ চেষ্টার দ্বারা গরুড়ধ্বজ বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং পৌরুষ প্রয়োগদ্বারা অন্য কোন পুরুষ অর্দ্ধনারীশ্বর চন্দ্রচূড়ের অধিকার লাভ করিয়াছেন।'

বিবর্ত্তনের ফলে এই যে আমরা সাধনসিদ্ধ সাধকের প্রজাপতিত্ব-রূপ উচ্চ পদবী লাভের কথা বলিলাম—এ সমস্তই কাল-সাপেক্ষ—কালক্রমের অনুযায়ী, অর্থাৎ মানবের এই তুঙ্গ শৃঙ্গে অধিরোহণ জন্য হয়ত' কল্প কল্পান্ত লাগিবে অর্থাৎ time is an important factor। অবশ্য উন্নতিই বিশ্বের নিয়ম—Progress is undoubtedly the law of life। কিন্তু প্রথম প্রথম—ঐ উন্নতি অতি মন্থর গতিতে অগ্রসর হয়। এ সম্পর্কে আমি অন্যত্র এইরূপ লিখিয়াছি;—

Things have moved on to be sure—but only in arithmetical progression, 1, 3, 5, 7, 9, 11 etc. Presently, let us hope, it will gather momentum and the progression will become what is called geometrical, 1, 3, 9, 27, 81, 243 and so on. Later still, (this is not a bold prophecy to make), the meandering stream, when nearing the sun-lit sea, will turn into a mighty torrent, so that in the closing stages of humanity, progress will mount up, as Bishop Leadbeater says, by "Powers"—3, 9, $9 \times 9 = 81$, $81 \times 81 = 6,561$ and so on. But all through, the time element will be in operation,—কালঃ কলয়তাম্ অহম্ (গীতা)।

কিন্তু শীঘ্রই হউক বা বিলম্বেই হউক, দ্রুতই হউক বা মন্থরই হউক, মানব যখন একদিন ঐ প্রজাপতিত্বের তুঙ্গ তোরণে আরূঢ় হইবে,

তখনই কি বিবর্ত্তনের বিশ্রান্তি হইবে? না, হইবে না। জ্যালালুদ্দীন রুমির ভাষায়—

Once more shall I wing my way above the Angels.
I shall become that which entereth not the imagination.
'Verily unto Him shall I return'.

ইহাকেই এদেশে বলে ব্রহ্মসাযুজ্য—গীতা যাহাকে বলিয়াছেন—'মম সাধর্ম্ম্যম্ আগতাঃ'। যাঁহারা 'মম সাধর্ম্ম্যম্ আগতাঃ' অর্থাৎ যাঁহাদের ব্রহ্ম-ধর্ম্ম সৎ, চিৎ ও আনন্দভাব সুবিকশিত, যাঁহাদের প্রতাপ, প্রজ্ঞা ও প্রেম কাষ্ঠাপ্রাপ্ত—তাঁহারা, গীতার কথায়,

সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ

—তাঁহারা আবর্ত্তন-নিবর্ত্তনের অতীত হন।

ন পুনরাবর্ত্তন্তে—অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ (ব্রহ্মসূত্র)।

ইহাকেই খৃষ্টান বলেন, বৈকুণ্ঠের তোরণের স্তম্ভ হওয়া—

Becomes a pillar in the temple of God, he goes out no more.

Though paths be straight or winding,
Through many lives be trod,
Each becomes *at last* a pillar
In the temple of God.

—Claude. L. Watson.

শ্রীকৃষ্ণ যাহাকে 'মম সাধর্ম্ম্যম্ আগতাঃ' বলিলেন — সে সম্বন্ধে যীশুখৃষ্টের এই অমোঘ নির্দ্দেশ 'Be ye perfect as your Father in Heaven is perfect' 'পরব্যোমে পরম পিতা যেমন পূর্ণ, তেমনি সম্পূর্ণ হও।' *

---

* খৃষ্টানেরা ইহাকে অন্যভাবে বলেন—যীশুখৃষ্টের প্রাংশুত্বের সমকক্ষ হওয়া। The Christ is born within the heart of every one of us, but, remember, He must grow within us so that we may come to the measure of the stature of His fulness.

—Bishop C. W. Leadbeater

আর একজন খৃষ্টভক্ত মধুর ভাষায় বলিয়াছেন—

Tho' Christ a thousand times
in Bethlehem be born
Unless He be born within you
you are forlorn.

ইহাকেই বলে—'Getting back to God'.

There is no path more rugged
Than that which Christ hath trod,
Not a way so far off straying
But it comes at last to God.
—C. L. Watson.

ইহাই জীবের চরমলক্ষ্য, পরম পুরুষার্থ—'the radical need of losing ourselves again in God, (George Santayana)

কারণ,

Man, who is from God sent forth
Doth again to God return.—Wordsworth.

আমরাও এ দেশে ঐভাবে বলি—

তস্মিন্ হংসো ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রে—শ্বেতাশ্বতর

চক্রের যেখানে আরম্ভ, সেখানেই শেষ—জীব ব্রহ্ম হইতে বিচ্ছুরিত হইয়া এই ব্রহ্ম-চক্রে ভ্রমণ করিতে করিতে, চরমে ব্রহ্মেই প্রত্যাবর্ত্তন করে—তখন সে বলিতে পারে—'The wheel has come full circle, I *am* here' (Shakespeare)। তখন কি হয় ?

When the Infinite within wake up to the Infinite without, it is then we hear the golden harmony

—তখন নদী সাগরে সঙ্গত হয়—যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রে—অন্তরাত্মার অনন্ত পরমাত্মার অনন্তে একীভূত হয়—তখন সেই অনাহত সুর বাজিয়া উঠে, যাহার ধ্বনি শুনিয়া কবির গাহিয়াছেন—

কোটি ভান রাগ কা রূপা
বীন সৎধুন বাজে অনুপা ॥

—সত্য ধ্বনির সেই বীণা অনুপম বাজে, যে রাগিণীর রূপ কোটি ভানু সমুজ্জ্বল। ঐ সুপ্ত রাগিণীকে জাগাইবার জন্য কবির অন্যত্র বলিয়াছেন।

সুর গম্ভীরা, কহে কবীরা
সুতল ব্রহ্ম জাগাও

—সকল সাধনার উহাই ত' চরম লক্ষ্য! ব্রহ্মে জীবের ঐ প্রত্যাবর্ত্তনকে—(getting back to Godকে) ঋগ্বেদের ঋষি—'অস্তে' আগমন বলিয়াছেন। হিত্বা অবদ্যং পুনরস্তমেহি, "হে জীব সমস্ত অবদ্য (অঞ্জন, stain) পরিহার করিয়া আবার 'অস্তে' ফিরিয়া আইস।" অস্ত শব্দের বৈদিক অর্থ—ধাম, গৃহ, home; অতএব অস্তে আগমনের অর্থ স্বধামে প্রত্যাবর্ত্তন—যদ্ধাম পরমং মম (গীতা)। মানবের প্রকৃত ধাম (real home) কি? ব্রহ্ম, God। এই জন্য কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ বলিয়াছেন—

> Trailing clouds of glory do we come
> From God, who is our home.

বুদ্ধদেবও মুক্ত পুরুষকে—'অস্তংগত' বলিয়াছেন—

অত্থং-গতস্‌স ন পমানং অত্থি।

যিনি 'অস্তং গত', যিনি স্বধাম-প্রত্যাবৃত্ত, তাঁহার ইয়ত্তা নাই—Of him who has returned home, there is no measure.

—Grimm

ইহা বিচিত্র নহে কারণ, যিনি অকাম, নিষ্কাম, আত্মকাম, আপ্তকাম হইয়া—'মম সাধর্ম্ম্যম্ আগত' হইয়া 'অস্তং' গত হইয়াছেন অর্থাৎ যিনি 'ব্রহ্মসংস্থ', তিনি ব্রহ্ম সন্ ব্রহ্ম অপ্যেতি—

অকামো নিষ্কামঃ আত্মকাম আপ্তকামঃ ব্রহ্ম সন্ ব্রহ্ম অপ্যেতি—বৃহ ৪।৪।৬

তিনি যীশুখৃষ্টের সহিত সুর মিলাইয়া বলিতে পারেন—I and my Father are one—'সোঽহম্ অস্মি'। এই সোহং-সিদ্ধিই মানবের উচ্চ নিয়তি (High Destiny)। * যখন মানব সোঽহং-সিদ্ধ হয়, তখনই সেই নিয়তি সম্পূর্ণ হয়।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

* 'Absolute repose, absolute fecundity' this, says Ruysbroeck, is the twofold property of Godhead; and the secret child of the Absolute (অমৃতস্য পুত্র) participates in this dual character of Reality—"for this dignity has man been made".—Underhill's Mysticism. p. 519.
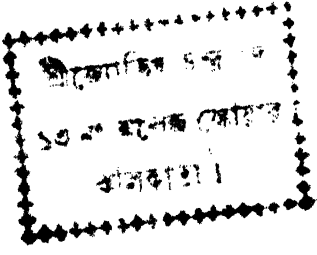
দুটি ইংরেজি কবিতা

আধুনিক য়ুরোপীয় কাব্যে নূতন সুর লেগেচে বলা চলে। সুর নূতন হলেও সঙ্গীত-লোকেই তার মূল, তার বিকাশ, তার বিহার। সুতরাং তার মধ্যে পারম্পর্য্যের সৃষ্টিতত্ত্ব আছে এত বড়ো স্বতঃসিদ্ধ বাক্যের ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। মনে রাখা দরকার মানুষের বিচিত্র সৃষ্টিলোক সমগ্রের সঙ্গে সঙ্গেই বাড়চে, বদ্‌লাচ্চে, হয়ে-উঠ্‌চে; যুগান্তরের তোরণ পার হয়ে চলেচে। চোখে-দেখা, মনে-জানা, চিত্তে-উপলব্ধ শত সহস্র জ্ঞান ধ্যান ধারণা জমে উঠেচে পৃথিবী জুড়ে, মানুষের সমাজ তারি বহুধারায় রূপায়মাণ। নানা-কারণে আধুনিক যুগ বিশেষভাবে মানবসম্বন্ধের যুগ, এই সম্বন্ধের ব্যাপকতম বিচিত্রতম সাধনায় তার অভিব্যক্তি। চিদ্‌-সংঘর্ষের প্রচণ্ড আলোড়নে আজ য়ুরোপীয় সাহিত্যের সঞ্চিত বোধন অগণ্য উৎসমুখে বাণীর ঝরণায় বেরিয়ে পড়েচে। সাহিত্যের এমনতর বিরাট বিস্তৃতি ইতিহাসে কখনো ঘটেনি। কাব্যে দেখতে পাই লীলাশব্দের লঘুধারা ছন্দের নব নব আবর্ত্তন ভঙ্গীতে গতিময়, মননের মাধুর্য্য দেখি ঐ ঝরণার জলে ঝলমল করচে। ঔজ্জ্বল্য এবং গতিই সাহিত্যে প্রাণের পরিচয়। আবহমান কালের বেগ নিয়ে প্রাণ-স্রোতের সমুদ্রে সঙ্গত হবে মানবচিত্ত-ক্ষেত্রের বিচিত্র অধ্যায়ে শ্যামলতার চিরন্তন পাথেয় বহন ক'রে—এমনতরো বাণীর মহানদী য়ুরোপীয় আকাশতলে যাত্রা করেচে বলে মনে করি না। কিন্তু এই যে বিপুল ভাবনার উদ্বোধন নিবিড় একাগ্র হলো য়ুরোপীয় সাহিত্য-সমাজের অন্তস্তলে, বিধি-নিষেধের বাধা ভেঙে বেরোলো আত্মপ্রকাশের নবীন অধ্যবসায়ে তারি প্রাণতরঙ্গিত ঐশ্বর্য্য ইংরেজি কাব্যে বিস্মিত আনন্দে চেয়ে দেখচি।

নূতন সুরের কথা বলেচি কিন্তু এখানে তার বিশ্লেষণ করব না। কেবল নির্দ্দেশ করতে চাই দুটো প্রধান লক্ষ্যের বিষয়। ভাষায় সহজ রিক্ততা, ঋজু দৃঢ় বাহুল্য-বর্জ্জিত বাক্যের স্বচ্ছভঙ্গী বিশেষভাবে আধুনিক। অক্ষর-গোণা প্যারাগ্রাফ, মিনিট-নির্দ্দিষ্ট বক্তৃতা, রেডিয়ো এবং ফিল্মের দিনে লেখনীর লীলা সংহত করতে হয়। কবিতার বাক্য-পরিসর স্বভাবতই

সংক্ষিপ্ত কিন্তু সেখানেও কালধর্ম্মের প্রভাব সুস্পষ্ট চোখে পড়বে। ছন্দে বোধহয় সব চেয়ে বড়ো পরিবর্ত্তন এনেচেন জেরার্ড্ হপ্‌কিন্‌স্, তাঁর Sprung rhythm-এর অনুবর্ত্তন আজো চলেচে। টেনিসন্ সুইন্‌বর্ণের Running rhythm-এর মধুময় অবলীলতা ব্রাউনিঙের হাতুড়িতে চূর্ণ হয়েছিল। বেঁচেছিল পাঠকের মন অবিমিশ্র ধ্বনি-প্রবাহিনীর ঘুমপাড়ানি গান থেকে জেগে উঠে। মানুষের সচেতন মন যতি খোঁজে, চল্‌তে চল্‌তে ফিরে দাঁড়ায়, মিলিয়ে নেয়, তার নৃত্যের তালও সমতরঙ্গ নয়। মসৃণ চাকার ঠেলাগাড়িতে গড়িয়ে কাব্যের খেলা জমিয়ে রাখা শক্ত; অভ্যস্ত আরামে দুই চক্ষু মুদে এলে বিছানায় শুয়ে পড়াই ভালো। ব্রাউনিঙের কাজ এগিয়ে আন্‌লেন হপ্‌কিন্‌স্; ব্রাউনিঙের সৃষ্টি-প্রতিভা তাঁর ছিল না, কিন্তু কবিতার টেক্‌নীকে তাঁর দান অসামান্য। আজো এই পথে সংস্কার চলেচে। *

কাব্য-সৃষ্টি স্বাতন্ত্রিক। যুগ-ধর্ম্মের প্রবর্ত্তনা উপস্থিত কোনো সাহিত্যে সন্ধান করলে অধিকতর ভ্রমের সম্ভাবনা ঘটবে। ভাষা ও ছন্দের আলোচনা করা চলে, কিন্তু আধুনিক কাব্যে কোনো সর্ব্বসাধারণিক মনস্তত্ত্ব খোঁজা নিরাপদ নয়, অবান্তরও বটে। হয়তো লক্ষ্যের বিষয় এই যে মানুষের দেহ মন, মানুষের জীবন ঘনিষ্ঠতর ভাবে আজ কাব্যের বিষয়ীভূত। দুটো চারটে বিশেষ সদ্-গুণ, অসদ্-বৃত্তিকে মহাপুরুষ বা অধম মানুষের বৃহৎ চিত্রে ফলিয়ে না তুলে আমরা নেমেচি ভালোমন্দে মেশানো দুদশজনকে বন্ধুর দৃষ্টিতে জানবার, জানাবার খোঁজে। গল্পের আসন নিয়েচে বায়োগ্রাফি। সর্ব্বপ্রকার মানবসম্বন্ধকে তলিয়ে দেখতে চাই বিশ্বপ্রকৃতির, মানবস্বভাবের আত্মীয় যোগে। কাব্যেও দেখি, তুমি আমি আমাদের আরো পাঁচজনকে নিয়ে নিবিড় জানাশোনার আবহাওয়ায় অস্তিত্ব-রহস্যকে একান্ত উপলব্ধি করবার চেষ্টা। মনে হতে পারে এতে মানুষের বৈচিত্র্যযোগের উদার দৃষ্টি দলীয় বিশিষ্টতার চর্চ্চায় গিয়ে ঠেকবে। আত্মগত আতিশয্য তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণে বিশেষকে সাধারণ করতে চাইবে। কোথাও বা তা ঘটেচে। কিন্তু এর বড়ো দিক হচ্চে এই যে আজ কোনো মানুষই সাহিত্যের জাতিভেদে

---

* Sprung rhythm-এর উৎকৃষ্ট বাংলা নমুনা পেয়েচি সম্প্রতি বিচিত্রায় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের "আদিতম" কবিতাটিতে। "নর্ত্তন জেগে ওঠে অদৃশ্য ভঙ্গীতে, অরণ্য মর্ম্মর সঙ্গীতে"...ইত্যাদি।

বহির্গত নয়, মানবসম্বন্ধের কোনো তত্ত্বই তার উৎসুক চিত্তের দাবী এড়িয়ে যেতে পারবে না। বিজ্ঞান দর্শনের ধন লুঠ করে এনে প্রাণের জগতে সাহিত্য তা'র অধিকার বাড়িয়ে চলেচে। অনেক সময়ে এই সঞ্চয় চিত্তের বোধনে সঞ্চারিত হয়ে প্রাণকণা হয়ে ওঠেনি। কিন্তু মুক্ত মনের দরজা গিয়েচে খুলে। কম্যুনিজ্‌মের প্রেরণা এর মধ্যে আছে। এবং তারই সহোদর ফ্যাসিজম্‌এর প্রভাব—বিশেষ মানুষের মধ্যে বিচিত্র মানুষের বিবিধ ইচ্ছার অপূর্ব্ব সমন্বয় দেখা, হোক্ ভালো, হোক্ মন্দ। হয়তো স্পেণ্ডর, ডে লিউইস্ চলেচেন এক পথে; এলিয়ট্ দ্বিতীয়ের সন্ধানে।

দুটো ইংরেজি কবিতার বাংলা তর্জ্জমা "পরিচয়ের" দরবারে উপস্থিত করতে গিয়ে এত কথা বল্‌লাম। প্রথমটির লেখক ষ্টীফেন্ স্পেণ্ডর, আধুনিক ইংরেজ কবিদের মধ্যে অন্যতম তাঁর প্রতিভা। লেখেন কম, কিন্তু তাঁর লেখায় কল্পনা এবং মননশক্তির প্রাচুর্য্য দেখতে পাই।[১] উইনিফ্রেড্ হোল্‌ট্‌বী ঔপন্যাসিক, সমালোচক, বিকল্পে কাব্য-ব্যবসায়ী। সৌন্দর্য্যের স্পর্শমণি আছে এঁর লেখনীতে, শাণিত বিদ্রূপে হাস্যোজ্জ্বল এঁর রচনা।[২] দুটি কবিতাই রেলগাড়ির উপর; বিভিন্ন কারণে হঠাৎ এদেশে জনপ্রিয় হয়ে উঠেচে। স্পেণ্ডর রেলগাড়ির গতি, তার ছন্দভঙ্গী এবং রূপরেখা আমাদের পরিচিত আবেষ্টনের আবহাওয়ায় জাগিয়ে তুলেচেন। চলতে চলতে তাঁর উন্মত্ত অভিসারিকা চেতনার দিগন্ত অতিক্রম করে উধাও হয়েচে জ্যোতি-র্লোকের রাগিণীতে। হোল্‌ট্‌বী একবারও রেলগাড়ির বর্ণনা করেন নি, অথচ অন্ধকার রজনীর বক্ষে আর্ত্তনাদ ক'রে ছুটে গেল অমোঘ নির্ম্মম যন্ত্রশক্তি, নির্ম্মম মনের অন্ধ ইচ্ছায় চালিত! মিলিয়েচেন মহাযুদ্ধের সময়কার অভিজ্ঞতাকে নিশাচর বেদনার তীব্রতায়।

আধুনিক রেলগাড়ি বা জাহাজ বিশেষভাবে কবিতার বিষয় বা বিশেষভাবে কাব্যে অপাংক্তেয় এমনতরো বচন বিচারের অগ্রাহ্য। অনুভূতির

১। Stephen Spender-এর গদ্য সমালোচনা Spectator-এ এবং বিশেষভাবে Left Review-এ দ্রষ্টব্য। তাঁর কবিতার বইয়ের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

২। Winifred Holtby লেখেন Time and Tide-এ; তাঁর ছোট গল্পের বই "Truth Is Not Sober" অতুলনীয়। সমাজে বা সাহিত্যে মূঢ়তা, ধার্ম্মিকতা বা অতি-সুকুমার-বৃত্তি যাঁদের পক্ষে অসহ্য তাঁরা এঁর Poor Caroline (Jonathan Cape) যেন পড়েন।

পরিমণ্ডলে যখনই অনিবার্য্য হয়ে দেখা দিয়েচে কোনো বাস্তব ঘটনা, কোনো প্রাত্যহিক জীবন-সামগ্রী, কাব্যে তখন তার প্রবেশ অপ্রতিহত। দূরগামী জাহাজ নানা কল্পনায় বেদনায় মিশ্রিত হয়ে চিদ্-সমুদ্রের তরঙ্গে দুলে ওঠে কখনো দেশের কখনো সুদূর প্রাণ-তটের আহ্বানে—হয়তো আমাদের অনেকের সহজ জীবনের অভিজ্ঞতায় তারি ছবি সত্য গ্রামের খেয়াতরীর চেয়ে। পোড়ো বাড়ি, শ্যাওলা-সবুজ দীঘি, মেলার হাট চেতনায় মিলতে পারে রেলওয়ে ষ্টেশনের লাল সবুজ আলো-জ্বালা আসন্ন বিদায়ের বা আগমনীর আলোড়নের ছন্দে। বৃষ্টি-ভেজা সহরের বুকে জ্বল্‌চে বৈদ্যুতিক আলোর মালা, পথের বাড়ি গাড়ির মধ্যে বাঁধা পড়ল এক টুক্‌রো সূর্য্যাস্তের আকাশ, মোটর গাড়ির ইস্পাতের ঢাক্‌না তাতে জ্বল্‌চে দুপুরের রোদ্দুর, থর্ থর্ করচে তার এঞ্জিন্, যেন গতি ছাড়া পেতে চায় উধাও দিগন্তের আহ্বানে। সৌন্দর্য্যের খর ইঙ্গিতে আঁকা হয়ে যাচ্চে এই রকমের কত ছবি শুধু পশ্চিমে নয়, আমাদেরি বাংলাদেশের ছেলেমেয়ের মনে প্রতিদিনের কত অনামা অভিজ্ঞতার স্তরে স্তরে। যদি লিখতে গিয়ে কলকাতা সহরের গল্পে এমনতরো দৃশ্য গ্রন্থিবাঁধা পড়ে যায় জীবনের ইতিহাসে তাহলে তাকে ভালোও বলব না, দোষও দেব না, দেখব ছবি চোখের কাছে মনের কাছে অনিবার্য্য হয়ে দেখা দিয়েচে কিনা। আমার বিশ্বাস নিম্নের দুটি কবিতায় সেই অনিবার্য্যতা আছে। দৃশ্যে কল্পনায় ভাবনায় মিলে তার অখণ্ড রূপ তর্জ্জমার মধ্য দিয়েও ধরা দেবে কিনা তার বিচার করবেন "পরিচয়ের" পাঠক।

একৃসপ্রেস্ ট্রেন

ষ্টীফেন্ স্পেণ্ডর্

প্রথম সহজ প্রবল ঘোষণার পরে
যন্ত্রের কালো জানানি দিয়েই বিনা দ্বিরুক্তিতে
সাম্রাজ্ঞীর মতো গড়িয়ে চল্‌ল, ষ্টেশন ছেড়ে।
নামালো না মাথা, সম্বরিত ঔদাসিন্যে
বিনম্র বাড়ির ভিড় গেল কাটিয়ে,
এবং গ্যাসের কারখানা; শেষে উল্‌টিয়ে গেল ঐ ভারি পৃষ্ঠা

মৃত্যুর, সিমেট্রির কবরের পাথরে ছাপানো।
সহরের বাহিরে দেশ রয়েচে খোলা—
গতি বাড়ালো দ্রুততায়, ঘনিত হলো তার রহস্য।
সমুদ্রে-চলা জাহাজের উদ্দীপ্ত আত্মসমাহিতি এখন তার।
এবার আরম্ভ করল তার গান—প্রথমে খুব ধীর শব্দে,
তার পরে জোরে, শেষে একেবারে উন্মত্ত শীৎকারে—
চলার বাঁকে বাঁকে বাজে তার বাঁশির চীৎকার-গান,
বধির-করা শব্দের ঝড় ঝঙ্কৃত হল সুরঙ্গে, যন্ত্রে যন্ত্রে,
অগণ্য কলকব্জার অন্তর্লীন সংঘর্ষে।

আর সব খন হাল্কা, বায়বীয়,
চলেচে আনন্দিত ছন্দ তার চাকার তলায়।
লৌহ ল্যাণ্ড্স্কেপ পেরিয়ে তার লাইনের পর দিয়ে বাষ্পবেগে
ঝাঁপিয়ে পড়ল এখন সে পাগল নূতন সুখের অধ্যায়ে,
যেখানে গতি ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেল্‌চে নব নব অদ্ভুত আকার, প্রশস্ত বাঁকা রেখা,
সম যুগ্মরেখা বন্দুকের ষ্টীলের মতো পরিষ্কার।
অবশেষে এডিন্‌ব্রো, রোমের চেয়েও দূরে।
পৃথিবীর চূড়ান্ত ছাড়িয়ে, পৌঁছল রাত্রিতে—
যেখানে কেবল মাত্র এক অবনত ষ্ট্রীম্‌লাইন উজ্জ্বলতা
ফস্‌ফরাস্‌-এ সাদা হয়ে উঠেচে টলমল পাহারের 'পরে।
আহা! ধূমকেতুর মতো অগ্নিশিখায় বিমুগ্ধ সে চলেচে এগিয়ে
তুরীয় আপন সঙ্গীতে,—কোনো পাখীর গান, না,
মধুভরা কুঁড়িতে ফেটে-যাওয়া কোনো পল্লবও তার কাছে লাগে না॥

ফ্রান্সের ট্রেন

উইনিফ্রেড্‌ হোল্‌ট্‌বী

সারা দীর্ঘরাত্রি অদৃশ্য পাহাড়ের পথে
ট্রেনগাড়ি
অগ্নি-চক্ষু ট্রেনগাড়ি,

ডাকে পরস্পরকে তীব্র খোঁজের চীৎকারে ;
আর আমি
ভেবেছিলেম সব ভুলেচি আমি যুদ্ধের কথা—
হঠাৎ ঝল্‌সে উঠ্‌ল মনে সেই ক্যামিয়র্সে'র এক রাত্রি
জেগে শুয়েছিলেম ঘন অন্ধকারে,
শুনছিলেম ট্রেনের শব্দ,
পশু, চীৎকার-করা ট্রেন-পশুগুলো
ডাকচে পরস্পরকে তাদের শীকারের গর্জ্জনে।
দুর্নিবার, অমোঘ, হিংস্র পশুর মতো
ছুটচে শীকারের সন্ধানে।
সৃষ্টি করেচে এইজন্যেই তাদের নির্ম্মাণকর্ত্তা,
সেই তারা, ব্যবসা যাদের ধরা এবং গ্রাস করা
আমাদের রক্ত মাংসের একান্ত আপন জনদের।
　　　　　　　　ঘণ্টার পর ঘণ্টা
ক্রুদ্ধ, অসহায়, শুয়েছিলেম একা সে রাত্রে,
শুনছিলেম শীকার করচে তারা তোমাকে, প্রিয় আমার, আর তোমাকে,
শুনছিলেম ছুটে নিয়ে চলেচে তারা তোমাকে মৃত্যুর মুখে,
অসহ্য চেষ্টা করলেম সাবধান করতে তোমাকে পশুদের হাত থেকে
হায়রে, ঐ পশুদের হাত থেকে !
　　　　　　　　তার পরে মনে হোলো, না,
এত বিশ্রী স্বপ্ন সত্য হতেই পারে না !
ক্ষণেক শান্ত হোলো মন, তখন ট্রেনের শব্দ আর শোনা যাচ্চেনা—
কিন্তু হঠাৎ, ঐ যে, নিস্তব্ধের বুক চিরে কম্পিত হোলো গর্জ্জন,
শুন্‌লেম, ঐ দূরে, আরো দূরে,
ভীষণ বজ্র-নিনাদ তাদের আনন্দহীন ভোজে—
ধরেচে তোমাকে পশুরা তাহলে, ধরেচে ঐ পশুগুলো, ঐ পশুগুলো—
জান্‌লেম
আমার নিশাচর স্বপ্ন তবে সত্য ॥

অমিয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী
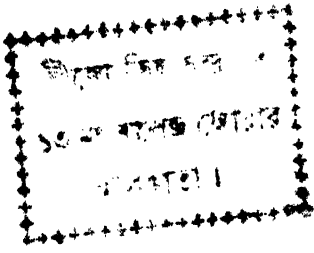
সমগোত্র

(ইভান বুনিন হইতে)

কলম্বো সহরের উপকণ্ঠ থেকে যে রাস্তাটি বেরিয়েছে সেটি বরাবর সমুদ্রের ধার দিয়ে গিয়ে একটি নারিকেল-কুঞ্জের মধ্যে এসে পড়েছে। সেখানে গাছের মাথায় মাথায় পাতার ঝালর, তার ওপর রোদ পড়েছে,—আর নীচে ঝিলিমিলি আলো-ছায়ার মধ্যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত সিংহলীদের কয়েকখানি কুঁড়ে ঘর; প্রতি ঘরের আশে পাশে অনেক কলাগাছ, আর সবুজ পাতার ঝোপে ঘরগুলি প্রায় আচ্ছন্ন; বড় বড় গাছের পাশে কলাগাছগুলিকে মনে হয় অনেক ছোট। লম্বা লম্বা নারিকেলগাছ সারি সারি নানা আকারে হেলে দাঁড়িয়ে আছে, তাঁর ফাঁক দিয়ে দেখা যায় সমুদ্রের বিস্তীর্ণ বেলাভূমি, সেটা অতিক্রম ক'রে স্থির জল রৌদ্রকিরণে সোনার আয়নার মত চক্‌চক্ করছে; জলে ভাসছে কয়েকটি সাল্‌তি ডিঙ্গি, দেখতে যেন লম্বা চুরুটের মত,—শালগাছের গুঁড়ি দিয়ে তৈরী; ডিঙ্গিগুলিতে জীর্ণ মলিন পাল দেওয়া, গাছের রংয়ের সঙ্গে তার রং একেবারে মিলে যায়। বালুচরে এক স্বর্গীয় দৃশ্য; কালো কালো উলঙ্গ ছেলেরা দল বেঁধে খেলা করছে, অন্য একদল জলের মধ্যে প'ড়ে আনন্দে সাঁতার দিচ্ছে আর চারিদিকে জল উৎক্ষিপ্ত করতে করতে প্রচুর কোলাহল করছে।··· দেখলে মনে হয় এই সব অরণ্যের শিশু, লঙ্কা দ্বীপের অধিবাসী আদি-মানবের এই সব সাক্ষাৎ বংশধর,—(শোনা যায় আমাদের আদি-পিতৃপুরুষ প্রথমে নাকি এখানেই অবতীর্ণ হ'য়েছিলেন,)—মনে হয় সহর বা সভ্যতা বা টাকা কড়িতে এদের কি হবে? এই সব বনস্পতি, এই সমুদ্র, ঐ সূর্য্য স্বচ্ছন্দে যা কিছু দান করে তাই কি এদের পক্ষে পর্য্যাপ্ত নয়? কিন্তু তবু এরাই যখন বয়সে বড় হ'য়ে ওঠে তখন এদের মধ্যে কেউ বা লেগে যায় ব্যবসা করতে, কেউ বা চাষবাস করে; কেউ চা-বাগানে মজুরী খাটে, আবার কতকজন চলে যায় দ্বীপের উত্তরপ্রান্তে—সেখানে গিয়ে নিগ্রোদের সঙ্গে মিশে ডুবুরির কাজ করে,—শুক্তার খোঁজে সমুদ্রের তলা পর্য্যন্ত

নেমে চলে যায় আর উঠে আসে চোখ রক্তবর্ণ ক'রে; এদের মধ্যে আর একদল আছে যারা ঘোড়ার মত কাজ করে,—তারা ইউরোপীয় আরোহীদের গাড়ীতে টেনে টেনে সহরের চারদিকে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ায়—লাল কাঁকরের নানা পথ দিয়ে আর দু'ধার থেকে ঘেরা বড় বড় গাছের পাতায় ঢাকা ছায়াবীথির মধ্য দিয়ে। ঘোড়াগুলো এখানকার গরম সহ্য করতে পারে না,—এমন কি অষ্ট্রেলিয়ার ওয়েলার ঘোড়া পর্য্যন্ত নয়; যে সব ধনী লোকেরা ঘোড়া রাখে তারা প্রতিবৎসর গরমের সময় ঘোড়াগুলোকে পাহাড়ে পাঠিয়ে দেয়।

এই রকম প্রত্যেক রিক্‌শওয়ালার বাম বাহুতে ইংরাজ কর্ত্তৃপক্ষ তক্‌মা এঁটে দিয়েছে, তাতে নম্বর দেওয়া। এই নম্বর আবার দু'রকমের —কতকগুলো সাধারণ নম্বর আর কতকগুলো বিশিস্ট নম্বর। এক বৃদ্ধ সিংহলী রিক্‌শওয়ালা সহরের কাছাকাছি ঐ বনের মধ্যে এক কুঁড়ে ঘরে বাস করে,—তার ভাগ্যে একটা বিশিষ্ট নম্বর পড়ে গেছে,—সাত। ভগবান তথাগত উপস্থিত থাকলে হয়তো বল্‌তেন—"হে ভিক্ষুগণ, এই বৃদ্ধ কিসের কামনায় পার্থিব দুঃখের এত বোঝা বহন করে?" আর ভিক্ষুরা হয়তো তার উত্তরে এই কথাই বলতো—"হে প্রভু, মাটির প্রেমের যে আকর্ষণে আবহমান কাল থেকে ধরাতলে জীবের সৃষ্টি হচ্ছে, সকলের মত ওকেও সেই একই মোহের টানে টেনেছে, সেইজন্যই এই বৃদ্ধ পার্থিব দুঃখের এত বোঝা বহন করে।" বৃদ্ধের সংসারে আছে এক স্ত্রী, এক বড় ছেলে, আর কতকগুলি কাচ্ছাবাচ্ছা,—এতগুলিকে যে প্রতিপালন করতে হবে সেজন্য কোনো ভয় ভাবনা তার নেই। লোকটা খুব কালো আর এমন রোগা খর্ব্ব-মূর্ত্তি যে তাকে স্ত্রীলোকের মতও বলা যেতে পারে, বালকের মতও বলা যেতে পারে; তার লম্বা লম্বা তৈলাক্ত চুল ঘাড়ের কাছে ঝুঁটি ক'রে বাঁধা, তাতে রীতিমত পাক ধরেছে; এদিকে হাড়ের উপর চামড়াখানি কেবল লেগে আছে মাত্র, তাও শিথিল হ'য়ে একেবারে কুঁকড়ে গেছে। সে যখন ছুট্‌তে থাকে তখন তার নাক দিয়ে, গাল বেয়ে, কোমরের কৌপীন বেয়ে ঘাম ঝর্‌তে থাকে; ছুট্‌তে ছুট্‌তে সে খুব হাঁপায় আর তার জীর্ণ বক্ষ-পঞ্জরের ভিতর থেকে বাঁশীর মত আওয়াজ শোনা যায়।

শ্রান্ত হ'লেই একটা পান খেয়ে সে আবার চাঙ্গা হ'য়ে ওঠে, তখন সে আবার দ্রুত বেগে ছুটতে থাকে ; আরোহী তার গাড়ীতে বসে রৌদ্রদগ্ধ সহরের ভিতরকার লাল পাথর বাঁধানো রাস্তার উপর দিয়ে, পথে ছড়ানো ঝরাফুলের সৌরভের মধ্য দিয়ে আরামে ঘোরাঘুরি করে।

নিজের সুখের জন্য সে এত পরিশ্রম করে না। কিন্তু যে সুখ তার নিজের ভাগ্যে হয়নি সেই সুখ যাতে তার আপন জনে পায়, যাতে তার ছেলে সুখী হয়—এইজন্যই সে এত কষ্ট সয়। ইংরাজী কথা ভাল বুঝতে পারে না, আন্দাজে কোনো মতে ঠিকানা বুঝে নিয়ে দৌড়ে চলে। গাড়ীখানা খুব ছোট ; মাথার উপর একটা আচ্ছাদন আছে সেটা দরকার হ'লে মুড়ে ফেলা যায়, চাকাগুলো সরু সরু, গাড়ীর কম্পাস দু'টোও খুব সরু, কতকটা যেন লাঠির মত। হঠাৎ হয়তো একজন বিপুলকায় সাহেব সওয়ারী জোটে, চোখগুলো কটা কটা, পোষাক একেবারে ধব্‌ধবে সাদা, মাথায় সাদা সোলার টুপি, পায়ে মোটা চামড়ার দামী জুতো—সে গাড়ীতে উঠে বসে, কোনমতে শরীরটা গদির আসনের মধ্যে ঢুকিয়ে পায়ের উপর পা তুলে দেয়, তারপর ভারী গলায় তার গন্তব্যস্থানের নাম অর্দ্ধোচ্চারণ করে মাত্র। অমনি বৃদ্ধ কম্পাস দু'টো আঁকড়ে ধরে সাম্‌নের দিকে ঝুঁকে পড়ে তীরবেগে ছুটে চলে, মাটিতে পা তখন ঠেকে কি না ঠেকে। টুপিওয়ালা সওয়ারীর হাতে থাকে একটা ছড়ি, তার এক প্রান্তে খানিকটা শণের মত চামর দেওয়া, লোকটি হয়তো অন্যমনস্ক হয়ে ভাবতে ভাবতে একবার হঠাৎ চোখ পাকিয়ে বিষম রেগে উঠে পথের দিকে চেয়ে দেখে—ব্যাটা তো ভুল পথ দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ! এমনি ক'রে কত চাবুক যে পিঠে প'ড়েছে তার কি ঠিক আছে ? তার পিঠের ডানার হাড় দু'খানা চাবুকের আঘাতের প্রতীক্ষায় সর্ব্বদা কোঙা হ'য়েই থাকে। কিন্তু ভাড়া নেবার সময় সাহেবদের কাছ থেকে ন্যায্য পাওনার চেয়ে কিছু বেশী আদায় না করেও সে ছাড়ে না, পূরোদমে দৌড়ুতে দৌড়ুতে কোনো হোটেল বা অফিসের দরজায় পৌঁছে থাম্‌তে বল্‌লেই সে হঠাৎ একেবারে থেমে পড়ে, তার পর কম্পাস মাটিতে নামিয়ে এমনভাবে মুখ কাঁচু মাঁচু করে, ঘর্ম্মাক্ত হাত দু'খানি পেতে দাঁড়ায় যে কিছু পয়সা তাকে বেশী না দেওয়া তখন অসম্ভব।

একদিন দুপুর বেলাকার ভরা রৌদ্রে নিতান্ত অসময়ে সে বাড়ী ফিরে গেল ; তখন চড়াই পাখীর দল ভারী ব্যস্ত হ'য়ে ছুটাছুটি করছে, ঝাঁকে ঝাঁকে টিয়া পাখীরা কলধ্বনি করতে করতে আলো-ছায়ার ঝোপের ভিতর থেকে বেড়িয়ে তীরের মত এ গাছে ও গাছে উড়ে যাচ্ছে, বহুরূপী রঙীন্ গিরগিটীগুলো গলা ফুলিয়ে নারিকেল গাছ বেয়ে সর্ সর্ করে উপরে উঠছে, নানা রকম রং-বেরঙের প্রজাপতি বাতাসে ভর করে অলস-গতিতে আকাশে ভেসে বেড়াচ্ছে—তাদের ডানা একটুও নড়্ছে না। এক একটা মাটির ঢিবির গায়ে অসংখ্য পিঁপ্ড়ের দল দীর্ঘ সার বেঁধে মন্থর গতিতে চলেছে। একদিক থেকে বনের মধ্যে জন্ম-মৃত্যু-বিধাতার অস্ফুট জয়গান উঠছে আর অন্যদিকে খাদ্যখাদক সম্পর্কের নানা জীব পরস্পর পরস্পরকে ধ্বংস ক'রে ক্ষণিক উল্লাসে উন্মত্ত হচ্ছে,—এমন সময় কোনো দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে তাড়াতাড়ি সে ঘরে ফিরে গেল। তখন আর কিছুই সে চায় না কেবল কষ্ট থেকে একটু মুক্তি চায় ; অন্ধকার মেটে ঘরের এক কোণে গিয়ে সে একেবারে শুয়ে পড়্ল আর কলেরা হয়ে হাত পা খেঁচে সন্ধ্যার মধ্যেই মারা গেল। সূর্য্য যখন সমুদ্রের পশ্চিম দিগন্তে মেঘের কোলে লাল আর ধূসর আর সোনালি দেওয়া অপূর্ব্ব বর্ণ-বিন্যাস রচনা করে অস্ত গেল, সেই সঙ্গে সঙ্গে তারও জীবন-প্রদীপ নিব্লো। রাত্রিকাল এলো,—সেই রাত্রে সেই নগর-প্রান্তে বনের ভিতর রিক্শওয়ালার অস্তিত্বের মধ্যে অবশিষ্ট রইল তার শবদেহটি, তখন আর তার নম্বরও নেই নামও নেই ; কল্যাণী নদীটি যখন সমুদ্রে এসে পড়েছে তখন যেমন তার পরিচয় হারিয়ে গেছে এও যেন ঠিক তাই। সূর্য্য যখন ডুবে যায় তখন সমুদ্রে একটা বাতাসের চাঞ্চল্য ওঠে ; মানুষ যখন যায় তখন কি কিছু হয় ?···রাত্রি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রূপকথার পরীর দেশের মত গোধূলির সেই ধূসর কোমল গোলাপী আভা ধীরে ধীরে মুছে গেল, বাদুড়গুলো গাছতলা দিয়ে নিঃশব্দে উড়ে গিয়ে আপন আপন রাত্রির আশ্রয় খুঁজে নিলে, বনের ভিতর জমাট অন্ধকারের মধ্যে অসংখ্য জোনাকির আলো জ্বলে উঠ্লো। ঝিঁঝিঁ-পোকার ডাকে আর পাতার মর্ম্মরে একটা রহস্যের আভাস জেগে উঠ্লো। দূরের মন্দিরে মিট্মিট্ ক'রে সন্ধ্যা-প্রদীপ জ্বলছে, ভিতরকার বেদীতলে নৈবেদ্যের চাল আর ঝরা ফুলের পাপড়ি ইতস্ততঃ ছড়ানো, কৃষ্ণ মর্ম্মরের

বেদীর উপর চন্দন কাষ্ঠে গড়া ভগবান বুদ্ধের অর্দ্ধ-শয়ান বিরাট মূর্ত্তি; মূর্ত্তি দক্ষিণ পাশে হেলে শুয়ে আছে, একটি হাত চিবুকে লগ্ন, প্রশস্ত মুখখানিতে সোনালি রঙ্ মাখানো, চোখ দু'টি টানা টানা, ঠোঁটে বিষাদ-ম্লান ঈষৎ হাসির স্নিগ্ধ রেখা।

অন্ধকার কুটরীতে রিক্‌শওয়ালার শব-দেহ চিৎ হ'য়ে প'ড়ে রইল, বীভৎস মুখে মৃত্যুকাতরতার চিহ্ন; ভগবান বুদ্ধের উচ্চারিত সংসার-মায়া-ত্যাগের উপদেশ-বাণী তার কানে তো পৌঁছয়নি, এ জন্মে সে যত পাপ সঞ্চয় করেছে, পরজন্মে সেজন্য তাকে আরও অনেক দুঃখ ভোগ করতে হবে। তার বিকৃতদশনা বৃদ্ধা স্ত্রী দরজার একপাশে উনুনের ধারে বসে সমস্ত রাত কাঁদতে লাগলো, অবোধ মায়া আর মোহ তাকে শোকে উদ্বেল করে তুল্‌লে। ভগবান তথাগত হয়তো ওর শোকের তুলনা দিতেন ওরই কানে-পরা তাম্র কুণ্ডলের সঙ্গে—যার গুরুভারে ওর কানের পাতা একেবারে ঝুলে পড়েছে আর তার ছিদ্রটা এখন প্রকাণ্ড গর্ত্তের মত ফাঁক হয়ে গেছে। তার কালো দেহে আঁটা সাদা কাপড়ের কাঁচুলিটাই কেবল অন্ধকারের মধ্যে সুস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। অনতিদূরে উলঙ্গ ছেলেমেয়েগুলো খেলা করছে, চীৎকার করে হুটোপাটি করছে। বড় ছেলেটি এখন তরুণ যুবা, সে উনুনের ধারে এক পাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। সেইদিন সন্ধ্যাবেলা সে গিয়েছিল তার পাশের গাঁয়ের প্রণয়িণীর কাছে,—যার বয়স মাত্র তেরো বছর, মুখখানি বেশ গোল। বাপের মৃত্যুর খবর পেয়ে প্রথমটা সে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল, হঠাৎ যে এমন হবে তা ইতিপূর্ব্বে কখনো কল্পনাও করেনি। তবু ওর মনে এখন যে নবীন প্রেম জেগে উঠেছে সেটা বোধ হয় পিতৃ-প্রেমের চেয়েও বলবান। ভগবান তথাগত একদিন এমনি স্থলে বলেছিলেন, "হে যুবক, অগ্নির স্পর্শ দিয়ে যেমন অগ্নি জ্বালা হয় তেমনি তোমার প্রাণের স্পর্শ দিয়ে তুমি অপরের প্রাণ প্রজ্বলিত করতে উৎসুক; কিন্তু একথা যেন ভুলনা যে, এই হস্তারক পৃথিবীতে যত দুঃখ শোক কেবল প্রেম হতেই উদ্ভূত।" কিন্তু বিছা যেমন করে তার বিবরে প্রবেশ করে তেমনি করে প্রেম ইতিমধ্যে এই যুবার বুকের কন্দরে আমূল প্রবেশ করেছে।

আগুনের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে সে দাঁড়িয়ে রইল। ছেলেটির পা দু'খানি খুব লম্বা কিন্তু তার মসৃণ দেহের যে সুঠাম গঠন স্বয়ং শিবও যেন তার কাছে লজ্জিত। কালো চুলগুলি মাথার উপর চূড়া করে বাঁধা, আগুনের আভা মুখের উপর এসে পড়েছে, চোখ দু'টি জ্বলছে—হাপরের মুখ আগুনের মত।

পরদিন প্রতিবেশীরা বৃদ্ধের মৃতদেহটা গভীর বনের ভিতর নিয়ে গেল, সেখানে গর্ত্ত কেটে পশ্চিম দিকে মাথা করে তাকে শুইয়ে দিলে, তার উপর পাতা মাটি চাপা দিয়ে এসে স্নান করে শুদ্ধ হোলো। বৃদ্ধের ছুটাছুটি সাঙ্গ হোলো, তার রিক্‌শ'র তক্‌মাটি উত্তরাধিকারসূত্রে তার ছেলে গর্ব্বভরে নিজের হাতে পরলে। প্রথম কিছুদিন সে অভিজ্ঞ রিক্‌শওয়ালাদের সঙ্গে ঘুরে বেড়ালে, তারা সওয়ারী নিয়ে কোথায় কোথায় ঘোরে সেটা দেখলে, ইংরাজী কোন্ কথার কি মানে হয় তা মুখস্থ করে নিলে, কোন্ রাস্তার কি নাম তাও জানলে; তারপর নিজেই রিক্‌শ নিয়ে পয়সা রোজগার আরম্ভ করে দিলে। তার এখন প্রণয়ের পাত্র জুটেছে, সে এখন নিজের মনের মত সংসার পাত্‌তে চায়; এই রকম বাসনা থেকেই ক্রমে পুত্রকন্যার বাসনা আসে, তার থেকে আসে সম্পদের আকাঙ্ক্ষা, তার থেকে যত সুখের অভিলাষ। কিন্তু একদিন বাড়ী ফিরে সে আবার এক নতুন দুঃসংবাদ শুন্‌লে; তার ভাবী বধূটি কোথায় হারিয়ে গেছে, দাস-উপদ্বীপের বাজারে গিয়েছিল কি কিন্‌তে, তারপর থেকে আর তাকে পাওয়া যাচ্ছেনা। বাক্‌দত্তা মেয়েটির বাপ কলম্বো সহরের পথ ঘাট ভাল চেনে, প্রায়ই সেখানে যাতায়াত করে থাকে; সে তিনদিন ধরে মেয়েকে খুঁজে যেন নিশ্চিন্ত হয়ে ফিরে এলো, বোধ হোলো নিশ্চয় কিছু সন্ধান সে পেয়েছে, কিন্তু কোনো কথাই সে ভাঙ্‌লেনা, কেবল একটু দীর্ঘ-নিঃশ্বাসের সঙ্গে দু'ফোঁটা চোখের জল ফেল্‌লে, অদৃষ্টকে ধিক্কার দিলে; লোকটা অতি শঠ, যাদের অনেক পয়সা থাকে, সহরে গিয়ে ব্যবসা করে তারা যে রকম ধূর্ত্ত হয় এ বৃদ্ধও সে রকমের ধূর্ত্ত। তার দেহটা বেজায় মাংসল, বুকের মাংস স্ত্রীলোকের মত ঝুলে পড়েছে, পাকা চুলে সযত্নে সিঁথি কাটা তাতে দামী একটা চিরুণী গোঁজা; খালি পায়ে চলে কিন্তু

মাথায় ছাতা দেয়; রঙীন কাপড়ের লুঙ্গি পরে, হাঁসিয়া দেওয়া জামা গায়ে দেয়। তার কাছে কথা বের করা বড় কঠিন। তবে স্ত্রীলোক মাত্রেই তো চঞ্চলমতি, বিশেষ যদি অবিবাহিত হয়,—নদী যেমন ক্রমাগতই এঁকে-বেঁকে চলে সেই রকম হয় এদের চরিত্র; রিক্‌শওয়ালা যুবক সব কথাই বুঝতে পারলে। বিভ্রমের ঘোরে তবু সে প্রথম দু'দিন ঘরে চুপ করে বসে রইল, এমন কি অন্ন স্পর্শ পর্য্যন্ত করলেনা। তারপর নিজেকে সাম্‌লে নিয়ে আবার সহরে গাড়ী টানতে চলে গেল। তখন দেখা গেল যেন তার ভাবী বধূর কথা একেবারেই ভুলে গেছে। রিক্‌শ নিয়ে আবার খুব ছুট্‌তে লাগলো, কৃপণের মত পয়সাও বাঁচাতে লাগলো,—দেখে বোঝবার উপায় নেই সে ছুট্‌তে বেশী ভালবাসে—না টাকাই তার অধিক প্রিয়। একজন রুষীয় নাবিক একদিন তার রিক্‌শতে বসে একটা ফোটো তোলালে, সেই ছবি একখানা তাকে উপহারও দিয়ে গেল। অনেকদিন পর্য্যন্ত সে রোজ রোজ এই ছবিটা দেখতো, নিজের প্রতিকৃতি ছবিতে দেখে ভারী খুসী হোতো; গাড়ীর কম্পাস দু'টি ধরে দাঁড়িয়ে যেন সে কাল্পনিক দর্শকদের দিকে চেয়ে আছে,—ছবিখানা যেই দেখে সেই তাকে চিনতে পারে, এমন কি তার হাতের তক্‌মাটা পর্য্যন্ত পরিষ্কার উঠেছে। এমনিভাবে অন্ততঃ আপাতদৃষ্টিতে বেশ সুখে-সৌভাগ্যে তার ছয়মাস প্রায় কেটে গেল।

দাস-উপদ্বীপ থেকে ভিক্টোরিয়া পার্ক পর্য্যন্ত যে প্রশস্ত রাস্তা চলে গেছে তার একস্থানে এক প্রকাণ্ড অশথ গাছের তলায় সে একদিন অন্যান্য রিক্‌শওয়ালাদের সঙ্গে বসে আছে; কতক্ষণ আগে পূর্ব্বদিক থেকে সূর্য্য উঠেছে, অশথ গাছটা খুব উঁচু বলে তার গুঁড়ির কাছে তখনো ছায়া পড়েনি; কতকগুলো শুক্‌নো পাতা সেখানে ছড়ানো পড়ে আছে; গাড়ী তেতে গরম হয়ে উঠেছে, কম্পাসগুলো লাল মাটির উপর নামানো আছে, মাটি থেকে যেন একটা পোড়া পোড়া গন্ধ উঠছে। আশপাশের বাগানের নানারকম ফুলের আর পাকা কলার একটা সুমিষ্ট গন্ধও এর সঙ্গে পাওয়া যাচ্ছে; রিক্‌শওয়ালারা সেখানে বসে পাকা কলা খাচ্ছে। কলার ওপরকার সোনালি রঙের নরম খোসাগুলি একটি একটি করে

ছাড়িয়ে ফেলছে আর তার ভিতরটা দেখা যাচ্ছে কচি ছেলের দেহের মত নিটোল। খেতে খেতে তারা উবু হয়ে হাঁটু মুড়ে মাটিতে বসেছে, এক হাত দিয়ে হাঁটু ঘিরে ধরেছে, মাথায় স্ত্রীলোকের মত ঝুঁটি বাঁধা, পরস্পরে আপন মনে গল্প করছে। হঠাৎ দেখা গেল অনেক দূরের একটা সাদা বাংলোর ভিতর থেকে বেরিয়ে সাদাপোষাক পরা একটি লোক আলো-ছায়ার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে—তাদেরই দিকে। লোকটি রাস্তার মাঝ দিয়ে হাঁটছে, তার দৃঢ় পদক্ষেপ দেখলেই বেশ চেনা যায়,—ইউরোপীয় ছাড়া আর কেউ এমন দৃপ্ত ভঙ্গীতে হাঁটতে পারেনা। সকল রিক্‌শওয়ালা তৎক্ষণাৎ একসঙ্গে লাফিয়ে উঠে তীব্র বেগে তার দিকে ছুট্‌লো, সকলেই চায় আগে তার কাছে উপস্থিত হতে। কাছে গিয়ে তারা চারিদিক থেকে তাকে ঘিরে ধরলে, লোকটি বেত উঁচিয়ে এক ধমকে তাদের থামিয়ে দিলে। ভয়ে তারা একেবারে চুপ করে দাঁড়িয়ে গেল, তখন তাদের দিকে চেয়ে বাছতে বাছতে সাত নম্বরের কালো রিক্‌শওয়ালাটিকে সকলের চেয়ে জোয়ান বলে লোকটির মনে হোলো; সাত নম্বরটিকেই সে পছন্দ করে নিলে।

আগন্তুক লোকটি বেশ হৃষ্ট-পুষ্ট আর কিছু বেঁটে, চোখে সোনার চশমা, কালো ভ্রূ'দুটি জোড়া, গোঁফ ছোট করে ছাঁটা, গায়ের রং ঝল্‌সানো লাল; এদেশের প্রখর রৌদ্র লেগে আর লিভারের দোষে মুখখানা যেন তাঁবাটে হয়ে গেছে। মাথার টুপিটার খাকী রং; কালো ভ্রূ আর কালো পল্লবের ভিতর থেকে চোখ দু'টি চশমার পুরু কাঁচের মধ্য দিয়ে এমন অদ্ভুতভাবে চাইতে থাকে যেন কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। রিকশ'য় চড়ে অভ্যস্তের মত সে এমন ভাবে হেলান দিয়ে বসল যাতে রিক্‌শওয়ালার টান্‌তে সুবিধা হয়; কব্জিতে বাঁধা চামড়ার বেষ্টনীর মধ্যে ছোট ঘড়িটার দিকে চেয়ে সময়টা একবার দেখে নিলে—হাতখানি বেশ সুপুষ্ট ও বলিষ্ঠ, তার উপর উল্কি আঁকা—তারপর হাঁক্‌লে "ইয়র্ক ষ্ট্রীট্‌"। গলার স্বর শান্ত গুরুগম্ভীর, কিন্তু চোখে সেই অদ্ভুত দৃষ্টি। রিক্‌শওয়ালা কম্পাস ধরেই প্রাণপণে ছুটতে লাগলো আর তার এক প্রান্তে বাঁধা ঘণ্টাটি প্রতি মুহূর্ত্তে ঠুন্‌ ঠুন্‌ করে বাজাতে বাজাতে রাস্তার লোকের ভিড়ের মধ্য দিয়ে, অসংখ্য গরুর গাড়ী

আর রিক্শগাড়ীর ভিতর দিয়ে এঁকে-বেঁকে পাশ কাটিয়ে পথ করে যেতে লাগলো।

তখন মার্চ্চ মাস শেষ হয়ে গেছে, এই সময়টাই সকলের চেয়ে গরম। সূর্য্য উঠেছে এখনও তিন ঘণ্টা হয় নি, এর মধ্যেই রৌদ্রের তেজ এমন প্রখর হয়েছে—আর বাজারে এত লোক জমেছে যে, মনে হয় প্রায় ভরা দুপুর। বড় বড় গাছের অনেক ডালপালা বাংলোগুলির ছাদের উপর নুয়ে পড়েছে, কত বাড়ীর মাথায় মাথায় ঝরা ফুল আর শুক্নো পাতা ছড়িয়ে গেছে,—চারদিককার গাছ থেকে, বাগান থেকে, মাটি থেকে যেন তপ্ত নিঃশ্বাস উঠে আকাশ বাতাস ভারী করে তুলেছে। কালো টালির ছাউনি দেওয়া সারি-সারি দোকান ঘর, ভিতরে দেখা যায় দেয়ালের গায়ে বড় বড় কলার কাঁদি ঝুল্ছে, কত সমুদ্রের মাছ শুকিয়ে টাঙানো আছে, সেখানে দেশীয় খরিদ্দারের বড় ভিড়। রিক্শওয়ালা ঝুঁকে পড়ে বেদম ছুটছে, এখনও শরীরে তার ঘাম দেখা দেয়নি, তেল মাখানো পিঠের চামড়া চক্চক্ করছে, কাঁধের উপর থেকে সরু গলাটি গতির তালে তালে সুঠাম ভঙ্গীতে নেচে উঠছে, মাথার কালো চুলে রোদের আলো ঝিক্মিক্ করছে। রাস্তাটা যেখানে শেষ হোলো সেখানে পৌঁছে সে হঠাৎ একবার থম্‌কে দাঁড়ালো, ঘাড় ফিরিয়ে নিজের ভাষায় অস্ফুট স্বরে কি একটা কথা বল্‌লে। আরোহী ইংরাজ ভদ্র-লোকটি তার মুখ দেখতে পেলেন, একটি কথা মাত্র কানে এল—'পান'। সে কী! এমন জোয়ান ছোকরা এইটুকু পথ চলেই পান খেতে চায়! কোনো কথা না বলে হাতের বেত দিয়ে সে রিক্শওয়ালার পিঠে আঘাত করলে। কিন্তু সিংহলী ভীরু হলেও সময় সময় বড় একগুঁয়ে হয়, সে গ্রাহ্য মাত্র না করে ঘাড় নেড়ে একেবারে পথের এক পাশে পানের দোকানে গাড়ী নিয়ে হাজির হোলো।

গাড়ী রেখে কুকুরের মত দাঁত বার করে, চোখ পাকিয়ে সে আবার বল্‌লে—'পান'। কিন্তু ইংরাজ ভদ্রলোক এতক্ষণ অন্যমনস্ক হয়ে সে কথা ভুলেই গেছে। এক মিনিট পরেই হাতে একটি পান নিয়ে সে দোকান থেকে বেরিয়ে এলো, তাতে একটু চুণ লাগালে, এক কুচি সুপুরি দিয়ে সেটা মুড়ে ফেল্‌লে। "হত্যা কোরোনা, চুরি কোরোনা, মিথ্যা বোলোনা,

চরিত্রস্খলন কোরোনা,—আর কোনো রকমের নেশার অভ্যাস কোরোনা” — ভগবান তথাগত সকলকে এই উপদেশ দিয়ে গেছেন। কিন্তু রিক্‌শওয়ালা সে খবর কি জানে? ওর পূর্ব্বপুরুষরা যে বাক্য অস্পষ্টভাবে মাত্র গ্রহণ করেছিল, ওর মনে বেজেছে শুধু তারই কিছু অস্পষ্টতর প্রতিধ্বনি। অনেক বর্ষা-উৎসবের সময় বাপের সঙ্গে সে পূজা-মন্দিরে গিয়েছে, বিস্মৃত প্রাচীন ভাষায় সেখানে মন্ত্রপাঠ শুনেছে, কিন্তু বোঝেনি কিছুই—সকলে যখন ভগবানের জয়োচ্চারণ করেছে সেইসঙ্গে সেও করেছে, সকলে যখন প্রণাম করেছে তখন সেও তাই করেছে। অনেকবার তার বাপ ঐ দারু-প্রতিমার সুমুখে হাত জোড় করে তাঁর স্তুতি-মন্ত্র উচ্চারণ করেছে আর তার কষ্টার্জ্জিত অর্থ থেকে যৎসামান্য পূজো দিয়েছে। কিন্তু সে লক্ষ্য করে দেখেছে এতে কেবল ভক্তি অপেক্ষা ভয়টাই বেশী,—যদি কিছু পাপ হয় এবং যদি কিছু শাস্তি পেতে হয় যেন সেইজন্যই এ ভয়,—যেমন ভয় করতে হয় ভূতকে, সাপকে, দুষ্ট গ্রহকে, অন্ধকারকে…।

পানটা মুখে ভরে রিক্‌শওয়ালার স্ফূর্ত্তি দেখা দিলে, হাসি মুখে কম্পাস তুলে নিয়ে আবার সে ছুটতে সুরু করলে। তখন রৌদ্রের খুব ঝাঁঝ; ইংরাজ ভদ্রলোক যতবার মুখ তুল্‌ছে ততবার তার চশমার কাচ আর সোনার ফ্রেমে রৌদ্র কিরণ ঠিকরে পড়ছে, তাপ লেগে তার হাত পা যেন ঝল্‌সে যাচ্ছে। পৃথিবী যেন এখন গাঢ় নিঃশ্বাস ছাড়ছে, মাটির উপরকার হাওয়া যে-তাপে কেঁপে উঠছে সেটা যেন স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে—আগুনের কড়ার ভিতর থেকে লেলিহান শিখা উঠলে তার উপরকার হাওয়াও এমনি করে কাঁপতে থাকে ;—কিন্তু তবু সে ভদ্রলোক নিশ্চল হয়ে বসে আছে, গাড়ীর হুড্‌টাও মাথার উপর টেনে দিতে বলছেনা। কেল্লার দিকে যাবার দু’টো রাস্তা আছে; একটা রাস্তা গেছে ডান দিকে মালয় প্যাগোডা পার হয়ে খালের বাঁধের উপর দিয়ে; আর একটি রাস্তা গেছে বাঁ দিক দিয়ে সমুদ্রের ধারে ধারে। ইংরাজ ভদ্রলোক বাঁ-দিকের রাস্তা দিয়ে যেতে চেয়েছিল, কিন্তু রিক্‌শওয়ালা মুখ ফিরিয়ে রাঙা ঠোঁটের এমন ভাব দেখালে যেন কথাটা বুঝতে পারেনি। সে ডান দিকের রাস্তা ধরলে, ভদ্রলোক কিন্তু তার ইচ্ছাতেই সায় দিলে, অন্যমনস্ক হয়ে কেবল চারদিকে চাইতে

লাগলো। খালটা পথের ডাইনে পড়ে ; তার সবুজ জল টল্ টল্ করছে, তাতে কেবল কচ্ছপ আর পচা পানা, অপর পারে এক নারিকেল-কুঞ্জ। বাঁধের উপরের রাস্তা দিয়ে নানারকম পথিক চলেছে, কেউ বা ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছে। এখানে কয়েকজন রিক্‌শওয়ালা দেখা যাচ্ছে, তাদের মাথায় পাগড়ী বাঁধা ; পরণে সাদা পিরাণ সাদা পায়জামা। ঐ সব রিক্‌শতে যে ইউরোপীয় সওয়ারী দেখা যাচ্ছে তাদের মুখের চেহারা ফ্যাকাশে,—যেন অনিদ্রাকাতর ; তারা পায়ের উপর পা তুলে বসেছে। একটা মোষের গাড়ী পাশ দিয়ে চলে গেল,—ঐ গাড়ীর ছইয়ের মধ্যে বসে আছে একজন বৃদ্ধ পার্শী, পরণে তার লম্বা আচকান, মাথায় জরী দেওয়া টুপি। ঢিলা পায়জামা পরা দীর্ঘদেহ এক কাবুলিওয়ালা, গায়ে তার ঢল্‌ঢলে সাদা জামা, পায়ে শুঁড় তোলা জুতো, মাথায় প্রকাণ্ড পাগড়ি, সে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে জলের দিকে চেয়ে কচ্ছপ দেখছে। সারি সারি মালবোঝাই গরুর গাড়ী মন্থর গতিতে চলেছে, লোলচর্ম্ম দু' একটি বৃদ্ধ রৌদ্রে পুড়তে পুড়তে এক পা লাল ধূলো মেখে গাড়ীর চাকার পাশে পাশে যাচ্ছে।…কেল্লাতে প্রবেশের মুখে যখন তারা এক বহুকালের পুরানো পান্থ-পাদপের তলায় এসে পৌঁছলো তখন ইংরাজ ভদ্রলোক একটি চায়ের দোকানের নাম উল্লেখ করে হুকুম দিলে—"চল প্যাগোডাতে।"

গাড়ী এসে থামলো একটি পুরানো ডাচ্ ফ্যাশানের অট্টালিকার ফটকের সাম্‌নে। ভদ্রলোক একবার ঘড়িটা দেখে নেমে গেল, সেখানে বসে কিছুক্ষণ চা চুরুট খাবে। রিক্‌শওয়ালা গাড়ী ঘুরিয়ে নিয়ে রাস্তার ওপাশে এক ছায়া-নিবিড় গাছের তলায় রেখে একেবারে বসে পড়ল ; সেখানে বাঁধানো ফুটপাথের ওপর হল্‌দে আর লাল ঝরা ফুলে সমস্ত গাছতলা ছেয়ে গেছে। সে সেখানে উবু হয়ে বসে হাঁটুর উপর হাত রেখে এই মধ্যাহ্নের তপ্ত সৌরভ উপভোগ করতে লাগলো আর আনমনে নানারকম দেশী বিদেশী পথিকদের পানে কতক্ষণ চেয়ে রইল। কোমর থেকে গামছা খুলে নিয়ে সে মুখ মুছলে, ঠোঁট মুছলে, বুকের ঘাম মুছে ফেল্‌লে, তারপর সেটা মাথায় জড়ালে ; মাথায় ময়লা গামছা জড়ালে তাকে ভাল দেখায় না, মনে হয় যেন কোনো অসুখ করেছে, কিন্তু সব রিক্‌শওয়ালাদের

এটা অভ্যাস। সেখানে এমনি বসে বসে হয়তো কত কথাই সে ভাবতে লাগলো।···আনন্দ বলেছিলেন ভগবান বুদ্ধকে—"হে প্রভু! আমাদের পরস্পরের শরীর পৃথক, কিন্তু হৃদয় সকলেরই এক।" অতএব যে যুবক কলম্বো সহরের কাছে মানুষ হয়েছে, আর সর্ব্বাপেক্ষা তীব্র বিষ রমণী-প্রেমও একবার আস্বাদ করেছে,—আকাঙ্ক্ষাময় যে জীবন আবেগভরে সুখের পিছনে নিত্য ছুটে যায় আর দুঃখ থেকে দূরে পালায় সেই জীবন-স্রোতে যে একবার ঝাঁপ দিয়েছে,—তার মনের চিন্তাধারা কি হতে পারে সে কথা অনুমান করা বিশেষ কঠিন নয়। রুদ্র তাকে ইতিমধ্যে তীব্র আঘাত দিয়ে গেছে কিন্তু সেই রুদ্র আবার ক্ষতকে আরোগ্যও করে দেয়। মানুষ যেটাকে আঁকড়ে ধরে রুদ্র তার হাত থেকে সেটাকে ছিনিয়ে নেয়,—কিন্তু আবার সেটাকেই সে নূতন করে আঁকড়ে ধরতে বলে, নয়তো নূতন কিছুকে ধরবার জন্য প্রলুব্ধ করে।···

চা খাওয়া সেরে ইংরাজ ভদ্রলোক কিছুক্ষণ পথের ধারে ধারে ঘুরতে লাগলো; দোকানে কত রকমারি জিনিষ সাজানো রয়েছে, কোথাও বা নানা রকমের মণিমুক্তা, কোথাও আবলুশ কাঠের বুদ্ধমূর্ত্তি বা কারুকার্য্য-করা নানারকমের হাতী, কোথাও সৌখীন গালার কাজ করা আসবাব-পত্র, কোথাও বা সোনালি রংয়ের উপর ডোরাকাটা বাঘের চামড়া,—ঘুরে ঘুরে সে এইসব দেখে বেড়াতে লাগলো আর রিক্‌শওয়ালা নিজের ভাবনা ভাবতে ভাবতে পথের পরিচিত অন্যান্য রিক্‌শওয়ালাদের চোখের ইসারায় আপ্যায়িত করতে করতে গাড়ী নিয়ে তার পিছু পিছু যেতে লাগলো। যখন বেলা বারোটা বাজলো তখন তাকে খাবার কিনে খেতে একটা টাকা বখ্‌শিশ দিয়ে ইংরাজ ভদ্রলোক মস্ত এক জাহাজের অফিসে ঢুকে গেল। রিক্‌শওয়ালা কিন্তু তাই থেকে কেবল কতকগুলো সিগারেট কিনলে, তার একটার পর একটা ধরিয়ে ক্রমাগত জোরে জোরে টানতে লাগলো আর মেয়েদের মত বার বার চেয়ে দেখতে লাগলো কতখানি পুড়ছে, এই রকম করে সে পাঁচটা সিগারেট একে একে শেষ করলে। তিন-তলা-বাড়ীটার ছায়ার তলায় বসে সে ধোঁয়ার নেশায় মশ্‌গুল হয়ে আছে,—এক সময় চোখ তুলে হঠাৎ দেখতে পেলে তার আরোহী আর পাঁচজন

সাহেবের সঙ্গে উপরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে এক একটা দূরবীণ চোখে দিয়ে বন্দরের দিকে চেয়ে আছে, সেখানে একটা জাহাজ ঘাটে এসে ভিড়ছে তার মাস্তুল দু'টো কেবল দেখা যাচ্ছে। বারান্দার সাহেবরা ঘন ঘন রুমাল আন্দোলন করতে লাগলো, আর ঐ জাহাজ থেকে তার প্রত্যুত্তরে গুরুগম্ভীর বাঁশী সজোরে বেজে উঠলো, সহরময় পথে ঘাটে সে শব্দ প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠলো। সাত নম্বর রিক্‌শ'র আরোহী আজ সুদূর ইউরোপ থেকে যে জাহাজের আগমন প্রতীক্ষা করছিল সেই জাহাজ এসে পৌঁছেছে। কুড়িদিনের সমুদ্রযাত্রার পর ইংরাজ চরিত্রের বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে ঠিক নির্দ্দিষ্ট সময়ে জাহাজটা কলম্বোতে পৌঁছুলো; তখনই ওদের পরস্পরের মধ্যে ঠিক হয়ে গেল সেই রাত্রে জাহাজের বড় সাহেবের খালধারের বাড়ীতে এক ভোজ দেওয়া হবে; এই ভোজ যে রিক্‌শওয়ালার পক্ষে এমন মারাত্মক হবে তা সে বেচারা তখন মোটে কল্পনাই করে নি।

কিন্তু ভোজ হতে তখনও অনেক দেরী, সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তখনও যথেষ্ট সময় আছে। সেই ভদ্রলোক যাকে দেখলেই মনে হয় চশমার ভিতর থেকে কিছুই দেখতে পাচ্ছেনা,—সে আবার রাস্তায় নেমে এল। সঙ্গে আরও দু'জন, তারা বিদায় নিয়ে ঘাটের দিকে চলে গেল; রিক্‌শওয়ালা আবার গাড়ী নিয়ে ছুটলো এক হোটেলের উদ্দেশে, সেখানে বহু সদ্যাগত ভ্রমণকারী ও স্থানীয় ধনী-বাসিন্দার দল একটা আধা-অন্ধকার ঘরে একসঙ্গে বসে খাওয়া-দাওয়া করছে, মাথার উপর একখানা পাখা চলছে। রিক্‌শওয়ালা আবার সেখানে ছাড়া পেয়ে ফুল ছড়ানো ফুটপাথের উপর বসে পড়লো। সেখানে গাছগুলির মাথায় যে কাঁচা সবুজ রংয়ের কিশলয়-গুচ্ছ পরস্পর জড়াজড়ি করে আছে তার জাল বোনা ছায়া নীচে এসে পড়েছে; সেই ছায়া-পথ দিয়ে চলেছে ঝুঁটি বাঁধা সিংহলীর দল, তাদের মধ্যে কেউ বা রঙিন ছবির পোষ্টকার্ড হাতে নিয়ে সাহেব দেখলেই তাদের সুমুখে গিয়ে ধরছে। কেউ বা ঝিনুকের চিরুণী প্রভৃতির ফেরি করছে, কেউ বা নানা রকমের মনোহারী পাথরের পসরা নিয়ে ঘুরছে, একজন একটা সজারুর গলায় দড়ি বেঁধে টেনে এনে বেচবার চেষ্টা করছে,—এই সাহেব পাড়ায় অনেকেই লাভের আশায় ঘুরতে আসে।...

দূরে খানিকটা চতুষ্কোণ ঘাসের জমির মাঝখানে উঁচু মর্ম্মরবেদীর উপর শ্বেত-পাথরের এক বিরাট রমণীমূর্ত্তি—মাথায় মুকুট আর হাতে রাজদণ্ড নিয়ে দৃপ্ত ভঙ্গীতে সিংহাসনের উপর বসে আছে, রৌদ্রালোকে তার ধবল রং আরো জাজ্জ্বল্যমান হয়ে উঠেছে। যে সব সাহেবের দল এইমাত্র জাহাজ থেকে পদার্পণ করেছে তারা ঐদিক থেকে এসে হোটেলে ঢুকলো। হোটেলের দ্বাররক্ষীরা সসম্ভ্রমে সেলাম করে তাদের হাত থেকে ছড়ি ব্যাগ প্রভৃতি নিয়ে তাদের ভারমুক্ত করলে, একজন সুসজ্জিত ভদ্রলোক পাট করা চুলে আর ফিটফাট পোষাকে বেরিয়ে এসে মাথা নীচু করে মার্জ্জিত কায়দায় তাদের অভিবাদন করতে লাগলো...ভগবান তথাগত বলেছিলেন,—“মানুষ নিত্য ভোগ-বিলাসে রত হতে চায়, ক্ষণে ক্ষণে ভোজের উৎসব করে, নিত্য নূতন আনন্দের নানা অভিযান করে। ভোগ্য সামগ্রীর রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শে তারা প্রমত্ত হয়ে ওঠে। মনোহারী সবুজ রঙের বিষাক্ত লতা যেমন করে শালগাছকে জড়িয়ে ধরে, কামনা মানুষকে তেমনি করেই জড়ায়।” শোনা যায় এই সিংহল দ্বীপে, যেখানে আদিম মানব কামনার প্রথম আস্বাদ পেয়েছে,—এই ভূস্বর্গে নাকি ভগবান তথাগত একবার পদার্পণ করেছিলেন।...যারা হোটেলে প্রবেশ করলে তাদের সকলের মুখে ক্লান্তির চিহ্ন, সমুদ্রপীড়ার কাতরতা ও অসুস্থতার চিহ্ন। তাদের যেন প্রায় অর্দ্ধমৃত অবস্থা, মুখে কারো ভাল করে কথা সরছেনা; তবু তারা দৃঢ় পদে একে একে অগ্রসর হয়ে ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেল, হাত মুখ ধুয়ে জিরিয়ে নেবার জন্য নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট কামরায় প্রবেশ করলে। এর পরই খাদ্য পানীয়ের দ্বারা পরিতৃপ্ত হয়ে, কাফি চুরুটের দ্বারা পুনর্জ্জীবিত হয়ে তাদের মুখ আবার লাল হয়ে উঠবে, তখন তারা রিক্শতে চড়ে সমুদ্রতীরে বেড়াবে, ঘুরে ঘুরে দেখবে বাগান, হিন্দু মন্দির আর বৌদ্ধ বিহার। এদের প্রত্যেকের অন্তরেই সেই ক্ষুধা আছে যা মানুষকে নিত্য বাঁচিয়ে রাখে আর নিত্য নূতন কামনার জোগান দিয়ে তাকে প্রলুব্ধ করে। আর এই আদিম দ্বীপের বাসিন্দা রিক্শওয়ালার কি সে মোহ নেই,—তাকে কি তা আরো দ্বিগুণ প্রলুব্ধ করে না? তার সুমুখ দিয়ে কত সাহেবের সঙ্গে কত স্ত্রীলোক যাতায়াত করছে, তার মধ্যে অবশ্য অনেক বৃদ্ধাও আছে যারা অনেকটা তার কুটীরবাসিনী মায়ের মতই বিকৃত-

মূর্ত্তি ;—কিন্তু সুন্দরী যুবতীও মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে, তাদের মাথায় সৌখীন টুপী, পরণে ধব্‌ধবে পোষাক, তারা ওর চোখের দিকে, ওর পান-খাওয়া ঠোঁটের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখছে আর ওর মনের ভিতর কত গোপন কামনার উদ্রেক করছে। কিন্তু যে বধূটি তার হারিয়ে গেছে সে কি এদের চেয়ে কিছু নিকৃষ্ট ছিল? এই দেশের সূর্য্যতাপে সে বেড়ে উঠেছিল। তার রং ছিল তাই কালো, নীল ফুল কাটা সাদা কাপড়ের কাঁচুলি বুকে দিয়ে তাকে আরো কালো দেখাতো, আর ঘাঘরাটাও ছিল ঐ কাপড়ের, এদের চেয়ে দেখতে ছোট হলেও দেহে যথেষ্টই সৌষ্ঠব ছিল। মাথাটি তার ছোট, কপালটি গোল,—ভীরু চোখ-দু'টিতে শিশুর মত অদম্য কৌতূহল জেগে নিত্য উজ্জ্বল হয়ে থাকতো, তার কটাক্ষে ছিল নারী-সুলভ প্রচ্ছন্ন লাস্য-জড়িত অপূর্ব্ব কোমলতা, গলায় ছিল মুক্তার কণ্ঠী, পায়ে রূপার মল, হাতে পৈছা··· লাফ দিয়ে উঠে রিক্‌শওয়ালা পাশের গলির ভিতর ছুটে গেল ; সেখানে পুরানো একতলা বাড়ীর এক পাশে টালি-ছাওয়া এক কাঠের ঘরের মধ্যে গরীবদের জন্য একটা মদের দোকান আছে,—রিক্‌শওয়ালা পঁচিশটা পয়সা ফেলে সেখানে দাঁড়িয়ে পূরো একগ্লাস মদ খেয়ে নিলে। একে তো এই আগুন খেয়েছে তার উপর পান তো আছেই,—এখন থেকে অন্ততঃ সন্ধ্যা পর্য্যন্ত মনটা বেশ স্ফূর্ত্তিতেই থাকবে,—যতক্ষণ না তাদের সেই সহর-তলীর বনের মধ্যে কালো অন্ধকার গাঢ় হয়ে ঘনিয়ে আসে, আর সঙ্গে সঙ্গে সেই অগণ্য গাছপালার ভিতর থেকে অস্ফুট রহস্যের মত সন্ সন্ আওয়াজ উঠতে থাকে, যতক্ষণ না ঝিঁঝিঁপোকারা চারিদিক থেকে ডাকতে সুরু করে আর বাঁশবনের ঝোপের মধ্যে অগণ্য জোনাকির আলো চঞ্চল হয়ে জ্বলে জ্বলে ওঠে। ইংরাজ ভদ্রলোকটিও চুরুট মুখে মাতাল অবস্থায় হোটেল থেকে বেরুলো, তার চোখ দু'টি তখন ঢুল ঢুল করছে, মুখটা লাল হয়ে ফুলে উঠেছে। মধ্যে মধ্যে লোকটি ঘড়িটার দিকে দেখে আর কি যেন ভাবে ; বাকী সময়টা কি করে কাটাবে, তাই বোধ হয় স্থির করতে না পেরে হোটেলের সুমুখে অনেকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল ; তারপর হুকুম দিলে "পোষ্ট্ অফিসে যাও।" সেখানে গিয়ে চিঠির বাক্সে তিনখানি পোষ্টকার্ড ফেল্‌লে ; পোষ্ট আফিস থেকে গেল

গর্ডন বাগানে, সেখানে গিয়ে কিন্তু ভিতরে ঢুকলো না, গাড়ীতে বসেই কিছুক্ষণ মনুমেণ্ট প্রভৃতি চেয়ে চেয়ে দেখলে; সেখান থেকে ফিরে সহরের এদিকে ওদিকে ঘুরতে লাগলো,—ব্ল্যাক টাউন, ব্ল্যাক টাউনের বাজার, কল্যাণী নদী···মাতাল রিক্‌শওয়ালা তখন আপন মনে তাকে চর্‌কির মত ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ালে আর মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত ঘর্ম্মাক্ত হয়ে উঠলো;—মদ আর পান খেয়ে সে তখন উত্তেজিত, অনেক পয়সা পাবে এই আশায় উৎফুল্ল, আর এমন সব স্বপ্নেতে সে বিভোর যা এই অবস্থায় মানুষকে কিছুতে ছাড়তে চায় না। রৌদ্রের গুমোটে অসহ্য অপরাহ্ণ,—এ সময় কোনো পথিক দু'মিনিট একটা বেঞ্চিতে বসলেই বেঞ্চির উপর ঘামের গোল ছাপ লেগে যায়,—এই সুদীর্ঘ অপরাহ্ণটা কি করে কাটাবে আর ডিনারের সময় উপস্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত কোথায় বা অপেক্ষা করবে তা ঐ ভদ্রলোক বলতে পারছে না দেখে, রিক্‌শওয়ালা তাকে পুরানো সহরে—ব্ল্যাক টাউনের পাড়ায় পাড়ায় কেবল ঘোরাতে লাগলো; এখানে নানা রকমের কটিবাস মাত্র পরা, নগ্নদেহ বহুলোক সে দেখলে; কত হিন্দু, পার্শী, পিঙ্গল-মূর্ত্তি মালয়বাসী; দুর্গন্ধে ভরা কত চীনেদের দোকান, কত খোলার ঘর, বাঁশের ছাউনি, ছোট বড় দেব-মন্দির, দেশ বিদেশের জাহাজের নানা রকম নাবিক; কত নেড়ামাথা রোগা বৌদ্ধ ভিক্ষু, তাদের দৃষ্টি যেন উন্মাদের মত, হল্‌দে রঙের লম্বা চাদরে সমস্ত দেহ ঢাকা কেবল ডানদিকের কাঁধটি খোলা, হাতে এক একখানি তালবৃন্তের পাখা। পথের ধূলা-আবর্জ্জনার মধ্য দিয়ে এমন বেগে রিক্‌শওয়ালা সওয়ারি নিয়ে ছুটতে লাগলো, যেন কেউ তাদের পিছু নিয়েছে। শেষে কল্যাণী নদীর তীরে গিয়ে তারা পৌঁছলো; শীর্ণা নদী, জল রোদে উত্তপ্ত হয়ে আছে, দুই তীরের ঘন তলাপাতার ঝোপে তার অনেক খানি ঢাকা, সেথা বহু কুমীরের বাস, নৌকা দেখলে তারা জঙ্গলের আওতায় গিয়ে আশ্রয় নেয়; পড়ন্ত রৌদ্রে নদীর জলে সোনার রং ধরেছে, তার উপর কত নৌকা ভাসছে; নৌকাগুলির উপর খড়ের ছাউনি দেওয়া, বস্তা বস্তা চাল, চায়ের পেটি, দারুচিনি, সমুদ্র থেকে সদ্য তোলা নানা রকমের মণি-মুক্তা, হরেক রকম পণ্যদ্রব্যে নৌকাগুলি বোঝাই···ইংরাজ ভদ্রলোক এতক্ষণে হুকুম দিলে ফোর্টের দিকে ফিরে যেতে; সে অঞ্চল তখন

জনশূন্য, অফিস, আদালত, ব্যাঙ্ক সব বন্ধ হয়ে গেছে; সেখানে এক নাপিতের দোকানে গিয়ে ভদ্রলোকটি ক্ষৌর কর্ম্ম সেরে নিলে, তাতে যেন তার বয়স যথেষ্ট কম দেখাতে লাগলো; তারপর কতকগুলো চুরুট কিনে একটা ঔষধের দোকানে ঢুকলো।...রিক্‌শওয়ালা তখন ঘর্ম্মাক্ত কলেবর, রুক্ষ-মূর্ত্তি, ক্ষ্যাপা কুকুরের মত চোখ দিয়ে থেকে থেকে বিদ্বেষ-দৃষ্টিতে তার দিকে চাইছে।...ছ'টা বেজে গেলে সে কুইন্ ষ্ট্রীট্ ধরে লাইট্ হাউস্ পার হয়ে, সেনা-নিবাসের মধ্য দিয়ে পরিচ্ছন্ন নির্জ্জন রাস্তাগুলি অতিক্রম করে একেবারে সমুদ্রতীরে ফাঁকা জায়গায় এসে যেন একটু মুক্তি বোধ করলে; সেখানে দেখলে দিগন্ত-প্রসারী সূর্য্যের কিরণ জলের উপর পড়ে ইস্পাতের মত ঝক্ ঝক্ করছে, তার মাঝে মাঝে যেন সোনার গুঁড়ো ছড়ানো; এখান থেকে গাল্‌ফেস্ প্লেস্ ধরে আবার সে দাস-উপদ্বীপের দিকে ছুটে চল্‌লো।

তথাগত বলেছেন—"লোভ হতেই প্রথম সুখের বাসনার উদ্রেক হয়, আর সুখ থেকেই দুঃখের উদয় হয়; সুখ আর দুঃখের থেকে ভয়ের জন্ম হয়।" এখন রিক্‌শওয়ালার চোখ দেখলে মনে হয় সেখানে যুগপৎ দুঃখ, ভয় আর হিংসার উদয় হয়েছে। ছুটে ছুটে তার মাথা গরম হয়ে উঠেছে, অনেকবার শ্রান্ত বিষণ্ণদৃষ্টিতে কষ্টদাতার দিকে সে ফিরে ফিরে চেয়ে দেখেছে, লম্বা লম্বা পা ফেল্‌তে ফেল্‌তে অনেকবার দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেছে। সূর্য্যাস্তের পর এই রাস্তাটা একেবারে ফাঁকা হয়ে যায়। কাজকর্ম্ম শেষ করে সাহেবরা ডিনারের পূর্ব্বে একবার এখানে বেড়াতে আসে; কেউবা দামী ঘোড়ার গাড়ীতে চড়ে হাওয়া খায়, কেউ আপন স্ত্রী পুত্রদের হাওয়া খেতে সঙ্গে নিয়ে আসে; অনেকে আবার ফুটবল, টেনিস্ খেলে; অনেকে সমুদ্রতীরে দাঁড়িয়ে এখানকার সূর্য্যাস্তের বিরাট সমারোহ উপভোগ করে, এমন সূর্য্যাস্ত নিজের দেশে তারা দেখতে পায় না। রিক্‌শওয়ালা সেখান দিয়ে যেতে যেতে উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে দেখলে—খাটো প্যাণ্ট্ আর রঙিন জামা পরা কটা চুল কয়েকজন লোক পরস্পরের পিছে প্রাণপণে ছুট্‌ছে, বলের সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠ্‌ছে আর পায়ের বুট দিয়ে সশব্দে বলটার উপর লাথি মারছে। সূর্য্য অস্ত যাচ্ছিল; উপরের আকাশ সবুজ হয়ে উঠলো, একখানা হাল্কা মেঘ আকাশের এক কোণে

পড়েছিল, তার সমস্তটাতেই গোলাপী রং ধরে গেল।......ইংরাজ ভদ্রলোক এতক্ষণ বিমনা হয়ে পশ্চিম দিকে চেয়ে সমুদ্রের তটভূমিতে ঢেউ-ভাঙা ফেনার বৈচিত্র্য দেখছিল, এবার নিতান্ত নির্জ্জীবের মত বল্‌লে—"কার্লটন হোটেল।"......রিক্‌শওয়ালা দাঁতে দাঁত চেপে ছুটলো; যে লোকটা ওকে এত ছোটাচ্ছে সুবিধা পেলে তাকে এখন সে চিবিয়ে খেতে পারে, কিন্তু তবু না ছুটেও উপায় নেই; ইংরাজ ভদ্রলোক বিরস মুখে বসে আছে আর মধ্যে মধ্যে এক একবার ছড়ির প্রান্ত দিয়ে রিক্‌শওয়ালার অঙ্গস্পর্শ করে তাকে আরো দৌড়ুতে ইঙ্গিত কর্‌ছে। সে যে রিক্‌শতে চড়েছে এ বোধ আর তার নেই, কেবল একটা অবিশ্রাম নিশ্চেষ্ট গতির উপর নেশার মত ঝোঁক ধরে গেছে। ভদ্রলোক দাস-উপদ্বীপের ওদিকে একটা সামান্য হোটেলে বাসা নিয়েছিল কারণ কেল্লার কাছে কোনো হোটেলে জায়গা খালি ছিল না,—কাজেই রিক্‌শওয়ালা আবার সেই অশথতলা পার হয়ে চল্‌ল যেখানে সে আজই সকালে সুখের বৃথা আশায় এই সব দয়ামায়াহীন লোকের কাছ থেকে কিছু পয়সা উপার্জ্জনের লোভে অপেক্ষা করে বসেছিল। আবার পার হয়ে গেল সেই সব পাঁচিল-ঘেরা পরিচিত বাগান, সেই সব নীচু বাংলো-বাড়ী যার ছাদের উপর গাছের ডালপালা নুয়ে লুটিয়ে পড়েছে।......এমনি একটি বাংলোর উঠানে ঢুকে এবার সে আধ-ঘণ্টা বিশ্রাম পেলে, আরোহী ততক্ষণ ভিতরে পোষাক বদলাতে গেল। ওর বুকের ভিতর তখন হাতুড়ি পিট্‌ছে, ঠোঁট শুকিয়ে মুখখানা সরু হয়ে গেছে, চমৎকার চোখ দুটিতে কালি পড়ে একেবারে বিস্ফারিত হয়ে উঠেছে, মাথায় জড়ানো গামছাটা এত ভিজে গেছে যে সেটা টান মেরে ফেলে দিতে হোলো। তার ঘর্ম্মাক্ত দেহ থেকে একটা বিশ্রী ঝাঁঝালো গন্ধ বেরুতে লাগলো,—কতকগুলো পিঁপ্‌ড়ে একসঙ্গে ধরে দুহাতে কচ্‌লে দিলে যেমন গন্ধ বেরোয় এ-গন্ধও অনেকটা সেই রকম।

ইতিমধ্যে সূর্য্য অস্ত গেছে। এক বৃদ্ধা ইংরাজ মহিলা ঐ বাড়ীর বারান্দায় একটা দোলা-চেয়ারে বসে সন্ধ্যার আলোটুকুতে একখানা ধর্ম্মগ্রন্থ পড়ছে। মহিলাটিকে রাস্তা থেকে দেখতে পেয়ে এক শীর্ণকায় হিন্দুস্থানী বৃদ্ধ উঠানের ভিতর এসে ঢুকলো, তার চেহারাটা খুব লম্বা, বাব্‌রি-কাটা

পাকা চুল্ বুকে পিঠে ঝুলে পড়েছে, মাথায় একটা ছেঁড়া পাগ্ড়ী, গায়ে ঝল্সে-যাওয়া লাল রংয়ের আংরাখা—তার উপর হল্দে ডোরাকাটা, হাতে একটা ঢাক্নি-বাঁধা বাঁশের চুব্ড়ি। লোকটা বোবা, নিঃশব্দে বারান্দার কাছে এগিয়ে গিয়ে সে মাথা নীচু করে কপালে হাত ঠেকিয়ে সেলাম করলে, তারপর সেইখানে বসে পড়ে চুব্ড়ির ডালা খুলে ফেল্লে। মহিলাটি তার দিকে না চেয়েই হাত নেড়ে তাকে চলে যেতে ইঙ্গিত করলেন। কিন্তু ততক্ষণে সে তার ডালা খুলে কোমর থেকে একটা বাঁশের বাঁশী বের করেছে। এই দেখেই রিক্শওয়ালা লাফিয়ে উঠে একেবারে যেন আগুন হয়ে ধম্কে তাকে তেড়ে এলো। বৃদ্ধও সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠে তাড়াতাড়ি ডালাটা বন্ধ করে সেখান থেকে ছুট দিলে। কিন্তু তবু অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত রিক্শওয়ালার চোখ দুটো জ্বলতে লাগলো,—তার মনে হতে লাগলো—এখনও যেন সেই ভয়ানক সাপটা ডালার ভিতর থেকে ফণা ধরে উঠে দাঁড়িয়ে আছে, তার চক্চকে গ্রীবা থেকে নীল রঙের আভা বেরুচ্ছে, সরু জিভ্টা লিক্লিক্ করে বেরিয়ে পড়ছে আর চোখ দুটো জ্বল্জ্বল্ করছে।

অন্ধকার ঘনিয়ে এলো; ইংরাজ ভদ্রলোক যখন ফর্মা পোষাকে সেজে বেরিয়ে এলো আর রিক্শওয়ালা আবার তাড়াতাড়ি গাড়ীর কম্পাস তুলে ধরলে, তখন একেবারে অন্ধকার হয়ে গেছে। এবার যেখানে যেতে হবে সে জায়গার নাম শোনবামাত্র রিক্শওয়ালার বুক্টা একবার কেঁপে উঠেছিল কিনা কে জানে! রাত্রিটা ছিল বেজায় গুমোট, বর্ষা পড়বার আগে যেমন হয়ে থাকে। তপ্ত মাটির সোঁদা গন্ধের সঙ্গে মৃগনাভীর মত কি একটা চড়া গন্ধ আর বাগানের ফুলের মিষ্ট গন্ধ একসঙ্গে মিশে বাতাস আরো ভারী হয়ে উঠেছে। যে বাগানের ভিতর দিয়ে সে চলেছে সেখানে এমন অন্ধকার যে কেবল তার ঘন নিঃশ্বাসের শব্দ শুনে আর তার রিক্শর চলন্ত আলো দেখে অনুমান করে নিতে হয় যে সওয়ারী নিয়ে কোনো রিক্শ চলেছে। যেতে যেতে কিছুক্ষণ পরে দূর থেকে গাছপালার মধ্য দিয়ে দেখতে পাওয়া গেল সেই খালের জল ঝিক্ ঝিক্ করছে, আলোর প্রতিবিম্ব তার উপর পড়ে রেখার মত লম্বা হয়ে গেছে। ক্রমে এজেণ্টের মস্ত দোতলা

বাড়ীটা দেখা গেল, তার সমস্ত খোলা জানালাগুলি উজ্জ্বল আলোয় উদ্ভাসিত। বাড়ীর চারদিককার ময়দান অন্ধকার, সেখানে বহু রিক্‌শ জমা হয়েছে, আর যে সব রিক্‌শওয়ালা নিমন্ত্রিতদের নিয়ে এসেছে তারা একস্থানে জমায়েৎ হয়ে বসেছে, তাদের গায়ের রং অন্ধকারে মিশে গেছে কেবল পরণের সাদা কাপড়গুলি অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। খালের দিকের প্রশস্ত বারান্দা আলোক-মালায় উজ্জ্বল, সেখানে স্ফটিকাধারে অসংখ্য বাতি জ্বলছে, দিকে দিকে অসংখ্য বাতির ঝাড় বসানো রয়েছে; প্রকাণ্ড লম্বা ডিনার টেবিলের উপর কারুকার্য্যখচিত আস্তরণ পাতা, তার উপর নানারকম চীনামাটির খাদ্য সরঞ্জাম, নানা আকারের বোতল, কাচপাত্র,—আর ফর্সা পোষাক-পরা নিমন্ত্রিতের দল সেখানে খেতে বসেছে, কথাবার্ত্তার এক মুহূর্ত্ত বিরাম নাই, সকলেই চাপা গলায় কথা বল্‌তে চায় কিন্তু কথাগুলো যেন গলার ভিতর থেকে গুরু ওজনে বেরিয়ে আসে; স্থূলকায় খানসামার দল নার্সের মত লম্বা চাপকান পরে নগ্নপদে পরিবেশন করে বেড়াচ্ছে, তাদের পায়ের চলা ফেরাতে খস্ খস্ করে শব্দ হচ্ছে। চীনা মাদুরের ঝালর দেওয়া একখানা মস্ত টানা পাখা এদের মাথার উপর দুল্‌ছে, একটা দেওয়ালের আড়াল থেকে কয়েকজন কুলি তার দড়ি ধরে টানছে, নিমন্ত্রিতদের ঘর্ম্মাক্ত কপোলে অনবরত বাতাস এসে লাগছে। সাত নম্বর রিক্‌শওয়ালা তার আরোহীকে নিয়ে একেবারে বারান্দার কাছে এসে দাঁড়ালো। টেবিলে যারা বসেছিল তারা সকলে আনন্দিত হয়ে উঠে তাকে সম্বর্দ্ধনা করলে। নূতন অতিথি রিক্‌শ থেকে নেমে বারান্দায় গিয়ে উঠলো। রিক্‌শওয়ালা গাড়ী ঘুরিয়ে নিয়ে বাড়ীর অপর পাশে গেটের দিকে চল্‌ল যেখানে অন্যান্য রিকশওয়ালারা রয়েছে। কিন্তু বাড়ীটার মোড় ঘুরতেই সে হঠাৎ এমন চম্‌কে উঠলো যেন কেউ তার মাথায় অকস্মাৎ এক ঘা লাঠি মারলে; দোতলার উপরকার একটা খোলা জানলার ধারে উজ্জ্বল আলোতে সে স্পষ্ট দেখতে পেলে—লাল সিল্কের জাপানী পোষাক পরা, লাল পাথরের মালা গলায়, গোল হাত দুটিতে মোটা মোটা সোনার বালা দিয়ে তার সেই হারানো ভাবী বধূ এদিকে মুখ ফিরিয়ে জ্বল্ জ্বল্ চোখে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে; এখনও ছমাস হয়নি—যে মেয়েটি তার হাঁড়িতে চাল দেবে বলে প্রতিশ্রুত হয়েছিল সেই মেয়ে!

অন্ধকারে সে ওকে দেখতে পেলেনা কিন্তু ও তাকে দেখেই চিনলে,—থমকে দু পা পিছিয়ে গিয়ে সেখানেই ও নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

ঐখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে পড়েও গেল না কিংবা বুকটা তার ফেটেও গেল না,—কাঁচা বুক হলেও তা বেশ শক্তই ছিল। দু এক মিনিট চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে সেখানে একটা পুরানো ডুমুর গাছতলায় সে বসে পড়লো; পরীর দেশের আলোর মত ঐ গাছটার মাথা ছেয়ে অসংখ্য জোনাকির আলো জ্বলছিল। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ও একদৃষ্টে চেয়ে চেয়ে দেখলে জানলার ফ্রেমের মাঝখানে মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে, লাল সিল্কের ঢিলা পোষাক তার ক্ষুদ্র দেহটি বেষ্টন করে লুটিয়ে রয়েছে, হাত তুলে যখন সে মাথার চুলগুলি একবার বিন্যস্ত করে দিলে,—নিটোল তার বাহু দুটি তখন স্পষ্টই দেখা গেল! যতক্ষণ পর্য্যন্ত মেয়েটি ঘরের ভিতর ফিরে অদৃশ্য হয়ে না গেল ততক্ষণ ও বসে বসে তাকে দেখলে। সে অদৃশ্য হয়ে যাওয়া মাত্র ও লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো, গাড়ীর কম্পাস দুটো তুলে ধরে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে ছুটতে একেবারে ফটকের বাইরে চলে গেল, তার পর আরো ছুটতে লাগলো; কিন্তু এখন সে একটা নির্দ্দিষ্ট পথে নির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে ছুটেছে; হঠাৎ যেন সে একেবারে মুক্তি পেয়ে গেছে, এবার নিজের প্রয়োজনে যেদিক পানে ইচ্ছা ছুটে চলেছে।

"জাগরে জাগ"! শত শত অতীত জন্মের পূর্ব্বপুরুষদের সহস্র বাক্-রুদ্ধ কণ্ঠ তার অন্তরের ভিতর এক সঙ্গে নিঃশব্দে সাড়া দিয়ে উঠলো। "ঝেড়ে ফেল্ যত মায়ার ছলনা, ক্ষণিক জীবনের তুচ্ছ যত স্বপ্ন! ঘুম কি আছে তোর জন্য—বিষের জ্বালায় যে জর্জ্জরিত, বুকে যার তীর বিঁধেছে? যার হৃদয়ে শতগুণ প্রেম তারই ভাগ্যে আসে শতগুণ যন্ত্রণা; সমস্ত দুঃখ, সমস্ত শোচনা তো প্রেম থেকেই আসে! ছিঁড়ে ফেল্ সব হৃদয়ের বাঁধন! বিশ্রাম তো বেশী দিন পাবি না! সহস্র সহস্রবার জন্ম নিয়ে আবার ফিরে আসতে হবে এই আদি-মানবের কামনার জগতে। কিন্তু তবু এবারকার মত তুই একটু বিশ্রাম করে নে, এই বয়সে সুখের আশায় অনেক পথ ঘুরেছিস, সকলের চেয়ে তীক্ষ্ণ বাণ তোর বুকে বিঁধে গেছে,—তুই যে করেছিলি প্রেমের আকাঙ্ক্ষা,—তুই করেছিলি নূতনের আশা এই পুরাতন পৃথিবীতে যেখানে স্মরণাতীত কাল থেকে বিজেতাই বিজিতের গলায় পা তুলে দেয়!"

দাস-উপদ্বীপের পথের ধারে গাছের নীচে সারি সারি দোকান পাতা, দূরে থেকে তার আলো দেখা যাচ্ছে। ক্ষুধার্ত্ত রিক্‌শওয়ালা একটা দোকানে গিয়ে কিছু ভাত আর লঙ্কা-দেওয়া তরকারী কিনে খেলে, তারপর আবার ছুটলো। যে সাপুড়ে বৃদ্ধ ঘণ্টাখানেক আগে সাহেবের সেই হোটেলের উঠানে ঢুকেছিল তার ভাইপোর একটা ফলের দোকান আছে, বৃদ্ধ যে সেই দোকানেই থাকে তা ও জানতো। তার ভাইপো তখন প্রকাণ্ড এক পাগড়ী মাথায় দিয়ে ফলের ঝুড়িগুলো ঘরের ভিতর টেনে তুলছে, মুখে আছে একটা সিগারেট,—তার ধোঁয়া লেগে চোখ দুটো কুঞ্চিত। ঘর্ম্মাক্ত রিক্‌শওয়ালার পাগলের মত চেহারা দেখে সে বিশেষ গ্রাহ্যই করলে না। রিক্‌শওয়ালাও কোন কথা না বলে দোকানের পাটার তলায় গুঁড়ি মেরে ঢুকে গিয়ে একটা ছোট ঝাঁপ ঠেলে খুলে ফেল্‌লে,—সে জানে এইখানেই সেই বোবা বৃদ্ধকে পাওয়া যাবে। ঘর্ম্মাক্ত হাতের মুঠার মধ্যে আছে তার বহুদিনের জমানো একটা মোহর, সেটা পথে আসতে আসতে নিজের কোমরের চামড়ার পেটির ভিতর থেকে ইতিমধ্যে সে বের করে নিয়েছে। এই মোহর দিয়ে অবিলম্বে তার কার্য্যসিদ্ধি হ'লো। একটা দড়ি-বাঁধা চুরুটের বাক্স হাতে নিয়ে সে বেরিয়ে এলো। এরই জন্যে তাকে অনেক দাম দিতে হয়েছে, কিন্তু বাক্সটা নেহাৎ খালি নয়; ভিতরে যে সামগ্রী আছে তা বেশ নড়াচড়া করছে, ডালার উপর ধাক্কা দিচ্ছে, ফোঁস্ ফোঁস্ শব্দ করছে।

গাড়ীটা ও তখন আবার টেনে নিয়ে গেল কেন? তা জানিনা, কিন্তু সেটা টানতে টানতে বেশ দৃঢ় পদক্ষেপে সে সমুদ্রতীরে গাল্‌ফেস্ প্লেসে গিয়ে উপস্থিত হোলো। সে স্থান তখন একেবারে নির্জ্জন; নক্ষত্রের আলোতে রাত্রির অন্ধকারেও অনেকদূর পর্য্যন্ত দেখা যায়। দূরে কেল্লার আলো মিট্‌মিট্ করে জ্বলছে নিবছে, আর লাইট হাউসের মাথা থেকে একটা তীব্র সাদা আলোর ছটা তির্য্যক ভাবে রাস্তার দিকে পড়েছে। সমুদ্রে খুব অস্পষ্ট মর্ম্মরধ্বনি হচ্ছে, একটা ঠাণ্ডা বাতাস এসে রিক্‌শওয়ালার গায়ে লাগলো। তার জীবন তাকে এই বয়সে যে কম্পাসের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছিল সেটা এইবার শেষবারের মত রাস্তার মাঝখানে ফেলে দিয়ে সে একদৌড়ে

সমুদ্রের কিনারায় এসে উপস্থিত হোলো, যে বেঞ্চিতে কেবল সাহেবরা বসে তারই উপর এখন নির্ভয়ে বসে পড়লো।

বৃদ্ধকে সমস্ত মোহরটা দিয়ে তার বদলে সে চেয়েছিল সকলের চেয়ে তাজা জিনিষ, সবচেয়ে যা বিষাক্ত। পেয়েছিলও তাই, কি তার সুন্দর রূপ! সমস্ত গায়ে কালো চাকা চাকা দাগ, ধারে ধারে সবুজের একটু আভাস, গোল ফণাটি নীল বর্ণ, তার উপর মরকত মণির মত উজ্জ্বল রেখাচিহ্ন, লেজটি সূক্ষ্মায়মাণ, আর আকারে ছোট কিন্তু ভয়ানক তেজী ও অতিশয় ক্রূর; চুরুটের গন্ধযুক্ত কাঠের বাক্সের মধ্যে বন্ধ থেকে আরও যেন সে ক্ষেপে গিয়েছে। ইস্পাতের স্প্রীঙের মত ভিতরে একবার সঙ্কুচিত হয়ে আবার ফুলে ওঠবার চেষ্টা করছে, বাক্সের ডালার গায়ে থেকে থেকে ধাক্কা দিচ্ছে। রিক্‌শওয়ালা বাঁধনের দড়িটা একটানে খুলে ফেল্‌লে···তারপর কেমন ভাবে কাজটা সে করেছিল সে কথা সঠিক কে জানে? হাত একটু কেঁপে গিয়েছিল না একেবারে স্থির ছিল? খুব তাড়াতাড়ি না ধীরে সুস্থে ব্যাপারটা সারলে? দড়িটা খোলবার পর সে কি কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করেছে? বহুক্ষণ ধরে সে কি সমুদ্রের দিকে আর আকাশের তারার দিকে চেয়ে বসেছিল? সেই আলোকোজ্জ্বল ভোজগৃহের উদ্দেশে সে কি বার বার দাঁতে দাঁত ঘষে অভিশাপ-দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছিল? খুব সম্ভব এত কিছু না করে ডালাটা তৎক্ষণাৎ খুলে ফেলে ধীর ভাবে তার বাঁ হাতটা একেবারে ঢুকিয়ে দিয়ে সেই কুণ্ডলীকৃত হিম দেহটার উপর রাখলে। করতলের ঠিক মাঝখানেই সে ছোবল খেলে।

এ দংশনের কি অসহ্য জ্বালা! একটা বৈদ্যুতিক আঘাতের মত এই তীব্র জ্বালা সমস্ত শরীরকে যেন এককালে বিদ্ধ করে দেয়, সে এমন অব্যক্ত যন্ত্রণা যে বাঁদরগুলো পর্য্যন্ত তাতে ছটফট্ করে ডুক্‌রে ওঠে—একেবারে ছেলেমানুষের মত, দয়া-ভিক্ষুর মত মর্ম্মান্তিক ভাবে কাঁদতে থাকে। রিক্‌শওয়ালা বোধ হয় কাঁদেও নি, চীৎকারও করেনি, সে তো জেনে শুনেই সব করেছে! কিন্তু সে যে এই যন্ত্রণায় বেঞ্চির উপর ঘুরে পড়েছিল তাতে সন্দেহ নেই, কারণ বাক্সটা দূরে ছিট্‌কে পড়েছিল। এর পর এক মুহূর্ত্তেই তার পায়ের তলার মাটি যেন সরে গেল, চারদিকে অনন্ত অন্ধকার

দেখলে, সমুদ্রের জল, আকাশের তারা, হোটেলের আলো একে একে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল। সমুদ্র-কল্লোলের মত একটা শব্দ তার মাথার মধ্যে ঢুকলো আবার হঠাৎ যেন থেমে গেল ; এই রকম ভাবে আহত হওয়ার পর প্রথমটায় মানুষ একবার ক্ষণিকের মত অজ্ঞান হয়ে যায়। কিন্তু শীঘ্র আবার জ্ঞান হয়, সঙ্গে সঙ্গে একটা বমির বেগ এসে রক্ত উঠে পড়ে, আবার তখন চৈতন্য লোপ পায়। ঘন ঘন এই রকম মূর্চ্ছা হতে থাকে আর প্রত্যেকবারে মানুষের খানিকটা করে অস্তিত্ব চুরমার হয়ে যায়, যত খাবি খেতে থাকে জীবনটা তত টুকরো টুকরো হয়ে ছিঁড়ে পড়তে থাকে ; চিন্তা, স্মৃতি, দেখা, শোনা, যন্ত্রণা, শোক, আনন্দ, ঘৃণা, —সব খসে যায়,—আর খসে যায় সেই সর্ব্বগ্রাসী চরম বস্তু—যাকে বলি প্রেম, সেই অপূর্ব্ব বাসনা যা দৃশ্য অদৃশ্য সারা বিশ্বকে কেবল নিজের বুকের ভিতর গ্রাস করতে চায় আবার সমস্তই নূতন প্রকারে অপর জনকে সমর্পণ করতে চায়।......

দিন দশেক পরে এক আসন্ন-ঝটিকা-স্তব্ধ গোধূলিতে কলম্বোর বন্দর পার হয়ে চারজন দাঁড়ি একখানা ছোট নৌকা বেয়ে প্রাণপণে দাঁড় টেনে চলেছে সুয়েজ-যাত্রী এক প্রকাণ্ড রাশিয়ান্ জাহাজের অভিমুখে। সাত নম্বরের রিক্‌শওয়ালার সওয়ারী সেই ভদ্রলোকটি এই নৌকার মাঝে হেলান দিয়ে বসে আছে। জাহাজ ছাড়বার জন্য একেবারে প্রস্তুত, ঘন ঘন বাঁশী দিয়ে নোঙর তুলে দিচ্ছে। এমন সময় নৌকা তার গায়ে লাগল, আরোহী দড়ির সিঁড়ি বেয়ে তাড়াতাড়ি ডেকের উপর উঠে গেল। জাহাজের কাপ্তেন প্রথমে তাকে জাহাজে নিতে অস্বীকার করলে ; এ জাহাজে কেবল মাল নেওয়া হয়,—জাহাজের এজেণ্টও চলে গেছে, সুতরাং কোনো যাত্রী নেওয়া এখন অসম্ভব। "দয়া করুন, দয়া করুন, দয়া করে আমায় এখান থেকে নিয়ে চলুন।" কাপ্তেন অবাক হয়ে তার দিকে চাইলে ; লোকটি দেখতে বেশ সুস্থ বলেই মনে হয়, কিন্তু মুখের উপর যেন কালি পড়ে গেছে, আর চশমার অন্তরালে অচঞ্চল চোখ দুটি যেন চেয়ে থেকেও কিছু দেখতে পাচ্ছেনা, কতকটা দিশাহারার মত। কাপ্তেন বললে—"পরশু পর্য্যন্ত অপেক্ষা

করুন, সেদিন একখানা জার্ম্মাণ জাহাজ ডাক নিয়ে ছাড়বে।" ইংরাজ ভদ্রলোক বল্‌লে—"তা জানি, কিন্তু কলম্বোতে আর দুরাত্রি কাটানোও আমার পক্ষে ভারী কষ্টকর হবে। এখানকার হাওয়া আমাকে নিস্তেজ করে ফেলেছে,—স্নায়ুদৌর্ব্বল্যে বড়ই কষ্ট পাচ্ছি। তা ছাড়া জার্ম্মাণ জাহাজ-খানায় ভয়ানক ভিড় হবে, আমি একটু একলা থাকতেই চাই। এদেশের রাত্রিগুলো অনিদ্রায় অনিদ্রায় আমাকে একেবারে কাবু করে ফেলেছে, আর প্রত্যেকদিন ঝড় ওঠবার সময় কি যে স্নায়ুর উদ্বেগ হতে থাকে! ঐ দেখুন কি ভয়ানক অন্ধকার, মেঘে মেঘে একেবারে সমস্ত আকাশ ছেয়ে গেছে, আবার আজ রাত্রে ঝড় উঠ্‌বে, এখন তো রীতিমত বর্ষা পড়ে গেল।" ভেবে চিন্তে কাপ্তেন অবশেষে থাকবার সম্মতি দিলেন। এক মিনিট পরে ঋজু-দেহ সিংহলীরা ধরাধরি করে কালো চামড়ায় ঢাকা একটা তোরঙ্গ টেনে উপরে তুল্‌লে, সেটার সর্ব্বাঙ্গে নানা জাতীয় রং চঙে লেবেল মারা, তার উপর লাল কালির বিস্তর ঢেরা দেওয়া সই করার দাগ।

জাহাজের ডাক্তারের জন্য একটা খালি কেবিন ছিল, ভদ্রলোককে সেইখানে জায়গা দেওয়া হোলো। ঘরটা খুব ছোট আর অন্ধকার, কিন্তু ইংরাজ ভদ্রলোকের তাই খুব পছন্দ হোলো। জিনিষপত্র সেখানে তাড়াতাড়ি গুছিয়ে রেখে সে ডেকের উপর ফিরে গেল। চারদিক ক্রমশঃই অন্ধকারে ঢেকে যাচ্ছে। জাহাজ নোঙর তুলে বাহির সমুদ্রের দিকে চলেছে। কেল্লাতে অনেক আলো জ্বল্‌ছে, দেখে মনে হচ্ছে যেন কোন জাহাজ মাস্তুলে আলো জেলে দূর থেকে ক্রমশঃ এগিয়ে আসছে। পিছনে চাইলে জাহাজের উঁচু রেলিঙের ফাঁক দিয়ে দেখা যায় বিস্তীর্ণ মলিন জলরাশি তীরের দিকে সরে সরে যাচ্ছে, তীরভূমি কালো কয়লার অনুচ্চ স্তূপ-রেখার মত দেখা যাচ্ছে, তার পিছনে সারি সারি নারিকেল-বন ঘন অন্ধকারে আচ্ছন্ন। এখনও এই জলের সীমা দেখতে পাওয়া যায়, আর উপরে দেখা যার ঘনায়-মান বিষণ্ণ মেঘ, জাহাজের গতিতে এগুলো এত দ্রুত সরে যাচ্ছে যে চেয়ে থাকলে মাথা ঘুরে ওঠে। কোথা থেকে এক একটা দমকা জোলো হাওয়া কি এক বিকৃত গন্ধ নিয়ে হঠাৎ উড়ে আস্‌ছে আবার তখনি ঘুরে অন্যদিকে চলে যাচ্ছে। নিঃশব্দ-সঞ্চারী মেঘের রাশি বিদীর্ণ করে হঠাৎ বিদ্যুতের

নীল আলো চম্‌কে উঠলো, সেই আলোতে তীরের সমস্ত গাছপালা, নারিকেল ও কলাগাছের সার, সিংহলীদের কুঁড়ে ঘরগুলো পর্য্যন্ত উজ্জ্বল হয়ে দৃষ্টিগোচর হোলো। ইংরাজ ভদ্রলোক ভয় পেয়ে একবার চোখ বুজে ফেল্‌লে, তখনি আবার চোখ চেয়ে জাহাজের ডেকটা আর সমুদ্রের কালো জল দেখতে পেলে,—তাড়াতাড়ি সে নিজের কামরায় ফিরে গেল।

জাহাজের তীক্ষ্ণবুদ্ধি বৃদ্ধ ষ্টুয়ার্ড সন্দিগ্ধমনে ইংরাজ ভদ্রলোকের কামরার পর্দ্দার আড়াল দিয়ে কয়েকবার উঁকি মেরে দেখে গেল। ভদ্রলোক একটা মোটা চামড়া বাঁধানো খাতা পায়ের উপর রেখে একখানি কেম্বিসের চেয়ারে বসেছে। সোনার নিব দেওয়া কলম নিয়ে খাতাটিতে কি যেন লিখছিল, যখনই সে মুখ তোলে তখনই তার চশমা চক্ চক্ করে,—দেখলেই মনে হয় কত যেন ভাবছে, অথচ দৃষ্টি একেবারে অর্থহীন। তারপর কলম রেখে সে নিবিষ্ট হয়ে চুপ করে বসে রইল, তার কেবিনের গায়ে অনবরত যে তরঙ্গাঘাতে জলের কল কল শব্দ হচ্ছে তাই যেন সে কান পেতে শুনতে লাগলো। হাতের চাবির গোছা ঝন্ ঝন্ করতে করতে ষ্টুয়ার্ড সেখান দিয়ে চলে গেল। ইংরাজ ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে উঠে গায়ের জামা কাপড় খুলে ফেল্‌লে। ওডিকলোনের জল দিয়ে বেশ করে নিজের গা মাথা মুছলে, দাড়ি কামালে, সমান করে গোঁফ ছাঁটলে, অনেক যত্নে টেরী কেটে বুরুষ দিয়ে চুলের প্রসাধন করলে, ফর্ম্যা ডিনারের পোষাক পরলে, তারপর সৈনিকের মত দৃঢ় পদক্ষেপে ডিনার খেতে গেল।

জাহাজের লোকেরা টেবিলে বসে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তার জন্য অপেক্ষা করে বিরক্ত হয়ে উঠেছিল, কিন্তু তাকে উপস্থিত দেখেই যথেষ্ট সৌজন্য করলে এবং নিজের নিজের ইংরাজী বিদ্যা অনুসারে কথাবার্ত্তা সুরু করলে। সেও যথেষ্ট ভদ্রতা দেখালে, বল্‌লে সে রাশিয়ান্ রান্না খুব পছন্দ করে, রাশিয়াতে যে একবার গিয়েছিল, সাইবেরিয়াতেও গিয়েছে...অনেক দেশ সে ঘুরেছে, কোথাও তার কোনো অসুবিধা হয়নি, কেবল এইবার ভারতবর্ষে, জাভাতে আর সিংহলে তার বড় কষ্ট হয়েছে; স্নায়ুগুলো বিগ্‌ড়ে গেছে,—এমন কি তার নিজের আচরণটাও যেন অদ্ভুত হয়ে উঠেছে; এই এক ঘণ্টা আগেই জাহাজে হঠাৎ উঠে এসে যে আচরণ সে দেখিয়েছে তাতেই হয়তো

সকলে বুঝতে পেরেছেন।······কাফি খাবার সময় সে জাহাজের কর্ম্মচারীদের বহুমূল্য পানীয় খাইয়ে আপ্যায়িত করলে; নিজের ঘর থেকে দামী ইজিপ্সিয়ান সিগারেট এক বাক্স এনে টেবিলের উপর খুলে ধরলে, সকলকেই তা ব্যবহার করতে অনুরোধ করলে। জাহাজের কাপ্তেনটির এখনও বেশ কম বয়স, চোখ দেখলে মনে হয় চালাক, সর্ব্বদাই ইউরোপীয় আভিজাত্যের চাল বজায় রেখে চলে; সে ইউরোপের বর্ত্তমান উপনিবেশ-সমস্যা নিয়ে কথাবার্ত্তা সুরু করলে,—জাপানের সম্বন্ধে, পূর্ব্বদেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনেক কথা বল্‌লে। ইংরাজ ভদ্রলোক ধীরভাবে সব কথা শুনতে লাগলো, কখনো বা তার সমর্থন, কখনো বা তার প্রতিবাদ করলে। তার নিজের বক্তব্যটি বেশ থেমে থেমে বলতে লাগলো, যেন কোনো সুলিখিত প্রবন্ধ থেকে পড়ে যাচ্ছে। কিন্তু মধ্যে মধ্যে সে হঠাৎ চুপ করে যায়, তখন যেন বাইরের সমুদ্র-কল্লোলটাই উৎকর্ণ হয়ে শোনে। এখানে আর ঝড় নেই! কলম্বোর তীরবর্ত্তী আলোগুলি আগে হীরার টুক্‌রার মত ঝিক্‌মিক্ করতে দেখা গিয়েছিল, কখন সে সব ঐ বিশাল কালো মখমলের মত জলের নীচে তলিয়ে গেছে। জাহাজের চারধার এখন অসীম অন্ধকারে ঘেরা, সমুদ্রও অন্ধকার, রাত্রিও অন্ধকার। ডিনার খাবার কেবিনটা খোলা ডেকের উপর, তার জানলা-দরজার বাইরে গাঢ় কালিমা; সেদিকে চাইলেই মনে হয় অন্ধকারটা যেন চারদিক থেকে ঘিরে দাঁড়িয়ে এই আলো-করা কেবিনের মধ্যে উঁকি মারছে। এই অন্ধকার ভেদ করে একটা জোলো হাওয়া আসছে,—পৃথিবীর আদিকাল থেকে ছাড়া পাওয়া একটি কিছুর মনখোলা আল্‌গা নিঃশ্বাসের মত; টেবিলে উপস্থিত সকলের গায়ে এই মুক্ত হাওয়া লেগে তাদের দামী সিগারেটের সৌরভ আর কাফি-পানীয়ের সৌরভ যেন আরো বাড়িয়ে দিচ্ছে। মধ্যে এক একবার দপ্‌ করে ইলেক্‌ট্রিক্ বাতিগুলো নিবে যায়, আর সঙ্গে সঙ্গে দরজা জানালার চতুষ্কোণ ফ্রেমের মধ্যে বাইরের অন্ধকারের নীলাভা যেন উজ্জ্বল হয়ে ওঠে; তখন দেখা যায় অতলস্পর্শ শূন্যতার কি স্নিগ্ধ নীল রং!—শব্দশূন্য, সীমাশূন্য, জাহাজের চারপাশে কেবল এই ছাড়া আর কিছু নেই; চঞ্চল জলরাশি চক্ চক্ করে; দিগন্ত যেন কয়লার মত কালো মসীমাখা। মাঝে মাঝে দূর থেকে গুড়্ গুড় করে

গম্ভীর মেঘ গর্জ্জনের শব্দ আসে, সমস্ত বস্তুর ভিত্তি পর্য্যন্ত তাতে কেঁপে ওঠে; মনে হয় স্বয়ং বিধাতা যেন সৃষ্টি করতে বসে উদ্দেশ্যহারা হয়ে গিয়ে থেকে থেকে অসহিষ্ণু ধ্বনি করছেন। ইংরাজ ভদ্রলোক এই সময় বসে বসেই যেন একেবারে অসাড় হয়ে যায়।

"ওঃ কি ভয়ানক"———একবার বিদ্যুৎ চমকের পর এই কথা বলে উঠে গিয়ে সে দরজার কাছে দাঁড়ালো। যেন আপনার মনেই বল্‌তে লাগলো—"বড়ই ভীষণ ব্যাপার। আর সকলের চেয়ে ভয়ানক কথা এই যে আমরা এও আর ভাবিনা, অন্তরে অনুভব করি না, ভাবতে পারিও না, কেমন করে যে ভয়ানক উপলব্ধি হয় তাও আমরা ভুলে গেছি।"

কাপ্তেন জিজ্ঞাসা করলে—"কিসের বিষয় বল্‌ছেন ?"

"এই ধরুন না কেন, আমাদের পায়ের নীচে চারিদিকে ব্যেপে এই যে অতলস্পর্শ গভীর সমুদ্র, যার কথা কত শ্রদ্ধার সঙ্গে বাইবেল পর্য্যন্ত বলেছে,—চোখের সুমুখে দেখতে পেয়েও তার কথা কি আমরা এখন একটুও ভাবছি ?" অন্ধকারের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে সে বলতে লাগলো—"ওঃ, দূরে, কাছে, সর্ব্বত্র কেবল ঢেউ আর ফেনা, থেকে থেকে ওর মধ্যে সবুজ রঙের জ্যোতি দেখা যাচ্ছে, অন্ধকার একটা প্রকাণ্ড শকুনির ডানার মত চারদিক থেকে চেপে ধরেছে,……আচ্ছা কাপ্তেনি করা বড় বিপদের কাজ,—না ?"

কাপ্তেন নিতান্ত তাচ্ছিল্যের ভাব দেখিয়ে উত্তর করলে, "কৈ না, মোটেই তা নয়। ভারী এক ঘেয়ে কাজ; অনেক দায়িত্ব আছে বটে কিন্তু এমন বিশেষ কিছু কঠিন নয়। সমস্তই অভ্যাসের ব্যাপার……"

"তার চেয়ে বরং বলুন আমাদের সকল বিষয়েই এমনি হৃদয়হীনতার একটা অভ্যাস হয়ে গেছে। আপনার ঐ ব্রিজের উপর দাঁড়িয়ে যখন দেখি ওর দু-পাশ থেকে মোটা কাচের ভিতর দিয়ে সবুজ আর লাল দুটো আলো বড় বড় দুটো চোখের মত জ্বলছে, রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে কোথায় ভেসে চলেছি, চারিদিকে মাইলের পর মাইল বিস্তীর্ণ অকূল-পাথার,— ভাবতে গেলে তখন মনে হয় এ কেবল নিতান্ত অসমসাহসিক পাগলের কাজ!" বাইরের দিকে চেয়ে আবার সে বল্‌লে—"কিন্তু সেও তো বড়

কম নয়, নীচে গিয়ে যদি কেবিনের মধ্যেই আশ্রয় নিয়ে শুয়ে থাকি, —সেখানে সামান্য একটু পাৎলা কাঠের ব্যবধান দেওয়া আছে মাত্র, আর মাথার কাছে ঐ তক্তার দেওয়ালের গায়ে অতলস্পর্শ সমুদ্রের ঢেউ এসে ক্রমাগত আছাড় খাচ্ছে!...এ কথা বড় মিথ্যা নয় যে সামান্য একটা পিঁপড়ের যতটুকু বিবেচনা-শক্তি আছে, আমাদেরও কেবল ততটুকুই; বরং তার চেয়ে আরো কম। একটা পিঁপড়ের বা একটা জানোয়ারের, কিংবা একটা অসভ্য মানুষেরও অন্ততঃ নিজস্ব স্বভাবটুকু বজায় থাকে, কিন্তু আমাদের তাও নষ্ট হয়ে গেছে, ক্রমশঃ আরো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।"

কাপ্তেন একটু হেসে উত্তর করলে—"তা যাই বলুন, পিঁপড়ে কখনো জাহাজে এমন পৃথিবী পর্য্যটন করতে পারে না, ইলেক্‌ট্রিসিটির সদ্ব্যবহারও করতে পারে না, বিনাতারে টেলিগ্রাফও করতে পারে না। এই মুহূর্ত্তেই ইচ্ছা করলে আমি এডেন বন্দরের সঙ্গে কথা কইতে পারি,—দেখ্‌তে চান? অথচ এখান থেকে সেটা দশ দিনের পথ।"

একজন ইঞ্জিনিয়ার এই কথায় হাসতে আরম্ভ করেছে দেখে চশমার ভিতর দিয়ে একবার তার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে ইংরাজ ভদ্রলোক বল্‌লে—"এটাও কম ভয়ানক কথা হোলোনা! কিন্তু আসলে আমরা কিছুকেউ আর ভয় করি না। আমরা মরণকেও গ্রাহ্য করিনা, জীবনকেও গ্রাহ্য করিনা; ভয় আমরা জীবনের কোনো রহস্যকেই করিনা; এই অসীম সমুদ্রকেও ভয় করিনা;—এমন কি মৃত্যুকেও ভয় করি না,—নিজের মৃত্যুকেও না, পরের মৃত্যুকেও না। আমি সৈন্য-বিভাগের একজন উচ্চ কর্ম্মচারী, বুয়ার যুদ্ধে লড়েছিলাম; কামানের গোলা মেরে আমি শত শত মানুষকে এক একবারে হত্যা করেছি; কিন্তু তবু তো বেশ নিশ্চিন্তই আছি! খুন করেছি বলে কাতরও হচ্ছি না, পাগলও হয়ে যাচ্ছি না,—ঐ সব শত শত লোকের কথা একবারও মনে ভাবিনা।"

কাপ্তেন জিজ্ঞাসা করলে—"আর জন্তু জানোয়ারেরা কিংবা অসভ্য মানুষেরা?—তারাই বুঝি ঐ সকল কথা ভাবে?"

"অসভ্য মানুষেরা বিশ্বাস করে যেটা ঘটনীয় তাই ঘটে যাচ্ছে, কিন্তু আমরা তাও করি না"—এই কথা বলে ইংরাজ ভদ্রলোক চুপ করে

রইল; জোরে জোরে পা ফেলে ঘরের মধ্যে কেবল পায়চারী করতে লাগলো।

দূর আকাশে তারাগুলোর উপর দিয়ে বিদ্যুতের চমক এখন অনেকটা কমে গেছে। ঠাণ্ডা বাতাস আরো জোরে বইতে লাগলো, বাইরের সূচীভেদ্য অন্ধকার আরো ঘন হয়ে উঠলো। জাহাজের দোলানিতে ঝিনুকের ছাইদানীটা টেবিলের উপর গড়াতে লাগলো। পায়ের তলায় একটা প্রবল শক্তি ক্রমাগত যেন পুঞ্জীভূত হয়ে ঠেলে উপরের দিকে উঠছে আবার যেন খসে নীচে পড়ে যাচ্ছে, আর জাহাজের মেঝেটা যেন সেই সঙ্গে নীচের দিকে তলিয়ে যাচ্ছে। অন্যান্য সকলে কাফি খাওয়া ও ধূমপান শেষ করে কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত আড়চোখে এই অদ্ভুত যাত্রীটির দিকে চেয়ে চেয়ে দেখলে, তার পর দাঁড়িয়ে উঠে 'গুড্‌নাইট' বলে টুপি হাতে করে বিদায় নিলে। কেবল কাপ্তেন চুরুট মুখে করে ভদ্রলোকের দিকে চেয়ে বসে রইল। ভদ্রলোক চুরুট হাতে এক দরজা থেকে আর এক দরজা পর্য্যন্ত ক্রমাগত ঘুরতে লাগলো। বৃদ্ধ ষ্টুয়ার্ড টেবিল পরিষ্কার করতে এসে অসন্তুষ্ট চিত্তে এই চশমা-পরা আন্‌মনা ভদ্রলোকটির দিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলো।

ইংরাজ ভদ্রলোক কিছুক্ষণ পরে বলে উঠলো—"হাঁ হাঁ, এইটেই আমাদের পক্ষে সবচেয়ে আশঙ্কার কথা যে আমরা আজ ভয় পেতে ভুলে গেছি। আমাদের কোনো ভগবানও নেই, কোনো ধর্ম্মও নেই,—ও সব অনেক কাল থেকেই নেই; ব্যবসা করে আর লোভ করে করে আমরা বরফের মত অসাড় হয়ে গেছি, জীবন বা মৃত্যু—এর কোনোটাকেই আর বুঝিনা। যদিও বা মৃত্যুকে কিছু ভয় করি তাও অন্য রকম কারণে, কিংবা হয়তো সেই আদিম জন্তু-প্রবৃত্তির এখনো কিছু অবশিষ্ট আছে বলে। কখনো কখনো চেষ্টা করি সেই ভয়টা মনের মধ্যে আনতে বা সেটাকে বড় করে দেখতে,—কিন্তু কোনো সাড়া জাগে না, কত ভীষণ ব্যাপার যে মানুষের জীবনে আছে তার কিছুই উপলব্ধি হয় না।...আমিই এখন যেটাকে ভয়ের জিনিষ বলছি, আমিই সেটাকে ঠিক অনুভব করছিনা"—আঙুল দিয়ে সে দরজার বাইরের দিকে নির্দ্দেশ করলে যেখানে অন্ধকার জলরাশি জাহাজকে

ধরে দোলা দিচ্ছে, আর জাহাজের প্রতি গ্রন্থিতে চড়্ চড়্ করে শব্দ হচ্ছে।

কাপ্তেন ধীরভাবে বল্‌লে—"সিংহলে এসেই বোধ হয় আপনার এই অবস্থা হয়েছে।"

ভদ্রলোক সায় দিলে—"সে তো নিশ্চয়ই, সে তো নিশ্চয়ই। দেখুন, আমরা যত ব্যবসাদার, ইঞ্জিনিয়ার, সৈন্য-বিভাগের লোক, রাজনীতিজ্ঞ, ঔপনিবেশিক,—সকলেই আমরা নিজেদের এক-ঘেয়ে আড়ম্বরের জীবন ছেড়ে মধ্যে মধ্যে পালিয়ে আসি, পৃথিবীময় ঘুরে ঘুরে বেড়াই; দেখছেন তো ইউরোপীয় দেশ-পর্য্যটকের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে; সারা পৃথিবী রং বে-রঙের বিজ্ঞাপনে আর টাইম টেবলে ছেয়ে ফেলেছে। আমরা প্রাণপণে চেষ্টা করি নিজেদের মুগ্ধ করে রাখতে,—কখনো সুইজারল্যাণ্ডের পাহাড় ও হ্রদ দেখতে যাই, কখনো যাই ইটালীর প্রাচীন ভগ্নস্তূপ আর ভাস্কর্য্যের নিদর্শন দেখতে; সিসিলির প্রাচীন এম্ফিথিয়েটারের পাথরের স্তূপ যেখানে এখন ছাতা ধরে পিছল হয়ে গেছে তার উপর দিয়েই ঘুরে বেড়াই, গ্রীসের প্রাচীন সহরের পাথরগুলো যেখানে ভেঙে-চুরে হল্‌দে রং ধরে গেছে সেখানে গিয়ে কৃত্রিম আনন্দে চেয়ে থাকি,—জেরুজেলামে যখন পবিত্র অগ্নি-উৎসব হয় তখন সেখানে গিয়ে এমন ভিড় করে জুটি যেন মেলাতে সং দেখতে এসেছি, ঈজিপ্টে গিয়ে কতকগুলো মন্দির আর কবর দেখবার জন্য গাইড্‌দের কতই অর্থদণ্ড দিই আর তাদের কতই অত্যাচার সহ্য করি। আমরা আবার জাহাজে চড়ে যাই ভারতবর্ষ, চীন, জাপান; কিন্তু কেবল এই সব দেশেই, যেখানে সকলের চেয়ে প্রাচীন মানুষেরা প্রথম যুগ থেকে বাস করে গেছে,—যে সব দেশ এখন আমরা দখল করে নিয়েছি—আর আমাদের উপনিবেশ বলে যাকে সর্ব্বদা পাহারা দিয়ে রক্ষা করি,—এখানে যদিও দেখি চতুর্দ্দিকে কেবল অপরিচ্ছন্নতা, প্লেগ, কলেরা, জ্বর, আর নানাবর্ণের মানুষগুলো নিতান্ত গরু ছাগলের মতই বাস করে,—কিন্তু কেবল এখানে এসেই আমরা জীবন আর মৃত্যু আর দেবতার সম্বন্ধে কিছু কিছু আস্বাদ যেন অনুভব করি। ওসাইরিস্, জিউস্, এপোলোন, খৃষ্ট, মহম্মদ, কোনো দেবতার কথাই আমি পূর্ব্বে কখনো গ্রাহ্য করতাম না, কিন্তু এখানে এসে মানুষের প্রথম শৈশব যুগের যে সব অদ্ভুত দেবতার মূর্ত্তি দেখলাম,—ঐ যে

শত হস্তধারী ব্রহ্মা, ঐ শিব, ঐ বুদ্ধ যার বাণী স্বয়ং ঈশ্বরের বাণীর মত একদিন মৃত্যুর দ্বারে গিয়ে পর্য্যন্ত ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল,—অনেকবার আমার মনে হয়েছে এই সব দেবতার কাছে নিঃসঙ্কোচে মাথা নোয়াতে পারা যায়।… আজ যে আমি এ সব কথা ভাবতেও পারছি আর অনুভব-শক্তি যে এখনও আছে বলে বোধ করছি এ কেবল এই প্রাচ্য দেশে এসেছি বলে, এখানকার রোগপীড়ায় ভুগে দেখেছি বলে; তা ছাড়া আমি আফ্রিকাতে গিয়ে স্বহস্তে শত শত লোককে হত্যা করেছি, ভারতবর্ষে গিয়ে সহস্র সহস্র লোককে অনাহারে মরতে দেখেছি, জাপানে গিয়ে কন্যা ক্রয় করেছি, চীনে গিয়ে অসহায় গরীবদের চাবুক মেরেছি, জাভায় আর সিংহলে গিয়ে রিক্‌শওয়ালাদের যতক্ষণ পর্য্যন্ত কণ্ঠশ্বাস না উঠেছে ততক্ষণ ছুটিয়ে নিয়ে বেড়িয়েছি, কোথাও গিয়ে বিষম জ্বরে ভুগেছি, কোথাও লিভারের রোগে ভুগেছি,—অনেক দেখে-শুনে তাই আজ আমি এত কথা ভাবতে পারছি। যে সব দেশের অসংখ্য অধিবাসী হয়তো এখনো সেই শৈশব যুগের মতই বাস করছে, অথচ আপনার সমস্ত সত্তা দিয়ে জীবনকে আর মৃত্যুকে আর বিধাতার সৃষ্টি-মাহাত্ম্যকে অন্তরের সঙ্গে অনুভব করতে পারে, কিংবা যারা বহুযুগ ধরে ইতিহাস, ধর্ম্ম ও দর্শন বিষয়ে অনবরত আলোচনাদ্বারা জ্ঞান বিজ্ঞানের কঠোর সাধনা করতে করতে বহুপথ অগ্রসর হয়ে গিয়ে এখন শ্রান্ত হয়ে থেমে পড়েছে,—নূতন লৌহ যুগের মানুষ হয়ে আমরা তাদের উপরে করি আধিপত্য, নিজেদের মধ্যে তাদের ভাগাভাগি করে নিই, আর একেই বলি উপনিবেশ-সমস্যা! ভাগাভাগি যখন শেষ হয়ে যাবে তখন জগতে হয়তো এক নূতন রাজছত্রের প্রতিষ্ঠা হবে, এক নূতন রোম রাজ্য আবির্ভূত হবে। আবার তখন সেই কথার পুনরাবৃত্তি শোনা যাবে,—যে কথা বাইবেলের জুডিয়ান ঋষিরা সিডোনকে বলেছিল, যে কথা এপোক্যালিপ্‌স্‌ রোম সম্বন্ধে বলেছিল, যে কথা বুদ্ধদেব ভারতের আর্য্য রাজাদের সম্বোধন করে বলেছিলেন—"হে ঐশ্বর্য্যগর্ব্বিত শক্তিদৃপ্ত রাজণ্যগণ, তোমরা কেবল পরস্পরকে ঈর্ষা কর। আর আপন আপন অতৃপ্ত লোভেরই ইন্ধন জোগাও…।" এই যে মায়ার জগৎ যার অস্তিত্বের কারণ আমাদের ধারণার অতীত, এখানে মানুষের আপন স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের মূল্য যে কতটুকু

তা বুঝেছিলেন বুদ্ধ, তাই তিনি মহা আতঙ্কে শিউরে উঠেছিলেন। আর আমরা নিজস্ব এই ব্যক্তিত্বকেই সকলের চেয়ে বড় স্থান দিয়েছি। যতই কেন আমরা বিশ্বজনীন সাম্য আর সখ্য আর ভ্রাতৃভাবের অভ্যুদয়ের বড় বড় কথা বলি, কিন্তু আসলে সমস্ত পৃথিবীকে আমরা নিজ নিজ ব্যক্তিত্বের মধ্যেই কেন্দ্রীভূত করতে চাই। কেবল এই সমুদ্র-বক্ষে যখন আসি, এই অজানা নক্ষত্ররাজির নীচে, এই ঝড়-তুফানের মধ্যে, আর এই ইতিহাস কাহিনীতে ভরা ভারতবর্ষে বা সিংহলে এসে যখন একেবারে আদিম মানবের হুবহু চিহ্ন কিছু কিছু দেখতে পাই,—যখন অনুভব করি এখানকার গুমোট অন্ধকারের নিস্তব্ধতার মধ্যে মানুষ কেমন করে নিঃসাড়ে খসে পড়ে অদৃশ্য হয়ে মিলিয়ে যায়, এখানকার শব্দ আর গন্ধ অন্ধকারের সঙ্গে একাকার হয়ে থাকে, কেবল তখনই আমাদের অসার ব্যক্তিত্বের কি যে মর্ম্ম তার সামান্য মাত্র আভাস পাই।”

কিছুক্ষণ ধরে চশমাটার ভিতর থেকে কাপ্তেনের মুখের পানে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে আবার সে বল্‌লে—“বৌদ্ধদের গ্রন্থে একটা গল্প আছে জানেন ?”

কাপ্তেন উদ্গত হাইটাকে আড়াল করে ঘড়ির দিকে একবার চেয়ে বল্‌লে—“কোন্ গল্প ?”

“একটা হাতী পাহাড় থেকে বেরিয়ে সমুদ্রের দিকে ছুটেছিল, আর একটা দাঁড়কাক তার পিছু নিয়েছিল। সমস্ত গাছপালা ভাঙ্‌তে ভাঙ্‌তে সমুদ্রে এসে পৌঁছেই হাতী ঢেউয়ের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লো, দাঁড়কাকটাও তার মাংস খাবার লোভে সঙ্গে সঙ্গে গেল। হাতীটা যখন জল খেয়ে খেয়ে মরে গিয়ে ঢেউয়ের উপর ভেসে উঠলো দাঁড়কাকটা তখন তার মৃত দেহের উপর বসে প্রাণভরে মাংস খেতে লাগলো। মৃত দেহটা যখন ভাসতে ভাসতে অনেক দূর চলে গিয়েছে তখন দাঁড়কাকটার চৈতন্য হোলো ; সে দেখলে তীর থেকে এখন এতদূরে চলে এসেছে যে ফেরবার আর উপায় নেই; তখন সে তারস্বরে এমনভাবে ডাকতে লাগলো যে-ডাক শোনবার জন্যই মৃত্যু শেষ পর্য্যন্ত চুপ করে অপেক্ষা করতে থাকে।...কি ভয়ানক গল্প !”

কাপ্তেন তাচ্ছিল্যের ভাবে বল্‌লে—“হাঁ, গল্পটার একটা কিছু উদ্দেশ্য আছে।”

ইংরাজ ভদ্রলোক চুপ করে আবার ঘুরে বেড়াতে লাগলো ; অন্ধকার মথিত করে জাহাজের ঘণ্টা দ্বিতীয়বার উঠলো বেজে। কাপ্তেন ভদ্রতার খাতিরে আরো পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করে উঠে দাঁড়ালো, ইংরাজ ভদ্রলোকের সঙ্গে করমর্দ্দন করে নিজের কেবিনে চলে গেল। ইংরাজ ভদ্রলোক তখনো কি ভাবছে আর পায়চারি করছে। জাহাজের ষ্টুয়ার্ড আধঘণ্টাকাল অপেক্ষা করে রেগে উঠে সেখানকার সমস্ত আলোগুলো নিবিয়ে দিলে, কেবল একটি আলো জ্বেলে রাখলে। সে চলে গেলে ইংরাজ ভদ্রলোক সেটাও দিলে নিঁবিয়ে। তখনই সমস্ত অন্ধকার হয়ে গেলো, মনে হোলো যেন তখন ঢেউয়ের গর্জ্জনও সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে উঠলো, বাইরের নক্ষত্রখচিত আকাশ আর জাহাজের মাস্তুলের দড়ি-দড়া জানালার ভিতর থেকে দেখা যেতে লাগলো। চড়্ চড়্ শব্দ করতে করতে জাহাজ এক ঢেউ থেকে আর এক ঢেউয়ের মাথায় নামতে উঠতে লাগলো। বড় বড় দোলা খেয়ে জাহাজ চলতে থাকে, সেই সঙ্গে আকাশের নক্ষত্রগুলোও যেন দুলে দুলে একবার নীচে তলিয়ে গিয়ে আবার উপরে উঠে পড়ে, আর সর্ব্বাঙ্গে তার জ্যোতির লেখা ছল্ ছল্ করে।

শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য্য
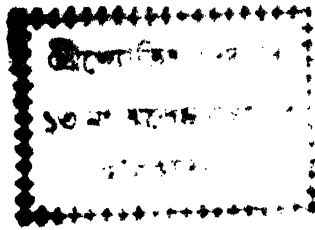
কবিতাগুচ্ছ

ঝিল্লীস্বর

আজ বিকালে হঠাৎ দুপেয়ালা চা খাওয়া ঘটে গেল,
যদিও নিয়মিত চা খাওয়া আমার অভ্যাস নয়।
ফলে লাভ হোল এই যে রাত্রে কিছুতেই ঘুম এল না।
ঘণ্টার পর ঘণ্টা একে একে বেজে যাচ্ছে,
ক্ষান্ত হয়ে আসছে পরিচিত পৃথিবীর কলরব,
বরফওলার ডাক, পাহারওলার হাঁক, বাস্-এর মেরামত ;
গাড়ী মোটরের বিরতিতে পথ এলিয়ে আছে নিশ্চিন্ত আরামে ;
সুধু ঝিল্লীর ডাকের বিরাম নেই,
সে-ডাকও এত মৃদু ও এমন অবিচ্ছিন্ন যেন নৈঃশব্দের প্রতিধ্বনি।

মনে পড়ে গেল সেদিনের কথা যেদিন পাহাড়ী দেশে বেড়াতে গিয়ে
দলছাড়া হয়ে তোমাতে আমাতে বনের মধ্যে গিয়ে পড়ি,
গভীর ঘন বন যাতে সূক্ষ্ম একটি পায়ে-চলা রেখা ছাড়া পথ নেই,
যার গাছে গাছে লাগালাগি, পাতায় পাতায় ঠাসবুনানি হয়ে
আকাশ পড়েছে ঢাকা, দিন হয়েছে ম্লানাভ রাত্রি,
আর অসংখ্য ঝিল্লীর অশ্রান্ত ক্রন্দনে যেখানে আদিম পৃথিবীর
প্রথমতম সঙ্গীত আজও ধ্বনিত হচ্ছে
মানুষের সমস্ত মুখর ভাষণকে স্তম্ভিত ক'রে।

সেই থেকে ঝিল্লীস্বর আমার কাছে অফুরন্ত ব্যঞ্জনায় ভরা।
কারণ সেদিন সে মুহূর্তে আমাদের উদ্বেলিত মন তাতে পরম আশ্রয় পেয়েছিল।
কিন্তু যে কথা তখন মুখে থেমে গিয়ে বুকের মধ্যে দোলা পাড়ছিল
তাকে বোবা ক'রে রাখে এমন ক্ষমতা বিশ্বপ্রকৃতিতে নেই।
তাকে ফোটাতে গিয়েই মানুষ গড়েছে তার সমাজ তার শিল্প তার সাহিত্য,

তাকে বলছে যুগে যুগে জনে জনে নতুন ভাষায়,
আর ভাবছে, বলার যা ছিল তার সবটুকু বলা গেল কৈ।
তোমার পক্ষে থেমে থাকা অসম্ভব হোল,
তার ভার তোমারও সহনাতীত ;
তুমি বল্লে চুপে চুপে, "তোমাকে আমার ভাল লেগেছে,
আমি তোমার বোন হতে চাই।"
এবার আমার চুপ ভাঙলো ;
হেসে উঠলাম এত জোরে যে ঝিল্লীস্বরও ডুবে গেল।
তুমি ব্যাথা পেলে, করুণ যন্ত্রনায় রাখলে তোমার চোখদুটি আমার চোখের দিকে।
আমার তখন মত্তাবস্থা, তোমার এ ব্যথা বুঝবো কেন ?
মনে হোল, আমায় তুমি চাও, দেহ মন প্রাণ সবটা দিয়েই চাও,
এ সুধু একটা ছলনা,
ছলনাময়ী নারীর অকারণ চাতুরীর লীলা।
তাই বল্লুম, বেশ শান দিয়ে,
"ও সব ভাই বোন পাতানো আমি মানি না,
তুলে রাখো তোমার অন্য ভাইদের জন্যে ;
আমি যা চাই তা-ই চাই, বদলে অন্য কিছু নিই না।"
তুমি চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বল্লে না কিছু উত্তরে।
আবার ঝিল্লীর অক্লান্ত কল্লোল।

তুমি রেখেছ তোমার কথা,
দিয়েছ ভেঙে আমার কামনার স্পর্দ্ধা,
গিয়েছ তুমি তারই ঘরে যাকে তুমি চেয়েছিলে।
তোমার নিষ্ঠায়, তোমার দাক্ষিণ্যে, তোমার শালীনতায় আমি মুগ্ধ।

আমার জগৎ জনবিরল নয়, নারীবর্জ্জিত নয়।
বন্ধুত্ব হয়, অন্তরঙ্গত্ব হবার আগেই মিইয়ে যায়,
বন্ধুরা বলে, আমার প্রাণ নেই।

বান্ধবীরা বলে, "তোমার মন একটা অন্ধ গলি,
মনে হয় পথ আছে, আসলে পথ নেই, ফিরে আসতে হয়।"
বলি, যেটাকে আড়াল ভাবো ভেঙে ফেললেই পারো।
উত্তর দেয়, "সেটা ত মানুষে-গড়া পাঁচীল নয়, স্বভাবে-গড়া পাহাড়,
তাকে উড়িয়ে দিলে তোমার মনের গড়নই যাবে বদলে,
তুমি আর তুমি থাকবে না,
যা দিয়ে তুমি টানো তাই হারাবে।"
শুনে হাসি আর ভাবি, মানুষের স্বভাব কত না প্রভাবের সমষ্টি।

তোমাকে যে সব সময়েই মনে পড়ে তা ত নয়,
কখনও বা দিনান্তে, কখন মাসান্তে;
আজ এই বিনিদ্র রাত্রে ক্ষীণ ঝিল্লীস্বরে তোমাকে দেখতে পাচ্ছি,
আমার অন্তরের কেন্দ্রে, আমার হৃৎপদ্মের কোষে,
আমার যা কিছু মাধুর্য্য, যা কিছু সুরভি যেখান থেকে ক্ষরিত হচ্ছে।

আজ অন্ধকারে চোখ মেলে একটা প্রশ্ন বারবার জিজ্ঞেস করছি,—
তোমার জীবনে কি এমন রাত আসে না।
যখন ঘুম তোমাকে ত্যাগ করে,
তুমিও শুনতে পাও এই ক্ষীণ ঝিল্লীস্বর,
আর ভুলতে পারো না সেই ঘন বন,
সেই সূক্ষ্ম পায়ে-চলা পথ,
সেই পাতার জালে বাধা পাওয়া স্বল্প আলোয় দিনের মাঝে ম্লানাভ রাত্রি,
আর,
সেই অসংখ্য ঝিল্লীর দুর্জ্জয় গর্জ্জন ?

টিনা

ভূতের খাটুনি খেটে সারাটা দিন কাটলো।
না, কথাটা ঠিক বলা হোল না,
আমার কাজের ধারা এমন নয় যে অত বড় আখ্যা দেওয়া চলে;

আমার কাজ ছোটখাটো, টুকরো-টাকরা,
ইংরেজিতে থাকে বলা হয়, নন্-ডেস্ক্রিপ্ট্;
অথচ তাদের বাঁধন অকাট্য, এড়াবার জো নেই।
মনে পড়ে যায় ছেলেবেলাকার ছবির বইয়ে পড়া সেই গালিভারের ছবি।
লিলিপিউশন্দের দেশে যার বিরাট চেহারা আটকা পড়েছিল
মাথার প্রত্যেকটি চুলে মিহি স্তোর অজস্র শাসনে।

শীতশেষের সন্ধ্যায় আমাদের পাড়াটি একেবারে ধূম্রলোক,
চোখ জ্বালা করে, দম আটকে আসে, নিঃশ্বাস ফেলা দস্তুরমতো এক্সার্সাইজ্।
স্ত্রীকে বল্লুম, চলো বেরিয়ে পড়ি।
উত্তর এলো, কাজ আছে।
'কাজ আছে' এযুগের চরম কথা, রঙের গোলাম, তার বড়ো
আর কোন তাস নেই।

একাই বেরোতে হোলো।

সদর দরজায় ডাকপিয়নের আবির্ভাব।
আমার হাতে যে-খাম দিলে তার ঠিকানায় আমারই নাম লেখা
মেয়েলি ছাঁদের সুস্পষ্ট হরফে।
হঠাৎ মনে হোলো অচেনা,
পরমুহূর্তেই বুঝতে পারলুম ভুল হয়েছে,
লেখার এ-ধাঁচ এককালে আমার অতিচেনাই ছিল।

চিঠি পড়ে আবার ভুল ভাঙলো।
এ চিঠি তাঁর যাঁর মেয়েকে একদিন আমার বিয়ে করার কথা ছিল
বছর পাঁচেক আগে।

তিনি লিখেছেন ঃ
"অনেক দিনই লিখব লিখব করি, হয়ে ওঠে না ;
সম্প্রতি পাহাড় থেকে নেমেছি, শীঘ্রই ফিরতে হবে ;
একদিন কি দেখা পাওয়া সম্ভব নয় ?
একটা দরকারী কথা ছিল।"

চিঠিটা স্ত্রীকে পড়তে দিলুম।
তাঁর মন্তব্য: "দরকারটা মায়ের না মেয়ের? কবে যাচ্ছো?"
উত্তর দিলুম, কাল কি পরশু।
"তাই যেয়ো, এখন চলো একটু বেড়িয়ে আসি।"
একটু আগে বললে যে তোমার কাজ আছে!
স্ত্রী নবাগতা, তবুও বুঝলেন: "কাজ ত আছেই, একা যেতে চাও,
একাই যাও।"
স্বর অভিমানক্ষুণ্ণ, কি আর করা!

একটা পার্কে গিয়ে বসলুম।
পাঁচ বছরের পর্দ্দা সরে গেল;
না, পর্দ্দা এসে গত পাঁচবছরকে ঢেকে দিলে,
জেগে উঠলো তার আগের যুগ, টিনার যুগ।

টিনার সঙ্গে প্রথম আলাপ ক্যামাক্ ষ্ট্রীটের ড্রইংরুমে,
পাতলা ঠুন্‌কো আলাপ,
দুপক্ষ থেকে কথা কাটাকাটির বাহাদুরি
যাতে মিষ্টতা নেই, তীক্ষ্ণতা আছে।

আমার বাস কলকাতার সেকেলে উত্তরপাড়ায়,
তবু যে পার্ক ষ্ট্রীটের দক্ষিণ দেশে ঠাঁই পেয়েছিলুম তার কারণ
আমার কটা রং ও বিলিতি-নবিশ মন।
মন কিন্তু দেহ নয়,
আচার-ব্যাভারে, বেশেভূষায় নিতান্ত বাঙালী।
মনটা ছিল ইউরোপের ভাববাষ্পে ফোলানো ফানুস,
যেদেশে তার জন্ম সেদেশে তার আত্মীয়তার টান ছিল না।
বিজ্ঞানে বলে, ফানুসও মাটির টানের বাইরে নয়,
কিন্তু এ টান প্রত্যক্ষ না হওয়ায় ও পক্ষের দৃষ্টি এড়িয়ে গেল।
তাঁদের ধারণা হোল, হীরে খাঁটি, একটু পালিশের অভাব;
মেয়ের কল্যাণে অভাব পূরণে মন দিলেন।

টিনার সঙ্গে আলাপ জমলো কালিম্পং-এর রোমান্টিক সেটিং-এ,
সেবার যখন আমি তাদের বাড়ী অতিথি,
রাজ-অতিথি বল্লেও অত্যুক্তি হয় না।
জামাই হবার আগেই জামাই-আদর ভাগ্যে জুটে গেল,
যদিও টিনা তখন হাঁ কি না কিছুই বলে নি।

টিনা নামটা আমারই দেওয়া,
বাপ রেখেছিলেন 'তন্বী,' যাকে মা করলেন 'টিনি' ;
মাঝে মাঝে আমি তাকে তিনকড়িও ডাকতুম।
কিন্তু আমার কাছে তখনও সে নতুন জগতের জীব
যার বিষয়ে আমার কৌতূহল ততটা লিরিক নয় যতটা সায়েন্টিফিক।

সাতটা দিন দেখতে দেখতে কেটে গেল—
দিবারাত্র খেলাধূলা গল্পগুজব গানবাজনা পাহাড়ে ওঠানামা,
আর ছিল ছবি তোলা
দূরবীণদাঁড়া থেকে রঙ্গিত-ব্রীজের সম্ভব অসম্ভব সব জায়গায়,
সে আমার আমি তার,
কিন্তু কখনও দুজনের একসঙ্গে নয়।

ফিরবার দিন এলো,
ভোরের আগে খোলা বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছি সূর্য্য ওঠার প্রতীক্ষায় ;
আকাশ ফরসা হয়েছে,
নীচের দিকে মেঘের সমুদ্র স্থির নিঃস্পন্দ,
যাতে গভীর উপত্যকার সমস্ত স্তর আচ্ছন্ন ;
দূরে হিমালয়ের অসংখ্য শৈলশির দুর্ভেদ্য গাম্ভীর্য্যে নিঃস্তব্ধ ;
টিনা এসে পাশে দাঁড়ালো।
দেখতে দেখতে কাঞ্চনজঙ্ঘার শুভ্রললাটে পড়লো প্রভাত সূর্য্যের
　　　　প্রথম রশ্মির সিন্দূর-আশীর্ব্বাদ।

হঠাৎ টিনা আমার বুকের কাছে মুখ রাখলে।

আমি তাকে তুলে ধরে তার ঠোঁটে যা দিলুম
তাতে তার মুখে ফুটে উঠলো কাঞ্চনজঙ্ঘার প্রতিচ্ছবি।
কাঞ্চনজঙ্ঘার সিন্দূর-শোভা ক'মিনিট থাকে ?
আমাদেরও তাই হোলো।
শাশুড়ির পয়সায় সাহেব বনার এমন সুযোগও আমার মন নিলে না।
টিনা রেগে বল্লে—'লাভ ইন এ কটেজ' এ যুগে অচল।

সেই থেকে ছাড়াছাড়ি ;
দুটি গ্রহ, তাদের কক্ষ বিভিন্ন,
অসীম শূন্যে ঘুরতে ঘুরতে কাছাকাছি এসেছিল,
আবার অসীম দূরত্বে ছড়িয়ে গেলো।

গেলুম দেখা করতে মিসেস সেনের বাড়ীতে।
কী আশ্চর্য্য শরীরের গড়ন,
এতকাল পরে কোথাও এতটুকু টস্‌কায়নি।
সুধু হাসির সে জ্যোতি আর নেই, কিছু নিষ্প্রভ।
জলযোগের পর নিজে থেকেই অনেক কথা বলে গেলেন,
একটি ছেলে মারা গেছে রেস-এ অনেক টাকা উড়িয়ে,
আরএকটি চেক-মেম বিয়ে ক'রে আলাদা হয়ে গেছে,
ছোটটিকে আর্মি-তে দেবার ইচ্ছে, কিন্তু তত সামর্থ্য নেই,
ইত্যাদি।
টিনার কথা আমিই পাড়লুম।
শুনলুম, বছর দুই তার বিয়ে হয়েছে নামজাদা এক ডেন্টিস্টের সাথে,
সাহেব পাড়ায় তার চেম্বার, থাকে আলিপুরে।
ভারি খুশী হলুম, মনে হোল এই ত ঠিক, এই ত তাকে মানায়,
বল্লুমও সে কথা।
মিসেস সেন হেসে বল্লেন, "জীবনে কি ঠিক না-ঠিক, কে জানে।"
জানতে পেলুম,
ডাক্তারের সঙ্গে টিনার ঠিক বনছে না, খিটিমিটি লেগেই আছে।

ডাক্তার সারাদিন তার চেম্বারে থাকে রোজগারের চেষ্টায়
অথচ তার স্বভাব এমন যে স্ত্রীকে চোখের আড়াল করতে ভয় পায়।
টিনাকে তাই হাজির থাকতে হয় পাশের একটা ছোট কুঠুরীতে
সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত,
সময় কাটাতে হয় শুয়ে বসে বই প'ড়ে।
সন্ধ্যাবেলায় শ্রান্ত হয়ে বাড়ী ফিরে ডাক্তার চায়
স্ত্রীর সঙ্গ, কফি-চুরুট, ও নির্জ্জন বিশ্রম্ভালাপ।
টিনার তখন নেশা লাগে লোকের সঙ্গ পাবার,
কিন্তু ডাক্তার তা একদম পছন্দ করেনা।
হেসে বল্লুম—এ আর এমন কি সমস্যা?
একটা বেবি হলেই গোল চুকে যায়।
এইবার মিসেস সেন আসল কথায় এলেন।
গোল সেইখানেই, টিনার ভীষণ অমত,
অমন সংকীর্ণ-মন লোকের সন্তানের মা না হতে সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ;
অথচ এই নিয়ে 'সীন' করতে সে ঘৃণায় মরে যায়,
তাই ঠাট বজায় রাখতে তাকে দিনে যা সহ্য করতে হয়
তার শোধ নেয় রাত্রে লোকচক্ষুর অন্তরালে।
বিব্রত হয়ে জিজ্ঞেস করলুম, আমায় ডেকে এসব কথা বলার মানে?
মিসেস সেন বলে গেলেন, গ্রামোফোন রেকর্ডের মতো বিরক্তভাবে,
যেন একটা চুক্তিরক্ষা করছেন,
"টিনি এখন ডিভোর্স চায়।
ডাক্তারের ইচ্ছে ছিলনা তাকে ছাড়া,
অনেক অশান্তির পর এখন তার আপত্তি নেই
যদি নিজের সুনামে ঘা না লাগে;
কেউ কো-রেস্‌পন্‌ডেন্ট হলে সে কেস আনতে রাজী।"
বুঝলুম আমার কেন দরকার; টিনার ঝোঁক এখন সেই পুরাণো কটেজে ফেরা
যেখানে সম্পদ না থাক সন্দেহ নেই।
আমার রহস্য-বোধ নেচে উঠলো চমকে দেবার এই সুযোগে;

বল্লুম, খুব শান্তভাবে,—কি ক'রে মত দিই, স্ত্রীকে না জানিয়ে।
মিসেস সেন আকাশ থেকে পড়লেন, স্ত্রী শুনে।
ঘরে ঢুকলো টিনা, ক্লান্ত অবসন্ন, যেন ঝড়-খাওয়া পাহাড়ী পাখী,
সোজা এলো আমার দিকে,
বসলো আমারই আসনটাতে, একেবারে গা ঘেঁসে,
মুখের দিকে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ,
পরে বল্লে—"তুমিও বিয়ে করেছ, সত্যি বলছ ?
কাঞ্চনজঙ্ঘার সে প্রভাত তাহলে তুমিও ভুলেছ ?
আমার উদ্ধারের পথ তাহলে একেবারেই বন্ধ ;
একটা ভুলের শাস্তি কি এমনই অমোঘ যে সারা জীবন ধরে তা বইতে হবে !"
এই বলে সে হাসতে হাসতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল
অপ্রকৃতিস্থের মতো।
সেদিনকার ইণ্টারভিউয়ের এইখানেই শেষ।
স্ত্রীকে বলার পর দেখি, তার চোখে জল।

দ্বন্দ্ব

বেলা তখন দশটা হবে,
ক্ষিপ্রবেগে খাওয়া সেরে আপিসে বেরোতে যাচ্ছি,
এমন সময় একটা ভিকিরী দরজায় হাঁক দিলে।
আজকাল সকল পেশাতেই বাঙালী এমন কম
যে কলকাতায় ভিক্ষুকের দলেও বাঙালী বিরল।
এটি যে বাঙালী পুরুষ
চোখে না দেখেও গলার স্বরে তা বোঝা গেল।
ভিক্ষার ডাকে আমার মনে করুণা না জেগে জাগে রাগ,
বিশেষতঃ যখন দেখি দুটি চাল বা একটি পয়সা দিয়ে গৃহিণী পুণ্য কেনায় উদ্‌গ্রীব।
ভুলতে পারিনা চার্লস ল্যাম্‌-এর সেই বিখ্যাত ব্যাঙ্গোক্তি,
"বাইয়িং এ পেনি-ওয়ার্থ অব প্যারাডাইজ।"
তাই তিনি ভিক্ষা দিতে গেলে তীব্র প্রতিবাদ করি,

তীব্র কিন্তু প্রায়ই নিষ্ফল,
কারণ হিন্দুরমণীর পুণ্যাকাঙ্ক্ষার তরঙ্গ রোধিবে কে।
আজ নেহাৎ আমার সামনে দাঁড়িয়েই গৃহিণী ভিক্ষা দেবার হুকুম দিতে
ইতস্ততঃ করতে লাগলেন,
কী তাঁর ব্যস্ততা সেই মনের অস্বস্তি আমার চোখে গোপন রাখতে।
দেখে হাসি পেল।
সেই সঙ্গে অনুভব করলুম আমার মনটাও কেমন যেন নরম হয়েছে।
ইচ্ছে করছে গৃহিণীকে বলি ওকে কিছু দিতে,
কিন্তু সঙ্কোচ এসে বাধা দিলে ঃ
হঠাৎ সাহস পেলুম না
এতদিনকার সদর্প ঘোষিত পৌরুষবৃত্তির বিরুদ্ধে যেতে।
ভাবতে লাগলুম,
আমার মন এমন বদলালো কেন ?
এ ভিক্ষুকের এমন কি বিশেষ দাবী
যাতে আমার সাধারণ আচরণের ব্যতিক্রম হচ্ছে !
একথা ঠিক আমার স্বজাতি বাঙালীকে আমি ভালবাসি,
কিন্তু যে ভালবাসা বিচারবুদ্ধিকে অন্ধ করে দেয়
তাকে আমি ভয় করি, ঘৃণা করি।

ভিক্ষা দেওয়া ভালবাসার অপমান, এ আমার দৃঢ় মত।
আমি চাই দেশ-জোড়া দারিদ্র্যের অবসান
ধনোপার্জ্জনের, ধনবণ্টনের, যোগ্যতর ব্যবস্থা দিয়ে,
যা ভিক্ষা দিয়ে হবার নয়।
এর জন্যে আমার সমস্ত আয় দেশের সমস্ত আয়ের সঙ্গে মিশে গিয়ে
ক্ষীণতর হয়ে ফিরে আসুক আমার অংশে সকলের সঙ্গে সমান হয়ে
তাতে আমার আপত্তি নেই, সম্মতি আছে।

মনের মধ্যে এই প্রশ্নের তোলপাড় চলছে,
সমাধান করে দিলে ভাইপো এসে।

ভাইপোটি বয়সে তরুণ, আনকোরা এম্, এ,
খুব চটপটে, প্র্যাক্‌টিক্যাল,
কোনো ননসেন্সের ধার ধারেনা।
চেঁচিয়ে বলে দিলে—"ওহে পথ দেখো, এ বাড়ীতে কিছু হবেনা।"
শুনে চমকে উঠলুম, একথা যে আমারই কাছে শেখা।
প্রতিবাদ শুনে, আরও গলা চড়িয়ে ঝাঁঝিয়ে উঠলো,
"অত বড় শরীর রয়েছে খেটে খেতে পারো না ?
উঠোনে বাসন রয়েছে, মাজতে পারো ? তাহলে পয়সা পাবে।"
ঝি সেখানে দাঁড়িয়েছিল, এই শুনে যোগান দিলে,
"কেন বাপু বিরক্ত করছ, চলে যাও, আমার বাসন আমি মাজবো
তোমায় কিছু করতে হবে না।"
ভিক্ষুক বল্লে, "রাখবেন বাবু আমায়, আমি কাজ করতে রাজী।"
ভাইপোর উত্তর ঃ "আমরা কেন রাখতে যাবো, আমাদের ত লোক রয়েছে,
অন্য কোথাও খুঁজে দেখো ; খুঁজলে আবার কাজ মেলে না ?"
ঝি ভয়ে ঝঙ্কার দিয়ে উঠলো, "এখনও দাঁড়িয়ে আছ, যাও, চলে যাও, বলছি।"
ভিকিরীটা চলে গেল।
সব শুনলুম।
আপিসের সময় হয়ে গিয়েছে, দাঁড়াবার সময় নেই, বেরিয়ে পড়লুম্।

বাঁধাবরাদ্দ কাজের চাপে সারাদিন কোন্ দিক দিয়ে কেটে গেল,
টেরও পেলুম না।
রাত্রে শুতে গিয়ে দেখি ঘুম আর আসে না।
কি আমার কর্ত্তব্য ছিল, এ-প্রশ্নের আক্রমণে আমি জর্জ্জরিত।
কি আমার কর্ত্তব্য—বর্ত্তমানের প্রতিকার, না ভবিষ্যতের প্রতীক্ষা ?
বর্ত্তমানের কোনো প্রতিকার যে সর্ব্বাঙ্গীণ নয় তা তো আমি জানি।
দেশজোড়া ভিক্ষুকশ্রেণী,
ভিক্ষা দিয়ে কতজনের কতটুকু উপকার করা যায় ;
এতো শুধু অক্‌সিজেন দিয়ে মুমূর্ষুর মৃত্যু-যন্ত্রণাকে
লাঘব করার নামে দীর্ঘতর করা ;

ভিক্ষা দেওয়া মানে ভিক্ষাবৃত্তিকে কায়েমী করা।
কিন্তু 'খুঁজে নাও' বল্লেই ত করার মতো কাজ খুঁজে পাওয়া যায় না।
তাহলে কি কর্ত্তব্য এই,
নির্ম্মম হয়ে, রিক্তানুভূতি হয়ে অপেক্ষায় থাকা সেই সুদূর ভবিষ্যতের
যতদিনে স্বপ্ন সার্থক হবে, আদর্শ সফল হবে,
যোগ্যতর ব্যবস্থায় ভিক্ষাবৃত্তির নিবৃত্তি হবে?
এই যদি কর্ত্তব্য, আমার চিত্ত তাতে শান্তি পায় না কেন?
শান্তি ত পেয়েছিলুম, যতক্ষণ আপিসের কাজে ডুবেছিলুম।
এই কি তবে কর্ত্তব্য, জীবনের সমস্যাকে ভুলে যাওয়া,
সত্য-সঙ্কটের সম্মুখীন না হওয়া,
মানুষের শরীরে যন্ত্রের জীবনযাপন করা?

এ কী অন্তহীন দ্বন্দ্ব আমার অন্তরে।
এ দ্বন্দ্ব ত জেকিল-এর সঙ্গে হাইড্-এর নয়,
সাংখ্যের সেই দুই পাখীর নয়;
এ দ্বন্দ্ব যে চিত্তের সঙ্গে মনসের,
অনুকম্পার সঙ্গে বিচারের,
বর্ত্তমানের সঙ্গে ভবিষ্যতের।
জীবন কি শুধু তবে হেরাক্লাইটায় আবর্ত্ত, মুক্তি সুধুই বিভ্রম?
কে বলে দেবে, কোনটা পথ, কোনটা অনুসরণীয়?
হৃদিস্থিত হৃষীকেশ,
তুমি কি জানিয়ে দিতে পারো না, তুমি কি চাও? নির্দ্বন্দ্ব হওয়ার পন্থা কি?
তুমি কি নির্ব্বাক,
না, তুমিও অবোধ?
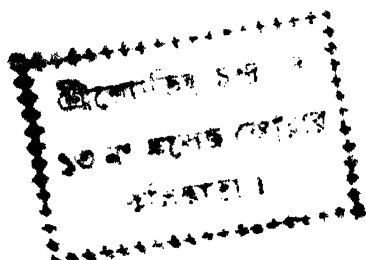
শ্রীনীরেন্দ্রনাথ রায়

পুস্তক-পরিচয়

রবি-দীপিতা—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশ গুপ্ত প্রণীত ; (মণ্ডল ব্রাদার্স)।

প্রথমেই বলিতে হইতেছে, 'রবি-দীপিতা' রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সমালোচনা নহে। ইহা 'রবি-দীপিকা' নহে, 'রবি-দীপয়িতা' হইবার স্পর্দ্ধা আছে, কিন্তু যোগ্যতা নাই, সুতরাং ইহা 'রবি-দীপয়িতা' তো নহেই, ইহা নিতান্ত-প্রত্যক্ষভাবেই 'রবি-দীপিতা।' "প্রয়োজনমনুদ্দিশ্য ন মন্দোঽপি প্রবর্ত্ততে," গ্রন্থের এই অভিনব নামোদ্ভাবনের প্রয়োজন ছিল, সে প্রয়োজন সুসাধিত হইয়াছে বলিয়াই এ গ্রন্থ সার্থকনামা। মূঢ়জন যাহাকে 'ভূমিকা' বলে, পণ্ডিত লেখক তাহার জন্যও একটি নূতন নাম উদ্ভাবন করিয়াছেন—'আলোচন'।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যপাঠে উদ্দীপিত হইয়া শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাশ গুপ্ত মহাশয় কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, এ গ্রন্থ তাহারই সমুচ্চয়, এই কারণেই ইহা 'রবি-দীপিতা'। যদি তিনি প্রবন্ধ না লিখিয়া গল্প বা কবিতার সাহায্যে তাঁহার উদ্দীপনা প্রকাশ করিতেন, তাহা হইলে তাহাও 'রবি-দীপিতা'ই হইত, এবং 'রবীন্দ্র-কাব্য-সমালোচনা' বলিয়া বর্ণিত হইবার দাবি ইহা অপেক্ষা তাহার অল্প থাকিত, এরূপ মনে করিবার কোনো কারণ নাই। কিন্তু পাঠক তাহাতে বঞ্চিত হইতে পারিত, কারণ, লেখকের অশেষবিধ বৈদগ্ধ্যের ভার বহন করিবার পক্ষে প্রবন্ধই উপযুক্ততম বাহন, রবীন্দ্রনাথের কাব্য পড়িয়া তাঁহার নবায়মান চিত্ত এতই উদ্দীপিত হইয়াছে যে তাঁহার সমস্ত মনসিজ ভাব অভিব্যক্ত করিবার এমন সুপ্রশস্ত সুযোগ প্রবন্ধ ব্যতীত অন্য কোনো রচনা-রীতিতে মিলিত কিনা সন্দেহ ; সুতরাং 'রবি-দীপিতা' প্রবন্ধাকারে রচনা করিয়া লেখক তাঁহার প্রয়োগ-নৈপুণ্যেরই পরিচয় দিয়াছেন।

ইহাতে নিম্নলিখিত পাঁচটি প্রবন্ধ আছে :—(১) 'কড়ি ও কোমল', ২০ পৃষ্ঠা, (২) 'ফাল্গুনী', ১৯ পৃষ্ঠা, (৩) 'বলাকা', ৮৪ পৃষ্ঠা, (৪) 'রবীন্দ্র-সাহিত্যে কান্তা প্রেম', ৭২ পৃষ্ঠা, (৫) 'কান্তা-প্রেম—মহুয়া', ৫৩ পৃষ্ঠা। 'কড়ি ও কোমল', 'ফাল্গুনী' এবং 'বলাকা', এই তিনটি প্রবন্ধ মিলিয়া ১২৩ পৃষ্ঠা কিন্তু এক কান্তা-প্রেমের আলোচনাই ১২৫ পৃষ্ঠা। 'যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী', সুতরাং লেখকের এই পরিমাণবোধ-রাহিত্যে বিস্মিত হইবার কিছু নাই। কান্তা-প্রেমেই রবীন্দ্র-কাব্য প্রকর্ষ লাভ করিয়াছে, সংস্কার-বশে বা অনুশীলনের ফলে, যেমন করিয়াই হউক, এ ধারণা লেখকের মনে বদ্ধমূল হইয়াছে এবং তিনি ইহাতে বিশেষ উদ্দীপিত হইয়াছেন। পর্য্যায়সৃষ্টি যুক্তিশাস্ত্রসম্মত কিনা, এ প্রশ্ন অবান্তর, কারণ, গ্রন্থসৃষ্টি করিবার জন্য এই পর্য্যায় সৃষ্ট হয় নাই, পর্য্যায় পূর্ব্বে সৃষ্ট হইয়াছে বলিয়াই এই গ্রন্থ সৃষ্ট হইতে পারিয়াছে।

'কড়ি ও কোমল'—'কড়ি ও কোমল' পড়িয়া ৺আশুতোষ চৌধুরীর মনে হইয়াছিল "মানব-জীবনের বিচিত্র রসলীলা কবির মনকে একান্ত করিয়া টানিতেছে, এই কথাটাই 'কড়ি ও কোমল'-এর কবিতার ভিতর দিয়া নানাপ্রকারে প্রকাশ পাইতেছে। এই জীবনের মধ্যে প্রবেশ করিবার ও তাহাকে সকল দিক্ দিয়া গ্রহণ করিবার জন্য একটি অপরিতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা এই কবিতাগুলির মূল কথা।......তাঁহার মতে"—'মরিতে চাহিনা

আমি সুন্দর ভুবনে'—"এই কবিতাটির মধ্যেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্ম-কথাটি আছে" (জীবনস্মৃতি)। রবীন্দ্রনাথ এ অভিমত স্বীকার করিয়াছেন, তিনি মনে করেন, "জীবন যে জীবনযাত্রায় বাহির হইয়া পড়িতে চায়" (জীবন-স্মৃতি) 'কড়ি ও কোমল' তাহারই অবদান।

কিন্তু 'কড়ি ও কোমল' পড়িয়া বর্ত্তমান লেখকের মনে হইয়াছে এই :—"সমস্ত প্রাণ দিয়ে কবি পার্থিব সৌন্দর্য্যকে ভালবেসেছিলেন, একদিকে পত্রপুষ্পশালিনী বসুন্ধরা অপরদিকে বিশ্ববিমোহিনী নারী। এই দুইটিতেই তাঁর সমস্ত ইন্দ্রিয়কে আকৃষ্ট করেছে, বিভোর করেছে, মাতাল করেছে। সে এমনি পূর্ণতা যে তাঁর মনে হচ্ছে যে এ পথ তাঁর শেষ হয়ে গেছে, তাই তিনি তখন পূর্ণ হয়েও রিক্ত, সমাপ্তির শূন্যতায় দীন ও নিঃসম্বল। এতদিনের সৃষ্টি বিলোপ করবার জন্য তাঁর রাজ্যের সিংহদ্বারে প্রলয়ের শিঙ্গা বেজে উঠেছে। কবি শ্রান্ত হয়ে পড়েছেন, সৃষ্টিতে আর তাঁর উৎসাহ নাই। এই যেমন একটা প্রলয়ের মূর্ত্তি এসে পূর্ব্বসৃষ্টির ব্যাবর্ত্তক হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তেমি আবার অপরদিক দিয়ে দেখতে গেলে সেই ব্যাবর্ত্তকতার মধ্যে আমরা আর একটি নূতন সৃষ্টির বীজকে প্রত্যক্ষ করতে পারি।......তিনি একদিকে যেমন বুঝেছেন যে তাঁর সে সৃষ্টি আর চলবে না, অপর দিকে আবার তেমি করে নব চৈতন্যের জন্য হুঙ্কার দিয়ে উঠ্ছেন। সেইজন্যেই একদিকে যেমন ইন্দ্রিয়াচ্ছন্ন পরিচ্ছিন্ন প্রেমের একটি লৌকিক বিগ্রহ দেখতে পেয়েছি, আবার তেমি তার প্রাণস্বরূপ একটি নবচৈতন্যের উন্মেষও আমাদের চোখে পড়ে।..... একটি সান্তের উপর বা একটি খণ্ডের উপর যতই সান্ত বা খণ্ড চাপাই না কেন তাতে কখনই অনন্ত ও অখণ্ডের বোধ বা জ্ঞপ্তি হ'তে পারে না। তার পাল্লা যতই লম্বা হোক, সে কেবল অন্ত থেকে অন্তে ছুটোছুটি। বাস্তবিক অসীমের যতটুকু বোধ বা প্রত্যয় আমাদের সম্ভব, সে কেবল এই চিচ্ছায়াপত্তির দ্বারাই সংঘটিত হ'তে পারে। যতক্ষণ বৃত্তি ও তার বহির্বিষয় নিয়ে মানুষ ব্যস্ত থাকে, ততক্ষণ অন্তরের চিদাভাসের ছায়াপাত সত্ত্বেও কোনো অভিব্যঞ্জনা হয় না। কিন্তু যখন বহির্বিশ্বের এই ক্রমসঞ্চারী পর্য্যায়ধারায় মানুষের তৃপ্তি সম্পাদন করতে পারে না, তখন ভোগে বিরাগ উপস্থিত হয় ও মিলনের পূর্ণতায় শ্মশানের রুদ্রদীপ্তি খাঁ-খাঁ করতে থাকে" ('রবি-দীপিতা'—'কড়ি ও কোমল')।

ইহা কাব্য-সমালোচনা নহে, ব্যাখ্যাও নহে, ইহা প্রলাপ, তবে দার্শনিক প্রলাপ বলিয়া জ্ঞানীর উপাদেয়। 'ফাল্গুনী' প্রবন্ধটি আদ্যন্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ। 'ফাল্গুনী' পড়িয়া লেখকের মনে আসিয়াছে ব্রাউনিং, যম ও নচিকেতা, নীতিশাস্ত্র, বার্গস্ (sic), Holy questও বাদ পড়ে নাই ; লেখক সে সমস্তই তাঁহার অনুকরণীয় ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন।

'বলাকা—প্রবন্ধের প্রারম্ভেই লেখক বলিতেছেন :—"বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক দুই একজন বন্ধুর সহিত যখনই আলাপ ও আলোচনার সুযোগ হইয়াছে তখনই শুনিয়াছি যে রবীন্দ্রনাথের বলাকা কাব্য অনেকাংশে দুর্ব্বোধ এবং রবীন্দ্রসাহিত্যে তাহার স্থান কোথায় তাহা নির্দ্দেশ করা কঠিন।......অধ্যাপক বন্ধুরা আমাকেও মধ্যে মধ্যে এই সম্বন্ধে কিছু কিছু বলিতে অনুরোধ করিয়াছেন। যখন যতটুকু সুযোগ পাইয়াছি বলিতে চেষ্টা করিয়াছি। আজ এই প্রবন্ধে বলাকা সম্বন্ধে মোটামুটি ভাবে একটা আলোচনা করিব" ('রবি-দীপিতা'—'বলাকা')।

ইহা ,অধ্যাপকগণের বোধসৌকর্য্যার্থে লিখিত, সুতরাং 'বলাকা' বিষয়ে ইহা তাঁহাদের 'বোধোদয়'। লেখকের হিতৈষণার জন্য বঙ্গভাষাভাষী অধ্যাপককুল তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। প্রবন্ধের পদ্ধতি এইরূপ :—

"প্রকৃতির প্রকৃতিস্থতার মধ্যে যে একটা অপ্রকৃতিস্থতার ধাতু আছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। সুন্দর মধুরের মধ্যে হঠাৎ একটা পাপ, একটি উৎপাত জ্বলজ্জটাকলাপ হইয়া দেখা দেয়, যাহার অগ্নিশিখার স্ফুলিঙ্গে গৃহের প্রদীপ জ্বলিয়া ওঠে, সেই শিখাতে নিশীথ রাত্রিতে গৃহদাহ উপস্থিত হয়।" ভাষা এবং ভাবের এই অপ্রত্যাশিত উৎপাতে বিশৃঙ্খলবাক্ গ্রন্থকারের প্রকৃতিস্থতা বিষয়েই পাঠকের সন্দেহ জন্মে ; সুতরাং প্রকৃতির অপ্রকৃতিস্থতা সম্বন্ধে ভাবিবার সময় অতি অল্পই থাকে।

'বলাকার' 'ছবি' কবিতাটি প্রসিদ্ধ, কিন্তু 'কূটস্থ অন্তর্য্যামী পুরুষের' উপর আলোক-সম্পাত করে বলিয়া প্রসিদ্ধ, একথা জানা ছিল না। অপ্রাসঙ্গিক দার্শনিকতা বর্ত্তমান লেখকের মৌলিক মনোবৃত্তি, সুতরাং তিনি অতি সহজেই আবিষ্কার করিতে পারিয়াছেন, "প্রথম প্রশ্ন উঠিয়াছিল এই যে তাহা হইলে আমাদের কূটস্থ অন্তর্য্যামী পুরুষের সহিত আমাদের এই গতির, প্রাকৃতিক জীবনের সম্বন্ধ কোথায়—'ছবি' কবিতাটিতে সেই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইয়াছে" ('রবি-দীপিতা')। 'কূটস্থ অন্তর্য্যামী পুরুষ' পরব্রহ্মের সালোক্যবাসী, সুতরাং ইহাতে ব্রহ্মজিজ্ঞাসারও উত্তর মিলিয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। ইহা চরম সুসমাচার সন্দেহ নাই, কিন্তু এ প্রশ্ন কবে উঠিল, কে তুলিল, ইহার কি উত্তর দেওয়া হইল, সমস্তই মীমাংসা-সাক্ষেপ রহিয়া গেল। 'বলাকা' পড়িয়া লেখকের মনে আসিয়াছে Conservation of Mass, Conservation of Energy, মেঘদূত, Hegel, Bradley, Bosanquet প্রভৃতি। প্রসঙ্গ-নিরপেক্ষভাবে নানা কথা মনে আসা যদি বৈদগ্ধ্যালক্ষণ হয় তাহা হইলে লেখকের বৈদগ্ধ্য অসাধারণ তাহা স্বীকার করিতে হইবে ; তবে ইহা echolaliaও হইতে পারে। এ আত্মঘাতী পাণ্ডিত্য হইতে লেখককে রক্ষা করিতে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও অক্ষম ; ইহা সরস্বতীর আশীর্ব্বাদ নহে, অভিশাপ।

'রবীন্দ্র-সাহিত্যে কান্তা প্রেম'—পূর্ব্ববর্ত্তী প্রবন্ধে যাহা আভাস মাত্র, ইঙ্গিতে পর্য্যবসিত ছিল, তাহা নিঃশঙ্ক পূর্ণতা লাভ করিয়াছে, লেখকের মানসিক ঐশ্বর্য্যের ইহাই শ্রেষ্ঠতম অভিজ্ঞান। 'আঁখির অপরাধ' কবিতাটি তাঁহাকে নিম্নলিখিত প্রণালীতে উদ্দীপিত করিয়াছে :—" 'আঁখির অপরাধ' কবিতাটিতে কবি বলিতেছেন যে তিনি বাসনার দৃষ্টি দিয়া তাঁহার প্রেমের পাত্রীটিকে দেখিয়া তাহাকে কলুষিত করিয়াছেন। ইন্দ্রিয়ের দ্বার দিয়া তাঁহার প্রেমের পাত্রী জীবনের মূলে প্রবেশ করিয়াছেন বলিয়া ইন্দ্রিয়ের ভোগতৃষ্ণাদ্বারা সেই মূর্ত্তি অপবিত্র হইয়াছে।" ('রবি-দীপিতা'—'রবীন্দ্র-সাহিত্যে কান্তাপ্রেম')।

লেখক বলিতেছেন, "সংস্কৃত কাব্য পড়িলে দেখা যায় যে কালিদাস প্রভৃতি অনেক কবির মধ্যেই নারীর প্রেম অধিকাংশ স্থলেই নিছক ঐন্দ্রিয়জ (sic) কামরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে।" সংস্কৃত কাব্য আদিরস-প্রধান ইহা সর্ব্বজনসম্মত প্রত্যক্ষ, সুতরাং উদ্ধৃতি-বাহুল্যের দ্বারা ইহার প্রমাণের প্রয়োজন নাই। কিন্তু লেখক মনে করেন প্রয়োজন আছে তাই তাঁহার প্রবন্ধে দেখিতে পাই, এই সহজ কথা প্রমাণ করিবার জন্য কালিদাস, নরসিংহ, মনোবিনোদ, রাজশেখর, শ্রীহর্ষদেব, ধর্ম্মকীর্ত্তি

ও ভর্ত্তৃহরি ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। বাদ পড়িয়াছেন ঔদ্দালকি, বাভ্রব্য, দত্তক, সুবর্ণনাভ, ঘোটকমুখ, গোনর্দীয়, বাৎস্যায়ন, কোক্কক, ভানুদত্ত ও কল্যাণমল্ল; তাহার একটি কারণ এই যে উদ্ধৃত হইবার জন্য তাঁহাদের সকলের রচনা বাঁচিয়া নাই, আর একটি কারণ লেখকের স্বভাবসিদ্ধ সংযম।

লেখক বলিতেছেন, "প্রিয়ালিঙ্গনের মধ্যে হৃদয়ের যে রসৈকতানতা ঘটে সেই রসৈকতানতার সহিত ব্রহ্মানন্দের বা আত্মানন্দের রসৈকতানতার সারূপ্য প্রবীণেরা উপলব্ধি করিয়াছিলেন।" একথা অতীব যথার্থ, অপ্রবীণগণ কোনোকালেই এই 'সারূপ্য' উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। প্রবীণ লেখক কল্যাণমল্ল ইহা উপলব্ধি করিয়া অপ্রবীণদিগকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন :—

"নিঃসারে জগতি প্রপঞ্চসদৃশে সারং কুরঙ্গীদৃশা-
মেকং—ভোগসুখং—পরাত্মপরমানন্দেন তুল্যং বিদুঃ।
তজ্জাত্যাদি বিবেক মূঢ়মনসো লব্ধাপি নানাঙ্গনাঃ
সংবিন্দন্তি না কামতন্ত্রবিকলাঃ পশ্বাদিবন্মানবাঃ ॥" (অনঙ্গরঙ্গঃ)

উদ্ধৃত করিবার এমন সুযোগ পাইয়াও এমন উদ্ধৃতিযোগ্য শ্লোকটি রসজ্ঞ লেখক উদ্ধৃত করেন নাই, ইহা তাঁহার অসামান্য সংযমের পরিচয়।

দেহজ প্রেমের বিবৃতি-প্রসঙ্গে বৈষ্ণব কবিতা হইতে লেখক যাহা উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহার নমুনা এই :—

"অপক্ক দেহেতে　　এ কাম সাধিতে
ই-কুল উকুল যায়।
বামন হইয়া　　বাহু পাশরিয়া
চান্দ ধরিবারে চায়।"

—লেখকের অধ্যয়নও যেমন অগাধ সুপ্রযুক্ততা-বোধও তেমনি তীক্ষ্ণ; কারণ দেহজ প্রেম ও দেহাতীত প্রেম, উভয়ের আলোচনাতেই তিনি পক্ষপাতশূন্য; নিরপেক্ষভাবে বহু অনাবশ্যক সংস্কৃত শ্লোক ও অ-সংস্কৃত কবিতা উদ্ধৃত করিয়াছেন। সহজিয়া সম্প্রদায়, Epipsychidion, 'উজ্জ্বল নীলমণি,' শ্রীমদ্ভাগবৎ, রামায়ণ কিছুই বাদ পড়ে নাই।

'কান্তা প্রেম—মহুয়া'—লেখক বলিতেছেন :— "পৃথিবীর যজ্ঞ-বেদিকায় যে দুঃখের হোমশিখা জ্বলিতেছে, যে প্রাণের আহুতি চলিয়াছে তাহারই চতুর্দ্দিকে তিনি আমাদের সপ্তপদী গমনের সহযাত্রিণী। তিনি আমাদের অজানাপথের পাহাড়কাটার সঙ্গিনী!

"পথ বেঁধে দিল বন্ধন-হীন গ্রন্থি,
আমরা দুজন চ'লতি হাওয়ার পন্থী ইত্যাদি।"

রবীন্দ্রনাথ যাহা 'নিবারণ চক্রবর্ত্তী'কে দিয়াছিলেন, বিশ্বভারতী তাহা 'মহুয়া'তে ছাপিয়াছেন; 'নিবারণ চক্রবর্ত্তী'র কবিতা 'নিবারণ চক্রবর্ত্তী'র মত করিয়া ব্যাখ্যা করিয়া বর্ত্তমান লেখক রবীন্দ্রনাথকে দত্তাপহারিত্বের কলঙ্ক হইতে রক্ষা করিলেন।

লেখক বলিতেছেন :—"আজিকার এই প্রেম যখন বিচ্ছেদ ও অন্ধকারের মধ্যে বিষাদমগ্না নির্জ্জন-কুটীর-লীনা প্রেয়সীর দ্বারে বজ্রধ্বনি-মন্দ্রিত-মল্লারে মৃত্যুনির্ঘোষে আসিয়া প্রিয়ের চিরবিরহ সূচনা করে, তখন শোকাচ্ছন্না নারী যুদ্ধশায়ী বীরের চির-

প্রয়াণের বার্ত্তার মধ্যে তাহার আপন বিবাহমাল্যের আঘ্রাণ পায়।" ('রবি-দীপিতা') ইহাকে রবীন্দ্র-কাব্য-সমালোচনা বলিলে লেখকের স্তুতিবাদ হয় বটে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রতি অবিচার করা হয়।

"সেবা কক্ষে করি না আহ্বান" (রবীন্দ্রনাথ), লেখকের ইহা পড়িয়া মনে আসিয়াছে এই :—"যখন তিনি মধ্যাহ্নতপ্ত দুর্গম পথে অনিদ্রায় রজনী যাপন করিবেন, শুষ্ক বাক্য-বালুকার ঘূর্ণিপাকে যখন তিনি আচ্ছন্ন হইয়া পড়িবেন, তখন তাঁহার নিষ্কলুষা কল্যাণী দয়িতা আসিয়া তাঁহাকে মধুর শুশ্রূষায় সঞ্জীবিত করিবেন, ইহা তিনি চান না" ('রবি-দীপিতা')। মনুতে আছে :—

"পারুষ্যমনৃতঞ্চৈব পৈশুন্যঞ্চাপি সর্ব্বশঃ।
অসম্বন্ধপ্রলাপশ্চ বাঙ্ময়ং স্যাচ্চতুর্ব্বিধম্॥"

লেখকের বাক্যাবলী ইহার চতুর্থশ্রেণীভুক্ত। লেখক বলিতেছেন :—"পুরুষের দুঃসাধ্য-সাধনের ব্রত যদি নারীর কর্ণকুহরে মন্দ্রিত নাও হয়, যদি তাহার সহিত তাহার সাক্ষাৎ পরিচয় নাও ঘটে, যদি কেবলমাত্র দূর রণাঙ্গনের মধ্যে সমুদ্র-তরঙ্গরবে তাহার হ্রেষাধ্বনি, তাহার অস্ত্রের ঝন্‌ঝনি মাত্র শোনা যায়, তথাপি তিনি তাঁহার চিত্তের অন্তরালে বসিয়া গোপন রজনী জাগিয়া সেই বীরের উদ্দেশে আপন বরমাল্য অর্ঘ্যথালায় সাজাইয়া রাখেন ; লালসা-লোলুপের দিকে তিনি ফিরিয়া চান না" ('রবি-দীপিতা')।

"সমুদ্র তরঙ্গরবে তাহার হ্রেষাধ্বনি" ইহা যথার্থ, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে হ্রেষাধ্বনি কাহার ? পুরুষের না নারীর ? সর্ব্বনামের যথেচ্ছ ব্যবহারের সার্থকতা সহজে উপলব্ধ হইবার নহে। পৌরাণিক উচ্চৈঃশ্রবা সমুদ্রতরঙ্গ হইতে উঠিয়াছিল বটে, কিন্তু সে হ্রেষারব করে নাই।

পাণ্ডিত্যাভিমানী লেখকের পক্ষে এরূপ রচনা অমার্জ্জনীয়।

"ছান্দোগ্য উপনিষদের অনুকরণে কবি বলেন যে নারীর অজর অমর মূর্ত্তি, আদর্শে তাহার যে প্রতিবিম্ব পাওয়া যায় তাহার মধ্যে নহে—নারীর দেহ তাহার ছায়া নয়। তাহাদ্বারা বহিরঙ্গনে নৃত্য করা যায় অন্তর মন্দিরে প্রবেশ করা যায় না" ('রবি-দীপিতা')। একটি সর্ব্বজনসুবিদিত কথা বলিতেও রবীন্দ্রনাথকে ছান্দোগ্য উপনিষদের অনুকরণ করিতে হইয়াছে ইহা পরিতাপের বিষয় ; কিন্তু তদপেক্ষাও পরিতাপের বিষয় বর্ত্তমান লেখকের পাণ্ডিত্য।

'রবি-দীপিতা' যে 'সাঙ্ঘটিক' কাব্য-সমালোচনা ইহা স্বীকার-অস্বীকারের অতীত, কারণ স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন এ বিশেষণটি সার্থক। "ধূম-জ্যোতিঃ-সলিল-মরুতাং সন্নিপাতঃ ক্ব" দীপিতা! এ 'সাঙ্ঘটিক' সমালোচনা জ্যোতির্ম্ময় কিনা জানি না, তবে ধূমের অপ্রাচুর্য্য ইহাতে নিশ্চয়ই নাই। রবীন্দ্রনাথের কাব্য যে ইহাতে ক্ষুণ্ণ হয় নাই ইহাও সুনিশ্চিত, কারণ তাহার কাব্যাত্মা সম্বন্ধেও বলা যাইতে পারে :—

"নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
নচৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥"

'অস্ত্রের ঝনঝনি' তাহাকে বিচ্ছিন্ন করে না, 'অগ্নিশিখার স্ফুলিঙ্গ' বা 'জ্বলজ্জটা-কলাপ' তাহাকে দগ্ধ করে না, 'সমুদ্রতরঙ্গ' তাহাকে ক্লেদাক্ত করে না, প্রলাপের প্রবল বাত্যাও তাহাকে স্পর্শ করে না।

"আনন্দনিস্যন্দী নাট্যের ফলও" যাহারা ইতিহাসাদি বিষয়ের মত "সাংসারিক জ্ঞানের ব্যুৎপত্তিমাত্র বলেন সেই সব অল্পবুদ্ধি" সাধু ব্যক্তিদিগকে নমস্কার জানাইয়া 'দশরূপ'-কার বলিয়াছেন :—

"আনন্দনিস্যন্দিষু রূপকেষু
ব্যুৎপত্তি মাত্রং ফলমল্পবুদ্ধিঃ।
যো'হপীতিহাসাদিবদাহ সাধুঃ
তস্মৈ নমঃ স্বাদপরাংমুখায় ॥"—'দশরূপ'

যে স্বাদপরাঙ্মুখ ব্যক্তি কাব্য পড়িয়া, ঐতিহাসিক নহে, দার্শনিক বিজৃম্ভণ করেন তাঁহাকেও দণ্ডবৎ। কিন্তু বর্ত্তমান লেখককে প্রণতি জানাইবার পথে কিছু বিপত্তি আছে; এ বিপত্তি সৃষ্টি করিয়াছেন রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং। রবীন্দ্রনাথের যে আশীর্ব্বাদ লিপি 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে তিনি বলিয়াছেন 'রবি-দীপিতা' গ্রন্থখানি তাঁহার কাব্যের 'প্রাণ-রহস্য উদ্‌ঘাটিত' করিয়াছে। কিন্তু যাহা উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে তাহাতে রবীন্দ্রনাথকেও 'অনেক জায়গায় ভাবতে হইয়াছে' এ কথাও রবীন্দ্রনাথই বলিয়াছেন।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে 'রবি-দীপিতা' গ্রন্থখানি একদিকে যেমন কাব্যের প্রাণ রহস্যের নিরসন করিয়াছে অপরদিকে তেমনি অভাবনীয় রহস্যসমূহের সৃষ্টি করিয়াছে। এই দুইটি আপাতবিরোধী মন্তব্যের সামঞ্জস্য করিতে হইলে লেখকের নিম্নলিখিত কয়েকটি কথা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। 'রবি দীপিতা'কে রবীন্দ্র-কাব্যের অনুচর মাত্র মনে করিলে তাহাকে ছোট করা হয় ইহাই বোধহয় স্বাধিকারপ্রমত্ত লেখকের মনোভাব। তিনি বলিতেছেন :—"কবির কাব্যরচনাই যে রচনা তাহা নয়, আলোচনও একটি মহতী রচনা।......উভয়েরই উদ্ভূতি সমগ্র-পুরুষীয় অনুভব হইতে। সমালোচক যখন কবির কাব্য পড়েন, তখন কবির সমগ্র কাব্যের মধ্যে তাহার যে সমগ্র-পুরুষীয় অনুভবটি স্তরে স্তরে প্রকাশ লাভ করিয়াছে, সমালোচক সেই সমগ্র-পুরুষীয় অনুভবটির সহিত নিজের সমগ্র-পুরুষীয় অনুভবের পরিচয় করিবার চেষ্টা করেন।" ('রবি-দীপিতা'—'আলোচন')। 'রবি-দীপিতাতে' রবীন্দ্রকাব্যের প্রাণবস্তু যে উদ্ঘাটিত হইয়াছে তাহা প্রাথমিক নহে, নিতান্ত প্রাসঙ্গিক কিম্বা আকস্মিক; প্রকৃতপক্ষে 'রবি-দীপিতা' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ ব্যপদেশ মাত্র।

গ্রন্থের ভাষা সম্বন্ধে কিছু না বলিলে সমালোচনা সম্পূর্ণ হয় না, কিন্তু তাহার অননুকরণীয় নির্লজ্জতার যে কয়েকটি দৃষ্টান্ত উপস্থিত করিয়াছি, তাহাই যথেষ্ট। দুষ্মন্ত-তাড়িত হরিণ সম্বন্ধে 'শকুন্তলা'তে আছে :—

"দর্ভৈরর্দ্ধাবলীঢৈঃ শ্রমবিবৃত্তমুখভ্রংশিভিঃ কীর্ণবর্ত্মা,
পশ্যোদগ্রপ্লুতত্বাদ্ বিয়তি বহুতরং স্তোকমুর্ব্ব্যাং প্রযাতি।"

শ্রমাক্তা বর্ত্তমান গ্রন্থের শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য; সুতরাং এখানেও দেখিতে পাই, অৰ্দ্ধচর্ব্বিত দর্ভে নহে বাক্যে সমগ্র গ্রন্থখানি বিকীর্ণ, 'উদগ্রপ্লুতত্ব' বা মানসিক উল্লম্ফনশীলতার পরিচয় ইহাতে কম নাই, লেখকও 'বিয়তি বহুতরং স্তোকমুর্ব্ব্যাং প্রযাতি।'

'রবি দীপিতা' শেষ করিয়া শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের একটি আখ্যান মনে পড়িল। নীলাচলে থাকিবার সময় মহাপ্রভুকে কিছুকাল সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের বেদান্তব্যাখ্যা শুনিতে হইয়াছিল। সাতদিন শুনিয়াও তিনি ভালমন্দ কিছু বলেন নাই; ইহাতে বিস্মিত হইয়া সার্ব্বভৌম তাঁহাকে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। তাহাতে :—

"প্রভু কহে 'মূর্খ আমি নাহি অধ্যয়ন।
তোমার আজ্ঞাতে মাত্র করিয়ে শ্রবণ।
সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম লাগি শ্রবণ মাত্র করি ;
তুমি যেই অর্থ কর বুঝিতে না পারি।'

* * * *

প্রভু কহে 'সূত্রের অর্থ বুঝিয়ে নির্ম্মল ;
তোমার ব্যাখ্যা শুনি মন হয়ত বিকল।
সূত্রের অর্থ ভাষ্য কহে প্রকাশিয়া ;
ভাষ্য কহ তুমি সূত্রের অর্থ আচ্ছাদিয়া।
সূত্রের মুখ্য অর্থ না কর ব্যাখ্যান ;
কল্পনার্থে তুমি তাহা কর আচ্ছাদন'।"

(শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

আমাদের কথাও তাই। আমরা ৺মোহিতচন্দ্র সেন, ৺অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী, ডক্টর রাধাকৃষ্ণণ্, ডক্টর টম্‌সন্, ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ডক্টর শ্রীসুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত সকলের রবীন্দ্র-ভাষ্যই কোনোরকমে বুঝিতে পারি, চেষ্টা করিলে হয়ত বা রবীন্দ্র-সূত্রও বুঝিতে পারি, কিন্তু শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মহাশয়ের ভাষ্য আমাদের সাক্ষরতা সম্বন্ধেই সন্দেহ, চিত্তে বৈকল্য আনিয়া দেয়। প্রকাশকের তাগিদ্ ব্যতীত এ বই প্রকাশিত হইতে পারিতনা ইহাই সান্ত্বনা, সুতরাং প্রকাশকের 'নিবেদন' সার্থক।

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র মৈত্র

Rise and Fulfilment of British Rule in India— By Edward Thompson and G. T. Garratt—(Macmillan).

আলোচ্য গ্রন্থখানি ভারতে ইংরেজ শাসনের ইতিহাস। আমাদের এই অতি প্রাচীন মহাদেশ তাহার দীর্ঘজীবনে কত কত সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতন দেখিয়াছে, তাহার হিসাব সে রাখে নাই। কতবার সে বিদেশীর হস্তে লাঞ্ছিত নিগৃহীত হইয়াছে তাহাও সে স্মরণে রাখে নাই। মনের দুঃখে গাহিয়াছে, যদুপতেঃ ক গতা মথুরা পুরী, রঘুপতেঃ ক গতোত্তর কোশলঃ। অলস অক্ষম অধমের জন্য বিশ্বনিয়ন্তা যে শাস্তি বিধান করিয়াছেন, তাহা সে মঙ্গলময় জানিয়া নতশিরে গ্রহণ করিয়াছে। আজও তাহার প্রায়শ্চিত্ত শেষ হয় নাই, তাহাও সে জানে। তথাপি এই দুর্দ্দিনে প্রভুর ব্যবহারে সামান্য একটু দরদ দেখিলে, প্রভুর মুখে ক্ষুদ্র একটি মমতার কথা শুনিলে, তাহার হতাশ অন্ধকার হৃদয়ে ক্ষণেকের জন্য আলোকের সঞ্চার হয় বই কি!

ভারত তাহার অতীত জীবনে বারবার বিদেশী বিজেতাকে আপন জন করিয়া লইয়াছে। দ্রাবিড়, আর্য্য, শক, হূণ, পাঠান, মোগল, একে একে সকলেই তাহার বিশাল বক্ষে আশ্রয় পাইয়া এক অখণ্ড ভারতের সন্তান হইয়া গিয়াছে। হইল না শুধু ইংরেজ। রাজা রামমোহন ত ব্রিটেনকে পরামর্শ দিয়াছিলেন—ভারতে উপনিবেশ

স্থাপন কর ! কিন্তু ব্রিটেন সে পরামর্শ গ্রাহ্য করিলেন না। হয়ত ভালই হইল। নহিলে ভারতমাতা তাঁহার খৃষ্টান-ধর্ম্মী ইংরেজীভাষী যবনবেশী ইউরেশীয় সন্ততিকুল পরিবেষ্টিত হইয়া কল্পান্ত অবধি বৃটানিয়া দেবীর আয়াগিরি করিয়া কৃতার্থ হইতেন। যে পথে আমরা চলিয়াছি, সে পথই বা আমাদিগকে কোথায় লইয়া যাইতেছে ? কে বলিতে পারে ! টমসন সাহেব ও গারাট সাহেব একটা উত্তর দিয়াছেন এ সমস্যার। পাঠক স্বয়ং পুস্তকখানি পাঠ করিয়া দেখিবেন, সে উত্তর তাঁহার মনোমত কিনা। আমরা কেবল একটি বাক্য, আপ্তবাক্য, স্মরণ করাইয়া দিব—অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যে কে আত্মহনাঃ জনাঃ।

গ্রন্থকারদ্বয় সাহিত্য-জগতে সুপরিচিত। টমসন একদিন ভারত সরকারের নির্ভীক ও নিরপেক্ষ সমালোচক বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। ইদানীং ভারতীয় নেতৃবৃন্দের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে নানারূপ অপ্রিয় সত্য বলার ফলে, এদেশের লোকের কাছে তাঁহার খাতির অল্পবিস্তর কমিয়া গিয়াছে, সত্য। কিন্তু একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে টমসন-এর সমালোচনা, আমাদের অনুকূল হউক বা প্রতিকূল হউক, সর্ব্বদা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।

গারাট-এর পূর্ব্বতন পুস্তক, "An Indian Commentary," যিনি পড়িয়াছেন, তিনিই জানেন যে এই সাহেব একজন নিরপেক্ষ ভাবুক, বর্ত্তমান ভারতের দুরূহ সমস্যাগুলিকে যত্নপূর্ব্বক অনুধাবন করিয়াছেন। সিবিল সার্বিসে সারা জীবন কাটাইয়াও তাঁহার স্বাধীন চিন্তা-শক্তি বিলুপ্ত হয় নাই। পূর্ব্বতন পুস্তকে তিনি ভারতের কৃষাণ শ্রেণীর দৈনিক জীবন, তাহাদের আর্থিক অবস্থা, তাহাদের ভবিষ্যৎ যেরূপ নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছিলেন, তাহা সত্যই অসামান্য।

এইরূপ দুইজন সুধী যখন মিলিত হইয়া বৃটিশ ভারতের ইতিহাস লিখিতে বসিয়াছেন, তখন আমরা সেই ইতিহাসে গভীর গবেষণা, সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি ও নির্ভীক সমালোচনার একত্র সমাবেশ দেখিবার আশা করিতে পারি। আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি যে আমাদিগকে এ বিষয়ে একটুও নিরাশ হইতে হয় নাই। গ্রন্থখানি একবার পড়িলেই বোঝা যায় যে লেখকদ্বয় কত পরিশ্রম করিয়া আসল দলীল-দস্তাবেজ, রোজনামচা, রিপোর্ট ইত্যাদি মন্থন করিয়া ঘটনাবলী সংগ্রহ করিয়াছেন, এবং কত সাবধানে সেই ঘটনাবলী হইতে নানা ঐতিহাসিক তথ্য প্রতিপাদিত করিয়াছেন।

পুস্তকের লিখনভঙ্গী মনোরম। কিন্তু যেখানে সত্যের খাতিরে স্পষ্টকথা বলা প্রয়োজন, সেখানে তাহা বলার এতটুকু কসুর হয় নাই। সারা পুস্তকে কোথাও মন-জোগান মিথ্যাকথা আমাদের নজরে পড়ে নাই। ভারতে ইংরেজ সাম্রাজ্যের অভ্যুদয় সারা পৃথিবীর ইতিহাসে এক অতি আশ্চর্য্য ঘটনা, প্রায় রূপকথার মত আশ্চর্য্য। ইংরেজ প্রাচ্যে প্রথম আসিয়াছিলেন সশস্ত্র জলদস্যুর বেশে, তারপর আসেন তুলাদণ্ডধারী বণিক রূপে ও সর্ব্বশেষে উপস্থিত হন রাজদণ্ডধারী শাসনকর্ত্তার সাজে। কেবল জরী মখমল পরিহিত লাট সাহেবের শাসন-কাল বিবৃত করিলে ইতিহাস হইতে অনেক জিনিষই বাদ পড়িয়া যায়। গ্রন্থকারেরা একথা ভোলেন নাই। তাই এই সার্দ্ধশত বৎসরে ভারতের রঙ্গমঞ্চে যে সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নটনটী নাচিয়া গিয়াছে তাহাদের জীবন-কথা যথাস্থানে লিপিবদ্ধ করিয়া শুষ্ক ইতিহাসকে সরস করিয়াছেন।

গ্রন্থের লিখনভঙ্গী সুন্দর হইলেও আগাগোড়া একই রকমের নয়। হইতেও পারে না, কেননা গ্রন্থকার দুইজন। কোন কোন স্থলে ভাষা অপেক্ষাকৃত লঘু ও

মাসিক পত্রের উপযোগী হইয়াছে বলিয়াও মনে হইতে পারে। কিন্তু ইহাতে গাম্ভীর্য্যের হানি হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি না। কেননা, এ কথা ভুলিলে চলিবে না যে পুস্তকখানি সর্ব্বসাধারণের পাঠের জন্য লিখিত, শুধু বিদ্যাভিমানী বিশেষজ্ঞের জন্য নহে। গ্রন্থকারদ্বয় কি মনোভাব লইয়া এই ইতিহাস লিখিতে বসিয়াছেন তাহা নিম্নলিখিত কয়েক ছত্র হইতে বেশ বোঝা যায়।

"The mischievous tendency to make historical truth subservient to administrative efficiency has been increased by changes in legal practice and procedure, which operate as an effective censorship. (p. vii)"। এ কথা ধ্রুব সত্য। আজিকার দিনে টমসনের "The Other Side of the Medal" প্রকাশ করিবার অনুমতি পাওয়া অতি কঠিন হইত।

"By far our hardest task has been to avoid a national or racial bias. We have both had long and close connections with India and friendships that have given us a feeling of second nationality * * * Love of England cannot blind us to the dangers which beset Western Civilization, and we are convinced of the immense influence that India, called to reinvigorated existence, could exert in solving those problems which now oppress the mind of man. We send out this book hoping that it will work for that understanding between the two countries which fate has linked so strongly together." (p. vii)

প্রস্তাবনার এই কথাগুলির সহিত উপসংহারের শেষ পৃষ্ঠা (655) পড়িলে স্পষ্টই বোঝা যায় যে গ্রন্থকার মহাশয়েরা দুইটি মুখ্য উদ্দেশ্য লইয়া আসরে নামিয়াছেন। প্রথম তাঁহারা বৃটিশ যুগের ইতিহাস সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সত্যকথা বলিতে বদ্ধপরিকর। দ্বিতীয়, তাঁহারা আপন জাতি ও ভারতবাসীর মধ্যে একটা হৃদয়ের যোগ স্থাপনে প্রয়াসী। কিন্তু এই উদ্দেশ্য থাকিলেও পুস্তকখানি propaganda (মত প্রচার) পুস্তক নহে, ইতিহাস, ঐতিহাসিক গবেষণাতে পূর্ণ। একবার সূচীপত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই বোঝা যায় এই গবেষণা কিরূপ গভীর। কোম্পানীর শাসনের সূত্রপাত হইতে মণ্টেগু চেমস্‌ফোর্ড রাষ্ট্রব্যবস্থা পর্য্যন্ত শাসন-যন্ত্র কিরূপে ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তিত ও পরিশোধিত হইয়াছে তাহা Book I হইতে Book VIII অবধি বিশদভাবে যত্নপূর্ব্বক দেখান হইয়াছে। পরিচ্ছেদগুলির নামও দেওয়া হইয়াছে বেশ চটকদার, যথা—Racial Estrangement and Changing Hindu Outlook, Parental Administration, Growth of Nationalism ইত্যাদি। পুস্তকখানির নামও কম চটকদার নয়! Rise and Fulfilment শুনিলে স্বতঃই নাটকের প্রথম ও পঞ্চম অঙ্কের কথা মনে হয়। Fulfilment শব্দটাই আমাদের মনোমত নয়। ভারতের বর্ত্তমান অবস্থায় এ শব্দের কোন অর্থ থাকিতে পারে না। আমাদের অর্থনীতি রাষ্ট্রনীতি সমাজনীতি সবই ত আজ গলিত অবস্থায়! যদি কোনদিন ঢালাই হইয়া নূতন কিছু গড়িয়া উঠে, তখন fulfilment বা সার্থকতা শব্দের প্রয়োগ চলিবে।

পুস্তকের শেষ কয় পরিচ্ছেদ সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ কিছু বক্তব্য নাই। উক্ত পরিচ্ছেদগুলিতে কংগ্রেস, Round table, নূতন constitution ইত্যাদি নানা অতি-আধুনিক রাষ্ট্রনীতিক ব্যাপার সম্বন্ধে লেখকদ্বয় আপন মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন। ভারতে মহাজাতি সংগঠন বিষয়ে আমাদেরও আপন মতামত আছে। আমাদের অনেকের চক্ষে অখণ্ড ভারতের পবিত্র মূর্ত্তি ধ্যান্-ধারণার বিষয়ীভূত। কিন্তু পুস্তকের সমালোচনা করিতে গিয়া আমাদের আপন মতামত বিবৃত করা অশোভন হইবে। তবে এইটুক্ মাত্র বলিব যে constitution শব্দটি বর্ত্তমান ভারত সম্বন্ধে প্রয়োজ্য নহে। সরকার প্রয়োজনমত শাসনযন্ত্রের পরিবর্ত্তন করিতে পারেন, করেনও, কিন্তু সে পরিবর্ত্তনকে constitution আখ্যা দেওয়া চলে না। Constitution দাবী করা যায়, অর্জ্জন করাও যায়, কিন্তু ভিক্ষা করা যায় না। Petition of Rights ও Declaration of Rights-এরই নামান্তর! Petitionই বলুন, Declarationই বলুন, এ সব জাতি সংগঠনের পরের পর্ব্ব। ভারতে একরাষ্ট্রীয়ত্ব-বোধ এখনও বহুদূরে। আলোচ্য গ্রন্থে এই কথাগুলি সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত দেখিলে আমরা আরও আনন্দিত হইতাম।

বর্ত্তমান পুস্তকের এক প্রধান গুণ এই যে, ইহাতে কোন প্রকারের তরফদারী নাই, কাহারও দোষক্ষালনের চেষ্টা নাই, অন্যায়কে অন্যায় বলা হইয়াছে, ন্যায়কে ন্যায় বলা হইয়াছে। কে কি মনে করিবে সেদিকে ভ্রূক্ষেপও নাই। গ্রন্থকারদ্বয় স্থানে স্থানে যেরূপ মুক্ত কণ্ঠে শত্রুর স্তুতিবাদ করিয়াছেন, তাহাতে আমরা বিস্মিত হইয়াছি। এক কর্ণেল ম্যালিসন ব্যতিরেকে কোন ইংরেজ ঐতিহাসিক এত উদারতা দেখাইতে পারেন নাই। নিম্নে আমরা পুস্তকের নানাস্থান হইতে দুই চারি ছত্র করিয়া উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। পাঠক পড়িয়া দেখিবেন।

পলাসীর যুগের অর্থলোলুপতা সম্বন্ধে—"A gold-lust unequalled since the hysteria that took hold of the Spaniards of Cortes' and Pizzaro's age filled the English mind. Bengal in particular was not to know peace till it had been bled white. (p. 91)

ক্লাইবের অর্থলিপ্সার বিষয়ে—"Clive's enormous greed provided an example against which his severity towards others * * * was entirely ineffective. For the monstrous financial immorality of English conduct in India for many a year after this, Clive was largely responsible. (p. 95)

মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসী সম্বন্ধে—"The offence which had not barred an Englishman's path to a peerage was now to doom a Hindoo to the gallows। পাঠক বুঝিতেই পারিতেছেন এই ইংরেজ কে, এবং তিনি কি অপরাধ করিয়াছিলেন (p. 139)।

মীর কাসিমের মত শত্রুর সম্বন্ধেও মুক্তকণ্ঠে বলা হইয়াছে—Mir Kasim was a genuine patriot and an able ruler, who quickly retrenched expenditure and suppressed disorders. But he was to be driven to the edge of insanity, if not over it. (p. 100)

২০৬,ও ২০৭ পৃষ্ঠায় মহীশূরের টিপু সুলতানের চরিত্রের যে আশ্চর্য্য নিরপেক্ষ আলোচনা আছে, তাহা বাহুল্য-ভয়ে উদ্ধৃত করিলাম না।

মহারাষ্ট্রীয়দের মধ্যে নানা ফড়নীসের মত ইংরেজের হাড়-বৈরী কেহ ছিল না। অথচ ইঁহার সম্বন্ধে লেখা হইয়াছে—"A man of strict veracity, humane frugal and charitable." (p. 215) "The greatest Indian statesman of the eighteenth century, Nana Farnavis, through perilous decades had kept his nation, the Marathas, from falling under the Company's all conquering sway. Courteously and without giving offence adequate for war, he had put by numerous invitations to walk into the parlour where Nizam, Nawabs of Oudh, Bengal, the Carnatic, and several smaller rulers were being entertained। কথাগুলি হয়ত সকলের ভাল লাগিবে না, কিন্তু ধ্রুব সত্য (p. 213)।

ভেদনীতি সম্বন্ধে লেখক মহাশয়েরা বলিয়াছেন—"We are today sensitive about the charge that in India we act on the high Roman maxim., *divide et impera.* In the eighteenth century it was statesmanship's normal aim and no one saw any hu t in it. (p. 214).

শিখ যুদ্ধের প্রাক্‌কালে কোম্পানী বাহাদুরের সহিত বিশ্বাসঘাতক সরদারদিগের যে গুপ্ত বোঝাপড়া হইয়াছিল এ পুস্তকে তাহাও ঢাকিবার কোন চেষ্টা হয় নাই। এই গুপ্ত ব্যবহারের কথা ব্যক্ত করিয়াই ত একদিন ঐতিহাসিক কানিংহামকে লাট ডালহৌসীর হস্তে নিগ্রহ সহ্য করিতে হইয়াছিল।

"The sikhs were practically deserted by their commanders Lal Singh and Tej Singh, who were both in correspondence with the enemy. (p. 371) " * * * annexing Kashmir and selling it to Gulab Singh who had remained neutral to see which way victory would go. (p. 374)

চিলিয়ানওয়ালার যুদ্ধক্ষেত্রে শিখ খালসার জয় জয়কার হইয়াছিল বলিয়াই আমরা ভারতের লোক চিরদিন মনে করি। হণ্টার সাহেব লিখিয়া গিয়াছেন Chillianwalla * * which British patriotism prefers to call a drawn battle। আলোচ্য গ্রন্থে কিন্তু ইহাকে সোজাসুজি "drawn battle-ই বলা হইয়াছে। এরূপ সামান্য দৌর্ব্বল্য প্রকাশ মার্জ্জনীয়। কিন্তু দুই এক স্থানে লেখকদ্বয় একটু অন্য রকমে বে-সামাল হইয়াছেন, তাহা দোষাবহ, অর্থাৎ এরূপ নিরপেক্ষ লেখকের পক্ষে দোষাবহ। ভিন্সেণ্ট স্মিথ হইলে কিছুই বলিতাম না।

১০৯ পৃষ্ঠায় এলফিন্‌ষ্টোনের এক প্যারাগ্রাফ উদ্ধৃত করিয়া তাহার নীচে গ্রন্থকারেরা লিখিতেছেন—"The dog was beginning to walk on his hind legs like a man remotely ; he was not doing it will, but was beginning

to do it." উপমাটী সুরুচির পরিচায়ক নয়। কুকুরের তীক্ষ্ণ দন্তের উল্লেখ করা সমালোচকের পক্ষে অশোভন হইবে। কিন্তু এরূপ উপমা প্রয়োগ করাই বা কেন?

বাঙ্গালা দেশ ও বাঙ্গালী জাতির প্রতি লেখকদ্বয়ের মনোভাব একটু দুর্ব্বোধ্য। ৩১৫ পৃষ্ঠায় দেখিতে পাই এই সরল স্তুতিবাদ—"The Brahmo Samaj * * * produced a succession of men for whom the only adequate adjective is 'noble.' * * * Bengali intellectual and spiritual life * * * was a beacon to the rest of India, which Bengal saved by her example, as she was saving herself by her exertions।" কিন্তু ৫৭৬ পৃষ্ঠায় দেখিতে পাই বঙ্গের আসন্ন দুর্দ্দশার কথা স্মরণ করিয়া এই আহ্লাদ—"With the removal of the capital to Delhi and the rapid developement of higher education in other provinces, Bengal has lost its old leadership. The war gave unwelcome prominence to the essentially pacific nature of its inhabitants. Even the nationalist movement became centred in the west, and Bengal has contributed little to its developement after the war, gaining its chief notoriety by irresponsible political murders. Finally time has had its revenge. The new Bengal under any democratic system will have a small Muslim majority, though its politically conscious classes are almost entirely Hindu. Its future as an autonomous province within a federation is probably more precarious than that of any other part of India."

আমাদের বিশেষ কিছু বক্তব্য নাই। তবে নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকের কি কাহারও দুর্দ্দশা দেখিয়া হাসা উচিত! বাঙ্গালার 'Low emotional flash point" (খড়ের আগুনের মত দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠা) বিদেশীর বোধগম্য হইবে ইহা বাঙ্গালী আশা করে না। আর, মোটের উপর, টমসন ও গারাট সাহেব ত তাঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী ঐতিহাসিকের চেয়ে বাঙ্গালীর প্রতি অনেক কম নিদয়! ম্যালিসনের মত ভারতবন্ধুও বাঙ্গালীকে কত কঠিন কথা বলিয়া গিয়াছেন!

ভারতের প্রতি ভারতবাসী ইংরেজের মনোভাব দিনের পর দিন কি প্রকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিয়াছে, তাহা আলোচ্য গ্রন্থে সুস্পষ্টরূপে দেখান হইয়াছে। তাঁহাদের মনোভাবের পরিবর্ত্তনের ফলে প্রজাজনের মনোভাবও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, এবং ক্রমে ইতিহাসের গতিকে নানা অজানা অচেনা পথে চালাইয়া দিয়াছে। এই মনের ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া সম্যক্‌রূপে বুঝিতে হইলে সারা বইখানি পড়িতে হইবে। আমরা এখানে ওখানে কয়েক ছত্র করিয়া তুলিয়া দিতেছি, পাঠকের কতকটা আন্দাজ হইবে গ্রন্থকারদ্বয়ের বক্তব্য কি।

"Men like Elphinstone and Munro had envisaged an India in which the British did little more than keep the peace.

Leaving the administration in Indian hands, they would have trusted to education to cure such evils as they believed to exist."

বেন্টিঙ্কের যুগের পরে কিন্তু এ মনোভাব আর রহিল না—"The next generation of officials was conscious of the clash between two civilizations, one of which they believed to be improving and the other to be in the last stages of degradation." (p. 330)

সিপাহী-যুদ্ধ সম্বন্ধে টমসনের মতামত সকলের পরিচিত। সে বিষয়ে কিছু বলার প্রয়োজন নাই। তবে ১৮৫৯—৬০ সালের অবস্থা সম্বন্ধে তিনি যাহা লিখিয়াছেন তাহা প্রণিধানের যোগ্য—"Educated Hindus could read the virulent attacks in the European press on Canning, Grant and other 'humanity-pretenders' who were endeavouring to restore the rule of law. Muslims heard of the punishment meted out to their coreligionists. * * * * These things were not done in a corner, and it is absurd to imagine that they did not affect profoundly the millons who had remained passive, and had viewed events with the philosophy of a race which had seen many empires pass."

সাহেবদের ইলবার্ট বিল আন্দোলন হইতে এ দেশের লোকে কি শিখিল? "No educated Indian has ever forgotten the lesson of the Ilbert bill. They were accustomed to rulers who could be influenced by cajolery, entreaty, bribery or threats of revolt, but it was an entirely new experience to see a Government, and especially the aloof and powerful British Government, deflected from its purpose by newspaper abuse and exhibition of bad manners." (p. 498)

"Lord Curzon's policy * * * combined with his off-hand methods of expressing his opinions were well suited to bring Moderates and Extremists into the field against the Government." (p. 547)

যুদ্ধ জয়ের পরে মনোভাব পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে টমসন সাহেবরা বলিতেছেন—"The armistice added to the general exasperation. Victory brought a certain racial arrogance, accentuating the worst features of the British occupation. * * * Certain officials who had remained in India during the war seemed to take a delight in being rude to Indians who had done the same. * * * * political Indians saw in them (The Sedition Bills) a direct challenge, not unlike the Partition of Bengal, but providing

better grounds for a struggle because it was a challenge which would unite every party and every creed." (p. 605)

সমালোচনা দীর্ঘ হইয়া পড়িল। আমরা পাঠককে অনুরোধ করিতেছি যেন পুস্তকখানি স্বয়ং পড়িয়া দেখেন। বৃটিশ ভারতের এরূপ নিরপেক্ষ ইতিহাস কখন আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় নাই। আর, এ ইতিহাস শুধু ঘটনা পরম্পরার প্রাণহীন বিবরণ নহে। গ্রন্থকারদ্বয় বৃটিশ যুগকে জীবন্তভাবে পাঠকের চক্ষের সম্মুখে ধরিয়াছেন।

শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত

Freedom and Organisation (1814-1914)—by Bertrand Russell. (Allen and Unwin)

History of Europe in the Nineteenth Century—by Benedetto Croce. (Allen Unwin)

The Growth of Philosophic Radicalism—by Elie Halevy. (Faber and Faber)

কোনও বিশেষ যুগের মানুষের পক্ষে ঠিক তার পূর্ব্ববর্ত্তী কাল সম্বন্ধে বিরুদ্ধ মত পোষণ করা বোধ হয় স্বাভাবিক। পারিবারিক জীবনে এর অনুরূপ ভাব প্রায়ই দেখা যায়; বৃদ্ধদের মতামত ও ব্যবহার অল্পবয়স্কদের প্রতিবাদ ও সমালোচনার লক্ষ্য হয়ে থাকে। ঊনবিংশ শতক সম্বন্ধে আধুনিক অশ্রদ্ধার নিশ্চয়ই এই একটা কারণ। কিন্তু ইতিহাসের আলোচনায় এ যুগের বিশেষ একটা স্থান আছে; মানুষের জীবনের উপর প্রভাবের দিক দিয়ে দেখতে গেলে অন্য যে কোন শতাব্দী থেকে এর মূল্য কম নয়। আলফ্রেড্ রাসেল্ ওয়ালেস্ যে একে অত্যাশ্চর্য্য ও বিস্ময়জনক বলেছিলেন সে কথা অত্যুক্তি বলা চলে না। ধনোৎপাদন পদ্ধতিতে যে বিপ্লব অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে আরম্ভ হয়ে ঊনবিংশ শতাব্দীতে পূর্ণ প্রকাশিত হয় তার অনুরূপ কিছু বিগত শতশত বৎসরের মধ্যেও ঘটেনি। ইয়োরোপীয় কর্ত্তৃত্ব ও সভ্যতা পৃথিবীর সব অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হওয়া গত শতাব্দীর আর একটি বিশেষত্ব; এই একতা এক নূতন ব্যাপার, এর ফল ভাল কি মন্দ যাই হোক না কেন। গণতন্ত্রের ধারণা পুরাতন কিন্তু সে আদর্শকে সর্ব্বত্র গ্রহণ ও তদনুসারে শাসন-পদ্ধতির সংস্কার ঊনবিংশ শতকের একটি বিশেষ চিহ্ন; আর এ কথা বলা বাহুল্য যে গণতন্ত্রের প্রচুর সমালোচনা সত্ত্বেও চিরস্থায়ী আদর্শ হিসাবে তার স্থান নিতে পারে এমন কোন স্বতন্ত্র মত আজ পর্য্যন্ত প্রচলিত বা স্বীকৃত হয় নি। গত শতাব্দীতেই যে শ্রমিকদের প্রথম অভ্যুদয় ও জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার অধিকতর বিস্তার হয়েছিল এই দুইটি কথাও এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার, মানুষের ইতিহাসে এ দু'য়ের প্রভাব আকস্মিক ও সামান্য না হওয়ারই সম্ভাবনা বেশী।

গত শতাব্দীর ইতিহাস সম্বন্ধে তিনখানি মূল্যবান গ্রন্থ কয়েক মাস আগে ইংল্যাণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থকারেরা সকলেই সুপরিচিত ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ। বাট্রাণ্ড্ রাসেল্ আমাদের দেশেও বিখ্যাত ; বিদেশী যে সব লেখকদের আমাদের পাঠক সমাজে অনেকদিন ধরে প্রতিপত্তি অক্ষুন্ন রয়েছে, রাসেল্ তাঁদেরই মধ্যে প্রধান একজন। তিনি একাধারে বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ও সমাজ-সংস্কারক। এই বইখানি তাঁর প্রথম ঐতিহাসিক রচনা কিন্তু এই একখানি বই-ই ইতিহাস-লেখক রূপে তাঁর খ্যাতি সুপ্রতিষ্ঠিত করবে। ক্রোচে বর্ত্তমান ইটালির সব চেয়ে প্রসিদ্ধ দার্শনিক। ইতিহাসের আলোচনা ও ব্যাখ্যা তাঁর কাছে নূতন নয় কিন্তু নেপল্‌স্ নগরীতে পঠিত তাঁর এই বক্তৃতাগুলিতে তিনি ইয়োরোপের গত শতাব্দীর ইতিহাসের একটি ধারাবাহিক ও সম্পূর্ণ বিবরণ দেবার চেষ্টা করেছেন। হালেভি বিখ্যাত ঐতিহাসিক ; ইংল্যাণ্ডের ঊনবিংশ শতকের ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে এই ফরাসী পণ্ডিতের মতামত এখন প্রামাণ্য বলে' গণ্য হয়, তাঁর অনেক লেখাই ইতিহাসের ছাত্র ও শিক্ষকদের অবশ্যপাঠ্য। গত শতাব্দীতে বেন্থামের যে চরমপন্থী শিষ্যদলকে দার্শনিক সংস্কারক আখ্যা দেওয়া হয়েছিল তাদের মতবাদের ক্রমবিকাশ ও বিশ্লেষণ হালেভি কয়েক বছর আগেই করেছিলেন ; ১৯২৮ সালে তাঁর লেখার ইংরাজি অনুবাদ বের হয়, গত বৎসর তারই সুলভ সংস্করণ ছাপিয়ে প্রকাশকেরা সকলের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হয়েছেন।

নেপোলিয়ানের পতন থেকে বিগত মহাযুদ্ধের আরম্ভ পর্য্যন্ত একশত বৎসরের ইতিহাসে রাসেল্ দু'টি মূল সূত্রের প্রকাশ দেখিয়েছেন। এর মধ্যে প্রথমটিকে মুক্তির প্রয়াস বলা যেতে পারে ; স্বাধীনতার প্রচেষ্টা ও স্বায়ত্তশাসনের সংকল্প এরই অন্তর্গত। অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে যে উদার নীতি প্রচারিত হ'তে আরম্ভ হ'ল তার সাফল্য পরবর্ত্তী শতাব্দীতেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। এই উদার মতবাদের আক্রমণে বহুযুগ সঞ্চিত রাষ্ট্রীয়, আর্থিক ও সামাজিক বাধা ক্রমে ক্রমে ক্ষয়প্রাপ্ত ও অপসারিত হবার ফলে মানুষের ইতিহাসে মুক্তি ও স্বাধীনতার স্থান প্রশস্ততর হয়। পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে ধীরে ধীরে মুক্তি পেল স্পেনের দক্ষিণ ও মধ্য আমেরিকাস্থিত উপনিবেশগুলি, গ্রীস, বেল্‌জিয়ম, ইটালি, বল্‌কান্ অঞ্চলের খণ্ড রাজ্যগুলি, নরওয়ে এবং আংশিকভাবে ইংল্যাণ্ডের সাম্রাজ্যের মধ্যস্থিত ডোমিনিয়নেরা। গণতান্ত্রিক স্বায়ত্তশাসন প্রায় সর্ব্বত্র প্রচারিত হ'ল—ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, ইটালি থেকে আরম্ভ হয়ে ইয়োরোপের প্রায় সর্ব্বত্র এই প্রথা স্থাপিত ও অন্যত্র পর্য্যন্ত এ আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হয়। আর্থিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে অবাধ বাণিজ্য জয়যুক্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়েছিল যে, মানুষের পারস্পরিক সম্বন্ধের মধ্যে রাষ্ট্র বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠান রচিত ব্যবধান আর থাকবে না। অন্যদিকে শ্রমিকেরা এবং জনসাধারণেও পুরাতন প্রথা ও আইনের সৃষ্ট অধীনতার বন্ধন থেকে মুক্ত হ'ল। প্রথমে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে, তার পর আমেরিকার যুক্তরাজ্যে ও অন্যত্র দাসত্ব প্রথার উচ্ছেদ সাধিত হয় ; ইয়োরোপের নানাদেশে যে ফিউডাল্ অৰ্দ্ধদাসত্ব অধিকাংশ লোককে শৃঙ্খলিত করে রেখেছিল তারও শেষ এই সময়ে। বেশীর ভাগ দেশেই ধর্ম্মবিশ্বাস ও স্বমত প্রকাশ ও প্রচারের স্বাধীনতাও ঊনবিংশ শতাব্দীর গৌরবের কথা বলে' গণ্য হয়। এই সব নানা কারণে মুক্তি ও স্বাধীনতার প্রচার গত শতকের একটি প্রধান কথা।

কিন্তু এ যুগের দ্বিতীয় মূলসূত্র এক হিসাবে মুক্তির পরিপন্থী—সংগঠন ও সংহতির বিভিন্নমুখী গতিও এ সময়ের ইতিহাসে সুস্পষ্ট প্রকাশ পাচ্ছে। আর্থিক জগতে

সংগঠন ক্রমশঃ পূর্ণতর ভাবে প্রকাশ পেল—ফলে উৎপাদনের ক্ষেত্রে অল্পলোকের হাতে কর্ত্তৃত্ব ও ক্ষমতার বৃদ্ধি এবং বাণিজ্যে জাতীয়তাভাব ও সংরক্ষণ-নীতি সব দেশে বিজয়ী হয়েছে। সামাজিক জীবনে রাষ্ট্রশক্তির হস্তক্ষেপ ক্রমশঃ বাড়তে লাগ্‌লে, প্রথমে দুর্ব্বলকে রক্ষা করতে, পরে সকলকে শিক্ষার সুযোগ দেবার জন্য; শেষে এমন কি দেশের সর্ব্ববিধ প্রচেষ্টাকে রাষ্ট্রের নেতৃত্বে সংগঠিত ও সুশৃঙ্খলিত করার আদর্শও প্রচারিত হ'তে বিলম্ব হল না। জাতীয়তা প্রথমে মুক্তি ও উদার নীতির সহায় ছিল। সংগঠনের প্রকোপে সেই জাতীয়তাই পরে মানুষের মিলনের পথে প্রবল বাধার সৃষ্টি করে' জগৎকে পরস্পর-বিরোধী খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত করে রেখেছে। প্রত্যেক জাতির মধ্যে আবার অন্য দেশের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য রাষ্ট্রশক্তির ক্ষমতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তির স্বাধীনতা হ্রাস পেল। আর্থিক সমস্যা ও জাতীয় বিদ্বেষের যুক্তফল প্রকাশ পেয়েছিল পৃথিবীব্যাপী মহাসমরে।

রাসেলের প্রধান প্রতিপাদ্য এই যে মুক্তি ও সংগঠন এই দুই মূলসূত্রের ফল বিভিন্ন হ'লেও গত শতাব্দীর ইতিহাসে তাদের গভীর যোগ রয়েছে। একের পরিণতি অন্যে। আর্থিক জগতে ও জাতীয়তার ক্রমবিকাশে এই যোগ স্পষ্ট দেখা যায়। পূর্ণ প্রতিযোগিতার থেকেই ধীরে ধীরে অথচ স্বাভাবিকভাবে আর্থিক কর্ত্তৃত্ব অল্প লোকের হাতে চলে যায়, বার বার এ ব্যাপার দেখা গেছে। আবার কোন জাতি মুক্তিলাভ করবার পরেই সংগঠিত হয়ে' অন্য দেশের পক্ষে শঙ্কার কারণ হয়েছে, এর দৃষ্টান্তও বিরল নয়। ঊনবিংশ শতকের ক্রমবিকাশকে সেইজন্য অস্বাভাবিক বলা চলে না। কিন্তু ঠিক এইজন্যই রাসেলের বইএ কোন আশার সুর নেই। মুক্তিবাদের প্রতি রাসেলের স্বাভাবিক আকর্ষণ বরাবরই আছে কিন্তু তার বিষময় পরিণাম সম্বন্ধেও তিনি সজাগ। ভবিষ্যতের জন্য তাহলে ভরসা কোথায়? রাসেলের মনে অন্ততঃ নৈরাশ্য ও সংশয় শুধু বিরাজ করছে। তিনি দেখিয়েছেন যে ঊনবিংশ শতকের শেষ থেকে আরম্ভ করে' আজ পর্য্যন্ত সকলে মুক্তি ও সংগঠন এই দুই আদর্শের শুধু খারাপ দিকটাই গ্রহণ করেছে। প্রতি দেশের আর্থিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে সংগঠনের আধিক্য ও আন্তর্জাতিক সম্বন্ধের বেলায় প্রতি রাষ্ট্রের পরিপূর্ণ স্বাধীনতা—গত পঞ্চাশ বছর ধরে' জগতের পক্ষে এই দু'টিই সমান সত্য নয় কি? অথচ উভয়ের ফলেই মানুষের অশেষ ক্ষতি হয়েছে এ কথাও নিঃসন্দেহ।

রাসেলের বইখানি নানাকারণে সবিশেষ সমাদর লাভ করবে। তাঁর লেখার সরস প্রাঞ্জলতা, অল্প কথায় বিষয়-বস্তুর সার-সঙ্কলন, তীক্ষ্ণ বিচারবুদ্ধি, অন্যায়ের প্রতি বিদ্রূপের কশাঘাত—এ সমস্তই সর্ব্বজনবিদিত। আলোচ্য বইখানিতে এই গুণগুলি আরও উজ্জ্বল হয়েছে। বিজ্ঞান-সংক্রান্ত লেখা ভিন্ন তাঁর অন্যান্য বইগুলিতে ধর্ম্ম, শিক্ষা, সমাজসংস্কার, রাষ্ট্রনীতি ইত্যাদি বিষয়ে যে মতামত আছে সে সম্বন্ধে মতভেদ থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু গত শতাব্দীর ইতিহাস বিশ্লেষণ ব্যাপারে অনেকেই তাঁর সঙ্গে একমত হবেন; মুক্তি ও সংগঠনের বিকাশ খুব নূতন কথা নয়, যদিও রাসেলের লেখার গুণে গত যুগের স্বরূপটি উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। রাসেলের আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে ক্রমোন্নতির সাধারণ ধারণা বা আধুনিক সভ্যতার বাহ্যিক সাফল্যের আবরণ তিনি ভেদ করেছেন; তাঁর মতন সংশয়বাদীর পক্ষে এই উপযুক্ত। বইখানির কয়েকটি অংশ বিশেষ করে' পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে—যেমন ইংল্যাণ্ডে গত শতকের

প্রথম দিকে জীবন-যাত্রার চিত্র, অবাধ বাণিজ্যনীতি ও কব্‌ডেনের মতবাদের নানাদিক সম্বন্ধে বিচার, মার্ক্সের দার্শনিক ও আর্থিক মতের বিচক্ষণ সমালোচনা, আমেরিকায় গণতন্ত্র ও ধনতন্ত্রের বিকাশের বিচিত্র ইতিহাস এবং বিস্‌মার্কের প্রভাবান্বিত জাতীয়তা-বাদের প্রসারের বিবরণ। উনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাস সম্বন্ধে একখানি ভাল বই পড়তে হ'লে এখন অনেকেই রাসেলের গ্রন্থখানি পড়বেন।

কিন্তু এ বইও সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর নয়, রাসেলের লেখার সম্বন্ধেও কয়েকটি অভিযোগ আনা সহজ। প্রথমতঃ তাঁর বইখানিতে অনেক কথা স্থান পেয়েছে যার সার্থকতা খুঁজে পাওয়া দুষ্কর, আবার তেমনই অন্য প্রয়োজনীয় কথাও বাদ পড়েছে। রবার্ট্‌ ওয়েন্‌ সম্বন্ধে তেইশ পাতার মধ্যে অধিকাংশ তাঁর জীবনের নানা ঘটনার বিবরণ; প্রেসিডেন্ট্‌ জ্যাক্‌সন্‌ সম্বন্ধে সাতপাতা-ব্যাপী খুঁটিনাটি কথার প্রয়োজন দেখা যায় না যখন মনে রাখি যে সমগ্র শতাব্দীর ইতিহাস পাঁচশ' পাতায় লেখা হয়েছে, কাইজার উইলিয়ামের অন্তরঙ্গ বন্ধুদের চরিত্র আলোচনার-ই বা যথেষ্ট কারণ কোথায়? অন্যদিকে যে সব চিন্তাধারার ছাপ ইতিহাসে সুস্পষ্ট তার আলোচনার অভাবও চোখে পড়ে। উনবিংশ শতকে ক্যাথলিক্‌ প্রভাবের পুনরুত্থান একটি স্মরণীয় কথা; উদার নীতির প্রধান বাধা হিসাবে অন্ততঃ এই দৃষ্টি-ভঙ্গীর আলোচনা এ যুগের ঐতিহাসিকের অবশ্যকর্ত্তব্য। গণতন্ত্রের থিওরী সম্বন্ধে যে প্রতিবাদের থেকে বর্ত্তমান ফাসিজ্‌মের অভ্যুদয়, সেই চিন্তাস্রোতের বিবরণের উনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাসেই স্থান পাওয়া উচিত। ইংল্যাণ্ডের ফেবিয়ান্‌ চিন্তা ও মতবাদ সোশ্যালিজ্‌মের সমস্ত ইতিহাসকে প্রভাবান্বিত করেছে; রাসেল্‌ তার নাম উল্লেখ পর্য্যন্ত করেন নি।

রাসেল্‌ দেখাতে চেষ্টা করেছেন যে মার্ক্স-প্রচারিত ইতিহাসের বাস্তব ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ সত্য নয় অর্থাৎ তাকে প্রমাণ করা অসম্ভব। কিন্তু বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত হিসাবে ইতিহাসের কোন ব্যাখ্যারই প্রমাণ চলে না। ঐতিহাসিক ব্যাখ্যার মানেই হচ্ছে একটা দৃষ্টিভঙ্গী যার সাহায্য ব্যতীত ইতিহাস লেখা অসম্ভব হয়ে পড়ে। রাসেলের নিজেরও একটা ঐতিহাসিক দৃষ্টি আছে যেটা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত করা শক্ত। কিন্তু ক্ষুদ্রায়তন প্রবন্ধের মধ্যে এ সব কথার আলোচনা করা সম্ভব নয়। শুধু এই কথা বলা যায় মার্ক্সের ব্যাখ্যায় ইতিহাসকে একটা কাটামো রূপে ধরা হয়, তার প্রসার বহু শতাব্দী ও বহু যুগ ব্যাপী। কিন্তু এই ব্যাখ্যার সমালোচকেরা সর্ব্বদা ইতিহাস অর্থে ছোট একটি যুগের ঘটনাবলী এমন কি কোন বিশেষ ঘটনার অব্যবহিত কারণ নির্ণয় বোঝেন।

এই বইখানির ভূমিকায় রাসেল্‌ একটি প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন যে সম্বন্ধে মতভেদ অবশ্যম্ভাবী। তাঁর মতে আজকাল অনেকে ইতিহাসে ব্যক্তি-বিশেষের প্রভাব অযথা খর্ব্ব করেন। নামপত্রিকায় গ্রন্থকার মিল্টনের চারটি পংক্তি উদ্ধৃত করেছেন যার অর্থ হ'ল এই যে বিশৃঙ্খলতা ও আকস্মিক ঘটনা পৃথিবী শাসন করছে। কিন্তু মানুষের ইতিহাস কি প্রধানতঃ আকস্মিক? রাসেলের স্বলিখিত ইতিহাসই ত' তার বিপক্ষে সাক্ষ্য দিচ্ছে। মহাপুরুষদের প্রভাব সম্বন্ধে অতিরঞ্জিত ধারণা করাও সহজ। রাসেলের বিশ্বাস যে বিস্‌মার্কের অকালমৃত্যু হলে জার্ম্মানী বা ইয়োরোপের ইতিহাস প্রায় সম্পূর্ণ অন্য আকার ধারণ করত। এর থেকে মনে করা অসঙ্গত নয় যে তাঁর মতে বিস্‌মার্কের শক্তি ও বিশ্বাসই আধুনিক যুগকে অনেকাংশে রূপ দিয়েছে। কিন্তু সেই বিস্‌মার্ক্‌ই যদি গত শতাব্দীতে গ্রীসে অথবা ভারতবর্ষে কিম্বা পঞ্চদশ শতকে জার্ম্মানীতে জন্মগ্রহণ

করতেন তাহ'লে কি বলা যায় যে তাঁর শক্তি ও বিশ্বাস ইতিহাসে সমান ছাপ রেখে যেত? পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপরই মহাপুরুষদের কৃতিত্ব অনেকাংশে নির্ভর করে না কি? ইংরাজ রাজা প্রথম চর্ল্‌সের মন্ত্রী ষ্ট্রাফর্ড-এর সঙ্গে বিস্‌মার্কের আশ্চর্য্য সাদৃশ্য অনেকেই লক্ষ্য করেছেন। বিস্‌মার্ক বিজয়ী হলেন আর ষ্ট্রাফর্ড্‌কে প্রাণ দিতে হ'ল—এই পৃথক ফলের প্রধান কারণ কি অবস্থার বৈষম্য নয়?

রাসেলের এই বইখানি বহু প্রচারিত হবে বলেই তার এত বিশদ বিবরণ এখানে দেওয়া সঙ্গত মনে হয়েছে, আর একটি কথার উল্লেখ করেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করব। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোন প্রকার ভরসা বা নির্দ্দেশ তাঁর এ বইখানিতে নেই—ইতিহাসকে তিনি সংশয়বাদীর চোখে দেখবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু সংশয়বাদের মহাগুরু ডেভিড্‌ হিউম্‌ পর্য্যন্ত স্বীকার করেছেন যে এ দৃষ্টিভঙ্গী মানুষের বুদ্ধির বিলাস মাত্র—কর্ম্মক্ষেত্রে এর প্রয়োগ চলে না। প্রবল কোন সমস্যার সামনে সংশয়বাদের প্রচার প্রচলিত বিধিব্যবস্থা সমর্থনের প্রকারান্তর নয় কি?

ক্রোচের বইখানি সম্পূর্ণ অন্য গোত্রের—বিশ্বাসের আতিশয্য এর ছত্রে ছত্রে ফুটে বের হয়েছে। উদার নীতিতে ক্রোচের অবিচলিত আস্থা তাঁর আখ্যায়িকাকে রূপ দিয়েছে আর সেই মতবাদ গত শতাব্দীর উদার মতসমষ্টির দার্শনিক পুনরাবৃত্তি। বর্ত্তমান ইটালিতে এই বই প্রকাশিত হওয়া আশ্চর্য্যের কথা—ক্রোচের খ্যাতি বোধ হয় তাঁকে ফাসিষ্ট্‌দের হাত থেকে রক্ষা করেছে। গ্রন্থখানির প্রথম তিন অধ্যায় এবং উপসংহার উল্লেখযোগ্য—ক্রোচের মতামতের বৈশিষ্ট্য এখানেই পরিস্ফুট হয়েছে। বাকী সাতটি পরিচ্ছেদে গ্রন্থকার বিগত শতাব্দীকে কয়েকটি ছোট ছোট অংশে ভাগ করে' প্রধানতঃ ইয়োরোপের রাষ্ট্রিক ইতিহাসের বর্ণনা করেছেন; তাতে তাঁর লেখার একটি গুণ বিশেষ করে' চোখে পড়ে—প্রত্যেক পাতায় প্রতি পদে ভিন্ন ভিন্ন ঘটনা সুসংবদ্ধভাবে প্রকাশ পাচ্ছে। ইয়োরোপীয় ইতিবৃত্তে অভিজ্ঞ পাঠকমাত্রে লেখকের ফ্যাক্টের সংগ্রহ ও তাঁর সঙ্কলনের ক্ষমতায় বিস্মিত হবেন। অন্যদিকে সাধারণ পাঠকের হয়ত এই বিবরণ পাঠে ধৈর্য্যচ্যুতি হ'তে পারে।

গ্রন্থের প্রারম্ভে ক্রোচে গত শতকের ইতিবৃত্তকে বিভিন্ন ধর্ম্মের সঙ্ঘাতরূপে চিত্রিত করেছেন। জগৎ সম্বন্ধে একটি বিশেষ দৃষ্টি, কতকগুলি দৃঢ় বিশ্বাস এবং তদনুসারে কর্ম্ম-প্রচেষ্টাকে ক্রোচে ধর্ম্ম আখ্যা দিয়েছেন। এই ধর্ম্মগুলির মধ্যে একটিকে যুগধর্ম্ম অভিহিত করা যায়—তার নাম উদার নীতি। এই নীতির চোখে মানুষের ইতিহাস মুক্তি ও স্বাধীনতার ক্রমবিকাশ রূপে প্রতিভাত হয়। গত শতাব্দীতে উদার মতবাদের কয়েকটি প্রধান লক্ষ্য ছিল—জাতিগত স্বাধীনতা, ব্যক্তিগত অধিকার ও স্বাতন্ত্র্য স্বীকার, আইনকানুনের মধ্যে সকলের সমভাব, নিয়মতন্ত্রমূলক শাসনপদ্ধতি এবং রাষ্ট্র ব্যাপারে জনসাধারণের প্রভাব স্থাপন। ক্রোচে এই উদার নীতির থেকে অন্য দুইটি ধর্ম্মের পার্থক্য নির্দ্দেশ করেছেন—একটি পরিপূর্ণ গণতন্ত্র, যার ন্যায়সঙ্গত পরিণতি সংখ্যাধিক্যের স্বেচ্ছাচারে এবং যার মূলনীতি হ'ল জনসাধারণের অবাধ প্রভুত্ব; অন্যটি সাম্যবাদ, যার প্রধান উদ্দেশ্য হ'ল ব্যক্তিগত সম্পত্তির উচ্ছেদ সাধন এবং জড়বাদ ও স্বার্থসন্ধান যার মজ্জাগত। অবস্থার গুণে অবশ্য এই তিন পৃথক ধর্ম্ম উনবিংশ শতকে অনেক ক্ষেত্রে পরস্পরের সাহায্য করেছিল, কিন্তু তাদের স্বরূপ স্বতন্ত্র।

এই ধর্ম্মগুলিকে পরিবর্ত্তনপন্থী বলা যেতে পারে—এর বিপক্ষে যে শক্তিসমূহ

দাঁড়িয়েছিল ,ক্রোচে তাদেরও ধর্ম্ম আখ্যা থেকে বঞ্চিত করেন নি। তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান নিয়েছিল ক্যাথলিক্ সম্প্রদায় যার চোখে প্রটেষ্টাণ্ট্ বিপ্লবের পর থেকে ইয়োরোপের ইতিহাস ভ্রান্তির কাহিনী বলে'ই গণ্য হত। ক্যাথলিক্‌দের দৃঢ়বিশ্বাস এই যে পোপ-পরিচালিত ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠানের শরণাপন্ন হয়ে' আপনার স্বাধীন বুদ্ধি বর্জ্জন করাই মানুষের পরম গতি, শত শত বৎসরের সঞ্চিত খৃষ্টীয় অভিজ্ঞতা কখনও মানুষকে ভুল পথে নিয়ে যাবে না—তার তুলনায় ব্যক্তি-বিশেষের বিচার-শক্তির মূল্য কতটুকু? ঊনবিংশ শতাব্দীতে এবং আজকের দিনেও অনেক মনীষী শেষ পর্য্যন্ত ক্যাথলিক্ প্রতিষ্ঠানের আশ্রয়ে শান্তি খুঁজেছেন। ক্যাথলিক্ ধর্ম্মের সহায়রূপে অন্য দু'টি মতবাদের উল্লেখ করা যায়—একটি পুরাতন প্রথানুযায়ী অবাধ রাজশক্তিতে বিশ্বাস যার প্রভাব থেকে জগৎ শুধু গত শতাব্দীতেই মুক্তিলাভ করেছে; অপরটি হ'ল আভিজাত্যের সংস্কার ও অল্প লোকের শ্রেষ্ঠত্বে দৃঢ় আস্থা, যার ফলে লোকে নির্দ্দিষ্ট কয়েকটি লোকের হাতে আপনাদের ভার চিরদিনের জন্য সমর্পণ করতে ভয় পেত না।

এই সঙ্ঘাত ছাড়া অন্য একটি বিষয়ও ক্রোচে সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন, সেটি রোম্যান্টিক্ চিন্তা ও কর্ম্মধারার প্রকাশ। ক্রোচের মতে রোম্যান্টিক ভাবের দু'টি রূপ আছে—একটি অশেষ মূল্যবান, অন্যটি নিন্দনীয়। প্রথমটি প্রকাশ পেয়েছে প্রকৃত কবিত্বের নূতন সাধনায়, ইতিহাস সম্বন্ধে নূতন বোধশক্তি ও ধারণার মধ্যে, ব্যক্তিত্বের বিকাশে, অষ্টাদশ শতকের যুক্তিবাদ ও সীমাবদ্ধ বিজ্ঞানের অযথা দাবীর বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াতে এবং আদর্শবাদী দর্শনের প্রচারে। অপরটি দেখা যায় ব্যক্তিগত উচ্ছ্বাসের মধ্যে, বিশৃঙ্খল জীবনে, অব্যবস্থিত চিত্তের ভাববিলাসের মাঝখানে, বিকারগ্রস্ত দৃষ্টিভঙ্গীর ভিতরে। ক্রোচে অবশ্য উপরোক্ত কথাগুলির সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করেন নি, কিন্তু দ্বিতীয় প্রকারের রোম্যান্টিক্ ভাবকেই গত শতকের সাহিত্যে যুগব্যাধি আখ্যা দেওয়া হয়েছিল।

ক্রোচে লিখিত ইতিহাসের বিরুদ্ধে প্রধান আপত্তি ওঠে এই যে এতখানি আদর্শবাদ আজকালকার দিনে প্রায় অচল। ক্রোচের ইতিহাস সম্বন্ধে একটি বিশিষ্ট ধারণা আছে, যে ধারণা এখন প্রায় সকলেই ত্যাগ করেছে। যে সঙ্ঘাতের বর্ণনায় বইখানি আরম্ভ হয়েছে তা সত্য বটে কিন্তু ঐতিহাসিকেরা এখন তার থেকে গভীর কিছুর সন্ধান করেন। ইতিহাস শুধু আইডিয়ার সঙ্ঘর্ষ নয়, বিশেষ কোন ধারণা বা মত ঠিক সেই যুগে কেন উদ্ভূত হ'ল তার কারণ নির্দ্দেশের চেষ্টারও প্রয়োজন আছে। ক্রোচে এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন, তিনি শুধু ভিন্ন ভিন্ন আইডিয়া বা আদর্শ নিয়েই সন্তুষ্ট; রাসেল্ যে ভাবে এক একটি মতের উদ্ভব, বিকাশ, পরিবর্ত্তনের বর্ণনা ও তার কারণ সন্ধান করেছেন, ক্রোচের বিশিষ্ট দার্শনিক মত তাঁকে সর্ব্বদা সে পথ থেকে দূরে রেখেছে। উৎপাদন-পদ্ধতির বিপ্লব বোধহয় গত শতাব্দীর সব চেয়ে স্মরণীয় কথা—ক্রোচে সে সম্বন্ধে প্রায় কিছুই বলেন নি। ১৫৪ পৃষ্ঠায় ইংল্যাণ্ডে নানাবিধ হিতকার্য্য সাধনের কারণ হিসাবে তিনি নির্দ্দেশ করেছেন ইংরাজদের মনোবৃত্তি—বহুযুগ সে মনোবৃত্তি কেন সুপ্ত ছিল সে প্রশ্ন তাঁর মনে জাগে নি। ১৭২ পৃষ্ঠায় তিনি বলেছেন যে সুদক্ষ শাসনযন্ত্র কখনও শ্রেণী-বিশেষের স্বার্থ সন্ধান করে না। সেই সঙ্গেই বলা হয়েছে যে ১৮৪৮ সালের ফরাসী বিপ্লবের কারণ মানসিক ক্লান্তি ও বিরক্তির ভাব। ইতিহাসের মধ্যে আর্থিক ব্যবস্থা বা শ্রেণীভেদের প্রভাব অনুসন্ধানকে তিনি ৩২৩ পৃষ্ঠায়

উপহাস করেছেন। এ জাতীয় আদর্শবাদ ক্রোচের পক্ষে হয়ত শোভা পায়, অধিকাংশ ঐতিহাসিককে এর মায়া বহুকাল ত্যাগ করতে হয়েছে।

হালেভির বিরাট গ্রন্থটি গত শতাব্দীর ইতিহাস নয়, একটি বিশেষ মতবাদ সম্বন্ধে গবেষণা এর বিষয়-বস্তু। এর দীপ্তির পাশে ক্রোচে ও এমন কি রাসেলের বই আমার কাছে নিষ্প্রভ মনে হয়েছে। হালেভির পুস্তকটি সুখপাঠ্য মোটেই নয়, আর্থিক মতামত সম্বন্ধে এর অধ্যায়গুলি দুর্ব্বোধ্য বল্‌লেই চলে কিন্তু গ্রন্থকারের পাণ্ডিত্য ও বিশ্লেষণ-শক্তি বইখানিকে প্রামাণ্য গ্রন্থের শ্রেণীতে স্থান দিয়েছে। গত শতাব্দী সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের অপরিহার্য্য অঙ্গ বলে বইখানি ইতিমধ্যেই গণ্য হয়েছে এবং এ প্রশংসা কিছু অত্যুক্তি নয়!

ইংল্যাণ্ডে যে উদার নীতি গত শতকে প্রতিষ্ঠালাভ করেছিল তার পিছনে প্রধান শক্তি ছিল বেন্থাম্‌পন্থীগণ। এ ক্ষেত্রেও ইয়োরোপ থেকে ইংল্যাণ্ডের পার্থক্য লক্ষ্যণীয়। দার্শনিক চরমসংস্কারবাদ বেন্থামের জীবদ্দশায় ধীরে ধীরে কি ভাবে গড়ে উঠেছিল, তার বিচিত্র ইতিহাস হালেভি তিন খণ্ডে লিপিবদ্ধ করেছেন। এর উৎপত্তি অষ্টাদশ শতকের একটি প্রচলিত ইচ্ছার মধ্যে—নিউটন্ যেমন আকর্ষণ-শক্তির মূলসূত্রের উপর বহির্জগতের বিজ্ঞান গঠন করেছিলেন, অন্যেরা তেমনই মনস্তত্ত্ব, দণ্ডনীতি, অর্থশাস্ত্র ইত্যাদি বিদ্যার মূল নিয়ম আবিষ্কার করে' তাদের বিজ্ঞানের পর্য্যায়ে উন্নত করতে চেয়েছিলেন। অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে এইরূপ দুটি মূল সূত্রের অস্তিত্ব প্রায় সকলেই গ্রহণ করতে আরম্ভ করেন—তার একটিকে অনুষঙ্গ বা association ও অপটিকে উপযোগ বা utility আখ্যা দেওয়া হয়। সকল মানুষেই সুখ খোঁজে ও কষ্ট পরিহার করতে চায়, এইজন্য সমস্ত ব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠানের সার্থকতা হচ্ছে এই প্রয়োজনসিদ্ধির পরিমাণের উপর। কিন্তু মানুষ ত একক নয়, তার সমষ্টি আছে। এইজন্য উপযোগের আদর্শ হল বৃহত্তম সংখ্যার মহত্তম মঙ্গল। কোন ক্ষেত্রে এ আদর্শ-নির্দ্ধারণ সম্ভব করতে গেলে দু'টি বিশ্বাস থাকা প্রয়োজন—প্রথমত, মানুষের সুখ বা আনন্দ পরিমাণ-সাপেক্ষ ; দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন ব্যক্তির মর্য্যাদা বা মূল্য সমান বলেই গণনীয়। ভিন্ন ভিন্ন লোকের সুখের ধারণা অবশ্য এক নয় ; এর কারণ শুধু অনুষঙ্গের মূল নীতি। অনুষঙ্গ ও উপযোগের সূত্র দু'টি ইংল্যাণ্ডে হিউম, হার্ট্‌লি, হাচিসন্ ও প্রিষ্ট্‌লির লেখার মধ্যে প্রথম প্রকাশ পায়। বেন্থাম্ কিন্তু শুধু এদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হননি ; ফরাসী যুক্তিবাদী হেল্‌ভেশিয়াস্ ও ইটালীয় আইন-সংস্কারক বেকারিয়াকে তিনি আপনার গুরু বলে' অভিহিত করেছিলেন। কিন্তু বেন্থামের মধ্যেই এই চিন্তাধারার পূর্ণ প্রতিষ্ঠা হয়েছিল—তাঁর কাছে এ শুধু একটা দার্শনিক মত ছিল না, অধিকতম সংখ্যার প্রভূততম কল্যাণের সূত্র তিনি ক্রমে ক্রমে সব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে চেয়েছিলেন। তিনি দার্শনিক চরমসংস্কারবাদের উদ্ভাবক না হলেও প্রধান গুরু।

বেন্থামের মতে উপযোগের আদর্শকে সাক্ষাৎভাবে প্রমাণিত করা যায় না, কেননা যে সূত্র সমস্তের মাপকাঠি তাকে কি দিয়ে বিচার করা যাবে? তবে এর অপরোক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় অন্য সকল তথাকথিত মূলসূত্রের অসারত্বে। ত্যাগ কখনও সমষ্টির আদর্শ হতে পারে না, ত্যাগ সকলের আদর্শ স্থানীয় হ'লে অপরকে বঞ্চিত করাও দোষ বলে' গণ্য হ'ত না। বিচারবুদ্ধি বা অধিকারবোধ উপযোগের আদর্শেরই রূপান্তর। সত্যের প্রতি আসক্তি বা মিথ্যা বর্জ্জন আদর্শ হিসাবে দাঁড়াতে পারে না—কারণ তার

অর্থ হয় আপনার মত বলপূর্ব্বক প্রচলন, নয় সব মতই তুল্যমূল্য স্বীকার করা যার অবশ্যম্ভাবী ফল অরাজকতার প্রশ্রয়।

উপযোগবাদের অবশ্য প্রথম সমস্যা ছিল এই যে ভিন্ন ভিন্ন লোকের সুখান্বেষণে সমষ্টির বা অধিকতম সংখ্যার মঙ্গল কি ভাবে সাধিত হতে পারে। এ প্রশ্নের তিনটি পৃথক উত্তর সম্ভব এবং তিনটিই এই মতবাদের ভিন্ন ভিন্ন স্তরে পাওয়া যায়। বেন্থামীয় দর্শনের একটি প্রধান দুর্ব্বলতা এইখানে। প্রথমতঃ বলা সম্ভব যে প্রতি লোকের মনে অনুকম্পা ও সহানুভূতির প্রভাবে স্বার্থের সঙ্ঘাত অপসারিত হবে; বেন্থামের দলের নীতিশাস্ত্রে ও দার্শনিক সংস্কারকদের জীবনের কঠোর সাধনায় এর প্রভাব দেখা যায়। দ্বিতীয়ত, অনেকের বিশ্বাস প্রত্যেক লোকের স্বার্থ ও সুখান্বেষণের পথে সকল বাধা অদৃশ্য হ'লে পরিণামে সমষ্টিরই কল্যাণ সম্পন্ন হবে; কোনও প্রকারে বিশেষ স্বার্থগুলির কাটাকাটিতে সাধারণের স্বার্থ বজায় থেকে যাবে। আডাম্ স্মিথ প্রবর্ত্তিত অর্থশাস্ত্র এই বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত নয় কি? তৃতীয়ত, আর একটি পন্থাও সম্ভব—এমনভাবে বিধি ব্যবস্থা করতে হবে যে দণ্ডনীতি শাসনপদ্ধতি ও রাষ্ট্রশক্তির সংস্থানের ফলে ব্যক্তির স্বার্থ অধিকতম সংখ্যার সুখসাধনে নিমজ্জিত হবে। বলা বাহুল্য যে বেন্থাম্ প্রথমে তাঁর দণ্ডবিধিতে ও ১৮০৮ সালের পর জেম্স্ মিলের প্রভাবে তাঁর রাষ্ট্রমতেও এই ধারণা অনুসারে সংস্কারকার্য্যে অগ্রসর হ'ন। এই তিন বিভিন্ন মতের সামঞ্জস্য কখনই সম্পন্ন হয়নি।

হালেভির প্রথম ও শেষ অধ্যায় দু'টি সকলেরই পড়ে দেখা উচিত। কিন্তু তাঁর বক্তব্যের মূলোদ্ধার দীর্ঘ সমালোচনা বা প্রবন্ধের মধ্যেও সম্ভব নয়। তিনি যথার্থই দেখিয়েছেন যে উপযোগবাদ সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণা অতিরিক্ত সহজ রূপ নিয়েছে। আসলে বেন্থামের দলের মতবাদে জটিলতার অভাব নেই। অষ্টাদশ শতাব্দীর যুক্তিবাদে যে স্বাভাবিক অধিকারের কথা শোনা যায় বেন্থামপন্থীরা তাকে বর্জ্জন করেছিলেন কিন্তু তাঁদের মধ্যেও যুক্তিবাদ প্রবল ছিল—নয়ত সমাজবিদ্যাকে বিজ্ঞান করে' তুলবার এ প্রচণ্ড প্রচেষ্টা কেন? ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ ও ব্যক্তিসাম্যের ধারণাও তাঁদের মধ্যে সমভাবে বিরাজ করত এ কথাও মনে রাখা দরকার—তাঁহাদের মতবাদে দুয়েরই প্রভাব দেখা যায়।

দার্শনিক সংস্কারবাদ যখন পূর্ণরূপ গ্রহণ করে তখন তার আর্থিক, রাষ্ট্রীয় ও নৈতিক সিদ্ধান্তগুলি ইংল্যাণ্ডের ইতিহাসে নানাভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল। অর্থনীতির ক্ষেত্রে এ মতবাদের রূপ দিলেন ম্যাল্থাস্ ও রিকার্ডো। ম্যাল্থাসের মতে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির পরিমাণ উৎপাদিকা-শক্তির প্রসারের চেয়ে অধিক—ফলে চাহিদা ও সরবরাহের নিয়ম অনুসারে শ্রমিকের বেতন হ্রাস হওয়াই স্বাভাবিক এবং ধনবৈষম্য ও দারিদ্র্য উচ্ছেদের উপায় নেই। রিকার্ডোর মতে কৃষিকার্য্যের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে নিকৃষ্ট জমিতে অধিক পরিশ্রমে শস্য উৎপাদন হয়, সেই পরিশ্রম অনুসারেই অবশ্য শস্যের মূল্য নির্দ্ধারিত হবার কথা—সুতরাং উর্ব্বর জমিতে তখন অনেক বেশী লাভ হয় আর এই লাভ জমিদারেরা বিনা আয়াসে আয়ত্ত করে। এই মতের ফলে ইংল্যাণ্ডে কৃষি-কার্য্যের সংরক্ষণ প্রথা শিথিল হয়ে আসে। এদিকে আডাম্ স্মিথের উত্তরাধিকারী হিসাবে বেন্থাম্পন্থীরা অবাধ বাণিজ্য ও ধনোৎপাদনে যন্ত্রের ব্যবহারের সমর্থক হ'ন। রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে এই সংস্কারকদল ক্রমশঃ ষ্টেটের কার্য্যপরিধি সঙ্কীর্ণ করবার পক্ষপাতী হয়ে পড়েন। অন্যদিকে তাঁরা গণতন্ত্রের সমর্থক ছিলেন, এমন কি নারীর রাষ্ট্রীয় অধিকারেও

তাঁদের বিশ্বাস ছিল। সাধারণের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার ছিল তাঁদের আর একটি মন্ত্র। এখানে অবশ্য রাষ্ট্রের সাহায্য প্রয়োজন হ'ল। কাজেই এদিকে বেন্থামীয় দলের বিভিন্ন মতের সামঞ্জস্য রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশ স্থাপনে এই সংস্কারকদলের মত ও আগ্রহ ছিল না। নীতিশাস্ত্রের ক্ষেত্রে এঁরা বিশ্বাস করতেন যে প্রত্যেক লোক সুখান্বেষী এবং সকলেই নিজের স্বার্থ কি তার প্রকৃষ্ট বিচারক। সাবধানতা, স্থৈর্য্য ও ধীরবিচারবুদ্ধি-ই এঁদের কাছে প্রধান গুণ বলে গণ্য হ'ত।

ইংল্যাণ্ডে গণতন্ত্রের বিকাশ, শাসনপদ্ধতি সংস্কার, আইনকানুনের পরিবর্ত্তন, শিক্ষার বিস্তার ইত্যাদি নানাদিকে দার্শনিক সংস্কারকেরা অনেক কাজ করেছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি এ মতবাদ খানিকটা পরিবর্ত্তিত হয়ে ম্যাঞ্চেষ্টারের সংস্কারবাদ রূপে পরিচিত হয়েছিল। তখন তার মধ্যে আর্থিক চিন্তাই প্রধান স্থান নিয়েছিল বলে' তার প্রথম বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়াল ষ্টেটের ক্ষমতা বৃদ্ধির পথে বাধা।

এই প্রসঙ্গ শেষ করবার আগে বেন্থামের চিন্তাধারার দু'টি প্রধান দুর্ব্বলতা নির্দ্দেশ করা দরকার। হালেভির গ্রন্থের ভূমিকায় বেলিয়ল্ কলেজের অধ্যক্ষ লিণ্ড্সে প্রথমটির ইঙ্গিত করেছেন—সমাজদর্শনকে বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের শ্রেণীভুক্ত করার চেষ্টা বৃথা এবং বেন্থামের সকল ভুলের মূল এখানে। দ্বিতীয়ত, বেন্থাম্ সমাজকে কতকগুলি সমকক্ষ লোকের সমষ্টি-ভাবেই বরাবর দেখেছিলেন, তার মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন জাতি শ্রেণী ও স্তরের অস্তিত্ব ও তাদের বিশেষ স্বার্থসঙ্ঘাতের সমস্যা তাঁর অগোচর থেকে গিয়েছিল। এইজন্য বাস্তব অবস্থার সঙ্গে দার্শনিক চরমসংস্কারবাদ অনেকখানি যোগ হারিয়ে ফেলে।

আলোচ্য বইগুলিতে কতকগুলি সামান্য ভুল থেকে গেছে। রাসেলের ৪৯৫ পৃষ্ঠায় রুষদেশের প্রথম নিয়মতন্ত্র প্রবর্ত্তনের তারিখ দশবছর এগিয়ে দেওয়া হয়েছে। ক্রোচের ৬৬ পৃষ্ঠায় ক্যানিং-এর প্রধান মন্ত্রিত্ব এক বছরের জায়গায় পাঁচ বছর লেখা আছে। হালেভি ২০ পৃষ্ঠায় ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগ লিখতে গিয়ে শেষদিক লিখে ফেলেছেন। এ ধরণের ভুল অবশ্য পরবর্ত্তী সংস্করণগুলিতে নিঃসন্দেহে সংশোধিত হবে।

শ্রীসুশোভন সরকার

রাগনির্ণয়—রবীন্দ্রলাল রায় প্রণীত, (ডি, এম, লাইব্রেরী)।

নবগীতিমঞ্জরী—শ্রীমতী সাহানা দেবী ও দিলীপকুমার রায় প্রণীত, দ্বিতীয় সংস্করণ, (গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড্ সন্স্)।

পরিচয়ের পাঠকবর্গের মধ্যে যাঁদের সঙ্গীতে আগ্রহ আছে তাঁদের এই দুইখানি বই অবিলম্বে কিনে পড়তে অনুরোধ করছি। লেখকবর্গ উচ্চ সঙ্গীতে অভিজ্ঞ, চিন্তাশীল এবং আলোচনায় সুদক্ষ। সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রই জানেন যে রবীন্দ্রলাল উত্তরাধিকারসূত্রে সুগায়ক। ইনি সুরেন মজুমদার মহাশয়ের ভাগ্নে, তাঁর মাতুলবংশের মধ্যে সঙ্গীত-প্রতিভা প্রায় সকলেরই আছে। পিতৃকুলও তাঁর উজ্জ্বল। রবীন্দ্রলাল ৺হরেন্দ্রলালের

পুত্র, দিলীপকুমারের জ্যাঠতুতো ভাই, শান্তিনিকেতনের সঙ্গীত-অধ্যাপক হেমেন্দ্রলালের ছোট ভাই। কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে Physic-এ উচ্চ ডিগ্রী নিয়ে রবীন্দ্রলাল লক্ষ্ণৌ Marris College of Hindusthani Music-এ পাঁচ বৎসর পড়েন এবং সব পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হন। পাঠাবস্থায় শ্রীকৃষ্ণ রতন জন্‌কারের প্রিয় শিষ্য হওয়ার দরুণ তিনি অনেক উচ্চাঙ্গের গান শেখবার সুবিধা পান। নিজে চমৎকার খেয়াল গান। তাঁর গলা শ্রুতিশুদ্ধ। সঙ্গীতে তাঁর অগাধ ব্যুৎপত্তি। তাঁর শাস্ত্র-জ্ঞান, ক্ষুরধার বুদ্ধি ও সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক বিচারশক্তি তাঁর রসবোধকে মোটেই ক্ষুন্ন করেনি—বরঞ্চ প্রশস্ত এবং তীক্ষ্ণই করেছে। মস্তিষ্কের ভারসাম্য-অবস্থা তাঁর আনন্দ উপভোগকে যথাযথভাবে ধারণ ও সমর্থন করে। সঙ্গীত সম্বন্ধে যে কয়জনের কথা মনপ্রাণ দিয়ে শুনতে সকলের তৎপর হওয়া উচিত তাঁদের মধ্যে রবীন্দ্রলাল অন্যতম। রাগ-রাগিণীর বিশ্লেষণে এবং সঙ্গীতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাঁর মতামত অত্যন্ত sensible—যা বর্ত্তমান শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কাছে প্রত্যাশা করা যায়। তিনি উত্তর ভারতের প্রায় সব ভাল গাইয়ে-বাজিয়ের গান-বাজনা শুনেছেন এবং প্রায় সব নামজাদা ঘরানার চালের সঙ্গে পরিচিত। হিন্দুস্থানী-সঙ্গীত-পদ্ধতির গুহানিহিত তথ্য আবিষ্কার করতে যিনি এতকাল কাটিয়েছেন তাঁর পক্ষে গুহার বাইরে এসে দৃষ্টিশক্তির তীক্ষ্ণতা বজায় রাখা যেমনই আশ্চর্য্যের বিষয়, তেমনই সুখের কথা। সঙ্গীতে বংশগত উত্তরাধিকার-সূত্রের কিছু অর্থ আছে বিশ্বাস করি, তাই রবীন্দ্রলালের বংশ-পরিচয় দিলাম। কিন্তু মূলধন ভাঙ্গিয়ে যে খায় তার সর্ব্বনাশ অদূরে। রবীন্দ্রলাল অনুকূল পরিবেষ্টনে এবং সুশিক্ষায় মূলধন বাড়িয়েছেন—তাই তাঁর বইখানির মূল্য অত বেশী।

বইখানিতে একটি ২০ পৃষ্ঠার চমৎকার উপক্রমণিকা আছে। প্রথম অধ্যায়ে আছে প্রাচীন পদ্ধতি অর্থাৎ পাঁচখানি প্রামাণিক গ্রন্থের আলোচনা। তারপর ১৮০ পৃষ্ঠাব্যাপী ৮০টি প্রচলিত রাগের অঙ্গ বা প্রকৃতি ও মেল বা ঠাট বিচার। প্রত্যেক রাগের বিচারেই তিনি শাস্ত্রমত এবং বর্ত্তমান গায়কী-পদ্ধতির তুলনা করেছেন, আরোহী-অবরোহী, রাগের প্রকৃত রূপ, অর্থাৎ বাদী-সম্বাদী, 'পকড়' এবং বিশিষ্ট গতি বিশদ করেই বুঝিয়েছেন। তা ভিন্ন প্রত্যেক রাগেরই ধ্রুপদ, ধামার ও খেয়ালের প্রসিদ্ধ গানগুলির উল্লেখ আছে। বিস্তার ও বিশেষ তান দেখিয়ে দেবার জন্য রাগিণীর প্রকৃতি পরিস্ফুট হয়েছে। বইখানিতে গানের কথা কিম্বা স্বরলিপি লেখা নেই। বাণীগুলি থাকলে বড় ভাল হত। শুদ্ধবাণী সুগায়কের লক্ষণ এবং বাঙ্গালীর উচ্চারণ নিতান্ত খারাপ ও অশুদ্ধ। তা ছাড়া, অনেক গান কবিতাহিসাবেও উপভোগ্য। বাণীগুলি চোখের সামনে থাকলে তাঁর বক্তব্যের দিক থেকেও সুবিধা হত। স্বরলিপি না দেবার অবশ্য একটি গূঢ় তাৎপর্য্য আছে। রবীন্দ্রলাল বিশ্বাস করেন যে আমাদের সঙ্গীতের প্রধান কথা—space-value, তাই নোটেশনে আমাদের রাগিণীর রূপ ততটা ধরা পড়বে না যতটা ধরা পড়বে graph-এর সাহায্যে। রাগনির্ণয়ের প্রথম খণ্ডে এই বিষয়ে আলোচনা নেই, কিন্তু Sangeet (Lucknow) এবং The Music Quarterly (July 1934, New York) নামক জগদ্বিখ্যাত পত্রিকায় তিনি যে দুটি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লিখেছেন আমি তাই পড়ে লিখলাম। পরিচয়ের পাঠকবর্গকে ঐ ইংরেজী প্রবন্ধ দুটি পড়তে একান্তভাবে অনুরোধ করছি। তাতে আমাদের সঙ্গীত সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নতুন কথা আছে, যে-কথা আমাদের ভাবিয়ে তুলবে। অন্য দেশ হলে ঐ প্রবন্ধ দুটি নিয়ে দেশব্যাপী সাড়া পড়ে যেত।

দিলীপকুমার এবং সাহানা দেবীর নতুন পরিচয়ের প্রয়োজন নেই। একটি কারণ হয়ত এই যে দিলীপকুমার অন্ততঃ নিজেই তাঁকে ভুলে যাবার কোন সুবিধাই আমাদের দেন নি। তিনি কবিতা, প্রবন্ধ, নভেল লিখে থাকেন—সে সব নিয়ে বাদ-প্রতিবাদ সর্ব্বক্ষণই চলছে। কিন্তু আমি এই বাদী-প্রতিবাদী দিলীপকুমারের উল্লেখ করছি না। সঙ্গীতে তাঁর দান স্মরণ করার দিন এসেছে। সেই হিসেবে আমি তাঁর পরিচয়-পত্র লিখছি। দিলীপকুমারের কৃপায় বাংলাদেশের মধ্যবিত্তের ঘরে ঘরে সঙ্গীতের আদর হয়েছে, নতুন ঢং-এর প্রবর্ত্তন ঘটেছে, অতুলপ্রসাদ ও ভাৎখাণ্ডেজীর লক্ষণ সঙ্গীত বাঙ্গালা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। আমাদের যুগে দিলীপকুমারই সঙ্গীতের মোড় ফিরিয়ে দিয়েছেন বল্‌লে তিলমাত্র অত্যুক্তি হয় না। তাঁকে যাঁরা সাহায্য করেছিল তাঁদের মধ্যে সাহানা দেবীর স্থান সব চেয়ে উঁচু এবং বেশী। ধ্রুপদের ধারা আসছিল শুকিয়ে, খেয়ালের সঙ্গে কোনকালেই বাঙ্গালীর প্রেম হয় নি; ঠুংরীরও প্রচলন ছিল না, ছিল কেবল টপ্পার। ইতিমধ্যে এলেন দ্বিজেন্দ্রলাল ও রবীন্দ্রনাথ; দ্বিজেন্দ্রলালের রচনায় বিদেশী ও হিন্দুস্থানী সুরের মিশ্রণ হল, রবীন্দ্রনাথের রচনায় মিশল ধ্রুপদ ও দেশী, বিশেষতঃ বাউল। সমাজ কিন্তু তাঁদেরকে সুর-রচয়িতা হিসেবে ধরল না, দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশী গানই লোকে গাইতে সুরু করল (হাসির গানে লোকে হাসত, দুঃখ এই যে লোকে বাড়ী গিয়েও কাঁদত না), তাই তাঁর রচনার মূল্য নির্দ্দিষ্ট হল political। রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক ও প্রেম-সঙ্গীতেরই প্রচার হল, লোকে তাঁর রচনার মূল্য দিলে poetical। রজনী সেনের গানেরও কিছু সুখ্যাতি ছিল ঐ হিসেবে। সাফ কথা এই—সঙ্গীত রচনার মর্য্যাদা আমরা দিতে শিখিনি তখনও। কিন্তু সঙ্গীতে বিপ্লব এসেছিল বিচক্ষণ ব্যক্তি মাত্রই বুঝেছিলেন। সঙ্গীত-সমাজ তখন লুপ্তপ্রায়। রাজা সৌরীন্দ্রমোহনও নেই, ওয়াজিদ আলিও নেই। কোন ক্রমে আশু চৌধুরী ও নাটোরের মহারাজা হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের মর্য্যাদা বজায় রেখেছিলেন। গ্রামের জমিদারবর্গ, বিশেষতঃ গৌরীপুর, মুক্তাগাছা, দিনাজপুরের রাজারা, এ অঞ্চলের গোবরডাঙ্গা, রাণাঘাটের বাবুরা বহু কষ্টে প্রদীপ জ্বালিয়ে রেখেছিলেন—কিন্তু প্রদীপ তখন নিব-নিব। আমাদের দলের জনকয়েক শিক্ষিত যুবক হঠাৎ ধ্রুপদ শিখতে ব্যগ্র হলেন। কিন্তু বিশেষ তাতে ফল হয়েছিল বলে মনে হয় না। ব্রাহ্মসমাজে তখন রবীন্দ্রনাথ, সভাসমিতিতে দ্বিজেন্দ্রলাল এবং পাড়াগাঁয়ে, বিশেষতঃ উত্তরবঙ্গে তখন রজনী সেনের প্রচলন। অতুল সেনের গান শুনে লোক ভাবত রবীন্দ্রনাথের লেখা। সঙ্গীতের অরাজকতা ধরা পড়ল থিয়েটারে। যাত্রায় পূর্ব্বে উচ্চ সঙ্গীতই গাওয়া হত, কিন্তু যাত্রাও হয়ে উঠল ভদ্র। ভদ্রতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন পদ্ধতি গেল ভেঙ্গে-চুরে—অবশিষ্টটুকু রইল ওস্তাদের মুখে, তাঁর শিষ্যবৃন্দের মধ্যে।

এই সময় এলেন দিলীপকুমার। তাঁর ছিল অদ্ভুত মিষ্টি গলা, তান ছিল বিচিত্র, তার উপর সুচেহারা। তিনি দ্বিজেন্দ্রলালের এক ছেলে, বিলেৎ ফেরৎ, উচ্চ ডিগ্রিধারী, পয়সার ভাবনা নেই, অকৃতদার যুবক, সব বাড়ীর দরজা তাঁর জন্য খোলা। উচ্চ সঙ্গীতে তাঁর শিক্ষা ছিল,—অনেক তথাকথিত ওস্তাদের চেয়ে,—শিক্ষানবিশী কালের দৈর্ঘ্য হিসেবে অবশ্য নয়—কারণ তার ততটা প্রয়োজন ছিল না। সঙ্গীত প্রচারের জন্য তাঁর চেয়ে উপযুক্ত সন্ন্যাসী কল্পনা করা যায় না। সব চেয়ে বড় কথা এই—সঙ্গীত সম্বন্ধে তিনি ভাবতেন এবং সঙ্গীত ভিন্ন অন্য নানা বিষয়ে তাঁর ভীষণ আগ্রহ ছিল। তাঁর মতন একাগ্রতা ও জানবার ও শেখবার ইচ্ছা খুব কম লোকেরই থাকে। নানা বিষয়ে জ্ঞান সঞ্চয় হয়ত অনেকেই

করতে চায়, কিন্তু স্বভাবদোষে জ্ঞান সমন্বিত হয় না। দিলীপকুমারের স্বভাবে এমন একটা গুণ ছিল যার জন্য তিনি সমস্ত অর্জ্জিত-বিদ্যাকে জীবনের সঙ্গে যুক্ত করে যাচাই করতেন। গানের বেলাও তাই। সেইজন্য তাঁর প্রচারের পিছনে ছিল একটা থিওরি। থিওরিটি দিলীপকুমার নানা প্রবন্ধে প্রকাশ করেছেন। নবগীতিমঞ্জরীর দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় তার পুনরুল্লেখ রয়েছে। বইখানির প্রত্যেক গানের মূল্য বিচার হবে এই থিওরির বিজ্ঞাপ্তি এবং দৃষ্টান্ত হিসেবে। নতুন সংস্করণে ত্রিশখানি নতুন গানের স্বরলিপি রয়েছে—ভিন্ন ভিন্ন রচয়িতার গান—নতুন, পুরাতন। সুর বসিয়েছেন দিলীপকুমার অনেক গানে, পুরাতন গানের স্বরলিপি করেছেন তিনি ও সাহানা দেবী। মূল সূত্রটি অবশ্য তাঁর থিওরি। অন্ততঃ এই ভাবেই পরিচয়ের জন্য সমালোচনা করা উচিত। টেক্‌নিক্যাল আলোচনার স্থান অন্যত্র এবং বোধ হয় সেই ব্যক্তিরই অধিকারে যিনি দিলীপ-কুমারের মুখে কিংবা অন্য কোন দরদী গায়কের মুখে গানগুলি শুনেছেন। দু একটি গান আমি স্বরলিপি দেখে গাইছিলাম—দিলীপকুমার যদি শুনতেন তাহলে রচয়িতার patent থাকাই উচিত মানতেন। তা তিনি মানেন না—কারণ তাঁর থিওরি অনুসারেই তিনি বলেছেন—'এ-সব গান যেন অনড় অচল করে গাওয়া না হয়।'

দিলীপকুমার বলতে চান—আমাদের সঙ্গীতের প্রধান গুণ হল, সুর-বিকাশের স্বাধীনতা; অথচ বাঙ্গালী কবিতা ভালবাসে, বাংলা গানে কবিত্ব থাকবেই থাকবে, সেটা নষ্ট করলে আমাদের ক্ষতি হবে; কিন্তু সুরে দরিদ্র হলে চলবে না। অতএব—বাংলায় লেখা গানে তানের সুযোগ থাকা চাই—সে গান অনড়, অচল হলে সুরের স্বাধীনতা ও ঐশ্বর্য্য ক্ষুণ্ণ হবে। এই সুযোগ পেলে বাংলা গান খেয়ালের চালে গাওয়া যাবে। মোদ্দা কথা এই—দিলীপকুমার উচ্চ সঙ্গীতকে বাংলা বুলি শেখাতে ও কওয়াতে চান। ব্রজ বুলিও থাক, তবে বাংলাও চলুক। এই হল তাঁর থিওরি। বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে যে দিলীপকুমার মাতৃভাষার প্রতি ভক্তিই দেখাচ্ছেন। তা নয়, কারণ এই মতের মধ্যে অন্য সাঙ্গীতিক আভাস রয়েছে। সেটি এই—ভাল কবিতা যখন গাইবার বিষয় হল, তখন সেই কবিতার ভাবকে খাতির করতে হবে—ভাবটিও অচল, অটল নয়, একই কবিতার মধ্যে ভাবের গতি ও বৈচিত্র্য আছে, অতএব সেই গতি ও বৈচিত্র্যের অনুযায়ী তাল ও সুরেরও পরিবর্ত্তন প্রয়োজন। যেমন অভীপ্সা নামক গানে রামকেলী, ভৈরবী, ভৈরব ও জৌনপুরী পর পর গাইতে হবে। অর্থাৎ বাংলা কবিতার মর্য্যাদা রক্ষার জন্য দিলীপকুমার রাগিণীর সংমিশ্রণেরও পক্ষপাতী। অবশ্য রামকেলী ও ভেঁরো, ভৈরবী ও জৌনপুরী প্রায় সমশ্রেণীর—অতএব তাদের মিশ্রণে গুরুচণ্ডালী দোষ বর্ত্তাচ্ছে না। সবগুলিই প্রভাতী এবং একটি থেকে অন্যটিতে যাবার সময় কান বিদ্রোহী হয় না।

পূর্ব্বোক্ত মতের বিপক্ষে অনেক যুক্তি আছে—সেগুলি প্রধানতঃ ভাষাতত্ত্বের। রবীন্দ্রলাল রায় দু'টির উল্লেখ করেছেন। আমাদের কথায় দীর্ঘ স্বরবর্ণের অভাব এবং ব্যঞ্জণবর্ণের, বিশেষতঃ যুক্তাক্ষরের দৌরাত্ম্য। তা ছাড়া অন্য প্রধান আপত্তি হল এই: কবিতার ভাবের ঠিক্ উপযুক্ত সুর মাথা খুঁড়লে পাওয়া যাবে না—কারণ স্পষ্ট, কবিতায় অর্থ আছে, সুরে ঐ ধরণের কোন অর্থ নেই, যদি থাকত তা হলে অন্ততঃ একটির কোন সার্থকতা থাকত না। তবু লোকে কবিতায় সুর দিয়ে থাকে, এবং মধ্যে মধ্যে সে সুর-দেওয়া কবিতা শুনতেও ভাল লাগে। এ ক্ষেত্রে উপযোগিতায় কোন সাঙ্গীতিক মূল্য নেই, মূল্য-নির্দ্ধারণ করে অভ্যাস ও ঐতিহ্য। দৃষ্টান্ত দিচ্ছি—

মেঘের বর্ণনা আছে কবিতাটিতে—অতএব লাগাও মেঘ কিংবা মল্লার, তবেই লাগবে ভাল, কারণ আমাদের সংস্কার মেঘ কিংবা মল্লার জাতীয় রাগিণীর সঙ্গে বর্ষার সম্বন্ধ স্থাপন পূর্ব্ব হতেই করে রেখেছে। এই সামাজিক সংস্কার অনেক সময় ভুল পথে নিয়ে যায়। একবার পরীক্ষা করেছিলাম একটি বর্ষার গান গেয়ে—ইচ্ছা করেই নীচের শুদ্ধ নিখাদ দিয়ে রিখাবকে বাদী করছিলাম এবং রিখাব থেকে পঞ্চমে না উঠে মধ্যমে উঠছিলাম। শিক্ষিত শ্রোতারা বলেছিলেন, মেঘ-মল্লার গাইছি—কিন্তু গেয়েছিলাম সারং। উপযোগিতা জোর এই সংস্কারগত ঐক্যকে কাজে লাগাতে পারে। তা ছাড়া, কবিতার ছন্দের উপযুক্ত তাল দেওয়াও সোজা নয়, যদিও ভাবের উপযুক্ত সুর বসানর চেয়ে তাল বসান সহজ। তালের পার্থক্যে যে কবিতার সর্ব্বনাশ করা যায় তা অনেকেই জানেন। অতুলপ্রসাদের একাধিক উৎকৃষ্ট রচনা আছে যেগুলি দ্রুততালে গাইলে একেবারে বাজারের সস্তা খেমটা দাদ্‌রা শোনায়।

আর একটি ছোট আপত্তি শুনেছিঃ সুর-বিকাশ ও তান দেবার স্বাধীনতা এক জিনিষ নয়। জোহরা বাই-এর 'কজরা রে' গানটিতে তান দেবার পূর্ব্বেই গৌড় সারং এর রূপ বিকশিত হয়েছে। ফৈয়াজ খাঁর নতুন রেকর্ডে (হিন্দুস্থান) পরজ ও টোড়ি আত্মপ্রকাশের জন্য তান বিস্তারের অপেক্ষা করছেনা। অবশ্য এই আপত্তিরও কাটান আছে; হিন্দুস্থানী পদ্ধতির গতিশীলতার জন্যই তানের সার্থকতা। তবুও কিন্তু স্বাধীনতার সীমা নির্দ্ধারণের দায়িত্ব কাটে না। উপর্য্যুপরি তান দিলে সুরের প্রাণ উড়ে যায় না কি? চন্দন চৌবে লক্ষ্ণৌ-এর আসরে বসে ঠুংরী গেয়েছিলেন, তান না দিয়ে, অথচ সুরও ফুটেছিল, ঠুংরীর রসও জমেছিল—দিলীপকুমার ভ্রাম্যমাণের দিনপঞ্জিকায় নিজেই স্বীকার করেছেন।

কিন্তু ঐ ধরণের যুক্তি সব ভেসে যায় কৃতিত্বের কাছে। সঙ্গীতের সীমানা আছে, কিন্তু সুনির্দ্দিষ্ট নয়। সঙ্গীতে কি হতে পারে না বলা শক্ত, অন্ততঃ কবিতায় কি হতে পারে না তার চেয়ে। সুরেন মজুমদার মহাশয়, দিলীপকুমার ও সাহানা দেবী সে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। অতুলপ্রসাদের মুখেও বাংলা গানে ঠুংরীর রস পাওয়া যেত—তিনি উচ্চারণ বিকৃত করেও গাইতেন না। হয়ত অনেকে বলবেন যে ওঁদের কারুরই চাল প্রথা-সঙ্গত ছিল না—কিন্তু তাতে কিছুই আসত যেত না, রসের দিক থেকে। এমন কোন মানুষ ছিল না যে দিলীপকুমারের মুখে "আজি তোমার কাছে ভাসিয়া যায়" দ্বিজেন্দ্রলালের এই ঝিঁজিট শুনে তৃপ্তি পায় নি। নিশ্চয়ই ফৈয়াজ খাঁ ঝিঁজিট ঐ ভাবে গান না। অবশ্য হিন্দুস্থানী রীতির সঙ্গে মিল ছিল, দিলীপকুমার ঝিঁজিটই গাইতেন। যদিও তাতে খেয়ালের অযথা তান বর্ষণ, গমকের বজ্রনিনাদ থাকত না, থাকত উপযুক্ত সময়ে এবং কথার উচ্চারণ অনুসারে তানের সুষ্ঠু বিভাগ। সে তানও আবার খেয়ালের নয়, টপ্পার। ঠুংরীর মিঠে খোঁচও সে তানকে মুখর কার তুলত। এখন মিলের মাত্রা নিয়েই গোল। খেয়ালিয়ারা প্রধানতঃ একটি রাগিণীতেই গান, একটি গানেই সেই রাগিণীর সমগ্র ঐশ্বর্য্য ভরে দেন, অজস্র তান ছাড়েন। দিলীপকুমার ঐ প্রকার মিল—অর্থাৎ অনুকরণ, চান না। তাঁর মিলের চাহিদা তাঁরই ভাষায় ব্যক্ত করছি। "আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি হল এই যে গানে আমরা প্রধানতঃ চাই সুরকেই, মানে শ্রেষ্ঠ শ্রেণীর গানে। ("শ্রেষ্ঠ শ্রেণীর গানে

বললাম এই জন্য যে, গানেরও নানা স্তর থাকবে ও থাকাই বাঞ্ছনীয়। অচল সুরপন্থী গানের সঙ্গেও তাই আমাদের কোন বিবাদ নেই। আমরা শুধু বলি সে-শ্রেণীর গান ভারতীয় সঙ্গীতে প্রথম শ্রেণীর সৃষ্টি বলে গণ্য হবেনা কোন দিনই, যদিও দ্বিতীয় তৃতীয় শ্রেণীর সঙ্গীতের পর্য্যায়ে এরা খাসা পড়তে পারে। কেউ এসব সঙ্গীতকে তার যথাযথ পর্য্যায়ে ফেললে কোনও বালাইই থাকে না।") আমি দাগ-দেওয়া কথাগুলির প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 'প্রধানতঃ' ও 'মানে' কথা দুটির ব্যবহারে মিলের আপেক্ষিকতা সূচিত হচ্ছে। কিন্তু বাক্য (statement) হিসেবে। আপেক্ষিকতার ধর্ম্ম ও সীমানা দিলীপকুমার ভূমিকায় আলোচনা করেন নি। ভরসার কথা এই যে দিলীপকুমারের অচল সুরপন্থী গানের সাথে কোন বিবাদ নেই। বিবাদ আছে তাঁদেরই সঙ্গে যাঁরা শেষোক্ত শ্রেণীর গানকে প্রথম শ্রেণীর রচনা বিবেচনা, করেন। দিলীপকুমারের শ্রেণী বিভাগের principleটি হল—হিন্দুস্থানী পদ্ধতির প্রকৃতি অর্থাৎ তাল বিস্তারের স্বাধীনতা। যে বাংলা গানে এই স্বাধীনতা আছে—যে বাংলা গান হিন্দুস্থানী রীতির দিকে বেশী ঘেঁষা সেই বাংলা গানই শ্রেষ্ঠ। কম ঘনিষ্ঠতা হলে কম ভাল, নীচু শ্রেণীর।

দিলীপকুমারের পরিমাণ-দণ্ডে নবগীতিমঞ্জরীর কত ওজন? বলা যায় না নানা কারণে। প্রথমতঃ দিলীপকুমারের মুখে গানগুলি শুনিনি। দ্বিতীয়তঃ, খেয়ালে যত রকম তান দেওয়া চলতে পারে ততগুলি তানের স্বরলিপি তিনি দেননি। যা দিয়েছেন সেই দেওয়াটাই অচলতা। তার ওপর যে রূপ আশ্রয় করবে সেটি দিলীপকুমারের প্রদত্ত রূপ নয়—যে গাইবে তারই দান হবে। যদি বেরসিক গায়ক হয় তখন দোষ হবে কার? আংশিকভাবে রচয়িতারই—কারণ বেরসিক পুরুষটি দিলীপকুমারের Carte blancheটি দেখাতে পারবেন। তখন, ন্যায়তঃ দিলীপকুমারকে নীরব থাকতেই হবে। আমার বক্তব্য হল এই যে দিলীপকুমারের মানদণ্ডে রচনার সাঙ্গীতিক মূল্য ও সার্থকতা যাচাই করা যাচ্ছে না। যতক্ষণ কথা ও সুরের পরস্পর উপযোগিতার নিয়মগুলি না আবিষ্কৃত হচ্ছে—যতক্ষণ তান দেবার অবসরটুকু এবং তান থামাবার সময়টি নিরূপিত না হচ্ছে, যতক্ষণ না হিন্দুস্থানী চালের ও বাংলা চালের সন্নিকর্ষণের ক্ষেত্র ও সীমানা নির্দ্ধারিত হচ্ছে, ততক্ষণ যাচাই করা চলবে না। ভারি শক্ত কাজ, কিন্তু এই কাজটি না সম্পন্ন হলে দিলীপ-কুমারের বক্তব্য সম্বন্ধে কিছুই বলা উচিত নয়। মাত্র দিলীপকুমারের বক্তব্য আছে এই খবরটি শোনা ও দেওয়া চলে।

তা হলে দাঁড়াল এই: দিলীপকুমার বলছেন বাংলা গানে হিন্দুস্থানী ঢং চলবে। কিন্তু রবীন্দ্রলাল বলছেন, চলবে না—হিন্দুস্থানী পদ্ধতিতে যে সব গান গাওয়া হয় তাতে কথা বাহন মাত্র—সুর প্রকাশের ছুতো ছাড়া অন্য কিছু নয়; এবং বাংলা গানে ভাবের ও অর্থের প্রাধান্য থাকবেই থাকবে,—অন্ততঃ শ্রোতা সে অর্থ গ্রহণ না করে থাকতেই পারবে না। রবীন্দ্রলালের আপত্তি শুদ্ধ সুরের তরফ থেকে—যার আদর্শ হল বীণার বাক্যহীন আলাপ। এই আপত্তির মূলে একটি বিশ্বাস আছে—আনন্দ উপভোগের জন্য শক্তির মাত্রা নির্দ্দিষ্ট, তাতে যদি কথা ভাগ বসায় তা হলে সুরের ভাগে টান পড়ে। শক্তিকে যদি fund ভাবি, তা হলে আমরা রবীন্দ্রলালের যুক্তি সমর্থন করতে বাধ্য। (Spearman তাঁর Creative Mind নামক Psychology-র বইএ লিখেছেন···

'that the mind acts as if it disposed of a fixed amount of general energy')। কিন্তু ইকনমিক্‌সে এই fixed fund-এর লজিকে বিশ্বাস করে ভীষণ ক্ষতি হয়েছিল—তাই আজকাল flow-এরই উপমা দেওয়া হচ্ছে—যেমন নদীর স্রোত—এক আধ ঘটি তুলে নিলে স্রোতে ভাঁটা পড়ে না। রবীন্দ্রলাল একাধিক প্রবন্ধে এই স্রোতেরই ইঙ্গিত করেছেন। তাঁর মতে আমাদের রাগ-প্রকাশের মর্ম্মই হল continuous transition—এতে স্বরের স্বকীয়তা রাগিণীর গতিরূপের ওপরই নির্ভর করে। এখানে রবীন্দ্রলাল flow-এ আস্থাবান, কিন্তু আনন্দ উপভোগের বেলা নন, তখন তিনি শক্তির বাটোয়ারাকে প্রশ্রয় দেন না।

অন্য আরো একটি দিক আছে। কবি তার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। বাংলার সংস্কৃতি সমন্বয়-সাধন, বাঙ্গালী মাত্র অনুকরণে সন্তুষ্ট নয়, সে নতুন কিছু রস-সৃষ্টি না করেই ছাড়বে না, রস-সৃষ্টির দিকেই তার ঝোঁক বেশী, মাত্র সুরের দিকে নয়, কবিতার প্রতিও নয়। তাই সে গেয়েছে কীর্ত্তন, বাউল, ভাটিয়াল, বিদ্যা-সুন্দরের গান, রামপ্রসাদী ও নিধুবাবুর টপ্পা। বাঙ্গালীর রসজ্ঞান আছে—সে কেবল কথার কিংবা তানের ভক্ত নয়। হিন্দুস্থানী চালে যে বাঙ্গালী ওস্তাদ অভ্যস্ত তিনিও রসিক, তাই তিনি ভাল রচনাই গেয়ে থাকেন, গান ও সুর নির্ব্বাচন করে গান, সে রচনার (বনাম বন্দেশের) মেজাজ বুঝে গান করেন, একই গানে রাগিণীর সমগ্র ঐশ্বর্য্য দেখাতে তৎপর নন, ভিন্ন ভিন্ন রচনার সাহায্যে রাগিণীর ভিন্ন ভিন্ন রূপ দেখান। সব চেয়ে বড় কথা বাঙ্গালী ওস্তাদ থামতে জানেন। এক কথায়, রচনার প্রতি বাঙ্গালী ওস্তাদের শ্রদ্ধা আছে আন্তরিক, অথচ রাগিণীর প্রতি তাঁর অশ্রদ্ধা নেই। মোটামুটি দিলীপকুমারও বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্য মানেন। তিনি লিখছেন, "এই হল বাংলার বৈশিষ্ট্য —এই কাব্য ও সুরের পরিণয়। বাংলার বৈশিষ্ট্য এ নয় যে সে সুরে দরিদ্র হবে। ঐশ্বর্য্যই মানুষের বৈদগ্ধ্যের সত্য বৈশিষ্ট্য,—দারিদ্র্য নয়। বাংলার বৈশিষ্ট্য এই যে সে কথার সঙ্গে সুরের সমন্বয় করে সৃষ্টি করল এক নতুন সুর-কাব্যের গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গম।" দিলীপকুমার এই বৈশিষ্ট্যের পরিণতিতেই বাংলা সঙ্গীতের ভবিষ্যৎ নিহিত আছে স্বীকার করেন—যাঁরা এই বৈশিষ্ট্যে আস্থাবান নন, তাঁদের সঙ্গে দিলীপকুমারের বিরোধ মূলগত—fundamental। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলে মনে হয় যে দিলীপকুমারের বিশ্বাসটি খুব দৃঢ় নয়। কারণ তিনি লিখছেন—'বাংলার বৈশিষ্ট্য এ নয়—হ'তেই পারে না—যে সে (?) সুরে দরিদ্র হবে।' যদি সমন্বয়-সাধনের ফলে 'নতুনত্বের' কোন সার্থকতা থাকে তা হলে সুরের কোন স্বাধীন সত্তাই রইল না, অতএব তার ঐশ্বর্য্য থাকলেই বা কি, গেলেই বা কি? এই নতুন বস্তুটি যদি eclectically তৈরী হয়ে থাকে, কিংবা পাটীগণিতের যোগের নিয়মে সৃষ্টি হয়ে থাকে, তবেই একটি সংখ্যার হ্রাসে অন্য সংখ্যাটির বৃদ্ধির প্রয়োজন, নচেৎ যোগফল সমান থাকে না। কিন্তু নতুন কথাটি synthetic অর্থে-ই ব্যবহৃত হওয়া উচিত, অর্থাৎ আমাদের বোঝা উচিত যে সমন্বয় শেষ প্রক্রিয়া নয়, আমাদের জানা উচিত যে সমন্বয়, কিংবা পরিণয়ের ফলে অ-পূর্ব্ব রস-রচনাই উৎপন্ন হয়েছে। আমার বিশ্বাস—এইটাই হল কবির সঙ্গীত বিষয়ে একটি প্রধান বক্তব্য। সে যাই হোক দিলীপকুমারও যখন সমন্বয়-সাধনেই আমাদের বৈশিষ্ট্য মানেন, তখন, ন্যায়ত ধর্ম্মত তিনি সুরের দারিদ্র্য কিংবা ঐশ্বর্য্যকে সমন্বিত-নতুন-ঐক্যের বিচার-দণ্ড হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন না। কিন্তু তাই তিনি করছেন, সেইজন্যই

আমার সন্দেহ হয়েছে, যে তাঁর সমন্বয় synthetic কিংবা organic নয়, যে তাঁর উল্লিখিত সমন্বিত বাংলা-রচনাকে সুরে-বসান কবিতা হিসেবেই তিনি বিচার করেন।

তা ছাড়া ঐশ্বর্য্য কথাটিতে আমার একটি ব্যক্তিগত আপত্তি আছে। 'ঐশ্বর্য্যই মানুষের বৈদগ্ধ্যের সত্য বৈশিষ্ট্য,—দারিদ্র্য নয়।' চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ-এর স্থাপত্য দেখে দেখে—বড় বড় ওস্তাদের কেরামতী (virtuosity), দিলীপকুমারেরই ভাষায় গমকের বদলে 'ধমক' শুনে শুনে, নিজেরই পূর্ব্বেকার লেখা পুনরায় পড়ে, আমেরিকায় ধনিকতন্ত্রের দুর্দ্দশা দেখে আমার মনে হয় যে ভদ্রতা ও সংযমই বৈদগ্ধ্যের—সত্য বৈশিষ্ট্য নয়—একমাত্র নিদর্শন। ঐশ্বর্য্যের দোষই হল এই যে সে নিজেকে প্রকাশ না করে থাকতে পারে না। দিলীপকুমার নিজে এইজন্যই ক্রোড়পতি মাড়োয়ারীর বাড়ি গাইতে রাজি হননি, নসীরুদ্দিনের ঘণ্টাব্যাপী গমক্ শুনে উত্যক্ত হয়েছিলেন। সুরেন মজুমদারের ছিল এই সংযম, এই ভদ্রতা, এই হিসাব-জ্ঞান। সেইজন্যই কি দিলীপকুমার তাঁর গানের ভক্ত ছিলেন না ?

বলা বাহুল্য নতুনত্ব ও সমন্বয়-সাধনের যুক্তি কিংবা গঙ্গা-যমুনা সঙ্গমের উপমায় হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের মাধুর্য্য,কি গাম্ভীর্য্য কিছুই বাদ পড়ছে না—বাদ পড়ছে ওস্তাদের ঐশ্বর্য্য দেখাবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা ও অবকাশ। এই আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্তির সুযোগ না দেওয়াই ভাল। এমন কী বাঁধা-ধরা নিয়ম আছে যে এই সুযোগটি না দিলে কিছুতেই সুরের বিকাশ হবে না। রাগিণীতেও অনেক প্রকার সীমা মেনে চলতে হয় না কি ? অবশ্য, এই ধরণের যুক্তিই অবান্তর, কারণ অতুলপ্রসাদ, রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল প্রভৃতির সঙ্গীত রচনায় আমি হিন্দুস্থানী রাগিণীর continuous transition প্রত্যাশা করি না। তবে যা প্রত্যাশা করি এবং উপযুক্ত গায়কের কাছে যা পাই সেটি সঙ্গীতেরই রস— এ বিষয়ে আমার মনে কোন দ্বিধা নেই। কথাটা নিতান্তই সোজা—রস, এমন কি সঙ্গীতের রস এক অখণ্ড বস্তু নয়, ভিন্ন প্রকারের—ধ্রুপদ, খেয়াল, ঠুংরীর রস সবই পৃথক—এমন কি একই রাগিণীর ভিন্ন গান ভিন্ন রস সৃষ্টি করে। মিঁয়া কি মল্লারের—'বরষণ লাগিরে বদরিয়া' এবং 'বোলিরে পাপাইয়া' দুই মধ্যলয়ে, দুই ত্রিতালী—তবু কত তফাৎ! আশ্চর্য্য নয়, কারণ দুটিই শ্রেষ্ঠ রচনা এবং দুটিরই পৃথক সত্তা আছে এবং আছে বলেই অত ভাল। প্রত্যেক গানের মর্য্যাদা রাখা চাই, নচেৎ তেলানা, কিংবা আলালিয়া, তুম্ তানানা উচ্চারণ করেই মিঁয়াকি গাওয়া চলে। (তেলানারও কি বন্দেশ নেই ?) ভাল ওস্তাদে স্বাতন্ত্র্যের মর্য্যাদা রক্ষা করেন, সেইজন্য বন্দেশ অনুসারে তান-কর্ত্তব করেন, যেখানে সেখানে তান ছাড়েন না, তানের বাহাদুরী অর্থাৎ গলার ও সুরের ভঙ্গী-বৈচিত্র্য দেখাবার জন্য সাধারণতঃ তেলানাই গেয়ে থাকেন। না হয়, অন্য প্রকার রচনাই গান, যাতে কথার সামান্যতা ও অর্থশূন্যতায় কেরামতীর 'ফুরসৎ' মেলে এবং শ্রোতার মন সুরের ছক্ শোনবারই জন্য ব্যগ্র হয়। নচেৎ বিলম্বিত খেয়ালে বেশী তান দেওয়া ও তালের বাহাদুরী দেখান সঙ্গত নয়। ধ্রুপদের বেলাও তাই, গোড়ায় জোর একটু আলাপ করে তারপর সোজাসুজি গান গাওয়াই রীতি। ধ্রুপদ-ধামারে বাটোয়ারা দেখাবার জনাও বিশেষ গান আছে। ঠুংরীতেও তাই—কীর্ত্তনে যেমন বিরহ, মান প্রভৃতি ভাব আছে ঠুংরীতেও তেমনি নায়িকার ভাব বজায় রেখে গাইতে হয়। এ কথা আমি খুব বড় গাইয়ের মুখে এবং মৈজুদ্দিন, গিরিজা বাবুর গলাতেও শুনেছি। বন্দেশের মেজাজের সঙ্গে

গায়কের মেজাজ বাঁধা চাই, তবেই মজা হয়। অতএব প্রত্যেক রচনারই এক একটি রস আছে এবং সঙ্গীত-রস আনতে গেলে সেই আদিম রসকে নেড়ে গাঁজিয়ে দিলে চলে না। পাঠকবর্গ আপত্তি করতে পারেন—তা হলে রসের অর্থ কি? আমার উত্তর—অর্থ আছে, তবে রূপভেদে এতই ভিন্ন যে কথাটি আলোচনা থেকে তুলে দিলে কোন ক্ষতি হয় না। অন্য কথা যোগায় না, তাই লিখতে বাধ্য হয়েছি।

ঐশ্বর্য্য দেখাবার প্রবৃত্তিকে দমন করবার পর রসের গুণ-বিচার সম্ভব হয়। শ্রেণী বিচার লিখলাম না, কারণ classification বুদ্ধির একটি লক্ষণ হলেও, শ্রেষ্ঠ নিদর্শন নয়। যাঁরা বুদ্ধিবাদী নন তাঁরা আমাকে সমর্থন করবেনই। দিলীপকুমার ত নিশ্চয়ই। রস-বিচার সম্বন্ধে গোড়ার কথা হল এই, আমাদের কাছে যে রূপ পূর্ব্ব হতেই পরিচিত তারই পুনর্ব্বার পরিচয়ে আমাদের উপভোগে বাধা পড়ে না। পুনরাবৃত্তিতেই যে উপভোগের মাত্রা বৃদ্ধি পায় তা বলছি না—কিন্তু অভ্যস্ত রূপই বেশী আরামপ্রদ। অপরদিকে—উদ্ভটত্বেরও এক প্রকার মোহ আছে—তার কাজ চমকে দেওয়া, মনকে জাগিয়ে তোলা। চমকে কিংবা জেগে উঠলেই যে আনন্দ বাড়ে তাও নয়। এই দুটি প্রক্রিয়ার মধ্যে পূর্ব্ব পরিচয়ের আনন্দই অপেক্ষাকৃত সহজগম্য। পূর্ব্ব পরিচয়কে বাদ দেওয়া যায় না—মন কিছুতেই স্বধর্ম্মত্যাগ করিতে চায় না। রস উপভোগের প্রক্রিয়ার মধ্যে একটা release of tension থাকেই থাকে, অভ্যস্ত প্রণালীতে সেই release সম্ভব হলে শুদ্ধ রসভোগের অন্তরায় দূরীভূত হয়। অতএব পূর্ব্ব পরিচয়কে কাজে লাগানই সুবিধার। কোন বিদ্রোহীই পূর্ব্বতন সংস্কারের এই সুবিধাকে পরিত্যাগ করেন না। যিনি ধারার বিপক্ষে যাচ্ছেন তাঁর কাজেও সেই ধারার অস্তিত্বই প্রমাণিত হচ্ছে। বিপক্ষে সাঁতার কাটার অর্থ নেই—কিসের বিপক্ষে তাই দেখতে হবে। ডন্ কুইক্‌সটের হাওয়া-কলের বিপক্ষে অভিযান হাস্যকর ঘটনা। তেমনি কিসের সঙ্গে আমাদের পূর্ব্ব পরিচয় বুঝতে হবে। হিন্দুস্থানী সঙ্গীত পদ্ধতির সঙ্গে, না রবীন্দ্রনাথ ও দিলীপকুমার যা বলেছেন সেই বাঙ্গালীর কীর্ত্তি—অর্থাৎ সুর ও কথার পরিণয় সাধন, গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমের সঙ্গে? এই তত্ত্বের মীমাংসা করবেন সমাজতাত্ত্বিকেরা। প্রশ্নটা সঙ্গীত সংক্রান্ত হলেও বস্তুতঃ সমাজতত্ত্বের।

আমি গণমন মানি না, সংস্কৃতির ধারা ও রূপের অস্তিত্ব মানি। বাংলা-কৃষ্টির ধারা আছে। রূপটি আমার কাছে প্রকট নয়—কারণ দুটি; প্রথমতঃ জাতির চরিত্র কি ব্যক্ত করা যায় না, দ্বিতীয়তঃ, সমন্বয়-সাধন, পরিণয়, সঙ্গম, মানি বলেই তার পরিণত রূপটি হৃদয়ঙ্গম করতে পারিনা। এক কথায়, বাংলার পরিশীলনে এখনও ইস্তফা পড়েনি। Typical বাঙ্গালী কল্পিত বস্তু।

তা ভিন্ন বৈশিষ্ট্য-আবিষ্কার বড় গোলমেলে ব্যাপার। অন্য দেশের লোকেরাও বলতে পারে যে তারা সমন্বয় করেছে—বম্বাই মাদ্রাজ—কোন দেশ করেনি? ইংরেজও করেছে। সংস্কৃতির ইতিহাসই হল এই সাধনার ইতিহাস। তবু রূপ ভিন্ন। Race-এর জন্য? Race কথাটির অর্থ ও সূচনা মোটেই পরিষ্কার নয়। যে সব ধারা মিশেছে তারই প্রকৃতির পার্থক্যের জন্য রূপ ভিন্ন। আমাদের বাংলা সঙ্গীতে হিন্দুস্থানী পদ্ধতি নিশ্চয় মিশেছে। কিন্তু হিন্দুস্থানী পদ্ধতি একটি নয়, তার ধারাও ছিন্নভিন্ন। রবীন্দ্রলাল রায় প্রত্যেক রাগিণীর শাস্ত্রোক্ত ও ঐতিহাসিক রূপের সঙ্গে বর্ত্তমান রূপের তুলনা-মূলক বিচার করে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে শাস্ত্রোক্ত পদ্ধতির রূপান্তর

ঘটেছে, 'ঘরানা' বা 'খানদানির'ও মূল্য খুব বেশী নয়, এবং অনেক সুন্দর মৌলিক সৃষ্টি নাম ভাঁড়িয়ে পিতৃপুরুষের দোহাই-এ চলছে। রবীন্দ্রলাল fiction-এর উল্লেখ করেন নি—কিন্তু করলেও চলত। তবুও রবীন্দ্রলাল আমাদের উত্তরাধিকার বুঝে স্বাধিকারী হতে বলছেন। কিন্তু পুরাতন সম্পত্তির কোন অংশকে উত্তরাধিকারী ভোগ করবেন? উত্তরাধিকারের কোন অংশের সঙ্গে বংশ পরিচয়? দিলীপকুমার ও রবীন্দ্রলালের হল খেয়াল টপ্পার সঙ্গে, রবীন্দ্রনাথের হল ধ্রুপদ, বাউলের সঙ্গে।

সমন্বয়-সাধন যদি বাঙ্গালীর মানসিক ইতিহাসের একটি প্রধান ঘটনা হয় তা হলে ন্যায়তঃ কথা-সঙ্গীতের (কিংবা অর্থ সঙ্গীতের) রস আমরা সহজেই উপভোগ করতে পারব। সাধারণ বাঙ্গালী শ্রোতা সেই রসই উপভোগ করে থাকেন। তবে সেটা হিন্দুস্থানী চালের রস গ্রহণ করার অক্ষমতার জন্যও হতে পারে। অবশ্য এমন বাঙ্গালী শ্রোতাও জানি যাঁরা বাংলা গান সহ্য করতে পারেন না—অথচ হিন্দুস্থানী সঙ্গীত সম্বন্ধে নিতান্তই অনভিজ্ঞ। দুই ক্ষেত্রেই দাম্ভিকতার জন্য অসহনীয়তা আসতে পারে। একধারে অজ্ঞতা ও অক্ষমতার rationalisation—কথাটি দিলীপকুমার ব্যবহার করেছেন—অন্যধারে অ-সাধারণত্বের দাম্ভিকতা—এই দুই সীমার মাঝে পরিচয় এবং সেই পরিচয়ের সম্পর্কেই উপভোগের মাত্রাবৃদ্ধি।

তবুও কিসের সঙ্গে পরিচয় আমি লিখতে পারলাম না—কেবল গণ্ডী কাটলাম। উত্তরাধিকারের রূপ ভিন্ন হলেও একটি সূত্র যেন কোথাও লুকিয়ে আছে। আভাস দিচ্ছি। রবীন্দ্রলাল রায়ের ভাষায় পূর্ব্বকার রাগ কি ভাবে গাওয়া হত বলা যায়না, তবে আজকালকার প্রচলিত রাগের প্রকৃতি হল—a combination of continuous transition and musical curves। প্রত্যেক curve হল spatial, temporal নয়। এই সাতত্যের জন্যই মনে হয় যেন স্বরগুলি একটি স্থান হতে অন্য স্থানে চলে যাচ্ছে। "The continuous change gives us the conception that the same musical tone is moving from place to place or varying in pitch, as related to a fundamental tone or given point of reference. Therefore the tones are not percieved as different entities, but the sensation is that of a single tone moving, leaving the impression of the path traversed...discontinuous changes give us the idea of recurrence and rhythm. Thus in its Ragas Hindusthani music has essentially developed the aesthetic appeal of spatial movements।" অবিরাম স্থান পরিবর্ত্তনের জন্য আমরা স্বরের গতি কোথায় জানবার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকি। রবীন্দ্রলাল space-value এবং time-value, continuity এবং successionকে একেবারে পৃথক করেননি। কিন্তু তাঁর equation দুই থেকে তৃতীয় co-ordinateটি বাদ পড়েছে—সেটি হল meaning, অর্থ। যে সমালোচক এই রাগের space-value, তালের time-value এবং ভাষার meaning মিশিয়ে equation দিতে পারবেন তাঁরই হাতে বাংলা সঙ্গীত রচনার মূল-প্রকৃতি ধরা পড়বে। সে আশা পূরণ হতে অনেক দেরী।

অঙ্কের ভাষা ছেড়ে দিলেও বোঝা যায় যে সুর ও কথার পরিণয়ের কিংবা সমন্বয়ের

ফলে যে বস্তুটি তৈরী হয় সেটি নতুন বস্তু, অতএব, নতুন বলেই তার বেলা ভাষাতত্ত্বের আলোচনা এবং রাগিণীর সূক্ষ্ম বিচার উভয়ই অবান্তর। যে নতুন emerge করছে তার আছে পৃথক সত্তা, যেমন chemical combinationএ, বহুব্রীহি সমাসে। একদল জীবতাত্ত্বিক বলছেন জীবনেরই নিয়ম এই—একদল মনোবৈজ্ঞানিকও বলছেন, উচ্চাঙ্গের মানসিক ক্রিয়ার ধর্ম্মই এই অখণ্ডতা। নতুনের রূপ পুরাতনের মধ্যে নেই; জলের রূপ হাইড্রজেনেও নেই, অক্সিজেনেও নেই; বৃক্ষ+আরূঢ়=বৃক্ষারূঢ়, অর্থাৎ বাঁদর—বাঁদরের রূপ গুণ গাছেও নেই, গাছে চড়াতেও নেই, organic বস্তু inorganic-এর মধ্যে নেই, মনও নেই organic-এর মধ্যে, আবার spiritও নেই matter কি mind-এর সংজ্ঞায়। অতএব নতুনের বিচার হবে তার নিজের terms-এ। অর্থাৎ দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ ও রবীন্দ্রনাথের রচনার বিচার হবে নিজের সংজ্ঞায়। কতটা শুদ্ধ রাগিণী রয়েছে এবং কতটা বাউল মিশেছে দেখাবার কোন আবশ্যক নেই। হরগৌরী=হর+গৌরী নয়। বাপের আদুরে মেয়ে+মায়ের আদুরে ছেলে=নতুন সংসার নয়। নতুন রচনার উৎপত্তির ইতিহাসও ঐ প্রকার তর্কনীতির সমর্থন করে। অতুলপ্রসাদ ও রবীন্দ্রনাথের রচনা-পদ্ধতি একই ধরণের। আগে সুর পরে কথা, কিংবা আগে কথা পরে সুর বসান তাঁদের রীতি নয়। সুর ও কথা যমজের অপেক্ষা নিকট ও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ। অনেকটা প্রতিমায় রং ও রূপের মতন মূর্ত্তির অন্তর থেকে রং ফোটানর মতন।

আমার সন্দেহ এই যে দিলীপকুমার ও রবীন্দ্রলাল নতুন সৃষ্টির পৃথক সত্তার মর্য্যাদা দেননি। অবশ্য সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা দুজনেই মুক্ত হস্তে স্বীকার করেছেন। রবীন্দ্রলাল লিখছেন: "এই ঐতিহাসিক আলোচনার উদ্দেশ্য আমাদের উত্তরাধিকার বুঝে নেওয়া। এই উত্তরাধিকার আঁকড়ে বসে থাকার কোন অর্থ নেই, কারণ প্রতি যুগে উত্তরাধিকার যতদিন স্বাধিকার হয়ে না ওঠে ততদিন তা বিকাশের পথে বিঘ্ন।" কিসের বিকাশ? নিশ্চয়ই সৃষ্টির একমাত্র অধিকার সৃষ্টিরই। কেবলমাত্র তান দেবার নয় নিশ্চয়। এইখানেই দিলীপকুমারের সঙ্গে রবীন্দ্রলালের মতভেদ। দিলীপকুমারও স্বাধিকারী। তাঁর মতে অধিকারের অর্থ 'গানে নিত্য নতুন বৈচিত্র্য আনা স্বাধীনতা'? কিসের বৈচিত্র্য? তান দেবার, রাগিণী মেশাবার। কিন্তু বৈচিত্র্য আনবার অধিকারের পূর্ব্বে রয়েছে সৃষ্টি করবার স্বাধীনতা। পরেও রয়েছে—কারণ, তান দিতে দিতে, অন্য রাগিণী মেশাতে মেশাতে, বাংলার বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে সুরের ঐশ্বর্য্য আনতে আনতে ('বাংলার বৈশিষ্ট্য এ নয়—এ হতেই পারেনা যে সে সুরে দরিদ্র হবে')। নতুন সৃষ্টি হবেই হবে। দুজনেই সৃষ্টির স্বপক্ষে, কেননা, দুজনেই সুশিক্ষিত এবং মেজাজে আধুনিক। কিন্তু রবীন্দ্রলালের সৃষ্টি হিন্দুস্থানী সুর-বিকাশ পদ্ধতিতেই আবদ্ধ, দিলীপকুমারের সৃষ্টি বাংলা-রচনায় প্রসারিত। তবু দুজনেই, অন্য বিদ্রোহীর মতন, অন্যান্য স্বাধিকারপ্রমত্তের মতন, বিদ্রোহ-প্রসূত সৃষ্টির পৃথক অস্তিত্ব স্বীকার করতে নারাজ, দুজনেই পূর্ব্বকার অংশের উপযুক্ত বিচার-পদ্ধতি নতুন সৃষ্টির বেলা খাটাতে তৎপর, দুজনেই বিদ্রোহের শেষ বেশ দেখতে নারাজ।

রবীন্দ্রলাল হিন্দুস্থানী-সঙ্গীত-পদ্ধতির অন্তরে যথেষ্ট elasticity আছে ভাবেন, যদিও তার বাইরের কঠিন আবরণ (তাঁর ভাষায় ওস্তাদী formula) অন্তরের গতিকে রুদ্ধ করে স্বীকার করেছেন। অতএব রবীন্দ্রলালের বিদ্রোহ গতিরোধক

আড়ষ্টতারই বিপক্ষে। দিলীপকুমার বাঙ্গালী হয়ে ভিন্ন দেশে তাঁবু গাড়তে চান, যুদ্ধ করা তাঁর অভিপ্রায় নয়, সমপদস্থতা অর্জ্জন করাই তাঁর উদ্দেশ্য। এ যেন scientific management আর social democracyর প্রভেদ।

রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের সঙ্গে কিন্তু দিলীপকুমারের বক্তব্যের বেশী মিল। তিনিও বিদ্রোহী, তবে তিনি বলেন স্বাধিকার-চর্চ্চার ফলকে প্রথমে পৃথক সত্তা দিতে হবে, অবশ্য তৃতীয় co-ordinate অর্থাৎ অর্থকে গ্রহণ করে। রবীন্দ্রনাথ বলেন যে তাঁর গানের রসই ভিন্ন। তিনি এক হিসেবে দিলীপকুমারের বক্তব্যেরই জের টানেন। আমারও বিশ্বাস দিলীপকুমারেরও সঙ্গীত-রচনার রস ভিন্ন, হিন্দুস্থানী পদ্ধতিতে রচিত খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরীর রস থেকে। তিনি নিজেই লিখেছেন তাঁর গানকে ঠুং-খেয়াল বলা চলে। আমার এই নামকরণে এক ভাষা ছাড়া, অন্য কোন আপত্তি নেই। সুরেনবাবুও গাইতেন টপ্ খেয়াল, বামাচরণ বাবু গাইতেন ধ্রুপ্ খেয়াল। স্বাধিকারের principleকে, এবং উত্তরাধিকারকে অধিকারে পরিণত করার ফলে যে নব-নব রূপ প্রকাশিত হয়, তার অস্তিত্ব মানতে আমার তিলমাত্র দ্বিধা নেই। গুণগত বিচার তার পরের কথা। অর্থাৎ সেই নতুন সমন্বয়ের, নতুন emergent qualityর নতুন সংজ্ঞানুযায়ী বিচার স্বরলিপি দেখে অসম্ভব। দিলীপকুমার সাহানা দেবীর গলাতে শুনতে চাই—নেহাৎ না হয়, অন্য কোন দরদী গাইয়ের। আন্দাজে বলছি—হারীন্দ্রনাথের আলসী হুঁ এবং দিলীপকুমারের ঝলকি মা ও শ্রীরাধা ভাল লেগেছে। পুরাতন রচনার মধ্যে সবগুলিই প্রায় তাঁদের মুখে শোনা। সেগুলি সত্যকারের উচ্চাঙ্গের সৃষ্টি।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ও দিলীপকুমারের বক্তব্যের পার্থক্য অন্য হিসেবে অপেক্ষাকৃত গভীর। Social Democracy এবং Communismএর প্রভেদের মতন। কবি বলছেন, বাংলা রচনা আর হিন্দুস্থানী চালের গান এক বস্তুই নয় যেকালে তখন সমপদস্থতা অর্জ্জন করার চেষ্টা বৃথা। বাংলা রচনার প্রকৃতিই যেকালে তাকে পৃথক সত্তা দান করেছে তখন হিন্দুস্থানী পদ্ধতির সঙ্গে মিল ও গরমিল দিয়ে তাকে বিচারের সামগ্রী ভাবতে সৃষ্টির আত্মসম্মানে আঘাত লাগে। তবে পৃথক মানে এ নয় যে তার মধ্যে খুঁজলে পুরাতনের আমেজ পাওয়া যাবেনা। পৃথক বস্তু ইতিহাস বহির্ভূত নয়, বরঞ্চ ইতিহাসের তাগিদেই তার উৎপত্তি। হয়ত এই সব সঙ্গীত-রচনায় পুরাতনের অঙ্গ পাওয়া যাবে—কিন্তু সৃষ্টির সম্পর্কে এসে পুরাতন তার জাত খুইয়েছে।

সমালোচনা ও প্রবন্ধের মধ্যে পার্থক্য আছে তাই নিজের মত লিখলাম না। রাগনির্ণয় বইখানির উচ্চ প্রশংসা করে এই সুদীর্ঘ সমালোচনা শেষ করি। এমন বই বাংলা ভাষায় বিরল। বই হিসেবেও নতুন সৃষ্টি (এমন কি ছাপার ভুল পর্য্যন্তও—কিন্তু এত বেশী ভুল লজ্জাকর)। অনেকের ধারণা হতে পারে যে রবীন্দ্রলাল ভাতখাণ্ডেজীর পদ্ধতি নকল করেছেন। মোটেই না। পণ্ডিতজীর ঠাট (মেল) বন্ধন গ্রহণ করলেও বিচার-পদ্ধতি এবং সরল লিখনভঙ্গী রবীন্দ্রলালের নিজস্ব, সম্পূর্ণ নিজস্ব। পণ্ডিতজীর প্রবর্ত্তিত পদ্ধতির সঙ্গে আমার সামান্য পরিচয় আছে বলেই এ-কথা জোর করে লিখলাম।

দিলীপকুমার ও সাহানা দেবীর বইখানির টেকনিক্যাল বিচার করবার সুযোগ

নেই বলে দুঃখিত। নবগীতিমঞ্জরীর বহুল প্রচার কামনা করি, কারণ দিলীপকুমারের সঙ্গীত সম্বন্ধে দানের বৈশিষ্ট্য ও ঐতিহাসিক মূল্য আছে। এযুগে বাংলা দেশের সঙ্গীতের ইতিহাসে তাঁর স্থান ছিল এবং আমরা সকলে রাতারাতি যদি অকৃতজ্ঞ না হয়ে যাই, তাহলে মানতে বাধ্য যে সে স্থান থাকবে। অতএব তাঁর মতামতকে সশ্রদ্ধভাবে গ্রহণ করতেই হবে। মাত্র এইটুকু বলি—তিনি যদি যুদ্ধক্ষেত্রের বাইরে দাঁড়ান, তাহলে তিনি নিজেই বুঝবেন—যে-'মহাসত্যের' জন্য তিনি নির্ভয়ে মত প্রকাশ করতে সদাই প্রস্তুত, সেই মহাসত্যই—সেই সৃষ্টির স্বাধীনতা, সেই উত্তরাধিকারকে অধিকারে পরিণত করার সাধনাই—তাঁকে ও তাঁর কল্পিত বিপক্ষকে একগোত্রে বেঁধেছে। তাঁর সঙ্গে তাঁর বিপক্ষের মিলই বেশী। জাতি ব্রাহ্মণ হলে রাঢ়ী-বারেন্দ্রতে বিবাহ চলতে পারে। বাদী প্রতিবাদী কি দুদলই justice মানেন না? এক্ষেত্রে দুপক্ষই সৃষ্টির তাগিদ মানছেন। রবীন্দ্রলাল বলছেন—সৃষ্টি সম্ভব, তবে বাংলা ভাষায় ঐ প্রকার সৃষ্টি হবেনা, দিলীপকুমার বলছেন—সৃষ্টি হবে এবং হওয়া চাই, তবে তাতে বাংলার সমন্বয়-সাধন বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সুরের স্বাধীনতাও থাকা চাই, এবং রবীন্দ্রনাথের দল বলছেন, সৃষ্টিটাই নতুন, অতএব তার অলঙ্কার তার নবত্বের অন্তরেই নিহিত। অতএব বিরোধটা মূলগত নয়।

ধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

A Hope for Poetry—by Cecil Day Lewis (Blackwell).
Aspects of Modern Poetry—by Edith Sitwell (Duckworth).

যুগে যুগে নবীন কবি যুগান্তের সঞ্চয়কে উপেক্ষা করিয়াছে, নীড়ের স্নিগ্ধ শান্তি ও নিরুপদ্রব আরাম ফেলিয়া রাখিয়া যাত্রা করিয়াছে অনির্দ্দেশের পথে। ঝঞ্ঝাসঙ্কুল মেঘমণ্ডল, ধূসর মরুর উত্তপ্ত প্রসার, মেরুলোকের দুঃসহ হিমস্পর্শ অনির্দ্দেশযাত্রাকে আরও লোভনীয় করিয়া তুলিয়াছে। নবীন কবির এই পক্ষসঞ্চরণের স্পর্দ্ধা জীবনভীরু জ্ঞানবৃদ্ধের কাছে সম্মান লাভ করে নাই, লাভ করিয়াছে উপহাস, সংশয়, উপেক্ষা। তবুও নবীন কবি সুলভ সঞ্চয়ের বঞ্চনাদ্বারা প্রতারিত না হইয়া গ্রহণ করিয়াছে বিপ্লবের পথ। কোন বিদ্রোহ অন্তরের গহনবাসীর প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধার পরিচয়, আর কোন বিদ্রোহ শুধু উৎকট বৈশিষ্ট্যের দম্ভ, নূতন যাহা কিছু পাইয়াই যাহারা খুসী তাহাদের কাছে এই দুই বিদ্রোহের পার্থক্য সহজে ধরা পড়ে না। আধুনিক কাব্যের বিপ্লবের কাহিনী লিপিবদ্ধ করিতে গিয়া অধিকাংশ ভীরু বিপ্লববিলাসীর মত শ্রীযুক্ত ডে লিয়ুইস ভিক্টোরীয় যুগের দীনতা ও ক্ষুদ্রতার বিরুদ্ধে আস্ফালন করেন নাই, তাঁহার মার্জ্জিত, সতেজ, সবল মনের এই সুস্থ আনন্দ পরম প্রীতিপ্রদ। হপ্‌কিন্‌স্‌, ওয়েন ও এলিয়টের বিদ্রোহ প্রসঙ্গে লিয়ুইস আধুনিক কাব্যের আদর্শ সম্বন্ধে যে আলোচনা করিয়াছেন, তাহা বিশেষ মূল্যবান। হপ্‌কিন্‌সের কল্পনার উত্তপ্ত সংস্পর্শেই ভাবার ও ছন্দের রূপবিপর্য্যয় হইয়াছিল; তাঁহার বিদ্রোহের মূলে আত্মপ্রচারের অভিসন্ধি ছিল

না, ছিল ক্রীড়ারত বালকের উল্লাস। অধ্যাত্মজীবনের আলোড়নেই এই বিদ্রোহী কাব্য-রীতির উৎপত্তি, ভীরু কল্পনা বা নিস্তেজ বুদ্ধিবিকারে নয়।

"O the mind, mind has mountains : cliffs of fall
Frightful, sheer, no-man-fathomed. Hold them cheap
May who ne'er hung there"—

হপ্‌কিন্‌সের জটিলতা এই মানসিক বৈশিষ্ট্যেরই ফল।

এলিয়ট হপ্‌কিন্‌সের মত ভাষা ও ছন্দের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন নাই, স্বল্পভাষণকে ওয়েনের মত তিনি বেদনার বাহন করিয়াও তোলেন নাই। স্বচ্ছ বুদ্ধির স্থির আলোকসম্পাতে তিনি যুগান্তের দীনতা ও বিকৃতিকে পরিহাস করিয়াছেন। তাই তাঁহার বিদ্রোহ কাব্যের বহিরাবরণকে ততটা স্পর্শ করে নাই। এতকাল ধরিয়া যুক্তির কাঠামোই ছিল কাব্যের অবলম্বন। লরেন্‌স তাঁহার জীবনে যুক্তিবাদের এই নিরতিশয় অত্যাচারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন। ফ্রয়েডের অবচেতনাতত্ত্ব লরেন্‌সের প্রভাবে ইংরেজী কাব্যে সুপরিচিত হইয়া উঠে। বিভিন্ন মুহূর্ত্তের চেতনার গ্রন্থি যে বুদ্ধিতে নয়, এলিয়টের কাব্যে ইহারই আভাস পাওয়া গেল। তাই বলিয়া তত্ত্ব কাব্যের প্রাণ নয়। তাই Waste Land সম্বন্ধে রিচার্ডসের উক্তি : "a complete severance between poetry and all beliefs" লেখক সমর্থন করেন নাই।

আজ ভাবিবার সময় আসিয়াছে। যন্ত্রচালিত, বেগ-বিড়ম্বিত, রেডিওসিনেমাবহুল জীবনে কোথায় সেই ব্যক্তিগত রসাস্বাদের অবকাশ, যে অবকাশ ছাড়া কবির অভিব্যক্তি কোনও রূপেই সম্ভব নয়।

'Tell the English', he shivered :
Man is a spirit.' (Auden)

কিন্তু আধুনিক কবির পক্ষে এই সহজ আত্মপ্রতীতি কি সম্ভব? যাঁহারা বলেন আধুনিক কাব্য জটিল ও দুরূহ, তাঁহারা ভুলিয়া যান খণ্ড অভিজ্ঞতার রূপহীন অসম্বদ্ধ ছায়ালোকে কবির পক্ষে আত্মসমর্পণ কত দুরূহ; আবেষ্টনের সঙ্গে যে সহজ আত্মীয়তা ব্যতীত কাব্যের প্রকাশ অসম্ভব, বিজ্ঞানের এই অনির্দ্দিষ্ট অভীপ্সার যুগে, অবচেতনার ঊর্দ্ধসম্প্রসারণের যুগে সে আত্মীয়তা কোনও কবির পক্ষে দাবী করা সম্ভব কি? কে বলিবে 'man is a spirit'?

তবে আশার কথা, যাহা ছিল বিস্ময়, তাহা হইয়া আসিতেছে সহজ। যে উগ্র আত্মচেতনা কবির সহজ সঙ্গীতবিহ্বলতাকে অবরুদ্ধ করিয়াছে, আবেষ্টনের সঙ্গে কবির পরিচয় যেদিন আরও গভীর হইবে সেদিন কবি আবার নিজের অভিজ্ঞতার স্বকীয়ত্ব উপলব্ধি করিয়া মুগ্ধ উল্লাসে তাহার স্বরূপ নির্দ্দেশ করিতে পারিবেন। আজও আবেষ্টনের সঙ্গে কবির মানসিক জীবনের সমন্বয় ঘটে নাই; তাই এত অনিশ্চিত জটিলতা। অনতি-দূরের অনাগত যুগ যেদিন নিজের অপ্রতিহত অধিকারে কবির মধ্যে নিহিত সামাজিক ব্যক্তিটির আত্মীয়তা দাবী করিতে পারিবে, সেইদিনই কবির পক্ষে সম্ভব হইবে অকুণ্ঠ প্রকাশ, মুক্ত আত্মদান। আজও সেদিন আসে নাই। তবে আশার কথা আমাদের নবতর মানসজীবনের দু একটি মুহূর্ত্ত মাঝে মাঝে সার্থক কাব্যপ্রকাশে আলোকিত হইয়া উঠিয়াছে। ব্যোমযান আর বিস্ময় নাই। তাহার সারথি আমাদেরই একজন।

Consider this and in our time
As the hawk sees it or the helmeted airman— (Auden)

কাব্যের কণ্ঠস্বর রসিককে চিনাইতে হয় না।

Also the swallows by autumnal instinct
Comfort us with their effortless exhaustion
In great unguided flight to their Complete South.
(Spender)

এই যে চিত্র, ভিক্টোরীয় যুগের কোনও কবির পক্ষে এ চিত্র অঙ্কন সম্ভব হইত না। বিজ্ঞানের সঙ্গে কবির পরিচয় আছে। অবচেতনার ছায়ালোকের ইঙ্গিতও আছে। তবুও এ চিত্র কাব্য; কবির অভিজ্ঞতার rhythm ইহাকে স্ফুট ও সজীব করিয়া তুলিয়াছে। আশার কথা সন্দেহ নাই। আরও আশার কথা লেখকের মত বলিষ্ঠ কল্পনা, মার্জ্জিত রুচি ও কাব্যসর্ব্বস্বতার এ অভ্যুদয়।

শ্রীমতি এডিথ সিট্‌ওয়েল চটিয়াছেন। লীভিসের সমালোচনায় তাঁহার হাড় জ্বলিয়া উঠিয়াছে। ওঠার কথা। কে একজন গ্রিগ্‌সন বিগু্হাম লিয়ুইসের সঙ্গে ড্রাইডেনের তুলনা করিয়াছেন! সত্যই "a man who can compare Mr. Lewis' versification with that of Dryden, and a man who can call Byron a descendant of Dryden will say anything"—কিন্তু সভয়ে জিজ্ঞাসা করি এত রাগ কেন? শ্রীমতী এডিথের গুরু ড্রাইডেন এচিটোফেলের ক্রোধ প্রসঙ্গে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা নিশ্চয়ই শ্রীমতী জানেন। এই উৎকট ভিক্টোরীয়-যুগবিদ্বেষই বা কেন? যাহারা সত্যই ক্ষুদ্র তাহাদের প্রতি বিদ্বেষ অনাবশ্যক। কিন্তু সত্যই কি মীনেল ও হাউজ্‌মান এতই ক্ষুদ্র?

সত্যই কি বিশ্বাস করিতে হইবে কাব্যালোচনায় ভদ্র মনের পরিচয়ও ভিক্টোরীয় বর্ব্বরতা? শ্রীমতী সিট্‌ওয়েল কবি। তাই তাঁর কটূক্তি রূপহীন হয় নাই। কিন্তু গদ্যে কেন? ছন্দে এই ক্রোধ আত্মপ্রকাশ করিলে আমরা আবার অষ্টাদশ শতকের পুনরভ্যুদয় দেখিতে পাইতাম। তবে শ্রীমতী সিট্‌ওয়েল পোপ ড্রাইডেনের মুগ্ধা শিষ্যা হইলেও কার্লাইলের সঙ্গেই তাঁহার নাড়ীর সম্বন্ধ বেশী।

আধুনিক কাব্যের সমালোচনায় শ্রীমতী সিট্‌ওয়েল একটী মূল্যবান কথা বলিয়াছেন। হপ্‌কিন্‌স্‌, এলিয়ট্‌, ইয়েট্‌স্‌, ডেভিজ্‌ ইঁহাদের সকলের কাব্যেই ভাষা আবার সজীব ও স্ফুট হইয়া উঠিয়াছে ইঁহাদের সকলেরই চেতনা অতি তীব্র; তাই ভাষাকে রূপ ও স্পর্শে আবার প্রাণবান করিয়া তুলিতে ইঁহারা সক্ষম হইয়াছেন, যাহা ইঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী কবিদের মধ্যে অনেকেই পারেন নাই। ভাষার এই দুটি শক্তির সম্বন্ধে শ্রীমতী যাহা বলিয়াছেন, বুঝিলাম। কিন্তু আধুনিক কবিদের কাব্যের টেক্‌নিকের বিস্তৃত আলোচনায় তাঁহার মুন্সীয়ানার পরিচয় পাইলাম বটে, আধুনিক কাব্যের আদর্শের কোনও পরিচয়ই পাইলাম না।

অতি আধুনিক ইংরেজী কাব্যের বিরুদ্ধে শ্রীমতী সিট্‌ওয়েলের যে অভিযোগ স্প্যারোর পর তাহাতে নূতন কিছু পাওয়া গেল না। আধুনিক কবিদের অনেকেই যে বৈশিষ্ট্যের দাবী করেন, অথচ ব্যক্তিত্বের জোর তাঁহাদের নাই—personal without possessing personality এ অভিযোগের অতি নিপুণ বিশ্লেষণ আমরা Sparrowর

Sense and Poetryতে পাইয়াছি। তাই শ্রীমতী সিট্ওয়েলের এ অভিযোগের পুনরাবৃত্তির সার্থকতা বুঝিতে পারিলাম না। অতি আধুনিক কবিদের এই unsensed life-এর মর্ম্মকথাই ডে লিয়ুইস সুগোচর করিয়া তুলিয়াছেন। সত্য বটে কামিঙ্গসের খেলো নূতনত্ব পীড়াদায়ক। সত্য বটে বহু আধুনিক কবির অভিনবত্ব শুধু ভঙ্গী। তবুও অডেন ও স্পেণ্ডারের মানস জীবনের কয়েকটি গৌরবোজ্জ্বল মুহূর্ত্তের প্রতিচ্ছবি দেখিয়া আমাদের আশার সঞ্চার হইয়াছে, শ্রীমতী সিট্ওয়েলের নৈরাশ্য সত্বেও।

শ্রীদিলীপকুমার সান্যাল

I, Claudius—by Robert Graves (Barker).
Claudius the God—by Robert Graves (Barker).

এই বই দুইখানি ঐতিহাসিক উপন্যাস কি উপন্যাসাকারে ইতিহাস তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন। রোমের "ক্লডিয়ান্" সম্রাট্দিগের মধ্যে তৃতীয় সম্রাট্ টাইবেরিয়স্ ক্লডিয়স্ ড্রুসাস্ নীরো জর্ম্মেনিকস্কে নায়ক করিয়া এযাবৎ কোন উপন্যাস রচিত হয় নাই, অথচ এই রোমান সম্রাটের রাজত্ব-কালের যত রহস্যময় ঐতিহাসিক তথ্য আমরা পাই তত আর কোন রোমান সম্রাটের সময় পাইনা।

এই উপন্যাস দুইখানির নায়ক সম্রাট্ ক্লডিয়স স্বয়ং। তিনি যেন আপন জীবন-কাহিনী নিজভাষায় বলিয়া যাইতেছেন। প্রথম খানিতে ১০ খ্রীষ্ট পূর্ব্বাব্দে তাঁহার জন্ম হইতে ৪১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার সিংহাসনারোহণ পর্য্যন্ত ৫০ বৎসরের কাহিনী। ইতিহাসে সম্রাটের জীবনের এই অংশের কথা আমরা অল্পই জানিতে পারি। গ্রন্থকার সম্রাট অগস্টস্ ও সম্রাট্ টাইবেরিয়সের রাজত্বকালের ঘটনাবলী হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া তাহা ক্লডিয়সের বাল্য জীবনের সহিত গাঁথিয়া কল্পনা সাহায্যে এমন ভাবে গড়িয়া তুলিয়াছেন যে উপন্যাসখানি পাঠে ইহা যে ক্লডিয়সের আপন জীবনস্মৃতি নহে তাহা বলিবার উপায় থাকেনা। এই উপন্যাস দুইখানির গল্পাংশের সার মর্ম্ম এই—

দশমাস পূর্ব্বেই ক্লডিয়স ভূমিষ্ঠ হইলেন। সুতরাং তিনি বিকলাঙ্গ হইলেন। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে জিহ্বার জড়তা প্রকাশ পাইল। চলিতে গেলেও তাঁহাকে খোঁড়াইতে হইত। সম্রাট্ অগস্টস্ হইতে সকলেই, এমন কি তাঁহার নিজের মাতা পর্য্যন্ত, তাঁহাকে ঘৃণা ও তাচ্ছিল্য করিতেন। কেবল ভ্রাতা জর্মেনিকস্ ও অগস্টসের দৌহিত্র পস্টুমস্ তাঁহাকে ভালবাসিতেন। বিকলাঙ্গ বলিয়া কোন রাজকার্য্যে তিনি যোগ দিতে পাইলেন না। অগত্যা লেখাপড়া লইয়াই থাকিলেন। প্রত্নতত্ত্ব ও ইতিহাসই তাঁহার প্রিয় হইল। শিক্ষা-গুরু এথেনো ডোরসের পরামর্শে জিহ্বার জড়তা দূর করিতে চেষ্টা করিলেন এবং ক্রমে ক্রমে নিজের শক্তির উপর আস্থাবান হইতে লাগিলেন। অগস্টস্ ও তাঁহার পর টাইবেরিয়স্ ক্লডিয়সকে কোন রাজকার্য্যের ভার দিলেন না। সম্রাট্ কালিগুলার সময়ে তিনি প্রথম রাজকার্য্যের ভার পাইয়া consul নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু বহুদিন অনভ্যাসে প্রৌঢ় বয়সে তিনি ঠিক মত কার্য্য চালাইতে না পারিয়া

সাধারণের নিকট অধিকতর নির্ব্বোধ ও অকর্ম্মণ্য বলিয়া প্রতীয়মান হইলেন এবং এই অকর্ম্মণ্যতার জন্যই কালিগুলার হস্ত হইতে জীবন রক্ষা পাইয়া তাহার হত্যার পর প্রিটোরিয়ন সৈন্যগণ কর্ত্তৃক সম্রাট বলিয়া নির্ব্বাচিত হইলেন।

সম্রাট্ হইয়া ক্লডিয়স কালিগুলার অপকীর্ত্তিগুলি নিরাকরণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার সদয় ব্যবহারে সকলেই সন্তুষ্ট হইল। ইতালীর বাহিরেও সাম্রাজ্যের অধিবাসীগণকে নাগরিকের সম্পূর্ণ সুবিধাদান করিয়া তিনি সর্ব্বজনপ্রিয় হইলেন। রোমের বিখ্যাত পয়ঃপ্রণালী Aqua Claudia সম্পূর্ণ করিয়া তিনি রোমের জলকষ্ট নিবারণ করিলেন, অস্টীয়ার বন্দর নির্ম্মাণ করিয়া শস্যের অনটন দূর করিলেন এবং ফুসিনিয়স হ্রদের জল বাহির করিয়া দিয়া উক্ত অঞ্চলের স্বাস্থ্যের উন্নতি করিলেন। ইঁহার সময়ে মরিটেনিয়া রোমসাম্রাজ্যভুক্ত হইল। বৃটেনে রোমের প্রভুত্বের সূচনা হইল, সাম্রাজ্ঞী সুন্দরী মেসালিনা মুক্ত কৃতদাসগণের পরামর্শে চালিত হইয়া কিছু অন্যায় অত্যাচার করিলেও ক্লডিয়স্ সাম্রাজ্যের অনেক মঙ্গল করিয়া গিয়াছেন। মেসালিনা নিজ দুষ্কৃতির দ্বারা মৃত্যুদণ্ড ভোগ করিলেন; তাহার পর ক্লডিয়স্ বিবাহ করিলেন আপন ভ্রাতুষ্পুত্রী এগ্রিপিনাকে। তাঁহার হস্তেই ক্লডিয়াসের ইহলীলা শেষ হইল।

এই সব গেল ইতিহাসের কথা। এই উপন্যাসে এই সকল কথাগুলি এমন অঙ্গাঙ্গিভাবে গ্রথিত হইয়াছে যে তাহাতে গ্রন্থকারের জ্ঞান ও মৌলিকত্বের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। ইতিহাসে শুধু ঘটনার পর ঘটনা কালপরম্পরা-ক্রমে সজ্জিত হইয়া থাকে। কিন্তু এই ঐতিহাসিক উপন্যাসে সেই ঐতিহাসিক ঘটনাগুলি গ্রন্থকার এমন কল্পনার বজ্রলেপ দিয়া জুড়িয়া দিয়াছেন যে কোথাও বিন্দুমাত্রও অসামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয় না। কোন কথাটি ঐতিহাসিক কোনটিই বা কাল্পনিক তাহা সুচতুর ঐতিহাসিকের পক্ষেও খুঁজিয়া বাহির করা কঠিন। ইহার আর একটি বিশেষত্ব এই যে ঐতিহাসিক সাধারণত বহু পূর্ব্বের ঘটনাবলী তাঁহার নিজের এবং তৎকালীন দৃষ্টি দিয়া দেখিয়া থাকেন, কিন্তু গ্রন্থকার সেই যুগেরই দৃষ্টি দিয়া সেই যুগেরই একজনের মুখের ভাষায় সমস্ত ঘটনা ও বিষয়গুলির বর্ণনা করিয়াছেন। কেবল আধুনিক পাঠকের উপযোগী করিয়া যথাসম্ভব প্রাচীন স্থানগুলির আধুনিক নাম এবং গ্রীক্ ও লতিন্ শব্দের ইংরাজী প্রতিশব্দ ব্যবহার করিয়াছেন।

"I, Claudius" এই নামটি হইতেই পাঠক পুস্তকের ভাষা ও রচনা-ভঙ্গীর কতকটা আভাস পাইতে পারেন। পুস্তকের ভাষা যতদূর সম্ভব সম্রাট্ ক্লডিয়সের রচিত পুস্তক, ঘোষণাপত্র ও শিলালিপিগুলির অনুরূপ করিয়া লিখিত হইয়াছে এবং সেই ভাবটি বজায় রাখিয়া প্রথম উপন্যাসখানির নাম রাখা হইয়াছে। এইভাবে উপন্যাস দুইটি মনোরম ও সুখপাঠ্য করিয়া রচনা করিতে গ্রন্থকারকে যে কতখানি লাতিন ও গ্রীক্ সাহিত্য ও তদানিন্তন ইতিহাসের সহিত পরিচিত হইতে হইয়াছে তাহা আর বিশেষ করিয়া বলিয়া দিতে হইবেনা। গ্রন্থকারের নিখুঁত ঐতিহাসিক জ্ঞান ও প্রাচীন সাহিত্যের উপর অধিকার তাঁহার গ্রন্থদ্বয়ের প্রতি ছত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই যুগের ইতিহাস পাঠ করিলে মধ্যে মধ্যে কতকগুলি সমস্যা আসিয়া উপস্থিত হয়, নিপুণ গ্রন্থকার সেই সমস্যাগুলির এমন সুন্দর সমাধান করিয়াছেন যে তাঁহার কল্পনা-কুশলতা দেখিয়া চমৎকৃত হইতে হয়। অগস্টাস, টাইবেরিয়স, কালিগুলা, ও ক্লডিয়সের রাজত্বকালের বিচ্ছিন্ন ঘটনাগুলিকে একত্র করিয়া কল্পনার রং ফলাইয়া বাস্তবিকই তিনি এক অপূর্ব্ব কাহিনীর

সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহার লেখনীতে ক্লডিয়সের ভাষা ও ভাব যেন মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে এবং সম্রাট ক্লডিয়স্ যেন স্বয়ং এই যুগে অবতীর্ণ হইয়া নিজের জীবনস্মৃতি লিখিয়াছেন।

গ্রন্থকারের বর্ণনা-শক্তিতে যথেষ্ট মৌলিকত্ব আছে।—রাজপ্রসাদ, বিচারালয়, রঙ্গভূমি, সেনেট্, রোমের পুস্তকাগার, ত্রিপলির মরুভূমি, জর্ম্মানীর ঘন বনানী, পম্পির প্রমোদোদ্যান, রোমান যুদ্ধশিবির, এন্টিওকের ভৌতিক প্রাসাদ, ফিউমীর ভবিষ্যৎ, বক্ত্রীর গুহা, বোলোনের সমুদ্রতীর, রোডস্ দ্বীপের শৈলশৃঙ্গ, মেম্ফিসে এপিস্ দেবতার মন্দির প্রভৃতির বর্ণনা এবং কালিগুলার বিলাসাগার, ক্লডিয়সের বিচার, ব্রিটেনে কারাকৃটাসের সহিত যুদ্ধ বর্ণনা ও হেরড্ এগ্রিপার কাহিনীতে তাঁহার দুঃসাহসিকতার বিষয়গুলি এমন নিপুণভাবে গ্রন্থকার বর্ণনা করিয়াছেন যে পড়িতে পড়িতে অতীতের সহিত বর্ত্তমানের ব্যবধান লুপ্ত হইয়া যায়। গ্রন্থকার মধ্যে মধ্যে প্রাচীন কবিতার অনুকরণে কবিতা লিখিয়া ও প্রাচীন কবিগণের ভাষা উদ্ধৃত করিয়া উপন্যাস দুই-খানিতে সেই যুগের আব্হাওয়ার সৃষ্টি করিয়াছেন। এ বিষয়ে তাঁহার চিন্তাশক্তির প্রশংসা না করিয়া থাকা যায়না।

একটি বিষয়ে আমরা গ্রন্থকারের সহিত একমত হইতে পারি নাই—তাহা টাইবেরিয়সের চরিত্র। গ্রন্থকার সম্ভবত Tacitus-এর Annals এবং Suetonius-এর "Lives of Twelve Caesars"-এর উপর বেশী নির্ভর করিয়া এই সময়ের ঘটনাগুলি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সমসাময়িক ব্যক্তিগণ টাইবেরিয়সের গাম্ভীর্য্যের আবরণ ভেদ করিতে না পারিয়া তাঁহার সম্বন্ধে অনেক অদ্ভুত ধারণা পোষণ করিতেন। তাঁহার অন্তরের সমস্ত ভাব, আশা, আকাঙ্ক্ষা একটি কঠিন বহিরাবরণের দ্বারা এমনি প্রচ্ছন্ন থাকিত যে তাঁহার কৃত কার্য্যগুলির দ্বারা বিচার করিতে গিয়া লোকে তাঁহাকে ভুল বুঝিত। তাঁহার অসামান্য প্রতিভা ছিলনা বটে কিন্তু তাঁহার অধ্যবসায় এবং তাহার প্রয়োগ দ্বারা তিনি নিজের শক্তি সামর্থ্য প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। তিনি প্রাচীনপন্থী ছিলেন, তাই তাঁহার কঠোরতা, মৌন স্বভাব, মিতব্যয়িতা, এবং সরল জীবন যাপনের সেই বিলাস-পঙ্কিল যুগে লোকে বিপরীত অর্থ করিয়াছিল। Suetonius তাঁহার কাপ্রিতে অবস্থান কালের জীবন-যাত্রার যাহা বর্ণনা করিয়াছেন তাহা তিনি সম্ভবত সম্রাট নীরোর মাতা ও ক্লডিয়সের শেষ পত্নী এগ্রিপিনার বিবরণ হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। কিন্তু এগ্রিপিনার লিখিত বিবরণে কতদূর ঐতিহাসিক সত্য আছে তাহা বিচার্য্য। Wean Merivale লিখিত "History of the Romans under the Empire," E. S, Beeslyর "Cataline, Clodius and Tiberius" এবং "Geschichte der romischen Kaiserzeit" নামক জর্ম্মানগ্রন্থে এবং Fregtag লিখিত "Tiberius and Tacitus" নামক গ্রন্থে টাইবেরিয়সের জীবনের অনেকটা প্রকৃত ইতিহাস পাওয়া যায়।

"I, Claudius"-এ একটি ঐতিহাসিক অনৈক্য দৃষ্ট হইল—৩১ পৃষ্ঠায় ক্লডিয়স বলিতেছেন মার্ক এণ্টনীর কনিষ্ঠা কন্যা এণ্টেনিয়া তাঁহার মাতা। আবার ৫১ পৃষ্ঠায় বলিতেছেন তাঁহার মাতা এণ্টনীর প্রথমা কন্যা। সম্ভবত ইহা লিপিকর-প্রমাদ। ইহা সত্ত্বেও পরিশেষে আমাদের এই বক্তব্য যে পুস্তক দুইটির মৌলিকত্ব এই শ্রেণীর গ্রন্থের মধ্যে ইহাদিগকে বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য করিয়াছে।

শ্রীত্রিদিবনাথ রায়

Nature and Life—by A. N. Whitehead, (Cambridge).

আধুনিককালে গণিত ও পদার্থবিজ্ঞানের প্রভৃত চর্চ্চার পর যাঁহারা বৈজ্ঞানিক তথ্যের ভিত্তিভূমি অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া দর্শনের রাজ্যে উপনীত হইয়াছেন, তাঁহাদের জ্ঞানের ব্যাপকতা ও অন্তর্দৃষ্টির গভীরতার মানদণ্ডে বিচার করিলে হোয়াইট্‌হেড্-এর স্থান সর্ব্বোচ্চ বলিয়া নির্দ্দেশ করা বোধ হয় অন্যায় হয় না। আধুনিক বিজ্ঞানের দার্শনিক বিশ্লেষণের উর্দ্ধ পথে এডিংটন, জীনস্ প্রভৃতি বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানিকগণ মরমীদের অতীন্দ্রিয় আত্মতত্ত্ব ও বিজ্ঞানবাদের কল্পলোকে উপস্থিত হইয়াছেন; পক্ষান্তরে অধ্যাপক লেভি ইঁহাদিগকে তীব্র সমালোচনার কশাঘাত করিয়া ইঁহাদের বস্তুহীন অতীন্দ্রিয় ভাবের রঙ্গীন ফানুসের উর্দ্ধগতি রোধ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন ও মার্কস্ ও এঙ্গেলসের মতবাদের অনুবর্ত্তন করিয়া বিজ্ঞানকে অনেকান্ত জড়বাদের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিবার পক্ষে যুক্তি দেখাইয়াছেন। কিন্তু হোয়াইট্‌হেড বিশ্লেষণ ও অন্তর্দৃষ্টির গভীরতর স্তরে নামিয়া প্রকৃতি ও জীবনের মূলতত্ত্ব উদ্ঘাটনের চেষ্টা করিয়াছেন ও প্রসঙ্গক্রমে ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ ও প্রকৃতির কাঠামো সম্বন্ধে যথাক্রমে হিউম ও নিউটনের মতবাদ বিচার করিয়াছেন। কারণ তাঁহার মতে ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞানের উপাদান ও প্রকৃতি জড় পরমাণুর গতি সম্বন্ধে অন্ধ বিধি মাত্র—বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকগণের এই ধারণাই প্রকৃতিকে জীবনের ধর্ম্ম হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিয়া উভয়ের মিলনের পক্ষে অন্তরায় স্বরূপ অজ্ঞতা ও সংস্কারের বিরাট চৈনিক প্রাচীর তুলিয়া রাখিয়াছে।

যাঁহারা পদার্থবিজ্ঞানের অনতিপূর্ব্ব বিপ্লবসমূহের সন্ধান রাখেন তাঁহারা জানেন যে নিউটনীয় যুগের জড়, দেশ ও কাল, সম্বন্ধ, ধারণা ও জ্যামিতি ও গতিবিজ্ঞান প্রভৃতির মূলতত্ত্বের বহু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। হোয়াইট্‌হেড্ এ সম্বন্ধে আলোচনার ফলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে প্রকৃতি গতিবিজ্ঞানের বিধি-অনুযায়ী সঞ্চরণশীল জড় পরমাণুপুঞ্জের অন্ধ অভিনয়ের রঙ্গমঞ্চ মাত্র নহে।

সংস্কার-বর্জ্জিত দৃষ্টিতে দেখিলে প্রকৃতি ঘটনপটীয়সী অবিরত ক্রিয়ার ক্ষেত্ররূপে প্রতিভাত হয়। যে আন্দোলনপুঞ্জকে আমরা জড় নামে অভিহিত করি তাহাকে প্রতিবেশ হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখা অসম্ভব; প্রতিবেশ ও আন্দোলনপুঞ্জ পরস্পরাশ্রয়ী এবং স্বসমাহিত স্থানীয় অবস্থিতি অভিধেয় কিছুই নাই। কোন বিশেষ ক্ষণে প্রকৃতি বলিতে কিছুই বুঝায় না। নবোন্মেষিণী সৃজনীশক্তির অবিরাম প্রগতির ক্ষেত্র ভিন্ন প্রকৃতির অন্য কোন অর্থ নাই।

দেকার্ত্তের জড় ও মনের সম্পূর্ণ বিভিন্নতা আধুনিক যুগের প্রারম্ভ হইতে প্রকৃতি ও জীবনের ধর্ম্মকে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু সমসাময়িক পদার্থ-বিজ্ঞান গতানুগতিক জড়তা ত্যাগ করিয়া অবিরত ক্রিয়ার ক্ষেত্রে নিজের স্থান করিয়া লইয়াছে ও জীবনের স্বভবনের ধারা-সেচনে তাহাকে উর্ব্বর করিয়াছে। নিষ্প্রাণ প্রকৃতির কোন অর্থ থাকিতে পারে না, তাহার অর্থ প্রাণ বা জীবনের মধ্যে অন্বেষণ করিতে হইবে। জীবনের মূল মন হইতে গভীরতর স্তরে নিহিত; অপরোক্ষ আত্মরতি জীবনের বৈশিষ্ট্য। জাগতিক ঘটনাধারা এই আত্মরতিতে সম্পূর্ণতা লাভ করে; আবার ইহার অস্তিত্ব জাগতিক ঘটনাধারার আশ্রয় ব্যতিরেকে সম্ভব নহে। সুতরাং প্রকৃতির অবিরত ক্রিয়া ও জীবনের আত্মরতি পরস্পরাশ্রয়ী ও উভয়ে মিলিয়া সম্পূর্ণতা লাভ করে।

এই সম্পর্কে হোয়াইটহেড হিউমের মতবাদ আলোচনা করিয়াছেন। ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষই বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানের ভিত্তি বলিয়া কল্পনা করা হইত। কিন্তু হোয়াইটহেড বলেন যে ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষের ফলে প্রকৃতি সম্বন্ধে আমদের অত্যন্ত ভাসা-ভাসা জ্ঞানলাভ হয়। প্রকৃতির মূলে পৌছাইতে হইলে অনুভূতিতে যে আত্মরতির উপলব্ধি হয় সেই গভীরতর স্তরে নামিয়া যাইতে হইবে। প্রত্যক্ষ প্রমাণ অপেক্ষা বড় প্রমাণ এই অনুভূতি এবং এই অনুভূতির সহিত প্রকৃতির কোন বিরোধ নাই। দেহের অপরোক্ষ আত্মরতির অনুভূতি হইতে আমরা প্রকৃতি সম্বন্ধে ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ হইতে অধিকতর গভীর জ্ঞানলাভ করি। ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ প্রকৃতিকে ক্রিয়াক্ষেত্ররূপে কথনই আমাদিগকে দেখায় না। প্রত্যক্ষীভূত বিষয়সমূহের পরম্পরা ব্যতীত তাহাদের কোন অর্থ প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ফলে আমরা লাভ করিতে পারি না ; সুতরাং প্রকৃতিকে উদ্দেশ্যহীন জড় বস্তুর গতির চিত্র ব্যতীত কিছুই ভাবিতে পারি না। পুস্তক খানির দ্বিতীয় ভাগের ইহাই প্রতিপাদ্য।

কার্য্যকারণ সম্বন্ধ, উদ্দেশ্য, অর্থবোধ, আত্মার অস্তিত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধে বিচার করিয়া হোয়াইট্‌হেড এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছেন যে প্রকৃতি ও জীবনের সম্মিলন ব্যতীত ইহাদের কোন কিছুরই কোন অর্থ হয় না। পদার্থবিজ্ঞানে শক্তির ক্রিয়া ও জীবনে অনুভূতির তীব্রতা, ইহাদের হোয়াইট্‌হেড এক বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন ও এই ভিত্তিতে সমস্ত দার্শনিক চিন্তাসৌধকে প্রতিষ্টিত করিতে চেষ্টা করিতেছেন।

এই গভীর বিষয় সম্বন্ধে এত অল্প কথায় কিছুই বোঝান যায় না ; বিশেষতঃ এই পুস্তকখানি হোয়াইট্‌হেডের সমগ্র দার্শনিক চিন্তার সারাংশ। যদিও তিনি বলিয়াছেন যে প্রাক্‌কাণ্টীয় দর্শনের সহিত তিনি পৌর্ব্বাপর্য্য বজায় রাখিয়াছেন, কিন্তু বহু কণ্টীয়, হেগেলীয় ও, বার্গসনীয় চিন্তাধারা তাঁহার দর্শনে রূপান্তরিত হইয়াছে বলিয়া আমাদের ধারণা। বিজ্ঞানবাদ (idealism) ও যথাস্থিতবাদ (realism) এই দুয়ের কোনটীকেই তিনি সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করেন নাই ; কারণ প্রকৃতি ও জীবন উভয়কেই তিনি গ্রহণ করিয়াছেন ও তাহাদিগকে এক সঙ্গে মিলাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। আধুনিক বিজ্ঞানে ও দর্শনে যাঁহার কিছুমাত্র অনুরাগ আছে তাঁহার এই পুস্তকখানি পাঠ করা অবশ্যকর্ত্তব্য।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী

চার অধ্যায়—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত (বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়)।

রবীন্দ্রনাথের যে কোন রচনাই বাংলা সাহিত্যিক মাত্রের কাছে বরণীয়,—বর্ত্তমান গ্রন্থখানির বেলায়ও তাহার বিন্দুমাত্র ব্যত্যয় ঘটে নাই। দীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসর সাহিত্য সাধনার পরেও তাঁহার সৃষ্টি-শক্তির নবীনতায় মুগ্ধ হইতে হয়, নিত্যনূতন রচনারীতির বৈচিত্র্যে বাংলা সাহিত্যের যে সমৃদ্ধি-সাধন তিনি করিয়াছেন, তাহার জন্য তাঁহাকে সকৃতজ্ঞ অভিবাদন জানাইতে হয়।

রচনারীতি এবং বিষয়বস্তু দুই দিক দিয়াই "চার অধ্যায়" উল্লেখযোগ্য। সন্ত্রাসবাদ এবং তাহার মনস্তত্ত্বকে কেন্দ্র করিয়া উপন্যাসিকা (novellette) খানি গড়িয়া উঠিয়াছে। যে মনোভাবে এ আন্দোলনের জন্ম, যে ভাবে তাহার বিকাশ ও পরিণতি, তাহা চার অধ্যায়ে যেমন করিয়া ফুটিয়াছে, বাংলা সাহিত্য আর কখনো কোন লেখায় তাহা ফুটিয়াছে কি না সন্দেহ। অনেক স্বপ্ন, অনেক আশঙ্কা ও আশা, নিষ্ঠুর বাস্তববোধ এবং অন্ধ ভাবালুতা সমস্ত মিলিয়াই সে আন্দোলন। এ বৈচিত্র্যের বিকাশ না করিতে পারিলে সন্ত্রাসবাদের সত্য পরিচয় দেওয়া অসম্ভব—রবীন্দ্রনাথের চার অধ্যায়ে বিবিধ উদ্দেশ্যের এ সংমিশ্রণ অপরূপ ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ব্যক্তিগত এবং রাজনৈতিক, স্বার্থঘটিত এবং সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ, আত্মসন্ধান এবং আত্মত্যাগের বিচিত্র মনন-সূত্রের জটিলতায় সন্ত্রাসবাদের অনিশ্চয়তা ও দিকভ্রান্তির আভাস চার অধ্যায়ে পরিস্ফুট।

চার অধ্যায়ের গল্পাংশ সহজ এবং সাবলীল। রবীন্দ্রনাথ ইন্দ্রনাথের জীবনের ইতিহাসে সন্ত্রাসবাদের সূচনা ও পরিণতির পরিচয় দিতে চাহিয়াছেন, এলা তাহার মধ্যে আবেগের রঙ জোগাইয়াছে, অতীন্দ্রের মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে তাহার অগ্রগতি ও প্রবলতা। সেই প্রবলতার আতিশয্যেরই যে পশ্চাদটান, তাহা প্রকাশ পাইয়াছে বটুকের জীবনে। তাই ইন্দ্রনাথ নিজের ব্যক্তিগত জীবনের অপমানের মধ্যে জাতীয় জীবনের অপমান উপলব্ধির ফলে সন্ত্রাসবাদের সূচনা করিলেন, তাহার যে ভাবগত আবেদন, তাহার ফলে আসিল এলা। এ আন্দোলনের মধ্যে সামাজিক জীবনের সংস্কার ও নারীর মর্য্যাদা-বৃদ্ধির উদ্দেশ্যেই তাহার অনুপ্রেরণা। তাহারই আকর্ষণে আসিল অতীন্দ্র এবং বটুক,—আন্দোলনের রাজনৈতিকতা অপেক্ষা জীবন-শক্তির প্রবলতাই তাহাদিকে অনুপ্রাণিত করিল, কিন্তু তাহার ফলে অতীন্দ্রের জীবনে আসিল প্রেম, বটুকের জীবনে লালসা।

সন্ত্রাসবাদের সূচনায় ব্যক্তিগত ও জাতিগত স্বার্থচিন্তার সঙ্গে স্বার্থত্যাগের সমন্বয়। তাহার আকর্ষণে যাহারা আসে, তাহাদের মধ্যে কিন্তু প্রায়ই এ দুইটি দিক বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে, তাই কেহ আসে অমিশ্র আদর্শ-বাদের অন্ধ অনুপ্রেরণায়, কেহ আসে স্বার্থচিন্তার সম্পূর্ণ সজাগ ইঙ্গিতে। দিনে দিনে এই স্বভাবদ্বৈত স্পষ্টতর হইয়া ওঠে, একদিন যাহা আদর্শের অনুপ্রেরণায় আরম্ভ হইয়াছিল, কালক্রমে তাহা দলের স্বার্থসিদ্ধির সহায়ক মাত্র রূপে বাঁচিয়া থাকে। দলের মধ্যেও তখন ভাঙ্গন সুর হয়, দেশোদ্ধারের বৃহৎ পরিকল্পনার পরিবর্ত্তে দলাদলি এবং ক্ষুদ্র স্বার্থসন্ধানে তখন তাহার অবসান। যৌবনের যে আবেগ ও কল্পনাকে ভিত্তি করিয়া সন্ত্রাসবাদের সূচনা, সন্ত্রাসবাদের পরিণতিতে সেই আবেগ ও কল্পনাই সমূলে বিনষ্ট হইয়া যায়। অতীন্দ্রের ভাষায়, "গায়ের জোরে আমরা যাদের অত্যন্ত অসমকক্ষ, তাদের সঙ্গে গায়ের জোরের মল্লযুদ্ধ করতে চেষ্টা করলে আন্তরিক দুর্গতি শোচনীয় হয়ে ওঠে। রোগ সব শরীরেই দুঃখের, কিন্তু ক্ষীণ শরীরে মারাত্মক। মনুষ্যত্বের অপমান করেও কিছুদিনের মতো জয়ডঙ্কা বাজিয়ে চলতে পারে তারা যাদের আছে বাহুবল, কিন্তু আমরা পারব না! আগাগোড়া কলঙ্কে কালো হয়ে পরাভবের শেষ সীমায় অখ্যাতির অন্ধকারে মিশিয়ে যাব আমরা।"

সন্ত্রাসবাদের বিশ্লেষণ হিসাবে "চার অধ্যায়" তাই বাংলা সাহিত্যে অতুলনীয়, কিন্তু যে বাস্তববোধের পরিচয়ে চার অধ্যায় সমৃদ্ধ, দুয়েকটি ঘটনায় তাহার ব্যত্যয় হইয়াছে। প্রথম অধ্যায়েই চায়ের দোকানে এলার চা পার্টি বাংলাদেশের পক্ষে

কেবলমাত্র অসাধারণ নহে, খানিকটা অসম্ভবও বটে। সমস্ত প্রথম অধ্যায়টিতেই রুষ-বিপ্লবসাহিত্যের ছায়া বড় স্পষ্ট বলিয়া মনে হয়। গ্রন্থের শেষেও যে হুইশিলের কথা রহিয়াছে, তাহাও জীবনে সম্ভব হইলেও সহজ নহে—তাহার ফলে গ্রন্থের পরিসমাপ্তি বড় মেলোড্রামাটিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে যে নাটুকে বা মেলোড্রামাটিক মাত্রই কি সাহিত্যে অচল? যাহাই অসত্য একদেশদর্শী তাহাই সেই কারণেই অবাস্তব, এবং অবাস্তব মাত্রই অবাস্তব হিসাবে নাটুকে বা মেলোড্রামাটিক হইতে বাধ্য। কাজেই চার অধ্যায়ের পরিসমাপ্তিতে যে অবাস্তবতা, সে অবাস্তবতা সন্ত্রাসবাদের আন্তরিক অবাস্তবতাকেই প্রকাশ করিতেছে, রচনারীতির দিক হইতে তাহাকে দোষ মনে করা অন্যায়। এ মতের স্বপক্ষে আরো বলা চলে যে চার অধ্যায়ের চরিত্র-রচনায়ও রবীন্দ্রনাথ এ অবাস্ত-বতার আভাস স্বেচ্ছায়ই রাখিয়াছেন। কোন চরিত্রকেই রক্ত মাংসের মানুষ করিয়া গড়া হয় নাই, কাহারও চরিত্র ঘটনার সংঘাতে বিকশিত হয় না, অথচ "চার অধ্যায়ে" ঘটনার কোন অপ্রাচুর্য্যও নাই। সমস্ত চার অধ্যায়কেই একদিক হইতে অতীন্দ্র এবং এলার চরিত্রের পরিণতির বিবরণ মনে করা যাইতে পারে, কিন্তু অন্যপক্ষে চরিত্রের এ পরিণতি চার অধ্যায়ে কোনখানেই মূর্ত্ত হইতেছে না। এলা এবং অতীন্দ্রের বাক্যালাপের মধ্যে আমরা চরিত্রের এ পরিণতির আভাস পাইতেছি, কিন্তু আভাসে ইঙ্গিতে চরিত্রের পরিণতি প্রকাশের ফলে সমস্ত গ্রন্থের রচনাতেই আবেগ-অস্পষ্টতা রহিয়াছে। এক কথায় নরনারীর সাক্ষাৎ পরিচয় চার অধ্যায়ে মেলেনা—এলা এবং অতীনের মানসিক প্রতিক্রিয়ার বর্ণনার মধ্যে আমরা তাহাদের ইঙ্গিত-পরিচয় পাই। তাহার ফলে চার অধ্যায়ের বর্ণনায় যে জগতের ছবি ফুটিয়া উঠিতেছে, সে জগৎ সুস্থ স্বাভাবিক পৃথিবী নহে, জটিল এবং চিন্তা-পীড়িত বলিয়া তাহা অস্বাভাবিক অবাস্তব। সন্ত্রাসবাদের পরিচয় হিসাবে তাহাতে গ্রন্থখানির মূল্য আরো বাড়িয়াছে, এ অবাস্তবতাকে দোষ মনে করা তাই ভুল।

এ যুক্তির যথার্থ্যকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করা চলে না। এই অবাস্তব অস্বাভাবিকতায় সন্ত্রাসবাদের পরিচয় যথার্থ হইয়া উঠিয়াছে বটে, কিন্তু তাহার ফলে সাহিত্য হিসাবে বোধ হয় গ্রন্থখানির হানি হইয়াছে। সাহিত্য এবং সমস্ত শিল্পকলাকেই জীবনের প্রতিবিম্ব বলা চলে কিন্তু চার অধ্যায়কে তাহা হইলে জীবনের প্রতিবিম্ব না বলিয়া প্রতিবিম্বের প্রতিবিম্ব বলাই যুক্তিসঙ্গত মনে হয়। এক কথায় বলা চলে যে চার অধ্যায়ের বিষয়বস্তু রবীন্দ্রনাথ যে ভাবে পরিকল্পনা করিয়াছেন, তাহাকে নাটকীয় রূপদৃষ্টি বলিলে অন্যায় হয় না। এলিজাবেথীয় যুগের নাটকের সঙ্গে সেদিক হইতে চার অধ্যায়ের ঘটনা-সংস্থান এবং চরিত্র-বিকাশের দিক দিয়া সাদৃশ্য রহিয়াছে, কিন্তু সে যুগের ট্র্যাজিডীতে ঘটনার যে স্বল্পতা ও তীব্রতা চরিত্রকে বিকশিত করিয়া তুলে, তাহার মূলে রহিয়াছে প্রকাশের সাক্ষাৎ ভঙ্গি। এই প্রকরণকে অসাক্ষাৎ করিবার ফলে চার অধ্যায়ের প্রকাশভঙ্গি উপন্যাসের পক্ষে উপযোগী হইলেও গ্রন্থের বিষয়বস্তুকে সুস্পষ্ট করিয়া তুলিতে পারে নাই। উপন্যাস রচনায় প্রকাশভঙ্গি অসাক্ষাৎ হইতে পারে কারণ উপন্যাসের গতি মন্থর, ঘটনার বৈচিত্র্যের অবকাশ সেখানে অনেক বেশী। চার অধ্যায়ে সঙ্কীর্ণ পটভূমির উপর সরল রেখায় ঘটনার অগ্রগতিতে উপন্যাসের প্রসারের অভাব ঘটিয়াছে, পক্ষান্তরে ঘটনাকে চিত্তবৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত করিয়া প্রকাশের ফলে

নাটকীয় রচনারীতি সম্পূর্ণ হইয়া উঠিতে পারে নাই। এলা এবং অতীন্দ্রের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের জন্য যে আয়োজন এবং আয়তন প্রয়োজনীয়, তাহার অভাব তাই চার অধ্যায়ে পদে পদে অনুভূত হয়।

নাটক এবং উপন্যাস রচনারীতির এই সংঘর্ষই কিন্তু চার অধ্যায়কে সাহিত্যামোদীর কাছে মূল্যবান করিয়া তুলিয়াছে। এই নূতন প্রচেষ্টায় রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা একটি নূতন সাহিত্যরূপ সৃষ্টির প্রয়াস করিয়াছে, সে প্রয়াস সর্ব্বতোভাবে সার্থক না হইলেও প্রয়াস হিসাবেই তাহা মূল্যবান। বাংলা সাহিত্যের প্রকাশভঙ্গির দৈন্যের কথা স্মরণ রাখিলে এ প্রয়াসের মূল্য তাই আরো বাড়িয়া যায়।

প্রকাশভঙ্গি ও বিষয়বস্তুর এই বিবিধ সম্বন্ধের ফলে চার অধ্যায় সন্ত্রাসবাদের যে ছবি প্রকাশ করিয়াছে ছবি হিসাবে তাহার মূল্য বিচার করিতে আগে চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু তাহার ফলে সাহিত্য হিসাবে চার অধ্যায় উপন্যাসের সীমা রেখা অতিক্রম করিয়া চলিয়া গিয়াছে। তাহা লাভ কি ক্ষতি, সে বিচারের সময় আজো আসে নাই।

হুমায়ুন কবির

Constance Markievicz.—by Sean O' Faolain (Jonathan Cape).

Prison Letters of Countess Markievicz.—(Longmans Green).

আয়ার্ল্যাণ্ডের নামে আমাদের আর রোমাঞ্চ হয়না। আইরিশ জাতি এখন আর ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চের পুরোভাগ অধিকার করিয়া নাই। মাঝে মাঝে যবনিকার অন্তরাল হইতে ফ্রি-ষ্টেট্ পলিটিক্স্-এর যে কোলাহল আমাদের কানে আসে তাহা অত্যন্ত ক্ষীণ, তাহাতে আসর জমেনা। স্বায়ত্ত শাসন লাভ করিবার পর আয়ার্ল্যাণ্ড যখন অন্তর্যুদ্ধে মত্ত হইল, তখনো আয়ার্ল্যাণ্ড সম্বন্ধে পৃথিবীর আগ্রহ অক্ষুণ্ণ ছিল, গ্রিফিথ্, কলিন্স্ ও ডি-ভ্যালেরার ব্যক্তিত্বের মোহে তখনো লোকে মুগ্ধ হইত। তাহার পর গ্রিফিথ, কলিন্স্-এর মৃত্যুর পর ডি-ভ্যালেরার আস্ফালন ক্রমশ মন্দীভূত হইল, ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভিন্ন সমস্যা লোকের চিন্তা অধিকার করিল। ইতিমধ্যে বলশেভিক রাশিয়ার অভ্যুদয় হইয়াছিল, ইটালিতে ফাসিষ্ট-তন্ত্রের প্রবর্ত্তন হইল, সম্প্রতি জার্ম্মনীতে ন্যাৎসি-দল চমকের পর চমকে পৃথিবীর লোককে একেবার সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিয়াছে। ইতিহাসের এই নূতন দৃশ্যপটের উপর যে-সমস্যাগুলি আজ আমাদের চোখে অত্যন্ত বড় হইয়া উঠিয়াছে, তাহার মধ্যে আইরিশ সমস্যার কোনো বিশিষ্ট স্থান নাই। আয়ার্ল্যাণ্ডের বিগত যুগের ইতিহাস আজ প্রায় পুরাকাহিনীর মতন মনে হয়। আমাদের বর্ত্তমান জীবনের সুখ দুঃখ আকাঙ্ক্ষা বা আদর্শের সঙ্গে কোনো সংস্রব উহার নাই, ওই যুগের উত্তাপ এবং গতি এবং চাঞ্চল্য আমাদের কল্পনাকে স্পর্শ করে কিন্তু আদর্শকে প্রভাবান্বিত করেন।

কিন্তু কি আশ্চর্য্য এই পুরাকাহিনী! কি ভয়াবহ ইহার পরিবেশ! কি দ্রুত ইহার ঘটনাপুঞ্জ! এবং যে সকল নরনারী আয়ার্ল্যাণ্ডের এই যুগের ইতিহাসের সহিত একেবারে ওতঃপ্রোতভাবে বিজড়িত হইয়াছিল কি মর্ম্মস্পর্শী, কি অদ্ভুত মর্ম্মস্পর্শী, তাহাদের ব্যক্তিগত জীবন! মনে হয় যেন এক বিপুল ট্র্যাজেডি কালো ছায়ার মতন তাহাদের জীবনকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল। মনে হয় যেন নিয়তির অনিবার্য্য বিধানে ইহাদের সকলের জীবন এক মর্ম্মান্তিক বেদনার সূত্রে একত্র গ্রথিত হইয়াছিল। আজ পৃথিবী হইতে ইহাদের চিহ্ন প্রায় মুছিয়া গিয়াছে। ইহাদের স্মৃতি যেটুকু অবশিষ্ট আছে তাহার কিছু ইতিহাসের জীর্ণ পাতায় যুগে যুগে জীর্ণতর হইবে, আর কিছু থাকিবে নবীন হইয়া সাহিত্যের অমর ভাণ্ডারে। আয়ার্ল্যাণ্ডের আদিম যুগের দেবদেবী, প্রাগৈতিহাসিক কালের নায়ক নায়িকা, আয়ার্ল্যাণ্ডের রমণীয় পাহাড় নদী বন, এঙ্গাস ও আশীন, কনেম্যারে ও ইনিস্‌ফ্রি, বহুবেদনার প্রতিমূর্ত্তি দেয়াড্রি, বহুতরঙ্গক্ষুব্ধ আৎলান্টিক সৈকত—যে অলৌকিক জগতের ইহারা উপাদান, সেই কুহেলী-রঙীন জগৎ হইবে এই সব নরনারী চির আশ্রয়।

কন্‌স্‌ট্যান্‌স্‌ মার্কিভিক্‌জ্‌-এর জীবন-কাহিনী পড়িতে পড়িতে বারবার এই কথাই মনে পড়ে। রোমান্টিক জীবন যদি কেহ যাপন করিয়া থাকে তবে করিয়াছিল এই উদ্দাম-প্রবৃত্তি বালিকা। চিরজীবনই সে বালিকা ছিল, নারী হইয়া উঠিতে হইলে যে অবসরের দরকার কন্‌-এর তাহা ছিলনা, এমনই দুর্নিবার বেগে তাহার দিন কাটিত। বিখ্যাত গোর-বুথ বংশে ১৮৬৮ সালে তাহার জন্ম হয়। কন্‌-এর পৈতৃক ভবনের নাম ছিল লিসাডেল্‌। শ্লাইগো সহরের নিকটবর্ত্তী লিসাডেল্‌—কোন্‌ সুদূর রূপকথার জগতের আভাস এই নামগুলিতে আছে কে জানে! রূপকথার রাজকন্যার মতনই সুন্দর ছিল এই লিসাডেল্‌-সঞ্চারী কন্‌ ও তাহার বোন ইভা। তাই ইয়েটস্‌ লিখিয়াছেন ঃ

The light of evening, Lissadell,
Great windows open to the south,
Two girls in silk kimonos, both
Beautiful, one a gazelle.

কিন্তু এই রমণীয় আবেষ্টনের সহিত কন্‌-এর উত্তর জীবনের কোনোই সঙ্গতি ছিলনা—রোম্যান্টিক জীবনের তাইতো ধারা। কন্‌ ছিল অত্যন্ত দুরন্ত মেয়ে, বেশির ভাগ সময় তাহার কাটিত অশ্বপৃষ্ঠে, ভব্যতার ধার সে ধারিতনা। অভিজাত বংশে তাহার জন্ম, আভিজাত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিবার উপযুক্ত শিক্ষা যাহাতে সে পায় তাহার জন্ম আয়োজনের ত্রুটি হয় নাই। কিন্তু কন্‌ ছিল অন্য ছাঁচে ঢালা। সম্ভ্রান্ত পরিবেশ তাহার বেশিদিন ভালো লাগিবে কেন? লণ্ডনের আর্ট স্কুলে কিছুদিন শিক্ষানবিশী করিয়া কন্‌ প্যারিসে একেবারে বোহেমিয়ার কেন্দ্রে গিয়া পড়িল। সেখানে পোল্যাণ্ড-দেশীয় কাউণ্ট ক্যাসিমির মার্কিভিক্‌জ—বা 'ক্যাসি' বয়সে দশ বৎসরের ছোট, বিপত্নীক, একটি পুত্রের পিতা—হইলেন তাহার প্রণয়ী এবং পরে স্বামী। বাড়ি হইতে আপত্তি হইল। কে শোনে? কন্‌ ও ক্যাশি আয়ার্ল্যাণ্ডে গিয়া সংসার পাতিল।

কন্‌-এর সহিত ক্যাসির মিল যতটা ছিল, তাহার চাইতে বেশি ছিল বোধ হয় অমিল। ভালোবাসার প্রথম আবেশে এই দুটি প্রাণী যে অপরূপ মনগড়া জগতের

সন্ধান পাইয়াছিল তাহার ললিত বর্ণজালে এই অমিল ধরা পড়ে নাই। তাহার পর একদিন নেশা টুটিল। বাইরের পৃথিবীর বিচিত্র আকর্ষণে প্রণয়িযুগল বিভিন্ন পথে নিজ নিজ প্রকৃতির চরিতার্থতার সন্ধানে ধাবিত হইল। কিন্তু ইহাদের স্নেহ ও বন্ধুত্ব কোনোদিন ক্ষুণ্ণ হয় নাই। ছোট বড় নানা ঘটনার মধ্য দিয়া ইহাদের এই সহজ সম্পর্ক আমাদের মনকে স্পর্শ করে। সত্যিকারের মানুষ ছিল ইহারা।

কন্‌স্ট্যান্‌স্‌ মার্কিভিক্‌জ্‌-এর উত্তর জীবনের প্রধান অবলম্বন ছিল দুটি—পলিটিক্‌স্‌ এবং দরিদ্রসেবা। লিসাডেল্‌ এবং আভিজাত্যের সকল সংস্রব সে একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছিল। তাহার সময় কাটিত কখনো দারিদ্রের কুটীরে, কখনো রাজনীতিক্ষেত্রে চরমপন্থী দলের সভা-সমিতিতে। এই রাজনৈতিক আদর্শের প্রেরণাতেই সে ছোট ছেলেদের লইয়া 'বয়স্কাউট' দল গঠন করিয়া রাইফেল ব্যবহারের কায়দাকানুনে তাহাদের একেবারে ওস্তাদ করিয়া তুলিয়াছিল। এই বয়স্কাউট প্রসঙ্গে তাহার জীবনীলেখক একটি অতি মজার ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। একদা কন্‌স্ট্যান্‌স্‌-এর মাথায় সখ চাপিল স্কাউটদল লইয়া এক আদর্শ উপনিবেশ স্থাপন করিতে হইবে। যথাসময়ে সহরতলীতে এক বাগানবাড়ি ভাড়া করিয়া সাঙ্গোপাঙ্গসহ কন্‌ সেখানে প্রতিষ্ঠিত হইল। কাউণ্ট মার্কিভিক্‌জ্‌ তখন আয়ার্ল্যাণ্ডে ছিলেন না। ইতিমধ্যে দেশে ফিরিয়া কাউণ্ট স্ত্রীর এই অভিনব খেয়ালের খবর পাওয়া মাত্র সেখানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন সন্ধ্যা হইয়াছে, চারিদিক অন্ধকার, কিন্তু কোথাও একটি আলো নাই। বাড়ির দরজায় বহু করাঘাত এবং চীৎকারের পর সদলবলে কাউণ্টেস আসিয়া স্বামীর অভ্যর্থনা করিলেন এবং জানাইলেন যে তাঁহাদের একটি মাত্র যে বাতি ছিল বাগানের মালী মহাশয় বৈঠকখানা ঘরে তাহারই আলোতে পাঠচর্চ্চা করিতেছেন। ক্যাসি বৈঠকখানায় গিয়া দেখিলেন এক চেয়ারে মালীবর বসিয়া—আর এক চেয়ারে তাঁহার পদযুগল বিন্যস্ত। অতিথির আগমনে মালীর এই সসমারোহ বিদ্যাচর্চ্চার বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম হইল না। কেন হইবে? আদর্শ উপনিবেশ যে!

কিন্তু এই-জাতীয় ঘটনা কন্‌স্ট্যান্‌স্‌-এর জীবনে অতি বিরল। ভাগ্যবিধাতা উত্তরকালের কৌতুকের খোরাক যোগাইবার জন্য তাঁহার জীবন নিয়ন্ত্রিত করেন নাই। আয়ার্ল্যাণ্ডের দারুণ দুর্দ্দিনের মর্ম্মান্তিক দুঃখে কন্‌-এর জীবন স্তরে স্তরে পূর্ণ ছিল। শ্রমিক-পল্লীতে, বিপ্লবীদের গুপ্ত সমিতিতে, কখনো ধর্ম্মঘট প্ররোচনায় কখনো সশস্ত্র সঙ্ঘর্ষে তাঁহার জীবন উত্তেজনার পর উত্তেজনার মধ্য দিয়া অত্যন্ত দ্রুতগতিতে অত্যন্ত ভয়াবহ ভঙ্গীতে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছিল! সেই বিখ্যাত ঈষ্টার-বিপ্লবের সময় (১৯১৬) কন্‌ অসীম সাহসে বিপ্লবীদের সঙ্গে ব্রিটিশ শক্তির প্রতিরোধের জন্য দণ্ডায়মান হইলেন। ডাবলিন্‌ সহরের পথ আইরিশ ও ব্রিটিশ রক্তে লোহিত হইল। কন্‌ বন্দী হইলেন এবং তাঁহার প্রাণদণ্ডের আদেশ হইল। এই আদেশ প্রত্যাহৃত হইল, কিন্তু কারা-প্রাচীরের অন্তরালে যে যন্ত্রণা তিনি ভোগ করিলেন তাহা মরণের অধিক। কেননা কিছুদিন ধরিয়া প্রত্যহ প্রভাতে তাঁহার কানে আসিত রাইফেলের কর্কশ আওয়াজ আর তিনি বুঝিতেন একটির পর একটি তাঁহার প্রিয় সঙ্গী, আয়ার্ল্যাণ্ডের কৃতী সন্তান, ন্যায়বিচারের হুতাশনে ইন্ধন যোগাইতেছে।

কন্‌-এর জীবনে কি সুখের দিন আর আসে নাই? কিন্তু গৌরবের দিন আসিয়াছিল নিঃসন্দেহ। তাঁহার 'সিন্‌ ফেন্‌' দল যখন ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট-এর নির্ব্বাচন

প্রতিযোগিতায় অপ্রতিহত সাফল্যলাভ করিল তখন জগৎ জানিল কন্‌স্‌ট্যান্‌স্‌ মার্কিভিক্‌জ দি হাউস্‌ অফ্‌ কমনস্‌-এর প্রথম নারী-সভ্য। তাহার পর সিন্‌ ফেন্‌ দল পার্লামেণ্টে না গিয়া যখন ডাব্‌লিন্‌-এ নিজেদের শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিল তখন কন্‌স্‌ট্যান্‌স হইলেন এই শাসকমণ্ডলীর শ্রমিক বিভাগের মন্ত্রী।

তাহার পর নিজেদের মধ্যে কলহ সুরু হইল, ইংল্যাণ্ডের সহিত সন্ধি হইয়া 'ফ্রি-ষ্টেট' প্রতিষ্ঠিত হইল। অন্তর্যুদ্ধে আয়ার্ল্যাণ্ড দ্বিধা-বিভক্ত হইল। ডি-ভ্যালেরার নেতৃত্বে কন্‌ যোগ দিলেন সন্ধি-বিরোধী দলের সঙ্গে। কি উন্মাদনাময় সেই দিনগুলি! কি রোমাঞ্চকর তখনকার ঘটনাপুঞ্জ! কন্‌-এর জীবন কাটিত ঝড়ের মতন, যুক্তির বা সঙ্গতির ধার তিনি ধারিতেন না। তাঁহার বক্তৃতা শুনিলে কি মনে হইত বলিতে পারি না, পড়িলে মনে হয় যেন অসম্বদ্ধ প্রলাপোচ্ছ্বাস। কিন্তু সাময়িক উত্তেজনার বিকার-ঘোরেও তাঁহার নিষ্কলুষ দৃষ্টি ঊর্দ্ধে সমুত্থিত হইয়াছিল, তাই একদা আকস্মিক প্রেরণায় তিনি বলিলেন—"I have seen the stars"। তাই বোধহয় তিনি মাঝে মাঝে লোকালয় ছাড়িয়া পাগলের মতন বহুদূরে নির্জ্জন প্রান্তরে সমুদ্রসৈকতে পর্ব্বতে অরণ্যের অভ্যন্তরে ছুটিয়া যাইতেন।

১৯২৭ সালে ডাব্‌লিন-এর দরিদ্র পল্লীর এক হাসপাতালে এই বিচিত্র জীবনের চরম অঙ্কের অবসান হইল। রোগযন্ত্রণায় অস্থির হইয়াও তিনি হাসপাতালের স্বতন্ত্র প্রকোষ্ঠে কিছুতেই থাকিতে রাজী হইলেন না। তাঁহার চিরদিনের বন্ধু অখ্যাত অজ্ঞাত দরিদ্র রোগীদের শয্যা-পার্শ্বে তাঁহার অন্তিম মুহূর্ত্ত কাটিয়াছিল।

লিসাডেল্‌-এর সেই সুকুমার শৈশবের এই হইল পরিণতি! কিন্তু কি আসে যায় তাহাতে? কেননা মৃত্যুর পূর্ব্বে কন্‌স্‌ট্যান্‌স্‌ দেখিয়াছিলেন তারায় তারায় অনন্ত জীবনের বিস্তার। আজ কন্‌স্‌ট্যান্‌স-এর সকল উন্মাদনা হইয়াছে প্রশমিত, সকল বিকার হইয়াছে নিরাকৃত। অসীম কালের পটভূমির উপর তাঁহার সমসাময়িক জীবনের প্রচণ্ড আঘাত সঙ্ঘাত মনে হয় যেন পলাতক আলোছায়ার ক্ষণিক চাঞ্চল্যমাত্র। তাই কন্‌ ও ইভার উদ্দেশ্যে লিখিত ইয়েট্‌স্‌-এর সেই পংক্তিগুলি মনে পড়ে:

> Dear shadows, now you know it all,
> All the folly of a fight
> With a common wrong or right,
> The innocent and the beautiful
> Have no enemy but time..............

শ্রীহিরণকুমার সান্যাল

কল্পলতা—শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু প্রণীত: (গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স)।

কল্পলতায় মণীন্দ্রবাবুর আটটি গল্প স্থান পেয়েছে। ইতিপূর্ব্বে মণীন্দ্রবাবুর আরও দু'একটি গল্পের বই প্রকাশিত হয়েছে এবং একথাও বোধ হয় পাঠককে স্মরণ করিয়ে দিতে হবেনা যে কল্পলতা তাঁরই হাতের যাঁর হাত থেকে সুপরিচিত উপন্যাস

'রমলা' বার হয়েছিল। একটি বিশেষ কারণে আমি এখানে এই কথাটি উত্থাপিত করলাম সেটি এই,—শ্রেণীবিভাগ করতে হলে রমলাকে ফেলতে হয় পাকা romanticism-এর বিভাগে এবং এই romanticism-ই কল্পলতারও মূলকথা। আমার মনে হয় একথা অনেকে স্বীকার করেন যে রমলা প্রকাশিত হওয়ায় উপন্যাস লেখা ও গল্পসৃষ্টির একটা নতুন ধারা উৎসরিত হয়, যার দ্বারা অনেক আধুনিক গ্রন্থকার প্রভাবান্বিত হয়েছেন। কেউ কেউ হয়ত বলবেন যে এটা রমলার প্রভাব সূচনা করেনা। বাস্তবিক পক্ষে এটা বাংলা ভাষায় গল্প উপন্যাস রচনার ঐতিহাসিক পর্য্যায়ের একটা অবশ্যম্ভাবী ঘটনা ও রমলা তারই মুখপাত্র বা নিদর্শন মাত্র। সে যাই হোক একথা বলা চলেনা যে এই উপরোক্ত আধুনিক গ্রন্থকারেরা রমলারই পূজক বা রমলাকে আদর্শ-স্থানীয় করেছেন। আসলে আমার বলার উদ্দেশ্য এই যে, শ্রেণীগত বিচার করতে গেলে মূলতঃ এই সব আধুনিক গ্রন্থকারদের রচনাকে সেই romanticism-এর শ্রেণীতেই ফেলতে হয় রমলা যার অন্তর্গত। মূলগত বৈশিষ্ট্য বাদ দিলে রমলাও যদিচ পূর্ব্বোক্ত আধুনিক উপন্যাসগুলির মধ্যেই তবু অল্পাধিক পার্থক্যও স্বীকার করতে হয় কেননা শেষোক্ত রচনাগুলিতে realism-এর বীজবপন করবার বহুতর চেষ্টা আছে; অপর পক্ষে রমলা একেবারে খাঁটি romanticism-এ অধিষ্ঠিত। Realism থাক আর না থাক আমার মনে হয় আধুনিক গল্প উপন্যাসে romanticism-এর একটা নূতন তীব্রধারা রমলা প্রকাশিত হবার সময় থেকে সুরু করে চলে আসছে এবং এও আমার মনে হয় যে আজকালকার প্রতিভাশালী লেখকবৃন্দ—বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ও এমন কি অন্নদাশঙ্কর রায় এই ধারার অদূরবর্ত্তী নন।

বর্ত্তমান প্রসঙ্গে এ বিষয়ে বেশী করে লেখা অপ্রাসঙ্গিক হবে। আপাততঃ এইটুকু বললেই আমার প্রয়োজনসিদ্ধ হবে যে আসলে কল্পলতার গল্পগুলিও চূড়ান্ত romanticism-এ ভরা। যদি কোন পাঠকের এমন ভ্রান্তধারণা থাকে যে realism ভিন্ন আধুনিক কালে গল্প হবে অচল তবে আমি তাঁকে নির্ভয়ে অনুরোধ করতে পারি কল্পলতার গল্প পড়ে দেখুন, এই তথোক্ত realism না থাকলেও গল্প কত মধুর, কত উপভোগ্য হতে পারে। কিন্তু মণীন্দ্রবাবুর গল্প উপন্যাসের বিরুদ্ধে অনেকের একটা নালিশ আছে যার এখানে উল্লেখ না করে পারি না;—নালিশ এই যে তাঁর গল্প উপন্যাসে এমন বিষয় বা এমন ঘটনা থাকে অল্প—যা বিশিষ্টতা বা সম্পদ লাভ করে। বোধ হয় এ নালিশ একেবারে ভিত্তিহীন নয়; অপরপক্ষে কেবল বিশিষ্টতা আছে কি না শুধু এই নিরিখ থেকে গল্প উপন্যাসের যাচাই করতে গেলে আজকের দিনে খুব মুস্কিলে পড়তে হবে। অবাধ গল্পের গতি, মনোরম ভাষা, বিন্যাসের অসামঞ্জস্যহীনতা—অন্য কিছু না থাক এগুলি থাকলেই, আমার মনে হয়, গল্প উপন্যাসের পক্ষে যথেষ্ট ও তারই ওপর নির্ভর করে ভাল-মন্দর যাচাই হতে পারে। মণীন্দ্রবাবুর গল্পে, অন্ততঃ কল্পলতার গল্পগুলিতে, এ কয়টি জিনিষের পর্য্যাপ্ত সমাবেশ আছে। বিশেষতঃ মণীন্দ্রবাবুর ভাষা অতি মনোহারী। কল্পলতার গল্পগুলিকে মোটামুটি দুভাগে ভাগ করা যেতে পারে। একভাগ অলৌকিক ঘটিত অপর ভাগে আছে বিচিত্র রকমের কাহিনী। অলৌকিক ঘটিত কাহিনী তিনটি। একটির নায়িকা ছিলেন বেহালাভক্ত, তিনি তাঁর এক মৃত ভ্রাতৃবন্ধুর প্রেতাত্মার বেহালাবাজান শুনতে পান ও তাঁর সঙ্গে কথোপকথন চলে; কিন্তু নায়িকা

জানতেন না যে সেই ভ্রাতৃবন্ধু পরলোকে। শুধু কথা ছিল তিনি একদিন এসে বেহালা শোনাবেন তাই পরলোকগত হয়েও তিনি এসে তাঁর প্রতিজ্ঞা রক্ষা করে যান। এতে ভৌতিকতত্ত্ব কিছু আছে কিনা বা মনস্তত্ত্ব ঘটিত কিছু আছে কিনা তা নিয়ে কোন মস্তিষ্কপীড়া হয় না, এর মর্ম্মস্পর্শী সরল কাহিনী মনকে মুগ্ধ করে। ইরা আর এক অলৌকিক ঘটনার গল্প; নায়ক সাত আট বছর অষ্ট্রীয়ায় কাটিয়ে এসে তাঁর প্রেমান্ধ ইরার খোঁজ করতে যান। তখন সে মৃত; তার সঙ্গে সাক্ষাৎ হোল না কিন্তু তার অলৌকিক দেহাত্মার দর্শন লাভ হোল। এ গল্পটিরও প্রধান আকর্ষণের বস্তু ঘটনার বিশিষ্টতা নয়, বর্ণনা। তৃতীয়টি হোল 'লেখকের বিচার'; এই গল্পটিতে কয়েকজন নায়ক-নায়িকার প্রেতাত্মা লেখকের কাছে এসে জবাবদিহি তলব করেন। গল্পটি Pirandello-র কথা মনে করিয়ে দেয়, কিন্তু Pirandello-র সঙ্গে একপ্রকার সাদৃশ্য থাকলেও গল্পটির নায়ক-নায়িকার মর্ম্মান্তিক নালিশ ও লেখকের সওয়াল জবাব বড় চমৎকার হয়েছে।

'মালতী'—গল্পগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠতম,—এক অকপট-হৃদয় গ্রাম্যবালিকার বঞ্চিত-প্রেম ও জীবন বিসর্জ্জনের করুণ কাহিনী। 'হোটেলওয়ালা'—অষ্ট্রীয়ার এক আধ-পাগলা হোটেলওয়ালার গল্প; একদিকে সে কন্যার জন্য বিরহ-শোকাকুল, অপরদিকে হোটেলওয়ালার আতিথ্য সৎকারের চিরাগত সৌজন্য সম্পাদনে আপন শোককে নিমজ্জিত রাখতে নিপুণ। গল্পটি গভীর অনুকম্পাপূর্ণ; এর বৈদেশিক পরিমণ্ডল চিত্তাকর্ষক পটভূমি সৃজন করেছে। আমি এই কারণে এ দুটি গল্পের প্রতি আকৃষ্ট যে গ্রন্থকার এ দুটি গল্পে কোন ভেজাল দেন নি; আপন সীমার মধ্যে গল্প দুটি চরিত্র ও রসের বিশুদ্ধতা বজায় রেখেছে। স্থানাভাবে বাকি গল্পগুলির বিষয়ে আলোচনা করা গেল না। আশাকরি বইটি পাঠকমহলে আদৃত হবে।

গিরিজাপতি ভট্টাচার্য্য
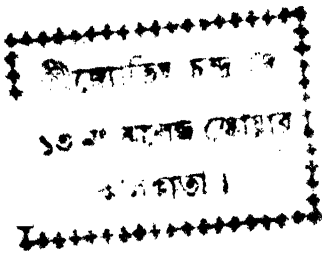
সেতু ও অন্যান্য কবিতা—নন্দগোপাল সেনগুপ্ত প্রণীত। (রয়েস্ পাব্লিশিং, কালিঘাট)।

মাত্র ৭৪ পৃষ্ঠার পুঁথিতে ২৭টি ছোট বড় কবিতা। বিষয়ে, সুরে, ছন্দে তাদের বৈচিত্র্য বড় কম নয়। বাঙ্গলা কাব্যে রবীন্দ্রনাথের খোলা যে সব পথ আজ বাঙ্গালী কবিদের প্রশস্ত রাজপথ এ পুঁথির কতক কবিতার গতি সেই পথে। আর কতক কবিতা চ'লেছে নূতন পথে। বিদেশে ও এদেশে কবিতার বিষয় ও ছন্দ নিয়ে যে পরীক্ষা চ'লেছে,—যে সব বিষয় পূর্ব্বতন কবিরা রসবস্তু নয় বোধে উপেক্ষা ক'রেছেন কাব্যে তাদের স্থান দেওয়া, ছন্দকে তানলয়ের পৌনঃপুনিকের উপর নির্ভর ক'রতে না দিয়ে মুক্ততর গতির মধ্যে সূক্ষ্মতর ও বিচিত্রতর 'হারমনি' সৃষ্টির চেষ্টা—নন্দগোপাল

বাবু সে পরীক্ষায় হাত দিয়েছেন। আর তাঁর হাত অধ্যবসায়ীর হাত নয়, গুণীর হাত। তাঁর প্রাচীনপন্থী ও নবীনপন্থী কবিতা দুই সানন্দে পড়া চলে; এবং মাঝে মাঝে প্রকাশ ও ভঙ্গীর সৌন্দর্য্য ও নবীনত্ব মনকে আকৃষ্ট করে। অবশ্য তাঁর কবিতার মধ্যে প্রাচীন ও নবীন ভাব ও সুরের কবি-প্রসিদ্ধি রয়েছে অনেক, যার ফলে অনেক কবিতার অনেক জায়গা সুখপাঠ্য, কিন্তু মনের মধ্যে স্থায়ী দাগ কাটে না। কিন্তু এই কবিতাগুলিরই অন্য জায়গায় তিনি স্বকীয়তার যে পরিচয় দিয়েছেন তাতে আশা করা যায় যুষ্মৎ-প্রত্যয়গোচর এই সব থেকে মুক্ত হ'য়ে তাঁর কাব্য নিজের বিশিষ্টরূপ লাভ করে বাঙ্গালী কাব্য-পাঠককে আনন্দ দেবে।

শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত

A Study of Yoga—by Jajneswar Ghosh; published by S. Ghosh, 37, Barrack Road Chinsurah, Hooghly.

এই বইয়ে যোগদর্শনের কোন ইতিহাস না থাকলেও যোগদর্শন যে কি তার বিশদ্ পরিচয় পাওয়া যাবে। সম্প্রতি এ বিষয়ে যে সব বই প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে এ বইকে শ্রেষ্ঠ স্থান দিলেও কিছু অন্যায় হবে না। যোগ সম্বন্ধে যে সব ভুল ধারণা আছে ভূমিকায় গ্রন্থকার তা অপনয়ন করবার চেষ্টা করেছেন। অনেকে মনে করেন যে যোগসাধনার দ্বারা দেহের ও মনের নানাপ্রকার অলৌকিক শক্তি লাভ করা যায়। এ কথা সত্য হলেও সে সব অলৌকিক শক্তি লাভ করাই যোগ সাধনার উদ্দেশ্য নয়। যোগসাধনার দ্বারা মানুষের মনকে অসম্ভব শক্তিসম্পন্ন করা চলে বটে কিন্তু সে শক্তির দ্বারা বহির্জ্জগৎকে নিয়ন্ত্রিত করে তাকে আমাদের ইচ্ছানুরূপে পরিচালিত করা যোগের উদ্দেশ্য নয়। বরং এসব শক্তি যে সিদ্ধলাভের অন্তরায় একথা স্পষ্ট করেই যোগসূত্রে বলা হয়েছে। যোগকে Quietism বলাও উচিত নয়, কারণ এ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে গেলে যে প্রচেষ্টার প্রয়োজন তা তুচ্ছ নয়। যোগীর জীবন হচ্ছে—"a more strenuous life than that of the man of action as it meant ascent to higher and higher levels unrelieved at any stage by movement along a smooth and straight road"। ভূমিকায় গ্রন্থকার যোগসম্বন্ধে নানা ইউরোপীয় দার্শনিকের মতও খণ্ডন করেছেন। যোগের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে গ্রন্থকার Self-consciousness and Intelligence, Mind, Nature ও Discipline of Yoga প্রভৃতির আলোচনা করেছেন। এ আলোচনা পাতঞ্জল যোগ-সূত্রের চারপাদেরই অনুবর্ত্তী। সে চার পাদ হচ্ছে—সমাধি, সাধন, বিভূতি ও কৈবল্য। এ চার পাদের ব্যাখ্যা করা পুস্তক-পরিচয়ের সীমাবদ্ধ গণ্ডীর ভিতর সম্ভব নয়। গ্রন্থকার এ-গুলির আলোচনা বিস্তৃতভাবেই করেছেন। তাঁর বই পড়লে মনে হয় যে তিনি তা

ইউরোপীয় পাঠকের জন্যই লিখেছেন কারণ আলোচনায় যোগের সংস্কৃত পরিভাষা খুব কমই ব্যবহার করেছেন। সংস্কৃত পরিভাষা থাকলে এ দেশের পাঠকদের এ বই অপেক্ষাকৃত সহজ-বোধ্য হত। তাহলেও যোগসম্বন্ধে এ বই যে প্রশংসা পাবে তাতে সন্দেহ নেই।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী

প্রকাশক—শ্রীসুরেশ চক্রবর্ত্তী, ৭নং আর, জি, কর রোড, কলিকাতা
রামকুমার মেশিন প্রেস, ১৬৩, মুক্তারাম বাবু ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীসুরেশ চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক মুদ্রিত।